জীবনানন্দ দাশের হস্তলিপির প্রতিচিত্র

অম্বুজ বসু

একটি নক্ষত্র আসে

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

বাঁদিক থেকে : লাবণ্য দাশ, মঞ্জুশ্রী দাশ, অমিতানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশ, সমরানন্দ দাশ

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক, ১৩৭২
দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৮৩
তৃতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত
(পুস্তক বিপণি) সংস্করণ
রজতজয়ন্তী বর্ষ প্রকাশন
মে ১৯৯৯
বৈশাখ ১৪০৬

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্টীট
কলকাতা-৭৩

পিকাশো / ক্রন্দনরতা নারী

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে
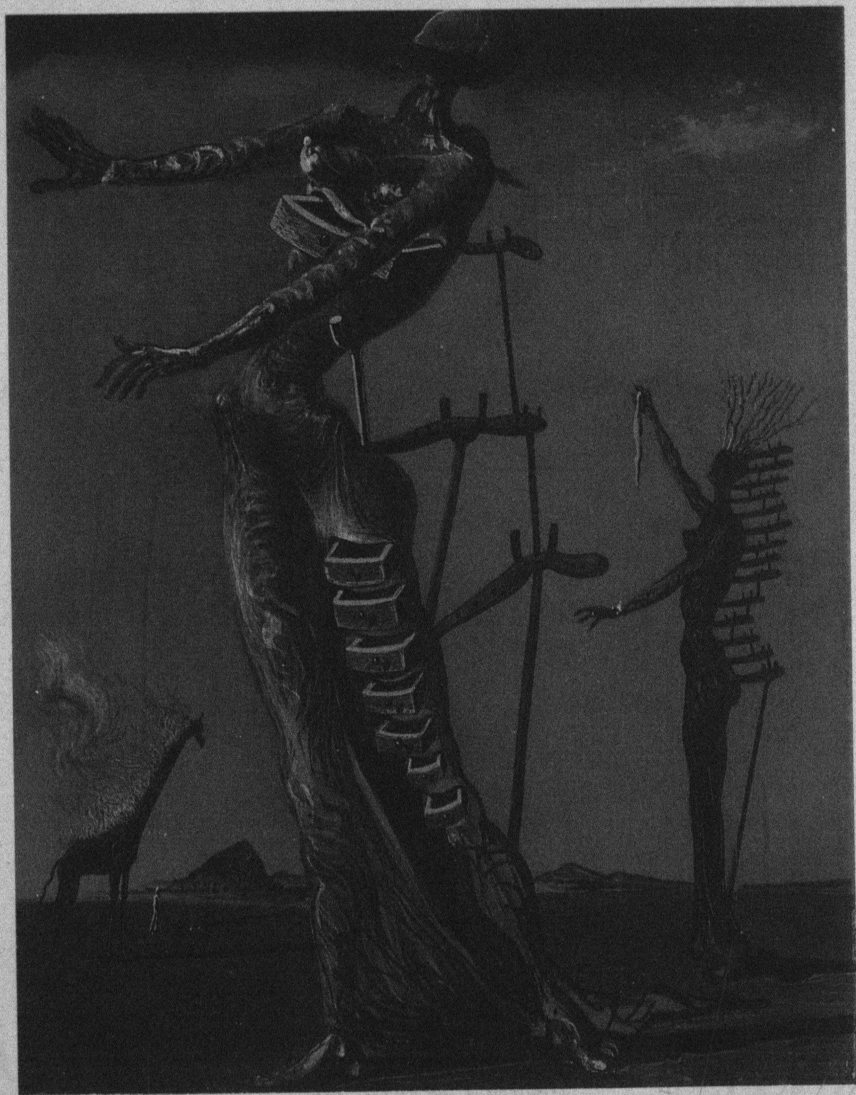
সালভাদোর দালি / জ্বলন্ত জিরাফ

EKTI NAKSHATRA AASE
A critical study on the life
and works of poet Jibnananda Das
by Ambuj Basu

পল সেজান / একটি ছবি

লেখকের নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পুনর্ণবা, মানস, জয়শ্রী, ধ্রুপদী, পূর্বপত্র, সমীপেষু ও নতুন পরিবেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব পত্রিকার সুধী সম্পাদকমণ্ডলী এ ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন এইজন্যে সর্বাগ্রে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ঐগুলির সামান্যই পরিমার্জনা করেছি। একটি প্রবন্ধ শুধু নূতন সন্নিবেশিত হলো।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ডক্টর অমলেন্দু বসু মহাশয় এই গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভূমিকা রচনা ক'রে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন। জীবনানন্দের অতি অন্তরঙ্গদের অন্যতম এই প্রবীণ মনীষী মানুষটির কর্মব্যস্ত সর্বক্ষণের মধ্যে থেকেও কিছু সময় আমি ছিনিয়ে নিতে পেরেছি সেজন্যে গর্ব অনুভব করি।

কবি-ভ্রাতা শ্রীঅশোকানন্দ দাশ মূল্যবান উপদেশ এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। মৌখিক আলোচনায় স্মরণীয় সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি শ্রীকল্যাণ সেনগুপ্ত, শ্রীনবেন্দু চক্রবর্তী, শ্রীমলয় দাশগুপ্ত, শ্রীরবিন আদক, শ্রীসমীর ঘোষ, শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও নির্ঘণ্ট রচনা করেছেন ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নূপুর ও শ্রীমতী অনুভাতি। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনায় ও অঙ্গসজ্জায় শ্রীকানাই পাল ও শ্রীঅজয় গুপ্ত সহায়তা করেছেন। আমার সোদরোপম বন্ধু শ্রীপ্রশান্ত গায়েন এই গ্রন্থ প্রকাশে অসামান্য যত্ন ও উৎসাহ না দেখালে এর প্রকাশ আদৌ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

আরো একটি কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করি। এতাবৎ প্রকাশিত জীবনানন্দ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও মৌলিক আলোচনা আমাদের চিন্তাকে মার্জিত করতে, উপলব্ধিকে উজ্জ্বল করতে কাজে এসেছে। আমাদের আলোচনাকে উদ্ধৃতি চিহ্নে আকীর্ণ করতে চাইনি ব'লেই সে সব লেখকদের কাছে যথাসময়ে ঋণস্বীকার সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীঅরুণকুমার সরকার, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীঅশোক মিত্র, শ্রীঅশ্রুকুমার শিকদার, শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকার, শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী, শ্রীনরেশ গুহ, শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু। এঁদের সকলের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। তবু এই সঙ্গে অসতর্কতায় কারো নাম যদি বাদ প'ড়ে থাকে সেই অক্ষমার্হ অপরাধেরও আমি মার্জনা চাই। কেননা গত দশ বছরে অনিয়মিতভাবে যখন এই প্রবন্ধগুলি রচিত ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন আজকের মতো গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরিকল্পনাও ছিল না, সব সময়ে নোট রাখাও সম্ভব হয়নি।

মার্ক শাগাল / আমি ও গ্রাম

গত দশ বছরে জীবনানন্দ দাশের অনেকগুলি নূতন বইয়ের প্রকাশ ও সংস্করণ হয়েছে, কিন্তু পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির তদনুরূপ সংস্কার সর্বক্ষেত্রে হয়নি। অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে সে বিষয়েও ক্ষমাপ্রার্থী। আমার প্রিয় বন্ধুজন ও শুভার্থীরা যাঁরা পরামর্শ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে আমাকে নিয়ত উদ্বোধিত করেছেন তাঁদের সকলের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা এই সুযোগে প্রকাশ করছি।

দীপান্বিতা, ১৩৭২

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রথমে প্রকাশকালে শুধু জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃতিই এ-বইয়ের আলোচ্য ছিল। জীবনানন্দের সমগ্র সাহিত্য-পরিধি নিয়ে বইটিকে পূর্ণায়ত করবো এই ইচ্ছাতে কয়েক বছর আগেই এ-বই নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও পুনঃপ্রকাশে অযথা বিলম্ব করেছি। গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস সব কিছুই এ-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হলো বটে তবু ক্রমেই বুঝছি, সে সাধ এ-সংস্করণেও পূর্ণ হবার নয়। এখনো জীবনানন্দের অনেক রচনা প্রকাশিতব্য। তাছাড়া নবনব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনে আলোচনা ঋদ্ধ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধীয় বিষয়ের পর্যালোচনা করতে হলে বইটির আমূল রূপান্তর ঘটানো দরকার। সময়ের স্বল্পতায় তা এখনি হচ্ছে না। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা রইল।

চারটি নূতন নিবন্ধ এই গ্রন্থে সংযোজিত হচ্ছে। তাছাড়াও জীবনানন্দের নব প্রকাশিত বইগুলির ভিত্তিতে সমগ্র বইটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। এবারে প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী এবং প্রকাশনার ব্যাপারে অসামান্য সহায়তা করেছেন শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীসনৎকুমার মিত্র। বইয়ের নবসংযোজিত উল্লেখপঞ্জী এবং এবারের নির্ঘণ্ট রচনায় শ্রীমতী চন্দ্রা বসুর সাহায্য পেয়েছি। সর্বোপরি শ্রীসুধাংশুশেখর দে যে আন্তরিকতা ও উৎসাহে এ-বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তার জন্য এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি ঋণী।

এ বইয়ের প্রথম প্রকাশকে যাঁরা সাদরে সম্বর্ধিত করেছিলেন আর যাঁদের নিরন্তর তাগিদে ও সহায়তায় এ-বই আবার প্রকাশ হলো সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রাখী পূর্ণিমা, ১৩৮৩

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

৪৮ বছর আগে প্রকাশিত এই বই ছিল কবি জীবনানন্দের উপর প্রথম একক পর্যালোচনা গ্রন্থ। সমকালীন কবিদের মধ্যে তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা, অনন্যতা, তাঁর বহুমুখী বৈচিত্র্য ও তাঁর কাব্যপ্রযুক্তির অভিনব আধুনিকতা এতেই প্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচিত হয়। ৩৭

গগ্যাঁ / একটি ছবি

বছর আগে এর দ্বিতীয় সংস্করণের কালে জীবনানন্দের সদ্য প্রকাশিত তিনটি গল্প ও দুটিমাত্র উপন্যাসের ভিত্তিতে কথাশিল্পী ও প্রবন্ধকার হিসাবের জীবনানন্দের পরিচিতি এতে তুলে ধরা হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য যে দুটি সংস্করণই অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষিত হয় এবং ছাত্র শিক্ষক, জীবনানন্দপ্রেমী ও গবেষকরা এ বইয়ের পোষকতা করলেও, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় দুবারই দীর্ঘদিন বইটি অমুদ্রিত পড়ে থাকে এবং আমি ধরে নিই বইটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রী এ বইয়ের অভাব বোধ করে পুনঃপ্রকাশের জন্য নানাভাবে তাগাদা দিতে থাকায় পরিশেষে জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষে বইটির পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ করতেই হয়।

বর্তমান সংস্করণে পুরানো আলোচনার আবশ্যিক সংস্কার ছাড়াও এযাবৎ প্রকাশিত জীবনানন্দের যাবতীয় রচনা, ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ জীবনানন্দ সমগ্র, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ এমনকি জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত দেশ বিশেষ সংখ্যাদ্বয় ও বিভাব শতবর্ষ সংখ্যার রচনাগুলি আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় সর্বব্যাপকতা কবির অনুরাগী ও একালের জীবনানন্দ জিজ্ঞাসুদের তৃপ্ত করলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

যাঁরা বইটির পুনঃপ্রকাশের জন্য অন্তহীন তাগাদা দিয়ে গেছেন এই বিলম্বিত প্রকাশের জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা চাই। আমার যে সব ছাত্র প্রায় স্থাবর আমার সঙ্গে কলকাতার প্রকাশন জগতের যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করে দিয়েছে এবং বইটির প্রকাশের ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছে তাদের সর্বাগ্রে সাহিত্যিক শ্রীঅশোককুমার কুণ্ডুর নাম করি, এছাড়া বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীতাপস কোনার, অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীঅনিন্দ্য ভুক্ত, অধ্যাপক শ্রীঅসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়কে, পাণ্ডুলিপি তৈরিতে শ্রীটুম্পা ঘোষ, আমার স্ত্রী চন্দ্রা বসু ও কন্যাপ্রতিম শ্রীপৌলমী পাত্রকে, মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীশুভজিৎ গুপ্ত ও পুস্তক বিপণির কর্ণধার শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দারকে কৃতজ্ঞতা জানাই। দুর্লভ বই দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত ড. তাপস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ড. প্রণবকুমার দালাল।

এপ্রিল, ১৯৯৯ — অম্বুজ বসু

আরামবাগ, হুগলী

পিকাশো / দি গীটার

বিষয়সূচি

মাতিস / লে রেপো দু মোদে

রুশোলা / গত রজনীর স্মৃতি

পল ক্লী / টুইটারিং মেশিন

ওয়াসিলি কাদিনস্কি / ইম্প্রোভিশাসন ৩৫

ভূমিকা

এক

জীবনানন্দর মৃত্যু হয় ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালী কাব্যরসিক যে কতটা অভিভূত হয়েছিলেন তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় সেদিনের নানারকম সাহিত্যপত্রিকায়। কোনো কোনো পত্রিকায় (বিশেষত যেগুলি নবীন কবিদের রচনাশ্রয়ী) জীবনানন্দ স্মরণে বিশেষ আলোচনার মূল্যবান সমাবেশ হয়েছিল। জীবনানন্দর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ধারণা বাঙালী কবি ও কবিতা পাঠকের কিছুমাত্র বদলায়নি বিগত দশ বৎসরে, বদলাবার কোনো লক্ষণ নেই, বরঞ্চ মনে হয় যতই দিন যাবে এই কবিপ্রতিভার মহত্ত্ব অনন্যতা সম্বন্ধে ধারণা ও ব্যাখ্যা ততই বেশি দৃঢ় ও পরিচ্ছন্ন হবে। জনৈক নবীন কবি এ-বিষয়ে যথার্থ বলেছেন :

> "যদি কোনদিন এই ভয়ঙ্কর অপ্রেম-যুগের অবসান হয়ে নতুন-জীবনের অনুভব মানুষের চেতনায় স্পষ্ট হয়...সেদিন আমরা জীবনানন্দর কবি-আসনটি অন্য কোন কবির জন্য এই দেশেও রচনা করবো। তার পূর্বে, অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, যখন কবিকে অমৃতের পুত্র এবং কবিতাকে মন্ত্র করার মত কোন সুচেতন মুহূর্তই মানব সমাজের মধ্যে স্থির নেই তখন...এই বিষণ্ণ অপ্রেমের মধ্যেও যিনি শিশু-মানুষের নিরপরাধ প্রেম-চেতনাকে কবিতার বিষয় ক'রে গেলেন, তাঁর আসন আমাদের নিজেদের বুকের মধ্যে।"
>
> বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "জীবনায়ন"

জীরনানন্দর কাব্য সম্বন্ধে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ব্যাপক ও গভীর বলেই আমার আশ্চর্য লাগে যে, তাঁর কোনো জীবনীগ্রন্থ আজো রচিত হয়নি, তাঁর কাব্যের আলোচনায় কোনো সমগ্র গ্রন্থ নিবেদিত হয়নি, যদিও একাধিক সমালোচনা-গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কাব্যের দিঙনির্ণয় কালে জীবনানন্দ সম্বন্ধে পুরো পরিচ্ছেদ নিয়োজিত হয়েছে। আশ্চর্য লাগে, কেননা অন্যান্য কোনো কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে প্রিয় কবিদের সম্বন্ধে ভিন্ন আচরণের আভাস পাই। একটা দৃষ্টান্ত দেব। উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েট্‌স্ মারা গিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে। চার বৎসর পরেই, ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয় জোসেফ হোন্ প্রণীত ইয়েট্‌স্-জীবনী। (বস্তুত গ্রন্থখানা রচিত হয়েছিল প্রায় এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ইয়েট্‌সের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে।) ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালে কবি ম্যাক্‌নীস্-রচিত "দ্য পোইট্রি অব ইয়েট্‌স্" প্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে আমার সতীর্থ অধ্যাপক নর্ম্যান্ জেফার্স ইয়েট্‌সের জীবনী ও কাব্য-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে

পিকাশো / বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি

তাঁর মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এরপরে যে ইয়েট্‌স্ সম্বন্ধে কতগুলি প্রবন্ধ এবং গোটা বই লেখা হয়েছে তার হিসেব রাখা গ্রন্থপঞ্জীকারকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত ইয়েট্‌স্-প্রীতি ইদানীং কাব্যরসিকের উদার এলাকা ছাড়িয়ে চলে গেছে সূক্ষ্মবিচারী অধ্যাপক-সমালোচকের ও পরীক্ষার্থীর সঙ্কীর্ণ স্তিমিতপ্রাণ পাঠকক্ষে। জীবনানন্দর কাব্য এখনো "ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত" হয়নি সেকথা যেমন অপেশাদার কাব্য-পাঠকের পক্ষে সুখের বিষয়, অপরপক্ষে শ্রীঅম্বুজ বসুর গ্রন্থখানি সুধীসমাজে সমাদৃত হওয়া উচিত কেননা কোনো অভূতপূর্ব মত প্রকাশের ও মূল্যায়নের প্রয়াসী না হয়েও এই গ্রন্থখানি জীবনানন্দ সম্বন্ধে প্রথম সমগ্র গ্রন্থ তো বটেই, উপরন্তু (এবং এইটেই বিশেষ প্রশংসার কথা) গ্রন্থখানি শ্রদ্ধাবান অনুরাগী ও সংবেদনশীল চিত্তের পরিচয়। গ্রন্থখানিতে সাধ্য ও সাধনার সুমিতি লক্ষ্য করবার বিষয়। জীবনানন্দর কাব্য পাঠ করে অম্বুজ বসু সুনিবিড় আনন্দবোধ করেছেন, সে-আনন্দে এই কালে তাঁর আবেগ ও মনন উদ্বেজিত হয়েছে, অতএব সে-আনন্দের পরিচ্ছন্ন সংহত এবং (সংস্কৃত আলঙ্কারিকের অর্থে) সহৃদয় প্রকাশে তাঁর সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি জানেন যে জীবনানন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার অন্য পন্থাও সম্ভব কিন্তু সে সব পন্থার দিকে তিনি অগ্রসর হননি। তিনি বলছেন, "আমরা জীবনানন্দর জীবনী লিখতে বসিনি।" জীবনী-রচনার আবশ্যকীয় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি অপর কোনো নিষ্ঠাবান নির্লোভ সাহিত্যসেবীকে আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক আরো বলছেন, "জীবনানন্দর প্রতিভার বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়"। আমার মনে হয়, এটাই সমীচীন যে প্রিয় কবি সম্বন্ধে রচিত প্রথম গ্রন্থটি অনার্দ্র মূল্যায়নে প্রবৃত্ত না হয়ে সেদিকে অগ্রসর হয়েছে যেদিকে (জীবনানন্দর নিজ অননুকরণীয় ভাষায়) শ্রেষ্ঠ কাব্যের গভীর ও বিরাট মেঘ-ধবলিমা, কবিতার শান্তি ও মাত্রাচেতনা। ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে স্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দর কাব্য নিকষিত হবে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই হবে। তা ছাড়া আলোচিত হবে এ কাব্যের নিজস্ব অচ্ছেদ্য দেশকালোত্তীর্ণ মূল্য কোথায় সে-প্রশ্ন, আবার বিশ্লেষিত হবে বাংলা কাব্যের অতীত পরম্পরা এবং কবির সমকালীন সংবেদনার সঙ্গে এ কাব্যের তুলনা কোথায় সে-জিজ্ঞাসা ; প্রবহমান বাঙালী ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে নিবিড় ভাবে অনুষিক্ত হয়ে এ-কাব্যের ব্যাপক ঐতিহাসিক মূল্য কোথায় সে-জিজ্ঞাসা। কিন্তু প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সেখানেই থামবে না। মহৎ কাব্য তো শুধু গ্রহণই করে না, শুধু ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রেরণাপুষ্ট নয়, সে-কাব্য অচিরে নিজেই ঐতিহ্যের ভাণ্ডারভুক্ত হয়। আজকের ও আগামীকালের বাঙালী কবির কাছে জীবনানন্দ নিজেই ঐতিহ্যের প্রতীক। আজকের ও আগামীকালের সক্রিয় কবি তাঁর নিজ অভিব্যক্তিশীল কবি-জীবনের পূর্বসূরী হিসাবে জীবনানন্দর কাব্য বিচার করবেন। সে-বিচার সশ্রদ্ধ ও সপ্রেম কিন্তু নিষ্করুণ হতেও পারে। যে hungry generation treading down-এর চিত্র কল্পনা করেছিলেন কীট্‌স্, সেই তীক্ষ্ণনখর জীবনক্ষুধায় জীবনেরই শাশ্বত অস্তি। জীবনানন্দর কাব্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকলে একালের ও আগামীকালের বাংলা কাব্যের মুক্তি না বন্ধন সে-প্রশ্ন অচিরেই উঠবে, দেখতে পাচ্ছি অন্তত একজন এখনই প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীঅশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধের থেকে কয়েকটি উদ্যত-প্রশ্ন বাক্যের উদ্ধার করছি :

"আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেকার রবীন্দ্রানুসৃতির মতোই, বর্তমানের জীবনানন্দীয় ঘোর, আমার ধারণায়, বাংলা কাব্যকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে, জীবনানন্দকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে না-আসতে পারলে মুক্তি অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের সৃষ্টি জ্যোতির্ময়তম, কিন্তু সেজন্যই বলছি, তাঁর সর্বসমাচ্ছন্ন করা প্রভাব পরম সর্বনাশের ব্যাপার।"

পরিচয়, আষাঢ় ১৩৭২

উত্তরসূরী সংবেদনায় মহৎ কবির কাব্য যে-দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব বিস্তার করে, (কখনও বা সে-প্রভাবের পরিণামে চংক্রমিত, অনুকৃতির বিবর্ণ সৃষ্টি-বিফলতা) সে-প্রভাব সাহিত্যের ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব বটে, এবং উত্তরসূরীর সৃষ্টিবেদনাপিষ্ট সংবেদনার স্বাক্ষরও বটে, কিন্তু সে-প্রভাবের আলোচনায় কবির কাব্যের স্বরূপ আলোচিত হয় না। বস্তুত ইতিহাসের রসিক পরিহাসে এমন অবস্থাও ঘটেছে যে মহৎ কবির প্রভাব সর্বনাশেরই মূল হয়েছে। মিলটনের প্রভাব এ প্রসঙ্গে অবধানের বিষয়। সে-প্রভাবে আঠারো-উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষায় অনেক মন্দ পদ্য রচিত হয়েছিল। অনুরূপ সূত্রেই পেত্রার্কার অসংখ্য অনুকারকগণ পনেরো ষোল শতকে উজ্জ্বল প্রদীপের চারিদিকে নিরলস ঘূর্ণাবিষ্ট সবুজ পোকার মতো অদ্ভুত আত্মরতির অন্ধ ধাঁধায় ঘুরেছিল। এবং অনুরূপ সূত্রেই শতাধিক বর্ষকাল ইংরেজি ভাষায় ওয়র্ডসোয়র্থ-কোলরিজ-শেলি-কীট্স্-ব্রাউনিং-টেনিসন প্রমুখ বহু মেধাবী ও কুশলী কবি কাব্য-নাট্য সৃষ্টির প্রয়াসে শেক্সপিয়রের অনুকরণে স্বকীয় সৃজনীবীর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের সমকালে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ও এলিয়টের দুর্বার প্রভাব কত প্রতিশ্রুতি সংহারের কারণ হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পরিণামে ও মূলে সাযুজ্য নেই, পরিণামের ভয়াবহতায় মূলের দোষ প্রমাণ হয় না। সীতার রূপে লঙ্কা জ্বলেছিল, হেলেনের অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়েছিল ট্রয়। সেজন্য, ইচ্ছে হয়, দোষ ধরতে পারেন কাম-লালসার, রাবণের ও প্যারিসের। অথবা পরম পৌরুষের অমিত অভিমানে বলতে পারেন, যেমন খৃষ্টীয় ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নানাভাবে বলা হয়েছে, স্ত্রীলোক থেকেই সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়। বলতে হয় বলুন, কিন্তু এমন কথা বলতে তো পারেন না যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সীতা এবং হেলেন লঙ্কা ও ট্রয়ের ধ্বংসের জন্য দায়ী। এলিয়ট যখন মিলটন-অনুকারকদের নির্বলতার প্রমাণে মিলটনেরই কাব্য দোষযুক্ত বলে সাব্যস্ত করেছিলেন তখন তাঁর উক্তিতে যেমন তথ্যাভাব ঘটেছিল, তেমনই অভাব দেখা দিয়েছিল সুযুক্তির এবং সুরুচির। এলিয়টের উক্তির হেত্বাভাস অশোক মিত্রের আর্তনাদে প্রকাশ পায়নি, বরং তিনি তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন একথা বলে, "জীবনানন্দ আমার প্রিয়তম কবি"। কাব্যের শিল্পরূপ ও ঐতিহাসিক রূপ, এই দুই অভিন্ন একথা অশোক মিত্র জানেন। তাঁর উক্তির উল্লেখ করেছি এই কারণে যে যদিও আমার নিজ বিশ্বাসে আজকের, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের, বাংলা কাব্যে যে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় তার মূলে জীবনানন্দর 'কুহকিনী' কাব্য নয় বরং সে কাব্যের অমনোযোগী পাঠ, তাহলেও আমি অশোক মিত্রের মূল কথা মানি যে আগামী দিনের মহৎ কবি মহত্ত্ব অর্জন করবেন জীবনানন্দর দ্বারা আচ্ছন্ন থেকে নয়, স্বকীয়তায় মুক্তিলাভ করে, যেমন জীবনানন্দ স্বয়ং পরম পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে অনবশেষ

শ্রদ্ধান্বিত হয়েও, সে-কাব্যের ঐতিহ্যপুষ্ট হয়েও, সে-কাব্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন নি। জীবনানন্দর কাব্য যে সমগ্রভাবে মেধার সহিত অধীত হচ্ছে না বরং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে একপেশে দৃষ্টিই তাঁর অনুরাগী নবীন কবিদের রচনায় অনেক সময় প্রকট তার প্রমাণ তাঁর কাব্যের একটি উজ্জ্বল আদিম অংশ সম্বন্ধে বহু পাঠকের অমনোযোগ। জীবনানন্দর যে-সুচেতনা আমাদের চিত্তে অবশ শিহরণ জাগায়, সেই সুচেতনার মূলে ছিল গভীর লোকপ্রেম, নিবিড় বস্তুনিষ্ঠ বলিষ্ঠ লোকচেতনা। শুধুই ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের Man নয়, ব্রাউনিং-উল্লিখিত Men and women। একদা কবি বলেছিলেন :

১। আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব।

মৃত্যুর আগে, ধূসব পাণ্ডুলিপি

২। এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?

বোধ, ধূসব পাণ্ডুলিপি

৩। দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,—
তবে ঐ পৃথিবীর দেওয়ালের 'পরে
লিখিতে যেয়ো না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা,

স্বপ্নের হাতে, ধূসর পাণ্ডুলিপি

সে ছিল এক অদ্ভুত আলো-আঁধারী কল্পজগৎ কিন্তু সে জগতের ভিত্তিও সুনিষ্ঠ বস্তুচেতনা ; পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত ; খড়-নাড়া-পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,/শিশিরের জল ; পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণ ; শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ ; বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত/এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে। কবি বলছেন "আমরা দেখেছি যারা।" দেখেছি। দর্শনেন্দ্রিয়ের আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বিন্দুসংহত অভিজ্ঞায় বিধৃত হয়েছে বস্তুজগৎ, প্রত্যক্ষ জগৎ,

এমন কি সর্বদ্যোতক মানুষ-নামা প্রাণীরও জগৎ কিন্তু এখনও বিধৃত হয়নি বিশিষ্ট অনন্য স্বকীয়তা-সম্পন্ন মানুষ-মানুষী ছায়াশরীরী নয়, এরা স্বকীয় নামাঙ্কিত দেহী নরনারী— ইয়াসিন হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ ; গগন বিপিন শশী ; পাথুরেঘাটার মানিকতলার শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের এন্টালীর। এতকাল নিসর্গ-চেতনা ও মানুষ-চেতনা দুই-ই এক অপার্থিব ধূসরতায়, এক অস্পষ্ট সীমাঙ্কিত কোমলতায় রঞ্জিত ছিল, নিসর্গবস্তুর অথবা মানুষের যেন স্বতন্ত্র অবয়ব-রেখা ছিল না, মানুষ যেন ইনডিভিজ্যুয়ল্ ছিল না। এখন মানুষ ইনডিভিজ্যুয়ল্ হল, প্রত্যেক মানুষের নামধাম বাসস্থান নির্ণীত হয়ে তারা চারিত্রিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করল। "এই সব অণুর মতন/উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলো।" অবশ্য সবারই জীবন উপেক্ষিত নয়, এই লোকে বাস করে অনুপম ত্রিবেদী, সুবিনয় মুস্তাফী, লোকেন বোস, সোমেন পালিত। আর বেনামী বন্দরের কিছু নামহীন নাবিকও জীবনের সড়কের একপাশ দিয়ে চলে যায় : 'গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী'। 'তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরী' ; 'এক ভিখিরিণী তিনজন খোঁড়া'। কিন্তু অনামা লোকেরও ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট।

> ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
> থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
> হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
> বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

রাত্রি : সাতটি তারার তিমির

প্রত্যক্ষজ্ঞাত এই মানুষ-মানুষীর লোকে ইতিহাসাঙ্কিত মানুষের ভিড় : নচিকেতা, জরাথুস্ট্র, লাওৎসে, এঞ্জেলো, রুশো, লেনিন, কুইসলিং, হিটলার, কে এম মুন্সী, বীর নরীম্যান। আমার বিশ্বাস যেদিন জীবনানন্দর কাব্যপাঠ আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে কবিকেন্দ্রিক হবে, সেদিন তাঁর কাব্যের নিরন্তর বস্তুনিষ্ঠা উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করবে এবং সে মর্যাদালাভে কবির সম্পূর্ণ মূল্য যেমন হৃদয়ঙ্গম হবে, নবীন কবিদেরও আদর্শ তেমন উজ্জীবনকারক হবে।

দুই

যখন বলা হয় যে জীবনানন্দ ভয়ঙ্কর অপ্রেম যুগের বিষণ্ণ কবি তখন খণ্ডিত দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যের মূল্যায়ন হয়। এ যুগের বাঙালী কবি মনে করেন তিনি যন্ত্রণাযুগের কবি যে Angst-দ্বারা বিমথিত হয়েছে পশ্চিম ইওরোপের লাঞ্ছিত যুব-হৃদয়, তারই ছোঁয়া লেগেছে তাঁরও গায়ে, যে Age of anxiety অথবা Age of Nightmare হয়েছে প্রতীচ্য সভ্যতার পরিমণ্ডল তার বায়ুস্রোতে চঞ্চল হয়েছে অন্তত বাঙালী জীবন। বিগত আট দশ বৎসরের বাংলা কবিতায় 'যন্ত্রণা' শব্দটি অথবা এই অনুভূতিজ্ঞাপক অনুরূপ শব্দাদি যে কতবার কত ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসাব রাখা শুমারনবিশের কাজ। এ যুগের কবির যন্ত্রণাবোধ আমি আদৌ পরিহাসের বা অবিশ্বাসের বিষয় মনে করি না। খুবই সম্ভবত কোনো এক আশ্চর্য বিপর্যয়বোধে, সর্বসত্তাচূর্ণকারী সর্বনিষ্পেষণকারী এক সুতীব্র ক্লেশজ্ঞানে উদ্বেজিত

হয় নবীন কবির সৃজনীশক্তি। প্রতীচ্য সমাজে ও বঙ্গীয় সমাজে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার আনুরূপ্য কতটা, সে আনুরূপ্যে বাঙালী কবির বিপর্যয়বোধ সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলে সাব্যস্ত করা যায় কিনা, এসব মামুলি ও হাল্‌কা প্রশ্ন তোলার আমি পক্ষপাতী নই, কেননা আনুরূপ্য কখনও নিঃসংশয় অব্‌জেক্‌টিভ্‌ মানদণ্ডে নির্ণীত হতে পারে না, পরিজ্ঞাত হয় দ্রষ্টার একান্ত আপন দর্শনক্ষমতায়। অতএব নবীন বাঙালী কবির আত্মচেতনার দাবি মেনে নেব। আর বস্তুত সে-আত্মচেতনা আপাতত আমার আলোচনার অধিগত বিষয়ও নয়। আমার প্রশ্ন জীবনানন্দকে Angst-এর কবি বলা সঙ্গত কি না। এ প্রশ্নের স-বিশ্লেষণ উত্তর বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিধিতে সম্ভব নয়। আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশ্লেষণ বর্জিত বটে কিন্তু বিন্দুমাত্র সংশয়ধূমাঙ্কিত নয়। আমার অধ্যয়নের ফলে আমি দেখতে পাই যে যদিচ জীবনানন্দের শিল্পাবেগে সমকালীন জীবনের অনেক রিরংসার বলাৎকারের বীভৎসতার তিক্ত মানস অভিজ্ঞতা এসেছিল, যেসব অভিজ্ঞতার ফলে এই স্পর্শাতুর কবিহৃদয় ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সজারু-কাঁটায় আবৃত করেছিল আপন বিষণ্ন মমত্ব বোধ ; যদিচ কামাচ্ছন্ন অর্ধসত্যের অর্থাৎ প্রবহমান ইতিহাসের ইদানীন্তন বিকৃত ব্যাদিত শ্বাপদ হিংস্র করালদ্রংষ্ট্রা চর্বণ করতে চেয়েছে কবির সকল ঐতিহ্যবোধ ও সংস্কৃতি-চেতনা ; এবং যদিচ কবির চারিধারে অপহৃত হয়ে চলেছে মানুষের বিশ্বাস ; শিল্পী দর্শনবিৎ ধর্মবিৎ ভেসেছেন লঘুতম প্রচেষ্টার গড্ডলিকা-স্রোতে ; যদিচ সৎ শুভ আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন লোক খুঁজতে গিয়ে অনুসন্ধানীর চোখে ছানি পড়ে যায়, তবুও কবির বলিষ্ঠ অমল জীবনবোধ নেতিবাদী নয়, বরং সদর্থক জ্ঞানে অশুভের ওপারে শুভের পানে অভিসারী। অসৎ থেকে সতে, তমসা থেকে জ্যোতিতে, নেতি থেকে অস্তিতে, যে এক মহান অভিগমন লক্ষণীয়, জীবনানন্দের কাব্য বিবর্তনে তার প্রথম পর্যায় অনুধাবন করুন :

> বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
>
> * * * * * *
>
> সে-সব সন্তান আজ এ-যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
> ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা প'ড়ে
> মৃতপ্রায় ; আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
> প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদারদের
> চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
> ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না ; তবুও
> আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়
> অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
> পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

১৯৪৬-৪৭ : শ্রেষ্ঠ কবিতা

রূপসী বাংলার আজ এই হাল! আমাদের প্রগাঢ় প্রপিতামহগণ, 'ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না', কিন্তু তারা অন্তত আজকের কাফকা-জগতের চেয়ে স্পষ্টতর জগতের অধিবাসী ছিল।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

অদ্ভুত আঁধার এক · শ্রেষ্ঠ কবিতা

— আতুর বিমথিত প্রাণের ক্লমধ্বস্ত উপলব্ধি। যতদূর দৃষ্টি যায়, ইতিহাসের ক্রমবিলীয়মান পশ্চাতের দিকে যখন তাকিয়ে দেখেন কবি (এবং আমরা দেখি), সুপ্রাচীন যুগ থেকে গতকাল পর্যন্ত বিবর্তিত সময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্ম যখন স্মরণ করেন কবি (আমরাও করি), তখন আত্মস্থ থাকা যায় না এই ভাবলে যে সমস্ত ঐতিহ্য যেন কোন্ ক্রূর দানবের হাতে লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল! কিন্তু জীবনানন্দ এই উপলব্ধির উষর বন্ধ্যা জমিতে প্রস্তরীভূত হয়ে রইলেন না মহীনের অপ্রাকৃত ঘোড়ার মতো। তাঁর কম্প্র সংবেদনা, তাঁর সংহত মেধা ও মনন এগিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে।

"সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার ক'রে নেয়া যায়, একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা' আছে * * * সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হ'লেও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হ'য়েও যদি তাকে প্রয়োগ-প্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো না কোনো এক রকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা না দিতে পারে তাহ'লে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা : কবিতার কথা

কিন্তু এ-প্রত্যয় অর্জন করা সহজ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তিনি ভেবেছেন "অভিজ্ঞতাবিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতির" কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে তাঁকে লিখেছিলেন এই :

অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হ'য়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন

> গ্রীকরা serenity জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে মনে না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমে বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানা রকম moods খেলা করে।...Mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্ব'লে ওঠে তাতে serenity অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই ব'লেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।
>
> চিঠিপত্র . "ময়ূখ", জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৬১

জীবনানন্দ-কাব্যের অভিব্যক্তির একটি মস্ত কথার আভাস এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া সম্ভব। জীবনানন্দর কাব্য নিবিড় অর্থে Poetry of tension, যে-কাব্যে কবিচিত্তে যুগপৎ সঞ্চরমান একাধিক আবেগের ও মননের আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণে একাধিক বোধের দোটানায় অথবা বহুটানায়, একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উদ্ভূত হয়, সেই আলোড়নই এই কাব্যের সর্বধাত্রী প্রেরণা। যতক্ষণ না এই টেন্‌শন্ একটা বহিরঙ্গ কর্মে (অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে কবিকর্মে) নিযুক্ত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না অন্তরস্থিত আবেগ বহিরাশ্রয়ী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কবির শান্তি নেই। অশান্তিতে এ-কাব্যের জন্ম, সৃষ্টির বেদনার্ত শ্রান্তি ও শান্তিতে এর অবশেষ। অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, উদ্বেল, আলোড়িত উন্মোথিত চিত্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয় শান্তিতে আত্মস্থতায়, ভারসাম্যে। ডক্টর আইভর্ রিচার্ডস্ শিল্পকর্মের যে বহুমানিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তদনুসারে শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পী স্বয়ং এবং শিল্পগ্রাহীও একটা আত্মিক balance of opposites অনুভব করেন, কতকগুলি বিপরীত প্রবৃত্তির এক ভারসাম্য লাভ করেন। সৃষ্টির পূর্বে প্রবৃত্তিগুলি ছিল এলোমেলো, উত্তাল। সৃষ্টিক্রিয়াকালে একটা প্রচণ্ড সকর্মক শক্তির চাপে (এই শক্তিকেই ইংরেজিতে ইম্যাজিনেশন, সংস্কৃতে প্রতিভা বলা হয়েছে) প্রবৃত্তিগুলি সংযত সুশৃঙ্খলায়, নীহারিকা থেকে গ্রহরূপে, বিমূর্ত থেকে মূর্তিতে, অশান্তি থেকে প্রশান্তিতে এই যে রূপায়ণই ছন্দ, সুর, ভাস্কর্যের সিমেট্রি বা সাম্য, চিত্রের ও স্থাপত্যের সুঠাম সুষমা। এই অর্থে জীবনানন্দর কাব্যে Poetry of tension, একটা আবেগব্যাকুল ভাববিচল উন্মন্থন। উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলির প্রথম বাক্যটি আবার লক্ষ্য করুন। জীবনানন্দ বলছেন, "দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না।" এ যেন সেই প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিহিংসাসাধিনী দুর্বারবেগে নিষ্করুণ অর্ধদেবিগণ, ইউমেনাইডিস্ বা এইরিনাইএস্, যারা তাদের লক্ষ্যভূত মানবকে (যেমন অরেস্‌টেস্‌কে) নিরন্তর তাড়নায় অভিভূত করে চলে যতক্ষণ না তিনি শিল্পক্রিয়ায় রত হয়ে শিল্পকর্মের সিদ্ধিতে আপন চিত্তের সংযম ও ভারসাম্য লাভ করেন।

জীবনানন্দ তাহলে টেন্‌শন্-এর কবি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে তাড়না থেকেও কবিতার জন্ম হয়।

তিন

কিন্তু জীবনানন্দ টেন্‌শনের কবি, মাত্র এই কথাটি বলার জন্য উপরের দীর্ঘ বাক্যস্তবকের অবতারণা করিনি। আমার বিশ্বাস (সে বিশ্বাসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও প্রামাণ্য উদ্ধৃতি এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, এখানে অনেকটা যেন সমালোচনা-অসঙ্গত আপ্তবাক্যেই ক্ষান্ত থাকছি), জীবনানন্দের কাব্যের অভিব্যক্তির আর একটি উজ্জ্বল ও অনুপম স্বাক্ষর পাই অন্য এক গতিতে। জীবনানন্দ উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠির জবাবে সে-চিঠিতে serenity সম্বন্ধে কী বলা হয়েছিল তা জানি না, রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি কোথায়ও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানিনা, আদৌ বিদ্যমান কিনা, না চিরতরে হারিয়ে গেছে তা-ও জানি না। কিন্তু জীবনানন্দর জবাব পড়ে মনে হয় হয়তো জ্যেষ্ঠ কবি বলেছিলেন যে কনিষ্ঠের কবিতায় প্রশান্তির কিছু অভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ; হয়তো তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রশান্তির অভাবে কাব্য সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না। জীবনানন্দর জবাবের মূলকথা যে প্রশান্তি ছাড়াও তো মহৎ সুন্দর স্থায়ী কাব্য পৃথিবীতে জন্মেছে। এই বলে তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন গ্রীক কাব্যের, দান্তের, পরে বিঠোফেনের।

এই পত্রটি লেখা হয়েছিল ইংরাজি ১৯৩৭ সনে। (এই তারিখ আমার অনুমান মাত্র। "ময়ূখ" সম্পাদক তারিখ সম্বন্ধে অনিশ্চিত।)[১] এর পরে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দর আরো পত্র বিনিময় হয়েছিল কিনা জানি না। কোনও রকম ধ্রুব বহিঃপ্রমাণের অভাবে আমি কেবল আমার কাব্যচেতনার নির্ভরে একটি কথা বলব। কথাটি আমার অনুমান যে যদিচ এই চিঠিতে জীবনানন্দর প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে যে প্রশান্তির অভাবেও সৎকাব্য সম্ভব, তবুও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার অনুমান যে দ্বিতীয় মহাসমরকালীন ও পরে দেশান্তরকালীন কবিতাগুলিতে তদানীন্তন বঙ্গসমাজের ও বৃহত্তর পৃথিবীর চরিত্রে ভ্রষ্টতা, আদর্শহানি ও সর্ব্বৈব মিথ্যাচার লক্ষ্য করে এই মেধাবী কবি যে-নিগূঢ় বেদনা ও অনাস্থা বোধ করেছিলেন, যে-তিক্ত বেদনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাভাষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রতীকী স্যাটায়ারে, সে-বেদনার নেতিবাদে আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই নেতিবাদী ক্লিষ্ট ব্যঙ্গের দুইটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন :

> ১। নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
> লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।

১। 'জীবনানন্দ দাশ—বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য চিঠিটি উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে লিখেছিলেন, "কল্যাণীয়েষু, তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহাসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্‌টো। ইতি ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" সুতরাং আসলে এই প্রশ্নোত্তরের তারিখ অনুমিত তারিখের বহু আগে ঘটেছিল।

তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

রাত্রি : সাতটি তারার তিমির

২। আপিল চাপিলা

—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড্‌বাস্কেট খেলো শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শত্রুর খোঁজে
সাতপাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে ;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে ;
অসৎ পাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিলো ব'লে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হয়ে ওঠে কী যে উচাটন!
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন :
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি-ঘায়ে।

সৃষ্টির তীরে : সাতটি তারাব তিমির

তীব্র স্যাটায়ার। এ যেন জোনাথান সুইফ্‌ট্‌-কথিত ইয়াহু ও হুইহ্‌ নিহ্‌ম্‌দের জগৎ, জর্জ অরওয়েল-কথিত জানোয়ার-উপনিবেশ, অথবা পল ন্যাশ-অঙ্কিত বা রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত বিভীষিকার উল্কি মাখা অপ্রাকৃত অবপ্রাণীর জগৎ। মানুষের পৃথিবী যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এই বিপর্যয় বোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন সমসাময়িক পৃথিবীর অনেক কবিই। তাঁর অনেকেই উত্তরণ করেছেন কোনো না কোনো বিশেষ মতবাদের ভেলায়, চিন্তার ও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অপরে সমর্পণ করেছেন—আমাদের দেশের কবি, বিদেশের কবি। কিন্তু "তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে।" জীবনানন্দর প্রতিভানিষ্ঠা একান্ত অমলিন। শকুন্তক্রান্তির কলরোলে যে-প্রলোভন সর্বাধিক মায়াময়—ছক-কাটা প্রত্যয়ের মসৃণ হাতে আত্মসমর্পণের প্রলোভন—সে প্রলোভনে জীবনানন্দ পথভ্রষ্ট হননি, আত্মপ্রতারণায় বিলোলপ্রজ্ঞ হননি। পুরোপুরি নির্মল ও নিঃসংশয় প্রত্যয়ে স্থিতধী হওয়ার পূর্বেই মহাকাল তাঁকে টেনে নিয়েছিল কুয়াশার ওপারে, সেজন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে থেকে থেকেই তাঁর ক্লিষ্ট বিপর্যস্ত আত্মার আর্তি রূপ পেয়েছে ; কিন্তু তবুও শেষ দিককার কাব্যে তিনি যে এক অন্তর্দীপ্ত স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জন করেছিলেন সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। জীবনানন্দ বলেছেন :

রাত

এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায় ;—বেলজেনের সব-চেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে ;

পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্ণা,—রৌদ্র প্রদীপ্ত হয়,—মানুষের মন
সহসা আকাশ পথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কী রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে,—সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে ;—অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহ অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত নাকি? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে : বেলা অবেলা কালবেলা

এই অগ্রসর হওয়ার, এই অগ্রগমনের, কোনো বিশিষ্ট গতিভঙ্গী আছে কি? "চরৈবেতি", "Excelsior", "আগে চল আগে চল ভাই", "কদম কদম বঢ়ায়ে যা"—কতরকম বাক্‌ভঙ্গীতে একই আহ্বান এসেছে মানুষের কাছে সময়ের অন্তিম ধূসর রাজবর্ত্ম বেয়ে! আহ্বানের যাথার্থ্য নিয়ে সংসারে দ্বিমত নেই। সঙ্কট উপস্থিত হয় কোন্ উপায়ে অগ্রগমন করব তাই নিয়ে। আর বস্তুত এই উপায় সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকলে আহ্বানের শক্তিশালিতা কমে যায়। শেলির বিপ্লবী মনোভাব শ্রদ্ধার্হ কিন্তু বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অতি অস্পষ্ট ধারণাগুলি অনেক মেধাবী পাঠক চিত্তে বিরাগ জন্মিয়েছে। অগ্রগমনের গতি সম্বন্ধে জীবনানন্দ কোন্ ধরনের চিন্তা করতেন তার বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য লিখিত সাক্ষ্য আমি পাচ্ছি না "সাতটি তারার তিমির" গ্রন্থের একটি স্মরণীয় স্তবক ছাড়া :

অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই!
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলন সূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?

সময়ের কাছে : সাতটি তারার তিমির

আঘাতেই জীবন, দ্বন্দ্বে জীবন, গতিই জীবন। জীবনই চলমান, জীবনই আহত হতে পারে, জীবন তো দ্বন্দ্বের সমার্থ। অতএব গতি দ্বন্দ্ব ও আঘাতের মধ্য দিয়েই জীবন আপনাকে সার্থক করবে, মিলনের স্বচ্ছন্দ উৎসবের পানে এগোবে।—এই ধারণার পশ্চাৎপটে সুপরিচিত দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের উপনিষদে আছে, আছে আমাদের মহাকাব্যে। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ নামক যে ক্ষুরধার তর্কশাস্ত্র প্রচলিত ছিল তারও গোড়ার কথা দ্বান্দ্বিক দর্শন। পরবর্তীকালে হেগেল এই দ্বান্দ্বিক দর্শনের মুখ্য

উদগাতা হয়ে ওঠেন এবং তাঁর দার্শনিক প্যাটার্নের ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ দণ্ডায়মান। অপরপক্ষে গতিদর্শন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তার ঐতিহ্যে আবহমান কাল থেকেই প্রবল। এযুগে রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তার শ্রেষ্ঠ ধারক। জীবন-নিহিত আঘাত এ-ও পুরনো চিন্তা, গৌতম বুদ্ধের দুঃখবাদের গোড়ার কথা। খৃষ্টীয় 'প্রব্লেম অফ্ ইভল্'-এরও গোড়ার কথা। তাছাড়া উনিশ শতকে ডারুইনের বিচারে এ চিন্তা নতুন রূপে দেখা গিয়েছিল। জীবনানন্দ সুপাঠক ছিলেন, চিন্তাশীল ছিলেন, স্বল্পবাক্ 'ইন্ট্রোভার্ট' বা অন্তরাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন সংসার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। দ্বন্দ্ব-আঘাত-গতির ধারণা তিনি কি বাইরের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ দর্শন-অধ্যয়ন থেকে অথবা সমকালীন কোনো আন্দোলন বা প্রচার থেকে? না কি তাঁর চেতনা যতই গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল, ব্যক্তিস্বরূপের বহিঃস্থিত যাবতীয় বিষয় ব্যক্তিস্বরূপেরই ক্রমোজ্জ্বল বর্তিকায় আলোকিত হতে লাগল, ততই এই দ্বন্দ্ব-আঘাত-গতির ধারণা সুপ্রতিষ্ঠ হতে থাকল?—প্রশ্নগুলির উত্তর আমি দিতে পারব না, কোনো সহায়ক তথ্য আমার আয়ত্তে নেই। কিন্তু সম্ভবত এ হেন তথ্য অনাবশ্যক। তথ্যের সাহায্যে বড় জোর এইটুকুই বলতে পারব যে জীবনানন্দ এ সব ধারণা আহরণ করেছিলেন অমুক গ্রন্থ থেকে অমুক দর্শন থেকে অথবা একান্তই নিজ অপ্রভাবিত চেতনা ও সংবেদনা থেকে। বলতে পারব না কোন্ উপায়ে বিমূর্ত ধারণা গ্রহণ করল কাব্যের শরীর, অথচ কাব্যই তো আসল বস্তুটি, অন্য সব কথাই কাব্যাস্বাদের প্রস্তুতি মাত্র। সুতরাং যে-তাবৎ না কোনো নিঃসংশয় তথ্যের নির্ভরে বিশ্বাস করতে পারি যে জীবনানন্দর চিন্তার উৎস বহিঃস্থিত, ততদিন আমি এটাই বিশ্বাস করব যে তাঁর গতি-দ্বন্দ্ব-আঘাত-ছন্দিত জীবনবোধ তাঁর নিজস্ব সকর্মক চেতনা থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। বস্তুত জীবন মানেই যে গতি দ্বন্দ্ব আঘাত, এই ধারণা কবির অনেক আগেকার রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছিল, যদিচ এমন মেধাবী বচনে নয়। "জীবন" কবিতার একটি স্তবক তুলছি :

> যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে,—
> বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন!
> সে-ফসল নষ্ট হবে তারি ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
> আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন!
> নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন
> এই শক্তি,—একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল!
> এরি জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
> আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল!
> দুরন্ত চিতার মত গতি তার,—বিদ্যুতের মত সে চঞ্চল!

জীবন · ধূসর পাণ্ডুলিপি

গতিময়, দ্বন্দ্ব ও আঘাতময়, জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছে কবির ইতিহাস-চেতনা। ইতিহাস-চেতনায় নিহিত তাঁর শুভ্র আশার বীজ, কোনো সরলরেখ বা চক্রবৃত্ত বা কম্বুরেখ নিয়তির নিয়মে প্রত্যয় নয়। জিয়মবাটিষ্টা ভিকো বা হেগেল বা স্পেংলার

বা টয়ন্‌বি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরে যে সব পুনরাবৃত্ত নিয়ম বা ছন্দ লক্ষ্য করেছেন তেমন কোনো অবশ্যমান্য বিশ্বাস আমাদের কাছে উপস্থিত করেননি কবি। তাঁর ইতিহাস-চেতনা পুরোপুরি কবিমানসিক, অর্থাৎ তত্ত্বমুখর নয় অনুভূতি নির্ভর, যুক্তি সাপেক্ষ নয় বাক্‌প্রতিমায় বিধৃত। আবহমান ইতিহাসের বঙ্কিম বন্ধুর পথে তিনি কয়েকটি আলোক-বর্তিকা দেখেছেন—নচিকেতা বুদ্ধ ঈশা...গান্ধী, এই সব বর্তিকায় উদ্ভাসিত হয়েছে মানবিক জীবনধারার প্রকৃত অর্থ। এই সব বর্তিকা যেন সহস্র ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে কোথাও নিবাত নিষ্কম্প শিখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং আজো যে এই নিটোল পবিত্র পরম্পরা অব্যাহত আছে তার প্রমাণ গান্ধীজীর জীবন। 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেছেন :

> এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
> তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
> টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল
> দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ ব'লে সম্ভাষণ ক'রে নয়—
> কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
> জীবনের ঢের পরিসর ভ'রে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে গিয়েছে
> পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
> সকলকে—সকলের নিচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

মহাত্মা গান্ধী . বেলা অবেলা কালবেলা

ইতিহাসের বর্তমান সর্গে, জীবনানন্দ বলছেন : "চাই শান্তি পর্ব ও সসীম আস্তিক্যের সুর"। অনেক বিক্ষোভ সত্ত্বেও, "যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে—মানবকে ফলিয়ে তুলে—তবুও এমন একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়—যা কঠিনতম আনন্দ একজনের কাছে, সফলতম বেদনা অন্যের নিকটে—তবুও তাদের প্রাণে এক সুরসাম্যের জন্ম দেয়"।—এই মনোমৈত্রী থেকে পরিণামে হৃদয়ে প্রশান্তির জন্ম হয়, আর প্রশান্তি মানে মাত্রাচেতনা। জীবনানন্দ কোথাও মাত্রাচেতনা কথাটির সংজ্ঞা দেননি, আমার মনে হয় ইংরেজ নিও-ক্ল্যাসিকদের প্রযুক্ত good sense অর্থে তিনি কথাটির ব্যবহার করেছেন, যে good sense and equilibrium, মাত্রাচেতনা ও ভারসাম্য, ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদী কাব্যের পরম লক্ষণ। সম্ভবত এই প্রশান্তির দিকেই ইশারা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং যদিও পত্রোত্তরে জীবনানন্দ বলেছিলেন যে প্রশান্তি ব্যতিরেকেই মহৎ কাব্য জন্মাতে পারে, তবুও আমার বিশ্বাস, জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের কথা ভোলেননি, নিদেনপক্ষে শেষ কয় বৎসর নিজ মননের গভীরে ও বৃহত্তর জাগতিক জীবনের প্রমাণে এই প্রশান্তি ও স্থিরতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমার অনুমান যে মহাযুদ্ধের অবসান কাল থেকেই জীবনানন্দর কবিচিত্তে তাড়নার স্থলে সুস্থিরতার তাগিদ প্রবল হচ্ছিল। এই সময়কার একটি চিঠি—তারিখ ২৬.১২.৪৫—এ-প্রসঙ্গে মূল্যবান :

> কোনো কিছুকে 'চরম' ভেবে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, *
> * রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—

> নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়। এতে করে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না ; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরী হয়ে চলতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্বাণের দিকে কারু মতে ; অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজ-প্রয়াণের দিকে অন্য কারু ধারণায় ; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন ক'রে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই। * * রয়েছে হয়তো কবির ভাবনাপ্রসাদ ; চরম ভেবে আঁকড়ে থাকার ভিতর নির্বাণ-অনির্বাণেরও সমন্বয়-স্বপ্নও আছে, শান্তি আছে, মাত্রাচেতনা আছে, উত্তেজনাও যে নেই, তা' নয়, কিন্তু তা নিরিখের সান্ত্বনায় ফিরে আসে।

(উদ্ধৃতি অংশটি নেওয়া হয়েছে 'ময়ূখ' ১৩৬১ থেকে, তারকা-চিহ্নের অন্তর্বর্তী অংশটি 'পূর্বাশায়' প্রকাশিত হয়েছিল, আমি দুটি অংশ একই চিন্তা প্রবাহের উক্তি বলে এক সঙ্গে সাজিয়েছি।)

অর্থাৎ কবি কোনো সদ্যপ্রস্তুত রেডিমেড সার্বিক দর্শনের আলোকে জীবন দেখছেন না, তাঁর দৃষ্টি সব সময় 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে ফলিয়ে দেখতে চায়'। এই হিসাবে তাঁর সমকালীন অন্য যে কোনো বাঙালী কবির তুলনায় জীবনানন্দ অধিক স্বাধীনচিত্ত। স্বাধীনচিত্ত আবার মুক্তচিত্তও বটে, নিশ্চয় স্বাধীন বলেই মুক্ত। তাঁর আবহমান ইতিহাস-চেতনায় সমভাবে বিধৃত হয়েছেন জরাথুষ্ট, লাওৎ-সে, এঞ্জেলো, রুশো, লেনিন, সোফোক্লেস ও মহাভারত, সোক্রাতেস্, কনফুচ, গ্যেটে, হ্যোল্ডেরলিন, রবীন্দ্র, জেসন, ওডিসিয়ুস, ধর্মাশোক, শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেব ঈশা। জীবনানন্দর স্বাধীন মুক্তচিত্ত আসলে স্থানকালোত্তর শুভ্র মানবিকতারই চিত্ত।

কিন্তু আমি এমন কথা বলতে চাই না যে সোনালি সিংহের দেশে যেমন হিরণ্ময় সূর্য, নিরুত্তেজ বিকেল, প্রক্ষিপ্ত রাত্রি এবং ভোর চক্রায়িত অনুক্রমে আসে যায় তেমনি বিমথিত বেদনা, ব্যাহত মূল্যজ্ঞান, তিক্ত পরিহাস, সুস্থিরতা ও প্রশান্তি জীবনানন্দর কাব্যবিবর্তনে স্থান নিয়েছে পরিচ্ছন্ন পারম্পর্যে। যেন প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গার শাদা জল পেরিয়ে যমুনার কৃষ্ণ নীল জলে পৌঁছলাম। না, এমন স্পষ্ট কালানুক্রম জীবনানন্দর কবিভাবনায় নেই। বস্তুত কোনো মহৎ কাব্যেই নেই। কোল্‌রিজের ভাষায় এ হেন স্পষ্ট পারম্পর্য হচ্ছে fixites and definites, যা কিনা fancy নামক নিরেশ শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়, অপর পক্ষে secondary imagination of esemplastic power নামক প্রাণপ্রচুর ও প্রাণচঞ্চল সৃজনী-প্রতিভায় কোনো শিলীভূত স্থবির অনুভূতির স্থান নেই। সুতরাং নিজ সৃজনী-প্রতিভার স্বভাবেই এমন হতে পারেনি যে জীবনানন্দ এককালে মানবিক ঐতিহ্যের ও আদর্শের পরাজয় এবং অন্যকালে সেই ঐতিহ্যের ও আদর্শেরই জয়লাভ দেখেছেন। তাছাড়া ১৯৪৫-এর পরে পরেই বহির্জগতে যে সব মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল—কলকাতার দাঙ্গা, দেশবিভাগ, কোটি কোটি নরনারীর দেশান্তর, জীবনানন্দর নিজ দেশান্তর, গান্ধীজীর হত্যা, আজাদ ভারতে বহু দেশপ্রেমিকের চরিত্রবিকার ইত্যাদি—

তার ফলে নিতান্ত doctrinaire অনমনীয় মতবাদী না হয়ে যিনি শুধু শুভ্র মানবিক আদর্শের ভোর চেয়েছেন, তাঁর পক্ষে আশায় বা নিরাশায়, যন্ত্রণায় বা আনন্দে, জয়ে বা পরাজয়ে, একটি মাত্র বিন্দুতে স্থিতিশীল হওয়া অসম্ভব ছিল। অতএব জীবনানন্দর কবিতায় শেষ অবধি চিন্তার দ্বিধারা সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে যদিও (আমার কাব্যপাঠে আমি দেখতে পাই) তাঁর অস্তিজ্ঞান ক্রমেই যেন নেতিজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে আসছিল।

১। তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের
বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ; তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙ্গে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত
জাতক মানব।

সৌরকরোজ্জ্বল : সাতটি তারার তিমির

২। জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে ;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার ;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

প্রয়াণপটভূমি · বেলা অবেলা কালবেলা

এবং যদিও 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থের কবিতা-বিন্যাসে কালানুক্রমিক রচনাশৃঙ্খলা সর্বদা রক্ষিত হয়নি, তাহলেও এ-গ্রন্থের শেষ কবিতাটির তিন ছত্রে যেন তাঁর অস্তিজ্ঞান-সমুখ, ভাবনার অন্তিম প্রতীক :

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।

হে হৃদয় : বেলা অবেলা কালবেলা

আগের টেন্‌শন্ অন্তর্হিত হয়েছে। অবরুদ্ধ আবেগের উগ্র উৎক্ষেপ আর নেই। কবির আবেগ তাঁর মননের দ্বারা, তাঁর মানবিক ঐতিহ্যবোধ দ্বারা, সংযত হয়েছে। টেন্‌শনের বহির্লক্ষণ আমি আর দেখতে পাই না কেবল একটি ছাড়া ; তাঁর অতি নিজস্ব খেয়ালী ভাষা প্রয়োগে। অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের রীতি-লঙ্ঘন তাঁর কবিতায় প্রথম থেকেই প্রকট (বিশেষত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে) কিন্তু "সাতটি তারার তিমির" ও "বেলা অবেলা কালবেলা" দুই গ্রন্থে অধিক, অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ আবেগের কালেই অধিক। বিশদ বিশ্লেষণের সুযোগ এ-প্রবন্ধে নেই, শুধু একথা বলে ক্ষান্ত হব যে ভাষা-প্রয়োগও শেষদিকে ক্রমশ সুস্থির সুবিন্যস্ত স্বচ্ছ হয়ে আসছিল বলে আমার মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

'মহাত্মা গান্ধী' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। কবিভাবনার গভীরে এমন সুস্থিরতা এমন অনবরুদ্ধ আবেগ বিদ্যমান যে ভাষা-প্রয়োগে কোনো অসচ্ছতা, কোনো বহু-ইঙ্গিত-জড়ানো অসম্পূর্ণ বাক্যবিন্যাস উপস্থিত হয় নি। যেমন চিন্তায় তেমনি ভাষায় নির্মলতা ঋজুতা প্রশান্তি। জীবনানন্দর কাব্য থেকে টেন্‌শন্ বিলীন হয়ে উদ্ভাসিত হলে কে এক পাখি যে গভীর সুসময়ে সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে দীপ্ত প্রাণ দান করে। "নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।"

টেন্‌শন্ বিলীন হ'ল মানে মনন ও আবেগের অস্থিরতা ও বিপর্যয় বোধ বিলীন হ'ল। জীবনানন্দর কবিচিত্ত এখন আত্মবিকাশের সেই স্তরে পৌঁছেছে যেখানে কাব্যের জন্ম balance of opposites-এ নয়, কাব্যের জন্ম স্থিতধী চেতনায়। খুব কম কবির সংবেদনায় এই স্থিতধী সমন্বয়ী প্রশান্তি বিদ্যমান। যেখানে বিদ্যমান সেখানে হয়তো কবি গৌণ কবি, যিনি সংকীর্ণ স্বচ্ছন্দ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কিছু সুকাব্যের ফসল ফলিয়েই পরিতৃপ্ত, অথবা অন্যত্র বিদ্যমান যেখানে কবির বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রতিভার সমগোত্রজ, যে-প্রতিভায় বহু আবেগের অণুপরমাণুগুলি একটা সর্বধাত্রী জীবনবোধে বিধৃত হ'য়ে স্থিতপ্রাজ্ঞ কবিকর্মে প্রশান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও শিল্পে টেন্‌শন্ নয়, হার্মনির লীলা। আমার বিশ্বাস যে এ-যুগের বাঙালী কবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি সার্থকভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও আঙ্গিক থেকে মুক্তি অর্জন করেছিলেন, যিনি এমন সুরের প্রবর্তন করেছেন—অবিস্মরণীয় সুর, সে-সুর জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়—যে-সুর রবীন্দ্রনাথেও পাওয়া যায় না, অথচ যিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অভিব্যক্তিতে নিয়ত বহমান যে অপরিমেয়তল প্রশান্তির ধারা সে ধারা নিজ অভিব্যক্তিতে আয়ত্ত করেছেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথের আত্মার নিকটতম আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য কবিদের যোগ বহিরঙ্গে, সে-যোগ জীবনানন্দর বেলায় অন্তর্গূঢ় ও আত্মিক। বাঙালী মানসের ও কাব্যের যে নিঃসংশয় ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথে বর্তেছিল তার ধারক জীবনানন্দ দাশ।

২১ জুলাই, ১৯৬৫ অমলেন্দু বসু

প্রাগ্‌ভাষ
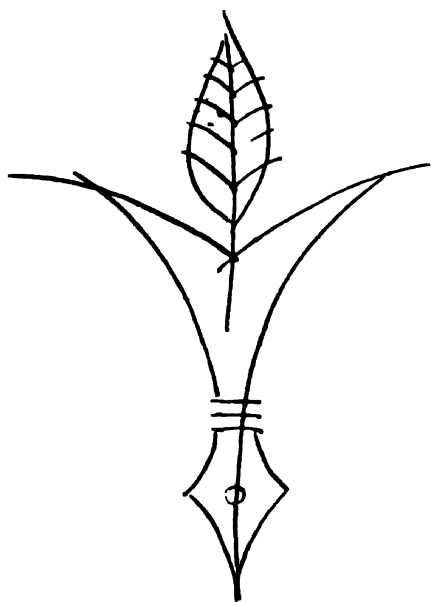
এক

কবিতা রস-মাধুর্যং কবির্বেত্তি, ন তৎ কবি। এই প্রবচনটি বহুকাল আবিজ্ঞ-সাধারণের কাছে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি মর্যাদা পেয়ে এখন শর্ত-নিরপেক্ষ সত্যের সমতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্তিটি আংশিক সত্য বলেই আমরা প্রথমেই এর প্রতিবাদ করবো। বিশেষ কোনো কবি আপন কাব্যের মর্ম উদঘাটনে অপটু—এমন দেখা গেলেও একথা সর্বজনীন সত্য হতে পারে না। বরং একালের কবিতা যখন ব্যক্তিনিষ্ঠ, কবিতা যখন আত্মচিন্তা বা স্বগতোক্তির সমার্থক প্রায়—তখন মনীষী-কবিরা পাঠকসুলভ নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষতা অর্জন করলে আপন কবিতার সার্থক সমালোচক হতে পারবেন নিঃসন্দেহে। উপরন্তু আপন কবিতার বিশ্লেষণে এমন উন্মোচনী আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা অন্যদের পক্ষে আবিষ্কার করা অনেক সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ তো বটেই, তা আদৌ কখনো সম্ভবপর হবে কিনা সন্দেহ। বিহারিলাল চক্রবর্তী যদি 'সারদামঙ্গল' কাব্যের রস-রহস্যের বিশ্লেষণ করে যেতেন তবে আমরা এমন কিছু পেতে পারতাম যার অভাব এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিসঞ্জাত সমালোচনাও পূর্ণ করতে পারেনি।

কিন্তু এই প্রাপ্তির পথে অনেকক্ষেত্রে প্রথাই প্রধান অন্তরায়। আজ যদি প্রবীণ শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে আপন কবিতার ব্যাখ্যা করেন তবে আগামীকালের পাঠক-আলোচকের অনেক শ্রম ও সাধনা লঘু হবে, অনেক প্রশ্নের সহজ মীমাংসা মিলবে। কিন্তু আশ্চর্য! তেমন দাবি আজও আমরা তুলছি না এবং যুগান্তরীণ সংস্কারে স্বভাব-লাজুক কবিরাও নীরবতা ভেঙে বেরিয়ে আসেন নি। আসলে কবিতার মর্ম-উদঘাটনে আমাদের উৎসাহ বড় কম। তার ফল যে কত শোচনীয় সমকালীন কবিদের উপর যে সব আলোচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয় তা থেকেই প্রমাণ হবে। কবিতা আজ স্বভাব-কবিতার পর্যায়ে নেই, দেশ-কাল-প্রসারিত নানা সমান্তরাল আন্দোলনের দোলায় সঞ্চালিত কবিতার মর্ম-আবিষ্কার তাই আজ স্বভাবসমালোচকদের সাধ্য নয়। বিশেষ করে যে সব কবি এই সব বিচিত্রধর্মী আন্দোলনকে উপলব্ধি করে তার অংশ-ভাক্ হয়ে চলেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে তো বটেই।

এক বন্ধু বলেছিলেন, 'কবি জীবনানন্দকে বাংলাদেশের কবিরাই সমালোচকদের আগে আবিষ্কার করেন'। তাঁর জীবিতকালের তাঁর কবিতার প্রকৃত সমালোচনা হয়নি বললেই হয়। আধুনিক কবিতার পক্ষে অক্লান্ত-সংগ্রামী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-র মতো বিরল ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে একথা মর্মান্তিক সত্য। মনে রাখতে হবে শ্রীযুক্ত বসুও মূলত কবিই। বাংলা সমালোচনা-শিল্পের পঙ্গুতা এতেই বোঝা যায়। তরুণ কবিরা যাঁর অন্তত দুই দশক আগে অনুকরণ ও আত্মস্থ করতে প্রবৃত্ত, তাঁর মৃত্যুর পর সেই কবির প্রতিভা সম্পর্কে রসিক-মহলে চেতনা এলো, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য সাহিত্যের নেই।

সম্প্রতি জীবনানন্দ সম্পর্কে সমালোচকরা যে বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন এ আশার কথা। জীবনানন্দ যে-জাতের প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন তার স্বরূপ-নির্ণয় কোনো ব্যক্তি-

বিশেষের দ্বারা অথবা একই যুগের সমালোচকদের পক্ষে নির্ভুল ভাবে করা হয়তো দুঃসাধ্য। কিন্তু যাঁরা আলোচনার অন্য কলম তুলে নিয়েছেন তাঁদের অন্তত একটা সৎ প্রচেষ্টা থাকা উচিত তাঁর অন্তর্প্রকৃতি অনুধাবনের। সে প্রয়াস যদি না থাকে, অথবা কবি যদি সেই প্রয়াসের যোগ্য বলে বিবেচিত না হন তবে অকারণ স্তবমালা রচনার আড়ম্বর কেন? এই জাতের রচনা দিয়ে আমরা শুধু কবিকে নয়, পাঠকদের অপমান করি।

জীবনানন্দের জীবৎকালে তাঁর সম্পর্কে এমন যে দু-একটি অপরিণত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তা দেখে কবি তুষ্ট হতে পারেন নি। কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের কাছে শুনেছি নিজের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে খুব প্রবল হয়েছিল তাঁর শেষ জীবনে। ভাবনার সূত্রগুলো পরপর সাজিয়েছিলেন। কয়েকটি শব্দ-সংকেত মাত্র। এখন তার অর্থভেদ করা যায় না।

জীবনানন্দের সেই অলিখিত আলোচনার দ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারিনি। তবু তাঁর নিজের কবিতা সম্পর্কে ইতস্তত ছড়ানো দু-একটি উক্তি অনুসরণে অনুমান করতে পারি সে আলোচনা রসনিবিড় এবং মর্মার্থসাধক হতো। কবিতার আলোচনায় তাঁর বহুদর্শিতা, সমালোচনার মান ও উচ্চ রুচি সম্পর্কে যে ধারণা তাঁর 'কবিতার কথা' বইটি পড়ে হয় তাতে আমাদের প্রত্যাশা অহেতুক মনে হয় না।

নিজের কবিতা সম্পর্কে ইতস্তত আলোচনার যে দু-একটি সঙ্কেত তাঁর রয়েছে আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তা দিক্-দর্শনীর মতো হয়েছে। এ রকম দুটি উক্তি আমরা এখানে উদ্ধার করছি।

(১) আমার কাব্যে প্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই ত মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়েই যে ধূসর তা হয়তো নয়। মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময় চেতনা, consciousness of times as a universal, তা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মত ; কবিতা লিখবার পথে কিছুদুর অগ্রসর হয়েই এ জিনিষটাকে আমি গ্রহণ না করে পারি না।

কবিতা প্রসঙ্গে

(২) আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিষ্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা-কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে নয়।

ভূমিকা : শ্রেষ্ঠ কবিতা

বজ্রানুবিদ্ধ মুক্তায় যেমন অনায়াসে সূতা পরানো যায় তেমনি এই উক্তি দুটি জীবনানন্দের কবিতার পূর্ণরূপ উদঘাটনে আমাদের সহায়তা করেছিল, নইলে এই প্রবন্ধমালা অন্তত এই আকারে রচনা করা যেত না। উপলব্ধির দীনতা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার জন্য উদ্ধৃত উক্তির তাৎপর্য আমরা কত দূর অনুসরণ করতে পেরেছি এবং সব মিলিয়ে জীবনানন্দের সামগ্রিক স্বরূপটি এখানে ফুটলো কিনা সুধীজনই তা বিবেচনা করবেন।

দুই

বর্তমান আলোচনায় আমাদের অনুসৃত রীতি সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলব। সমকালীন কবিতার পটভূমিকায় জীবনানন্দের কবিকৃতি উপস্থাপিত করে তার মূল্যায়নের বিস্তারিত প্রয়াস আমরা করিনি। আমাদের মনে হয়েছে আধুনিক কবিতার এবং তার আলোচনার যাঁরা জিজ্ঞাসু পাঠক তাঁদের কাছে আধুনিক কবিতার পটভূমিকাটি অজানা নয়।

সংক্ষেপে এটুকু শুধু স্মরণ রাখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়, খ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে, তখন আরো কয়েকজন অখ্যাতনামা সহযোগী কবির মতোই অজ্ঞাতশীল জীবনানন্দের বাংলা কবিতার অঙ্গনে অলক্ষিত আবির্ভাব। এখন যে যুগটাকে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলে অভিহিত করি তখনো সেটি নাম গোত্রে চিহ্নিত হয়নি। তখন রবীন্দ্রনাথের নিত্যপ্রসারী কবিসত্তা ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের বিভিন্ন দিক এবং পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও শিল্পতত্ত্বের অনুকূল অংশ আত্মস্থ করে এমন এক ব্যাপক ভাবরাজ্য অধিকার করেছিল, আর তাঁর কবিতার ব্যর্থতার ভাব-ভাষা রূপে এমন এক আশ্চর্য উজ্জ্বল শিল্পসিদ্ধি ঘটেছিল, যে মনে হয়েছিল, তার বাইরে পদচারণার স্থান খুবই সংকীর্ণ। সে যুগের পাঠকেরা জীবন ও শিল্প সম্পর্কে একটা শুচিশুভ্র নীতিবাদ, সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে একটা অনুদার পূর্বপোষিত ধারণা, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটা উন্নাসিক উপেক্ষা, এই সব মিলিয়ে একটা আত্মতৃপ্তিজাত জড়ত্বের মধ্যে ছিলেন। এমনকি যে যুগের যাঁরা প্রতিষ্ঠিত কবি তাঁরাও প্রায় ভুলতে বসেছিলেন সে মধুসূদন প্রভৃতি প্রাচীনদের প্রভাব পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা অজস্র সৃষ্টি করছেন তা থেকে ভিন্ন কোনো প্রশস্ত পথ আছে, আর সে পথে নূতন এবং সার্থক কিছু করা সম্ভব ও সঙ্গত। অথচ একথা তাঁরা বুঝতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাবভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সমান বা কাছাকাছি সার্থকতা লাভ করাও নূতনদের পক্ষে দুরাশা।

বার্ণার্ড শ' একদা শেক্সপিয়রের নাট্যপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সাহিত্যের উৎকর্ষের এক নির্ধারিত সীমা আছে এবং সাহিত্য বারবার সেই সীমা স্পর্শ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যিক যদি একই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একই সীমা স্পর্শ করতে যান, তবে তাঁর ব্যর্থতা অবধারিত সার্থক হবে বলে তাঁকে নূতন ক্ষেত্র সন্ধান করতে হবে। বাঙালী সাহিত্যিকরা, কবিরা রবীন্দ্র-প্রভাব বর্জিত নূতন ক্ষেত্র অন্বেষায় নিযুক্ত ছিলেন এ তাঁদের জীবনধর্মেরই তাগিদে। 'কল্লোলে' 'কালি কলমে' 'উত্তরা'য় নূতনের এই অনিবার্য অভ্যুদয়ে যে প্রচণ্ড সন্দেহ ও বিক্ষোভ এবং তুমুল বিসংবাদ দেখা দিয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংবাদ হয়ে আছে। এই ভাবেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনা হয়েছিল।

তখনো রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল হয়েই বর্তমান ছিলেন। আর বহু খ্যাতিমান সাহিত্যরথী নিয়ে রবীন্দ্র-যুগ যে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে বা ক্ষীণবল হয়েছে একথাও কেউ বলবে না। বস্তুত রবীন্দ্র-রীতি ও রবীন্দ্রোত্তর-রীতির বিবদমান দুটি ধারা তখন থেকে দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে পাশাপাশি রয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলতে কোনো কালগত শ্রেণীবিভাগ বোঝায় না, বোঝায় দুই জাতের সাহিত্যের প্রকৃতি। প্রবীণ সমালোচক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছিলেন :

"রবীন্দ্রনাথের যাহা জীবন দর্শন এবং সেই জীবন দর্শন হইতে উদ্ভূত যে তাঁহার

শিল্পাদর্শ এবং শিল্পের রূপায়ণ পদ্ধতি তাহা হইতে পৃথক শিল্পাদর্শ এবং শিল্পের রূপায়ণ পদ্ধতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যে সাহিত্য তাহাকেই অভিহিত করা যাইতে পারে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলিয়া—সে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই গড়িয়া উঠুক—অথবা রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের পরেই গড়িয়া উঠুক।"

কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়

তাঁর এই যুক্তি অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমকালীন কবিদের জীবনাদর্শ ও শিল্পাদর্শের এ রকম পার্থক্য শুধু তো তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্যায়ের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়, যখন থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের মূল সুর তখন থেকে সর্বদাই এক বা একাধিক বিবাদী সুরের সন্ধান কবিতার লক্ষণ দিয়েও শনাক্ত করা সম্ভব। তাহলে আমরা কোন সময় থেকে রবীন্দ্রোত্তর কালের পূর্বসীমা নির্ধারণ করবো। ডঃ দাশগুপ্তই লক্ষ্য করেছেন বাংলা ১৩১৭ সালে 'গীতাঞ্জলি'র রচনাকালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'র প্রকাশ। আমরা প্রসঙ্গত ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং প্রমথ চৌধুরীর কবিতার কথা স্মরণ করতে পারি। গোবিন্দ দাসের কবিতায় বিদগ্ধজন সুলভ সংযম ও পারিপাট্য ছিল না ; কিন্তু তাঁর জীবনবাদ, তাঁর বহু কবিতার বহু উজ্জ্বল পংক্তি, বর্ণনা ও চিত্রকল্প যে কোনো শক্তিমান আধুনিক কবির ঈর্ষার কারণ হতে পারে। আর প্রমথ চৌধুরীর নিরীশ্বর জীবনদর্শন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সমশ্রেণীতে গণ্য হবে না।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে স্বসম্পাদিত 'একালের কবিতা'র মুখবন্ধে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের (শেষ?) চোদ্দ পনেরো বছরের কবিতা থেকেই সচরাচর বাংলা কাব্যে আধুনিক পর্ব নির্দিষ্ট। অথচ যেহেতু প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুজ তাই তাঁদের কবিতাও যদিচ পূর্ববর্তী, তবু স্মরণীয় মনে হয়েছে।...নামকরণ একালের কবিতা মাত্রই রইল। কারণ আধুনিক শব্দটা খুব নিশ্চিত নয়।" তারপরে আত্মসচেতনতার ক্রমাভিব্যক্তি এবং 'ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের চেয়ে ব্যক্তিসমাজের নিহিত ভাষা-বিনিময়ের আততি'কে আধুনিক কবিতার মৌলিক লক্ষণ ঘোষণা করে তিনি আবার লিখেছেন, "আধুনিকতার বিষয়ে উপরোক্ত একটা অস্পষ্ট ধারণা নিশ্চয়ই সংকলনের অবচেতনে ছিল। কিন্তু যেহেতু প্রথমত ধারণাটা সূত্রাকারে নির্দিষ্ট নয়, এবং যেহেতু গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের নানারকমে বাংলা কবিতার প্রগতির মোটামুটি একটা চেহারা সাধ্যমত ধরাই ছিল এর বিনীত উদ্দেশ্য, সেহেতু এই বিচার ছিল একটিমাত্র বিবেচ্য।"

'আধুনিক' শব্দটির এই অনিশ্চিততা এবং আধুনিক কবিতার লক্ষণের এই অস্পষ্টতা ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুও অনুভব করেছিলেন। আধুনিক শব্দটিকে তিনি ব্যাখ্যার সাহায্যে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল 'যা শাশ্বত তাই আধুনিক। সেই হিসাবে মেঘদূত কাব্যও আধুনিক, চণ্ডীদাসের পদও আধুনিক।' কথাটি চমকপ্রদ বটে, কিন্তু অর্থহীন। ভালো কবিতার কাজই হলো যুগের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে যুগোত্তরেও জীবিত থাকা। তাহলো কবিতার প্রথম বিচার। কিন্তু এমন কবিতাকেই আধুনিক বলা হবে কেন? আধুনিকতার সংজ্ঞাতে নিশ্চয়ই কালচেতনার কোনো স্পর্শ থাকা চাই। কেননা প্রতিটি যুগেরই একটা স্বতন্ত্র চরিত্র আছে। তাই বিশেষ যুগের কবিতা সে যুগের বিশেষ

সমস্যা, চেতনা ও লক্ষণে চিহ্নিত হয়ে ওঠে ; কিন্তু তার সবই কালোত্তীর্ণ হবে এমন আশা অল্প। তবু হোমার, কালিদাস, মুকুন্দরাম ও মধুসূদনের মতো মহৎ কবির কবিতা তাদের স্বকীয় যুগচিহ্নগুলিকে বুকে নিয়েই চিরজীবী হয়ে আছে, তেমনই এ যুগেরও যে কবিতা মহৎ এবং শাশ্বত, তা যুগের ভেলায় চড়েই কাল-সমুদ্র পাড়ি দেবে।

রবীন্দ্রনাথ একবার আধুনিকতার সামান্য লক্ষণটি বিদেশী কবিতার আলোচনা ক্রমে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, "পাঁজি মিলিয়ে মডার্‌নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌, বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।"

সাহিত্যেব পথে . আধুনিক সাহিত্য

সাহিত্যের কালের প্রসঙ্গে এই নদীর উপমাটা সুন্দর। নদীর জলস্রোতটি শাশ্বত ; কিন্তু তার রঙ, তার তটরেখা তার বিশিষ্ট রূপ নির্ভর করে বিশেষ দেশকালের মাটির বিশেষত্বের উপর। নদী যখন চলে নিজের প্রাণবেগে পথ কেটে চলে, বাইরের শক্তির প্রভাবে যখন তার গতি ব্যাহত হয় তখন নদী বাঁক নেয়। বাঁক নেয় বটে, কিন্তু নিজের প্রাণবেগ হারায় না। সাহিত্যও নিজের প্রাণছন্দে চলতে চলতে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যুগবিপ্লবে রাষ্ট্রবিপ্লবে চিন্তাবিপ্লবে নূতন পথে মোড় নেয়, তবু নদীর মতই তার প্রবাহ অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন। আর সেই নূতন পরিণতির সাহিত্যের রূপ রস রঙ নির্ভর করে ব্যক্তি-প্রতিভা, যুগ ও সমাজ জীবনের উপর।

আধুনিক কবিতার এই শেষ বাঁক যে রবীন্দ্র-বিরোধী ভাবধারা দিয়ে শুরু তা ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতো আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ডঃ দাশগুপ্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে, অবশ্যই মোহিতলাল প্রমুখ আরো কয়েকজনের সঙ্গে, নবযুগসূচক কবি হিসাবে ধরে নিয়ে রবীন্দ্রোত্তর কবিতার কালসীমাকে বাংলা ১৩১৭ অবধি টেনে নিয়ে গেছেন। উক্ত কবিদের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নেই, অবশ্যই রবীন্দ্রোত্তর কবিতার উন্মেষের কালে তাঁরাও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—কিন্তু যুগ-বিভাগকে ঐভাবে সম্প্রসারিত করায়, আমাদের মনে হয়, বিপদ আছে। শ্রদ্ধেয় সমালোচকের অনুরূপ যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিকালকেই হয়তো রবীন্দ্রোত্তর কালে টেনে আনা যাবে। (কেননা প্রত্যেক আন্দোলনের একটা সূচনা আছে এবং সূচনার আগে ভূমিকাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব।)

বস্তুত রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারা বলতে কোনো নূতন পৃথক কাব্যধারা বোঝায় না—আমরা তা বোঝাতেও চাইছি না। এটি রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ ও শিল্পাদর্শের বিরোধী এক ধারা যা দীর্ঘদিন ফল্গু-স্রোতের মতো নেপথ্যে স্তিমিত ছিল। যতদিন বাংলাদেশ রবীন্দ্র-সাহিত্যকে একান্ত ও সর্বৈব বলে ভাবতে শেখেনি ততদিন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রশ্ন অর্থহীন। কিন্তু যখন ওই ভাবনা দৃঢ়মূল হয়ে উঠলো, তখনই উপযুক্ত কাল পরিবেশে একটি পুরানো বীজ অঙ্কুরিত হলো ; বহুজনের ক্ষোভ যেন এক সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সদর্থ বিদ্রোহে অভিব্যক্ত হলো এবং তখনই হলো রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সূচনা।

তিন

আর এই জন্যই রবীন্দ্রোত্তর কবিতার সূচনায় 'কল্লোলের' ভূমিকা স্মরণীয়। যতীন্দ্রনাথ মোহিতলালেরা যা করেছেন 'কল্লোলে'র কবিরা যে তাঁদের তৎকালীন রচনায় তার থেকে স্পষ্ট করে রবীন্দ্র-বিরোধী অন্য কোনো সুর তুলতে পেরেছেন একথা বলা যাবে না। তাঁরা শুধু বহুদিনের সুপ্ত বিদ্রোহকে ভাষা দিয়েছিলেন সেদিন। তাঁদের সেদিনের মনোভাবনাকে জীবনানন্দ অনেক দিন পরে ব্যক্ত করেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই একটা নূতন প্রস্তুতির ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা কাব্যে ; সেটা 'কল্লোলে'র সময়। 'কল্লোলে'র লেখকরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন—কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লিখবার প্রয়োজন বোধ করেন না—যদিও তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়, তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানা রকম সঙ্কেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি। ঠিক এই ভাষায় যে এই ধরনের যুক্তি তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন তা নয়, যুক্তিগুলোও সত্য মিথ্যায় মেশানো; কিন্তু এই ভাবেই দানা বাঁধছিল।
>
> অসমাপ্ত আলোচনা কবিতার কথা

বাংলা ১৩৬০ সালে লেখা এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে 'অনেকের মতে'র প্রসঙ্গে জীবনানন্দের শ্লেষটি লক্ষ্য করতে হবে। শিল্পের কোনো 'শাশ্বত বিষয়' আছে কিনা এ প্রশ্ন কি তিনি তুলতে চেয়েছিলেন? যে বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন শুধু সেটাই শাশ্বত কবিতার বিষয় নয় তার বাইরেও এমন বিষয় থাকতে পারে যা নিয়ে শিল্প সিদ্ধি সম্ভব। বাস্তবিক, 'কল্লোল' রবীন্দ্রসাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কেই কলরব তুলেছিল। 'কল্লোলে'র কবিদের ভূমিকা ছিল যুগপৎ অনুপূরকের এবং বিরোধের। এঁদের আদর্শ ছিল নজরুল ইসলামের দুঃসাহসী বলিষ্ঠতা। প্রেরণার মতো, নায়কের মতো নজরুলই নূতন কবিতার 'অনাগত বিধাতা' হয়েছিলেন। তাঁর তীব্র জাতীয়তাবোধ, তাঁর মহৎ সাম্যভাবনা, প্রবল হৃদয়াবেগ, সুগভীর প্রেমপ্রসক্তি সবেরই মধ্যে একটি স্বপ্নময় বর্ণীল সুরোচ্ছল দীপ্ত পৌরুষ ছিল যা তরুণদের আকুল উন্মাদ করে তুলতো। কবিতার ভাব ভাষা ছন্দে একটা অসংযত ঐশ্বর্য, একটা রূপময় ক্ষেপামি, রবীন্দ্রনাথের নিপুণ নিটোল সংযত সিদ্ধির পাশে এত স্বতন্ত্র, এত মোহময়, যে মনে হতো, যৌবনের ধর্মই এই অজস্র ফেলাছড়া, এই উদ্ধত নির্বিচারের মধ্যে নিহিত আছে।

কিন্তু নজরুলের প্রকৃতিতে যা সুস্থ যা স্বাভাবিক অন্য কবিদের ক্ষেত্রে তা 'পরোধর্ম'। তার হেতু কবিদের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। একথা বুঝতেও তাঁদের বেশি সময় লাগেনি যে নজরুলের কবিতা যতটা মাতায়, ততখানি জাগায় না। নজরুলে নূতন ভঙ্গির প্রবলতা আছে, নূতন দৃষ্টির গভীরতা নেই। অথচ নূতন যুগতো নূতন ভঙ্গি নিয়ে হতে পারে না,

নূতন বিশ্বাসের বাণী নিয়ে তাতে নিজের ভিতর সত্য হয়ে উঠতে হবে। নজরুল পথের ডাক দিয়ে গেলেন, পরবর্তীদের পথ খুঁজে নিতে হবে।

কল্লোলেই নূতন পথের সন্ধান চলেছিল। বলা বাহুল্য তা সময় সাপেক্ষ। তাই এখন যেগুলিকে আমরা রবীন্দ্রোত্তর কবিতার লক্ষণ বলি ১৯২৪ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর প্রথম বই 'মর্মবাণী' এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের প্রথম বই 'ঝরা পালকে' তেমন কোনো ভাবনা বা সুর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে ১৯২৩ ছিল কল্লোলের প্রকাশকাল। যে সমস্ত কবির লেখায় এবং যে সমস্ত কবিতার বই-এ আধুনিক কবিতার নূতন সুর বাজলো তার সবগুলিই অন্তত এর সাত বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' ১৯৩০, অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' ১৯৩০, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' ১৯৩২, বিষ্ণু দে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ১৯৩৩, জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬, সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' ১৯৩৭, অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' ১৯৩৮, প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিরা সকলেই অবশ্য তখনকার 'কল্লোল' গোষ্ঠীতে পড়েন না কিন্তু সকলেই পরে রবীন্দ্রোত্তর কবি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। এই বইয়ের যেগুলি নূতন কবির প্রথম বই তার দু-একটিতে তখনো শিক্ষানবিশীর ভীরুতা ছিল বা রবীন্দ্রানুবর্তনের পুরনো সুর। তখনো কেউ কেউ স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর খুঁজে পাননি, গোষ্ঠীর নামে তাঁদের পরিচয়। তবু আজকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় এই অন্তর্বর্তী বছরগুলি ছিল এঁদের পরীক্ষা ও প্রাপ্তি, সন্ধান ও সিদ্ধির সময়।

তবে অনতিবিলম্বেই প্রমাণ হলো 'কল্লোল' কোনো সমানধর্মাদের গোষ্ঠী ছিল না, ছিল বিচিত্রধর্মাদের মিলন-মঞ্চ। পশ্চিমের দেশগুলির মতো কোনো ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে এঁদের যৌথ সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, এঁদের মিলন সূত্রটি ছিল নঞর্থক অর্থাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের বিরোধিতার। নূতন সাহিত্যের রূপ প্রকৃতি সম্পর্কে এঁদের প্রত্যেকের ভাবনা ধারণা কিছু বা অস্পষ্ট, এবং যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। প্রাথমিক বহিরঙ্গিক মিল খসে যেতেই মনোভঙ্গির দুস্তর ব্যবধান চাপা রইল না। অন্নদাশঙ্কর রায় স্বভাবসিদ্ধ সরস ছন্দে বললেন, 'তোমার আমার মিল নাই, মিল নাই / তাই বাঁধিলাম রাখী'। বাস্তবিক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রসাধনহীন কথা ও ছন্দের কাঁচা স্বাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেনি মোহিতলালের মন্দাক্রান্তা ছন্দ-সরস্বতী ; বুদ্ধদেব বসুর নিচুগ্রামের হার্দ্য সুরের সঙ্গে মিল খায় না সুধীন্দ্রনাথের বাক্-বিধির গুরু চাল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা আর বিষ্ণু দে-র বিপুল বৈদগ্ধ্যের পরিভাষা ভিন্ন। ·

এই স্বভাবগত ভিন্নতার জন্য কবিতা তাঁদের এক লক্ষ্যে পৌঁছেও দিল না। ওঁদের কেউ শিল্পসর্বৈবতায়, কেউ সমাজতত্ত্বে, কেউ মনস্তত্ত্বের জটিলতায়, কেউ ক্লাসিক ঐতিহ্যের নবাবিষ্কারে, কেউ মালার্মে প্রবর্তিত প্রতীকীবাদে, কেউ লরেন্স প্রমুখের প্রকৃতিবাদে, এমনি নানা পথে সাহিত্যের মুক্তি খুঁজছিলেন। প্রায়শই এঁরা সফলও হয়েছেন এবং সেদিক থেকে যে অর্থে 'কল্লোলের' যূথবদ্ধ আন্দোলন তা সার্থকও। রবীন্দ্রনাথের বহুবিসারী ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের ছায়াতে দাঁড়িয়ে, তাঁর মহৎ সাহিত্যের পাশাপাশি এক নূতন বহুবিচিত্র আধুনিক সাহিত্যের, আধুনিক কবিতার এঁরা জন্ম দিয়েছেন।

তবু যখন এই নূতন কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়োজন আসে তখন গত সত্তর বছরের

কবিতার আন্দোলনের ধারাটিকে সামনে রেখে বিভ্রান্ত হতে হয়। ইতিমধ্যে কতো ঢেউ এলো গেল, বিস্মিত হয়ে তার পর্যায়ক্রমটিকে দেখতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-উত্তেজনা আর ইতিহাসের প্রমত্তচারণা, কালিদাস রায় প্রমুখের পল্লীপ্রীতির সহজ রোমান্স, যতীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গদিগ্ধ নৈরাশ্যবাদ, নজরুল ইসলামের তীব্র দেশপ্রেম, গদ্যচারণ, বিষ্ণু দে-র মননিষ্ঠা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমাজ চেতনা প্রতিনিয়ত মনে হতে লাগল আধুনিক কবিতার [?] একান্ত লক্ষণ বুঝি এই, কবিতার মুক্তি বুঝি এই পথে। কিন্তু সেই উদ্ভাসিত বলয়গুলি পার হয়ে এসে আজ মনে হচ্ছে ওর অনেকগুলিই হয়তো অন্ধ গলিপথ ছিল শুধু। এককালে আধুনিক কবিতার সামান্য লক্ষণ যাঁরা নির্দেশ করেছিলেন 'সামাজিক বিষয় বিতর্ক ব্যঙ্গ মননধর্মিতা, নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখতা' সে সংজ্ঞা ছিল হাস্যকরভাবে সংকীর্ণ।

চার

কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার ধারা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তিনি এসব সাময়িক উচ্ছ্বাসে কখনো গভীর ভাবে আক্রান্ত হননি। এই দিক দিয়ে অন্যান্য কবিদের সঙ্গেও জীবনানন্দের সাহিত্যদৃষ্টি এবং আন্দোলনগত যোগ খুব নিবিড় ছিল না। অনেকে যেমন বলেছেন পূর্বতন ও সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রবহীন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ তাঁর রচনা—আমরা অবশ্য তেমন কিছু ইঙ্গিত এর মধ্যে করছি না। আমরা বরং পরে আলোচনা করেছি কিভাবে বাংলাদেশের আবহমানের কাব্যধারায় তিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন, কিভাবে কাব্য ও ইতিহাসের গভীরে গাহন করে উপলব্ধি করেছিলেন কোন পথে বন্ধ্যাস্রোত বাংলা লিরিকের মহামুক্তি এবং সেই পথে বাংলা কবিতার ধারাকে কিভাবে অগ্রসর করে দেওয়া যাবে। আমরা শুধু এখানে এই কথাই বলতে চাইছি যে উত্তর-রবীন্দ্র কাব্যসৃষ্টির নানা পরস্পর বিরোধী সার্থক ও ব্যর্থ প্রয়াসের সমসাময়িক উত্তেজনায় জীবনানন্দকে কখনোই তেমন গভীর ভাবে আলোড়িত হতে দেখা যায় নি। নিজের লক্ষ্য স্থির ছিল বলে তিনি প্রায় সর্বদাই এই আবর্তের বাইরে স্থির ও একাভিমুখ।

জীবনানন্দের নিজের কবিতায় কোনো দ্বিধা বা কোনো দোলাচলতা ছিল না এমন নয়—অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত না তুলেই বলা চলে বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের ভূমিকাটি এই অর্থে অনন্য ও ঐতিহাসিক যে কবিতার চিরায়ত রীতি ও প্রযুক্তি, ভাব ও ভাষার পরিধি পেরিয়ে তিনি এমন এক ভূখণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছেন বাঙলার তরুণতর কবিরা প্রত্যাশা করেছিলেন সেখানে নিজেদের স্থান করে নিতে পারবেন অথচ স্বাতন্ত্র্য হারাবেন না। আমরা জানি, শ্রেষ্ঠ কবিতার পটভূমিতে থাকে মহত্তর জীবনবেদ। এমন মহৎ জীবনবেদ পূর্বোল্লিখিত প্রধান কবিদের কবিতারও ভিত্তি রচনা করেছিল, তথাপি একটি স্বতন্ত্র কাব্য-ঐতিহ্য সৃষ্টির গৌরব এঁদের বর্তায় নি।

এর পিছনেও কারণ ছিল। এঁরা প্রত্যেকেই হয়ত এক একটি স্বতন্ত্র কাব্যরীতির প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, প্রতিষ্ঠা অর্থে পরবর্তী কবিদের প্রভাবিত করার দক্ষতা, কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে তা আর সম্ভব ছিল না। লিরিক কাব্যরীতি এমন এক পরিণতিতে আজ পৌঁছেছে যার রূপগত কোনো বিবর্তন না হলে তা আর বাঁচতে পারে না।

যত দুর্বল যত অপরিণতই হোক নূতন শিল্পকর্মের একটা আকর্ষণ থাকে। বাংলায় লিরিক যখন প্রথম রচিত হচ্ছিল তখন তার অভিনবত্বের যে স্বাদ ছিল তার জন্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মোচ্ছ্বাস অথবা বিহারিলাল চক্রবর্তীর অস্ফুটভাব ও অপুষ্ট ভাষা—সব কিছুরই একটা মূল্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রযুগে লিরিক কবিতার সম্ভার যখন বিপুল হয়ে উঠেছে, তার ভাব ভাষা ছন্দ নিটোল সুডৌল রস-পরিণতি পেয়েছে তখন থেকে আর যে কোনো সৃষ্টিতে পাঠকমন আগের মতো তৃপ্ত হতে পারছে না। তারা ফজলি আম খেয়েছে, এখন চাইছে ফজলিতর আম, কিন্তু সে আম পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং কবিরা নাচার, আর পাঠকরা বিক্ষুব্ধ। পাকা দাড়িকে তো গুড় তেঁতুল মাখিয়ে আম বলে কেউ কেউ চালাতে চাচ্ছেন কিন্তু সে ষ্টান্ট টিকছে না। আসলে সকলকে বুঝতে হবে আমের আসর শেষ হয়েছে। অপেক্ষা করতে হবে আতার আবির্ভাবের।

লিরিকের সব সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়েছে। আজকের লিরিক কবিতা আর তেমন করে পাঠকমন কাড়তে পারে না বলেই কবিদের অবিরাম প্রয়াস নূতন ছলাকলার। একালের কবিতা তাই আঙ্গিকে প্রকরণে এত সমৃদ্ধ। ভাব-ভাষার পরিণতির ফলে সার্থক লিরিক রচনা আজ অত্যন্ত সহজ কিন্তু মনোহরণের সেই পুরনো জাদুমন্ত্রটি খোয়া গেছে। আবেগের তীব্রতা দিয়ে আব পাঠকের হৃদয়কে জাগানো যায় না, অন্তরের তীক্ষ্ণ বেদনাকে ভাষা দিয়ে শ্রোতার মনে আর মোচড় দিতে পারা যাচ্ছে না। তাই হৃদয়ের সাহচর্য লাভের জন্য আরও সার্থক কোনো মাধ্যম আবিষ্কার করতে হবে। তাই নিয়ে দেশ-বিদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই।

জীবনানন্দের কবিতায় এক অদ্ভুত সংবাদ-শালিতা আছে। কিন্তু যে কোনো সাধারণ বাংলা লিরিকের মতো অনেক সময়েই তার স্পষ্ট ব্যক্ত কোনো পরিভাষা নেই। যেন কিছু অর্ধস্ফুট এলোমেলো উক্তি, দু-একটি ইতস্তত ছড়ানো চিত্র, স্বল্পতম কথায় একটি নির্বিশেষ পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে এমন একটি অব্যক্ত অনুভূতির আমেজ আনে অথবা এক বেদনার ব্যথা ছড়িয়ে দেয় যে পাঠকের সুপ্তপ্রায় মন চমকে জেগে উঠে। তাঁর কবিতার ভাষা শব্দচয়ন ও প্রযুক্তিতে দুর্বলতার অন্ত নেই—অন্তত আধুনিক যে কাব্যরীতি এখনো প্রচলিত রয়েছে, তার বিচারে। জানি, আমাদের একথার প্রতিবাদ উঠবে বিস্তর, কিন্তু সে প্রতিবাদ অর্থহীন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বাক্‌শিল্প অধ্যায়ে বিশদ করা হয়েছে। এটুকু বললেই এখানে যথেষ্ট হবে যে জীবনানন্দের ভাষারীতি বাংলা কবিতার ভাষারীতি বা তার বাক্যবিন্যাস রীতিকে প্রায়ই অতিক্রম করেছে, নূতন কোনো ভাষারীতিকে প্রতিষ্ঠা দেবার আন্দোলন হিসাবে নয়—শুধু লিরিক কবিতায় স্পষ্টতা অতিক্রম করে এক বিহ্বলতা সৃষ্টির প্রয়োজনে। অনেক সময়ে সঠিক শব্দটাকে বদলে ভাবটাকে একটু অস্ফুট করে তোলা, বস্তুর বদলে ব্যঞ্জনা, অর্থের বদলে ভাবের অর্ধস্ফুট গুঞ্জরণ, এই তাঁর লক্ষ্য দেখা যায়।

১। সচ্ছল শাণিত নদী, তীরে তার সারস-দম্পতি
ঐ জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে ;
তাদের চোখের রঙ অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে ;

মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প

২। তারই পাশে তোমারও রুধির কোনো বই—কোনো
প্রদীপের মতো আর নয় ;

হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হয়ে সৈকতের 'পরে
সেও সুর আপনার প্রতিভায়—নিসর্গের মতো ঃ
রূঢ়—প্রিয়—প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।

তার স্থির প্রেমিকের নিকট

ভাষা শব্দ অর্থের এই অভাবনীয়তা কি এক আশ্চর্য কৌশলে তিনি হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারেন। তাঁর কবিতার মর্মমূলে যে গভীর চিন্তা প্রবাহ চলে তা সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিগম্য নয়, তবু জীবনানন্দের কবিতা পড়তে ভাল লাগে—এ রহস্য তরুণ কবিদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

ভাবকে উপযোগী ভাষার মাধ্যমে, ধ্বনির মাধ্যমে রসোত্তীর্ণ করার প্রচলিত পদ্ধতিতে নয়, পরন্তু কতকগুলি চিত্রের মাধ্যমে, বিভিন্ন বস্তুর আপাত-বিরুদ্ধ সম্বন্ধের মাধ্যমের অনুভূতিকে অক্ষরে চিত্রিত করার স্বতন্ত্র এক রীতি জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন—

১। তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনও
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরেব ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, কবেছি অনুভব।

শ্যামলী

২। * * তাব মুখ মনে পড়ে এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এলে ; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

শিরীষের ডালপালা

প্রথম কবিতাটিতে নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে যে চিত্র ও বস্তুগুলি কল্পনায় ভেসে উঠেছে তাতে প্রেমিক হৃদয়ের বেদনার অভিব্যক্তি হয়েছে কি আশ্চর্য ভাবে! সমুদ্রের নীল, শূন্য বন্দর, বিকেলের আলোয় সাগরের চিল, নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন—সব মিলিয়ে এক বিচ্ছেদাতুর আত্মার অসঙ্গ ব্যথা ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় কবিতাটিতে পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে একটা মুখের স্মৃতি মনে আসে আর মন থেকে মুছে যাওয়া প্রেমিককে যে দয়া লোকে করে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়নকে মনে হয় সেই দয়ার মতো। এইসব আপাত অসংলগ্ন ভাব ও চিন্তা পাঠকের হৃদয়ে এমন শূন্যতার অব্যক্ত অনুভূতি ও গভীর আবেগ সঞ্চারে সমর্থ যা প্রচলিত লিরিকের দীর্ঘ উচ্ছ্বাসময় স্বগতোক্তিতেও সম্ভব হতো না।

কিন্তু কবিতার রকম নূতন প্রকরণ আবিষ্কারেই তাঁর নিঃশেষ কৃতিত্ব নয়। কবিতার ভাবে ও রূপে যে গভীর জীবনানুভূতির স্বাক্ষর আছে, তাই তাঁকে যুগোত্তর আয়ু দেবে। তাঁর কবিতার সেই বিশেষ রূপ নির্ণয়ই আমাদের লক্ষ্য।

বিকাশের ধারা
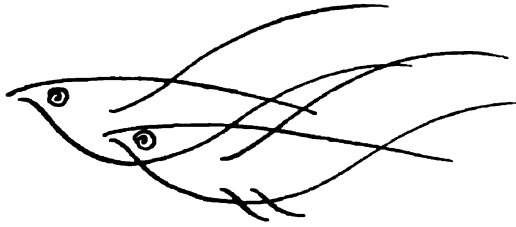
উন্মেষ

যখন সন্ধ্যা নামে, নিচু জমিতে, মাঠে, ঝোপঝাড়ে অন্ধকার জমাট বাঁধে, উঁচু উঁচু গাছগুলোয় তখনো সূর্যের লাল আভা। তারপর রাত্রি জমে গাঢ় হয়, তখন অন্য এক দৃশ্যপট। অন্ধকারে উঁচু গাছগুলো পাথুরে কালো স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়; আর মাঠে-ঝোপে তখন আবছা তরল অন্ধকার।

প্রকৃতির এই দৃশ্যান্তরের মতো কবি-প্রতিভার বর্ণান্তর ঘটতে দেখা যায় কখনো কখনো। প্রথম অবস্থায় কবিতায় যে বস্তুগুলো উঁচু হয়ে চোখে পড়ে তাতে হয়তো অস্তোন্মুখ অন্য প্রতিভার আভা। তখন নূতন কবির ব্যক্তিত্ব বুঝতে হলে দেখতে হয় ছোটখাট খুঁটিনাটি, খুঁজতে হয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে। তারপর সেই স্বাতন্ত্র্য যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন প্রধান বস্তুগুলোতেই সেই প্রতিভাস দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' থেকে শুধু কবিতার নামগুলি পড়ে গেলেই দেখা যাবে, বিষয় নির্বাচনে সে যুগের সাধারণ কবিচেতনার কি নিদারুণ আনুগত্য ছিল সেখানে। দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ, হিন্দু-মুসলমান, আমি-কবি, আলেয়া, ডাহুকী, পিরামিড ইত্যাদি সাময়িক ও বিষয় মুখ্য পদ্য—যা তৎকালীন কবিতার আসরে সবচেয়ে প্রবল ধারা—তাই লেখা হয়েছিল—সে যুগে জীবনানন্দের কবিপ্রাণের বিশিষ্টতা বিষয় নির্বাচনে অথবা প্রয়োগদক্ষতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা লুকিয়ে আছে কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিষণ্ণ-বেদনা অথবা উপমা নির্বাচনের নিপুণ বিশেষত্বে। কিন্তু এই সব সাময়িক আবেদনের কবিতা যে আদৌ কবিতা নয়, অথবা অন্য কবির অনুচারণায় যে সত্যকারের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, একথা অনুভব করা মাত্রই এ জাতের লেখা জীবনানন্দের রচনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এ বই সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। এমন কবিতা তিনি আর কখনোই লেখেন নি। যে-কোনো সৎকবিই জানেন এগুলির সৃষ্টিপদ্ধতি যান্ত্রিক, প্রকরণ রীতি-নিয়ন্ত্রিত এবং প্রেরণা অনৈসর্গিক। 'ঝরাপালক' বহুদিন নিঃশেষিত হলেও তাঁর জীবিতকালে এটি পুনঃপ্রকাশ না করে জীবনানন্দ পরিণত কাব্যবোধের প্রমাণ রেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর, হয়তো পাঠকদের দাবিতে অথবা হয়তো প্রকাশকদের আগ্রহে 'ঝরাপালক' পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। কবিতাগুলির রচনাকাল জানা যায় না। তবে সাময়িক পত্রিকায় কবিতাগুলির প্রকাশকাল ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সাল। সমকালীন পত্রিকা থেকে আরো কিছু কবিতা সম্প্রতি গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'জীবনানন্দ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে এখন সেগুলির দেখা মিলবে। মনে করা যেতে পারে, 'ঝরাপালক' যখন প্রকাশ

হয় জীবনানন্দের কাছে তখন অবধি বইতে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিই নির্বাচনযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। বাকিগুলি নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের অপরিণত কবিতার দায়িত্ব শেষ পর্বে অস্বীকার করেছিলেন—শুধু সঞ্চয়িতায় সংকলিত তাঁর ঐ পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কেই তাঁর ঈষৎ মমতা ছিল। জীবনানন্দও পরবর্তী জীবনে 'ঝরাপালক' বইটির গুরুত্ব অস্বীকার করেন "সে বইখানা অনেকদিন হয় আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে ; আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে।" (ধূসর পাণ্ডুলিপির ভূমিকা)। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে 'নীলিমা', 'পিরামিড', এবং 'সেদিন এ ধরণীর' এই তিনটি মাত্র কবিতাকে স্থান দিয়েছেন। এতখানি নির্মম না হলেও অবশ্য চলতো। অন্ততঃ আরো কয়েকটি কবিতা সেকালীন কবিতার আঙ্গিকের বিচারে অবশ্যই সুখপাঠ্য হয়েছিল। যেমন 'ছায়া প্রিয়া', 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিই কথা কয়' প্রভৃতি। কিন্তু সেকথা বাদ দিলেও, প্রশ্ন করা যেতে পারে কোন বিচারে উদ্ধৃত তিনটি কবিতা এই গ্রন্থের থেকে উদ্ধারযোগ্য মনে হয়েছিল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছেন উদ্ধৃত তিনটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের মানসিকতার পার্থক্য পরিস্ফুট হয়েছে। তুলনাত্মক বিচারে তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' ও জীবনানন্দের 'পিরামিডে'র মধ্যে 'তাজমহল' ভাবসত্য ও কাব্যাশ্রয়ী দর্শন, অন্যপক্ষে 'পিরামিড' ইতিহাস চেতনায় ব্যথাতুর, এবং ইতিহাসের শিক্ষায় সুস্থির। 'তাজমহল' ব্যক্তিকেন্দ্রিক, 'পিরামিড' ইতিহাসকেন্দ্রিক। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত মনে করেন ঝরাপালকের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও তাতে জীবনানন্দের চিত্রকল্প সামর্থ্য ও স্বকীয়তা লক্ষ্য করার বিষয়। ডঃ অমলেন্দু বসু মনে করেন ঝরাপালক পর্বে জীবনানন্দের নিসর্গ চেতনার সৌন্দর্যমণ্ডিত স্ফুরণ ঘটেছিল।

কিন্তু এহ বাহ্য। আমরা মনে করি এ বইখানি থেকে সঙ্কলন করতে হবে এই মনোভাব নিয়ে এমন নির্বাচন করা হয়েছিল কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার্য ছিল না। কবির মনোগঠনের নেপথ্য রহস্য জানার প্রয়োজন তাত্ত্বিক ও গবেষকদের। তাদের প্রয়োজন মেটাতে রসিকজনের দৃষ্টি-ভোগে এক অপটু শিল্পীর অপূর্ণ প্রতিমাগুলি তুলে ধরা সমীচীন হয়নি।

'ঝরাপালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। এই ব্যবধানের উপর আমরা জোর দিতে চাই, কারণ এই অধ্যায়েই তাঁর কবি-জীবনের জটিলতম গ্রন্থি : হ্যান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথার গল্পের সেই ছোট্ট নোংরা পাতিহাঁস যেন হঠাৎ একদিন নিজেকে আবিষ্কার করল রাজহাঁস ব'লে —তেমনি আশ্চর্য কাহিনী একটি। 'ঝরাপালকে'র কবি আত্মচারী উচ্ছ্বাসী কিশোর পদ্যকার। নামী কবিদের অনুচিন্তাই যাঁর অভিজ্ঞতার পরিবর্ত, কি মায়ামণির স্পর্শে সেই আত্মসর্বস্ব আত্মমুখ কবি এক নতুন প্রত্যয়ে জেগে উঠলেন! নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের চেয়েও বিস্ময়কর সেই আত্ম-আবিষ্কারের ঘোষণা—

কেউ যাহা জানে নাই— কোনো এক বাণী—
আমি বয়ে আনি ;
একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে, —পুরোনো তা—কোনো এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ!
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপরে আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
নতুন এ—আর সব হারানো-পুরানো।

কয়েকটি লাইন

চিরায়ত উৎসবের কথা নয়, ব্যর্থতার গান নয় ; এক ব্যথার জাগরণের কাহিনী এই কাব্য। সেই ব্যথা প্রেম। 'ঝরাপালকে'র নায়ক কবির অহং,—'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি নয়, পৃথিবী নয়, প্রকৃতি নয়, প্রিয়া নয়— প্রেমেরই মুখ্য ভূমিকা। আর এই প্রেমের উচ্চারণ যে ভাষায় তা আগের মতো প্রচলিত কবিতার ভাষা নয়, কবির মুখের ভাষা নয়, কবির অনুভবের ভাষা। মন্ত্রের পবিত্রতা সেই ভাষায়। মনে হয়, কোনো গভীর ব্যথাকে রক্তের মধ্যে আস্বাদ করতে হয়েছে বলেই শিল্পীপ্রাণের এই জাগরণ। অথচ সেই ব্যথাই ক্ষতের মতো তাঁর মনে জেগে থেকে কাজ করে গেছে। সেই আত্মচারীর উচ্ছ্বাসময় দৃঢ়তা আর নেই— এক ক্রন্দন থেকে থেকে বাজে। কবিতায় প্রেমেরই মুখ্য আসন, অথচ পরিপূর্ণ আবেগশায়ী হতে ভয়। এক জায়গায় এসে কবি আর এগোতে চান না। বিচিত্র কৌশলে কবিতা শেষ করে দেন। নানা কারুকর্মে, ইন্দ্রিয়বৈভব দিয়ে এক রূপজগৎ সৃষ্টি করে আমাদের চমকে দেবার খেলা খেলেন। আর তার মধ্যেই আমরা কবি জীবনানন্দকে প্রথম স্পষ্ট ভাবে পাই।

বিকাশ

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি আবেগে গভীর ও প্রকরণে বিশিষ্ট। এই গভীরতার সঙ্গে বরাবরই বিষয়ের বৈচিত্র্য ও পটভূমির ব্যাপ্তির সাধনা ছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত

হয়েছিল ১৯৩৬ সালে, কবিতাগুলির রচনাকাল কিন্তু ১৯২৫ থেকে ১৯২৯। সুতরাং রচনাকালের বিচারে 'ঝরাপালকে'র কবিতা এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতা সমকালীন। ভূমিকাতে কবি লিখেছিলেন, "সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইল।" পরে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সিগনেট সংস্করণের ভূমিকায় অশোকানন্দ দাশ লিখেছিলেন, "সেই সব ধূসরতর কবিতার সন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি, তাদের অনেকগুলিই আজ আর বেঁচে নেই; কীট দষ্ট হয়ে উদ্ধারের অতীত হয়েছে... এই অপ্রকাশিত কবিতাগুলির সংযোজনের ব্যাপারে ঈষৎ সংকোচ বোধ করতে হচ্ছে; কেননা প্রকাশ করবার পূর্বেই প্রত্যেকটি কবিতাকে পরিমার্জিত করার অভ্যাস কবির ছিল, যাতে করে প্রথম লিখবার সময় যেমন ভাবে ছিল তার চেয়ে বেশী স্পষ্টভাবে চারিদিককার প্রতিবেশ চেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরও সত্য হয়ে উঠতে পারে ঃ 'পুনরায় ভাব প্রতিভার আশ্রয়ে'।"

'ঝরাপালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যদি একই কালের কবিতা হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে 'ঝরাপালকে'র পরিত্যক্ত কবিতাগুলোই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নূতন রূপে রসে অভিনব হয়ে উঠেছে। কেননা একথা অবিশ্বাস্য যে কবি নিজের বিবেচনায় ভাল কবিতাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন।

এই রহস্যের সমাধান মেলে যদি আমরা স্মরণ রাখি কবি নির্দেশিত রচনাকালের আট বছর পরে গ্রন্থাকারে এই কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে এবং স্মরণ রাখি অশোকানন্দের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি— 'প্রকাশ করবার পূর্বে প্রত্যেকটি কবিতাকে পরিমার্জিত করার অভ্যাস কবির ছিল।' অন্তর্বর্তী এই আট বছরে কবিচিত্ত কবিতার যে নূতন রূপ ও রীতিতে দীক্ষিত হয়েছে একথা অনুভব করতে কষ্ট হয় না। এবং তাহলে বুঝতে পারি পুরোনো পরিত্যক্ত কবিতাগুলি শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে চারিদিককার প্রতিবেশ চেতনার ভিতর ভাব-প্রতিভার পুনরাশ্রয়ে নব-জন্ম নিয়েছে।

জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "সৎ কবি তাঁর প্রতিনিয়ত শিক্ষিত মনকে আরও বেশী শিক্ষিত করে নিচ্ছেন যা স্বভাব প্রতিভা বলে মনে হয়েছিল সেটাকে আরও স্থির ও বিশুদ্ধ করে।...যদি কবি মনে করেন তাঁর কোন একটি বিশেষ কবিতায় এই শিক্ষিত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ঠিকভাবে স্থির করতে পারেন নি তিনি, ফলে, কবিতার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, শরীরও অনেক পরিমাণে, কিংবা শরীর উপর-উপর অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কিন্তু ধর্ম নেই—তাহলে সে কবিতায় চরিতার্থ বোধ করবেন না তিনি, কবিতাটি কেটে ফেলতে হবে কিংবা শোধরাবার দরকার।"

কবিতার আলোচনা : কবিতার কথা

অর্থাৎ জীবনানন্দ রচনাকাল থেকে পত্রিকায় প্রকাশের কালে এবং প্রকাশের কাল থেকে গ্রন্থ সংকলনের কালে কবিতাকে এইভাবেই বারবার শোধন ও মার্জিত করে নিয়েছেন এবং মার্জনার মধ্যে তাঁর নিয়ত পরিবর্তমান কাব্যশিল্পবোধ স্বাক্ষর রেখেছে।

যখন পত্রিকাতে প্রকাশিত কবিতাগুলির পাঠ বা জীবনানন্দের মূল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হবে এবং মিলিয়ে দেখা হবে তখন একথার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও আমরা জীবনানন্দের এই বিস্ময়কর মানস বিবর্তনের হেতু সন্ধান করতে চাই। প্রধানত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে জীবনানন্দের যে নবতর শিল্পরুচি গড়ে উঠেছিল তাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে নবরূপ দিয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব। এই বই বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গিত এবং এর প্রকাশনার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু আগাগোড়া যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত কবিতা নির্বাচন বা সম্পাদনাও তাঁকেই করতে হয়েছিল। " কবিতাগুলির অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ প্রগতিতে। তার উপর যখন বই ছাপা হল তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম। তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের অংশ বলে মনে হয় আমার"। প্রবুদ্ধ সম্পাদকের হাতে কাব্যগ্রন্থের শ্রী ও মর্যাদা যে কতখানি বাড়তে পারে তার প্রমাণ টি. এস. এলিয়টের নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবিতার বই The Waste Land সেটি এজরা পাউন্ডের সম্পাদনার গুণেই চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিল।

অসতর্ক পাঠকের মনে হতে পারে যে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির' 'মহাপৃথিবী' 'বনলতা সেনের' পরবর্তীকালের কবিতা। কিন্তু কবিতাগুলির রচনাকাল বিচারে দেখা যাবে প্রচলিত সংস্করণে ঐ তিনটি গ্রন্থে যে আকারে আছে তার মধ্যে 'বনলতা সেনে'র রচনাকাল ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯, 'মহাপৃথিবী'র রচনাকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ এবং 'সাতটি তারার তিমিরে'র রচনাকাল ১৯২৮ থেকে ১৯৪৩। 'মহাপৃথিবীর' সংযোজন অংশের রচনাকাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র রচনা ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০-এরই মধ্যে এক খণ্ড কাল পর্বে ১৯৩৪ সালে 'রূপসী বাংলা' বইখানি লেখা হয়েছিল।

সুতরাং এই সব গ্রন্থের বিষয় ও আঙ্গিকবিচারে এর মধ্যে কোনো বিকাশ বা উত্তরণ ঘটেছে কিনা তা নিয়ে তর্ক তোলা কঠিন। প্রাথমিকভাবে বড় জোর এটুকখানি বলা যায় যে অন্তত এ পর্বে এক একটি সংকলন প্রকাশের সময় কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে নয়, বিশেষ এক একটি ভাব বা প্রকরণকে কাব্যগ্রন্থে বিধৃত করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের পূর্বোক্ত বিচার অনুক্রমে আরও এইটুকু যোগ করা যায় যে প্রত্যেক গ্রন্থ প্রকাশের আগে সেই কালে কবির বিবর্তনশীল শিল্প চেতনা বা কাব্য চিন্তা দিয়ে ঐসব কবিতাগুলিকে যথাসম্ভব শোধন করে নেওয়া হয়েছিল, এবং তারই ফলে প্রতিটি বইয়ের ভাব ও রূপের বৈচিত্র্য বা বিকাশ দেখা গিয়েছিল যাকে অসতর্কভাবে কখনও কখনও বিবর্তন বলে মনে হয়েছে।

যদি তাই হয় তবে জীবনানন্দের কাব্যের রহস্যের সন্ধান করতে হবে প্রতিটি পাঠান্তরের কাল বিচারে। রচনাকালে কবিতার যে রূপ ছিল পত্রিকায় প্রকাশকালে তার রূপান্তর, গ্রন্থ প্রকাশকালে তার পরিমার্জনা এবং এর মধ্যে জীবনানন্দের কাব্য বোধের বিবর্তনের প্রতিফলন আগামী গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে রইল।

'রূপসী বাংলা' গ্রন্থটি যেহেতু কবির জীবিত কালে প্রকাশিত হয়নি, কবিচিত্তের

বিকাশের স্তর পরম্পরায় তাই এ গ্রন্থের স্থান 'বনলতা সেন' পরে এবং 'মহাপৃথিবী'র কাছাকাছি। 'রূপসী বাংলা'র খাততে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির সমকালীন অন্যান্য কবিতার প্রকাশকাল যাই হোক তার নব রূপান্তর ১৯৩৪ সালের কবি-চিত্তের ক্রমিক শিল্প পরিণতির চিহ্নবাহী। কিন্তু পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত এ কবিতাগুলি ঐ কারণেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্বর্তী স্তর হিসাবে গণ্য করা সমীচীন হবে।

উত্তরণ

সচেতন শিল্পী মাত্রেরই পুনরাবৃত্তির স্পৃহা থাকে না। মাইকেল মধুসূদন এই অভিনবত্ব সন্ধানীদের আদর্শ স্থানীয়। জীবনানন্দের কাব্যে দেখা যায় অবিরত সঞ্চরণের নূতন নূতন ক্ষেত্র এষণা। 'রূপসী বাংলা'র পটপ্রেক্ষিত ও প্রকরণ ধূসর পাণ্ডুলিপি তুলনায় নূতন ছিল, তবু এই প্রকৃতি নিষ্ঠাও যখন একঘেঁয়ে লাগল তাও বর্জিত হলো।

'মহাপৃথিবী'তে আবার ব্যাপ্তির সাধনা। গ্রামীণ বাংলার রূপময় পটভূমি তার ঋতুবৈচিত্র্য তার প্রেম ও বিষাদ পেরিয়ে কবি এবার নাগরিক যান্ত্রিক জীবনের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছেন। এই বিশ্ব যদিও বিরাট ও বিচিত্র তবু আবহমানের নয়। চলমান ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। তাই এর কাব্য ভাষার মধ্যেও তীব্র তীক্ষ্ণ চলিষ্ণুতা পুরানো রীতি প্রকরণ ত্যাগ করে নূতন উপযোগী রীতির অনুসন্ধান আছে। আধুনিক বাস্তব জীবন প্রদক্ষিণ করে যে রূঢ় তিক্ত অভিজ্ঞতা কবি সঞ্চয় করেছেন তার প্রতিফলন এই কাব্য; এবং তিক্ততা, ব্যঙ্গ, বিষাদ ও মৃত্যু কামনা তার ফসল। 'রূপসী বাংলা'তেও মৃত্যুর কথা ছিল। সেখানে জীবন যেমন সহজ স্বচ্ছন্দ, মৃত্যুও তেমনি সুন্দর, শোভাময়। স্বাভাবিক অবসানের ব্যথামাখা জীবনের নিটোল পরিণাম। অথচ 'মহাপৃথিবী'তে জীবন তিক্ত, ক্লান্তিকর, গ্লানিময়, অসহ ভারাতুর। কবির মননেও তাই মৃত্যুর মধ্যে মুক্তিস্পৃহার তামসী-বিলাস। মৃত্যু এখানে আরোপিত, আকস্মিক, মৃত্যু এখানে আকাঙ্ক্ষিত ; কারণ তা জীবনের দিকে পিঠ ফেরানো, পলায়নের পথ।

'মহাপৃথিবী'তে কবি শনাক্ত করেছেন মানুষের বিকৃত জীবন ও বুদ্ধিকে। যে ভয়ানক নির্জন মুখের রূপ মানুষের ভোগের জন্য নয়, উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল সেই—

রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত—
ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
'ব্যবহৃত —ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?'

আদিম দেবতারা

মানুষের রক্তে এই মাছির মতো কামনা ; রূপকে স্থূল হাতে এমনি মাংসের মতো ব্যবহার করে করে স্বপ্নের সম্পদকে কামনার কলুষতা মাখিয়ে মাখিয়ে, বারবার মাখিয়ে শূয়ারের মাংসের মতো ঘৃণ্য অস্পৃশ্য অশুচি করে তোলাই মানুষের ধর্ম। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী বিপন্ন মানবতা, সমকালীন জীবন ও সমাজচেতনা বয়ে পৃথিবীর কবিতা গুচ্ছ প্রতিফলিত, ক্রূরতা হিংসা ও তজ্জ বেদনাও কবিতাগুলির ফসল।

অথচ পৃথিবীর এই কদর্য বামন মানুষগুলোর মধ্যে, এই ক্লেদাকীর্ণ যন্ত্রের বিষ-স্পর্শমাখা শহরের গর্ভে বাস করেও কেউ কেউ অনুভব করে মহাকাশে সূর্য উঠছে, পঙ্কিল সভ্যতাকে ঘিরে নিজের অখণ্ড সজীবতা নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে মহাপ্রকৃতি। সার্বিক মূঢ়তায় কবি-মন শ্লেষে-বিদ্রূপে মর্মভেদী হয়ে উঠলেও হৃদয়ের গভীরে সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাওয়া যায়। এই উপলব্ধিও এই পর্বে মেলে।

'মহাপৃথিবী'র সঙ্গে 'বনলতা সেন' বইটির অধিকাংশ কবিতার কালগত কোনো ভেদ নেই, কিন্তু মনোভঙ্গির দিক থেকে প্রভেদ দুস্তর। 'বনলতা সেনে'র কবিতাগুলি সঙ্কলিত হয়েছিল প্রেম, প্রকৃতি এবং ইতিহাস চেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে, তাই এই গ্রন্থের আবেদন ভিন্নতর। স্মরণ রাখতে হবে এর বেশির ভাগ কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায়। তাঁর পছন্দ তাঁর নির্বাচনের পরোক্ষ প্রভাব তাই এতে অনুভব করা যায়।

বনলতা সেন কবিতাগুচ্ছে যে শিল্পশ্রী উন্মেষিত তার মধ্যে কবিচেতনার সক্রিয়তা ছিল। এখানে এক নূতন ইন্দ্রিয়লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যা ইতিপূর্বে বা পরে তাঁর লেখায় বা অন্য কারো লেখায় এত সুস্পষ্ট আকারে ধরা পড়েনি। কবি নিজের চেতনাকে সংহত করে, মননকে দমন করে, কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্যে দিয়ে এক রূপরাজ্য আবিষ্কার করে নিয়েছেন, তার মধ্যেই তন্ময় হয়ে রয়েছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বিহ্বলতা, 'রূপসী বাংলা'র বেদনা, 'মহাপৃথিবী'র তিক্ততা, 'সাতটি তারার তিমিরে'র প্রাখর্য এবং 'বেলা অবেলা কালবেলার' সুদৃঢ় মনন এবং মরমী চেতনা—সব কিছু মিলিয়ে জীবনানন্দের যে বলিষ্ঠ বিষণ্ণ কবিসত্তা, তাকে আচ্ছন্ন করে, অতিক্রম করে এক সুরেলা মিষ্টি মেজাজ প্রকাশ পেয়েছে এখানে। কারণ কবি কিছুই বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করছেন না, মন দিয়ে লক্ষ্য করছেন না, গভীর মমতার সঙ্গে দেহ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে ছুঁয়ে চলেছেন সব কিছু।

জীবনানন্দের কবিতার সূক্ষ্ম পরিশীলিত শিল্পিতা নিয়ে যতখানি গর্ব আমাদের তার সাথে এই কবি প্রাণের মধ্যেও যে রক্তাল্প বিবর্ণতা ও অন্তর্লীন শূন্যতার ব্যথা আছে সে কথা স্মরণ করে বেদনাও কম নয়। একথার প্রতিবাদ হবে হয়তো, তবু আমাদের অভিযোগ করতে হবে কবির উদ্দেশ্য যে তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অন্তরলোকের সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মণিকণিকায় খচিত যে রূপজগতে আমরা উপনীত হই সেখানে অন্তর্গুহার বিষয়-রহস্যের উদঘাটন নেই—আমরা শুধু অনুভব করি, অতীতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব আশ্চর্য অনুভূতির সামীপ্য পেয়েছিলাম অথচ যা আমরা মন দিয়ে লক্ষ্য করিনি, তেমনিই সব অভিজ্ঞতার দিব্য উন্মোচন সেখানে।

কাব্য যে 'স্মৃতি সহযোগে ভাবাবলম্বনেচর্বনা'—এই কথা এইখানে এসে বিশ্বাস হয়। আমাদের বিমুগ্ধ হৃদয়ে এই স্মৃতি এক মনোময় নবাবিষ্কারের আনন্দ চমক দেয়। কিন্তু উচ্চাঙ্গের কবিতাতে যে আবেগের গভীর আবেশ যেভাবে অন্তর ভরে দেয়—জীবনানন্দের কবিতায় সাধারণত পাঠকের সেই অমৃত-অভীপ্সা পূর্ণ হয় না। কবিতাগুলির শিল্প-বৈভব ও অঙ্গশ্রী-সুষমার অন্তরালে শূন্যতার স্বাদ হৃদয়ের অতৃপ্তি ও ক্ষুধা নিত্য অনুষঙ্গী করে রাখে।

এই ব্যর্থতা কেন তিনি অতিক্রম করতে পারলেন না।—এ প্রশ্ন কাব্য বিচারে অর্থহীন। কি হয়নি তা আলোচকের জিজ্ঞাস্য নয়, কি হয়েছে তাই বিবেচ্য। তবু এই বিশিষ্টতা বিশ্লেষিত হওয়াও চাই। তাতে কবি স্বভাবটিকে চেনা সম্ভব হবে।

মহৎ কবিতা মাত্রেই একটা উত্তরণ আছে। প্রতিটি সার্থক কবিতা আমাদের আত্মাকে অনধিগত এক চেতনা ক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়। কবির আবেগ গভীরতা ও মনন দীপ্তি থেকে এই চেতনাক্ষেত্রের জন্ম। কিন্তু জীবনানন্দ স্বভাবত মননশালী কবি নন, আবেগশায়ী কবি। তাই তাঁর যাত্রা আরো নিশিত দূরত্যয় পথে। মননশীল কবি নিজের জীবনের উপলব্ধিকে তত্ত্বের আলোতে নূতনরূপে দেখতে অভ্যস্ত। অভিজ্ঞতা মননে বিস্রুত হয়ে নূতন নূতন চিন্তার সংস্রবে এলে কবিতা সৃষ্টি প্রচুর ও অনায়াস হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল। কিন্তু আনকোরা আবেগ অভিজ্ঞতা যাঁর উপকরণ, তাঁর সৃষ্ট কবিতা, অনুভূতিতে গভীর—কিন্তু সংখ্যায় পর্যাপ্ত হয় না। যিনি আবেগশায়ী, দুর্মর বন্ধনের আনুগত্য থেকে তাঁর মুক্তি নেই—আত্মার সততার বন্ধন। ধরা যাক্, প্রেমের কবিতা। একই প্রেম মননধর্মী কবির দার্শনিক চিন্তার আলোকে অসংখ্য কবিতার জন্ম দিতে পারে, কিন্তু আবেগবান কবি নিজের অনুভূতিকে একবার মাত্রই স্ফুট রূপ দিতে পারেন—নয়তো তা পুনরুক্তি দুষ্ট হবেই। প্রেমের এক পরম অভিজ্ঞতার লগ্ন হয়তো কোনো কোনো মানুষের জীবনে আসে, তখন সেই বজ্রাহত দগ্ধ-শেষ আত্মার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই সত্য-মৃত্যুর পরে প্রেমের অনুভূতি আবার আস্বাদ করা যায় না। যদিও বা সেই অসম্ভব সম্ভব হয়—স্মৃতির আকারে, ব্যথার আকারে যদি বা সেই আবেগ পুনর্জাত হয়— তবে তার স্বাদ ভিন্ন রকমের, আর তা নিয়েও বহুবার কবিতা সৃষ্টির দুঃসাধ্য।

আবেগের এমন উত্তরণময় নিটোল চেতনালোক সৃষ্টি করতে পারেন নি যেখানে প্রেমিক প্রিয়ার অন্তরের স্পর্শ পেয়েও বলে—

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয় ॥

শ্যামা : রবীন্দ্রনাথ

অন্যদিকে তেমনই আবেগের বিহ্বল আবেগ রচনাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি যখন

কণ্ঠলগ্না প্রিয়াকে পুরুষ বলে—

তবে বলবো না কথা, তবে আমি চুপ করে থাকি
তোর অগ্নিচুম্বনে এ ঠোঁট দুটি জুড়ে,
তোর দুটি চোখে মোর শূন্য দৃষ্টি রাখি
যে চোখ বিশ্বস্ত আবেগের, অন্বেষার—
তবু বোবা কামনারা ঘুরে ঘুরে ভাসে
উড়ন্ত মেঘের মতো লাভাস্রাবী আগ্নেয়গিরির চারপাশে।

ইংরেজী কবিতা থেকে (অ. ব)

জীবনানন্দ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কবি হয়েও কবিতায় এমন প্রগাঢ় উন্মাদনা সঞ্চার করেননি। দু-একটি খণ্ডিত উক্তি, প্রত্যুক্তি, স্মৃতি, আক্ষেপ, ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি আবেগগর্ভ পংক্তি রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ বলয়িত ভাবব্যঞ্জনা অনেক সময়েই অনুপস্থিত, ফলে প্রায়ই তাঁর কবিতা পরিণতিতে কোথাও পৌঁছে দেয় না। 'দুজন', 'অঘ্রাণ প্রান্তরে', অথবা 'জার্ণাল ১৩৪৬'-এর মতো কবিতাতেও সেই ব্যর্থতা, সেই স্থাণুত্ব ব্যথার মতো বাজে। মনে হয় ব্যক্তিগত জীবনের কোনো রূঢ় আঘাত, কোনো স্মৃতির তীক্ষ্ম জ্বালা তাঁকে সম্পূর্ণ আবেগাশ্রয়ী হতে বাধা দিয়েছে। তাঁর সেই প্রথম যৌবনের অপরিজ্ঞাত ইতিহাসের উন্মোচন এখন প্রায় অসম্ভবই। তাই প্যাশানকে আশ্রয় করে স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যেতে তাঁর বাধে। জীবনানন্দের 'ঘাস' বা 'হরিণেরা'র মতো কবিতা যেখানে প্রেমের প্রসঙ্গই নেই, 'পাখিরা' অথবা 'পরস্পরে'র মতো কবিতা যেখানে প্রতীকী ভাবনাই মুখ্য, অথবা 'বনলতা সেন', 'শঙ্খমালা'র মতো কবিতা যেখানে আবেগকে আড়াল করে রয়েছে 'মিষ্টিক'-দীপ্তি, সেখানে কবিতার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু যেখানে 'প্যাশান'ই মুখ্য হওয়া দরকার সেখানে তিনি নির্মমভাবে অদক্ষিণ 'পিপাসার গানে'র মতো দেহ পিপাসাও সেই অভাব মেটাতে পারে না।

শেলি-কীটস-ব্রাউনিং যদি কবিতায় 'প্যাশান'-কে এমন পরিহার করতেন ইংরেজ পাঠক তাঁদের ক্ষমা করত না। কিন্তু প্রেমের প্রসঙ্গে জীবনানন্দের কুড়ি বছরের পরে চলে গিয়েই স্বস্তি, যেখানে—

ব্যস্ততা নেই কো আর
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে, মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল!

কুড়ি বছর পরে

'চোখের পাতার মত নেমে কোথায় চুপি চুপি চিলের ডানা থামে', 'সোনালি সোনালি চিল শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে'—এইসব অমূল্য ইন্দ্রিয় বৈভবের

জাদু দিয়ে কবিতার স্বাভাবিক পরিধি থেকে দূরে এনে তিনি আমাদের ভুলিয়ে রাখতে চান। পারেনও।

তবু এই পারাটাই সব নয়। এমন ইন্দ্রিয়ময়তার পরিচয় দিয়েও তিনি যদি কবিধর্মে মহৎ হতেন, সেটাই পরম শ্লাঘনীয় হতো। যা হয়নি তা নিয়ে ক্ষোভ নেই। বাংলা সাহিত্যে এক নূতন বররীতির জনয়িতা হয়ে তিনি রইলেন ; —ক্ষোভ সেই অনন্য যাত্রী পথে পরাসিদ্ধি তাঁরও অনায়ত্ত রইল।

নব নিরীক্ষা

'বনলতা সেনে'র পরেই 'সাতটি তারার তিমির'। এক জায়গায় সিদ্ধির পরে অন্য জায়গায় সাধনা। জনপ্রিয়তার মোহ এই—কবি আপন সফল সৃষ্টির অনুবর্তন করে। কিন্তু বাংলা কবিতার সেই শোচনীয় অবক্ষয়ের যুগে 'বনলতা সেনে'র অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার পরেও চিন্তার জটিলতার মধ্যে, স্যুর-রিয়ালিষ্ট কবিতার দুর্বোধ্য রহস্য গূঢ়তায়, নূতন অনিশ্চিত নিরীক্ষার পথে যে কবি অগ্রসর হলেন তিনি সাধারণ নন।

অথবা, এই তাঁর নিয়তির নির্দেশ। ইতিহাস সেই নিয়তি। যুদ্ধের সেই প্রচণ্ড বিভীষিকার মধ্যে কাব্যবিলাস তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। চেতনা তখন প্রবল উত্তেজিত, বেদনা তখন দিগন্তপ্রসারী—আর সেই বেদনার মধ্যে যখন অন্তরে এক দুর্নিরীক্ষ্য প্রত্যয় মাথা তুলে উঠছে, কোনো সৎকবির পক্ষে তখনো কি আর পুরানো পথে হাঁটা সম্ভব? সেই দুর্বোধ আগন্তুক দুর্বার আবেগে কবিকে নূতন পথে চালিয়ে নেবেই।

'মহাপৃথিবী'তে বিক্ষিপ্ত বস্তু-পৃথিবী ও জীবন-জটিলতার মননিষ্ঠ কিছু কবিতা ছিল। 'সাতটি তারার তিমিরে' তারই পুনরাবর্তন দেখা গেল, কিন্তু এ গ্রন্থে পুরানো ভাবনার সঙ্গে মিশেছে নূতন উপলব্ধি তাই নূতন প্রকাশ পদ্ধতি, নূতন প্রতীক, নূতন সংকেত দেখা দিয়েছে। বহির্বিশ্বে তখন যুদ্ধের নান্দীরোল, সর্বব্যাপী সংকট, আত্মঘাতী বুদ্ধি, রুচিহীন বিলাস ও প্রতিকারহীন নৈরাশ্য। রাজনীতিবিদ্‌রা নানা ইজমের তাড়নায়, স্বার্থের মোহে বিভ্রান্ত, চিন্তাশীলেরা বিমূঢ়, সাধারণেরা সর্বস্বান্ত। তখন জীবনানন্দ প্রজ্ঞার মাধ্যমে জীবনের জটিল দিকগুলোর পরিপূর্ণব্যাপ্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা-মুখর কবিতা লিখছেন সমাধানে পৌছাবার প্রত্যাশায়। জীবনের যে কোনো দিক, যে কোনো সমস্যাকে যে কবিতাতে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে—এবং ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব কবির রয়েছে সে সম্পর্কে জীবনানন্দের অন্তত কোনো সংশয় ছিল না। সে কথা বিবৃত হয়েছে তাঁর 'কবিতার কথা' বইতে। কিন্তু এসব কবিতা সিদ্ধ হয়েছে কি? দূর যুগান্তরে এইসব সমস্যাকেন্দ্রী কবিতা আপন রসমূল্যে কি বেঁচে থাকবে? এ তর্ক উঠুক। কবি অন্তত জানতেন এ পথে আসা, এই দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর ব্যর্থ হয়নি। এই বিষয় কবিতার পরিধির বাইরে নয়, এখানেও কবির পরাসিদ্ধি সম্ভব।

এ ছাড়াও রয়েছে 'সার-রিয়ালিষ্ট' কবিতা—অবচেতনার সেই আশ্চর্য সংকেতগূঢ় উদঘাটন—এক নূতন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে বাংলা কবিতাকে, তারও উন্মেষ এখানেই। এসব কবিতা দুরূহ তো বটেই যেজন্য বইটি জনপ্রিয়তাও লাভ করে নি তেমন। বুদ্ধদেব বসুর মতো জীবনানন্দের একান্ত গুণগ্রাহী মানুষও এসব কবিতা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন না। ক্ষুণ্ণ কবি স্বয়ং লিখেছেন, "বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশী আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়।... তারপরে 'বনলতা সেন' এবং পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজের ও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।" কবির এই ব্যক্তিগত বেদনা 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমিরের' কবিতাগুলি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিকূল মনোভাবে। বর্তমান আকারে 'বনলতা সেন' গ্রন্থটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বিরূপ ছিলেন না।

যাই হোক 'সাতটি তারার তিমির'-এ কবিচিত্তের বিকাশের আরেক স্তর, মালার্মে প্রভৃতির প্রতীকী আন্দোলন এবং পরবর্তী সার-রিয়ালিষ্ট বা পরা-বাস্তববাদী আন্দোলন এতে প্রাণরস জুগিয়েছিল। যুদ্ধ পূর্বকালীন হতাশা ও বিষাদ এবং যুদ্ধকালীন সর্ববিধ মূল্যবোধের বিনষ্টি কবিতাগুলিতে যে তিক্ত পটভূমি রচনা করেছিল 'মহাপৃথিবী'র তুলনায় অনেক পরিণত শিল্পিতা সত্ত্বেও তা পাঠকচিত্তকে হৃষ্ট করতে পারে না, ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্তই করে তোলে।

'মহাপৃথিবী'তেই এই বিষাদের সূচনা হয়েছিল। প্রকৃতির নির্জন প্রত্যন্তভূমি ছাড়িয়ে কবি যে মানব-সভ্যতার নবপীঠ নাগরিক জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ব্যাপ্ত অথচ কলুষ পটভূমি কুটিল ও শ্বাসরোধী মনে হয়েছিল। হিংসা মৃত্যু চক্রান্তের এই ভয়াল মঞ্চের পশ্চাৎপটে যে প্রশান্ত মহাপ্রকৃতি বিদ্যমান তা নাগরিক মানুষকে কোনো স্বস্তি দিতে পারেনি; তাই কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়েছিল ব্যঙ্গ ও বিষাদ। 'সাতটি তারার তিমিরে' এই মনোভাবনাই আরো সঙ্কেত-গূঢ় হয়ে উঠেছে। যে সপ্তর্ষিমণ্ডল মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক তা আর আলোক-বর্তিকার মতো মানুষকে পথ দেখাতে পারছে না। বরং এক তিমিরচ্ছটায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। তাই কবির চেতনায় আলো বার বার নিস্তেজ হয়ে নিভে আসে।

ক) বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়।

খ) যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্বলে গেছে—তার
ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার,
মানুষের অভিজ্ঞতা এরকম।

গ) যেদিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া।

'সাতটি তারার তিমির' তাই দিশাহারা বিপর্যস্ত মানবজীবন ও তার অন্তরালে শুশ্রূষাহীন নিরর্থক বিশাল নিসর্গের মহাকাব্য। নৈরাশ্য ও অস্তিবাদ ওতপ্রোত হয়ে আছে একাব্যে তার মধ্যে তিমির নিমগ্ন কবির বিশ্বস্ত প্রার্থনা :

"মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেকে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হয়ে নাকি যাবে!
সূর্যে আরো নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও— প্রাণ দাও পাখি।"

মকর সংক্রান্তির রাতে

মাত্রা চেতনা

১৩৫১ সালে জীবনানন্দ 'কবিতার কথা' গ্রন্থের 'মাত্রা চেতনা' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তাতে ছিল—

"আদিম মানুষ যেদিন নিজেকে বোঝাবার তাগিদ বোধ করেছিল সেই অস্পষ্টতার সময় থেকে ক্রমশ স্পষ্টতর ভাবে ; এই ক্রমিক নির্মলতা তার চেতনার ভিতর কাজ করে এসেছে; এবং সাংসারিক, সামাজিক প্রয়োজনে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে হলে সেও বিশেষ কোনো অস্পষ্ট কথা বলে না, কোনো প্রতীকের দুর্গমতা বা রূপকের আবছায়ার দিকে সহজে ঘেঁষতে চায় না আর।... এ মানসকে কবিতার বিশিষ্ট স্বভাবের দিকে অগ্রসর করে দিতে পারা যায় কিনা— জনসাধারণের চেতনা রুচি ও ভাষা মহত্তর করে তুলতে পারা যায় কিনা, এইসব বহুকালের চলতি সমস্যা...। কবি মানসের প্রমত্ততা বা তার মহাভাবনার দৌরাত্ম্য তাকে যতই নিরাবলম্ব ও অস্পষ্ট করে তুলতে চাক না কেন—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাকবিই এই অস্বস্তি বোধ করছে—জনসাধারণের নিজেদের বাচনরীতির সফল স্বচ্ছতার দাবি সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।... কবিতা সৃষ্টি করবার সময় সে তার নিজের আদর্শ উপায়কে যতটা স্বায়ত্ত মনে করুক না কেন, ততদূর স্বাধীন তা নয়। যে সময়ে সে বাস করেছে, এবং যে সময়ে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে এবং যেখানে সে নেই, এই সকলের কাছেই সে ঋণী।...এ জিনিষ ঋণও নয় উপায় বরং— মর্মার্থী হয়ে বেঁচে থাকবার,...নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায়—সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে পারা যায় নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায়—এ দায়িত্ব কবির।...

"কিন্তু তাই বলে কবিতার মানে পাঠক সম্বন্ধে নির্বিশেষে বিমুক্ত করতে গিয়ে যে যুগে ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখব— এরকম বা যে কোনোরকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না।...সার্থক কবিতা হয়তো মুখের

ভাষায়ই ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক মুখের ভাষা নয় এমনি কোনো ভাষায়,...যে জিনিষ হয়তো আমিই শুধু জেনেছি সেই সম্পর্কে আমার স্থাপনাশক্তিকে স্পষ্টতা, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুস্থিরতা দেবার জন্যে আমি তাকে সবচেয়ে স্পষ্ট স্বভাব প্রতিভার ভিতর দেখব; অপরকে দেখাবার বা জানাবার আগে নিজের ব্যক্তিপুরুষকে চরিতার্থ করে নেবার জন্যে।"

মাত্রা চেতনা : কবিতার কথা

এই প্রবন্ধ লেখার আগে 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' দুটি বইয়েরই শেষ কবিতাটিও লেখা হয়ে গেছে। যদিও শেষোক্ত গ্রন্থটি এবং প্রথমটির অনেক কবিতাই তখনও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নি। আমাদের মনে হয় পাঠকদের বারংবার দুর্বোধ্যতার অভিযোগের অভিঘাতে অথবা স্বাভাবিক আত্মপ্রতিক্রিয়ায় জীবনানন্দ কাব্যশিল্প সম্পর্কে নূতন উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছেন। তারই অভিব্যক্তি দেখা গেছে তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলিতে 'বেলা অবেলা কালবেলায়' 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় বিধৃত অগ্রন্থভুক্ত কবিতাগুচ্ছে, সার-রিয়ালিজম্ ও প্রতীক রূপকের দুর্গমতা পরিহার করে তিনি ক্রমশ তাঁর 'স্থাপনাশক্তিকে স্পষ্টতা' দিতে চেয়েছেন। তার ফলে তাঁর কবিতায় আর এক দূরপ্রসারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

'বেলা অবেলা কালবেলা' প্রকাশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর পরে। প্রকাশক বলেছেন 'গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন।' কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০। প্রায় ১৬ বছর ধরে ছড়ানো এইসব কবিতার প্রথম ১০ বছর 'সাতটি তারার তিমিরে'র কালসীমার সমান্তরাল এবং তার পরের আরো ছ' বছরের কবিতা এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

প্রতীকী রীতি বর্জন করে কবি এখানে সহজ হতে ও স্বভাবে স্থিত হতে চলেছেন। কিন্তু চিন্তার গভীরতা মেধা বিশ্বাস ও মননের চাপ এখানে কমেনি বরং বেড়েছে। এখানেও ছড়িয়ে আছে সভ্যতার পরিণতি সম্পর্কে সংশয় ও বিষাদ ; তাই স্বচ্ছতা ও সারল্য সত্ত্বেও এ বইটি 'সাতটি তারার তিমির'-এর চেয়ে কম দুরূহ, বা বেশি জনপ্রিয় নয়। সাঙ্কেতিকতা ত্যাগ করায় এখানে কবিতার আকার অনেকটা বড়ো, মননশীলতার প্রাবল্যে গদ্যধর্মী, ছন্দের বৈচিত্র্যও এ পর্বে অনেক কম। পংক্তিগুলির আকারও প্রায়শই দীর্ঘতর হয়েছে।

জীবনের শেষ পর্বে এসে মনে হয় কবি সব গুছিয়ে তুলছিলেন। সেই সব কবিতা যা স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় স্থির প্রশান্তিতে স্থিত। মনে হয়, মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর তাঁর উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল। সেই আশ্চর্য জাগ্রত বোধির কবিতা—যাতে উপনিষদের কবিরা মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—খুব দূর ছিল না। যেখানে ব্যক্তিটিকে কথা বলতে হয় না, তার প্রজ্ঞাময় অন্তর্তম সত্তা সামনের কুয়াশা কাটিয়ে দেখতে পায়, ব্যক্তিটিকে ঘুম পাড়িয়ে কবিতা সৃষ্টির লগ্নে আচ্ছন্ন (hypnotize) করে রাখলে যে সত্তা জেগে ওঠে তা এসেছিল।

অন্তিমের প্রেমের কবিতায়-—ওই যূথবদ্ধ, বিষণ্ণ, বিহ্বল সুরের কবিতায় তিনি কিসের পরীক্ষা করছিলেন? আগের আমলের— 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' পর্বের জোরালো রূপ-প্রকরণটা ভাঙলেন কেন? মনে হয় ভাঙাটাই লক্ষ্য। ভাঙলেই তাকে পাওয়া যায় যার জন্যে কবিতায় হাতড়ে বেড়ানো। শিল্পীর সতর্ক চেতনাটা সরে গেলেই অন্তরের ব্যথা কথা কয়ে ওঠে।

ইতিহাস চেতনা
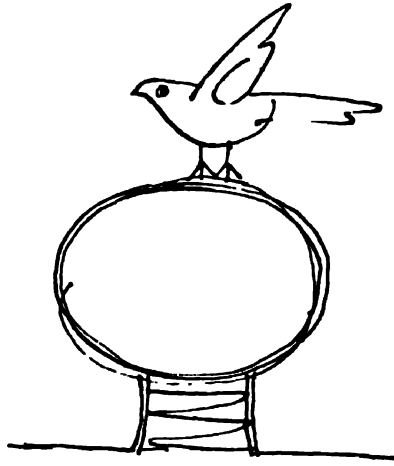
নির্জনতা

খুব কৌতূহলোদ্দীপক একটি ব্যাপার হলো কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ উভয়েই সমবয়স্ক এবং কল্লোলের অব্যবহিত অগ্রজাতক, অথচ উভয়ের কাব্য-চেতনায় কি দুস্তর ব্যবধান! নজরুল রহস্য করে আপনাকে 'যুগের এবং হুজুগের কবি' হিসাবে জাহির করেছিলেন। সেই আত্মবিজ্ঞপ্তির যথার্থতা আজ অনেকেই স্বীকার করবেন। তাঁর সৃষ্টির ভিতর যুগোত্তীর্ণ হওয়ার পাথেয় কবিতা থেকে গানে বেশি।

কবিতার এই সাময়িক লক্ষণযুক্ততার জন্যই নজরুল সমকালের জনচিত্তের যে অভিনন্দনে ধন্য হয়েছিলেন তা পেতে জীবনানন্দের তিন যুগ লেগেছে অথবা বলা চলে ততখানি গণস্বীকৃতি তিনি আজও পাননি। এতে বিস্মিত বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নেই। তবু এই সহজাতক দুই কবির স্বভাব-বৈপরীত্য রসিকদেব প্রশ্নাতুর করে তুলবে। যে যুক্তিতে নজরুলকে জনতার কবি বলি, সেই যুক্তিতে জীবনানন্দকে নির্জনতার কবি বলতেই হয়—যদিও সূচনাতেই এমন উক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। 'নির্জন কবি' বলতে যদি বোঝানো যায় যে, জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি, তবে কারো কিছু বলার থাকে না ; কিন্তু এর যদি অর্থ করা হয় জনজীবনের সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ ছিল না তবে তা শুধু ভুল হবে না, জীবনানন্দের কবিকৃতি নির্ণয়ের পক্ষে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

জনতার আশা আকাঙক্ষা নজরুল ইসলামের লেখায় রূপ পেয়েছে। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে সাধারণের প্রতি কবির অপরিসীম ভালবাসা। এই কথাই জীবনানন্দের কাব্যে আরো গভীর অর্থে সত্য। এখানেই উভয় কবির জীবন-দৃষ্টির মিল। কিন্তু কেবল গণজীবনের কামনা-বেদনা রূপায়িত করে জীবনানন্দ ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি—আরও গভীরে দৃষ্টি ফেলে আজকের সভ্যতার অন্তর্নিহিত নিবিড় নৈরাশ্য ও হতাশা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই উপলব্ধি তাঁকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

জনপ্রিয় কবি হতে গেলে কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ থাকা চাই। জনসাধারণ আশা করতে, ভালবাসতে, উত্তেজিত হতে চায়। হতাশা তাদের কাছে দুঃসহ, চিন্তাশীলতা তাদের পক্ষে দুর্বহ। সোজা সাদাসিধে কথায় তাদের কামনা-বাসনা আনন্দের গান যারা গাইতে পারবে, জীবনের স্থূল প্রয়োজনগুলি যারা শিল্পিতাবর্জিত কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে, তাদের আর মার নেই। জীবনানন্দের এই সব গুণের মারাত্মক অভাব ছিল বৈকি! কোনো বিবেকী সৎ কবিই মনের গভীর দুশ্চিন্তা চেপে আনন্দের গান গাইতে পারেন না। জীবনের স্থূল প্রয়োজন সম্বল করে অহেতুক উত্তেজনা ছড়াতে পারেন না। জীবন তাদের জীবন-জিজ্ঞাসায় উত্তরিত করে, শিল্প তাদের শিল্পী-চেতনার স্বাক্ষর রাখে।

এই পর্বের আরো একজন প্রধান কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে এমন গভীর জীবন-

জিজ্ঞাসার পরিচয় ছিল। ইতিহাস ধারার পশ্চাৎপটে দৃষ্টিক্ষেপ করে গভীরতর হতাশা ও নির্বেদে নিমজ্জিত হয়েছিল তাঁর মন। তাই তীব্রতর শ্লেষ- বিদ্রূপে তিনি কশাঘাত করেছেন সর্বত্র—ধর্ম, সমাজ, রাজনীতিক সংস্কার-পন্থীদের,—জাতিকেই। জীবনানন্দের আদিযুগের কাব্য প্রেরণায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। জীবনানন্দের কবিজীবনের মধ্যযুগ অবধি যে নির্বেদ ও নিদ্রাতুরতার প্রতি আসক্তি দেখা যায় তাও কি যতীন্দ্রনাথের 'ঘুমিওপ্যাথী'-র প্রভাব সঞ্জাত না? তবু জীবনানন্দের মনোগঠনটাই ভিন্নতর। যতীন্দ্রনাথের মতো শ্লেষ বিদ্রূপে যেমন তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়নি, তেমনই নির্বিকল্প হতাশাও তার চারিত্রিক আশাবাদকে ছাপিয়ে কখনো সর্বৈব হয়ে উঠতে পারে নি।

অথচ জীবনানন্দ পলায়নবাদী কবি হিসাবে আজও মিথ্যানিন্দিত। তাঁর কাব্যের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তারা এজাতীয় উক্তির অসারতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়। জীবন সম্পর্কে এমন সদাজাগ্রত কৌতূহল, এমন পরিপূর্ণ ইতিহাস চেতনা সমকালীন অন্য কোনো কবির মধ্যে নেই। তাঁর কাব্য পড়তে গেলে অনেক সময়েই মনে হয়, ইতিহাস বিশেষত সমকালীন ইতিহাস তাঁর কাব্যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়েছে। তাঁর অনির্বচনীয় শিল্পদক্ষতায় তার রুক্ষতা চাপা পড়লেও পরিণামে পরিবর্তিত পরিবেশে তা হয়তো কিছু কিছু কবিতার ক্ষেত্রে শিল্পের অন্তিম মূল্যেরই হানি করবে।

ব্যাপ্তি

বৈষ্ণব কবিতার বিরুদ্ধে একটা বড়ো অভিযোগ ছিল সেখানে গভীরতা আছে, প্রসারতা নেই! জীবনের বিশাল ব্যাপ্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নব নব বৈচিত্র্য আদিম মহাকাব্যে, মধ্যযুগের গাথা ও মঙ্গল কাব্যে, উনিশ শতকী বীর-কাব্যে যেভাবে স্থান করে নিয়েছে সে সুযোগ বৈষ্ণব কবিতায় ঘটেনি। এই প্রসার মানে এ নয় যে, মানুষের যাবতীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার স্থান কবিতায় করে দিতেই হবে—এর অর্থ হলো জীবনের কোনো বিষয়ই কবিতা থেকে বহিষ্কার-যোগ্য নয়। প্রয়োজন মতো সব অভিজ্ঞতাই কবিতায় স্থান দেওয়া যাবে এমন উদার গ্রহণশীলতা কবিতার থাকা ভালো। বৈষ্ণব কবিতা শুদ্ধ-শিল্পের কবিতা—*জীবন থেকে প্রাণ-নির্যাস নিয়ে তা বেঁচে থাকে। কিন্তু জীবনকে, জীবনের কোনো* খণ্ডাংশ অথবা জীবন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতাগুলিকে বৈষ্ণব কবিতা স্থান দিতে পারে না।

আধুনিক বাংলা লিরিকেরও অনেকখানি ঐ দশা। বাঙালী গীতিকবিদের মধ্যে জীবন-দৃষ্টির একটা ব্যাপ্ত পরিধি বহু সময়েই অনুপস্থিত। ইতিহাসের গতির সতর্ক অনুধাবন, পরিণত রাজনৈতিক চেতনা কবিতার উপযোগী আবহের পরিপন্থী এমন একটা ধারণা রয়েছে অনেক প্রবীণ কবির। শৈল্পিক শুদ্ধতায় বিশ্বাসী এঁদের ধারণা ও রচনার অনুভাবনায় আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভবের বাইরেও গীতিকবিতার সঞ্চরণভূমি আছে। জীবনের বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তা, অনুভবের যে কোনো উপান্তেই গীতিকবিতার মর্মকেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।

অবশ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চিন্তা ও অনুভবের শুদ্ধতা প্রকট সত্যের মতো বা বৈজ্ঞানিক

তথ্যের মতো কবিতাতে স্থান পাবে না। বরং এই বাস্তব প্রজ্ঞান এক স্বচ্ছতায় স্থিত হয়ে কবির সহজ স্বভাবগুণকে সজাগ ও তপঃশক্তিশীল ভাবে শিক্ষিত, অনুভূতি ঘন ও সুস্পষ্ট করে তুলবে। অভিজ্ঞতা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই কবির পক্ষে আরো বেশি সিদ্ধির স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। যদিও অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কবিস্বভাব বিশৃঙ্খল হয়ে যাবারও আশঙ্কা আছে।

অথচ সাম্প্রতিক বাঙালী কবিরা কবিতার এই সঙ্কট এড়িয়ে যেতেই ইচ্ছুক। স্বভাব কবিতার পর্যায় পেরিয়ে আরো মহত্তর পরিণতির পথে তাই বাংলা কবিতা এগিয়ে যেতে পারছে না। হৃদয়াবেগ কেন্দ্রিত বাংলা কবিতায় যে সঙ্কীর্ণ আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তি না পেলে বাংলা কবিতার সুস্থ স্বস্থ প্রতিষ্ঠা হবে না।

এমন কবি অবশ্য এদেশে অনেকেই আছেন রাজনৈতিক বিশ্বাস অথবা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান যাদের কবিতা নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেই বিশ্বাসী মনের কবিতা অথবা মনস্তাত্ত্বিক রীতির কবিতা কবির মনোভূমিকে আগেই এক নির্দিষ্ট আকার দেয় বলে স্বচ্ছ চোখে পৃথিবীকে, জীবনের সমস্যাগুলিকে দেখার দৃষ্টি হারিয়ে যায়। তত্ত্বের রঙিন আলোতে জীবনকে দেখা, সমাজকে ব্যাখ্যা করা এক, আর স্বাভাবিক চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জীবনের বিরঞ্জিত অবস্থা এঁকে তোলা ভিন্ন কথা। প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে তত্ত্বটি ধ্রুব, জীবনের ততটুকুই বর্ণনীয় যাতে তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়। স্বভাবতই শেযোক্তদের ক্ষেত্রে তা নয়।

জীবনানন্দের কবিদৃষ্টির মধ্যে কোনো প্রাক-পরিগৃহীত সংস্কার ছিল না। কবিতা সম্পর্কে কোনো সঙ্কীর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে গীতিকবিতার পরিধিকে তিনি ছোট করে আনেন নি—অথবা পূর্বনির্ধারিত কোনো তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে তিনি অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে বসেন নি। তাঁর কবিদৃষ্টিতে ছিল ঐতিহাসিকের নির্মোহ স্বচ্ছতা। কবিতার প্রকরণের দিকে, হাল আমলের কবিদের মতো দু-একটি স্মরণীয় পংক্তির উজ্জ্বল নৈপুণ্যেই অখণ্ড মনোযোগ না দিয়ে. কবিতার সার্বিক উদ্ভাসনায় তিনি যত্নবান ছিলেন। সেই সাথে বিষয়ের দিকে চিন্তা-বিস্তারের মধ্যে, যুগচেতনার মধ্যে কবিতার প্রসরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেই জীবনানন্দ একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন—

> ..সময়-ও সীমা-প্রসৃতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে আমি ভালবাসি। তবু আমি এটা স্বীকার করব না যে 'মেমোরেবল্ স্পীচ্' মাত্রই কবিতা। কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক; কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।

উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য : কবিতার কথা

জীবনানন্দের কবিতার বিচার প্রসঙ্গে এই উক্তির তাৎপর্যে অনুপ্রবেশ প্রয়োজন। কবিতায় ভাবনা-কল্পনার আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপ্তি তাঁর লেখায় আছে। দেখতে হবে এই ভাবনা-কল্পনা

ও যুগচেতনা কবিতার ফলশ্রুতিতে রসমূল্যে কোনো বিরোধ এনেছে কিনা। কবিতা শুধু চিন্তাভূয়সী হলে চলবে না, সেই চিন্তা স্মরণীয় ভাষণ হয়ে ওঠাও যথেষ্ট নয়, তাকে উদ্ভাসিত হতে হবে। দীপ্তি কাব্যের এই দুরূহ আদর্শ সামনে রেখে তিনি কাব্য-পিপাসুদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

কবির পক্ষে সমাজবোধ প্রয়োজনীয়। ইতিহাস চেতনা কবিতার অস্থির মধ্যে মজ্জার মতো উপস্থিত থাকবে। যুগে যুগে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি, সাধনা ও ব্যর্থতা যদি চিনে নেওয়া কবির পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে আধুনিক সমাজের স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হবে না। সুতরাং যুগজীবনের যিনি রূপকার তিনি যুগান্তরে বেঁচে থাকবেন যে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? ইতিহাস-চেতন হলে অবশ্যই থাকবেন। কারণ, বৈনাশিক কাল সেই অবান্তর আবর্জনাগুলিকেই ধ্বংস করে যা যুগান্তরে অর্থহীন ভার স্বরূপ। এযুগের বিশিষ্ট চরিত্র যেমন অন্য যুগের তুলনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে ইতিহাস-চেতন কবির কাছে, তেমনি কোন কোন ভাবনা-কল্পনা যুগোত্তীর্ণ হওয়ার নয়, সে শিক্ষাও তাঁকে দেবে। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত কবির সৃষ্টি তাই যুগের চিহ্নবাহী হয়েও যুগোত্তীর্ণ। সর্ব কালের বলেই আধুনিক কালের।

ইতিহাস চেতনা

প্রত্যেক যুগের কবিকেই এক সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়, সাহিত্যে সাময়িকতা ও শাশ্বতের সমস্যা। সাময়িকতা অতিক্রম করে শাশ্বত কালের রসমূর্তি রচনাই শিল্পী মাত্রেরই কাঙ্ক্ষিত। সাধারণ শিল্পী শুধু শাশ্বতের সাধক—ইতিহাসের নয়। কিন্তু ইতিহাস-চেতন কবি যেমন নিজের যুগের, তেমনই সর্বকালের কবি। কারণ অতীতের জ্ঞান ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে যুগের ও শাশ্বত কালের ধারণা লেখকের আসে। যুগের চেতনার সঙ্গে আবহমানের বেদনাকে যিনি মেলাতে পারেন তিনিই ইতিহাস-চেতন শিল্পী।

ইতিহাস-চেতন কবি কালপ্রবাহ অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের গতির তাৎপর্য জেনেছেন বলেই ইতিহাসের স্বাভাবিক সঞ্চরণ পথ তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে। কোথায় আমরা ইতিহাসের অভিপ্রায় বিরোধী পথে নেমেছি, কোথায় স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে আটকে রয়েছি তা তাঁর না জানা থাকার কথা নয়। তাই বদ্ধ পল্বল থেকে মুক্ত হয়ে, উজান গতি থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সমুদ্র-সঙ্গমে পৌঁছবার সঠিক উপায় তিনি আমাদের দেখাতে পারেন।

ইতিহাসাশ্রয়ী কবিতামাত্রই ইতিহাস চেতনার কবিতা হলে প্রতিটি রোম্যান্টিক কবিকেই সম্ভবত ইতিহাস-চেতন কবি বলা যেতে পারতো। কিন্তু তা হয় না। ইতিহাস-চেতনার তাৎপর্য হলো বিনাশশীল কাল ও অবিনাশী ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান। অতীত কখনোই নিজের যুগের সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। বর্তমানের অন্তরে সে ফল্গুর মতো প্রবাহিত হয়, বর্তমানের অন্তরালে সে প্রেতের মতো বিরাজ করে, ভবিষ্যতের গর্ভে সে ভ্রূণের মতো পুনর্জাত হয়। 'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে'।

অতীতের এই অবিনাশী অস্তিত্বকেই বলে ঐতিহ্য। ঐতিহ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বোধকে সংহত আকারে বলা যায় ইতিহাস চেতনা। এই উপলব্ধিকেই কবিতায় আকার দিতে গিয়ে আর একজন ইতিহাস-চেতন কবি টি. এস. এলিয়ট তাঁর Four Quarters গ্রন্থে লিখেছেন—

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past
If all time is eternally present
All time is unredeemable.

Burnt Norton

ইত্যাদি।

কবি জীবনানন্দ এমনই এক ইতিহাস-চেতন কবি কিন্তু কাব্য-সৃষ্টির সূচনাবধি যে সেই পরিণত চেতনা তাঁর ছিল এমন মনে করা ভুল। তবু যাঁর কল্পনা কবি-জীবনের সূচনাতেই—

দূর উর—ব্যাবিলোন্—মিশরের মরুভূ সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড তলে—ঈসিসের বেদিকার মূলে

পিরামিড

সঞ্চরণশীল, প্রভেন্স প্রান্তরে, আশিরীয় সম্রাটের বেশে, ক্রবেদুরের যৌবন-মত্ততায় স্পেইনের সিয়োরায় দস্যু অশ্বারোহী রূপে, বাংলার ঘাটে-ঘাটে কদম তলায় বাঁশের বাঁশিটি হাতে, ইতিহাসের পর্বে পর্বে আপনাকে অনুভব করেছে, সেই চেতনাই আবার যুগ যুগ প্রবাহিত পিরামিডকে মানব সমাজ জাতি ও রাষ্ট্রের শত শত উত্থান পতনের সাক্ষী এক সুচিরস্থায়ী শ্মশান মন্দির হিসাবে সনাক্ত করেছে। মৃত্যু আমাদের কাঁদায়, জীবন আমাদের সেই ক্ষণ-অশ্রু ভুলিয়ে দেয়— অচিরস্থায়ী এই হাসি-কান্নার জোয়ার-ভাঁটার পাশে অতীতের এই হিমগর্ভ কবর চিরন্তন হয়ে জেগে থাকে।

তবু এ কবিতাও ইতিহাস চেতনার কবিতা নয়। কিন্তু এর মধ্যে কবির ইতিহাস-চেতন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। সেদিন অন্য পাঁচ জন ইতিহাস-কুতূহলী কবির মতোই দূর ইতিহাসের রন্ধ্রপথে স্বেচ্ছাচারী কল্পনাবিহারের মূলে ছিল জীবনানন্দের রোম্যান্টিক কবি চিত্তের আদিম ও উন্মাদনাময় (বোহেমীয়?) জীবনের আহ্বান। তবু কবি যে এখানে বহমান কালের মধ্যেও শাশ্বত কিছু সন্ধান করেছিলেন এই কথাটা স্মরণ রাখতে বলি।

আরও একটি বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অতীত চারণায় যেমন ইতিহাসের স্থান-কাল-চিহ্নহীন ভাবরূপ এ কবিতা তেমন নয়। বরং স্থান ও কালের উল্লেখে ইতিহাসাশ্রয়ী শব্দ ও ভিনদেশী মুখ্যত আরবি ফারসি মেশানো বাংলা শব্দের প্রচুর প্রয়োগে উপযোগী আবহ তৈরির চেষ্টা আছে। অবশ্য কাজী নজরুল এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র এক্ষেত্রে আরও সার্থক হয়েছিলেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে ইতিহাসের অহেতু উল্লেখ আর নেই। পরন্তু 'ঝরা পালকে'র বর্বর বিলাস উচ্ছলতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবির কাছে রুগ্ন প্রতিপন্ন হয়েছে। রূপকথার

রূপসীরা গত রাত্রির ফুলের মতো 'বাসি' হয়ে 'একেবারে মেকি' হয়ে গেছে। রোম্যান্টিক কল্পনা-বিলাসের স্বরূপ—

> সেই কুঁজ গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
> নষ্ট শসা, — পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
> যে সব হৃদয় ফলিয়াছে— সেই সব

· বোধ

তাঁর কাছে উদঘাটিত হয়েছে। তাই আত্মমগ্ন কবির কাছে ইতিহাসচেতনার নূতন অনুভব অস্ফুট আকারে 'ধূসর পাণ্ডুলিপিতে'ই লক্ষ্য করা যায়। নব সংযোজিত 'পায়রারা' কবিতার তার প্রথম আবির্ভাব। কবি লিখছেন—

> আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে—তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি
> পুরানো জ্ঞানের খাতা রক্ত ক্লেদ রোমহর্ষ চুপে চুপে করেছি সঞ্চয়
> অন্ধকারে, অজন্তার ইলোরার রোম আলেকজান্দ্রিয়ার আমরা প্রহরী
> মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা—চামড়া ও কাগজের বিষণ্ণ বিস্ময়
> এই কি জগৎ নয় আমাদের?

· পায়রাবা

বর্তমানের পটভূমিকায় অতীতের স্মৃতি-বিস্মৃতি, সংস্কারের লুপ্ত-শেষ অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন স্পষ্ট উল্লেখ এর আগে কোথাও দেখা যায়নি। যাকে আমরা সভ্য ভাষায় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য বলি, তা কী অতীতের মৃত পৃথিবীর অভিজ্ঞতার ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ বিস্ময়, মিউজিয়মের কৃত্রিম রক্ষণ-দক্ষতায় বিনষ্ট ছায়ান্ধকার পৃথিবীর জ্ঞান-বিস্ময় রক্ত-ক্লেদ রোমহর্ষের বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি মাত্র নয়? তবু গতদিনের কথা চিন্তা কাজ সমারোহে মন স্তব্ধ করে রাখে কেন মানুষেরা? কেন আমাদের অতীত পৃথিবীর ভারমুক্ত দায়হীন, অভিজ্ঞতাহীন, সতেজ, স্বচ্ছন্দ স্বাধীন সঞ্চরণশীলতা নেই পায়রাদের মতো।

অতীতের এই দায়ভার, স্মৃতিভার, ঐতিহ্যভার বহনের বেদনা ইতিহাস-চেতন কবিকে সহ্য করতে হবেই। কারণ, ঐতিহ্যের মধ্যে যেমন মানব সভ্যতার কালকূট, তেমনি অমৃতও লুকিয়ে আছে। অতীতের সংস্কার আমাদের রক্তের অণুতে অণুতে সঞ্চারিত হয়, ব্যাধির মতো আমাদের পীড়িত করে। আবার যা কিছু সভ্যতাকে ঋদ্ধ করেছে তার মূলও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। ইতিহাস-চেতন কবি তাই একে অস্বীকার করে মুক্ত হতে পারেন না—আবার স্বীকার করার অনন্ত যন্ত্রণাও তাঁর চেতনাকে ক্লান্ত করে। নির্বেদ তাঁকে আচ্ছন্ন করে কখনো কখনো. মন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—অজ্ঞানতার অনাবিল বর্বর স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরে যেতে চায়। আবার প্রবুদ্ধ চেতনা সভ্যতার ব্যাধি থেকে ঐতিহ্যের গ্লানি থেকে মানুষকে মুক্ত করে নবতর জগতের সৃষ্টি-শপথ গ্রহণ করে।

গতিধারা

'রূপসী বাংলা'য় ইতিহাসধারার মধ্য দিয়ে বাংলার বিনাশশীল জীবন আর অবিনাশী আবহমানের রূপ দেখেছেন কবি। সুতরাং ঐতিহ্যবোধের স্বাক্ষর আছে এখানেও—শুধু তা একটি দেশের ভৌগোলিক সীমায় বিধৃত। আর সার্বমানবিক পটপ্রেক্ষিত থেকে সরে এসে জাতীয় পটপ্রেক্ষিতে দাঁড়ানোর ফলে তার তাৎপর্যও পরিবর্তিত হয়েছে।

'ঝরাপালকে' কবি প্রেমকে দেশকালে বিচ্ছিন্ন বহু জীবনের মধ্যে উপভোগ করেছিলেন, 'রূপসী বাংলা'য় তিনিই বহু যুগে বিস্তৃত দেশকে, দেশের জীবন ও আত্মাকে, তার ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। দূর অতীতের মধ্যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে এইভাবে প্রসারিত করা, নিজের মধ্যে এক শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব অঙ্গীকার—এই হলো ইতিহাস চেতনার মর্মবাণী।

'বনলতা সেন' কবিতায় কবির এই অবিনাশী সত্তাই হাজার বছর ধরে সঞ্চরণশীল। ইতিহাসের তীরে তীরে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে, বিদর্ভে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সেই প্রাণ আজকের সভ্যতার তটে এসে পৌঁছেছে। আর পৃথিবীর বয়সিনী সেই নারী—যার চুলে বিদিশার অন্ধকার, মুখে শ্রাবস্তীর তক্ষিত রূপ সেও ইতিহাস বিস্তারের স্তরে স্তরে কবির সমযোনি। জীবনের ব্যথা বেদনার সাগর পেরিয়ে সভ্যতার নগরে বন্দরে দেখা, চেনা, কথা বলা। এবং এই প্রেমিক যুগলের পরিণামী ভবিষ্যৎও জীবনানন্দের কাছে স্পষ্ট। তিনি জানেন আজকের প্রবুদ্ধ সভ্যতা যখন দ্বারকার বিচূর্ণ থামের মতো দেবদারু ছায়ার নিচে অবলীন হয়ে যাবে, আজকের মানুষ যখন কেউ নেই আর, হাজার বছর শুধু অন্ধকারে জোনাকির মতো খেলা করে নিভে যাবে, সেই দূর ভবিষ্যতের গর্ভেও তাদের সত্তা, তাদের প্রেম জাগরুক হয়ে থাকবে।

এবং এই চেতনা দেখা দিল বলেই—ইতিহাস চেতনার পরিপূর্ণ তাৎপর্য তাঁর কাছে উদঘাটিত বলেই 'সুচেতনা' কবিতায় দাঙ্গা যুদ্ধ ও নানা দুর্গতির বর্ণনা ক্রমে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তাকে উচ্চারণ করতে শুনি—

> সুচেতনা এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
> সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
> এ বাতাস কি পরম সূর্য করোজ্জ্বল ; —
> প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
> আমাদের মতো ক্লান্ত, ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
> গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

সুচেতনা

কারণ ইতিহাসের গতিধারা তাঁর কাছে অপরিস্ফুট নেই আর। অকারণ অতিরিক্ত আশাও যেমন তাঁর নেই—তেমনই অহেতুক বিষণ্ণ ও হতাশ হবারও প্রয়োজন নেই। মানুষের

গতি শ্লথ, কিন্তু নিশ্চিত। এ কথা জেনেছেন বলেই কবিতার শেষ ছত্রে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন—

দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

ঐ

এই প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি এসেছে তার চিন্তা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সমন্বয়ে। গ্রন্থ থেকে আমরা যে জ্ঞান পেতে পারি তাতেই সবকিছু স্পষ্ট হবে না।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে বসে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চলে যাই—চেয়ে দেখি আরো কিছু আছে তার পরে।

আবহমান

জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু তার পরেও আরও কিছু অজ্ঞাত থেকে যায়—তা জানতে হয় উপলব্ধি থেকে, ইতিহাস থেকে। এইভাবে গ্রন্থের থেকে আহৃত জ্ঞান, স্বভাবের থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে, ইতিহাসের ইঙ্গিত অনুসরণ করেছেন বলেই দূরতর ভাবীকালের চরিত্র উদঘাটিত হয়েছে তাঁর কাছে।

আলোকের পাখি

'মকর সংক্রান্তির রাতে' কবিতায় জীবনানন্দ প্রথম নির্দেশ করেছেন তার কাছে 'আবহমান' ইতিহাস চেতনা একটি পাখির মতো যেন।" পাখির রূপকে ইতিহাস-চেতন জীবনানন্দ বহুবার ব্যক্ত করেছেন। এই আলোকের পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে, নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে, আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে অনুভব করেও আরো বড়ো বিষয়ের অভিমুখে, বর্তমান সময় অতিক্রম করে আরো গভীর সুসময়ে সভ্যতাকে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। এ পাখি কিছুতেই লুপ্তশেষ ডোডো পাখি নয়—যে স্থবিরতার মধ্যে, বিলুপ্তির মধ্যে, নিঃসীম মৃত্যুর মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে যাবে।

'পাখিরা' কবিতায় এই পাখিরাই রাত্রে সমুদ্রের বুক দিয়ে উড়ে চলেছে। সমুদ্রের মুখে লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে যেমন মৃত্যু অতল সত্য হয়ে আছে ঠিক তেমনই তাদের রবারের বলের মতো ছোট্ট বুকে রয়েছে জীবন। বহুদূরে সমুদ্রের পরপারে কোথাও জীবন আছে, জীবনের স্বাদ আছে, সাগরের মৃত্যুময় তিতা ফেনা পেরিয়ে কোথাও নদীর সুপেয় জল আছে— এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে, শীত পিছনে ফেলে আশ্বাসের অভিমুখে তারা উড়ে চলেছে। বন্ধ্যা সমুদ্রের সীমা পেরিয়ে তারা কোনো ফসলের প্রান্তরে যাবে, কেন না তাদেরও ফসলের ঋতু আসন্ন। সমুদ্রের অনেক লবণ ও লবণাক্ত অশ্রু ঘেঁটে এই মাটির ঘ্রাণ মিলবে—ভালোবাসা, ভালোবাসার সন্তান, নীড় রচনার স্বপ্ন—জীবনের এই গভীর স্বাদ অঙ্গীকার করে সাগরের গর্জন স্বর ছাপিয়েও পাখিরা কথা বলছে—মৃত্যুকে অতিক্রম করতে করতে জীবন কথা বলছে।

এই যাত্রার পিছনে পড়ে আছে গৃহহারা প্রাণের বেদনা, মানুষ যেমন বাধ্য হয়ে মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে—তেমনি বাধ্য হয়েই পাখিদের নোনা সমুদ্রের বুকে নেমে আসতে হয়েছে, আশ্রয়ের সন্ধানে। পুরানো আশ্রয়ের আশা সুখ সার্থকতা নিঃশেষে ত্যাগ করে স্মৃতির ব্যথা বুকে নিয়ে তাদের চলে যেতে হয়েছে।

অতীতের ঐতিহ্য—যার বেদনা বহন করে পাখিরা উড়ে চলেছে, তার ছায়া জীবনানন্দের কবিতায় আপ্রান্ত প্রসারিত। তিনি সত্যিই ঐতিহ্য ক্লান্ত স্মৃতিভার-মন্থর কবি। তিনি জেনেছেন অতীতের বিনাশ নেই। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়', তার চেতনা মন থেকে মনে সঞ্চারিত হয়, যুগ থেকে যুগে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। 'স্বপ্ন' কবিতায় তিনি একেই নাম দিয়েছেন স্বপ্ন। যা অতীতের ছিল, বর্তমানে নেই, তা বিলুপ্ত হয়নি। আমাদের অনুভূতির মধ্যে রয়ে গেছে।

কুয়াশা থেকে আরো কুয়াশায়, অস্পষ্টতা থেকে আরো অস্পষ্টতায় একাকীতম যে পাখি উড়ে গেল তার পাখার হাওয়া লেগে ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে। এই নির্জন আঁধার হাতড়ে যখন আলো জ্বালবো তখন হঠাৎ কার মুখ দেখে চমকে উঠবো? কার মুখ? মৃত অতীতের পরিচিত যে মুখ আজ বিস্মৃতির ধূসরতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তারই মুখ কোন নির্জ্জন মনের গহন অন্ধকার পার হয়ে আরেক আলোয় হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে? যে মুখ একদা এই পাণ্ডুলিপির চেয়ে, যে কোনো পার্থিব বস্তুর চেয়ে সত্যতর ছিল, সে আজ পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েও স্বপ্নের মধ্যে গুহায়িত হয়ে রয়েছে।

তেমনই এই পৃথিবীর সব আলো একদিন মুছে যাবে, সব গল্প ফুরিয়ে যাবে—মানুষও থাকবে না আর—তখনো মানুষের অস্তিত্ব স্বপ্ন হয়ে বেঁচে থাকবে। সেই স্বপ্নের মধ্যে আমিও থাকবো, কিছুই বিলুপ্ত হবে না।

এমনই জীবন থেকে স্বপ্নে, চেতনা থেকে অবচেতনায় মানুষের প্রতিনিয়ত সঞ্চরণ চলেছে। অজস্র অসংজ্ঞান স্মৃতিভার মানুষকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। অতীতের অবিনাশী সত্তা যুগান্তরের মানুষের কাছে তাই চেতনার পরিমাপ নিতে আসে। আবার কখনো রক্তের অন্তর্লীন আদিমতা মানুষের শিক্ষা সংস্কার বুদ্ধি-চেতনাকে ঘুলিয়ে আবিল করে যায়। চেতনার গূঢ় স্তর থেকে এই অন্ধকার এই ঐতিহ্যভার মানুষ সরিয়ে ফেলতে পারে না। সঙ্কীর্ণচিত্ত আত্মতৃপ্ত মানুষের কাছে, সে বেদনা অবশ্য অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু উৎকৃষ্টচিত্ত মানুষের কাছে এই বেদনা দুর্বহ হয়ে ওঠে। জানবার অবিরাম বেদনা তার অনিদ্র মুহূর্তগুলিকে অস্বস্তিতে ভরে তোলে। জৈবিক সুখদুঃখে আর সে তৃপ্তি পায় না।

> বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিল :
> প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়, —তবু সে দেখিল
> কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
> অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল, —লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমাবে এবার।

কি প্রগাঢ় বেদনায় সুখের সংসার ছেড়ে তারা মৃত্যুকে নির্বাচন করে তা মানুষের বুদ্ধিতে

আসে না। তারা দেখে—

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

দেখে আর আত্মঘাতীর নির্বুদ্ধিতায় বিস্মিত হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের গ্লানি যারা বোঝে তারাই অনুভব করে—

জানি-তবু জানি
নারীর হৃদয় —প্রেম—শিশু—গৃহ নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে
আমাদেব ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;—

-আট বছর আগেব একদিন

এই নিত্যতা থেকে নিষ্কৃতির আকাঙক্ষা, এই aspiration for something greater, nobler and queer—জীবনানন্দের কোমল স্পর্শাতুর মনের এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মহত্তর মূল্যবোধের পরিচায়ক। এই বিচিত্র অনুভূতি, মানুষের জীবনের ভিতরে, তার অন্তর্লীন চৈতন্যের ভিতরে ; ইতিহাসের এই নিয়ন্ত্রণ অনুভব করে মানুষ; তার তাৎপর্য উপলব্ধি না করেও সংস্কারের আকারে তাকে ফিরে পায়। সে মানুষকে নূতন উদ্যমে উদ্বুদ্ধ [illegible] অথবা হতাশায় আত্মনাশ করতে প্ররোচিত করুক—তার লক্ষ্য আরো বড়ো [illegible]। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—ইতিহাস শুধু বহমান একটি জীবন প্রবাহ [illegible] মহত্তর বিকাশের দিক-চিহ্নও। আর তাই ইতিহাসের মূল্য। [illegible] অনৈতিহাসিক অন্ধকার অতীত থেকে আজ অবধি যে খণ্ডিত সভ্যতার [illegible] চীনে কুরুবর্ষে, গ্রীসে বেথলহেমে. জরাসন্ধ, নচিকেতা, বুদ্ধ, খ্রিষ্ট, [illegible] মহাত্মা গান্ধী এরকম কয়েকটি আলোকবলয় আমরা পার হয়ে এসেছি। তিমির [illegible] মধ্যে এই আলোকণাগুলিই আমাদের আগামী দিনের পথনির্দেশক আলোকস্তম্ভ- (Light house) স্বরূপ। সেই উজ্জ্বলতর আলোর সন্ধান জীবনানন্দ পরিশেষে এসে পেয়েছিলেন। এই সংকেত অনুসরণ করেই আলোকিত বর্তমান থেকে শুচিশুভ্র ভবিষ্যতে যে পৌঁছানো যাবে এ বিশ্বাস কবি অর্জন করেছিলেন। জেনেছিলেন সেই শুভ্রতর আলোক-তীর্থে ভবিষ্যতের মানুষও মনীষীদের ইতিহাসকে একদিন পৌঁছে দেবেনই।

সমাজ চেতনা
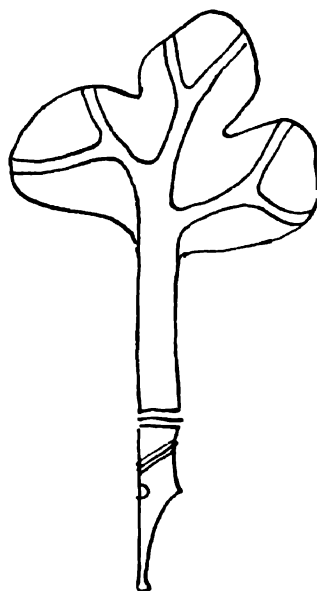
স্বপ্নপ্রয়াণ

আধুনিক সমালোচনায় কবির বাস্তবদৃষ্টি ও সমাজ চেতনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অপরিহার্য—কিন্তু সে যোগ কখনই চেতনার উপরিবলয়ের নয়। কবির জীবন-দৃষ্টি অন্তর্লীন প্রেরণার মতো সাহিত্যের প্রাণভূমিতে ক্রিয়া করে। কিন্তু সাম্প্রতিক সমালোচনায় সেই গভীর নিরীক্ষার দায়িত্ব না নিয়ে দু-একটি বিক্ষিপ্ত কূট উক্তির উপর, এলোমেলো পংক্তির উপর নির্ভর করে যেভাবে কবিদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হয় না।

এই সব স্থূল সমালোচকরাই একদা জীবনানন্দকে পলায়নবাদী হিসাবে শনাক্ত করেছিলেন। জীবনানন্দ পলাতক কবি—এই সংজ্ঞা শস্তা বুলির মতো সাহিত্যের হাটে বাজারে আজও ছড়িয়ে আছে। ফলত যাঁরা এইসব চালু মার্কার উপর নির্ভর করে কবিদের গুণাগুণ নির্ণয় করেন, স্বকীয় সাহিত্যবোধ দিয়ে যাচিয়ে দেখেন না, জীবনানন্দের কবিকৃতি সম্পর্কে তাঁদের অনীহা অব্যক্ত নেই। আর অন্যেবা, যাঁরা তাঁর কবিতা পড়ে অপরিসীম আনন্দ রস আস্বাদ করেছেন, তাঁরা কোনো বিতর্কে না গিয়ে তাঁর কবিতায় তুষ্ট আছেন। এই সব কাব্য-রস-পিপাসুদের অনির্ণেয় অনুভবের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে তথাকথিত সমাজবাদীরা লাভবান হন নি। আরো গভীরতর সমীক্ষা তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একদা যে হঠকারিতার প্রশ্রয় দিয়ে বিদগ্ধ মহলে তাঁরা চিহ্নিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ সম্পর্কে সেই অধ্যায়ই পুনরাবৃত্ত হলো।

আগেই বলা হয়েছে কবির সমাজবোধ ও ইতিহাসদৃষ্টি কোনো স্ফুট চিন্তার রূপে থাকে না, অন্তর্লীন প্রেরণার মতো কবিমানসকে নিত্য অভিষিক্ত করে। তবেই গভীর ও রসোপেত শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়। নতুবা যে কবিতা লেখা হয় তা কখনো উচ্চরব ঘোষণার চেয়ে বেশি মর্যাদা পায় না। কোনো শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে তাঁর জীবনের বিক্ষিপ্ত উক্তি বা ঘটনা দিয়ে তাঁকে বিচার না করে তাঁর সামগ্রিক জীবনের সমস্ত আপাত-বিরুদ্ধ চিন্তা, ঘটনা ও ব্যবহার লক্ষ্য করেও জীবনের গতি ও পরিণামের দিকে দৃষ্টি রেখে জীবনের অন্তর্সঙ্গতি খুঁজে দেখবো। এই ভাবে পর্যবেক্ষণের পরে সেই শিল্পীর সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা চলে। নয়ত শ্রদ্ধাহীন, পর্যবেক্ষণ ব্যতিরিক্ত উক্তি মাত্রকেই অন্য হিসাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে এলেও, হাওয়ায় ওড়ানো কথার চেয়ে বেশি মর্যাদা দেবো না।

মানুষের জীবন, মানুষের বলেই নানা দ্বৈতত্ব, অসংখ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব দিয়ে গড়া। জীবনানন্দের কবিজীবনও কোনো সমতল ঋজু রেখার উপর দাঁড়িয়ে নেই। জীবনকে লোকে যেভাবে পেতে চায় সেই ভাবেই যদি সহজে পেতো তবে তার মধ্যে সৃষ্টি-যন্ত্রণার জন্ম হতো না।

আমাদের ঈপ্সিত জীবন বাস্তব থেকে ভিন্ন বলেই জীবনকে ভাঙার আবেগ, আবার নূতন করে গড়াব সাধনা, অথবা যন্ত্রণাবিদ্ধ নির্বেদ কিংবা কল্পলোকে অভিসার। কিন্তু অভিব্যক্তি যেমনই হোক ইচ্ছার সঙ্গে প্রাপ্তির বিরোধ থেকেই তার উদ্ভব। জীবনানন্দের কবিচিত্ত যখন কল্পজগতের অভিসারে উন্মুখ ছিল তখনও জীবন সম্পর্কে অতৃপ্তিই ছিল তার হেতু—

স্বপন-সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা ক'রে!
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হ'লো না আমার সাধা—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়, পথে পথে ধায় ধাঁধা!
—নিমেষে পাসরি, এই বসুধার নিয়তি-মানার বাধা
সারাটা জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভরে'।

আমি কবি, —সেই কবি

অতৃপ্তির রূপটা স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু পায় পায় যাব জিঞ্জির, নিয়তি মানার বাধায় যে বদ্ধ— সেই স্বপ্ন সুরার ঘোরে মাতাল হতে চায়। প্রতি পদে যার যন্ত্রণার কুশাঙ্কুর, স্বপ্ন-সাধ তার ব্যাহত হবেই। 'ঝরাপালকে'র অন্তিম কবিতায় সেই স্বীকারোক্তি আছে।

...কবে অবেলায় এলোমেলো পথে যেতে
ঘোর ভেঙে গেল, খেয়ালের খেলাঘরটি গেল যে ভেঙে!

কারণ —

ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন,—স্বপন ক'দিন রয়!
এসেছে গোধূলি গোলাপীবরণ, —এ তবু গোধূলি নয়!

. সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে

স্বপ্নলোক থেকে মহাপ্রয়াণের গোধূলিটি ঠিক ঠিক শনাক্ত করেছেন কবি। তবু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসেও যন্ত্রণার তীব্র অভিঘাতের মধ্যে বার বার স্বপ্নের হাতে নিজেকে তুলে দেবার ব্যর্থ আকুতি ধ্বনিত হয়েছে।

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই!..
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে!
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর—
থাকিত না হৃদয়ের জরা—

: স্বপ্নের হাতে

কিন্তু সেই অসম্ভব সিদ্ধ হবার নয়। তাই সৌন্দর্য-স্বপ্নের অভীপ্সা ছেড়ে ঘুমের মধ্যে

অসাড়তা ও নির্বেদের মধ্যে, কর্ম-কোলাহলের বাইরে তিনি মুক্তি খুঁজেছেন। কবির এই মুক্তির ইচ্ছাই রূপ নিচ্ছে 'মাঠের গল্পে', 'অবসরের গানে'—

এখানে চকিত হতে হবে নাকো—ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময় ;
উদ্যমের ব্যথা নাই—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর—
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর ;
ভালোবাসা আসিবে না,—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

* * *

এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমোবার
সাধ ভালবেসে!

অবসরের গান

সব চেতনা ডুবিয়ে দিয়ে নিদ্রার মধ্যে শান্তি খোঁজার এই ইচ্ছা। পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, বরং অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চাওয়া, বাস্তবের রূঢ়তা থেকে মুক্তি পাবার এই পলাতকা প্রবৃত্তি একদিন প্রবল হয়ে উঠেছিল সত্য। কিন্তু সেইটাই শেষ সত্য নয়। কারণ এভাবে কূর্মের মতো নিজের গভীরে ডুবে থেকে কিছুতেই বাঁচা, কিছুই এড়ানো যায় না—একদিন আলোর মুখোমুখি হতেই হয়।

অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব!

অন্ধকার

পৃথিবীর মুখোমুখি হবার অনিচ্ছা যতই প্রবল হোক্ এই ঘৃণা বুকে করে, এই ঘৃণা মুখে মেখেও মানুষকে জেগে উঠতে হয়। জীবনকে এড়িয়ে মুক্তি পাবার পথ নেই কোথাও।

সেই মুক্তি কামনাও কবির জীবনের চরম কথা নয়। যাঁরা বলেন, জীবনানন্দের কবিতায় জীবন সংগ্রাম Struggle for existence নেই— তাঁরা বোধহয় ভাবেন নায়ক এবং খলনায়কের দ্বন্দ্ব, অত্যাচারী অত্যাচারিতের সংঘর্ষ অথবা শ্রেণী সংগ্রাম না দেখালে তা জীবনযুদ্ধ হয় না। কিছু মানুষের বিরুদ্ধে কিছু লোকের উত্তেজনাকর বিষোদ্‌গার যে চিত্তাকর্ষক কবিতা হতে পারে এদেশী ও বিদেশী প্রগতি সাহিত্যে তার প্রচুর প্রমাণ মিলবে। কিন্তু ওই সিধে পথ ছাড়া মানুষের সংগ্রামের অভিব্যক্তির অন্য কোনো পথ সাহিত্যে নেই, কিম্বা কেউ সেই পথ সন্ধান করলে কবিকে সংগ্রামীদের বাইরে বলে ধরতে হবে—এগুলো হাল্কা কথা। জীবনে সংকট এবং সংঘাত বিচিত্র রূপে উপস্থিত হয় তার স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং আর মোকাবিলা বা সমাধান করার চেষ্টা বুদ্ধিজীবীদের করতেই হয়—তা শুধু শ্রেণী সংঘাতেই রূপ নেবে কখনো আত্মার রক্তাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের চেহারা নেবে না, বা তার সামনে এলেই সহজ সমাধানের পথ উদ্ভাসিত হবে এমন তো নয়, অনেক সমাধানই সময় সাপেক্ষ, পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষ, এগুলি বুঝতে হবে। এজন্য ধৈর্য এবং আস্থার প্রয়োজন। জীবনানন্দ সেকথা বুঝেছিলেন বলেই এমন কবিতা লিখতে পেরেছিলেন। তাঁর এক সত্তা যখন গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে লালিত হচ্ছে, তখনই, আরো এক নিগূঢ় সত্তা—না এলেই ভালো হতো অনুভব করে এসেও যে গভীরতর লাভ হয়েছে তা আস্বাদ করে তৃপ্ত—এইজন্যেই অন্ধকার কবিতার পাশাপাশি 'বনলতা সেন' গ্রন্থেই এই কবিতাও জন্ম নিয়েছে।

...চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

: সুচেতনা

পাশাপাশি এই সুর। এই দ্বিতীয় সুরটি স্মরণে রাখি তখন আর কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাসে কবির উপর অবিচার করার হেতু থাকে না। তখন আমরা অনুভব করি কি অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে তাঁকে 'তিমির হননের গান' লিখতে হয়—

তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

: তিমির হননের গান

বস্তুত তাঁর জীবনে কোনো পিছু ফেরা নেই—যা আছে তাকে বলা চলে ব্রত-চ্যুতি। কোনো বিরুদ্ধ-চেতনা নয়—মাঝে মাঝে এক নিশ্চেতনা তাঁকে সমাচ্ছন্ন করে। তিমির শিকারীরা তখন তিমির পিপাসী হয় যেন। আবার সুচেতনার দিন ফিরে আসে, প্রখর উজ্জ্বল দিন। তিমির শিকারীরা জাগ্রত, উদ্যত হয়ে ওঠে। আবার দৃপ্ত বিশ্বাসে কবির মন ভরে যায়।

সন্ধিকাল

ঝরাপালক যদি স্বপ্ন-প্রয়াণের ঋতু, ধূসর পাণ্ডুলিপি-মহাপৃথিবী-বনলতা সেন, তবে কবিচেতনার গোলাপী-গোধূলি। চেতনার গভীর হৃদয়ে জিজ্ঞাসা-অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ, বিদ্রূপ-বেদনা-সন্ধান এই নিয়ে এ ঋতুর চরিত্র। কিন্তু সব জড়িয়ে, সব ছাপিয়ে রয়েছে এক ইন্দ্রিয়লগ্ন স্বপ্নিল সৌন্দর্যের বলয়। দূরবিধৃত কল্পনার জগৎ থেকে নেমেই মাটি-পাথরের পৃথিবীতে পা রাখেন নি। বরং এই বস্তু পৃথিবীকে এক মনোভাব চেতনার ম্লানালোক জ্যোৎস্নাধারায় যেন অভিষিক্ত করে তুলে ধরেছেন। 'অন্ধকার' কবিতায় যে কস্তুরী আভার চাঁদের কথা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে মনে আসবে। যদি কল্পনার নিঃসীম আকাশে ডানা মেলা নাই যায়—যদি অনবচ্ছিন্ন ঘুমের নিশ্চেতনায় নিলীন শান্তি নাই মেলে, তবে এই ম্লান চাঁদের দ্যুতিই বরণীয়। বহির্পৃথিবীর বস্তুভার, কর্মভার, চিন্তাভার সরিয়ে এই স্তিমিত চন্দ্রালোক জাগরণেই নিদ্রার নিলীন শান্তি এনে দেবে—

> হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
> তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
> হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
> রয়েছে যে অগাধ ঘুম
> সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,

. অন্ধকার

কবিজীবনের এই অধ্যায়ে বস্তুপৃথিবীর প্রকৃতিটি এই। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতি-চিত্রের বস্তুভারহীন রূপ মানুষের নিদ্রালু চেতনায় আঘাত করে না, শান্তি দেয়। বাস্তব হয়েও অবাস্তবতার কুহেলি মাখা এই আশ্চর্য পৃথিবীটি তিনি এখানে ক্রমে ক্রমে তৈরি করে নিয়েছেন। উপকরণ কোথাও জন্মান্তরীণ স্মৃতি-সৌন্দর্য, কোথাও বা মানুষের কালাতিশায়ী জীবন—যাকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ইতিহাসচেতনা। 'বনলতা সেন' গ্রন্থ এই পর্বের চরম বিকাশ।

কিন্তু সে কথা থাক্। এখানে আমাদের কবির জীবনজিজ্ঞাসার রূপটি লক্ষ্য করে যেতে হবে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নিজের কবিচরিত্র ব্যাখ্যা করতে তিনি লিখেছেন—

> যে-কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
> শুধু জেনেছে বিষাদ,
> মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,

যে বুঝেছে, প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে—সে-ও যাবে স'রে ;
একে-একে সবই
ডুবে যাবে; —উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবে না কেউ আরো?
যেইদিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে?
কিম্বা যদি গায়,—পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা সত্য ছিল তার?

. কয়েকটি লাইন

তা যদি না যায়, পথের আহত মাছিদের মতো যদি আমাদের প্রাণ শুধু ব্যথা পেতে থাকে, তবে দুর্দশার গান বা উৎসবের কবিতা—এসব কিছুর সৃষ্টির সার্থকতা কি? এমন সাময়িক কাব্য রচনার স্পৃহা তাঁর নেই, সৃষ্টির আহ্বানে যে কবি আসেন, সময়-সিন্ধুর মতো বর্তমানের বুকে যাঁর নিশ্চিত অভ্রান্ত পদক্ষেপ, তিনি উৎসব-দুর্দশার ছোট্ট গণ্ডীতে ধরা দেন না। সৃষ্টির পিছনে আরো মহত্তর ভূমিকার উপলব্ধি তাঁর ছিল। তাই জীবনের সঙ্গে যোগ তাঁর অবিচ্ছিন্ন এবং ক্রমপ্রসারী।

তবু এই পর্বে প্রশ্নহীন, অভিজ্ঞতাহীন, 'চিন্তার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন' জীবনের প্রতি লোভ রয়েছে। চিন্তার, সঙ্কল্পের, ব্যথার পৃথিবীকে এড়িয়ে রূপের, রঙের, রসের, গন্ধের জগতে বিচরণ করতে চেয়েছেন বলেই মাটির উপরে নেমে আসার ইচ্ছা সত্ত্বেও এখনও সম্ভব হলো না। গোলাপী গোধূলি এলেও তবু বলতে হলো—এ 'তবু গোধূলি নয়'। তাই এই পর্বের পাঠক, যাঁরা জীবনানন্দকে রূপচেতনার কবি বলেই চিনলেন তাঁরাও তাঁকে সম্পূর্ণ চিনলেন না। আরো পরবর্তী সৃষ্টির মধ্যে তাঁর পরিণততর পরিচয় লুকানো রইল।

ইন্দ্রিয়-চেতন কবি মাত্রেরই মননের বিরুদ্ধে যেন আক্রোশ থাকে। রবীন্দ্রনাথের পরিব্যাপ্ত মনীষাতেও আমরা জানি, মনের ক্রিয়াশীলতায় তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। 'পঞ্চভূতে'র 'মন' প্রবন্ধে সে কথা খোলাখুলিই ব্যক্ত করছেন তিনি।

> "সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না। ...আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না।...প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে একভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর-এক ভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনো কালে কিছুতেই বোঝা যায় না অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন-কি, এসকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য করে।"

জীবনানন্দের কবিতায় ইন্দ্রিয়াসক্তির অতিকৃতির কালে মনের সম্পর্কে অনীহা ব্যক্ত হবে এতে বিস্ময় নেই।

ব্যুবনিক প্লেগের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধতারে নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন।

তথাপি একই সঙ্গে এই প্রত্যয়ও তাঁর রয়েছে যে, মানুষের মন যেমন সব গ্লানি ও কলুষের জনক, তেমনই অন্য এক মহৎ বেদনায় রক্তাক্ত হওয়াও শুধু তার পক্ষেই সম্ভব। একমাত্র মানুষই এই সাধ, এই সাহস নিয়ে এসেছিল। অথচ তার সেই মহত্ত্ব শুধু 'গ্লানি হল —কৃপা হল—নক্ষত্রের ঘৃণা হল—অন্য কোন স্থল পেল নাকো'—এই বেদনাও এই পর্বেই ধরা পড়ল। আশ্চর্য।

গ্রন্থিমোচন

'বনলতা সেন' পর্যায়ে যে অনুভব অন্তর্লীন ছিল সেই জিজ্ঞাসা-অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ, বিদ্রূপ-বেদনা-সন্ধান তার পরবর্তী স্তরের কবিতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রায়শই কবির কণ্ঠস্বর এখানে পরিহাস-তরল ; কিন্তু মন সামাজিক বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতার বেদনায় জটিল। রূপের জগৎ আর তাঁকে তৃপ্তি দেয় না। গ্রামজীবনের বিবর্ণ শান্তির অনুধ্যানে আত্মপ্রসাদ নেই আর; ইতিহাসের বঙ্কিম গতিপথ বেয়ে সামাজিক সমস্যার গ্রন্থিমোচনের সাধনা এবার থেকে।

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি একথা আমরা জানি ও মানি। কিন্তু তিনি নাগরিকতার কবি একথাও সমান সত্য, রূপসী বাংলা পেরিয়ে এসে মহাপৃথিবীতে পৌঁছে তাঁর এই নবপরিচয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। হয়তো এই পরিচয়ের মধ্যেই বিধৃত আধুনিক মনন। তাই গ্রামীণ স্বপ্নময় অভিজ্ঞতার ও আবেগময়তার প্রকাশ উপেক্ষা করে তিনি নাগরিক জীবনবোধকেই প্রথমে প্রকাশযোগ্য বলে মনে করলেন।

'জীবনানন্দের কবিতা : শতাব্দীর রাক্ষসী বেলায়' শীর্ষক নিবন্ধে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী সঠিক ভাবেই লক্ষ্য করেছেন, '১৯৪০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যবর্তী যে দলিত ও বিপন্ন জটিল ও নিষ্ঠুর দশক তার ভিতর দিয়ে এতখানি আন্তরিকতায় আর কোনো কবি হেঁটে গিয়েছিলেন কিনা জানি না।' তাঁরও মনে হয়েছে এ পর্বের প্রধান লক্ষণ নগর চেতনা, রূপসী বাংলার প্রিয় গ্রামীণ শাশ্বত অনুষঙ্গগুলি অন্তত তখন নির্বাসিত করে তিক্ত ক্লেদ গ্লানিভরা হিংসা বিদ্বেষে নিষ্ঠুর নাগরিক বাস্তবতায় এসে দাঁড়ালেন ; অমলেন্দু বসুর ভাষায় "চল্লিশের দশকের জাগতিক যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হানাহানি দুর্ভিক্ষ মারী দারিদ্র্য মানবতার বিকার এসবের প্রকৃতই দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলো আমাদের বাংলাদেশ এবং সে দেশের বৃহত্তম জনতার ও শক্তির কেন্দ্র কলকাতা'। —'অনিমেষ আলোর বলয় কবিও ব্যক্তি জীবনে বরিশালের গ্রাম্য আবেষ্টনী ছেড়ে চলে এসেছেন কলকাতায়, তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিচ্ছায়া এইসব কবিতা।

অনেক আগেই 'আবহমান' কবিতায় একালের জীবনের সমস্যা ও সঙ্কটের রূপ স্পষ্ট ধরা পড়েছিল কবির কাছে। তিনি জেনেছিলেন অনেক মৃত্যু পরম্পরা পার হয়ে এসে আজ আর সভ্যতার মৃত্যু নেই। কিন্তু অতীতের মতো সরল একমুখী সমাজও আর নেই। নানা লক্ষ্যের সাধনায় সমাজ এখন অনেক জটিল। তবু মানুষের শুভবুদ্ধি সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে আসে নি। অতীতের মতোই—

> পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
> এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।

: আবহমান

আর সাধারণ মানুষ সহজ বিশ্বাসে একটি পাখির মতো ডিনামাইটের উপরে বসে নিড়ানো ক্ষেতের কাজ করে যাচ্ছে। সোনালি সূর্যের সাথে মিশে থেকেও তারা আলোর দিকে পিছু ফিরে রয়েছে।

অথচ গ্রন্থকীট সমাজ-তাত্ত্বিকেরা যে এদের সত্য পথের নির্দেশ দেবেন এমন অবস্থাও তাঁদের নেই। কারণ বিভিন্ন মতবাদের আবর্তে তাঁরা বিভ্রান্ত।

> বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
> হেগেল ও মার্কস : তার ডান আর বাম কান ধ'রে
> দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতে ছিলো

অনুপম ত্রিবেদী

জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক্ নিয়ে, ষ্ট্যালিন, নেহরু, ফরোয়ার্ড ব্লক বা মানবেন্দ্র রায়ের বোঝা বয়েই উদ্বাস্ত এঁরা। মানুষের প্রাণ নিয়ে এই যে ছিনিমিনি খেলা—এর কোনো প্রতিকার বাতলাবেন তার সাধ্য কি? অথচ কবির বিশ্বাস ঐ নিরক্ষর চাষীদের দিকে তাকালে আমরা ত্রাণের পথ খুঁজে পাবো। স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতার ভ্রান্ত পথে আমরা চলেছি। এই অপমৃত্যুর পথ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে প্রেম ও সততার পথ, শ্রীজ্ঞানের পথ, প্রজ্ঞা পারমিতার পথ; বুদ্ধের পথে এসে দাঁড়াতে হবে।

শিল্পীরা এ পথ নির্দেশ করতে পারবে না! কারণ, 'কোনো আমলকী নেই শিল্পীর নির্জন করতলে'। গ্রন্থাদি থেকেও আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ খুঁজে পাব না। 'বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাইয়ে পড়ে আছে'। ভোট দিয়ে জন-মতামতে মিশেও কোনো সুফল ফলবে না। মাঠে ময়দানে কথা বলে জীবনের বিষ যারা ঝেড়ে দিতে চায় সেই নেতারা মূর্খ ওঝার মতো প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে শুধু। শোচনীয় কালের বিপাকে বিপ্লব ও এক-নায়কতন্ত্রের উপরও সেই সান্দ্র বিশ্বাস নেই আর, সব বৈচিত্র্যকে একটি ছাঁচে ঢালতে চেয়ে, সবাইকে একের অনুকরণে বাধ্য করতে গিয়ে, মানব ভাই বোনকে বুকে টেনে নেবার ছলে তাদের নিকেশ করে অনির্বচন রক্তে যন্ত্র-প্রতিম নায়কেরা নূতন বৃহৎ ভীষণ নদী সৃষ্টি করল। এই নূতন হিংসা ও রক্তপাতকে অভিধানের নবসৃষ্ট শব্দ ব্যাখ্যা করে অননুতপ্ততায় ক্ষালন করা হলো।

অথচ জনসাধারণ সব কিছুই করেছে। কাজ করেছে, ভোট দিয়েছে, বইকে বিশ্বাস করে পড়ে গেছে, নেতাদের সব কথা মেনে গেছে, বিশ্বাস-ভ্রষ্ট হয় নি। তবু কেন প্রীতি নেই? তারা বাসস্থান তৈরি করেছে অথচ বাসা পায়নি, ধান রুয়েছে অথচ গ্রাসাচ্ছাদন পায়নি। এই অসংখ্য শ্রমিক, কেউ বা মধ্যবিত্ত সমাজের লোক এবং এরা বাঁচবার পথের খোঁজ জানে না,

জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে,
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে।
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।

: এই সব দিনরাত্রি

এই সব হা-ঘরে হা-ভাতেদেরও কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, বিচিত্র মৃত্যুর আগে শারীরিক শান্তির প্রয়োজন আছে একথা অনুভব করে না কেউ। রাজপথে মৃতশব আতঙ্ক মুখে নিয়ে পড়ে থাকে। যুগ শেষ হলে এমন আবিষ্ট নিয়ম নেমে আসে।

তবে কি এই জেনেই আমাদের তৃপ্ত থাকতে হবে যে প্রকৃতির মধ্যেই এই হিংসা চিরন্তন হয়ে থাকবে। এই কথাই কি বলতে হবে—

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ
সৃষ্টির মনের কথা : আমাদের আন্তরিকতাকে
আমাদের সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুজ্জল
ঝর্ণার জল দেখে তার পর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায় :
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে, পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি ;

: ১৯৪৬-৪৭

কেউ না বলতেই যেমন পৃথিবীতে ভোরের আলো দেখা দেয়, কেউ না চাইতেই তেমনই কি দুপুরের ঢেউ কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে? নিসর্গের থেকে স্বচ্ছ জল পেয়েও নদী মানুষের মৃঢ়-রক্তে ভরে ওঠে। সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে—নদী নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছে কি? না মানুষের হৃদয়ের থেকে?

উদ্ভিদ্ যেমন আলোর দিকে মাথা তোলে তেমনই আলোর দিকে এগোতে চেয়েছে মানুষ। সকলকে আলো দিতে চেয়েছে। কিন্তু আলো না পেয়ে অন্ধকারে শত্রু মনে করে নিজের ভাইকে বধ করে ঘুমাচ্ছে। যদি আলো জ্বলে, কেউ যদি এসে এদের নাম ধরে ডাক দেয়, ঘুম ভাঙবে, আলো দেখবে এরা, সাড়া দেবে একত্রে সোল্লাসে। কিন্তু সেই আলো নেই। সূর্য নিভে গেছে।

পথ-নির্দেশ

কেন এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা? কেন এই দুর্বুদ্ধি আমাদের? কবি জানেন প্রত্যেকের প্রত্যেকে অপকর্মের পিছনে নিজস্ব যুক্তি আছে। শুধু গলদ এই যে প্রত্যেক নিজের স্বার্থের দিক থেকে বিষয়টিকে দেখছে সব দিক মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছে না।

ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোন কিছু বলবার আগে
আধখণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা বলে গিয়েছিল, তবু
অনন্ত তো খণ্ড নয়; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ কথা
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে
কেউ কেউ কিছু নেই- সূর্য নিভে গেছে।

: ১৯৪৬-৪৭

আজ এই বিশ শতকে শিক্ষার চরম প্রসার ঘটেছে কিন্তু জ্ঞান বাড়েনি ; কেননা প্রাণের প্রসারতা ঘটেনি।

বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিষের ভিড় শুধু- বেড়ে যায় শুধু ;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই

: ঐ

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর গভীর হতাশায় কবি লিখেছিলেন—

হয়তো বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা ;
হয়তো বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;
হয়তো বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন বলে—অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি বলে প্রচারিত করার ভিতর ;
হয়তো-বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা—সুখে থাকা রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা ;
হয়তো বা বিজ্ঞানের অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, এই।

. মহাত্মা গান্ধী

ইতিহাস এখনো কালের সীমানায় অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন। আমরা তবু জীবনকে ভালবাসি। জীবনের মানে হলো—সকলের ভালো করে জীবন যাপন। সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে। তবু যারা তুচ্ছতম আর্তকেও শারীরিক সান্ত্বনা এনে দিতে চায়, এই অপমৃত্যু রোধ করে যারা এক সাহসী পৃথিবী, সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ গড়তে চায়—তাদের ধন্যবাদ দিতে

হয়। সামান্য সুস্থ জীবন চাইতে গিয়ে আমাদের শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয়। এত আগুন, এত রক্ত মধ্যযুগেও দেখা যায় নি। তবু আজকের মানুষকেই সমস্তকালের হিসাব নিকাশ করে শুভ কাজের সূচনায় স্নিগ্ধ ও বীতশোক হতে হবে। অন্তিম গুণ 'দীনতা' আশ্রয় করতে হবে। কারণ আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময় তৃতীয় অঙ্ক এখন।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় র'য়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে;
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স ;
সে-সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।

: বিভিন্ন কোরাস ম পৃ.

হিংসার এই আমিষ অন্ধকার পেরিয়ে সেই নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রিতে পৌঁছাতে হবে। সেই শব্দহীন মৃত্যুহীন অন্ধকার না এলে মানুষের বিহ্বল দেহের সব দোষ প্রক্ষালন করে মানুষের বিহুল আত্মাকে সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল মুছিয়ে বীতকাম ও নির্মল করে তুলবে কে? এই মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকারের গর্ভেই ভোরের কান্তিময় আলো ফুটে উঠবে।

সাধারণ দৃষ্টিতে আজকের পৃথিবীতে সহজ মানুষের দাঁড়াবার মতো তিল ধারণের স্থান নেই। কিন্তু প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলে পথ মিলবে। বাংলার অশিক্ষিত কৃষকেরাও সে পথ নির্দেশ করতে পারে। সেই পথ হৃদয়ের সরল শান্তির পথ। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ তার হৃদয়। হৃদয় আছে বলেই মানুষ ভাই-বোনকে খুন করেও সেই রক্ত দেখে বিচলিত হয়ে জেগে ওঠে। ইতিহাসের স্থূলতা ঘুচিয়ে দিয়ে জ্ঞান—প্রতিভা—আকাশ—প্রেম—নক্ষত্রের শরণ নেয়। তাই হৃদয়কে আশ্রয় করেই মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু জ্ঞান ছাড়া প্রেম নেই। বিদ্যার পুঞ্জীকৃত উত্তরাধিকার নয়, প্রাণময় অর্থময় কিছু। সেই প্রাণময় জ্ঞানও দুর্লভ আজ পৃথিবীতে। অথচ এই পথেই আবহমানের মানব সভ্যতা এগিয়ে এসেছিল। বুদ্ধ সেই জ্ঞান সাধনা করেছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে সেই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আমরা ক্রমশ দূরে সরে এসেছি। তাই বিশ শতকে এসে প্রশ্ন জেগেছে 'একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে আবার বিশুদ্ধ হ'তে কতদিন লাগে?'

কিন্তু মানুষ জ্ঞান-পাপী। সব বুঝেও অভ্যাসের দাসত্ব অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই তাদের।

বাজার দরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে
জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোনো জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে ;
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে ; ছিন্ন হয়ে ; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে— অথবা নিজের দেশ— নিজের নেশন
সবার উপরে সত্য মনে ক'রে ;—জ্ঞান পাপে, অস্পষ্ট আবেগে।

: এইখানে সূর্যের

এবং এরই ফলে যে মানুষ যে দেশে টিকে থাকে সেই ব্যক্তি হয়—রাজ্য গড়ে, সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে আবার নূতন করে গড়ে ওঠে। এর থেকে নির্মল কোনো রাজনীতি এযুগে সম্ভব নয়। বর্তমান শতাব্দীর সময় স্রোত পার হতে পারলে সেই অমল রাজনীতি পাওয়া সম্ভব।

আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে। দারিদ্র্য-অভাব-অজ্ঞানতা, লোভ-হিংসা-ধ্বংস—এই পাপচক্র থেকে মুক্তির এটাই পথ—এ নির্দেশ বাংলার চাষীদের কাছ থেকেই আমরা পাই। তার অর্থ নয় যে তারাই সভ্যতার চরমে এসে পৌঁছেছে। তাদেরও প্রাণের নিঃসাড়তা মৃত মমীর মতো।

> কোথাও শান্তির কথা নেই, তার উদ্দীপ্তিও নেই,
> একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
> সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল খেতে ;
> সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে।
> সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।

: খেতে প্রান্তরে

এই মৃতকল্প জীবনের কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে থাকতে দেবে না। সভ্যতার ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে করুণ নিরীহ নিরাশ্রয় হয়ে থাকার কোনো মানে নেই, বরং ইতিহাসের কূলহারা সাগরের চিহ্নগুলি চিনে চিনে নচিকেতার মতো অগ্রসর হলে স্বাভাবিক সূর্যালোকে পৌঁছানো যেতে পারে।

'সময়ের কাছে' কবিতায় সেই চিহ্নগুলির পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে, নব নব ইতিহাস সৈকতে তাদের অভিযান। কিন্তু নচিকেতা, জরাথুষ্ট, লাওৎসে, এঞ্জেলো, রুশো, লেনিন প্রমুখ মনীষীরা মনে মনে যে পৃথিবীর স্বপ্ন এঁকেছিলেন কোথাও সেই অনির্বচনীয় স্বপ্নের সাফল্যের নিশানা দেখা যায় নি। শুভ্র মানবিকতার ভোরের উন্মেষ হয় নি। তবু এদেরই কল্পনার পৃথিবীর অভিঘাতে আজকের এই স্মরণীয় শতক আসতে পেরেছে। কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছি বলেই ক্ষান্ত হয়ে শান্তি চাইলে চলবে না। যে নূতন নূতন সমস্যা ও সঙ্কটের আবর্তে সভ্যতাকে পৌঁছাতে হচ্ছে তাকে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়। এমন নিরন্তর আঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসব হতে থাকলেই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, তার চেয়েও মহত্তর সিদ্ধিতে উপনীত হতে পারবো। সুতরাং অনন্ত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শুধু গতির গুণগান গেয়ে বর্তমান শতকের সভ্যতার সৈকত ছেড়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। নূতন নূতন তরঙ্গে, নব নব বিপ্লবে আমাদের বিভেদ ও সংগ্রাম ক্রমবিদূরিত হবে। মানবিক মিলন গভীরতর হবে। নব নব মৃত্যু শব্দ, রক্ত-শব্দ, ভীতি-শব্দ জয় করে মানুষের সেই চেতনার দিন এগিয়ে আসছে ; সর্বমানবের কল্যাণের অভিমুখে, প্রগাঢ় আশাবাদের মধ্যে মানুষের বিষয় হৃদয় এগিয়ে চলেছে।

প্রেম
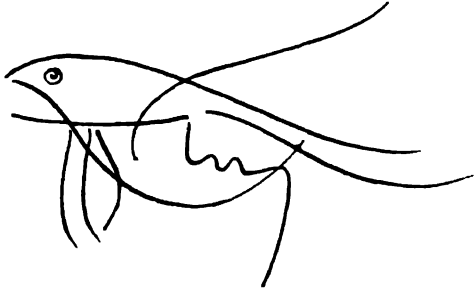
প্রেম ও মৃত্যু

বিজ্ঞান বলে, বস্তুর কোনো বর্ণ নেই। আলোক রশ্মি বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে প্রাণীর চোখের স্নায়ুতে আঘাত করলে বর্ণ বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। বস্তুর নিজের বর্ণ নেই বটে কিন্তু বর্ণশোষক শক্তি থাকতে পারে। অর্থাৎ আলোর সবগুলি উপাদান তাতে প্রতিফলিত না হতেও পারে। প্রতিফলিত আলোতে এই সব উপাদানের অভাব আমাদের চোখে যে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটায়, তাতেই বর্ণ বৈচিত্র্যের প্রতীতি। আলোক-রশ্মি বিশ্লিষ্ট করে বস্তু সমূহের উপর ফেলে আর এক জাতের বৈচিত্র্য সম্পাদন সম্ভব। আর এ কৌশলও আমাদের অভিজ্ঞতায় দুর্লভ নয় একেবারে। খালি চোখে পৃথিবীর যে রূপ দেখি, রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখলে তার বর্ণান্তর ঘটে বৈকি। কিন্তু বাইরের সব আলো নিভিয়ে অ্যালট্রা ভায়োলেট আলো জ্বেলে দিলে সেই অদৃশ্য আলোয় বস্তুর যে আশ্চর্য রূপান্তর দেখবো তা দিনানুদিন অভিজ্ঞতার বিষয় নয়।

কবির লেখায় বিশ্বকে তার সহজ-স্বভাবে পাই না, ব্যক্তি অনুভূতির বিভায় বিরঞ্জিত হয় তার রূপ—সেই তার বিশেষ আকর্ষণ। কবিতা হতে গেলে তাই ব্যক্তি ও বিশ্ব—এই দুটি উপাদানের আবশ্যকতা প্রাথমিক। জীবনানন্দের কবিতায় যে ত্রিতল মাত্রা (third timension) পাওয়া গেল তা হলো সময় ও ঐতিহ্য। কালের অনুবর্তনে অনুভূতির যে তারতম্য ঘটে, তার রূপায়ণে অন্য এক স্বাদ বর্তালো তাঁর কবিতায়। এবং এই কালপরিধি শুধু ব্যক্তি জীবনের নানা পর্বে সীমাবদ্ধ না রেখে সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে সৌর-বিশ্বের ক্রান্তিকাল পর্যন্ত প্রসারিত করে দেওয়ায় যে বিশিষ্টতা দেখা গেলো তাকেই বলা হয়েছে ইতিহাস চেতনা। ইতিহাসের পর্যায়ে পর্যায়ে এবং ব্যক্তি জীবনের পর্বে পর্বে কবি অনুভূতির যে বর্ণান্তর তা ঐ ত্রি-শিরা কাঁচের মতো প্রতিসরিত আলোকচ্ছটায় জীবনকে বিচিত্র ও রমণীয় করে তুলেছে। কিন্তু অন্তত প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে এই কৌশলও যথেষ্ট নয়— বরং মাঝে মাঝে আমাদের পরিচিত সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মৃত্যুর অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট আলো জ্বেলে জীবনের আর এক রূপ, আর এক তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং এটাই জীবনানন্দের কবিতার চতুস্তল মাত্রা।

ধরা যাক 'বনলতা সেন' কবিতাটি। এটিকে নিলাম কারণ এটিই জীবনানন্দের সব চেয়ে পরিচিত কবিতা। কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের অদ্ভুত মোহ আছে। কারণ, ব্যঞ্জনায় ও অভিব্যক্তিতে এর তুলনা বাংলা সাহিত্যে একটিও নেই। তবু এই একটি কবিতা দিয়ে জীবনানন্দকে চিনতে যাওয়া ভুল। এ কবিতাটি তাঁর বিশিষ্ট কবি-মানসের প্রতিভূ তো নয়ই—তাঁর কোনো একক গ্রন্থকেও সে গৌরব দেওয়া যেতে পারে না। তাঁর কবিসত্তার পূর্ণ পরিচিতি শুধু মিলতে পারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবের এবং রীতির কবিতার

সামগ্রিক অনুধাবনে। সুতরাং এই কবিতাটি পড়লেই তাঁর প্রেম সম্পর্কে ভাবনা-কল্পনার মর্মোদঘাটন করা যাবে না। বরং এতে তাঁর যে বিশিষ্ট চেতনার নিদর্শনগুলি পাবো তারই সন্তর্পিত অনুসরণ ক্রমে তাঁর প্রেমের কবিতার মর্মমূলে যে প্রাণরস সঞ্চারিত হচ্ছে, তার উৎসমুখে উপনীত হতে প্রয়াসী হবো।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রত্যেক প্রধান কবি নিজ নিজ কবিতায় প্রেম বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী বিশ্ববিসারী যুগল প্রেম কল্পনা, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের অস্থিমাংস-সম্বন্ধ প্রেমানুভূতি, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ক্ষণভঙ্গুর মিলন স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দানের আকূতি, মোহিতলাল মজুমদারের দেহলগ্ন রতিবিমুখ প্রেমের ক্রন্দন ও হাহাকার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রেমকে অস্বীকার ও জীবনযন্ত্রণাকেই প্রেমের স্থলাভিষেক, বুদ্ধদেব বসুর জৈবিক মিলনের নিঃসঙ্গ ও উতরোল আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমাজভীরু প্রেমের খিন্ন অবসাদ ইত্যাদির বিশ্লেষণ ও বিস্তৃততর ব্যাখ্যার অবকাশ আপাতত নেই। জীবনানন্দের দৃষ্টিতেও প্রেম এক স্বতন্ত্রচেতনা।

জীবনানন্দের রচনার আদিপর্বে 'ঝরা পালকে'র আমলে সম্ভোগাতুর প্রেমের মানস উত্তেজনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তখন কল্লোলের কাল। সেই উদ্দাম যৌবনোদ্দীপ্ত দিনগুলিতে দেহজ কামনা-প্রসক্তির রূপায়ণে কল্লোল কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সগোত্রতা ছিল। একটু নমুনা রাখলেই বোঝা যাবে, শুধু ভাবের বা বিষয়ের গ্রন্থিবন্ধন নয়, প্রকাশ পদ্ধতিতেও কি নিবিড় একরূপতা সেখানে—

পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
　　নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা!
নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে, —ঘুমে রাজবধু,
　　চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
　　কৃষ্ণা তিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
লভেছিনু উল্লাস—উতরোল!

· অস্তচাঁদে

প্রকল্পিত প্রেমের আবেগোচ্ছল আতিশয্যময় বর্ণনাতেও অন্যান্য প্রেমের কবির মতোই জীবনানন্দেরও কুশলতা ছিল একদা। কিন্তু এই উল্লাস ও উত্তেজনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে স্তিমিত হয়ে গেছে।

বরং মৃত্যুর সম্ভাব্যতা ও বিষণ্ণতা সেখানে মেঘমেদুর ছায়া ফেলে গেছে—

যে কবির প্রাণ
　উৎসাহ উঠেছে শুধু ভরে—
সেই কবি—সেও যাবে সবে;

· কয়েকটি লাইন

মৃত্যু আসবে। কবি থাকবেন না। প্রেমিকাও নন। তৃপ্তি থাকবে কি?

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের পরে শুয়ে রবে?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!

. নির্জন স্বাক্ষর

প্রেম আছে বলেই মৃত্যু ব্যথা আনে, সর্বজীবের ক্ষেত্রে—

এই ব্যথা, এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে
কোথাও ফড়িঙে-কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

ক্যাম্পে

আবার মৃত্যু আছে বলেই কি প্রেম রমণীয় নয়? প্রেমের জন্য ঘাতকের হাতে মৃত্যুও জীবনকে ও প্রেমকে মহনীয় করে।

কি বাস্তবের হাত এড়িয়ে যে কবি শেষ কবিতায় 'স্বপ্নের হাতে' নিজেকে তুলে দিতে চেয়েছেন। তারও অন্তিম উপলব্ধি : সর্বজীবের মৃত্যু আছে কিন্তু প্রেম মৃত্যুহীন—

কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়।

মৃত্যু অন্তিম অনিবার্য সত্য তাই বলে প্রেম কি নিষ্ফলা মূল্যহীন? কবি কিন্তু একথা বোঝাতে চাননি। তিনি শুধু বোঝাতে চেয়েছেন—মানুষ জীবনকে ভালবাসে, প্রেমের পিপাসায় তারা উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবির বিশ্বাস হয়েছে মানব জীবনে প্রেম আসে এক বিশেষ কালসীমায় সমুদ্রের তরঙ্গের মতো, প্রেম এসে মানুষকে উদ্দীপ্ত উন্নীত উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করে তোলে, তারপর তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। কিন্তু ঐ উচ্ছল উদ্দীপ্ত মুহূর্তটি জীবনের সার সত্য, তারপর অবশিষ্ট থাকে সেই স্মৃতি বুকে আঁকড়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা। একাব্যে কালপরিধি এবং তার সংলগ্ন মৃত্যু চেতনাই হলো প্রেম—প্রেমের চেতনা। ধূসর পাণ্ডুলিপির 'জীবন' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা আসলে মৃত্যুরই কবিতা। কবির বিশ্বাস, যারা প্রেমিক, যারা জীবনের

মহামূল্যতা উপলব্ধি করেছে—

> মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো...

এবং

> নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে।
> সব ভালোবাসা যার বোঝা হল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে।
>
> · জীবন

অতএব এ কবির কাছেও 'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান'! কবি তাই অনায়াসে বলতে পারেন—

> মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে।
>
> : জীবন

এ কাব্যে মৃত্যু প্রেমের মতই আকাঙ্ক্ষিত, হয়তো বিকল্প, হয়তো অদ্বৈত। তাই আসন্ন-মৃত্যু-প্রেমিক কবির দৃষ্টিতে পৃথিবীতে কত রূপময় সুন্দর আকর্ষণীয় তার অসামান্য অভিব্যক্তি মেলে 'মৃত্যুব আগে' কবিতায়।

মানুষের জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্যেব কাছে প্রেমের আপাত সংকীর্ণ পরিসর আলোচ্য 'বনলতা সেন' কবিতায় উদঘাটিত হয়েছে। 'হাজার বছর' এখানে কোনো অতিশয়োক্তিমূলক শব্দমাত্র নয় বরং বুঝতে হবে হাজার বছর ধরে গতিশীল এই মানুষ কোনো ব্যক্তিপুরুষ নয়। শত শত প্রজন্মের মধ্যে বহমান মানবাত্মার প্রবাহকেই এখানে নায়ক ও নায়িকা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সমান্তরাল উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
> যুগল প্রেমের স্রোতে
> অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
> আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
> কোটি প্রেমিকের মাঝে
> বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে
> মিলনমধুর লাজে।
> পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।
>
> : অনন্ত প্রেম

জীবনানন্দ কবিতায় কিন্তু উভয়েই জীবনের স্রোতধারায় বহমান নন। পুরুষ তার কর্মক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ থেকে আজকের স্পষ্টতর কালে,

সিংহল থেকে মালয় সাগর—সারা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে আর নারী দূর কালান্তরের শ্রাবস্তী বিদিশার রহস্যময়তা নিয়ে গৃহাঙ্গনে আজ অবধি অপেক্ষমাণ। ওডিসিউসের মতো একজনের নিয়ত সঞ্চরণ আর পেনেলোপের মতো অন্যজনের নিয়ত প্রতীক্ষা। সমস্ত দীর্ঘ কর্মময় দিনের অবসানে দিশাহারা ক্লান্ত মানবক যখন ঘরে ফেরে, তখন তার ভগ্ন-শ্রান্ত প্রাণকে আশ্রয়ের শান্তি দিতে পারে নারীর প্রেম, সেই প্রেমের সঙ্গে মানবাত্মার একটা ঐতিহাসিক স্মৃতির অস্পষ্ট পরিচিতি জড়িয়ে আছে—যা ঠিক চেনা যায় না, তবু বিশ্বাস করা যায়। যেন কোনো এক অতীত যুগান্তরে তার সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ছিল। সেই আধো পরিচিতির মাধুর্য, নারী হৃদয়ের সেই অপ্রত্যাশিত উষ্ণ আমন্ত্রণ ব্যর্থতা ভুলিয়ে দিতে পারে, শূন্যতার অন্ধকার ভরিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু জীবনে প্রেমের ভূমিকা সম্পর্কে এটুকু অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। কর্মময় দিনে যেমন প্রেমের অনুভূতি নেই, কর্মাবসানের বিহ্বল মুহূর্তে তার আবির্ভাব, তেমনি জীবনের সামগ্রিক লেনদেনের মতোই দূর ভবিষ্যতের বিচারে তার তাৎপর্যও যৎকিঞ্চিৎ। একথা বোঝাতে সম্ভবত পরে তাঁকে লিখতে হয়েছে—

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড-কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপর জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয় :—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' শুধাল সে, শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন'?

. হাজার বছর শুধু খেলা করে

ব্যক্তিগত প্রেমের মূল্য ব্যক্তির সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়। মৃত্যুর শীতল স্পর্শে যখন রক্তের উত্তাল উচ্ছ্বাস নিরসিত তখন সবচেয়ে জীবনমুখর প্রেমেরও কোনো অভিব্যক্তিময় উত্তরণ নেই। দুটি নরনারীর পরিচয়ের স্মৃতির নিরুত্তাপ স্বীকৃতি শুধু তখনও অবশিষ্ট থাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রবাদের মতো।

অথচ সমষ্টিগত দৃষ্টিতে যখন প্রেমকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, তখন তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রেমের অবসন্ন অবসান দেখেন নি। তিনি অনুভব করেছেন বিঘ্নলঙ্ঘী মৃত্যুত্তীর্ণ প্রেমের গম্ভীর রূপ কালপ্রবাহের মধ্যে আপনার প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে—

যে নক্ষত্ররা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ্ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?

: হাওয়াব রাত

এর সাঙ্কেতিকতা বিস্ময়াবহ। প্রেমের মধ্যে একটা প্রবল বেগ আছে, একটা বিঘ্নলঙ্ঘী প্রতিষ্ঠাকাম ভয়ঙ্কর আত্মতা আছে—যা যুগ অতিক্রম করে মৃত্যু পদদলিত করে একটা ব্যাপ্ত আয়তি চায়—সেই রহস্যাবৃত তথ্যই এখানে সঙ্কেতিত হয়েছে।

প্রেমিক

শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ বিস্ময়কর হলেও সত্য যে জীবনানন্দ প্রেমিক কবি, কিন্তু প্রেমের কবি নন। প্রেমের প্রতিফলনে প্রেমিক যে অব্যক্ত ব্যথা ও বিস্ময় বোধ করে, তাঁর কবিতাতে শুধু তারই উদঘাটন আছে। এক বিচ্ছেদাতুর নৈর্ব্যক্তিক চেতনার স্মৃতি ভাবানুষঙ্গ ক্রমে যে চিত্রকল্পগুলি আনে তাতে কোনো গভীর আলোড়ন নেই কিন্তু করুণ আর্তি আছে—অস্ফুট বেদনা, অবরুদ্ধ আবেগ আছে।

'হায় চিল' কবিতাটিতে বৃষ্টি ধোয়া মেঘের দুপুরে চিলের তীক্ষ্ণ কান্নার সুরে একটি প্রেমের আর্ত হাহাকার ছড়িয়ে আছে, আর কিছু নয়। আর কিছুর প্রয়োজনও নেই একটি সুন্দর লিরিকের জন্যে। বিগত প্রেমের স্মিত সুরভি শুধু পরিবেশ ও 'মুড'-এর অপরিহার্য যোগাযোগে এমন আশ্চর্য করুণ রসোচ্ছলতা লাভ করে, যা জীবনানন্দের কাব্যের বাইরে পাওয়া যাবে না। জীবনানন্দের আধুনিকতা এইখানে। আয়োজনের আতিশয্যে তিনি মনকে কখনই ভারাক্রান্ত করেন না। ভাবের সংহতিতে, প্রতীকের ব্যঞ্জনায় তিনি কাব্যকে ধ্বনিময় করে তুলতে ভালবাসেন।

বাস্তবিক, জীবনানন্দ প্রেমকে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন। তাঁর কবিতার একমাত্র নায়ক—কবি স্বয়ং। তাই প্রেমিক-পুরুষের হৃদয়ের নিবিড় বেদনা ও সূক্ষ্ম অনুভবগুলি সেখানে এত পরিচ্ছন্ন পরিভাষা পেয়েছে যে, তুলনায় সাধারণ প্রেমের কবিতা, বিশেষত বাংলা কবিতা, অত্যন্ত স্থূল, অত্যন্ত ভোঁতা মনে হয়।

যতদিন ভালবেসে গিয়েছি তোমারে
কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর

চেয়েছি—চেয়েছি, আহা... ভালোবেসে না-কেঁদে কে পারে
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও দেখনি ফিরে—তুমিও ডাকনি আর—আমিও খুঁজিনি অন্ধকারে

যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে।

: যেন এক দেশলাই

প্রেমের সঙ্গে এই বিহ্বলতা, এই অসহায় আকুতি যেন ওতপ্রোত হয়ে আছে, অথচ এর সাক্ষাৎ সাহিত্যে অন্যত্র মিলবে না; কারণ এখনো সাহিত্য অভিজ্ঞতামূলক হয়ে গড়ে ওঠে নি—এখনো সাহিত্যে আতিশয্যজনিত কৃত্রিমতার সমাদর—তাই তাতে মর্মস্পর্শের দক্ষতা নেই।

অথচ জীবনানন্দ কখনও প্রেমকে কাব্যের বিষয় বলে মনে করতে পারেন নি। প্রেম তাঁর কাছে জীবনের এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের উদঘাটন, কবিতা তার স্মৃতি-চর্বনা। তাই প্রেমের অবতারণা মাত্রই এক অদ্ভুত বিহ্বলতা তাঁকে আচ্ছন্ন-আবিষ্ট করে। এই আবেশ ও বিহ্বলতা কাটাতে না পারলে কখনও প্রেমের কবির কুশল-শৈলী আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব না হোক, প্রেমের কবি আমরা অনেক দেখেছি, অনেক দেখবো—কিন্তু প্রেমিক-কবির এই আত্ম-উদঘাটন দুর্লভ থাকবে আবহমান কাল।

তবু সে কথাও তো পরের। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি অন্যান্য প্রেমের কবির মতই প্রকল্পিত প্রেমের আবেগোচ্ছল আতিশয্যময় বর্ণনাতেও জীবনানন্দর কুশলতা ছিল একদা। তখন কল্লোলের কাল। সেই উদ্দামতা, সম্ভোগাতুর প্রেমের সেই মানস উল্লাস ও উত্তেজনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে স্তিমিত হলো। রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম' কেবল এই উপলব্ধিতে এসে অস্তমিত হয়েছিল যে 'ক্ষুধা মিটাবাব খাদ্য নহে তো মানব'। কিন্তু জীবনানন্দের ক্ষেত্রে কবি-স্বভাবের এমন আমূল রূপান্তরের রহস্য আজও অনুদঘাটিত। হয়তো বলা যেতে পারতো তখনকার সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ কবিকে ঐ রকম উগ্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ; বলা যেত, কল্লোল গোষ্ঠীর প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়েছিলেন ; বলা যেতে পারে এ হলো প্রথম যৌবনের বয়োধর্ম; অথবা নানা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দুরূহ হতো না। কিন্তু ঐ জাতের কোনো ত্বরিত মন্তব্যে আমাদের আস্থা নেই। কার্যত পূর্বোক্ত কোনো একটি কারণ একক ভাবে নয়, সবগুলিই অল্পবিস্তর মাত্রায় যৌথভাবে কবিচিত্তের সাময়িক কেন্দ্রচ্যুতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। এবং তাঁর সেই অতীত জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাঁরা রাখেন, তাঁরাই কেবল এই কারণগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশে সাহায্য করতে পারেন। তাই সে মনস্তাত্ত্বিক জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আপাতত বলতে পারি কল্পনা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় নেমে এসেছেন বলে 'মুড'-এর অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর হয়েছে—

তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

: নির্জন স্বাক্ষর

এবার থেকে তাঁর কাম্য হলো—মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

প্রেমিকের দুঃসহ যন্ত্রণা, তার অন্তর-বৃত্তির তীব্র তাড়না এই পর্বে এসে জীবনানন্দ প্রথম এবং মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। প্রেমের অসীম যন্ত্রণার মধ্যেও যে অন্তর্গূঢ় অমৃত আস্বাদ, প্রেমের অবার আনন্দের মধ্যেও যে গভীর বিষাদ নিহিত, তার উপলব্ধিতে তাঁর কবিপ্রাণ স্পর্শমণির সারূপ্য পেয়েছে। এইখানে এসে তিনি জেনেছেন প্রেম এক বিস্ময়ের মতো। পার্থিব কোনো বস্তু তা নয়, অথচ অপার্থিবও বলা চলে না তাকে। প্রকৃতির মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই, শুধু হৃদয়ের গভীর গহ্বরে নক্ষত্রের চেয়েও নিঃশব্দ আসনে সে বেঁচে থাকে অন্য এক হৃদয়ের অপেক্ষায়। সময় এসে প্রেমিকের চোখে যখন আগুন জ্বালিয়ে যায়, সেই হিজল কাঠের রক্তিম চিতায় সে নিজেই দগ্ধ হয়ে ভস্ম-শেষ হয়ে যায়। অতীতে যে প্রেম মানুষের চোখে জ্বলে উঠেছিল, নিভে গেছে। আবার নূতন আগুন জ্বলে উঠেছে নূতন নূতন চোখে। পুরানো নক্ষত্র নিভে যায় যেমন, নূতন নক্ষত্রে জ্বলে উঠে। ক্রমে ক্রমে জীবনের ধার ক্ষয়ে আসে, অতীতের নিভন্ত প্রেমের শৈত্য এক সময়ে নিজের মধ্যে অনুভব করে সকলে। হেমন্তের শিশিরের জল ঝরে প্রেমের দীপ্ত শিখাকে ম্লানতর করে। অতীতের হিমগর্ভ কবরে শিশিরের জল বুকে নিয়ে সেই দগ্ধাবশিষ্ট স্মৃতি শ্মশানের মতো জেগে থাকে।

প্রেম

জীবনের আলো জ্বালিয়ে রাখতে আমাদের যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ও শ্রম—এবং জয়, সাম্রাজ্য, সিংহাসন, সাফল্য ইত্যাদি সেই সংগ্রামের যে পুরস্কার, তার সঙ্গে বিমিশ্রিত থাকে অনেক রক্ত ও অশ্রু। তাই এই রণরক্ত সফলতা আমাদের তৃপ্তি দেয় না, মনের গভীরে অবসাদ জমে—আমাদের ক্লান্ত করে। অনেক জেনেছি বলে, অনেক মেনেছি বলে এক এক সময় আসে যখন আর জানতে ইচ্ছা করে না, জাগতে চাই না, ঘুমাতে হয়। জ্বরগ্রস্ত জীবনের বিকারের মতো আমরা প্রলাপের জগতে থাকি, বিকারের অবসানে ঘুমিয়ে পড়ি। ক্লান্তির পরে ঘুমের প্রয়োজন, মৃত্যুর মতো শান্তির প্রয়োজন।

মানুষ তার রক্তের মধ্যে এই অস্থিরতা, এই যন্ত্রণার বীজ বহন করে চলেছে। তার বেদনা দুরপনেয়। অন্যকে আঘাত না করলে আমরা নিজেদের জাগিয়ে রাখতে পারি না। আবার এই আঘাতের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু নক্ষত্রের এইভাবে গহ্বরের মতো ঘুমাতে হয় না ; কেননা, নক্ষত্রের আলো জ্বালতে এই রক্তের মতো অশ্রুর প্রয়োজন নেই, নিজেকে দগ্ধ করেই সে দীপ্ত থাকে। জানার বেদনা, মানার ক্লান্তি, জাগার অবিরাম প্রয়াস তার নেই বলে সে সুস্থ, স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারে যদি আমরা নক্ষত্রের মতো আলো পাই, যদি অন্যকে ক্লিষ্ট না করে নক্ষত্রের মতো অন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারি, তবে আর ক্লান্তি আমাদের আচ্ছন্ন করবে

না। কিন্তু যতদিন মানুষের মতো মানুষের পথে চলেছি ততদিন এই অবসাদ থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

তবু জীবনের এই কোলাহলময় অভিযান, অহংকে ঘিরে এই আড়ম্বরময় আয়োজন—সব কিছু প্রেমের অতর্কিত আবির্ভাবে ও আঘাতে বিপর্যস্ত ও নিরর্থ হয়ে যায়। এবং সেই আঘাতের পরে, সেই বিদ্যুতের মতো চকিত আবির্ভাবে আগুন জ্বলে ওঠার পরেও জীবন বহুক্ষণ অঙ্গারের মতো জ্বলতে থাকে। কারণ একমাত্র প্রেমই এই স্বার্থপরতার, এই আত্মসর্বস্বতার ব্যূহ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়—অন্যকে আঘাত না করে বরং নিজে আহত হয়ে অন্যকে সুখী করতে শেখায়। তাই প্রেমিক-মানুষের হৃদয় বজ্রাহত মহীরুহের মতো শতশিখায় দীপ্ত হয়ে ওঠে।

কেননা সূর্যের থেকে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে প্রেমের শক্তি বেশি। আমাদের অন্তর্লীন রক্তের অসুস্থতা মুহূর্তে দূর করে সে মায়ের মতো, সে আমাদের সুস্থ সজীব করে তোলে। তাই একবার তার স্পর্শ যে পেয়েছে, সে বারবার তাকে ফিরে পেতে চায়; কিন্তু প্রেম বারবার ফিরে আসে না।

অস্খলিত গতিতে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রেম চলেছে, তার পিছনে পড়ে আছে স্মৃতির শীত। প্রেম আমাদের ছুঁয়ে যায়, দোলা দিয়ে যায়, তবু আমরা তাকে ধরতে পারি না। প্রেম বলে যা ধরি, তা শুধু প্রেমের ছায়া, ঢেউযের মতো তার গতি —যদি আঁজলা ভরে আনি, পাই শুধু নিস্তরঙ্গ জল।

তবু তার স্পর্শের সেই লগ্নটিতে আমরা মৃত্যুকে অবহেলা করতে শিখি। সকলেরই ঘুম আছে—ঘুমের মতো মৃত্যু বুকে আছে সকলের, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়, কিন্তু প্রেমের পায়ের শব্দ তবু আকাশে চিরজাগরূক হয়ে বেঁচে থাকে। সব কিছু ভুলতে পারে মানুষ—প্রেমকে নয়। তাই মৃত্যুকে পদদলিত করে আকাশের বুকে মৃতেরা আবার জেগে ওঠে। মানুষের যে ব্যথা মুছতে এসে প্রেম আরও ব্যথা, আরো বিহ্বলতা দিয়ে যায়, তা ভুলে কে ঘুমাতে পারে?

নায়িকা

প্রেমের প্রতিফলনে পুরুষের মনটিকে কবি যেমন আশ্চর্য স্বাভাবিকতায় আঁকতে পেরেছেন নারীর মনটিকে ততখানি পারেন নি। তাঁর কবিতার নায়িকারা 'পরস্পর' কবিতার ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো যুগে যুগে আপনার অঙ্গলাবণ্য শাণিততর করে চলেছে—কোটি কোটি পুরুষের সাধনা ও আত্মোৎসর্গও তার সুপ্ত-চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে নি, তার বোবা মনের গোপন বাণীটি অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। এমনি এক রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তার জগতে জীবনানন্দের নায়িকারা ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত। 'পরস্পর' কবিতার বাস্তব পৃথিবীর মেয়েটির মতো তাদের শারীরী রূপের বর্ণনা

আছে, সেই রূপের ত্বরিত বিনাশের কান্না আছে, কিন্তু তাদের আত্মার বাণীটি দুর্লভ।

একেবারে নেই তা বলি না—'দুজন' কবিতায় যেখানে সব কিছু মৃত্যুর ধূসর বুকে ঝরে পড়েছে, হেমন্তের সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে এসে এক নারী তার সঙ্গীকে বলেছিল :

'পৃথিবীর পুরানো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ; —একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের —প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা,
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'
এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।

: দুজন

এই অক্ষম করুণ ইচ্ছার চিত্রটি নারী-স্বভাবের এক গোপন মাধুরীর উৎস অবারিত করেছে। তার হৃদয়ের এ উদঘাটনে শুধু প্রেমিকের নয়, আমাদেরও মনে হয়, 'এই নারী—অপরূপ—'। কিন্তু আর একবারও তার দেখা মিলল না।

মেলেনি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ নারীকে জীবনানন্দ দেখেছেন পৃথক এক চেতনার আলোকে। ইতিহাসের কুটিল অভিপ্রায় পুরুষকে যতখানি অস্থির ও স্বভাব-চ্যুত করেছে নারীকে ততখানি নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তার অনেক বেশি একাত্মতা। নদীর মতো তার মুখে বিম্বিত হয় সূর্যের বিভা, স্থান ও কালের বিভিন্ন পটপ্রেক্ষিতে তার বর্ণান্তর ঘটে। নদীর মতোই তার সহজ স্বকীয় প্রাণচ্ছন্দ আছে— প্রকৃতির মতো অব্যক্ত দুর্বোধ্য প্রাণচ্ছন্দ। তাকে অনুভব করা যায়, বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন যুগ-যুগান্তরের পুরানো কোনো এক নারীকে দেখছি। যেন অখণ্ড কাল প্রবাহের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা মণিকা-আলো নিয়ে মানুষকে জীবনের পথ দেখায়, সংঘমিত্রার মতো দুঃসাহসী অভিযানে প্রেরণা দেয়, প্রজ্ঞা পারমিতার মতো মহৎ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু নারী যদি তার সুস্থ স্বভাবে না থাকে, যদি কোনো অজ্ঞাত কুটিল অভিপ্রায়ের দ্বারা চালিত হয়ে পুরুষের সহজ বিশ্বাসকে প্রতারণা করে, তবে আর পুরুষের নিস্তার নেই। কোনো এক বসন্তের রাতে—জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে—জ্যোৎস্নায় ঘাইহরিণীর মতো তারা এসে পুরুষকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়।

মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস লয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি ;
বিয়োগের —বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস-সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?

. ক্যাম্পে*

তাই নারীর উপর জীবনানন্দের নির্ভরতা অনেক বেশি। দাবি অপরিমেয়। এবং নারীমাত্রকেই এইভাবে একটা ভাবদৃষ্টিতে দেখার ফলেই জীবনানন্দের নায়িকারা জীবন্ত ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। এমন কি, 'ঝরাপালকে'র আমলের passive নায়িকাদের প্রকল্পিত সজীবতাও পরবর্তীকালে বজায় থাকেনি। শুধু তাই নয়, 'বনলতা সেন' গ্রন্থে যদিও কবি বলেছিলেন 'এখানো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'—তবু এই নায়িকাদের অরূপ নারীত্বের প্রতীক মনে করাও ঠিক হবে না হয়তো। তাঁর বনলতা, সুচেতনা, সুদর্শনা, সুরঞ্জনা, সবিতা, শ্যামলী, শঙ্খমালা সবই যেন পৃথক পৃথক 'আইডিয়া'র প্রতীক। এদিকে এই নামের শব্দগত অর্থও কিছু আলোকপাত করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। বনলতা যেমন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের রূপক এমন ব্যাখ্যা করা সম্ভব, শ্যামলীকে যেমন বাংলাদেশের প্রতিরূপ ভাবা চলে, তেমনি সুচেতনা, সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, সবিতা প্রভৃতিকে বিভিন্ন ভাব বা বৃত্তির রূপক-ভাবা চলে কিনা দেখা দরকার। 'ভাষিত' কবিতাটি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় সুচেতনা মানুষের নৈতিক শুভ চেতনার প্রমূর্তি মাত্র। এমনি আর কি! তবু যথার্থ মরমী কবির হাতে ভাব রূপকাশ্রিত

---

* একসময়ে ক্যাম্পে কবিতা সম্পর্কে জাঁকালো জনশ্রুতি উঠেছিল। এই জীবনধর্মী কবিতাটির ভিতরে কেউ কেউ নাকি অশ্লীলতা খুঁজে পেয়েছিলেন, এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ স্বয়ং যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উদ্ধৃতি যোগ্য মনে কবি। "ক্যাম্পে অশ্লীল নয়। যদি কোনো একমাত্র স্থিব নিষ্কর্মা সুব এ কবিতাতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের— মানুষের কীট ফড়িঙের সবার জীবনেবই নিঃসহায়তাব সুব। সৃষ্টিব হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়—ক্যাম্পে কবিতাটির ইঙ্গিত এই। একমাত্র।...প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল—পৃথিবীর এইসব ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়,—বিষণ্ণ যতখানি ; বিষণ্ণ—নিরাশ্রয়। ক্যাম্পে কবিতায় কবিব মনে হয়েছে তবু যে স্থূল হরিণ-শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না। সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদেব সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলেছে।...As this to wanton toys are we to the gods, they kill us for their sport'—এই আয়োজন।

...ক্যাম্পে কবিতাটির এই পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয়তার সুর : 'জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মত আমরা সবাই'—এই সুর আগে এসেছে কিনা জানি না...যা পরিচিত নয় তার অপরাধ ঢের। কিন্তু তবু অশ্লীলতার দোষে ক্যাম্পে কবিতাটি সবচেয়ে কম অপরাধী। ...Prurient মন যাদের, সব সময়েই সব জায়গায়ই সব কিছুর ভিতর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বার করবার অবাধ শক্তি তাদের রয়েছে...আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়। শেলীর 'Souls Sister' পাশ্চাত্য কবি সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression কিন্তু 'হৃদয়ের বোন' (expressionটির জন্য শেলির কাছে আমি ঋণী। এই শব্দদুটি বুঝতে দেয় সে কত Prurient- তার ভিতর অন্য কোন চেতনা জাগায় না।' [১৩৮১ সালে শতভিষায় প্রকাশিত] মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

হয়ে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হলে তাদের মধ্যে মানবিক বৃত্তিও দেখা দিয়ে থাকে ; রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যেমন কখনো প্রেমিক, কখনো বা প্রিয়ার রূপে বিলসিত হয়েছিল, এখানেও তাই হয়েছে। জীবনানন্দের কবিসত্তার সমান্তরালে থেকে এই সব নায়িকাও আপনাদের রহস্যময় দুর্বোধ্যতা নিয়ে কখনও অনুকূলতা, কখনও প্রতিকূলতা করেছে, কিন্তু কখনও শরীরী হয়নি। এই জন্যেই তাঁর প্রেমের কবিতা কখনোই দুটি সন্নিকৃষ্ট হৃদয়ের সংঘাত-মুখরতা লাভ করেনি। সেখানে শুধু একটি হৃদয়ের অন্য একটি মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়-রোমাঞ্চের অর্ধস্ফুট অভিব্যক্তি অথবা হৃতলগ্ন স্মৃতির বিচ্ছেদাতুর রোমন্থন। ম্যাথু আর্নল্ড একদা লিখেছিলেন, মানুষ এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। আত্মার এমনি নিঃসঙ্গ একাকীত্ব জীবনানন্দ বারবার অনুভব করেছেন। প্রিয়াকে অন্তরের সান্নিধ্যে পেয়েও তাই তাঁকে বারবার বলতে হয়েছে—

> তোমার মুখের রেখা আজো
> মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
> অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন ;
> কত কাছে—তবু কত দূর।

সবিতা

নারী

ইতিহাসের অগ্রগতির পথে জীবন ও সভ্যতার নানান অবক্ষয়ে আহত কবি শুধু প্রেমকেই আশ্রয় করেছেন। এই পর্যায়ে নারী এবং প্রকৃতিই তাঁর অবলম্বন এবং বলা বাহুল্য এরা প্রায় অদ্বৈত হয়ে উঠেছে। এতদিন্ তাঁর কবিতায় যে সব ইনডিভিজুয়ালকে পেয়েছিলাম, স্থান কাল দ্বারা চিহ্নিত, নাম পদবী দ্বারা বিশেষিত যে সব নায়িকারা তার কাব্য লোক আলোকিত করেছিলেন তার বদলে নামগোত্রহীন 'নারী' অথবা 'মহিলা' অথবা কেবলমাত্র তুমির আনাগোনা। অর্থাৎ এতদিনের প্রেমিক পুরুষ-সত্তার বিপরীতে এই প্রথম 'প্রেমিকা' স্ত্রী অথবা সঙ্গিনীকে দেখতে পেলাম।

সুমিতা চক্রবর্তীর এই বিশ্লেষণ সুন্দর যে "নারী তাঁর কবিতায় এক সময় এসেছিল বনলতা সেনের রূপ নিয়ে।" সহৃদয়া প্রেমময়ী। তারপর মাঝে মাঝে তাকে প্রেমহীন ও মৃতশরীর মনে হয় শঙ্খমালা সরোজিনী ও মৃণালিনী, উদাসীন রূপ-সর্বস্ব গর্বিত এসব নারী 'বধির নিশ্চল সোনার পিত্তল মূর্তি'—তবু তখনো রমণীয়। কিন্তু জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় নারীর আরেক রূপান্তর দেখা গেল 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এসে।

সে মহিমা কেমন?

উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে এসে উনিশশো পঁচিশের জীব সেই নারী আপনার হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন।

'হংসী শ্বেত' এই সৌন্দর্য বিন্দুটুকুও তখনো অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু কয়েক পংক্তি তারে বনলতা সেনের কবি না কাঁপা কলমে লিখে যান

কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে নারীর রাং দেখে হো হো করে হাসে।

এই সাধারণী নায়িকার আবির্ভাব হয়েছিল সাতটি তারার তিমিরের 'লঘু মুহূর্ত' কবিতায় সে দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন সুমিতা দেবী। তিনজন ভিখিরি নায়ক তাদের চায়ের আসরে নিয়ে এসেছিল কোন শঙ্খমালাকে নয়, শাঁখচুন্নিকে।

এই বাস্তবতা জীবনধর্মিতাই হলো এই বিশ্ব যুদ্ধকালীন কবিতার নূতন লক্ষণ। কিন্তু সব কবিতাই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন উচ্চারণ সমন্বিত নয়—। তবু এপর্বে এসেই প্রথম শুনলাম প্রেমিক কবির গভীর বিশ্বাসের বাণী।

মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

· মাঘ সংক্রান্তির রাতে

দেহকে ছাড়িয়ে এখানেই প্রথম মন, মুখের কথা ছাড়িয়ে নারীর মনোভাবনা এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নারীর জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের উপাসনা দেখতে পাচ্ছি। স্বীকৃতি পাচ্ছি কবির কণ্ঠের—

তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের শেষে এসে; মানব প্রতিভায়
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

· তোমাকে

আকণ্ঠ বিষকেও অমৃতে রূপান্তরিত করার শক্তি প্রেমের মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু সে প্রেম সর্বজনীন বিশ্বপ্রেম নয়। সেই নীলকণ্ঠ প্রেম কেবল নারীকে অবলম্বন করেই জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে।

জীবনানন্দের ক্লান্তপ্রাণ নাবিক 'বনলতা সেনে'র চোখে একদিন আশ্রয়ের শান্তিনীড় খুঁজে পেয়েছিল। দশ পনেরো বছর পরে এখন 'পটভূমির' রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিকেরা নিশিত নারী মুখের অন্তর্যামী দৃষ্টিতে বিষাদ ও ভর্ৎসনা দেখতে পাচ্ছে। কেননা সময় কোথাও নিবারিত হয় না, একদিন প্রত্যূষে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম আপতিক কাল আজ আমাদের যুবাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে, ধর্মাশোকের পথে নয়—পাপের পথে, লুণ্ঠনের পথে, নিষ্প্রেম অন্ধকারের অভিমুখে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু সময়

নারীকে কলুষিত করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বিশ্লেষণটি সুন্দর ও সঙ্গত "জীবনানন্দের প্রথম পর্যায়ের কবিতার অধিকাংশ নায়িকাই মৃত। অন্য নায়িকারা বড়োজোর ক্ষতবিক্ষত কবিকে শান্ত নিবিষ্ট কটামুহূর্তের সঙ্গ দিতে পারে কেবল : নাটোরের বনলতা সেন, যার উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু অন্ত্যপর্বে জীবনানন্দের কবিতায় নারী হয়ে ওঠে প্রেরণাদাত্রী, শুধু নর্মসহচরী নয়, কল্যাণব্রতী পুরুষের মর্মসঙ্গিনী। তাই মৃত শঙ্খমালার জন্যে আর খেদ নেই, নারী সান্নিধ্য অবসর বিনোদনের অছিলা নয় আর, নারীর আলস্যে নিজেকে সঁপে দিতেও উৎসুক নন তিনি। বরং চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময়ে একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে ওঠে নারী-পুরুষের প্রেম।... প্রেম ও যৌনতার মাধ্যমে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা জানান তিনি।"

তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে শিবাজী 'সুতীর্থ' উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুলে দেখিয়েছেন শ্রমিক ধর্মঘটে সুতীর্থ ও ক্ষেমেশকে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করে নামিয়েছে। জয়তী বলেছে "আমি তোমার সঙ্গে না থাকলে কোনো কিছুতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে না তুমি। সে রকম বিশ্বাস না থাকলে, সুতীর্থ এ-যুগকে সাহায্য করতে পারবে না তুমি। খুব বিপন্ন আমাদের এই যুগ, তোমার মতন লোকের সাহায্য চায়।"

মনে রাখতে হবে 'সুতীর্থ'র রচনাকাল ১৯৪৮ সালের মে জুন মাস। অর্থাৎ কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা' রচনা চলেছে। পূর্ব প্রকাশিত সব বইয়ের শেষ কবিতাটিও রচনা হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরে নূতন দায়িত্ব চেতনা অনুভব করছেন কবি। তাঁর মনে হচ্ছে নারীই এখনো এই অন্ধ জগতে অতীতের সূর্যবলয়ের নিদর্শন। অথচ কবির অভিজ্ঞতা হচ্ছে একালের মানুষ—

"কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মত ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো ;
.. ..
সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো;
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার করে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।"

: সময়ের তীরে

মানুষ নারীকে অবজ্ঞেয় করে রাখলেও কবির চেতনায় তারা তা নয়, তারা মহিয়সী। তাই কবির মনে হয়েছে নারীকে আজ আর মিনারে, জানালার নানা বর্ণীল কাঁচের দিগন্তে দেখা যায় না। বনচ্ছবির ভিতরেও সে নেই, নিঃসঙ্কোচ রৌদ্রে বা ঝর্ণার জলে, নগরীর সমুৎসুকতায় তাকে পাওয়া যাবে না। তাকে আমরা দেখতে চাই আমেরিকার কংগ্রেসে, ভারতের পারলামেন্টে, ক্রেমলিনে শান্তি-শক্তি-শুভ্রতার সপক্ষে; কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর, অথবা কোনো নগরী যা সৃষ্টির মরালীকে মধু বাতাসে নক্ষত্রলোক থেকে সূর্যলোকান্তরে বহন করে নিতে পারে? কবি এইরূপেই নারীকে দেখতে পেয়েছেন সময়ের জ্বলন্ত তিমিরের মধ্যে, শুনেছেন শ্বেতপক্ষিসূর্যের ডানার উড্ডীন কলরোল; আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।

শেষপর্ব

কবি-জীবনের শেষ-পর্বে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় ছান্দিক বৈচিত্র্য এসেছিল। তাঁর সেই অতিপরিচিত আপ্লুত ঢঙের ধীরবিলম্বিত অক্ষর-মাত্রিক বা গদ্য-ছন্দ নয়, নূতন এক প্রাণ-স্পন্দিত ছন্দ এলো, পংক্তি-বিন্যাসে কারুকার্য এলো, এক সজাগ শিল্পীমনের স্পর্শে নূতন হয়ে উঠলো কবিতা ; ছন্দে সঙ্গীতে যেন 'ঝরাপালক'-এর সেই হারানো দিনগুলি আবার ফিরে এলো। আর সবাই জানেন, কবিতার নূতন আঙ্গিক কখনো শুধু তার বেশ-বৈচিত্র্য বর্ধনে নিঃশেষিত হয় না, বরং তা কবির বাণীতে নূতন অর্থ-সঙ্কেতেরই দ্যোতনা করে। জীবনানন্দের কবিতার এই ছান্দিক বিবর্তন, আশ্চর্য, শুধু প্রেমের কবিতা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই এতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই পর্বের কবিতার এই রূপকর্মগত বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রসঙ্গে অবান্তর হওয়ায় সে কথা বাদ দিয়ে শুধু তার ভাব-মূল্যগত দিকটুকুই আমরা পর্যালোচনা করছি।

ভাল কবির কাব্যে নূতন ছন্দ যদি নূতন ভাবনারই দ্যোতক হয় এবং জীবনানন্দের শেষ জীবনের সব কবিতার মধ্যে প্রেমের কবিতাতেই যদি নূতন আঙ্গিক সবচেয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, বুঝতে হবে, প্রেমের কবিতাতেই তিনি এক নূতন ভাব-ক্ষেত্র অধিকারে নিযুক্ত ছিলেন। এই নূতন ভাবনাটির প্রকৃতি নির্ণয়ই আমাদের লক্ষ্য।

'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতাটিকে এই জন্যেই জীবনানন্দের প্রেমের কবিতার একটি 'মাইল-ষ্টোন' হিসাবে নিতে হবে : শুধু ছন্দের বিচিত্রতা আছে বলে নয়— এর ভাবের মধ্যে কবিমানসের যে অন্তর্গূঢ় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার জন্যেই। 'ঝরাপালকে'র আমলে তাঁর প্রেমের কবিতার বিচিত্রতা ছিল রঙে, রসে, ছন্দে, ভাবে, কল্পনায়। কল্পনার উচ্ছলতা ছিল মাত্রাতীত সেখানে। যেন নানান রঙচঙে মাটির পুতুল ছিল সব—বিচিত্র আকার-আয়তন-বেশ-বাস। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—রঙ-ছুটের কাল। বিচিত্রতা ঝরে গেছে। কবি এখন ভাবে গভীর, আবেগে বিশুদ্ধ। পুতুল ছেড়ে প্রতিমা রচনায় মন দিয়েছেন তিনি। রঙ নেই, কিন্তু একরঙা মেটে সাজেই শ্রী এসেছে, সুষমাও। 'মহাপৃথিবী'-'বনলতা সেন' একই পর্বকাল

ধরতে হবে। এখনও এক রঙ—সে রঙ মাটির নয়, খড়ি-মাটির। শুভ্রতার প্রলেপ পড়েছে শুধু। মুখশ্রী অঙ্গরাগ আরো মার্জিত, আরো নিটোল। শেষ পর্বে আবার রঙ এসেছে, বিচিত্র ছন্দ, বিচিত্র রস—কিন্তু 'ঝরাপালক'-এর পুতুলের মতো অতো চটকদার অতো চোখ ধাঁধানো স্থূল বর্ণলেপ নয়। রঙে, রেখায় সূক্ষ্ম কারিগরি, আলতো তুলির টানে নাক-মুখ-চোখ এঁকে তোলার নিপুণ দক্ষতা। তবু লাল-নীল-হলুদ-সবুজ রঙের ছড়াছড়ি নেই আগের মতো—সুমিত শ্রীর জন্যে যে রঙ যেটুকু দরকার, সেটুকুই।

বস্তুত, 'ঝরাপালক'-এর কবিতার সঙ্গে এই পর্বের কবিতার মিল আছে—বর্ণের, ছন্দের মিল; মাঝে ওই পুতুল আর প্রতিমার সমুদ্র প্রভেদ।

এল আমার ছায়া-প্রিয়া
কিশোর বেলার সই গো!
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে ;
মনের মধু,—মনোরমা,—
কই গো সে মোর, —কই গো!
কিশোর বেলার সই গো!

ছায়াপ্রিয়া

এমন নিপুণ নিটোল মিষ্টি ছন্দ এই পর্বে এসেও পাওয়া যাবে না। তবু যা পাওয়া যাবে তা—

পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে :
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা ;
ফাইল নাড়া কী মিহি কেরানির কাজ ;
নাড়ব না আমি,
নেড়ে কার কি সে লাভ;
মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,
সুবলেরই শুধু? অবশ্য আমি তাকে
মানে এই —এই অমিতা বলছি যাকে—
কিন্তু কথাটা থাক ;
কিন্তু তবুও—
আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,
নারী যদি মৃগতৃষ্ণার মতো—তবে
এখন কি করে মন কারাভান হবে?

প্রৌঢ় হৃদয়, তুমি
সেই সব মৃগতৃষ্ণিকা তালে ঈষৎ সিমুমে
হয়তো কখনো বৈতাল মরুভূমি,
হৃদয়, হৃদয় তুমি !
তারপর তুমি নিজের ভিতরে ফিরে এসে তবু চুপে
মরীচিকা জয় করেছো বিনয়ী যে ভীষণ নামরূপে—
সেখানে বালির সৎ নীরবতা ধূ ধূ
প্রেম নয় তবু প্রেমেরই মতন শুধু।

. *লোকেন বোসের জার্নাল*

কর্কশ পাথরে তীক্ষ্ণ-মুখ ভাস্কর্য যেন। 'ঝরাপালক'-এর কবিতাটিতে ছন্দের চতুর চটুল জলতরঙ্গ ধ্বনি ছিল, চিত্রল সৌন্দর্য ছিল, ভাবের দিকে ছিল বিরাট শূন্যতা। এখানে আধুনিক প্রেমিক চিত্তের নিষ্ঠাহীন প্রেমকলাবিলাসের ছলনার অন্তস্থলে হৃদয়ের চাপাপড়া হাহাকার যে নিস্তব্ধ ধ্যানময়তায় সমাহিত হয়েছে, তার ব্যঞ্জনা সাহিত্যে দুর্লভ। প্রতিমার যেমন বর্ণ লক্ষ্য নয়, প্রতিমার অন্তরালে যে প্রত্যয় রূপায়িত হয় তাই লক্ষ্য, সত্যিই যিনি শিল্পী, তিনি প্রতিমার রঙ-রেখাকে প্রকট করে তোলেন না, মূর্তিকে প্রমূর্ত করেন না— লক্ষ্য রাখেন অন্তরের প্রত্যয়টাকে আড়াল করে এরা যেন সামনে এসে না দাঁড়ায়, তেমনি এখানেও ছন্দ-গৌরবে দৃষ্টি নয়, চিত্ররূপে মোহ নয়,—এর অন্তরস্থিত ভাব-বস্তুর গাম্ভীর্যেই আমাদের পরম বিস্ময়।

এবং শিল্পের মধ্যে ঐ প্রত্যয়ই শেষ কথা। জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে এসে জীবনানন্দ এই প্রত্যয়টুকুই অঙ্গীকার করেছিলেন। এই প্রত্যয়কেই আমরা এরপর বোধি বলে উল্লেখ করবো। জীবনানন্দের কবিতায় এই বোধির আবির্ভাব এবং তার স্থান ও রূপ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। আপাতত এটুকু জানলে চলবে যে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খণ্ডিত উপলব্ধিগুলি পেরিয়ে যেখানে সমগ্র ব্যক্তি সত্তার নিশ্চিত উপস্থিতিতে একীভূত হয় এবং পরে সেই স্বানুভূত প্রত্যয়ের আরোপে অনুরূপ বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলি এক নূতন অখণ্ড তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে ওঠে, সেখানেই বোধির সক্রিয় অস্তিত্ব রয়েছে। আরও সহজ করে বলতে গেলে, সামাজিক মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি গভীরতম বিশ্বাস যে কেন্দ্রে সমন্বিত হয়ে চেতনায় রূপ পায় তাকেই বোধি বলে।

প্রেমের কবিতার মধ্যে এই কবিতাটিতেই প্রথম বোধির আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। ক্ষণস্থায়ী হাল্‌কা নাগর-প্রেমের বর্ণনার মধ্যেও নামরূপের নিঃসঙ্গ অনুধ্যানে প্রেমের অতীত যে এক ভীষণ স্তব্ধতার জগতে কবি আমাদের উপনীত করে দিলেন তা ধ্যানেরই জগৎ—নিত্যকার অভিজ্ঞতার জগৎ নয়।

প্রেম-সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা কবির যে আত্মনিষ্ঠ চেতনার পরিচয় পেয়ে এসেছি এ কবিতাটি যেন তার স্পষ্ট ব্যতিক্রম। এখানে পাত্রপাত্রীদের সামনে রেখে কবি প্রেক্ষাপটের

অন্তরালে সরে দাঁড়িয়েছেন—নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাদের সমাচ্ছন্ন করেন নি। প্রেম সম্পর্কে স্বাভাবিক বিহ্বলতা ও ভাবাবেগের বদলে একটা সরস ব্যঙ্গদিগ্ধ ভঙ্গি যে মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে, তাও কবির নির্লিপ্তির সাক্ষ্য দেবে। কবিতাটির আবেগ যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেখানেও বৈজ্ঞানিক বস্তুমুখিতা অস্তিত্ব হারায় নি।

হেমন্তে ঘাসে নীল ফুল ফোটে—
হৃদয় কেন যে কাঁপে,
'ভালোবাসতাম'—স্মৃতি—অঙ্গার—পাপে
তর্কিত কেন রয়েছে বর্তমান।
সে-ও কি আমায়—সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিল?
আজো ভালোবাসে না কি?
ইলেক্‌ট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হ'য়ে রবে;
কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে?

. লোকেন বোসের জার্নাল

নইলে এই স্মৃতি-অঙ্গার-পাপ-বোধ এই অতীতের প্রেম আর বর্তমানের আত্মদংশন ও জ্বালা—সব কিছুকেই বস্তুজগতের একটি নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধবার প্রয়াস কেন? প্রেমের সেই একচ্ছত্র ভাবাকুলতার দিন আর নেই, বরং সৌর বিশ্বের আদিম নিয়মতন্ত্রের (System) মধ্যে তাকে সংস্থিত করে তিনি যেন বিহ্বলতা থেকে মুক্তি চাইছেন; প্রাচীন ভক্তেরা যেমন ঈশ্বরের শুভঙ্করত্বে আস্থা রেখে দুর্বহ ব্যথা-বেদনা এড়াতে পারতো। তবু কবিতাটির শেষ পংক্তিতে এসে তিনি আবার বলেছেন—

সময়ের এই স্থির একদিক,
তবু স্থিরতর নয় ;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

: ঐ

জীবন তো কোনো স্থির সমাধান দেয় না। যদি দেয় তবে তখন তো প্রেম স্থবির ও মৃত হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রেমের সুনিশ্চিত অবস্থানের মধ্যেও একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এ শুধু তাঁর বৈজ্ঞানিক ভাবনার অঙ্গীকার নয়, অস্থির চিত্তেরই পুনঃপ্রকাশ। তবু এমনভাবে কোনো প্রেমের কবিতা সমাপ্ত হতে পারে, ভাবতেও বিস্ময়। ইউরোপীয় ভাষায় হয়তো মিলবে—কিন্তু তাদের কাব্য-ঐতিহ্য ও সংস্কারে এবং আমাদের সংস্কারে যুগান্তরের ব্যবধান।

এই আপাত আত্মপ্রক্ষেপহীন পাত্রপাত্রী-সমন্বিত লৌকিক প্রেমের বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনরীতি দেখে মনে হতে পারে—ইতিপূর্বে তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যত কিছু আলোচনা করা হয়েছে, সব—ভুল যদি নাও হয়—একদেশদর্শী। প্রেম

সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি আত্মনিষ্ঠ হলে অথবা ঝরাপালকের যুগের বস্তুনিষ্ঠা তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র না হলে তিনি 'লোকেন বোসের জার্নাল'-এর মতো কবিতা কি ভাবে লিখতে পারলেন? কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে এবং আলোচ্য কবিতাটি একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্টই প্রতীত হবে আমাদের প্রতিটি উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। পাত্রপাত্রীর কয়েকটি নাম সামনে তুলে ধরলেও এবং নির্লিপ্তির অন্তরালে আত্মগোপন করতে চাইলেও অতীত প্রেমের স্মৃতি এবং জীবন্ত দ্বন্দ্ব-মুখর প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষত প্রেমিকচিত্তের আত্মাণুবীক্ষাই এর মূল কথাবস্তু। তখন আর সেই প্রেমিকটিকে কবির আত্ম-প্রতিকৃতি বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আর সেই জন্যেই এই একটি কবিতা ছাড়া এই পর্বে আর কোনো কবিতায় লৌকিক চিত্র মেলে না—অন্তত আমাদের হাতের কাছে নেই।

বরং অন্য একটি কবিতায় জীবনের পরিণত অধ্যায়ে এসে, রক্তের মধ্যে বয়সের শৈত্য অনুভব করেও এই চির-হেমন্তের কবি হৃদয়ে এক নূতন বসন্তের আবির্ভাবের বিস্ময় ব্যক্ত করেছেন।

আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো
আকাশ তেমন নীল? আকাশ তেমন নীল নয়,
মেয়ে মানুষের চোখে নেই যেন তেমন বিস্ময়,
মাছরাঙা শিশুদের পাখি আজ ; শিশুরাও কারো
রেশমি চুলের শিশু নয় আজ ; ভাবিতে কি পার
প্রেমে সেই রক্ত আছে? আঘাতে রয়েছে সেই ভয়?
কুয়াশায় সেই শীত? কে সাজায় কে করে সঞ্চয়
আজ আর! জীবন তবুও যেন হয়েছে প্রগাঢ়!

নতুন সৌন্দর্য এক দেখিয়াছি—সকল অতীত
ঝেড়ে ফেলে—নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে;
শালিখেরা কাঁপিতেছে মাঠে মাঠে—সেইখানে শীত,
শীত শুধু--- তবুও আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রাণ রাত শেষ হ'ল—পৌষ গেল চ'লে
যাহারে পাইনি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে ব'লে।

: সে

বাইরের শীতকে অগ্রাহ্য করে সৌন্দর্যের, বসন্তের প্রগাঢ় অনুভব যার আবির্ভাবের ফল, সে প্রেম ছাড়া অন্য কিছু কি? যোগমগ্ন মহাদেবকে ঘিরে হিমালয়ের তুহিন স্তব্ধতা মদনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উচ্ছল প্রাণোন্মাদনায় মুখর হয়ে উঠেছিল তেমনি অকাল-বসন্তের হাওয়া লেগে কবির মনোভূমিও নূতন স্পন্দনে জেগে উঠেছে না কি?

এসব কবিতায় ভাবনার বিশিষ্টতা শুধু নয়, শব্দ প্রয়োগের প্রতীকী ব্যঞ্জনাও আশ্চর্য শিল্প-সিদ্ধি লাভ করেছে।

আরো পরের পর্যায়ে বোধ হয় স্পষ্টতারই সাধনা করেছেন কবি। ছন্দের মাধুর্য ও ভাষার প্রসাদগুণ এসব কবিতার আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ভালবাসায় যে চিরন্তন কৈশোর সারল্য মিশে থাকে তার স্বাদ পাওয়া যায় এই কবিতাগুলিতে। সহজ কথা সহজে বলা যায় না, এটাই দুলর্ভতম গুণ, কবির মহত্তম সিদ্ধি, এগুলি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আবার মনে করতে হবে।

'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'বনলতা সেন' কবিতার অথবা 'শ্যামলী' কবিতার অনুচ্ছেদে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এসে জীবনানন্দ নূতন কবিতা লিখেছিলেন 'পটভূমির'। নারীর প্রেমের প্রেরণায় যে সব যুবকরা যুগে যুগে অভিযান করেছে মৃত্যুবরণ করেছে সেই নিশিত নারীমুখ আজও অক্ষয় হয়ে আছে ঃ

> চারিদিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিউস ফিনিশিয়
> সার্থবাহের অধীর আলো—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
> আমরা আজও বহন ক'রে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
> লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা...প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।

: পটভূমির

কবির দশ-পনেরো বছর আগের তীব্র আবেগ যেন এক অবসন্নতায় ক্লান্তিতে বিমর্ষ মৃত্যুতে নিথর হয়ে আছে। ঠিক তেমনই 'দুজন' কবিতার অনুষঙ্গে পরে লিখেছিলেন 'নদী নক্ষত্র মানুষ'। এখানেও প্রকৃতির সমুদার প্রান্তরে পাতাঝরার হলুদ পটভূমিতে নারী ও পুরুষের বিগত প্রেমের স্মৃতিচারণা। অনুস্মৃতিতে মনে পড়বে ব্রাউনিং-এর 'লাষ্ট রাইড্ টুগেদার' কবিতাটি। কিন্তু এ কবিতা দুটির স্বাদ আর চরিত্র ভিন্ন। এখানের প্রেমিক প্রেমিকা। বিচ্ছেদের চরম সত্যকে স্বীকার করে নিতে ব্যথা পায়। হারানো প্রেমের নূতন কোনো সার্থকতা খোঁজে। বিশ্বাস করে :

> সে বললে—'শেষ সত্য নদী নয়— মন—'
> আমি তাকে : 'হয়তো নতুন কোনো রূপে
> আমাদের ভালবাসা পথকেটে নেবে এই পৃথিবীতে ; —
>
> ... ...
>
> একদিন তুমি এসে তবু এই হলুদ আঁচল রেখে ঘাসের ভিতরে
> শান্তি পাবে ; সন্ধ্যার জলের দিকে শূন্য চোখে রবে নাকো' তাকিয়ে এমন
> অস্পষ্ট সংকটে এসে—মুখে কথা ফুরাবে না—এখন যা গভীর গোপন
> প্রাণের চারণা পাবে অন্ধকারে ; ব্যাপ্তি পাবে, যেই সব কথা
> ভুলে গেছ—যে নিয়ম অনুভূতি সহজ স্পষ্টতা
> হারিয়েছে—নতুন জীবন পাবে তারা সব—'

: নদী নক্ষত্র মানুষ

নদী যেমন আপন গতির প্রবাহ থেকে বিচ্যুত না হয়েও জীবনের কল্যাণে আত্ম নিয়োজিত ঠিক তেমনই নারীও আপন বাস্তবতা নিয়ে স্বভাব থেকে চ্যুত না হয়ে প্রেমের প্রয়োজন আত্মোৎসর্জন করতে চায়।

আরো একটি কবিতায় কবি লিখেছেন—

ভেবেছিলাম একথা স্থির মেনে নিতে পারি :
নিউট্রন ও ইলেকট্রনের অন্ধ সাগরে
ওদেরি জাদুবলে তুমি হয়েছ আজ নারী ;
ওদেরি দয়ার ফলে আমি প্রেমিক তোমার তরে।
এ তবু ভুল হৃদয়ঙ্গম—মহাসৃষ্টির মানে
হয়তো ঠিক এমন ভাবে উৎসারিত নয়।
তা যদি হ'ত তবে যেদিন নিজেরি পরামর্শে সজ্ঞানে
আমাকে তুমি দিয়েছিলে অব্যর্থ হৃদয় ;—
সে স্বাদ হয়ে যেত কি আজ হেমন্তে আবার ক্ষয়।

তোমাকে

জড় বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মে নিউট্রন-ইলেকট্রনের পরস্পর সাপেক্ষতার মতো নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় কবির এই ভ্রান্ত ধারণা আজ নিরসন হয়েছে। মহাসৃষ্টিকে এত সহজে হয়তো ব্যাখ্যা করা যায় না। তা যদি হতো তবে কেউ নিজের বুদ্ধিতে সজ্ঞানে ভালবাসতো না অথবা সেই ভালবাসা কালক্রমে আর নষ্ট হয়ে যেত না।

আজও যেমন প্রকৃতির নিয়মে ফসল ফলছে, জলের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে নদীতে, কিন্তু সে ধারা রক্তের মিশ্রণে আবিল, আজকের নারী-পুরুষ শূন্য থেকে শূন্যের অভিমুখে আঁধার থেকে অপরিসীম অন্ধকারের দিকে নিরুপায় অনিবার্যতায় ছুটে চলেছে, এর ভিতরে আরো এক গভীরতর নিরুপায়তা হলো প্রেম—এই বোধ মানুষ বা মানবতা ছাড়া কেউ জানে না। এই প্রেমের উৎস দুর্জ্ঞেয় নারী-প্রকৃতি। আদি পৃথিবী থেকে আজ পর্যন্ত সব গ্লানি রক্ত বিহ্বলতার মধ্যেও নারীই এই প্রেম রহস্য বহন করে চলেছে, তার গালের অসীম সুন্দর তিলবিন্দুর মতো।

'তোমাকে ভালবেসে' আর 'তোমায় আমি' (তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে) কবিতা দুটিকে একই কবিতার পাঠান্তর বলে মনে হয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী। সেই ক্ষণস্থায়ী জীবন আশ্রয় করেও প্রেম তার স্বচ্ছতায় গভীরতায় এবং সৌন্দর্যে অনন্তকাল স্থায়ী হতে পারে। পদ্মপাতার উপরের উজ্জ্বল চঞ্চল জলকণার মতো—কালের মহাসাগরের বুকে দুটি প্রাণকণার যে মিলন, তা স্থায়ী না হোক, তাতে সুন্দর পৃথিবীর সম্মতি আছে। 'তোমার আমার' কবিতায় প্রেমকে তিনি দেখেছেন শাদা-

পাখির রূপে, সময় সেখানে কালো-পাখির মতো। তারা এক সাথে দেশে দেশে উড়ে চলেছে এই—

শাদা পাখিই কালো পাখি কি না
চিনিনা আমি চিনি না চিনি না ;
কালো শাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালবেসে।

: তোমার আমার

ভালবাসার যে নিবিড় সমাহিতির মধ্যে সব প্রেমচেতনা, কালচেতনা, প্রশ্ন, ব্যথা ডুবে যায় সেই প্রগাঢ়তার স্বাদ এই সব কবিতায়। এমনই একটি কবিতায় কালের কালো মহাসাগরের কাছে এসে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁর মনে হয়েছে —

অনেক দূরের জলের আলোড়ন
যেন তোমার মন ;
সেই নদীরই জল
যেন আমার মনের কোলাহল ;
তোমায় খুঁজে পায় না, তবু
ঘুরছে আমরণ।

: তোমাকে আমি দেখেছি ঘুরে ফিরে

আবার অন্য একটি কবিতায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি হারিয়ে ফেলে তিনি অনুভব করেছেন—

একদিন এ-জীবন সত্য ছিল শিশিরের মতো স্বচ্ছতায় ;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম—তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।

: রাত্রিদিন

জীবনের সেই অমূল্য মুক্তোগুলি এইভাবে বিকিয়ে গেলেও ভালবেসে তিনি এই সান্ত্বনা সঞ্চয় করতে পেরেছেন যে সময় অনন্ত হলেও প্রেমের সার্থকতার জন্যে অনন্ত সময়ের প্রয়োজন নেই। যদি একটি মুহূর্তেও কেউ হৃদয় মেলে দিতে পারে তবে প্রেমের অমৃতস্পর্শে এই অকূল মৃত্যুর সমুদ্রে শ্যামল দ্বীপের মতো সে জেগে থাকবেই।

প্রকৃতি
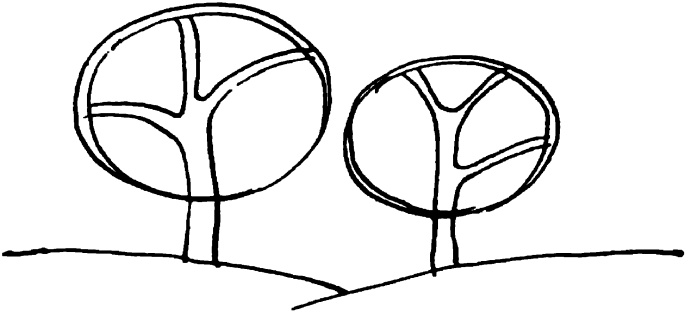
প্রকৃতি

প্রকৃতিই সেই স্বচ্ছ সমতল মসৃণ দর্পণ যাতে কবি-স্বভাবের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পড়ে। প্রকৃতির সংস্পর্শেই শুধু জৈবিক আলোড়ন বিলোড়ন নেই, স্বার্থের রঙ লেগে হৃদয়ে রাগ-বিরাগের দাগ ধরে না। তবু প্রকৃতির কাছে এলে কবিদৃষ্টির যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায় তার মূল স্বভাবের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে। সমালোচকরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে কবির অনুভাবনার যে অশেষ মূল্য দেন এই প্রজ্ঞানই তার মুখ্য হেতু।

বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ অবতারণার ভিন্নতর সার্থকতা আছে। জীবনানন্দের প্রতিভা সেই জাতের, যা নাগরিক জীবনের আলোড়ন-উদ্দীপনা, সমস্যা ও সঙ্কটের ব্যাসকূট ছাড়িয়ে প্রকৃতির অনাবিল সারল্যে সংলগ্ন হয়ে আছে। তাঁকে যখন প্রকৃতির কবি বলি, তখন একথাই মনে রাখি যে এই কবি-সত্তার প্রকৃতিতেই স্থিতি, প্রকৃতিতেই শান্তি, জীবনের আঘাতে আক্ষোভে আশ্রয় পেতে তিনি প্রকৃতিতেই বারবার ফিরে ফিরে আসেন। এখানেই সেই অক্ষয় শুশ্রূষা ও শক্তির উৎস যেখান থেকে তাঁর ক্লান্ত উৎসাহ নিত্যই নূতন প্রাণনে উৎসারিত হয়। জীবনের প্রতিকূল আহবে আহত সেনানী তিনি, তবু এ দুর্ভেদ্য বর্মের প্রসাদেই পরাভূত নন।

যেমন প্রেমের কবিতায় তেমনই প্রকৃতির কবিতায় কবির মনোধর্মের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের অনুভবনীয় ধারাবাহিকতা আছে। 'ঝরাপালক'-এ প্রধান ভূমিকা কবির ব্যক্তি-আমির। একটা মূঢ় কিশোর অহং প্রবল সেখানে। প্রকৃতি ক্বচিৎ কদাচিৎ সেই অহংয়েরই পটপ্রেক্ষিত হয়েছে মাত্র। অন্য স্বস্থ, স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই তার। একটি দৃষ্টান্ত—

আমি প্রজাপতি,—মিঠা মাঠে মাঠে সোঁদালে সর্ষে ক্ষেতে ;
—রোদের শফরে খুঁজি নাক' ঘর
বাঁধি নাক' বাসা, —কাঁপি থরথর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
শুঁড়ির গেলাসে মেতে!

: যে কামনা নিয়ে

প্রকৃতির এই যে রূপ, সাহিত্যের হাটে এর রস নূতন নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনো চিহ্ন নেই। 'ছায়া-প্রিয়া'র মত কবিতায় সেই সত্যদৃষ্টির পরিচয় ছিল। কিন্তু সেখানেও প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্য কোনো বিস্ময় বা সন্ধিৎসার জন্ম দেয় নি। প্রকৃতির কবি মাত্রই যে অতন্দ্র সমীক্ষা ও সম্ভ্রমে প্রকৃতিকে নব নব রূপে পান সেই অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়নি তখনো।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রথম প্রতিষ্ঠা প্রেমের। প্রকৃতি এসেছে তার পরিবেশ হয়ে। তবু তার মর্যাদা ও সার্থকতা এসেছে। অনেকখানি স্বয়ং সম্পূর্ণতাও। কবির ব্যক্তি আমির প্রেমে যেমন প্রবলতা, প্রকৃতিতেও তেমনি পূর্ণতা।

এখানেই তিনি প্রথম জেনেছেন নারীকে ভালবেসে ব্যথা। প্রকৃতিকে ভালবেসে ব্যথা নেই, শান্তি! নারীকে ভালবাসার স্মৃতিতেও ব্যথা। প্রকৃতির নির্মল শুশ্রূষায় তবু শেষে শান্তি আসে।

এই উপলব্ধি তাঁকে আরো গভীর অনুভাবনার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জীবনের নগ্ন অভিজ্ঞতা পরিহার করে আমরা রক্ত-ক্লেশ রোমহর্ষের কাহিনী সঞ্চয় করে পাণ্ডুলিপি গড়ছি। তার বোঝা টেনে চলেছি। মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা, চামড়া আর কাগজের বিষণ্ণতা নিয়েই আমাদের জগৎ। কিন্তু আমাদের জীবন এমন হবার কথা ছিল না। ফড়িং, পতঙ্গ বা পাখিদের জীবন যেমন কাটে সেই স্বাভাবিক জীবন মানুষের নেই কেন? কেন তারা চিন্তা কাজ সমারোহে মন স্তব্ধ করে রাখে? পায়রারা যেমন ভোরের উজ্জ্বল বিশাল রোদে উড়ে গিয়ে আকাশ আরো নীল করে দেয়—তাই কি জীবন নয়? নূতন নূতন আরো বেশি দামী জ্ঞান ও চিন্তার অন্বেষণে ক্লান্তি আসে। এই প্রত্যাশার কথা পায়রারা জানে না। শুধু নীল আকাশের রোদ বুকে নিয়ে তারা কি ব্যথা পায়!

এইসব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত ক্লান্তি নিয়ে আসে। অনেক জানার মূঢ়তা, জীবনের মানে খোঁজার দায় থেকে মুক্তি নিয়ে তিনি প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়েছেন। শহরে চিন্তার ব্যথা,—তিনি চেয়েছেন শান্তির আকাশ। কথা কাজ প্রশ্ন শুধু ভুল করে, ব্যথা বয়ে আনে। প্রকৃতির নানা রূপ দেখা—এই নিয়ে ভাবা, ছবি আঁকা—প্রাকৃতিক মৃদু নরম উচ্ছ্বাসের ছবি—এর মাঝে শান্তি আছে। এই ধূলো-খড় গাড়ি-হাঁস জ্যোৎস্না—এরা হৃদয়ের নীড় যেন, হৃদয় এরই শান্ত আশ্রয়ে চুপ করে শুধু রঙ, ঘ্রাণ, শান্তি, নিঃশব্দতা আবিষ্কার করে। এই সব সঞ্চয়ের মধ্যেই জীবনের সত্য পরিচয় উদঘাটিত হয়—এরই ফলে জীবন আরো নিবিড়তর রস রূপ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিচিত্রের এই নিবিড় আনন্দরস তাঁর চেতনায় মদির হয়ে এসেছে এই পর্বে

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু' বেলা
নির্জন মাছের চোখে, পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

: মৃত্যুর আগে

মৃত্যুর আগেই কেবল বিচ্ছেদাতুর মানুষের চেতনায় পৃথিবীর সব রূপ এমন কোমল সুন্দর মধুময় হয়ে ওঠে, এত খুঁটিনাটি ছবি, এত হৃদ্য রঙ ইন্দ্রিয়ানুভূতির এত সূক্ষ্ম কল্পনাতীত কারুকার্য ধরা পড়ে তখন। 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান।' এই রূপ রস এই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার কি করে জীবনানন্দের কাছে অবারিত

হলো— কিভাবে পাঠকের কাছে দুহাতে বিতরণ করেও যে ঐশ্বর্য ফুরালো না সে প্রশ্ন এখন থাক। তাঁর কবি-দৃষ্টি ও সৃষ্টির সেই রহস্য পরে উদঘাটন করা হবে। এই সম্পদের স্বীকৃতি এলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা প্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এই মনোভাব অবলম্বনের পিছনেও দুটি দিক ছিল আমরা তা আগেই চুম্বকে বিবৃত করেছি। একদিকে তিনি নগরে থেকে ক্লান্ত হয়ে নিসর্গের দিকে গিয়েছেন, কারণ প্রকৃতিই নাগরিক মানুষের আত্মশোধনের বিষ-চুম্বক। অন্যদিকে সভ্যতার আকর্ষণ ভুলে প্রকৃতির অমেয় রূপ ও আকর্ষণে তন্ময় হয়েছেন। শহরের দিক থেকে প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজন, আর হৃদয়ের দিক থেকে প্রকৃতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ। আর তারই ফল নগরের প্রতি তাঁর স্পষ্ট অনীহা।

অথচ 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে এক বিষণ্ণতা জড়িয়ে—সেটি বোধহয় এদেশের মাটির সঙ্গে ওতপ্রোত। বাংলার গ্রামীণ সভ্যতার বর্তমান সংক্রান্তি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিবিড় নৈরাশ্য ও ভয় এই যন্ত্রণা-পাণ্ডুর ছায়া ফেলেছে। চিলের কান্নার মতো এক অস্ফুট বোবা কান্না নীল আকাশে রোদে জলে মাঠে ছড়িয়ে রয়েছে।

দেশ

জীবনানন্দের সমস্ত প্রকৃতি কবিতার মধ্যে এককভাবে 'রূপসী বাংলা'র একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যত্র প্রকৃতি কবিতায় যেমন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক রূপ 'রূপসী বাংলা' তেমন নয়। এতে বাংলার গ্রামীণ সভ্যতার পটদীপে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলেছে, জীবনানন্দের সমস্ত কবিজীবনে তার আভা ; তাই 'রূপসী বাংলা' যতদিন প্রকাশ হয়নি, তাঁর কবিস্বভাব অনুভব করেও আমরা পুরোপুরি সতর্ক ছিলাম না।

'রূপসী বাংলা'র এই বিশিষ্টতাই এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। দেশকে, প্রকৃতিকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেছেন সেই বিস্ময় উদঘাটিত হবে এখানে।

কবিতার বিষয়-হিসাবে দেশপ্রেম যদিও এদেশে ইংরাজি সাহিত্য-সংস্পর্শের ফল, তবু এর ঐতিহ্য দুর্বল নয়, অথবা কবিতাও অপ্রচুর নয় বাংলা সাহিত্যে। এই সব দেশাত্মবোধক কবিতায় সুস্পষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রয়োজন ও সঙ্কটের ছবিই অত্যন্ত স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। বাঙালী দেশপ্রেমিক কবিদের সততা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয়—ভালবাসা হৃদয়বৃত্তি হলেই তার অন্তরের অমেয় অতলতা সমস্ত জ্ঞান বিশ্বাস প্রয়োজন ও সঙ্কটের অতীত। প্রতিটি স্বদেশী কবির মনোভঙ্গির বিশ্লেষণের অবকাশ নেই ; কিন্তু চিন্তার কি সমসূত্রে তাঁদের মন গাঁথা নীচের গান বা পংক্তিগুলি স্মরণে আনলে নজরে পড়বে—

১। নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশীয় ভাষা
পুরে কি আশা?

: রামনিধি গুপ্ত

2। নানা রূপ স্নেহ কবি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?

: রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। গুণবান, যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !

: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৫। বাজ্ বাজ্ শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মধ্যে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৮। ও আমার দেশের মাটি'
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯। মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা—

: অতুলপ্রসাদ সেন

এই সব মহৎ চরণের কাছে বাংলার রূপ ছিল অখণ্ড। কারণ তখনো পল্লী ও শহরের বিচ্ছেদ এমন আত্যন্তিক হয়ে ওঠে নি। তাই দেশের বন্দনা গানে, তাঁদের গলার সুর

গম্ গম্ করে বেজেছে। দেশকে ভালবাসার নিবিড় আত্মপ্রসাদের ব্যঞ্জনা তাঁদের সুরে গমকে। আমরা দেখেছি জীবনানন্দ দেশকে এমন অখণ্ড আকারে পাননি। গ্রাম ও নগরের বিচ্ছেদ তাঁকে বিষণ্ণ করেছে। ইয়েটসের আইরিশ লোকগীতির অনুরক্তির পিছনে দেশের সংস্কৃতিবান মানুষের আন্তরিক সমর্থন ছিল। কিন্তু পল্লী-বাংলাকে ভালবেসে রসিক সমাজে তাঁর লজ্জা, গৌরব নেই কিছু ; মায়ের ভালবাসায় যেমন আত্মপ্রসাদহীন নিবিড়তার স্বাদ—তাই, অন্য কবিদের মতো উচ্ছ্বসিত উচ্চারণ পাওয়া যায় না।

বাংলার তীরে এসে প্রকৃতির কি রূপ দেখলেন কবি? এই কিশোরী শ্যামলীর মুখের কোন মায়া তাঁকে মুগ্ধ করলো? তিনি দেখেছেন বাংলার রূপের অবিনাশী আবহমানতা। সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিলয় আছে, কিন্তু প্রকৃতি তার সোনার স্বপ্নের সাধ নিয়ে পুরানো গল্পগুলো নিয়ে বেঁচে থাকবে। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে মনে হয়, যেন মানুষ প্রাণী সকলেই এই সজীব প্রকৃতির বুক থেকে জন্মেছে, এখানে নীরবে কাজ সেরে কুয়াশার নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাবে বলে। তবু তারা হারায় না। কারণ, বাংলার তীরে কিছুরই নিঃশেষ অবসান নেই। বাংলার এই মুখ যে দেখেছে পৃথিবীর রূপ সে খুঁজতে যায় না। পৃথিবীর পরিবর্তমান রূপে কোনো স্থির সত্য নেই। কিন্তু চাঁদ সদাগর শ্রীমন্তের বাংলার রূপের কোনো আত্যন্তিক বিকৃতি হয় নি।

বাংলার এই গাঢ় বিষণ্ণ রূপ তিনি ভালবেসেছেন বলেই তাঁর মনে এক আশঙ্কার ব্যথা ছড়িয়ে আছে। সেই অতীতের শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার বাংলার আশ্চর্য রূপ মানুষের অবহেলায় অত্যাচারে নষ্ট হতে চলেছে। যেখানে তাদের কাঁকন বাজতো সেই ভাঙা ঘাটলায় এক একটি ইঁট ধসে ডুব-জলে ডুব দিয়ে হারিয়ে যায়। আজ কেউ বাসমতী চালধোয়া ভিজে হাতে বিনুনি খসায় না, কড়ি খেলার ঘর গোখুরের ফাটলে মিশে যায়। সেই সব রাঙা রাজকন্যারা আর কেউ ফিরে আসে না।

অনেক বছর আগে শৈশবে যেমন আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক দাঁড়কাক দিনরাত দেখা যেত সেই দাঁড়কাকও আর নেই। তবু পৃথিবীর কোথাও এমন বিজন শাদা সোঁদা পথ বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে শ্মশানের পারে চলে যেতে দেখা যাবে না। প্রান্তরে এমন বিজন সবুজ কোথাও নেই। লক্ষ লক্ষ ঘাস পাড়াগাঁর নরম কান্তারে অতীতের স্মৃতি নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। যখন কেশবতী কন্যার মতো নীল সন্ধ্যা আসে, সবার চোখের উপরে তার চুল ভাসে, অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে অবিরাম ঝরে, তখন রূপসীর চুলের বিন্যাসে এত গন্ধের আয়োজনে বিস্মিত হতে হয়। নরম ধানের গন্ধে, কলমীর ঘ্রাণে, হাঁসের পালকে, শরে, পুকুরের জলে, সর পুঁটিদের মৃদু ঘ্রাণে, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাতখানিতে, কিশোরের পায়ে দলা মুথা ঘাসে, লাল বটফলের ব্যথিত গন্ধের মধ্যে বাংলার প্রাণ টের পাওয়া যায়।

এই ডাঙা ছেড়ে রূপ খুঁজতে কেউ পৃথিবীর পথে ঘুরে বেড়ায় না। বটের শুকনো পাতায় এখানে যুগান্তরের গল্প ছড়ানো—এ সব উপেক্ষা করে কে ভিন্‌দেশে যাবে? কোন দেশে পাম গাছ সমুদ্রের গানে মাথা দোলায় অথবা কোথায় এলাচি ফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে বিনুনি খসিয়ে বসে থাকবার স্বপ্ন আনে, জেনে লাভ নেই। পৃথিবী

কোথায় সফলতা শক্তির ভিতর ব্যস্ত রয়েছে, কোথায় আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট জেগে উঠেছে, কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজেরা ভিড় জমিয়েছে—জানার কি দরকার ! বাংলার পাড়াগাঁর রূপই আমাদের বিহ্বল করেছে।

যে কবি সাত-সমুদ্রের জলে স্নান করেন, ঘোড়া নিয়ে ধূম্র নারীদেশে অর্জুনের মতো যেতে পারেন, অথবা সুপর্ণের মতো আরো দূর ম্লান নীল রূপের কুয়াশা অনায়াসে ভেদ করে যান, আমাদের কালীদহ গাঙ্গুড়ের গাঙচিল তাঁর কাছেও ভালবাসা চায়। এই দহে, এই চূর্ণ মাঠে, এই জীর্ণ বটে বাসা বেঁধে তিনি নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিন —এই দাবি করে। অথবা তাও ভুল। কীর্তিনাশা কতজনের কীর্তি ভেঙেছে তবু পদ্মার রূপ একুশ রত্নের চেয়েও গাঢ়, আরো ঢের প্রাণ তার—বেগ তার—আরো ঢের জল—আরো জয়। সেই দুর্বার আকর্ষণই কবিকে নক্ষত্রের পাশা খেলার মতোই, অনুরাধা রোহিনীর ভালবাসার মতোই শঙ্খমালার ভালবাসা চাইতে ব্যগ্র করে, তাকে ভালবাসতে বাধ্য করে।

যে ইঙ্গিতে আকাশের নীলাভ নরম বুক থেকে হিমের ভিতর নক্ষত্র ঝরে পড়ে সেই ইঙ্গিতে কবি যখন বাংলার বুক ছেড়ে একদিন চলে যাবেন তখনও এই গাঙ্গুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ তাঁর চোখে মুখে লেগে থাকবে। মনে কোনো ক্ষোভ নয় বরং সান্ত্বনা থাকবে এই কীর্তন ভাসান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর নরম নিবিড় ছন্দে তৃপ্তি পেয়েছেন—রূপহীন প্রবাসের পথে বাংলার মুখ ভুলে নষ্ট শুকের মতো কাল কাটাননি। বেহুলা লহনার মধুর জগতে বাঙালী নারীর চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল, কস্তাপাড় শাড়ির কাছে মন বিকিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শ্মশানে বঁইচি শেয়াল-কাঁটা তাঁর দেহ ভালবেসে চিতার ছাইয়ে নিবিড় হবে। আরো অনেক পরে সেখানে বাসকের গন্ধে আনারস ফুলে মৌমাছির গুঞ্জরণ শোনা যাবে। তারপর একদিন—

> আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
> হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
> হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
> কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;

: আবার আসিব ফিরে

সেই দিন এই কিশোরীর সঙ্গে আবার কার ভালবাসা হবে কে জানে? মৃত্যুকে কে মনে রাখ? শুকতারা নিভে গেলেও আকাশ কাঁদে না। কীর্তিনাশা কীর্তি খুঁড়ে খুঁড়ে নতুন ডাঙার দিকে এগিয়ে যায়—পিছনের অবিরল মৃতচর ছাড়াও তার দিন কাটে।

বিচিত্র

'রূপসী বাংলা'র একটি কবিতায় এক রহস্যময় ইঙ্গিত মুখরতা আছে। পল্লী বাংলার সৌন্দর্যের মদির আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে তিনি যখন আকস্মিক

ভাবে উল্লেখ করেন,

মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে—লালপেড়ে পুরোনো শাড়ির
ছবিটি মুছিয়া যায় ধীরে ধীরে—কে এসেছে আমার নিকট?
'কার শিশু? বল তুমি' : শুধালাম; উত্তর দিল না কিছু বট ;
কেউ নাই কোনোদিকে—মাঠে পথে কুয়াশার ভিড় ;
তোমারে শুধাই কবি : 'তুমি ও কি জান কিছু এই শিশুটির'।

তবু তাহা ভুল জানি

তখন বিস্মিত হতে হয়। বাংলার প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যার আঁধারে এই অজ্ঞাতকুল শিশুর আবির্ভাব—এর সাঙ্কেতিকতা অব্যর্থ মনে হয়, কিন্তু কবির মনোভাবের হদিশ মেলে না।

'রূপসী বাংলা'তে এ ছাড়াও যেটি লক্ষ্য করবার সেটি হলো এর অধিকাংশ কবিতা সনেট রূপ। প্রকৃতির কবিতা লিখতে তিনি এই বিশিষ্ট আঙ্গিকটি বেছে নিয়েছেন — অনর্থক নেন নি। এই ধ্রুপদী প্রযুক্তিটি প্রকৃতি কবিতার একতান স্বল্পায়তন রূপময় ভাবনাগুচ্ছকে সংহত সুষমায় যেমন ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে অন্য আঙ্গিকে তা দুরূহ হতো।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সনেট-ছন্দের যে গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে তিনি তাও বর্জন করেছেন। সেখানে সনেট চারটি ত্রিপদী (terza rima) আর একটি পয়ারের (couplet) সমাহার। সনেটের এই নূতন প্রকরণ কবির সতর্ক কলাকুশলতা ও বিষয় বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সেখানে সুন্দর খাপ খেয়েছিল। তবু এখানে সেই স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে প্রকৃতির তন্ময় মুর্চ্ছনায় আত্মলীন হয়ে গিয়েছেন বলে এই কাব্যের গুরুত্ব ও রসরূপ উজ্জ্বল হয়েছে। প্রকৃতি কোনো কিছুরই প্রতিবাদ করে না, আঘাত করে না, বরং বৃক্ষের মতো অসীম ধৈর্যে সব আঘাত মেনে নিয়ে তার মধ্যেই নিজের প্রবল প্রাণ-সত্তা সঞ্চারিত করে দেয়। কোনো সুরের সঙ্গেই প্রকৃতির বিরোধ নেই—সব সুরের মধ্যেই সে অনায়াসে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আঙ্গিক যখন বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত হতে চায় না, আরো সার্থক অভিব্যক্তির জন্যে যখন তার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, ভাবের সেই অনমনীয়তা কবিতার সান্দ্রতার হানি ঘটায়। পাঠকের মন ভাব-গভীরতা থেকে ছন্দ চাতুর্যের দিকে সরে যায়। বিষয়ের উপযোগিতার বিচারে তাই পুরোনো আঙ্গিকের ব্যবহার এখানে অসামান্য সার্থকতা পেয়েছে।

তবু 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতা ছিল। তার বিরুদ্ধে আত্ম প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তী কবিতাগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি-মুগ্ধতা বিরল হয়ে এসেছে। কিন্তু ভাবনা বৈচিত্র্যে আর অনুভবের ঐশ্বর্যে এই কবিতাগুলি তুলনাহীন।

'মহাপৃথিবী' বনলতা সেন' পর্যায়ে প্রকৃতি আর প্রেম অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। প্রেম যখন মানুষকে কাঁদায় প্রকৃতি তখন ব্যথার প্রলেপ, প্রেম যখন মানুষকে জাগায় প্রকৃতি তখন নিবিড় আস্বাদ হয়ে থাকে। মানুষের হৃদয়-বৃত্তির সঙ্গে প্রকৃতি, প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়

ওতপ্রোত হয়ে মিশে যায়। প্রেম যখন আসে তখন—

সেই সব বাসনার দিনগুলো ; ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেই দিন ;

: জার্নাল : ১৩৪৬

আবার অন্যদিকে—

চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে

: বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয়

হৃদয়ের প্রেম-ব্যথা-স্মৃতি-আনন্দের অনুষঙ্গে তাই প্রকৃতির রূপ-রস-রঙ-রেখা নির্ণিত, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কোথাও বা প্রেম আর প্রকৃতি প্রতীকী রূপারোপ করেছে পরস্পরের উপর; যেমন ক্যাম্পে, শিকার, জনান্তিকে ইত্যাদি কবিতায়। এইসব বিচিত্র-স্বাদী কবিতার একটু আস্বাদ—

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি,...
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!

: আমি যদি হতাম

প্রাণীর মধ্যে উদ্ভিদের মধ্যে জীবনের স্ফুটতর সার্থকতা অনুভবের লোভটা আবার নূতন করে জেগেছে। প্রকৃতির মধ্যে শরীরের আস্বাদ ও অনুভব বিস্ময়কর তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে কোনো কোনো ছোট কবিতায়।

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেই খানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে।

ফিরে এসো, একদিন নীল ডিম করেছে বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব!

: ফিরে এসো

মানুষ প্রকৃতির নীড়ে একদিন যে ডিম বুনে এসেছিল সেই নীড়ে ফিরে গিয়ে সেই সব শিশিরে শীতল ডিমগুলিতে প্রাণের উত্তাপ সঞ্চার করলেই একদিন ঝর্ণার কলধ্বনির মত অজস্র প্রাণের কলকাকলিতে জীবনের স্বাদ অনুভব করতে পারবে, শহরে নয়।

এমনিধারা মননের আরো বিচিত্র বিকাশ হয়েছে আরেকটি ছোট কবিতায় তার চিহ্ন—

আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

. কমলালেবু

মুমূর্ষু পরিচিতের বিছানায় কমলালেবুর করুণ হিম মাংস হয়ে আসবার আকাঙক্ষা শরীরী আবেগেরই চমকপ্রদ প্রকাশ।

ক্বচিৎ কোনো কবিতায় প্রকৃতির রূপ কল্পনার স্পর্শ লেগে আশ্চর্য সঙ্কেতবহ হয়ে উঠেছে। 'অবশেষে'র অরণ্য-প্রান্তরে এক জৈবশক্তির খেলা। দুপুরের সূর্যের আঁচ যখন সবুজ পাতার উপর নেমে আসে উঁচু উঁচু গাছগুলো তখন প্রশান্ত মনে খেলা করে। বিকেল এলে অতিকায় হরিণের মতো স্তব্ধ দেখায় তাদের, তখনই সেই নিলীম বিন্যাস ত্রস্ততায় নড়ে উঠে। মনে হয়, হরিণের মতোই দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে একযোগে তারা পালিয়ে যেতে পারে ; কিন্তু না পালিয়ে বাঘিনীর মতো সাহসে সেই ঝোড়ো বাতাসকে আলিঙ্গন করে।

দু-একটি কবিতায় অস্বাভাবিক নিসর্গ দৃশ্যও রয়েছে দেখা যায়। তার মধ্যে খুব সাধারণ একটি হলো রাত্রে পাখির ওড়ার বর্ণনা। যেমন :

শাদা শাদা ছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
রাত্রি;
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিস্তব্ধতা।

: আমাকে তুমি

এই দৃশ্য বার বার ফিরে এসেছে এই পর্যায়ের নানা কবিতায়। আবার কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কবির কল্পনার বলিষ্ঠতার অগ্নি পরীক্ষা এইখানে। যেমন—

নীল আকাশে খই ক্ষেতের ফুলের মতো অজস্র তারা,

: আমি যদি হতাম

অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবার কথা নয় এটা। খইয়ের ক্ষেত যদি সম্ভব হতো জগতে তবে সোনালি ফুলের মতো প্রক্ষিপ্ত ও সংখ্যাতীত মনে হতো আকাশের অজস্র তারাকে। খইয়ের পূত শুভ্রতার অনুষঙ্গে আকাশের সোনালি তারার সৌন্দর্য নিষ্কলুষ পবিত্রতার স্পর্শ পেয়েছে এখানে।

যুদ্ধকালীন পর্বে তাঁর প্রকৃতি কবিতার পরিণতি অত্যন্ত অলক্ষিত। অন্তত নূতন কোনো দিকের ইঙ্গিত হাতে নেই। গ্রাম থেকে নগরে কবিতার পটপ্রেক্ষিত সরিয়ে আনার ফলে প্রকৃতি নেপথ্যে পড়ে গেছে। অপরপক্ষে তথ্যবহুলতা, মনন আধিক্য আর বিবৃতিপ্রাধান্য চিত্রগুণকে আঘাত করেছে। কল্পনা ও অনুভবের ঐশ্বর্যে ক্রমিক ঘাটতি কবিতাগুলিকে বর্ণনাপঞ্জীর মতো নীরস, অসংলগ্ন ও প্রবন্ধসদৃশ করে তুলেছে। যে কোমল স্পর্শাতুর-চেতনা প্রকৃতি কবির অমূল্য ঐশ্বর্য, সেই সহজ স্বীকৃতির মন কোনো না কোনো কারণে তাঁর চরিত্র থেকে লোপ পেতে বসেছে। এই পর্বে অন্য জাতের কবিতায় তাঁর সিদ্ধি হয়েছে, কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি কবিতা ছাড়া প্রকৃতি-চিত্রণে তাঁর আগের সাফল্যের পুনরাবৃত্ত হয়নি।

কিন্তু জীবনের ব্যাসকূট ছাড়িয়ে অন্তিম অধ্যায়ে এসে তিনি আবার প্রকৃতিকেই অঙ্গীকার করেছেন। তিনি জেনেছেন, যদিও পৃথিবীভরা আলো আমাদের জীবনকে উদ্ভাসিত করছে তবু সুদূর ইতিহাসের থেকে যে সব গ্লানি জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল ঐতিহ্য সূত্রে তার ভার ক্রমেই দুর্বহ হয়ে উঠছে—

ঢেরাদিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবী ভরা আলো
তবুও গভীর গ্লানি ছিল কুরুবর্ষে, রোমে ট্রয়ে,
উত্তরাধিকারে ইতিহাসের হৃদয়ে
বেশী পাপ ক্রমেই ঘনালো

· আলো-পৃথিবী

সভ্যতার এই ঐতিহ্যজাত গরল ভবিষ্যতের মানুষ ও মনীষীদের সমবেত সাধনায় হয়তো একদিন দূর হবে, কিন্তু তার আগে এই সভ্যতার কৃত্রিমতার গ্লানির বাইরে একটি অন্তহীন শুশ্রূষার স্থান তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন। 'আছে' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেছেন, পৃথিবীর পথে মানুষের কাজ বা ইচ্ছা বড় জোর একশো শরতের সঙ্গে জড়িত থাকে। অনন্তকাল ও ইতিহাসের বিবর্তনের দিকে, সত্যকার জন্ম মৃত্যুর দিকে তাকালে বোঝা যায় মানুষের কামনা বেদনা কত অকিঞ্চিৎকর, প্রাপ্তি আর বিচ্ছেদ সাফল্য ও ব্যর্থতার তারতম্য তিলপরিমাণ। কিন্তু সনাতন অন্ধকারে ডুবে থেকে নরম ঘাসে শুয়ে উদার নক্ষত্রময় আকাশের দিকে তাকালে অনুভব করা যায় "কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি শান্তি—অফুরান"।

নিচের এই স্তব্ধ মাটিতে অনেক জ্ঞানী বন্ধুর মৃত শরীর মিশে আছে— আমরাও

মিশে যাবো—একথা বুঝেও নীল আকাশে চোখ রেখে পৃথিবীর মাধুরীর এই ঘাসে শুয়ে থাকাই বরং ঢের ভাল। তিনি বলেছেন, আজকের নীলকণ্ঠ মানুষও যদি পরস্পরকে ভালোবেসে স্পষ্ট হতে পারে, যদি মাটির কোলে নেমে আসে, যেখানে—

আমাদের পৃথিবীর পাখলি ও নীলডানা নদী
আমলকি জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন ; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি ; —শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রুরক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহলেও রবে, তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নব নব জলধারা উজ্জ্বল জগতে।

. আলো-পৃথিবী

মানুষের আদি ব্যথাই তো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বিচ্ছেদ, বুদ্ধি আর হৃদয়ের বিচ্ছেদ। আমরা আত্মকে সর্বস্ব জেনেছি, হৃদয়ের থেকে বুদ্ধির প্রাধান্য মেনেছি— তাই পৃথিবীর এই রক্তাক্ত রূপ। কিন্তু আজকের মানুষও যদি নাগরিক সভ্যতার এই আত্মঘাতী অভিশাপ থেকে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত সবুজের পথে এসে দাঁড়ায় তাহলে যদিও সেখানে মানুযের নিষ্ফলতা মৃত্যু ও হাহাকারের অবসান হবে না, তথাপি হৃদয়ের অনাবিল সাহচর্যে তারা আবার পরস্পরের বিচ্ছেদ বেদনা ভুলে উজ্জ্বলতর জগতের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারবে।

কেননা মানুষের মূঢ়তায় যদিও এই প্রকৃতি আবিল, যদিও নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুযের মূঢ় রক্তে ভরে যায়— তবু মানুষের হৃদয়ের গ্লানি ক্ষয় কালিমা মুছিয়ে তাকে নিষ্পাপ পবিত্র করে তুলতে পারে সেই-ই।

প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজন্-মতো তাতে নির্মলতা আছে।
আরো কিছু আছে তাতে ; যেন মানুষের সব রকম প্রার্থনা
নিঃশব্দ শিশির কণা—সব মূল্য বিনাশের তীরে।

· এইখানে সূর্যের

ঋতু

বাংলায় প্রকৃতির কবিতা প্রথম লিখেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঋতুতে ঋতুতে তাকে প্রদক্ষিণ করলেন রবীন্দ্রনাথ—গানে কবিতায়। একই প্রকৃতি ঋতুর জাদু লেগে নব নব রূপে এলো প্রাণে, এলো গন্ধে বরণে গানে। হেমচন্দ্রের প্রকৃতির অচঞ্চল মৃত মুখশ্রী রূপ-রাগের বিচিত্র বিভায় চঞ্চল স্পন্দিত জীবন্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে।

হেমচন্দ্রের মতো প্রকৃতির অখণ্ড রূপ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো ঋতুর বিচিত্র বিন্যাস নয়—জীবনানন্দের প্রকৃতি-কবিতা আরো বিস্ময় নিয়ে এলো। ছয় ঋতুর সবচেয়ে অখ্যাত অবজ্ঞাত ঋতুটি—রবীন্দ্রনাথের প্রচুরবর্ষী দাক্ষিণ্য অপর্যাপ্ত ঝরেছে অপাত্রেও, কিন্তু পাতাঝরার ব্যথা ছাড়া আর কোনো গাঢ় অনুভবে যা কবির মনকে নাড়া দেয় নি—শিশিরের মতো বিরল-রূপ, শিশিরের মতো স্বল্পায়ু এই শিশিরের ঋতুই জীবনানন্দের মন কেড়ে নিল, আমৃত্যু এই ঋতুটির রূপ-রস-রঙ ছুঁয়ে-ছেনে তাঁর তৃপ্তি হলো না, ক্লান্তি এলো না। আমরা যারা বাংলাদেশে জন্মে প্রকৃতির নিবিড় ছোঁয়ায় বুক ভরেছি, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, বসন্তের আকাশ-পৃথিবী, শরতের জল-বাতাসের বর্ণে গন্ধে মন রাঙিয়েছি—আমরাও কি হেমন্তের রূপ দেখেছি? বসন্তের আলোর ঘুঙুর, গ্রীষ্মের হাওয়ার হাহা, বর্ষার বনের মাদল, শরতের কাশের হাসি, শীতের তারার কাঁপন আমাদের মনের দুয়ারে জানান দিয়ে হাঁটে। এদের কোলাহলের ভিড়ে হেমন্ত এমন লাজুক ছেলের মতো চুপি-সাড়ে দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায় যে তার মুখ চিনি নি আজও। সেই হেমন্তকেই জীবনানন্দ বন্দী করেছেন অসংখ্য ছবির অ্যালবামে। শব্দ-গন্ধময় সেই সব ছবির দিকে তাকিয়ে আমাদের চমকে উঠে আবিষ্কার করতে হয় এক পরিচিততম মুখের আদল—যা কোনোদিন দেখেও দেখিনি। ভাবিনি, এই শিশিরের মতো স্বচ্ছ রূপেই বিম্বিত হলে পৃথিবীর শ্যামলিমা মরকত হয়ে ওঠে, সূর্যের আলো ছড়ায় হীরকের দ্যুতি, আকাশের নীলিমা আনে ইন্দ্রনীলের আভা, ঊষার মেঘের গোলাপী বিভাই দেয় পদ্মরাগের কান্তি, রাত্রির তারার তিমির তাই হয় চোখের মণির মতো টলটলে কালো।

হেমন্তের এই রূপ, এই রূপের বিচিত্র মাদকতা জীবনানন্দই প্রথম আবিষ্কার করলেন। প্রকৃতিতে যে রূপের বৈচিত্র্য—ইন্দ্রিয়ানুভবেই তার স্বীকৃতি। তার মধ্যে বর্ষার প্রকাশই সবচেয়ে স্থূল—আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সে তার কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে চলে। সবচেয়ে ভোঁতা মংনুষও তাকে এড়িয়ে থাকতে পারে না। ঋতুর বাসরে সবচেয়ে সূক্ষ্ম সংবেদনা হেমন্তের। বর্ষার রূপে, বসন্তের সৌন্দর্যে মাতোয়ারা কবি দেশে দেশে কালে কালে সংখ্যাতীত, কিন্তু শরতের মাধুরী মন মাতালো কজনের? হেমন্তের আরও কম—নেই-ই বলা চলে। শরতের মহৎ কবি আছেন ইংরাজীতে কীট্‌স্, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ। কীট্‌স্ বেশি লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথেরও শরতের কবিতা অঙ্গুলিমেয়। আর জীবনানন্দ শুধু হেমন্তের কবিতা লিখলেন, হেমন্তের কবিতা ছাড়া আর প্রায় কিছুই লিখলেন না।

শুধু তাই নয়—এই একটি ঋতুই তাঁর হাতে কত রূপে ধরা দিল। হেমন্তের রূপের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের মিশ্রণ আছে। এ একাধারে ফসল ও ফাঁকামাঠ, পূর্ণতা ও রিক্ততা, জীবন ও মৃত্যুর ঋতু। তাঁর কবিতার সূচনা থেকেই হেমন্তকে কবি কতরূপে চিনলেন, চেনালেন। 'ঝরাপালক'-এ অন্য সব ঋতুর সঙ্গে হেমন্ত আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলো— অতি সাধারণ তার রূপ। 'হেমন্তের হিমঘাস' আর 'ঝর ঝর কামিনীর ব্যথার শিয়র' তার বাইরের ছবিটাই ফুটিয়েছিল। কিন্তু তারই পাশাপাশি সে গ্রন্থেই ছিল তার অন্তরঙ্গ রূপ। 'আলেয়া' কবিতায় হেমন্ত শীতলতার, নির্জনতার, পরিত্যক্ত কালের প্রতীক। 'পিরামিড' কবিতায় হেমন্তই আবার মৃত্যুর, বিচ্ছেদের, ব্যথার লগ্ন—

মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা-ঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি
অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি'
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু ;

: পিরামিড

হেমন্তের শিশির-সিক্ততায় বিচ্ছেদ ব্যথাতুর হৃদয়ের আহ্বানও শুনেছেন কবি—

মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা—তোমার ;
ডেকেছিলো ভিজে ঘাস,—হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড়!

: সেদিন এ-ধরণীর

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে এই বিষণ্ণ বিচ্ছেদের ঋতুই হয়ে উঠেছে প্রত্যাসন্ন ফসলের কাল।

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই, —রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে!

: অবসরের গান

শব্দের আশ্চর্য ব্যঞ্জনা, রূপের এমন বিস্ময়কর আধিকারিক প্রয়োগ সত্ত্বেও কোনো কোনো রুচিবাগীশ সাহিত্য-রসিকের এই অংশটি মনঃপূত হয়নি। 'বিয়োবার' শব্দটাই তাঁদের বিরাগের কারণ। সন্তান-সম্ভবা নারীর রূপের মধ্যে যে আশ্চর্য মর্যাদা ও সৌন্দর্য রয়েছে তা মহাকবি কালিদাস জানতেন বলেই রঘুবংশ কাব্যে গর্ভিণী সুদক্ষিণার রূপের বর্ণনায় ইতস্তত করেন নি, রসজ্ঞ পণ্ডিতেরাও তা অনুমোদন করেছেন। কিন্তু একালের সমালোচকদের দুর্ভাগ্যবশত সেই ঔদার্য বা কল্পনাশক্তি দেখা গেল না, বোঝা গেল শব্দের শ্লীলতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ফরাসী চিত্রবিচারক রাজার মতোই আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে।

হেমন্তের পরিপূর্ণ ফসলের সৌন্দর্যের সঙ্গে ওতপ্রোত অলস ক্লান্তির রূপ এই কবিতাতেই রয়েছে—

হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে,—
দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে।

: অবসরের গান

কখনো ফসল উঠে যাওয়া শূন্য মাঠের দৃশ্য—
প্রথম ফসল গেছে ঘরে,—
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে—
শুধু শিশিরের জল ;

: পেঁচা

এমন খণ্ড খণ্ড ছবিই শুধু বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো আছে তা নয়, অনেক কবিতাতেই হেমন্তের বিষণ্ণ বেদনাতুর পরিপূর্ণ রূপ এঁকেছেন। আমরা বিশেষ করে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি একবার সম্পূর্ণ পড়তে বলবো।

'বনলতা সেন' বইটিতে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের বেদনা আর বিগত প্রেমের স্মৃতির মন্থনে হেমন্ত করুণ হয়ে উঠেছে।

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয় প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে :
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

: দুজন

জীবনে হেমন্তের অভিসঞ্চার প্রকৃতির মতোই এক পরিব্যাপ্ত নিয়মের ফল, এ যেমন কবি এখানে বুঝেছেন, তেমনই অন্যত্র অনুভব করেছেন প্রকৃতিতে হেমন্তের আবির্ভাবের মতো আমাদের হৃদয়েও হেমন্তের আস্বাদ পাওয়া যায় কখনো কখনো :—

অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে ;
এ সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ;

অঘ্রাণ প্রান্তরে

সেই মনসিজ হেমন্তের বেদনা, ক্লান্ত-প্রশান্ত-নির্লিপ্ত বেদনা, করুণ সুরের আবেশে এ সব কবিতায় জড়িয়ে আছে।

'মহাপৃথিবী'র একটি কবিতায় ফলবান হেমন্ত জীবনের আস্বাদের প্রতীক হয়েছিল। জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—

তোমার অসহ্য বোধ হ'লো ;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো?

: আট বছর আগের একদিন

মানুষের চেতনায় একই ঋতু নানা সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। কবির কাছে সুপক্ক যবের ঘ্রাণ মাখা হেমন্ত যখন জীবন বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে চিত্তকে তখন অন্য কেউ যে এই পরিবেশকেই অসহনীয় মনে করে মৃত্যুকামনা করতে সক্রিয় হবে—এটা বিস্ময়কর ; কিন্তু এটাও সত্য। এখানেই জীবনের রহস্য। সেই রহস্যের উপলব্ধি এখানে এই অনবদ্য কবিতার জন্ম দিয়েছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পাখিরা' কবিতায় শীতার্ত পাখিগুলি যখন তীরে এসে পৌঁছালো তখন কবি 'বসন্তের রাতে' জেগে রয়েছেন। হেমন্ত হঠাৎ বসন্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

'সাতটি তারার তিমির'-এ হেমন্তের ব্যবহার আরও সংহত, আরো প্রতীকী। সারা কবিতা জুড়ে আর তার স্থিতি নেই—দু-একটি পংক্তির মধ্যে কোনো বিশেষ অবস্থা ব্যক্ত করতেই তার প্রয়োগ। কোথাও বা হেমন্ত জীবনের পরিশিষ্ট ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলির প্রতীক—

এই সেই সঙ্কল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ ক'রে ফেলে চায়ের ভিতরে ;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।

· সোনালি সিংহের গল্প

কোথাও সঞ্চিত ফসলের প্রতীক—
হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়;

: নাবিকী

এইভাবে একই ঋতুকে আমাদের অরণ্য ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীবন, জন্ম ও মৃত্যুর অসংখ্য মূর্তির মধ্যে অক্ষয় করে আমাদের হাতে তিনি দিয়ে গেলেন। আমরা অন্তহীন বিস্ময়ে সেই ঋতুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

প্রসঙ্গ

অধুনা যাঁরা কবিতা লেখেন জীবনানন্দের কবিতা তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখতে হবে। দেখতে হবে আধুনিক কবিতার অসংখ্য দুর্বলতা প্রথাসক্তি, দীনতা ও তুচ্ছতা অবলীলায় অতিক্রম করে তিনি কেমন সবল স্বাধীন, নিবিড় ও ঋজু হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের কোনো নূতন দিক আধুনিকেরা. দেখতে পাই না, দেখতে ভয় পাই। ছন্দে একটু মোচড় কষে, ভাবের উপর একটু চকচকে করে বুরুশ ঘষে ভাবি যথেষ্ট কারিকুরি হলো। কিন্তু জীবনানন্দের দিকে যখন তাকাই নিজের অকৃতার্থতা অন্তত আত্মার কাছে গোপন থাকে না।

অথচ দেখবার চোখ থাকলে কতো নতুন আলো জগৎকে রাঙিয়ে দিয়ে যায় তাঁর কবিতায় তার নানান প্রমাণ পাবো। তবু, তার পরেও আমরা হাল ফ্যাশনের কবিতা লিখবো—ষ্টাইল গড়ে তুলতে পারবো না।

ধরা যাক্ এই প্রকৃতির কথাই — এই ফুল ফল, গাছপালা, পাখি, পোকা, জীবজন্তু তাঁর কবিতা থেকে এদেরই একটা তালিকা করা গেলে, — বিলেতী আলোচনায় এমন তালিকা করার রেওয়াজ আছে—তাচ্ছিল্যের ব্যাপারে নয় সেটা, — এমন একটা নূতন

জগতে গিয়ে পৌঁছাবো বাংলা কবিতা আগে কখনো সেখানে এসে দাঁড়ায়নি। আমরা তো প্রকৃতিকে কখনো কবিতাতে ঢুকতে দিইনি,—আদিম অরণ্যের বদলে একটা শৌখিন বাগান গড়েছি সেখানে। জীবনে আমরা বর্ণভেদ মানি। কবিতাতেও বন্য অন্ত্যজদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। ভেবেছি গোলাপ-চামেলি, ময়না-বুলবুলির জগতে ওদের ঢুকতে দিলে কোলাহলে কি কবিতা থাকবে? কবিতা যে বিষয়ের গৌরবে নয়— অভিব্যক্তিতে, এ বোধ কিছুতেই হলো না। জীবনানন্দের লেখায় সেই উদ্যানের বাইরে এসে দাঁড়াতে হলো; ব্রহ্মার বিস্ময় নিয়ে দেখতে হলো—

> একদিন কোনো এক আঞ্জির গাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
> সোনালি সবুজ এক ডোরাকাটা রাক্ষুসে মাকড়কে আমি
> একটি মিহিন সুতো নিয়ে দুলে নির্জন বাতাসে
> দেখেছি স্বর্গের থেকে পৃথিবীর দিকে এল নেমে,
> পৃথিবীর থেকে ক্রমে চ'লে গেল নরকের পানে ;
> হয়তো সে ঊর্ণনাভ নয়,
> অগস্তের মতো নানা আয়ুর সন্ধানে
> চোখে তার লেগেছিল ব্রহ্মার বিস্ময়।

: ইতিবৃত্ত

আঞ্জির গাছের ডালে ঝুলন্ত ডোরাকাটা মাকড়ও কবিতা হলো—কবিত্ব এতটুকু ক্ষুন্ন হলো না। দেখলাম গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, করবী, রজনীগন্ধা, কামিনী, যুথিকা, মধুমালতী, কদম, অতসী, মোতিয়া, অপরাজিতা, পদ্ম, বেলকুঁড়ি, চাঁপা, ভুঁইচাপা, কাঁঠালি চাঁপা অশোক, পলাশ, ডালিম, এলাচি, নার্গিস, হেলিওট্রোপ, ক্যানা ফুলের পাশাপাশি মোরগ, ভেরেণ্ডা, কেয়া, সজিনা, আনারস, বাবলা, পিয়াল, আপেলের ফুল, শশাফুল, নারিকেল ফুল, ভাটফুল, দ্রোণফুল, মচকা, আকন্দ, মরা শিউলি আর কলমীফুল মিলে মিশে রইল। অভিজাত অনভিজাত কাউকেই দূরে ঠেলা হলো না।

বাস্তবিক, কবিতার পুরানো কর্ষিত বাগানটিকে উচ্ছেদ করলেন না কবি, তার সঙ্গে একটা বিশাল আরণ্য-ভূখণ্ড জুড়ে দিলেন। তাই গাছের মধ্যে হিজল, আমলকী, বট, পলাশ, আম, কাঁটাল, নিম, মহানিম, জাম, হরিতকী, শাল, পিয়াল, তমাল, পিয়াশাল, শিরীষ, সুন্দরী, জলপাই, অর্জুন, অশ্বত্থ, তেঁতুল, জামরুল, বাতাবী, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, ঝাউ, দেবদারু, টার্পিন, মেহগিনি, অলিভ, মার্টিল, ইউ, উইলো, পাম, দারুচিনি, এলাচি, আঙুর, সরো প্রভৃতি গাছের সঙ্গে জারুল, নোনা, ক্ষীরুই, ফলসা, কদম, পেয়ারা, নারকেল, খেজুর, বাবলা, শাঁইবাবলা, আশশ্যাওড়া, ফণীমনসা, জামির, হোগলা, শর, শেয়ালকাঁটা, বঁইচি, গুপুরি, জিউলি, গাব, পিপুল, চালতা, ডুমুর, সজনে, মাদার, বাঁশ, বেত, পাট, আকন্দ, ধু-ধুল, মাকাল, বাসক, বকুল, অপরাজিতা, কলমশাক, উলুবন, পানবন, পেঁপে, কলা, শিমলতা, নটেগাছ, হেলেঞ্চা, পদ্ম, শেওলা, পরথুপি, পানা, ভাট, তৃণ, মধুকূপী, মুথাঘাস, খড়, নাড়া—সব এসে গেল।

কবিতার মধ্যে হাটজমালো নোনা, কুল, করমচা, কচি তালশাঁস, আতাফল, লিচু, ডাঁশা আম, আমলকী, জামরুল, কামরাঙা, আপেল, দালিম, জলপাই, কমলা লেবু। সেই সঙ্গে হাজির হলো কাঁটাবহরের ফল, নাটাফল, বেতফল, ঝাউফল, নীবার, মহুয়া, ধুতুরা, শিম, সরিষা, তিসি, টম্যাটো, লাল বটফল, নষ্ট শাদা শশা, সবুজ সিঙ্গাড়া, চিনাবাদাম, পচা চালকুমড়া, দারুচিনি ছাল এমন কি তরমুজ মদ আর লুপ্ত নাসপাতির গন্ধও চলে এলো কবিতার আসরে। হেমন্তের ভাঁড়ার খুলে ছড়িয়ে পড়লো অজস্র বাসমতী চাল, ধানের গন্ধ ; গোধূম, যব, মটর, মৌরি, আর রাইসর্ষের অমেয় সৌরভ।

পাখি এলে ; কোকিল, খঞ্জনা, দোয়েল, কাকাতুয়া, তোতা পাখি, ফিঙে, টুনটুনি, বক, বুলবুলি, হরিয়াল, হীরামন, শ্যামা, চড়ুই, ঘুঘু, ময়ূর, চাতক, পাপিয়া, তারুই, মনিয়া, নীলকণ্ঠ, সারস, রাজহাঁসই শুধু নয়, পেঁচা এলো, লক্ষ্মীপেচা, চিল, গাঙচিল, সিন্ধু সারস, মরাল, সুদর্শন, শঙ্খচিল, শালিক, গাঙ্শালিক, হাঁস, বালিহাঁস, কাক, দাঁড়কাক, পায়রা, জলপায়রা, ডাহুক, চকোর, জলপিপি, মাছরাঙা, কোরালি, চামচিকা, শকুন, নিমপাখি, গৃধিনী, বাদুড়, শ্যেন এমন কি ডোডোপাখি অবধি কিছুই বাদ পড়লো না।

যেন এক নূতন জগতের দরজা খুললো। অথবা কবিতার সেই আজগুবী সংকীর্ণ জগৎ যেন আমাদের চেনাজানা পৃথিবীর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। কবিতার সোনার তরীতে এতকাল বাছাই করা সোনার ধানই শুধু ধরে আর কিছুরই 'ঠাঁই নেই' এই জানতাম। এখানে 'আছে আছে স্থান' শুনে উঠে এসে দেখি নোয়ার নূতন নৌকায় সবাই 'বসিয়া আছে আগে ভাগে উঠি নিশ্চিন্ত নীরবে'। 'তুই হেথা কেন ওরে?'—এ প্রশ্নে তারা হটবে না। কেননা উটকো রবাহুত তো কেউ নয়, নিজের জায়গাতেই তারা এসেছে। ছাগল, রামছাগল, ভেড়া, ইঁদুর, বেজি, কুকুর, বিড়াল, গাধা, গরু, বলদ, ঘোড়া, বানর রয়েছে। খরগোস, সজারু, খচ্চর, গাড়ল, শুয়োর, হরিণ, চিতলহরিণ, নীলগাই, উট, শম্বর, শেয়াল, ফেরু, বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, বেবুন, গরিলা এমনকি ঘাইহরিণী অবধি আছে। ম্যামথ আছে, ডাইনোসুর আছে। জোনাকি রয়েছে, বোলতা, ভীমরুল রয়েছে, গুবরে, ভোমরা, কাঁচপোকা, পিঁপড়ে, মৌমাছি, ঝিঁ ঝিঁ, সাপমাসী, ফড়িং, গঙ্গাফড়িং, মাছি, নীলমাছি, মশা, রাতচরা ডাঁশ, পঙ্গপাল, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, দেয়ালী পোকা সব রয়েছে। মাকড় তো আগেই দেখেছি। আদিম জীবানু অ্যামিবা থেকে শুরু করে, কৃমি, চুলের এঁটিলি, শামুক, গুগলি, ব্যাঙ, কাঁকড়া, সরীসৃপ, কুমির, বৃশ্চিক, গোক্ষুর, কেউটে, শঙ্খচূড় সাপ আছে। বাটামাছ, চাঁদা, সরপুঁটি, চিতল, চুনোমাছ, ট্যাংরা, শফরী, পমফ্রেট, হাঙ্গর থেকে তিমি অবধি এসেছে। ভাঙা ডিম, মাকড়ের ছেঁড়া জাল, প্রবাল, হাতির দাঁত, সাপের খোলস, ঘোটকীর লেজ, মৃগনাভি, সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি, চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল; কি আছে, কি নেই?

জীবনানন্দের এই আরণ্য জগতের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যকে'র অরণ্য-সম্পদের আশ্চর্য মিল আছে। সেখানেও এমনই অনভিজাত প্রকৃতি এমন মর্যাদার আসন পেয়েছিল। চোখের ঠুলি খসিয়ে তিনিও জীবনানন্দের মতোই এই বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে নেমে গিয়ে তাকে ভালবেসে ছিলেন। তাঁদের মিল তাই সমধর্মী বস্তুদৃষ্টির মিল। সাহিত্যের চৌহদ্দীর বাইরে যে সত্যিকারের বনকান্তার

তা বাংলার গ্রামে প্রান্তরেও যেমন বিহারের অরণ্য খণ্ডেও তেমনই। সেই পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে রইল বিভূতিভূষণের উপন্যাসে, জীবনানন্দের কবিতায়। তাঁদের কাছেই আমরা নূতন করে শিখলাম প্রকৃতি আর সাহিত্য দুটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নয়— প্রকৃতির সবুজ সতেজ শ্যামলতা যতই সাহিত্যের বিবর্ণ বিশুষ্ক পাতাগুলো বদলে দিতে পারবে সাহিত্য ততই সতেজ সমৃদ্ধ প্রাণবান হয়ে উঠবে।

আলো

ইম্প্রেশানিষ্ট শিল্পী এদুয়ের মানে বলতেন, তাঁর ছবিতে আলোই প্রধান ব্যক্তি। নিজের কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দও একথা বলতে পারতেন। তাঁর কবিতা শুধু 'চিত্ররূপময়' তাই নয়, ইম্প্রেশানিষ্ট শিল্পীর মতো আলোর রহস্যময় খেলা এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখবার।

নিসর্গ দৃশ্যমাত্রেই আলোর একটি স্থান আছে। ভোর, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, চাঁদনী বা আঁধার রাত, মেঘলা বা বর্ষণ-মেদুর দিন—আলোক সম্পাতে দৃশ্যকে নানারূপ প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। ইম্প্রেশানিষ্ট শিল্পীরা দৃশ্যকে পূর্ণাঙ্গ করতে আলো আঁকেন নি—আলোকেই বর্ণনীয় করে তুলতে দৃশ্য এঁকেছেন, যেমন ক্লোদ মনে একই দৃশ্য বারবার আঁকতেন শুধু সময়ের অনুযায়ী আলোর বৈচিত্র্য বোঝাতে।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিটি নিসর্গ দৃশ্যে নানা সময়ের আলোর বর্ণনাই শুধু নেই, আলোর বিন্যাসে দিন-রাত্রির রৌদ্র-জ্যোৎস্নার ক্রমিক অবস্থান্তর ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'হাঁস' কবিতায় সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যার নদীর ছবি আশ্চর্য আলোমাখা হয়ে আছে। ভোরে তার জলপাই পল্লবেব মতো স্নিগ্ধ জল, দিনমানে জলের গভীরে শাদা মেঘ, লঘুমেঘের ডুবে যাওয়া, বিকেলে অনেক সময় স্থির থেকে হেমন্তের জল নীল আকাশ বলে প্রতিপন্ন হলো আবার অপরাহ্ণে খইয়ের রঙের মতো রোদের ঝিলিক ঝরে পড়লো—সব মিলিয়ে আলোর মায়াই দেখতে হবে।

তবু তাঁর কবিতায় আলোর ভূমিকা এতটুকু হলে উল্লেখযোগ্য হতো না। আরো বড়ো কথা, নিসর্গের আলো ছাড়াও আরো এক মনোভাব আলোর দ্যুতি সেখানে জাদুর মতো কাজ করে যায়, 'আলো'-এই শব্দটি জীবনানন্দের কবিতায় যে মরমী তাৎপর্য বহন করে তার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। সেখানে আলো হচ্ছে নির্মল সভ্যতার প্রতীক একটি তত্ত্ববহ শব্দ-শরীর। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে, এখানে আলো বলতে আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবের কথাই বলছি, যদিও তা নৈসর্গিক নয়, মনোময়।

আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকেল বেলার ধূসরতা ;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির :
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ;

· মৃত্যুর আগে

চোখের দেখার হাত ছাড়িয়ে এই যে আলো ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়, সেই চেতনার আলোর কথাই আমরা বলছিলাম। উল্লাস, বিষণ্ণতা, খুশি, শোক, অথবা উদ্যমের আবহ গড়তে কবিতায় আলোকেই সাঙ্কেতিক ভাবে উজ্জ্বল, ম্লান, তীব্র, স্তিমিত, ফিকে অথবা গাঢ় করে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। এই ভাবেই আলোর ব্যঞ্জনায় কবির অভিপ্রায় কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আর এই চেতনার আলো যখন জ্বলেছে সেই আলোর উজ্জ্বল অভিঘাতে মনে হয়েছে 'অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো।' নিসর্গের আলোকে অতিক্রম করে অন্তরের আলোয় তাকে উদ্দীপিত করে তোলা—এই প্রবুদ্ধ নৈপুণ্যের শিল্প-তাৎপর্য যিনি বোঝেন—তাঁর অন্তরের অকুণ্ঠ সাধুবাদ কবির প্রাপ্য।

জীবনানন্দের কবিতার এই স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তিনিই দেখিয়েছেন কিভাবে 'মাঠের গল্প', 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা' ইত্যাদি কবিতায় আলোর ম্লান ছায়াঘন কুয়াশার পর্দা ঝুলে আছে। অথবা 'অবসরের গান,' 'ঘাস,' 'শিকার', 'সিন্ধুসারস'—আলোর যেখানে প্রবল উজ্জ্বল অবয়ব ; কিংবা সেই সব কবিতা যেখানে দিনের থেকে রাতে অথবা রাত থেকে দিনে পৌঁছে কবিতার সমাপ্তি, যেখানে রাতের কবিতায় দিনের উজ্জ্বলতা—দিনের কবিতায় রাতের ম্লানিমা। 'হাওয়ার রাত' অথবা 'অন্ধকারে'র মতো কবিতা—

"যেখানে তারা ভরা অন্ধকারের কথা বলতে বলতে কবির হৃদয় দিগন্ত প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে ভরে যায় যেখানে অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে কবি হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী। ভাবছিলাম নগ্ন নির্জন হাতের বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে—তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকারে, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায় চিল'-এ দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাতে'র অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠলো।"

: কালের পুতুল

বুদ্ধদেব বসু স্পষ্টই লক্ষ্য করেছেন এসব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, এগুলি কবির ভাবনার বেদনারই প্রতিফলন। আবার 'মৃত্যুর আগে'র মতো কবিতাও রয়েছে, স্বপ্রতিষ্ঠ ছবির কবিতা, যেখানে

"হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি যদিও একবার দেখা যায় আর ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ভোর বেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই। পড়তে পড়তে আমাদের মন বারে বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হয়ে আসে।"

ইন্দ্রিয়-চেতনা

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে শারীরিক। বাস্তবিক, তাঁর কবিতার অমেয় আকর্ষণের উৎস, তাঁর তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়-চেতনা। বাঙালী কবিদের মধ্যে এক্ষেত্রে তিনি এতই অনন্য বিশিষ্টতাময় যে এই দৃষ্টিকোণে যে কবিতার আলোচনার কোন সূত্র থাকতে পারে, তাঁর আবির্ভাবের আগে এদেশী কাব্যরসিকেরা তা ভেবে দেখেন নি।

আমাদের ইন্দ্রিয় বোধের এমন মূঢ়তা আছে যে বস্তুর সংস্পর্শে এসেও আমরা সব ইন্দ্রিয় দিয়ে সম্পূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করি না। কবিদেরও প্রায়ই দেখা যায় এক অনুভূতির তীব্রতায় অন্য অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ কবিই মুখ্যত দু-একটি ইন্দ্রিয়-রসিক কবি। সুইনবর্ণের কবিতায় শুধু কান দিয়ে চেনা পৃথিবীকে পাই। রসেটির কবিতায় রূপের আল্পনা। কীটসের কাব্যে পৃথিবীর বর্ণ-গন্ধময় প্রকৃতির উদঘাটন—যদিও রসের ভোজে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আমন্ত্রণ সেখানে অবারিত, রবীন্দ্র কাব্যে প্রধানত ছবি ও গানের অত্যাশ্চর্য সমাহার। জীবনানন্দের কবিতায় সবচেয়ে বিস্ময়সূচক শৈলী হলো ইন্দ্রিয়সাধনার সর্বমুখী সূক্ষ্ম মার্জিত অনুশীলন। রৌদ্রের রূঢ়তা, ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের চেতনায় আসে না, শিশিরের শব্দ অথবা নক্ষত্রের জ্যোৎস্নাও জীবনানন্দের অনুভবে সাড়া জাগায়।

তারপর ঘাসের ভিতর
শাদা শাদা ধুলোগুলো পড়ে আছে, দেখা যায় ; খইধান দেখি একরাশি
ছড়ায়ে রয়েছে চুপে : নরম বিষণ্ণ গন্ধ পুকুরের জল থেকে উঠিতেছে ভাসি ;
কান পেতে থাকো যদি—শোনা যায় সরপুঁটি চিতলের উদ্ভাসিত স্বর
মীনকন্যাদের মতো ; সবুজ জলের ফাঁকে তাদের পাতালপুরী ঘর
দেখা যায়—রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ—রুপালি মাছের দেহ গভীর উদাসী

: ঘাসেব ভিতরে যেই

সবুজ ঘাসের মধ্যে ধুলোর শাদা রং, চিত্রের স্তব্ধতা, পুকুরের জলের গন্ধের কোমলতা ও বিষণ্ণতা, মাছের উল্লসিত কণ্ঠস্বরের ধ্বনি সবুজ জলের মধ্যে তাদের রহস্যময় রৌপ্যোজ্জ্বল সঞ্চরণ, সব কিছুই কবির চেতনায় এবং সমৃদ্ধকল্পনায় মৃদু মৃদু অভিঘাত তুলেছে। এই সহজ অনুভবের কথা, রঙ-দেখা-গন্ধ স্পর্শ-স্বাদের পৃথিবীকে এমন একান্ত করে ছুঁয়ে থাকার পরিচয়, বাংলার প্রকৃতিকে এত নিবিড় ভাবে পাওয়া, আর কোনো কবির ক্ষেত্রে এত স্বভাব সত্য নয়। তাঁর হাতে প্রকৃতি যত পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ফোটে, যে রঙের রসের ভোজে আমাদের মন মাতাল হয়ে ওঠে তেমনটি আর কোথায় মিলবে? এই শক্তি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সজাগ বলেই কোনো বর্ণনা, কোনো ভাবনা প্রকৃতিকে সংলগ্ন না করে তিনি করেন না। এ সত্য এত পরিজ্ঞাত যে উদ্ধৃতি দিয়ে আক্রান্ত করবো না

প্রবন্ধ-শরীর ; শুধু প্রকৃতি চিত্রের মদির আনন্দরস কবির চেতনায় কি নিবিড় হয়ে আসে তার একটি দৃষ্টান্ত তুলবো—

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুল্‌বুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙক্ষায় নেমে আসে ;

· মৃত্যুর আগে

এই আশ্চর্য শারীর অনুভবে পাশে দাঁড় করানো যায় এমন কবি বাংলায় নেই। জীবনকে এমন সহজ ইন্দ্রিয় বোধের মধ্যে পেয়েছিলেন ইংরেজ কবি ইয়েটস্‌। আর এটি এতোই দুর্লভ প্রাপ্তি, সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভবের মধ্যে এমন সজাগ সমতা রাখতে পারা এত দুঃসাধ্য, যে ইংরেজী কবিতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে, তাঁকে প্রায় নিঃসঙ্গ মনে হয়। 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান'—এউক্তি জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য তেমন আর কোনো কবি সম্পর্কে নয়। অথবা এই মন্তব্যকে একটু শোধন করে বলা উচিত এর সমতুল ইন্দ্রিয় ঐশ্বর্য যদি বাংলা সাহিত্যের কোনো প্রকৃতি চিত্রের মধ্যে থাকে তবে তা কোনো কবিতায় নয়, অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যের ক্বচিৎ কোনো বর্ণনায় অথবা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র গ্রাম্য পাঠশালার রূপচিত্রণে আর 'আরণ্যকে'র ইতস্তত খণ্ডাংশগুলিতে। এইভাবে এঁদের সঙ্গে সমকক্ষতার পরিচয় দিয়েও এক জায়গায় জীবনানন্দ এঁদের ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন। বস্তু ও কল্পনা, রূপ ও রূপকথার অন্তহীন সঞ্চরণ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ পাড়ি জমান সহজেই। আর বস্তু জগতের সীমা পেরিয়ে বিভূতিভূষণ আশ্রয় নেন অলৌকিকতার। কিন্তু সেই বল্গাহারা স্বপ্নের হাতছানি অথবা অতীন্দ্রিয়ের আকর্ষণে পথ না হারিয়েও জীবনানন্দ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমেই বস্তুর অতীত লোকে আমাদের পৌঁছে দিতে পেরেছেন। মাঠ ছেড়ে চাঁদের আহ্বানে ডানায় সাঁই সাঁই শব্দ তুলে যে অজস্র অপার বুনো হাঁস উড়ে

যায়, কবি লক্ষ্য করেছেন—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ছাড়া
এঞ্জিনের মত শব্দে ; ছুটিতেছে — ছুটিতেছে তারা।
তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ — দু-একটা কল্পনার হাঁস,

: বুনো হাঁস

পৃথিবীর হাঁস উড়ে যায়—রূপ হারিয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়ের শব্দ-হীন জ্যোৎস্নায় একঝাঁক কল্পনার হাঁস অম্লান ভাস্বর হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ানুভবের এই অন্তহীন আনন্দলোকেই সব পার্থিব সৌন্দর্যের শেষ উত্তরণ।

প্রতীক ও বাক্‌প্রতিমা

বোধি

বিপরীতগামী দুটি শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে এক জায়গায় গভীর নৈঃশব্দ্য থাকে, বিপরীত দুটি আলোক-তরঙ্গের মধ্যে এক জায়গায় বিরাজ করে নিরন্ধ্র অন্ধকার। খোলা কানে, খালি চোখে আমরা তা অনুভব করতে পারি না বলেই তা নেই এমন নয়। এক আলোক-ক্ষেত্র অতিক্রম করে অন্য একটি আলোক-ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে গেলে অনিবার্যভাবে আমাদের সেই সূক্ষ্ম তিমির-স্তরটি অতিক্রম করতে হয়।

সাধারণ কবিতা ও জীবনানন্দের কবিতার মধ্যেও এমন এক আপাত দুর্লক্ষ্য ব্যবধান আছে। সেই অন্তর্বর্তী-তিমির স্তরটি যদি আমরা উদঘাটন করতে না পারি, জীবনানন্দের কবি প্রকৃতিও আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে না। এই প্রবন্ধে আমরা সেই প্রয়াসেই ব্রতী হবো।

জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতায় হৃদয়ানুভূতি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার সমধিক এমন কথা বলা হয়ে থাকে। বস্তুত যে জাতীয় কবিতা প্রসঙ্গে সাধারণত এই উক্তি করা হয় তাকে ঠিক বুদ্ধিবৃত্তির কবিতা বলা চলে না। ইতিপূর্বে অন্যত্র তাঁর কবিতা আলোচনা ক্রমে 'বোধি'র উল্লেখ করেছিলাম। জীবন সম্পর্কে এক অখণ্ড বোধ মানুষের যখন জাগে তখন গভীর অনুভবশীল চিত্তের হৃদয়াবেগ তার নিবিড় সংশ্লেষে এক প্রত্যয়ে রূপায়িত হয়। এখানে 'প্রত্যয়' শব্দটি, বলা বাহুল্য, এক নিগূঢ় অর্থ বহন করছে। সৃষ্টি রহস্যের যে গোপন প্রত্যয়ে সৃষ্টি উপাদানসমূহ কেন্দ্র করে স্রষ্টার সমগ্র পুরুষীয় সত্তার উদ্বোধন ঘটে এবং এক নিবিড় রসচেতনায় বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত উপাদান অন্বিত হয়—স্রষ্টা-মানসের সেই গভীর গোপন অথচ ক্ষণিক অনুভবটি এখানে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ক্ষণিক এই অর্থে, যে সার্থক সৃষ্টির লগ্নেই এই সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় অনুভূত হয়—অন্যকালে না হতেও পারে। এই প্রত্যয়কেই এখানে বোধি বলা হয়েছে। একেই জীবনানন্দ বলেছেন 'কল্পনা ও কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা।' 'কবিতার কথা'য় এই কল্পনা ঈশ্বর-প্রদত্ত নয়, সজ্ঞান মনেও একে পাওয়া যায় না। বাস্তবতার সমগ্র চেতনা ডুবে গেলে এই প্রতিভা উঠে আসে। কথাটা বোঝাবার জন্যে জীবনানন্দের ব্যঞ্জনা-গভীর ভাষাই তোলা যাক—

> 'যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্য বেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে, তাঁদের এ দাবির মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—

একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন জ্বলে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায় সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়।'

: কবিতার কথা

কবিতার সৃষ্টিলগ্নের অভিজ্ঞতার এই আশ্চর্য দুর্লভ বিবরণী এত সার্থক পরিভাষায় এখানে ব্যক্ত হয়েছে যে ব্যাখ্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যাঁরা পদ্যকার নন, যাঁরা কবি, তাঁরা কবিতায় নিজের ইচ্ছার উপর এক অন্ধ ব্যক্তিত্বের অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ অনুভব করেন। আর সেই ব্যক্তিত্ব যখন কথা বলে তখন কবিতাকে দৈববাণীর মতো মনে হয়। কবির ইচ্ছার উপর প্রতিভার সেই নিয়ন্ত্রণের কথাও এখানে নয়— এখন বলা হচ্ছে সেই ব্যক্তিত্বের কথা বলা, সেই দৈববাণী, সেই mysterious oracle-এর কথা। একেই এখানে বোধি বলা হয়েছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে হয়তো—

যদিও গভীর ভাবে সময়ের সাগর উজ্জ্বল—
কি এক নিঃশব্দ নিবিড় আবেগে তাকে কালো
দু'টি তুরঙ্গম যেন অনন্তের দিকে টেনে নেয়;
নিরন্তর এরকম অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া ভালো।

দুটি তুরঙ্গম

এই যে অভিমত, 'নিরন্তর এরকম অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া ভালো',—এ শুধু বুদ্ধির বিচার নয়,—এর পিছনে জীবনানন্দের সমগ্র মগ্ন-ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি ও বিশ্বাসের সুনিবিড় উপস্থিতি রয়েছে। দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টি থেকে এই মন্তব্যটির জন্ম হয়নি—হতে পারতো না, কারণ কবিতার সামগ্রিক অনুভবটি তত্ত্বমুখী নয়— মিস্টিক।

নিজের মধ্যে বোধির উপস্থিতি তিনি প্রথম তীব্রভাবে অনুভব করেছেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই। যদিও তার যথার্থ পরিণতি হয়েছে আরো উত্তর জীবনে—প্রায় জীবনের প্রান্তসীমায় এসে। উপরের দৃষ্টান্তটি সেই অন্তিম-পর্ব থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' কবিতায় প্রথম সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বর্ণনা। এই বোধ আমাদের স্পষ্ট চেতনার ব্যাপার নয়। মনের সংজ্ঞান ও অসংজ্ঞান সত্তার অঙ্গীকারে তার জন্ম বলেই তার অর্থ স্থূল-বুদ্ধির অগম্য। বোধি-সমন্বিত মানুষ তাই আপনাকে বুঝতে পারে না। অন্যকে বোঝাতেও পারে না। সাধারণ জীবনের স্থূল নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে আপনাকে খাপ খাওয়াতে না পেরে সে অস্থির হয়ে ওঠে। জীবনের যেখানে দুর্বোধ্যতম বিকাশ, জটিলতম গ্রন্থি—সেই প্রেম অথবা স্বপ্নও এক দূর পরম্পরা-সূত্রে গাঁথা। কিন্তু এই বোধ যাবতীয় বিশ্লেষণের অতীত, তাই

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধাঁ?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মত হয়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে,
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি? —তাহাদের মন
আমার মনের মত না কি?—
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী!

* * *

মাথা ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকবার স্বাদ
পাবে না কি?

: বোধ

এই তীব্র দুর্বোধ্য অস্বস্তি বহন করে প্রতিটি কবিপ্রাণের যাত্রা শুরু হয়। নতুবা পরিচিত জীবন-সত্য অতিক্রম করে তিনি নূতন কিছু দিতে পারেন না। সত্তার গহনে গাহন করে যখন কবি উঠে আসেন তখনই তাঁর বাণীতে সেই পবিত্র মন্ত্রগুণ থাকা সম্ভব যা আমাদের চৈতন্য অতিক্রম করে আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে।

জীবনানন্দের কবিতার এক বিশেষ পর্বে যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, মানবাত্মার নিরন্তর অপমান-অবক্ষয়ে, যখন কবি-মননে গভীর নৈরাজ্য, প্রবহমান কালক্রমের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতি নিদারুণ সন্দেহ-সঞ্জাত প্রশ্ন তুলেছে, 'একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?' সভ্যতার মর্মে যখন 'কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুনে'র অভিসঞ্চার, তখনো সেই নৈরাশ্যের ধূসরতা ছাপিয়েও তাঁর কণ্ঠে গান বেজে ওঠে—

নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে— 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়,
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

সময়ের কাছে

তখনই এই সহজ তখনই এই সহজ প্রত্যয়টিকে, প্রজ্ঞার অতীত, আশাবাদীর সামান্য বিশ্বাসের অতীত অনুভবটিকে স্পষ্ট চিনতে পারি। বুঝতে পারি কবির সজ্ঞান সত্তা যে সংক্রান্তিতে 'দলিলে না মরে তবু এরকম মৃত্যু অনুভব' করেছে, কবির অন্তর্লীন ব্যক্তিত্ব কবির বোধি ঠিক সেই মুহূর্তে, তারই পাশাপাশি নব নব সূর্যে জেগে উঠেছে।

যে দুর্ভেদ্য দেয়ালে বুদ্ধি নিরন্তর মাথা খোঁড়ে, যে অন্ধকারের ওপারে দৃষ্টি হারিয়ে যায়— ইথরের তরঙ্গের মতো বোধি সে দেয়াল অনায়াসে টপকে যায়, আকস্মিক উদ্ভাসের মতো সেই অন্ধকার অবলীলায় ছিন্ন করে দীপ্ত করে তোলে। আমরা অবাক-বিস্ময়ে ভাবি কবির কণ্ঠে এই নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয়ের সুর এই অম্লান ঘোষণার পরিভাষা এলো কি করে? কি ভাবে কবি এত সংশয়াতীত, এত নিশ্চিত, এত প্রশ্নহীন হতে পারেন?

এই রহস্যাবৃত প্রশ্নকে কবিদের দুর্লভ কোনো ঐশী বিভূতি বলে ব্যাখ্যা করা না হয় যেন। কারণ, এতদিন এইভাবে ব্যাখ্যা করেই প্রশ্নটিকে হাল্কা ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। কবিদের এই শক্তি লোকসামান্য, কিন্তু অনৈসর্গিক বা ঐশ্বরিক কিছু নয়, এ একরকম আন্তর অভিজ্ঞতা (inner experience) যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলে পুরোপুরি সচেতন না হতেও পারে। বুদ্ধিবাদীরা বিশ্লেষণশীল ও বিচক্ষণ বলেই এই শক্তিকে স্বীকার করতে লজ্জিত। কিন্তু যাঁরা এই শক্তির সততা সম্পর্কে সজ্ঞান, অথবা এই শক্তি যাদের মধ্যে প্রবল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাঁরাই শুধু কবিস্বভাব পেলে এই জাতের কাব্য রচনা করতে পারেন।

কারণ, অনেক কিছুই লেখা যায় কবিতায়—কিন্তু যা অনুভবের মধ্যে স্থিত হয়নি, প্রত্যয় হয়ে জন্ম নেয়নি, তা শব্দসঙ্গীত হয়ে বাজবে না কিছুতেই। শব্দই আমাদের কানে ভাঙা কাঁচের মতো চেরা আওয়াজ তুলে চিনিয়ে দিয়ে যাবে কোথায় সাচ্চা, কোথায় ঝুটো। নইলে আত্মার অতল থেকে যে কবিতা উঠে আসে তা যতই দুর্বোধ্য যতই অস্পষ্ট হোক—তার উচ্চারণের মধ্যে অনুভবের প্রসাদ সুর হয়ে গম্ গম্ করে বাজবেই। তার অভাব চিন্তার ব্যাপ্তিতে ভরা যায় না, সে দৈন্য কল্পনার ঐশ্বর্যে ঢাকা পড়ে না। এই আশ্চর্য শব্দমন্ত্র আছে লালন ফকিরের গানে, রামপ্রসাদী কীর্তনে, উপনিষদে, গীতায়, মীরার ভজনে, ক্বচিৎ রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে, রিল্কের কবিতার ভাষায়। জীবনানন্দের এই সব কবিতায় সেই প্রত্যয়ের স্বরগ্রাম আমরা শুনেছি। তবু একথা স্বীকার করা ভালো এই সব কবিদের মতো সেই আশ্চর্য প্রত্যয়ে জীবনানন্দের কবিসত্তার অচঞ্চল স্থিতি

হয়নি। এঁদের সৃষ্টিতে বোধির সঞ্চার সাময়িক উপলব্ধি-মাত্র নয়। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় বোধির কখনো নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠা হয়নি। সচেতন মনন আর বোধির পাশাপাশি সংস্থান অথচ বিরোধ এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখবার জিনিষ।

উপলব্ধির আলো-ছায়ায় মেশা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে আসার সন্ধ্যালগ্ন এখানে। একসুর একছত্র হয়ে ওঠেনি কখনো। ধূপছায়া শাড়ির মতো দুটি রঙের সংলগ্ন সমাবেশে বিশিষ্ট আবেদন তার। তাই জীবনানন্দের কবিতার স্বাদই আলাদা। চেতনা আর বোধির সন্নিকট সাযুজ্যে তার বিন্যাস জটিল, তবু এই জটিলতার প্রসাদেই তিনি সাধারণের নিকটগম্য ও বিশ্বাসভাজন—পূর্বোক্ত কবিদের মতো সরল অথচ সেই জন্যেই রহস্যাবৃত নন।

তবু জীবনানন্দের ব্যাপ্ত চেতনায় যা বোধির অন্তর্গত, আমাদের পরিমিত চেতনায় তা বুদ্ধিরই বিসার-ক্ষেত্র; কারণ, আমরা বোধিতে অভ্যস্ত নই। অথচ বুদ্ধির সাধ্য কি বোধির সেই দুর্জ্ঞেয় বলয়টি স্পর্শ করে। তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার তীব্র অভিযোগের এটাই হেতু। সমকালীন অন্য কবিদের সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়। তাঁরা কাব্যকে হৃদয়বৃত্তির বেড়া ভেঙে বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনেই মুক্তি দিতে চান—তাই জীবনানন্দের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য সমগোত্রীয় নয়। সেই জন্যেই জীবনানন্দের কাব্যে যে জাতের প্রতীকী কবিতা রয়েছে সে জাতের কবিতা অন্য কারো পক্ষে লেখা সম্ভব হয় নি। ইতিপূর্বে অন্যত্র 'হাওয়ার রাত' কবিতাটি আলোচিত হয়েছে। এমন আশ্চর্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তবু স্বীকার করা দরকার, এজাতীয় কবিতার ঐতিহ্য আমাদের ভাষায় আজো গড়ে ওঠেনি বলেই এর পূর্ণ মূল্য ও যোগ্য সমাদর আমরা দিইনি। ভাব যেখানে গভীর, প্রকাশ সেখানে জটিল হবেই। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সর্বজনপ্রিয়, রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক নয় ; কারণ গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা মহত্তর। বাংলা দেশে জীবনানন্দের থেকে গভীর ও জটিল বিষয় নিয়ে কবিতা সৃষ্টির দুঃসাহস কেউ করেনি। এই জটিল ভাবনার রূপ দিতে তাঁকে প্রায়শই যে সব প্রতীক এবং সঙ্কেতের আশ্রয় নিতে হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। সাঙ্কেতিক কবিতা সবদেশেই আপাত-দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। উপরন্তু এ উপলব্ধির জন্যে যে মানস প্রস্তুতির দরকার তার অভাবে এই সব আশ্চর্য কবিতার আবেদন ব্যর্থ হয়। ঐ মানস প্রস্তুতির প্রয়াস যদি আমরা না করি, তাঁকে দুর্বোধ্য জেনে যদি দূরে সরিয়ে রাখি তাহলে বিশ্ব সাহিত্যের কয়েকটি মহত্তম কবিতার আস্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবো।

কবিতা

হয়তো দেখেছেন ওজন করার আগে কিভাবে স্যাকরারা অ্যাসিড ঢেলে সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করে নেয়, আমাদেরও সেইভাবে এখন কবিতা সম্পর্কে ধারণাটুকু পুড়িয়ে নিখাদ করে নেবার দরকার হবে।

কবিতা বলতে যে ছন্দোগ্রস্ত ভাব শুধু বোঝায় না—এতো কাব্য বিচারের বর্ণ-

পরিচয়। কবিতায় ভাব অনুভূত হয়ে ওঠে, কবিতা হৃদয়ের অব্যক্ত আবেগ-স্পন্দনটুকু অনুরণিত অনুকম্পিত করে তোলে পাঠকের হৃদয়ে। হৃদয়ের এই অনুকম্পাই কবিতা। 'তবু এহ হয় আগে কহ আর'—বলে এগিয়ে এলে আরো গভীর অতলে নামতে হয়।

ভাষার উপাদান হিসাবে শব্দের দুটি অঙ্গ আছে—আওয়াজ আর অর্থ। ধ্বনি-চাতুর্যের মধ্যে যদি কবিত্ব কোথাও থাকে, আছে ধ্বন্যুক্তি এবং অনুপ্রাসে। অনুভূতিময় আবহ গড়ে তুলতে এই দুটি মাত্র শব্দালঙ্কার-ই আমাদের কাজে আসে। শ্লেষ, যমক ইত্যাদি কবিতাকে ঋদ্ধ করে না আদৌ।

অন্যদিকে অর্থ অভিধার দ্বারা সীমায়িত। অভিধার বন্ধন থেকে লক্ষণা তাকে মুক্তি দেয়—যেন ঘরের দেয়াল পেরিয়ে দোতলার বারান্দাটায়। ওই বারান্দাটুকুতেই আপনার গতিবিধি— তার বাইরে নয়। ফিরতে হলে ফিরতে হবে ঘরেই। ব্যঙ্গ বা ধ্বনি ওই অর্থের পরিধি স্বীকার করে নিয়েই আপনাকে নূতন কিছুর ইঙ্গিত দেবে যা চির পুরাতন, চির পরিচিত, চিরমোহময়, উন্মাদনায় বিভোর। অর্থের বন্ধন হাতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর— কিন্তু ভাবের গহন লোকে?—নৈব নৈব চ। শব্দের অর্থকে স্বীকার করে নিলে ভাবের পরিচিত উপরিতল থেকে গভীরে আমরা কিছুতেই নামতে পারবো না।

অথচ চিত্র-শিল্পীরা কেমন অবলীলাক্রমে পারেন। পারেন কারণ রেখার সঙ্গে, রঙের সঙ্গে ভাবের কোনো অব্যবহিত যোগ নেই। শব্দ যেমন উচ্চারণ-মাত্রই অর্থ টেনে আনে, রেখা বা রঙ তেমন ভাবকে বহন করে না। তাই সমস্ত রেখাগুলো একটা অখণ্ড পরিকল্পনার মধ্যে অন্বিত হবার আগে এবং পরেও পৃথকভাবে শিল্পীর ইচ্ছার বাইরে কোনো অর্থ দাবি করে না। অথচ যে কোনো কবিতায় প্রতিটি শব্দের স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে, কবিতার সামগ্রিক তাৎপর্য ছাপিয়েও সেই শব্দার্থ আপন অস্তিত্ব অটুট রাখবে।

উপরন্তু বৈয়াকরণিক অন্বয়ের দাবি। ব্যাকরণ একটু ভেঙেছে কি ভাঙেনি অমনি ক্ষেপা পাঠক ও সমালোচকরা তেড়ে আসবেন দুর্বোধ্যতা আর ভাষার অনাচারের অভিযোগ নিয়ে। কবিতার মানে বুঝতেই হবে এমন কি কথা? মালার্মে বলতেন Poetry is written with words, not ideas. অর্থাৎ শব্দগুলো মিলেই একটা পরিপূর্ণ ভাবদেহ গড়ে তোলা চাই, ব্যাকরণের অন্বয় না হোক ক্ষতি কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কবিতা বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্য'। হায়, যদি অর্থকে বিসর্জন দিয়ে কয়েকটি কবিতাও তিনি লিখতেন তবে তাঁর মতের চেয়ে সেই দৃষ্টান্ত অনেক বেশি জোরদার হতো।

অবশ্য প্রত্যেক কবিই যে সব রকম লিখবেন এমন কোন কথা নেই। আর রবীন্দ্রনাথ না লিখলেও এমন কবিতা যে আদৌ লেখা হয়নি তাও নয়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইংরেজ কবি ব্লেকের অনবদ্য কবিতাগুলির উল্লেখ করতে পারি। এই জাতীয় কবিতা প্রসঙ্গেই হাউসম্যানের দেওয়া কাব্যের সংজ্ঞা— Poetry is not the thing said, but the way of saying it··········Meaning is of the intellect, poetry not.— পুরোপুরি খাটে।

মালার্মের মতো কবিতাকে যাঁরা গীতধর্মী করে তুলতে চান তাঁরা আবার বিপরীত কোটিতে কবিতার বিশিষ্ট প্রকৃতি অতিক্রম করে চলেন। গানের উপাদান স্বর—যা রঙ রেখার মতোই অর্থহীন। এই অর্থ বিহীন স্বর-সমন্বয়ে অর্থবহ সুরসঙ্গতি গড়ে তোলাই

গানের কাজ। এই জন্যে যন্ত্র-সঙ্গীতও সঙ্গীত। এই জন্যে ছবির মতোই গান দেশ-কাল জাতির সীমা সহজেই লঙঘন করে যায়। কিন্তু কবিতার প্রকৃতি স্বরূপত পৃথক। কারণ আগেই বলা হয়েছে কবিতার উপাদান শব্দের দুটি অঙ্গ আছে আওয়াজ আর অর্থ। অর্থকে অস্বীকার করতে গেলে শব্দের স্বভাবচ্যুতি হয় বলেই কবিতা আপন ভাষার সীমায় বদ্ধ। নইলে স্বরলিপিও কবিতা বলে গণ্য হতো।

এই বাঁধন অতিক্রম করে নয়—এই বাঁধন মেনে নিয়েই কবিতার মুক্তি দিতে হবে। কবির মনের অনুভূতি, আবেগ, আকুতি অবিকৃত রেখে পাঠকের মনের দরবারে ঠিক ঠিক পৌঁছে দিতে হবে। সংবাদশালিতায় ত্রুটি ঘটলে চলবে না। পাঠকের মনটি প্রথমেই আকৃষ্ট করা চাই—স্পর্শ করা চাই। পাঠক অবশ্যই সংবেদনশীল, স্পর্শচেতন ও সহৃদয় হবেন,—অসহিষ্ণু অথবা প্রথানুগ পাঠক আধুনিক কবিতার পাঠক হতে পারেন না। কিন্তু মনোহরণের গুণটি কবিতাতেই থাকা দরকার।

এলিয়ট এই কথাটাই সুন্দর করে বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, কবিতার অর্থ একটু আধটু রাখা ভালো, তাই নিয়ে পাঠকের সচেতন মনটা ব্যস্ত থাকবে যেমন কুকুর ব্যস্ত থাকে চোরের দেওয়া মাংসের টুকরো নিয়ে, ওদিকে কবিতাটি পাঠকের মনের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে আপন কাজ হাসিল করবে।

যদি মেনেই নিই কবিতা এই সজাগ মনটার জন্যে নয়, তাহলে কবিতা জিনিসটা কি? তার অস্তিত্ব, তার প্রয়োজন সম্পর্কে এক বিপুল বিস্ময় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কবিতা সম্পর্কে সমস্ত পুরোনো সংস্কার ঝেড়ে ফেলে আমাদের নূতন করে ভাববার জন্যে, জানবার জন্যে তৈরি হতে হয়।

যাবতীয় সাহিত্য-প্রয়াসের মধ্যে কবিতাতেই স্রষ্টার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম। কারণ কবির সজাগ সত্তা ছাপিয়েও এখানে কবির নির্জ্ঞান সত্তা কথা বলে। একটি ভাবকে কেন্দ্র করে কেন ঐসব বিশেষ উপমা, বিশিষ্ট শব্দ, রূপ, রস, রঙ, ধ্বনি, ছন্দ আসে কেউ তা বলতে পারে না। কবিতা তাই এক হিসাবে মানুষের অবচেতনার অবয়ব। সজ্ঞান সত্তা দিয়ে তাকে অনুভব করতে যাওয়া দুরাশা। কবিতা মানুষের অবচেতনায় মগ্ন হতে ভালবাসে। কিছু বুঝি না অথচ ভালো লাগে, প্রেম ছাড়া শুধু কবিতা সম্পর্কেই মানুষ একথা বলতে পারে, কারণ এ দুই-ই মানুষের মগ্নচেতনার উর্দ্ধতন।

জীবনের এই পরিচিত চেতনার বহির্বিলয় ছেড়ে কবিতা যেখানে ডুব দিয়েছে চৈতন্যের গভীরে সেখানেই প্রতীকী কবিতার জন্ম। প্রতীকী কবিতা রূপক নয়। রূপক কবিতা সজ্ঞান মনের সৃষ্টি—একটা চতুর কাব্য-কৌশল মাত্র। তাতে দুটো অর্থ, দুটোই পরিচিত, পরিস্ফুট। কিন্তু প্রতীকী কবিতা সঙ্কেতময় ও একার্থক। বাইরের উপকরণ দিয়ে সে শুধু ইঙ্গিত করে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়— তারপর তুমি সেই রহস্যময় অবাঙ্ অনুভবের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াও. স্তব্ধ হও, বিস্মিত হও। বুঝবার চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ তা বোঝা যায় না। যা বোধাতীত, যা অস্ফুট, যা অপরিজ্ঞাত তাই প্রতীকী কবিতার বিষয়।

প্রতীক

আধুনিক বাংলা কবিতা যে ইউরোপীয় কবিতার প্রাণরসে পুষ্ট একথা অনস্বীকার্য। রোম্যান্টিক কবিতার উচ্ছ্বাস আতিশয্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসাবে ফ্রান্সে প্রতীকী কবিতার জন্ম হয়। অথচ 'পারনাসিয়ান'* কবিতার সূক্ষ্ম সংবেদনাহীন, বক্তব্য-প্রধান স্থূল প্রগাঢ়তা এঁদের কাম্য ছিল না। বরং ইংরাজী কবিতার ইঙ্গিতময়তা আকৃষ্ট করেছিল এই আন্দোলনের নেতাদের। এড্‌গার অ্যালান পোর আলোচনায় কবিতার শব্দসঙ্গীত সৃষ্টির এবং অনির্দেশ্য ইঙ্গিত-মুখরতার জয়ধ্বনি করা হয়েছিল। তাঁর কবিতায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ যেভাবে দেখা গেছে তাই আকৃষ্ট করেছিল ফরাসি প্রতীকবাদীদের।

এঁরা বলতে চাইলেন, আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা, চেতনা ও অনুভূতি, শুধু স্বতন্ত্রই নয়, প্রতি মুহূর্তে তার রূপান্তর আছে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষায় সেই তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রতিটি মুহূর্তের যে স্বতন্ত্র সুর, প্রতিটি ব্যক্তির যে প্রাতিস্বিক-চেতনা ও অনুভূতি, তাকে প্রকাশ করতে গেলে কবিকে একটি স্বকীয় পরিভাষা করে নিতে হবেই। এই অনুভূতি এত স্বতন্ত্র, এত গতিশীল, এত অস্পষ্ট, যে একে ব্যক্ত করতে গেলে শব্দ ও চিত্রকল্পের প্রবাহের মধ্য দিয়ে, প্রতীকের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করতে হয়।

এঁরা বিশ্বাস করতেন, প্রাতিভাসিক এই জগৎ—এটি বাস্তবিক পক্ষে সত্য নয়। এক অতীন্দ্রিয় পূর্ণতর অরূপ জগতের এটি প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সেই বাস্তবতার জগৎ অনুভূতি-গম্য, কিন্তু বুদ্ধির অগোচর। সেখান থেকে নিত্য উৎসারিত হচ্ছে সব শিল্প ও সঙ্গীত। তাই অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই অপরূপ জগৎকে স্পর্শ করতে হবে, ভেদ করতে হবে, তবেই সেই উৎসে পৌঁছানো যাবে।

এমনকি এই জাগতিক বিষয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাম থেকে যে অনুভূতির আভাস মিলছে তাও প্রায় অলৌকিক। তাও কবিতার বিষয়। কিন্তু সেই অলৌকিকতার ব্যঞ্জনা আনতে হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে আশ্রয় করতে হবে। তার বস্তু-রূপটুকু নয়, ভাবরূপ টুকুকেই। এই জগতকে অবয়ব দেবার আয়াসে, অনুভূতিগম্য এই ধ্বনিময় জগৎ-সৃষ্টির প্রয়োজনে, কবিরা সঙ্গীত-সূত্রে-সংবদ্ধ চিত্রকল্প-পরম্পরা এমন ভাবে উপস্থিত করবেন যে, যে কোনো mood বা myth পাঠকের সচেতন জ্ঞানের কাছে নয়— অসংজ্ঞান মনের মধ্যে উদঘাটিত হবে।

আমরা 'প্রতীক' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি, বলা বাহুল্য, তার থেকে প্রতীকবাদের ব্যবহার কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র। যখন আমাদের রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে অশোক-চক্রের উল্লেখ করি, তখন সে প্রতীক একটি 'আইডিয়ার' প্রথাগত অপরিবর্তনীয় বিকল্প মাত্র। প্রাচীন প্রতীকী নাটকের, কাহিনীর 'প্রতীক'ও এ নয়। সেখানের প্রতীক ঐতিহ্য-মূলক, যুক্তি-নির্ভর ও নির্দিষ্ট। কিন্তু প্রতীক-বাদের (symbolism) প্রতীক কবির বিশিষ্ট ভাবনার

---

* Le-Parnase Contemporin নামক কাব্যসঙ্কলনের মাধ্যমে বোদেলেয়রের নেতৃত্বে এই ফরাসি কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব। এঁরা শিথিল বাকবহুল পদ রচনার বিরোধী ছিলেন।

বাহন বলে কবিনির্বাচিত ও যথেচ্ছ। কবির ব্যক্তিগত ও সাময়িক ভাবনার বাহন বলেই নিয়ত-পরিবর্তমান। এই মুহূর্তে যে বস্তু, শব্দ বা চিত্রকে ভাবনাটির প্রতীক বলে কল্পনা করা হচ্ছে পরমুহূর্তেই তাকে ত্যাগ করে কোনো নূতন প্রতীককে আশ্রয় করতে পারে কবি-কল্পনা, নূতন কোনো দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত করার তাগিদে। এখানে প্রতীকের স্থায়িত্ব বড় নয়—আসল কথা কবির অন্তরের একান্ত ব্যক্তিগত অপরিস্ফুট আকৃতিকে তার সূক্ষ্মতা ও দুরূহতা সমেত পাঠকচিত্তে পৌঁছে দেবার সাধনা। এর জন্যে ব্যবহারযোগ্য যে কোনো মাধ্যমই প্রতীকবাদের হাতিয়ার! ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম জীবনানন্দের রচনায় ইন্দ্রিয়চেতনার আশ্চর্য বৈভব দেখা গেছে। কবি অবশ্য এঘরের জন্যে কবিতার সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনা বিন্দুমাত্র খোয়াতে প্রস্তুত নন। সেই জন্যে বস্তুর নামের সরাসরি উল্লেখ নয়, তার আভাস দিতেই ভালবাসেন প্রতীকী কবি। সরাসরি উপস্থাপনের ফলে 'পারনাসিয়ান'দের কবিতার রহস্যময়তাই খোয়া যেত। পড়ার সময় পাঠক যেন বস্তুটিকে সৃষ্টি করে নিচ্ছেন এমন অনুভূতির যে স্বাদ, যে আনন্দ—তাই যদি লোপ পেল তবে কবিতার রইল কি? উল্লেখ না করে আভাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা, বস্তুকে যেন আবাহন করে আবির্ভূত করে তোলা, এখানেই ব্যঞ্জনার আসল আনন্দ।

প্রতীকী কাব্যের ভাবানুষঙ্গ ও প্রযুক্তিতেও জীবনানন্দ পশ্চিমী প্রতীকী কবিতার উত্তরসূরী। ওদেশের প্রতীকী কবিতার সঙ্গে তাঁর লেখায় চিন্তার সাদৃশ্য ও মনোভঙ্গিগত একাত্মতা কতখানি তা খুঁজে খুঁজে বার করতে হয় না অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে নজরে আসে। সঙ্গত ভাবেই এ প্রশ্নও করা চলে জীবনানন্দের প্রতীক রচনায় চর্যাপদের কিছু প্রভাব আছে কি? ঘোড়া জ্ঞানময় পুরুষ, নিবিড় রমণী (শরবী) ইঁদুর, নদী, নৌকা, গাছ, হরিণ, কচ্ছপ, পেঁচা, শকুন—এই সব প্রতীক চর্যাকার ও জীবনানন্দ কি একই আবেগে ব্যবহার করেন নি?

জীবনানন্দের কবিতায় এই আধুনিক প্রতীক লক্ষণের প্রথম উন্মেষ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়। মৃত্যুর প্রাক্‌লগ্নে মানুষের চোখে এই প্রিয় পৃথিবীর যে রহস্যময় মোহনীয় রূপ উদঘাটিত হয় তার সাংকেতিক প্রকাশ ঘটেছে সেখানে। এড্‌গার এলান পো' যেমন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে উলটে পালটে ইন্দ্রিয় চেতনার আশ্চর্য বৈভব রচনা করতেন সেই পদ্ধতি দেখা গেল সেখানে।

> চালের ধূসর তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
> নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
> পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

: মৃত্যুর আগে

চালের গন্ধে ধূসরতা, রূপের ঝরে পড়া, মাছের চোখের বিশ্লেষণে নির্জন শব্দের উল্লেখ, ঘুমের ঘ্রাণ; স্পর্শ যেন মানুষের মতো এসে হাঁসকে তুলে নিয়ে গেল —এই সব চিত্রকল্প ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন মিশ্র প্রয়োগে এক রহস্যমাখা কবিত্বময় মাদকতা সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে অভিনব ছিল। তবু মনে রাখতে হবে প্রতীকী কবিতার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে

এখানে, এটি কিন্তু প্রতীকী কবিতা হয় নি। যেখানে প্রতীকের ব্যবহার সাঙ্কেতিকতার নিগূঢ় তাৎপর্যে অন্বিত সেখানেই যথার্থ প্রতীকী কবিতার সাক্ষাৎ মিলবে।

'ক্যাম্প', 'পাখিরা' এবং 'শকুন' কবিতাকে কেউ কেউ প্রতীকী কবিতা বলতে চেয়েছেন। এগুলিও প্রতীকী লক্ষণযুক্ত কবিতা, প্রতীকী কবিতা নয়। 'ক্যাম্পে' কবিতার হরিণ শিকারের কাহিনীকে মানব হৃদয় শিকারের রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই তাৎপর্য কবি পরিণামে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রতীকী কবিতায় এ জাতীয় ব্যাখ্যার কোনো স্থান নেই। 'পাখিরা' কবিতায় পাখিদের জীবন সমস্যার রূপকে মানব জীবনের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে যেমন রূপক ও প্রতীক একাত্ম হয়ে মিশে আছে এ কবিতাও প্রায় তাই। তবে রূপক লক্ষণই প্রবল।

'শকুন' কবিতায় বরং প্রতীক লক্ষণ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। সমস্ত এশিয়া এখানে ভাগাড় যেন। এই কুৎসিত দিকহস্তীরা নানা দেশ থেকে আগত লোভার্ত আগন্তুক। ইতিহাসের ধারাস্রোত বেয়ে যে সব লোভার্ত অভিযান বারবার এই ভূখণ্ডে হয়েছে তাকে এক প্রতীকী ভাবনার মধ্যে অন্বিত করতে চেয়েছেন কবি—এ অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এই চিন্তার সঙ্গে মিশে আছে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত রহস্যময় অনুভূতি।
'বনলতা সেন' কবিতার এই প্রতীকী ভাবনা আরো পরিণত।

> সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
> সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;

: বনলতা সেন

শিশিরের শৈত্য আছে জানি, কিন্তু শব্দ আছে কি? অথচ এখানে সেই শব্দের সঙ্গে সন্ধ্যার আসার উপমা! অথবা রৌদ্রের গন্ধ! আমরা বর্ণ মুছতে পারি—কিন্তু গন্ধও কি মোছা যায়? বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনাকে এমনি মিশ্রিত ভাবে অনুভব—এটি প্রতীকী কবিদের আগে কারো কবিতায় দেখা যায়নি। আর ইন্দ্রিয় চেতনায় বিচিত্র বিন্যাসেই শুধু নয়—হাজার বছর পথযাত্রী কবির যুগান্তরীণ সত্তার সমান্তরালে পৃথিবীর বয়সিনী নায়িকা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—চিত্রকল্পময় এই কবিতায় ফরাসী প্রতীকবাদের লক্ষণ স্পষ্টতর।

এমনই সত্য ও কল্পনার মধ্যে বিভ্রম রচনায় প্রতীকী কবিদের মতো জীবনানন্দেরও অসামান্য সাফল্য। প্রতীকী কবিরা আমাদের অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিভ্রম ঘটিয়ে তোলেন—এ প্রায়ই দেখা গেছে। জীবনানন্দের 'নগ্ননির্জন হাত', 'স্বপ্ন' বা 'হাওয়ার রাত' কবিতাগুলিকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। মালার্মে 'ফনের দিবাস্বপ্নে' যেমন অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টি ও ক্রিয়ার মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি জীবনানন্দ 'নগ্ন নির্জন হাত'-এর নগরীর এক কাল্পনিক বাস্তবতা আনতে পেরেছেন বস্তুত বুদ্ধির জগৎ বর্জন করে অনুভূতির জগৎ আশ্রয় করায় এটি সহজ সাধ্য হয়েছে।

'অন্ধকার' কবিতায় কবি এই কাজের পৃথিবীকে বোদলেয়রের মতই ঘৃণা করে 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে' থাকতে চেয়েছেন।

তথাপি আসলে আন্তর লক্ষণে যে সব কবিতা প্রতীকী সংজ্ঞাবাচ্য তা বাস্তবকে অতিক্রম করে পরাবাস্তবতার লোকে বিলীন হয়েছে। যার সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বুদ্ধির সংশ্লেষ একেবারেই অবলুপ্ত, ভাষায় ব্যাকরণ ও যুক্তি-বিন্যাস একেবারেই অনুপস্থিত। অন্তরের অনিবার্য তাগিদে যা মন থেকে প্রলাপের মতো উঠে আসে তা 'সাতটি তারার তিমির'-এর আগে পূর্ণরূপে কখনো ধরা পড়ে নি। তবু 'মহা পৃথিবী'র 'বিড়াল' কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করবো। সমস্ত কবিতাটি এখানে তোলার অবকাশ নেই শুধু পরিণতিতে এসে সেটি কি রকম সঙ্কেত গভীর হয়ে উঠেছে তাই দেখা যাক—

> হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরাণ-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
> শাদা থাবা ঝুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে
> তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে সমস্ত
> পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।
>
> : বিড়াল

এ বিড়াল, বলাবাহুল্য, কোনো পৃথিবীর বিড়াল নয়; প্রকৃতির কোন দুর্জ্ঞেয় প্রাণ সত্তাকে এখানে বিড়ালের রূপকে বেছে তুলে ধরা হোল তা বলা কঠিন। এমনই 'আমিষাশী তরবার', 'সন্ধিহীন স্বাক্ষর বিহীন', 'সমুদ্র পায়রা' প্রভৃতি কবিতা এই পর্বে উল্লেখযোগ্য প্রতীকী রচনা। বাস্তব অপরিচিত তুচ্ছ বস্তুর আধারে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার রূপ ধরে দেবার কুশলতাই এইসব কবিতার আস্বাদনের অনবদ্যতার হেতু। অথবা হয়তো এর আপাত দুর্বোধ্যতার অন্তরালে আমরা ভাবলোকের এক পূর্ণতার বলয় অনুভব করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দের 'ঘোড়া' কবিতাটি আলোচনা করা উচিত। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যৌবন শক্তির প্রতীক এই ঘোড়া প্রস্তর যুগে তেজোদ্দীপ্ত থাকলেও আজ তা নিষ্প্রাণ প্রস্তরসদৃশ। তবু তার কামনা নিঃশেষিত হয়নি, "এখনো ঘাসের লোভে চরে" পৃথিবীর কিমাকার ডাইনাসোর উপর ঘাস নেই, শুধু আস্তাবলে বিষণ্ণ খড়ের গন্ধ ইস্পাতের কল থেকে ঝরছে।

আস্তাবলটি গোল, পৃথিবীর প্রতীক, বাস্তব আস্তাবলের পাশে ছিল পাইস রেস্তোরা, তার মেঝেয় পড়ে থাকা চায়ের পেয়ালা কটা বিড়াল ছানার মতো ঘুমে কুকুরের অস্পষ্ট কবলে হিম হয়ে নড়ে চলেছে।

প্রাণী ও অপ্রাণী এখানে একাকার। পুরানো মৃত জীবনের খাদ্য সঞ্চিত স্মৃতির মেশিনে কাটাই করার কথা ভেবেছেন কবি, তাজা কোনো ভোজ্য তাদের জন্য নেই। কামনা পরবশ মৃত অতীত শুধু সঞ্চরণশীল।

'সাতটি তারার তিমির'-এর 'ঘোড়া' কবিতায় সত্য ও কল্পনার এই বিভ্রম, বুদ্ধির জগৎ বর্জন করে অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ ও সাংকেতিকতার অন্তর্গূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। কালপ্রবাহের মধ্যে বিচরণশীল মহীনের ঘোড়াগুলি 'নিওলিথ' যুগের অধিবাসী

হয়েও এ যুগের আলোকিত সভ্যতার মধ্যে বিচরণশীল। নব নব দৃশ্যের পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে প্রাণশক্তির প্রতীক এই ঘোড়া প্রস্তর যুগের প্রাণহীনতা থেকে কামনা পরবশ হয়ে এই যান্ত্রিক জগতে ঘাসহীন খড়ের শব্দে সমাচ্ছন্ন আস্তাবলে ঘোরাঘুরি করছে।

আমরা যাইনি মরে আজো— তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্না প্রান্তরে,
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।

: ঘোড়া

জীবনের নিরন্তর পট-পরিবর্তনের মধ্যেও যেন যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা আর প্রাগৈতিহাসিক নিথরতা লুকিয়ে আছে। এক আদিম ক্ষুধার আকর্ষণে যেন অতীতের জীবেরা আমাদের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে, আবার পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে দীপনেভা অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

এইসব কবিতার আশ্চর্য সাঙ্কেতিকতার উৎসে রয়েছে জীবনে সম্পর্কে তাঁর একান্ত স্বকীয় দৃষ্টি। এই দৃষ্টির প্রসাদেই তিনি সমস্ত পাশ্চাত্য প্রতীকী কবিদের সগোত্র হয়েছেন, অনুকারী হন নি। বাস্তবিক প্রতীকী কবিতা কখনো অনুকৃত হতে পারে না, যার মধ্যে এক অখণ্ড অনুভবের মুখরতা আছে তিনিই শুধু ইচ্ছা করলে প্রতীকী কবিতা লিখতে পারেন। অনুকরণ করতে গেলে বহিরঙ্গের খোলসটাই শুধু থাকবে— অন্তরের সেই বিপুল রিক্ততা ঢাকা পড়বে কি ভাবে?

মহীনের ঘোড়াগুলোর পশ্চাৎপটে হামিদের মরখুটে ঘোড়াগুলোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

কে যেন উঠিল হেঁচে, — হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি!
সারাদিন গাড়ি-টানা হলো ঢের, —ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায়
নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস;
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে— আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি?

: নিরালোক

মৃত্যুর আঘাত প্রতিহত করে কানা ঘোড়া এখানে জীবনের উল্লাস ও আনন্দ বহন করেছে। এই বাস্তব জীবন্ত ঘোড়ার সঙ্গে মহীনের প্রস্তর যুগের ঘোড়াকে সমীকৃত করা ভুল হবে। আরো একটি কবিতায় দেখেছিলাম উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত নারীকে যে কুয়াশা ঘোড়ায় তুলে নিতে আসবে সেই ঘোড়াটিকে

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো-এক বিকেলের জাফরান দেশে।

: স্থবির যৌবন

বাস্তব পৃথিবীর ঘোড়া কিভাবে প্রাণশক্তির প্রতীক এবং আরো পরে মৃত্যুর দূর-অভিযাত্রার বাহন হিসাবে মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠেছে তা লক্ষণীয়। ভাবনার ক্রম-পরিণতিতেই

যে জীবনানন্দের কাব্য-প্রতীকের জন্ম তাতে সন্দেহ নেই। টি. এস. এলিয়ট একদা এমনই এক আন্তর উপলব্ধিকে ভাষা দিতে প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার একটু নমুনা রাখা যেতে পারে। দেখা যাবে প্রযুক্তিতে কতখানি আত্মীয় হয়েও জীবনবোধে কতখানি দূরত্ব রাখা সম্ভব। লক্ষ্য করুন এই দুজনই ইতিহাস-চেতন কবি, তবু আমরা দেখেছি জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনার মর্মে মৃত্যু আর করুণার অভিজ্ঞান কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত পর্বে জীবনের নিষ্প্রেম নিরর্থকতা থেকে হতাশ বিতৃষ্ণায় উপনীত হয়েছিলেন এলিয়ট—

Lady, three white leopards sat under a janiper tree
In the cool of a day, having fed to sotiety
On my legs my heart my liver and that
which had been contained
In the hollow round of my skull. And god said
Shall these bones live? shall these
Bones live?....

Ash. Wedsesday

এখানে কবির বিক্ষত শরীর ও আত্মার এই উপলব্ধির অভিব্যক্তির প্রয়োজনে প্রতীক নির্বাচনে যতখানি উচ্চাঙ্গের কুশলতা দেখা গেছে বক্তব্যের মধ্যে ততখানি নিগূঢ় সঙ্কেতময়তা নেই। তুলনায় জীবনানন্দের কবিতার নিবিড়তা ও শিল্পিতা প্রশ্নাতীত।

সে-আগুন জ্ব'লে যায়— দহে নাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়— দহে নাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যায় নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই—একা;
এখানে পেল না কিছু, করুণ পাখায়
তাই তাঁরা চ'লে যায় শাদা,—নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দেখা।

: একটি কবিতা

শুধু পংক্তির পুনরুক্তি প্রবণতাতেই এলিয়টের প্রভাব নয়— সমস্ত কবিতার ভাবনা কল্পনাতেও সারূপ্য রয়েছে। তবু সব সত্ত্বেও পাশাপাশি রেখে পড়লে দুজনের শক্তি দুর্বলতায় ও কবিধর্মের বিশেষত্ব নজরে আসবে। এলিয়টের দক্ষতা মননের বলিষ্ঠ বৈদগ্ধ্যে, প্রকরণের নিটোল নিপুণতায়,—জীবনানন্দের ঐশ্বর্য অন্তরেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম স্পর্শচেতনায়। জীবনানন্দ যে অর্থে যথার্থ প্রতীকী কবি, এলিয়ট সেই আত্মার অতলতা ছুঁয়ে আসতে পারেন কি?

সার-রিয়ালিজম

খেতে বসে যখন জলের গ্লাস উল্টে যায়, তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে একটা ভিজে দাগ কেটে দেন আপনি—যাতে জলটা ইচ্ছে মতো গড়িয়ে না চলে। আমাদের প্রাণও এমনি অভ্যাস ও জড়ত্বের দাগকাটা পথে বয়ে চলেছে। তার দুরন্ত অনির্ণেয় এলোমেলো স্বভাব-ছন্দে গড়িয়ে পড়তে পারছে না। আমাদের জীবন যাত্রা, অভিজ্ঞতা, চিন্তা, কল্পনা সব কিছু এতই ছককাটা হয়ে গেছে যে কোন উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-বিস্ময়েই আর অভাবিতের স্বাদ নেই। সচেতন বুদ্ধি ও অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে জীবনকে যদি এলোমেলো পথে বইয়ে দেওয়া যেত, পাহাড়ী ঝরণার দুরন্ত জলধারার মতো সব কিছু যদি ডুবিয়ে ভাসিয়ে, সরিয়ে পাশিয়ে ছুটে চলতে পারতো তবে বোধহয় আত্মার মুক্তি সম্ভব হতো।

জীবনের প্রথানুগ স্থবিরতা থেকে মুক্তির আকুতিতেই, আত্মার সেই স-লীল রহস্যময় গতিচ্ছন্দটি অনুভবের ইচ্ছাতেই সার-রিয়ালিজমের উদ্ভব। পাবলো পিকাসো (Pablo Ruiz Picasso) এবং আপোলিনেয়র (Guillaume Appollinaire) যখন দৃশ্যমান বস্তু-রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার আন্তর রূপের সন্ধানে ১৯১২ সালে কিউবিজমের (Cubism) পত্তন করেছিলেন তখন সেই কল্পনা করতে পারেন নি কি অসীম রহস্যের মায়াপুরীর খিল খুলছেন তাঁরা। বস্তুর একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে যা আমাদের দৃষ্টির পরিধিতে ধরা পড়ে না। একে তো আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই অপূর্ণতা আছে ; বস্তুর পরিপূর্ণ রূপ তাতে ফোটে না। অর্থাৎ তাতে 'ফোর্থ ডাইমেনশান' নেই। উপরন্তু সেই দেখাটাও আমরা নির্বিকার নিরাসক্ত হয়ে দেখতে পারি ন। আমার ব্যবহারিক প্রয়োজনের আলোতে দেখি বলেই খানিকটা দেখি, খানিকটা বাদ দিই।

আমাদের চোখের সামনে বস্তুর যে রূপ রয়েছে আমাদের মনের সামনে তার সেই রূপ নেই। টেবিলের যে অংশটি আমার দৃষ্টির আড়ালে তা আমার কল্পনার আড়ালে নয়। সুতরাং বস্তুকে যদি তার স্বরূপে আঁকতে হয় তাহলে দৃশ্যের সঙ্গে ওই কল্পনাও যুক্ত করা চাই।

পিকাসো তাঁর কিউবিষ্ট চিত্রে এটা করেছেন দুই উপায়ে। এক,—বস্তুটিকে নানা কোণ থেকে যেমন দেখায় সেই জ্যামিতিক দৃশ্যগুলিকে একই ছবির মধ্যে গেঁথে রেখেছেন। এইভাবে বস্তুর সম্পূর্ণ অবয়ব পরিদৃশ হয়েছে—চতুর্থ আয়তন ধরা পড়েছে। এইভাবে জ্যামিতিক রেখার সাহায্যে ছবি আঁকতে সুবিধা হয়েছে এই যে—শিল্পীর মনোভাব হৃদয়াবেগের স্পর্শ-বিমুক্ত হওয়ায় ছবি বস্তুর নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করেছে।

পিকাসোর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আরো বিচিত্র। কোনো একটি অতিপরিচিত বস্তুর রূপও যখন আমরা ভাবি তখন তা আমাদের স্মৃতিতে একেবারে পরিপূর্ণ আকারে আসে না, আমাদের মানসিক পক্ষপাত, প্রয়োজনগত তাগিদ এবং ভাবানুষঙ্গ হিসাবে কিছুটা আগে আসে, কোনো অঙ্গ পরে, কিছু বা একবারেই লোপ পেয়ে যায়। সুতরাং বাইরের ওই জ্যামিতিক আকৃতিটা হটিয়ে দিয়ে আমাদের মনের চিন্তাগুলিকে যদি পরপর পৃথক পৃথক রূপে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলি তাহলে সব কিছু অত্যন্ত আজগুবী মনে হবে।

এক কথায়; কিউবিজম ও উত্তর-কিউবিজম চিত্রধারায় বস্তুর পরিদৃশমান রূপের

অন্তরে যে স্বকীয় সত্তা রয়েছে তারই উদঘাটন লক্ষ্য ছিল। কোথাও বস্তুর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলি একত্র গেঁথে চতুর্থ আয়তন ফোটাবার প্রয়াস, কোথাও বা মনের প্রতিফলনে বস্তুর প্রতিলিপি রচনার সাধনা। প্রথম পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পিকাসোর 'কুবেলিকের প্রতিমূর্তি' বা 'ফনের মাথা', দ্বিতীয় পদ্ধতির দৃষ্টান্ত 'এসরাজ'।

আপোলিনেয়র, মাক্স জাকভ প্রমুখরা সাহিত্যে কিউবিজমের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবনের আন্তর রূপের সন্ধানে ব্রতী হলেন। তাঁরা দেখলেন জীবনে এমন এক এক রহস্যময় অভিজ্ঞতার মুহূর্ত আসে যখন বস্তুর চিরপরিচিত রূপ মুছে যায়—তখন এক বিস্ময়কর উদ্ভাস অন্তরে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই সব মুহূর্তে আমরা হঠাৎ অনুভব করি আমাদের এই চেনা জানা জীবনটার বাহ্য আবরণের নিচে রহস্যাবৃত জীবন-সত্য নিহিত আছে—তিমির রাত্রে বিড়ালের জ্বলন্ত চোখের হিংস্রতায় যেমন পোষমানা কোলের মিনিটার আন্তব-সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

সার-রিয়ালিষ্টরা (Surrealist) এই পথেই আরো এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা ভাবলেন, আমাদের কল্পনায় বর্হিবস্তুর যে রূপান্তর হয়, তার মূলে আমাদের মগ্নচেতন সত্তার সক্রিয়তা আছে। এই মগ্নচেতন জগতের রহস্যের উদঘাটনই সার-রিয়ালিজমের লক্ষ্য। যে বিষয়েই আমরা চিন্তা করি সেই চিন্তাটা প্রথমে কতকগুলি বস্তু বা 'আইডিয়া'-বহ শব্দের সমাবেশ হয়ে আসে। সেই শব্দ-সমাবেশকে আমরা ব্যাকরণের এবং যুক্তির বিচারমতো বিন্যাস করে লোকের বোধগম্য করে তুলতে ঠিক যেন অনুবাদ করে প্রকাশ করি। নিরন্তর প্রকাশের তাগিদে মনের এই অনুবাদ-ক্রিয়ায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত বলেই সেই অগোছালো, আনকোরা, কার্য-কারণ-ক্রিয়ার পারম্পর্যহীন অবস্থাটি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু এই অনুবাদের সচেতন দক্ষতা যখন লোপ পায়,—যেমন জ্বরের প্রবল বিকারে যখন আমরা প্রলাপ বকি, তখন মনের সেই অসংজ্ঞেয় স্তরটি উদঘাটিত হয়। জাগতিক বস্তু বা ভাব-প্রসঙ্গে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিন্তা সমূহকে যখন আমরা বোধগম্য ভাষায় সাজাই তখন স্বতঃই কিছুটা বাদ পড়ে যায়—যা আমরা ভাষায় ঠিক বোঝাতে পারি না, যা আমাদের সজ্ঞান মনের স্বীকার করতে বাধে, যা আমরা অবান্তর ভেবে বর্জন করি, তুচ্ছ মনে করে বাদ দিতে চাই অথচ আদৌ তা অবান্তর নয়, তুচ্ছ নয়, কারণ এইগুলিই আমাদের ব্যক্তিত্বের এবং চরিত্রের যথার্থ এবং পূর্ণতর স্বাক্ষর বয়ে থাকে। তাই আমাদের ভাব-কল্পনা সেই চেতন অনুবাদের স্তরে পৌঁছনোর আগেই শিল্পীরা সেই চিন্তাবহ শব্দ-সমষ্টি, চিত্র, রূপক ইত্যাদিকে যথাযথ অমার্জিত অবস্থায় তুলে ধরতে চান" যে কোনো ভাবনার অনুষঙ্গে মানুষের মনের চিন্তা, শব্দ, রূপক, চিত্রকল্প স্বতঃই আসে তা যতই অর্থহীন, আত্মবিরোধী, অবাস্তব মনে হোক, অবশ্যই গভীর নিহিত তাৎপর্য আছে ; তাই সার-রিয়ালিষ্ট কবিতায় এইসব চিন্তা-চিত্র-শব্দ-রূপককে তার অমূল্য জ্ঞান করা হয়। মন যে স্তরে বুদ্ধির শাসনে আসে নি, যখন সে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়—সার-রিয়ালিজম সেই স্তরের পরিভাষা। আঁদ্রে ব্রেতোর বক্তব্য ছিল সার-রিয়ালিজম কোনো কবিকর্ম নয়—মগ্নচৈতন্যের অনুভূতিমালার রেকর্ড। পরাবাস্তববাদী তাঁদের রচনাকে কোনো আর্ট কর্ম হিসাবে দাবি করেন নি, বুদ্ধি ও কল্পনার স্পর্শহীন মাধুরীহীন এক বন্য সৌন্দর্য হলো

পরাবাস্তববাদ। তাঁদের পরিভাষায় Super reality ; তাঁদের বক্তব্য হলো এতকাল মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধি সম্রাটের মতো সাহিত্য ও শিল্প জগৎ শাসন করতো। তাকে অপসারিত করার ফলে অন্তর্জগৎ অর্থাৎ মগ্ন চৈতন্য এবং বহির্জগতের কোনো ব্যবধান রইল না স্বপ্ন জগতের সঙ্গে কল্পজগৎ একাকার হয়ে গেল।

ভাবজগৎকে ভাষা ও অর্থের অর্গল মুক্ত করে দেওয়ার ফলে নানা অপূর্বতন দুর্গম লোকে অভিযান সম্ভব হলো। মিশে গেল প্রাকৃতিক জীবজন্তু, কাল্পনিক ভয়াল সুন্দর বস্তুপুঞ্জ, মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কঙ্কাল। যেন এক কোলাজের মধ্যে গাঁথা পড়ল, পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও কল্পবিজ্ঞানের ত্রিভুবন। জড়বস্তু হলো তরল বা বায়বীয়, অমূর্ত হতে চাইল মূর্ত, রূপ হলো রস, শব্দ হলো স্পর্শাতুর। সার রিয়ালিষ্ট কবি তাই যে চিত্রকল্পগুলি আঁকেন তার মধ্যে এমন প্রবল দুর্লঙ্ঘ্য আত্মতা আছে, এমন অন্ধ আবেগ বা মূঢ় শক্তি আছে যা আমাদের ব্যক্তিত্বের মুল-ধাতুতে গিয়ে আঘাত করে গভীর ক্ষত রেখে যায়, সেই আঘাতে আমাদের আত্মার কেন্দ্র নড়ে চড়ে স্থিততর হয়ে আসে।

সার-রিয়ালিষ্ট শিল্পসৃষ্টি দুরূহ বলেই এখানে বিকৃতি বেশি। সাধারণ পাঠক-দর্শকের অজ্ঞানতা ও বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে এখানে আসর জমিয়ে বসা সহজ এবং হয়ও তাই। যার উপহাস্য রূপ এতদূর অবধি পৌঁছেছে যে, কোনো শিম্পাঞ্জির আঁকা উচ্চাঙ্গের (?) সার-রিয়ালিষ্ট চিত্রসমূহ আমেরিকায় উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়েছে! এই ভাবেই এই শিল্প পদ্ধতি রসিকের শ্রদ্ধার ক্ষেত্র থেকে সরে যাচ্ছে।

তবু মনে রাখতে হবে নকল ও আসলের নির্ধারণ কঠিন হলেই আসল ঝুটা হয়ে যায় না। বরং প্রকৃত জহুরীর মতো নকলের ভিড় থেকে আসলটি চিনে নিতে শিখলে আমরাই লাভবান হবো। আমরা দেখেছি সার্থক সার-রিয়ালিষ্ট শিল্পের আপাত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে এমন এক নিহিত চরিত্র থাকে—যা আমাদের চেতনার গভীরে অনুপ্রবেশ করে আমাদের আত্মাকে প্রবলবেগে নাড়া দিয়ে যায়। এই সংবাদ-শালিতায় যেখানে ত্রুটি ঘটে সেখানেই শিল্পের ব্যর্থতা। সেই সৃষ্টিকে আমরা কিছুতেই সার্থক শিল্প বলে স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু একথাও তো সত্য এই রীতিতেই রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা হলো অবিস্মরণীয় চিত্রসম্ভার, গগনেন্দ্রনাথের হাতের রহস্যময় প্রেতভুবন ; লেখা হলো বিষ্ণু দের ঘোড়সওয়ার আর যযাতি, দেখা দিল জীবনানন্দের হাঁস আর হরিণেরা, বেড়াল আর হামিদের মরকুটে ঘোড়াগুলো, অমিয় চক্রবর্তী পুষ্পবৃষ্টি করে গেলেন। সবটাই নিষ্ফল বা বিকার বলি কি করে? হার্বার্ট রীড্ লিখেছিলেন,

> " It is the aim of the Surrealist whether as painter or as poet to try and realise some of the dimention and characteristics of his submerged being and to do this he resorts to verious kinds of symbolism."

জীবনানন্দের কবিতাতেও আমরা তাই দেখতে পাই।

সেই একত্রিশ থেকে চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতায় সার-রিয়ালিজমের যে প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, স্বীকার করতে আপত্তি নেই তাতে বিকারই ছিল বেশি। নয়তো

আমাদের সমস্ত চেতনার বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই সব কবিতা লুপ্ত হতো না, আমাদের সত্তার গভীরে আশ্রয় পেতো। কিন্তু সেই ব্যর্থ আন্দোলনের গর্ভেই অন্তত কিছু উজ্জ্বল কবিতার জন্ম হয়েছিল, যা প্লাবনের ঘোলা জল সরে গেলেও আমাদের আত্মার আশ্রয়চ্যুত হয় নি! এই সব কবিতার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক কবিতা যে জীবনানন্দের, একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর অধিকাংশ সার-রিয়ালিষ্ট কবিতা, যার এক বৃহৎ অংশ তাঁর জনপ্রিয় 'সাতটি তারার তিমির' এবং শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে— আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, অনুভব ও অভিজ্ঞতার উচ্চরোল প্রতিবাদ নিরস্ত করে অন্তরে আসন পেতে নিয়েছে। এই সব কবিতার আপাত-নিরর্থ বিক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ সমূহের গুঞ্জরণময় কলতানের ভিতরে এমন এক দুর্বোধ্য আকর্ষণের ঐক্যমন্ত্র আছে যা আমাদের সংজ্ঞান চিত্তের অংশী হয়ে আছে। একটি অতি বিখ্যাত কবিতার কিছুটা দেখা যাক—

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে :
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে
সচ্চল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর
বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে ;
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময়!
যুগে যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম,—হিটলার সাত কাণাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেল লাল :
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল,...

. সৃষ্টির তীরে

অর্থের অতীত কোনো মন্ত্রের জাদুতে আমাদের অনুভব-শক্তির উপর ক্রিয়া করে বলেই চেতনার সাময়িক আবেশের ছিদ্রপথে এই সব কবিতা আমাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করতে পায় ; নতুবা একে প্রলাপোক্তির মতো বাতিল করা চলতো।

বাক্‌প্রতিমা

১৯৩৫ সালে জীবনানন্দের বনলতা সেন কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে এ কবিতাটি 'চিত্ররূপময়'। এর আগে 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'ধূসর

পাণ্ডুলিপি' রচনাও সমাপ্ত, তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হতে আরো এক বছর দেরি। এই সময়ে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উন্মোচনী অভিধা বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির কথা সন্দেহ নেই। কেননা জীবনানন্দের কবিতা যে যে গুণে আমাদের প্রিয়, তার মধ্যে চিত্ররূপময়তা নিশ্চয়ই একটা বড়ো গুণ। কিন্তু সে গুণের বিকাশ হয়েছে ক্রমে ক্রমে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা', 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' এ। বইগুলির একটিরও সাক্ষাৎ পরিচয় না পেয়ে, দু একটি বিচ্ছিন্ন কবিতা থেকে অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো একটি উন্মেষশীল কবিচিত্তকে চিনতে পারা এবং নির্দেশ করা বিস্ময়কর বৈকি!

আজ জীবনানন্দের এই চিত্র-সামর্থ্য সম্পর্কে সম্ভবত সব সমালোচকই একমত। 'এবং এই জন্যেই তাঁকে একটি সংস্থা বা institution বলা হয়।" এতবড় সশ্রদ্ধ সিদ্ধান্তের পরেও সমালোচক শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু মন্তব্য করেছেন,— "চিত্রসৃষ্টি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতেই তিনি করেছেন—তবু কাব্যে চিত্রকল্প সৃজনের ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা পথিকৃতের গৌরব দান করতে পারি না।"

চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দ পথিকৃৎ কিনা? বাংলা ভাষায় প্রথম চিত্রকল্প স্রষ্টা কে? তিনি সচেতন স্রষ্টা কিনা? এসমস্ত কূটতর্ক ভাবী সমালোচকদের জন্যে সরিয়ে রেখে আমরা শুধু দেখাবার চেষ্টা করবো জীবনানন্দ চিত্রকল্প নিয়ে কি ভেবেছেন বা কি করেছেন। আলোচ্য উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আমাদের শুধু বিনীত বক্তব্য এইমাত্র যে, চিত্র ও চিত্রকল্প সৃষ্টিকে একাকার করে শুদ্ধসত্ত্ববাবু প্রমাদে পড়েছেন। 'চিত্র' মাত্রই চিত্রকল্প হলে 'চিত্রকল্প' শব্দটি উদ্ভাবনের প্রয়োজন হতো না। তাই মনে হয় আজকের আলোচনায় চিত্রকল্প কি, —এখান থেকে শুরু হলে ভাল হয়।

'গল্প' যেমন চিরকালের জিনিস কিন্তু 'ছোটগল্প' হাল আমলের আবিষ্কার—কবিতায় শব্দ চিত্র তেমনি আবহমানের জিনিস বটে কিন্তু 'চিত্রকল্প' আধুনিক কালের যোজনা। বাংলা কবিতায়, এই রূপ ও প্রকরণটি এসেছে ইংরেজি সাহিত্যের অনুসৃতিক্রমে। মূল ইংরেজি শব্দটি হলো 'ইমেজ' যার প্রাচীন ও সহজ অর্থ হলো 'শব্দ দিয়ে তৈরি ছবি'। একে 'চিত্র' বললে দোষ হয় না। কিন্তু কবিতার আজ বিবর্তনের পথে অনেকটা পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন 'গীতিকবিতা' বিবর্তিত হতে হতে আজ গান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্র আর চিত্রকল্পের পার্থক্য নির্দেশ করতে আমরা দুটো দৃষ্টান্ত নিচ্ছি।

> ডাকিযা কহিল মোরে রাজার দুলাল,—
> ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার,—রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল,
> চুল যার শাওনের মেঘ, —আর আঁখি গোধূলির মত গোলাপী রঙীন
> আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, —স্বপ্নে কতদিন!
>
> : ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল

এই যে শব্দ দিয়ে আঁকা ছবি রাজপুত্রের ঠোঁটের রঙ, গালের রক্তাভা, চুলের নিবিড় কৃষ্ণরূপ— বস্তু রূপকেই যেন চিত্রপটের মতো এঁকে তুলছে কিন্তু কোনো ভাবকে

ফুটিয়ে তোলা, কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার শক্তি তো এসব ছবিতে নেই, কিশোরীর মুগ্ধরাগ এই বর্ণময় চারটি উপমায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙীন,— এতো চোখের রঙ নয়, এখানে সন্ধ্যারাগের মদির আবেশ বিবাহ লগ্নের উচ্ছলতার মগ্নচেতনায় মিশে যায়, আবার কবি যখন বলেন—

মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কি যে ;
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।

: জার্নাল : ১৩৪৬

এখানে বস্তুত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ছবি নেই, একটি ভাবনা, আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ বিষণ্ণতা বোঝাতে মা মরা শিশুর করুণ বিমর্ষ মুখের প্রতিভাস আমাদের মনে এমন গেঁথে দেবার শিল্পিতা। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, একেবারে নূতন জিনিস। আকাঙ্ক্ষার আগে একটি দুটি বিশেষণ দিয়ে কেমন আকাঙ্ক্ষা তা বোঝানোর নিষ্ফল চেষ্টা না করে তার দৈন্য, তার অসহায়তাকে এমন একটা স্পষ্ট মূর্ত করে প্রকাশ করতে একটা কবির প্রতিভারই প্রয়োজন হয়েছে। এটাই হলো আধুনিক চিত্রকল্প। কবিতার এই যে নূতন প্রকরণ এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বোঝাতে Ezra Pound-কে বলতে হয়েছে—

An 'Image' is that which present an intellectual and emotional complex in an instant of time... It is the presentation of such a complex instantaneously which gives that sense of sudden liberation, that sense of freedom from time limits and space limits, that sense of sudden growth which we experience in the presence of greatest works of Art.

It is better of present one Image in a lifetime than to produce voluminous works.

চিত্রকল্প যদি চিত্রমাত্র হতো তাহলে তা কবির সারাজীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠফলও হতো না, অতো বিরলও হতো না।

চিত্রকল্প শুধু চিত্র নয়। যদিও শব্দচিত্রই বিকাশের একস্তরে চিত্রকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা ছিল সাজানো ছবির অ্যালবাম, বর্ণনার বর্ণালী পেরিয়ে তা পৌঁছেছে মনের মণিমঞ্জুষায়। তুলি আর রঙের সঙ্গে মিশেছে কল্পনার অভিজ্ঞান ; তাই চিত্র দিয়ে যে Image এর প্রতিশব্দ হয় না একথা রসজ্ঞরা সকলেই অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ইমেজ' এর বদলে লিখেছেন 'রূপক'। ডঃ অমলেন্দু বসু 'বাক্ প্রতিমা' শব্দটি উদ্ভাবন করেন। 'চিত্রকল্প' শব্দটি কবে কে প্রথম ব্যবহার করেছেন আমি জানি না। যেই করুন তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কাউকে কাউকে আবার ব্যবহার করতে দেখেছি 'রূপকল্প'ও।

'রূপক' শব্দটির ব্যবহারে পারিভাষিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের আলোচনার প্রয়োজনে 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটিকে ইমেজ-এর আদি অর্থের প্রতিশব্দ হিসাবে রেখে অন্য দুটি শব্দের অর্থের পরিধি অনেকখানি কমিয়ে আনতে চাই। আমাদের প্রস্তাব এজরা পাউন্ডের সংজ্ঞানুযায়ী কোন অমূর্ত ভাব বা বস্তুরূপ পরিস্ফুট করতে যখন একটি

অভিব্যক্তিময় চিত্র উদ্ভাসিত হয় কবিপ্রতিভার সেই অনবদ্য উন্মোচনই শুধু 'চিত্রকল্প'। 'রূপকল্প' শব্দে আমরা কি বোঝাতে চাই তা যথাস্থানে নিবেদিত হবে।

চিত্রের সঙ্গে চিত্রকল্পের প্রভেদ নির্দেশ করে বলা যেতে পারে চিত্রকল্প মাত্রই অল্প বিস্তর কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু কল্পনার এমন অভিজ্ঞান কি প্রাচীন রচনাতে পাওয়া যায় না? মহাকবি কালিদাস যখন স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতীর রূপবর্ণনায় লিখলেন 'সঞ্চারিণী দীপশিখা ইব' তখন সেই ব্যঞ্জনাগর্ভ উপমার আলোতে বরাঙ্গনার প্রদীপ্ত লাবণ্যই তো আমরা দেখিনি, দেখতে পেয়েছিলাম অগ্রসরমান রমণীর বরমাল্যের প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত ও পরমুহূর্তেই হতাশাম্লান রাজপুরুষদের মুখচ্ছবিও। এই রকম লক্ষণাযুক্ত উপমায় চিত্রকল্পের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বিকশিত হয় নি এদেশে, কালিদাসের উত্তরসাধকদের হাতে। আমাদের গিয়ে দাঁড়াতে হলো ফরাসী প্রতীকী কবিদের দরবারে।

প্রতীকী কবিরাই প্রথম কবিতায় বাচ্যার্থ পরিহার করে চেতনার অবাচ্য অনুভূতিগুলিকে অবয়ব দিতে চিত্রের চিত্রকল্পের উৎস মুখ অবারিত করে দিলেন। প্রতীকী কবি গুস্তাভ খান চিত্রকল্পের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে এলেন নূতন এক কাব্য-আন্দোলনের নায়কবৃন্দ—টি. ই. হালমে, এফ. এস. ফ্লিন্ট, লাফর্গের অনুসরণ করে এলেন মার্কিনী কবি টি. এস. এলিয়ট ও এজরা পাউন্ড। কবিতা থেকে কৃত্রিম আবর্জনাজ্ঞানে এঁরা ছন্দ, মিল এমনকি চিরাচরিত অলংকারগুলিও বাদ দিতে চাইলেন। ভিক্টোরিয় যুগের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুও বাতিল হলো। এলো নূতন মুক্তবন্ধ ছন্দ। বাকসংহতি, কান্তি, যাথাযথ্য ও লক্ষ্যভেদী শব্দচয়ন কবিদের অভীষ্ট হলো। আর কবিতার বরাঙ্গ হয়ে হয়ে এলো নূতন ঐশ্বর্য চিত্রকল্প। আন্দোলনের নামই হলো ইমেজিসম্। চিত্রকল্পবাদ।

১৯১০ সালে প্রকাশিত হলো টি. এস. এলিয়টের 'Portrait of a lady'—প্রথম সার্থক চিত্রকল্পবাদী কবিতা। নূতন ধরনের চিত্রকল্প দেখা গেল এইসব কবিতার মধ্যে। ব্যঙ্গদিগ্ধ এক অভিজাত রচনারীতি নূতন যুগের সূচনা করলো। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হলো প্রথম কবিতা সংকলন 'Some Imagist poets'। তার ভূমিকায় ঘোষিত হলো : 'বাক্ সংহতিই কবিতার প্রাণরস'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্রকল্পবাদী কবিদের সংযোগ ছিল পূর্বাবধি, বলাকার নূতন প্রকাশভঙ্গী ও নূতন ছন্দ হয়তো এই সংযোগেরই ফলশ্রুতি। অবশ্য চিত্রকল্পবাদের আরো গভীরে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছেন আরো পরে। সে তাঁর গদ্য কবিতা 'পুনশ্চ'-র কাল ১৯৩২ সাল। তারও আগে ১৯৩০ এর মধ্যেই জীবনানন্দ যে এক সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন একথা উপলব্ধি করতে রবীন্দ্রনাথের কোনো অসুবিধে হয় নি।

পাশ্চাত্য কবিদের এই ঋণ সম্পর্কে জীবনানন্দের স্বীকারোক্তি খুব স্পষ্ট। তিনি লিখছেন :

"আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হল নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে। মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী— রবীন্দ্র-বঙ্কিমও তাঁদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন—বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পর নিঃসক্ত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের কাছ

থেকে শুরু করে ইয়েটস এলিয়ট ও পাউন্ডের কাছে গেল খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে।...অন্ততঃ যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি, রবীন্দ্রনাথকে তারা বিশিষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রঁসার ও ইয়েটসের সদর্থক ও নঙর্থক মনন বিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।"

. রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

জীবনানন্দ তাঁর কোনো রচনায় 'চিত্রকল্প' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে 'ইমেজিসম্' শব্দটি উল্লেখ করে এই আন্দোলনের প্রভাব স্বীকার করেছেন।

প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের কাছাকাছি। তখনো চিত্রকল্প শব্দটি উদ্ভাবিত হয়েছিল কিনা বা হয়ে থাকলেও জীবনানন্দের জানা ছিল কিনা বলতে পারবো না। কিন্তু তাঁর কবিতাতে চিত্রকল্পের সজ্ঞান ও সর্বতোমুখী ব্যবহার এই আভাস দেয় যে চিত্রকল্পবাদী কবি যদি বাংলা ভাষায় তখন কেউ থাকেন তবে তিনি জীবনানন্দই।

পাউন্ড একদা ইয়েটসের সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"মিঃ ইয়েটস কি চিত্রকল্পবাদী? না মিঃ ইয়েটস প্রতীকী কবি। কিন্তু তিনি পূর্বতন অনেক ভালো কবির মতই অনবদ্য চিত্রকল্প রচনা করেছেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই, এবং আমি যতদূর জানি তাঁরও চিত্রকল্পবাদীদের বিরুদ্ধে, 'তাদের নারকীয় ছন্দ'— এই মন্তব্যটি ছাড়া আর কিছু বক্তব্য ছিল না।"

কথাগুলি জীবনানন্দ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। জীবনানন্দও প্রতীকী কবি, ইয়েটসের দ্বারা প্রভাবিত ও তাঁর সমধর্মী। ইয়েটসের মতই জীবনানন্দ ও ছন্দের ব্যাপারে চিত্রকল্পবাদীদের মতো যথেচ্ছাচারী নন। তবু আরো উত্তর কালের মানুষ হিসাবে জীবনানন্দের পক্ষে চিত্রকল্পবাদীদের রচনারীতির সফলতাগুলি আত্মস্থ করা ও বিফলতাগুলি এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়েছিল। জীবনানন্দ যখন লেখেন :

"আধুনিক কালের প্রাণের কথা একদিক দিয়ে যেমন সংহতি সন্ধান করছে অন্যদিক দিয়ে তেমনি তথাকথিত আপেক্ষিক কালের প্রতীকের মতো সমাজ ও জীবনের আধুনিক বন্দিদশার সীমা লঙ্ঘন করে অমেয়তার অন্তঃকরণে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে।"

. কবিতার আত্মা ও শরীর

তখন বোঝা যায় চিত্রকল্পবাদীদের সঙ্গে তাঁর কতখানি চিন্তা ও চেতনার মিল গরমিল।

চিত্রকল্প

বাংলা সাহিত্যে সার্থক ও অজস্র চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দ দ্বিতীয় রহিত। বাংলা কাব্যে তিনি এর প্রবর্তক যদি নাও হন, এর নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠা যে তাঁর কবিতার মাধ্যমে তাতে

সন্দেহ নেই। 'বনলতা সেন'-এর চিত্রকল্পগুলির দূর প্রসারী ব্যঞ্জনা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তবু তারই একটি নমুনা নেওয়া যাক—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য

: বনলতা সেন

সুপ্রাচীন লুপ্ত ইতিহাস বিদিশার রাত্রির অন্ধকারের মত দিশাহীনতার কথা স্থগিত থাকুক আপাতত। প্রশ্ন করবেন না এর অব্যবহিত পরের দারুচিনি দ্বীপের সন্নিহিত ভাঙাহাল নাবিকের চিত্রকল্প এড়িয়ে যাচ্ছি কেন। শুধু মুখের ওই অংশটুকু দেখুন, 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। এখানে শুধু মুখের নিখুঁত নিটোল গঠনই কি কবির বাচ্য? অথবা সেই কথাটুকুকে বক্রোক্তিতে কাব্যময় করে তোলা? প্রাচীন ভারতের এক শিল্প সমৃদ্ধ স্বর্ণযুগের অভিজ্ঞান কি এতে নেই যার ফলে একটি নারীর মুখশ্রীতে ভারতীয় সৌন্দর্য পিপাসা ও প্রেমের কালাতিসরণ বোঝা যায়? 'শ্রাবস্তী'র অনুষঙ্গে তো আর্য নারীত্বের ব্যঞ্জনা পেয়েছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কারুকার্য কথাটিতে কেন জানি না আমার তো গ্রীক ভাস্কর্যের সংহত সুষমা ও শারীরী লাবণ্যের স্মৃতি আসে।

চিত্রকল্পে যেহেতু কল্পনার স্থান অনেকখানি তাই পাঠকের মনোগঠনের—বাসনালোকের তারতম্যে তার গ্রহণশীলতার তারতম্য ঘটবেই। একই চিত্রকল্প নানা মানুষের চেতনায় নানা সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিয়ে ধরা পড়বে। কবি এক পংক্তি লিখবেন, পাঠককে দিয়ে দশ পংক্তি ভাবিয়ে নেবেন, এ না হলে চিত্রকল্প হলো কি?

সুতরাং চিত্রকল্প মাত্রই অল্পবিস্তর কল্পনাশ্রয়ী। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে সব চিত্রকল্পেই একটা দৃশ্যরূপ কোনো না কোনোভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যেসব চিত্রকল্প অন্য ইন্দ্রিয় নির্ভর তাতেও ক্ষীণ দৃশ্যমান অনুষঙ্গ যুক্ত থাকে।

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিকে মাখে

: মৃত্যুর আগে

—এ দৃষ্টান্তে স্পর্শানুভূতিই প্রধান। তার সঙ্গে যুক্ত আছে ঘ্রাণ। তবু গন্ধকে, স্পর্শকে ছাপিয়ে নদীর তটে জলের সক্রিয়তার ছবিটি যেন রূপান্তরিত হয়ে যায় ময়দার মতো কিছু মাখার চিত্রপটে। আবার —

শতশত শূকরের চিৎকার সেখানে
শতশত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর
এইসব ভয়াবহ আরতি

: অন্ধকার

এ চিত্রকল্পে বিকট শব্দ ও যন্ত্রণানুভূতিরই প্রতিষ্ঠা। তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে লিপ্ত রয়েছে বিশৃঙ্খলা ও জুগুপ্সা। কিন্তু তাও আসছে একটা কল্পিত দৃশ্যের আভাস থেকে।

এ ধরনের ছাড়াও তো অন্য ধরণের চিত্রকল্প হতে পারে। যে সব চিত্রকল্প একান্ত আবেগ আপ্লুত কিংবা মননধর্মী তার দু একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক্।

১। প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই।

: গোধূলি সন্ধির নৃত্য

২। হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে
সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর।

. সৃষ্টির তীরে

৩। কবি নয়— অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি

: সমারূঢ়

নিদ্রা নয়, মৃত্যুর মোহমদির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে প্রথম উদাহরণে। দ্বিতীয়টিতে প্রহেলিকার মতো করে উদঘাটিত হয়েছে জীবনের বর্তমান বৈপরীত্য ও অসংগতি, খাদ্য-খাদকের বিপর্যয়, পাশার চালের মতো রাজকীয় ইচ্ছায় চালিত সৈনিকদের প্রতিবাদহীন অপমৃত্যু। সমালোচকদের বীভৎস ও ঘৃণ্য রূপ আঁকতে চূড়ান্ত কল্পনা প্রতিভার স্বাক্ষর পড়েছে তৃতীয়টিতে। যাই হোক না কেন, সব চিত্রকল্পেই ইন্দ্রিয় চেতনা অবর্জিত রয়ে গেছে। বস্তুত ইন্দ্রিয় চেতনা চিত্রকল্পের সামান্য লক্ষণ।

এ সবই চিত্রকল্প। সার্থক পরমরম্য চিত্রকল্প। যদি প্রশ্ন করেন, চিত্রকল্প কি তবে কোনো নূতন বা বিশেষ ধরনের অলংকার? অনেকে রূপক সমাসোক্তি এবং চিত্রকল্পকে সমজাতীয় মনে করেন। বস্তুত এদের পার্থক্য দুই মেরু সদৃশ। রূপক দুই বিভিন্ন বস্তুর ভাবগ্রন্থি। সমাসোক্তিতে কোনো বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যবহারের আরোপ। চিত্রকল্প এর কোনোটাই নয়। সেখানে এক অরূপ ভাবকে পরিস্ফুট করতে একটি চিত্রের যোজনা কেবল। কোনো কোনো বাক্‌প্রতিমা একটা অলংকার বা সমতুল্য জিনিস হতেও পারে কিন্তু যথার্থ চিত্রকল্প শুধুমাত্র কবিতার শোভা সজ্জা বা প্রসাধন নয়। তা আরো বেশি কিছু ; তা কবিতা। সাধারণ বাক্‌ প্রতিমা পাঠকের নজর এড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু প্রকৃত চিত্রকল্প লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা কল্পনা শক্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বলে তা পাঠকের মন স্পর্শ করবেই। কেননা কবিতা হলো স্মৃতিচর্বনা। চিত্রকল্প মানুষের পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার উন্মোচন। জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভাষায় বলা চলে :

"ভালো,—যাকে অক্ষর বলা যেতে পারে এরকম কবিতা পড়ে অনুভব করা যায় খুব হৃদ্য জিনিসের স্পর্শে এসেছি—এই কবির কবিতায় যা রয়েছে আমার অভিজ্ঞতায়ও সে জিনিস ছিল, কিন্তু ঠিক এরকম স্পষ্ট কৃতার্থ সংস্থানের ভিতরে ছিল না।... উঁচু উঁচু গাছ দেখেছিলাম, বাতাস পাখি, কাছে কোথাও অনেকখানি

জল ঝিকমিক করছে রোদে—অনেক দিন ভেবে দেখিনি সে সব কথা, কবিতাটি স্মারক আঙুলের মতো এসে আমার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাকে ডাক দিয়ে সচেতন করিয়ে দিল আবার।"

. কবিতা পাঠ : কবিতার কথা

চিত্রকল্পের মর্মের ব্যাপারটা প্রকৃত পক্ষে এই রকমেরই। খণ্ড বিখণ্ড স্মৃতি, নষ্টালজিয়া, আবেগময়তা নানা প্রসঙ্গ কবির জাদুকরী মায়াদণ্ডের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে। আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। অনুভূতির সূক্ষ্মতর অনুশীলন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের কবি-চেতনায় ক্ষণদীক্ষা দেয়। যেখানে তা করতে পারে সেখানেই চিত্রকল্প সার্থক।

আবার কিছু নমুনা তোলা যাক জীবনানন্দের রচনা থেকে—

দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার কবে কার ; পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব

মৃত্যুর আগে

খর রৌদ্রে-পা ছড়িয়ে বর্ষিয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে গান গায়—গান গায় এই দুপুরের বাতাস

· আমাকে তুমি

বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে

. বিভিন্ন কোরাস

কে অস্বীকার করবে এগুলো আমাদেরই অভিজ্ঞতা, আমরা দেখিনি, কবিই কেবল দেখেছেন! কবি সেই দেখাগুলিকে স্মরণ করে আপন কবিতার ভাবপুষ্টির প্রয়োজনে লাগিয়েছেন। বাল্মীকি যেমন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র গল্পটাকে চুরি করে নিয়ে রামায়ণে লাগিয়ে দিয়েছিলেন আগে ভাগে—অনেকটা তেমনি। পাঠকের মনোলোকের সঙ্গে কবিকল্পনার যেখানে সাযুজ্য হয় সেইখানে চিত্রকল্প সার্থক।

এটা বিতর্কিত কথা। আপনারা অস্বীকার করতে পারেন। বলতে পারেন তাজা কল্পনা আর কবির নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয় সার্থক চিত্রকল্প। কোনো কবি যদি লেখেন 'অন্ধকার—নেকড়ের কণ্ঠলগ্ন অতল গহ্বর যেন'—তখন চিত্রকল্পটা কবির নিজের কল্পনা নিঃসন্দেহ—কিন্তু আমি বলবো ওটা অসার্থক। এই চেষ্টাকৃত ধূর্ত উপমা পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরে বলেই যে ব্যর্থ তাই নয়, পাঠকরা যদি নেকড়ের মুখগহ্বরটা কল্পনাও করতে পারতেন তাহলেও তা কি অন্ধকারের দ্যোতক হতো? যদি তাও হয়, তখনো প্রশ্ন আসবে শুধু নেকড়ে কেন? কেন হাতি বা তিমি মাছ নয়? আসল কথা কবিকে অন্ধকারের আরো অভিব্যক্তিময় চিত্রকল্প খুঁজতে হবে। জীবনানন্দের কবিতায় এমন অসার্থক চিত্রকল্প বোধ হয় নেই।

কিন্তু চিত্রকল্পে অন্য ধরনের অসুবিধাও থাকতে পারে। কবির ভাবনা কখনো কখনো পাঠকের চেতনায় ধরা না পড়তেও পারে। যেমন জীবনানন্দ যখন লেখেন—

অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে।

তখন 'লেগুন' কথাটির অর্থ যার অজানা তার কাছে পুরো চিত্রকল্পটাই অস্পষ্ট হয়ে যায়। চিত্রকল্প যদি পাঠ-মাত্রই পাঠকের অন্তর্লোকে দৃশ্যমান রূপ না ধরলো তাহলে সব আয়োজনই যে ব্যর্থ। এজন্যে অনেকেই কবিকে দোষ দেন। জীবনানন্দের কবিতায় মার্মালেড, মেল্লন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, বডকিন, ব্লিজার্ড ইত্যাদি প্রসঙ্গ এমনই অন্তরাল সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, আমরা বিদেশী প্রকরণ শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিশদভাবে বলেছি। এ ক্ষেত্রে বিচার্য কবি এসব চিত্রকল্প বর্জন করবেন কি? কবিতা তো চিরকালের জিনিস। পাঠকের আজকের অজ্ঞতা কালক্রমে দূর হবে। তাছাড়াও এর ফলে সামান্য রসাভাস হয়েছে হয়তো, তবু কাব্যের রসবিচারে পাঠকের পরিচিতি নয়, কবিতার অভিব্যক্তির দিকটাই আগে বিচার্য। বিজাতীয়তার অজুহাতে এসব ঐশ্বর্য সম্ভোগে আমাদের অনীহা নেই।

ভাল চিত্রকল্প মাত্রই তরতাজা ও প্রত্যক্ষ। তা স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিয়ে দেয় বিষয়ের উপর লেখকের প্রশ্নাতীত অধিকার। জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যাবে অতিপরিচিত বস্তু ও চিরাচরিত বর্ণনার মাধ্যমেও বিস্ময়কর চিত্রকল্প গড়ে তুলতে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'আকাশলীনা' কবিতায় নায়িকার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকের সম্পর্কে প্রেমিকের অনুযোগ :

কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

মাটির নীরব সহিষ্ণুতাকে ঘাস যেমন নিঃশব্দসঞ্চারী ব্যাপ্ত আবরণে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন আজ করে ফেলে, ওই যুবকের প্রেম তেমনই নায়িকাকে গ্রাস করতে চলেছে। 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় কবি লিখেছেন :

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে আসে সবুজ বাতাস
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে করে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হয়ে ওঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি।

ঘাসের সবুজের উপর প্রবাহিত বাতাস মনে হচ্ছে যেন সবুজ রঙের ; অথবা নদীর নাম করলেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে নদী। (যেমন 'ধানসিঁড়ি')। কল্পনার অভিনবত্ব এখানে

চিত্রকল্পে চমক সৃষ্টি করছে। আবার অন্যত্র শঙ্খমালার রূপান্তরিত রূপ বর্ণনা :

> চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
> চিতা জ্বলে; দক্ষিণ শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
> সে আগুনে হায়।

: শঙ্খমালা

তারই চোখের রক্তিম চিতার আগুনে তারই পুড়ে যাওয়া যেন অপ্রাকৃত ভৌতিক মনে হয়। চিত্রকল্পের আধুনিকত্ব যারা আধুনিক প্রসঙ্গের মধ্যে খোঁজেন তাঁদের চিত্রকল্প ক্ষণজীবী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জীবনানন্দের চিত্রের বস্তু এখানে চিরাচরিত কিন্তু দৃষ্টিকোণটি উপস্থাপনাটি নূতন ও অভিনব—তাই আধুনিক।

মায়াদর্পণ

চিত্রকল্পের সার্থকতার একটা বড়ো শর্ত হলো, কবিতার সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে চিত্রকল্পগুলি তাৎপর্যময় সম্পর্কে যুক্ত হয়ে এক যৌথ জটিল সামগ্রিক পূর্ণতা সাধন করবে, নইলে স্বতন্ত্রভাবে চিত্রকল্প যত আকর্ষণীয় বা গুণযুক্ত হোক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। জীবনানন্দ তা জানতেন এবং কবিতার এই সামগ্রিক উদ্ভাস সম্পর্ক গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর বক্তব্য :

> কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস করে তোলে, এতে করে একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু সমস্ত নক্সাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি :

: কবিতা প্রসঙ্গে

জীবনানন্দের প্রতিটি ভালো কবিতায় এই পরিকল্পনার এই নক্সাটার উজ্জ্বলতা নিপুণভাবে সংরক্ষিত। আর তার প্রকাশ কত বিচিত্র। 'মহাপৃথিবী'তে 'হঠাৎ মৃত' নামে একটি অনতিপরিচিত কবিতা আছে। আকস্মিক হত্যা মৃত্যু, শিকার এসব নিয়ে কত কবিতাই তো তিনি লিখেছেন তেমনি একটি কবিতা। শান্তসুরে খণ্ড খণ্ড কটি আকস্মিক অপমৃত্যুর কথা বলছিলেন কবি। তারপরে এতো মাঝের স্তবক—

> এইসব হঠাৎ মৃত্যু
> এইসব হঠাৎ মৃত
> আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
> বিক্ষুব্ধ বাঘের মত গর্জন করে উঠছে যেন
> গর্জন করে উঠছে আমার হৃদয়ের অরণ্যে।

সবশেষে আবার কবির অন্তরের বিষাদ ও ঘৃণার কিছু সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি মৃত্যুর

এই বেদনাদীর্ণ নীরবতার মধ্যে মৃতদের বিক্ষোভ, কবির হৃদয়ের বিক্ষোভ, নিস্তব্ধ অরণ্যে আহত বাঘের মত গর্জন করে উঠেছে দু-দুবার (উদ্ধৃত স্তবকের শেষ দুই পংক্তিতে) শব্দ ও চিত্রের এই যুগপৎ সুকল্পিত সন্নিবেশ কবিতাটিকে আশ্চর্য শ্রীমণ্ডিত করেছে। অথবা স্মরণ করুন 'হাওয়ার রাত'-এ কবির সেই উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত আকাশচারী কল্পনা, স্মরণ করুন :

> মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে, জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়।

যখন কবির হৃদয়—

> পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
> নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে
> একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
> একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

অজস্র সার্থক সর্বার্থ সাধক চিত্রকল্পের প্রবাহ পাঠকের চেতনাকে আপ্লুত করে দিল। স্মরণ করুন 'আট বছর আগের একদিন'— যেখানে আত্মঘাতী এক মানুষের রক্তাপ্লুত বিক্ষত শব আর তার মৃত্যু কামনার শব ব্যবচ্ছেদ এবং তারই পাশাপাশি জীবন তৃষ্ণায় উগ্র উদ্‌গ্রীব অসংখ্য কীট-পতঙ্গ পাখি, গলিত স্থবির ব্যাঙ, থুরথুরে অন্ধ পেঁচার তুমুল গাঢ় সমাচার। অজস্র টুকরো টুকরো স্ববিরোধী চিত্রকল্পের সমাহারে ও আবর্তনে বিষয়ের অসামান্য অনিবার্যতা পাঠকের অন্তর্ভেদী করে তোলার রহস্য উপলব্ধি করুন। Cicil Day Lewis-এর সেই অবিস্মরণীয় বর্ণনা মনে পড়বে—

> The images in a poem are like a series of mirrors set at different angles so that, as the theme moves on it is reflected in a number of different aspects. But they are magic mirrors; they do not merely. reflect the theme, they give it life and forms it is in there power to make a spirit visible.

চিত্রকল্প বাস্তবিকই কবিতার এই মায়াদর্পণ যাতে প্রতিফলিত হলে সব কিছু রূপ পায়, প্রাণ পায়— কবিতার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে তোলে। তা যদি জীবনানন্দের কবিতাতে হয়ে থাকে তবে এই সব কবিতাতেই হয়েছে। হয়েছে 'শিকার' কবিতায় যেখানে নিপুণ চিত্রকরের মতো অসংখ্য উপমাগর্ভ বর্ণনায়। দু-একটি নিপুণ মহার্ঘ চিত্রকল্পে হিংস্র হত্যার পটভূমি ও হত্যার বেদনাকে কবিতায় অবিনশ্বর করা গিয়েছে। অথবা মনে আনুন 'নগ্ন নির্জন হাত' হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে যে সৌন্দর্যলোকের জন্ম এ সেই অমর্ত্য লোকের কাহিনী। যেখানে অস্তিত্বহীন এক নগরী গড়ে তুলেছেন কবি, এক প্রাসাদ, অসংখ্য অনুপুঙ্খের বর্ণনায় বিশ্বাস জন্মিয়েছেন তার অস্তিত্বে। ঐশ্বর্যের নিপুণ আড়ম্বরের অন্তঃপুরে কল্পনার দৃঢ় ভিত্তির আসনে বসিয়েছেন সেই নারীকে যে তাঁকে চিরদিন ভালবেসেছে

অথচ যার মুখ তিনি কোনোদিন দেখেন নি, ভোগ ও উপভোগের সুপ্রচুর উপকরণের সিংহাসনে আসীন সেই নারীর হাতের নগ্ন-নির্জনতা ইন্দ্রিয় পিপাসা জাগাচ্ছে, এ বিশ্বাস সৃষ্টি করা গেছে। এই বিলুপ্ত জগত থেকে কবি যেন নির্বাসিত, স্বর্গচ্যুত আদমের মতো। জাতিস্মরের স্পষ্ট চেতনাও দৃঢ়-বিশ্বাস এই কবিতাটির ভিত্তি। কিন্তু এও কি সেই মায়াদর্পণে অনন্ত কৌণিক দৃশ্যরূপ পরম্পরায় প্রতিফলনের ফলেই পর্দায় পর্দায় উন্মোচিত রূপ রং আদর্শগন্ধের দ্বার উজ্জীবিত সম্মোহন সৃষ্টি করেনি। আরো লক্ষ্য করুন ঐ কবিতাটিতে বিধৃত রূপের সঙ্গে রঙের সঙ্গে আলোছায়ার মায়া। আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এক অন্ধকারে যার শুরু, যার পটভূমিকাই

> ফাল্গুনের অন্ধকার অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলোছাড়া উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে।
>
> : বুদ্ধদেব বসু

চিত্রকল্পের প্রয়োগ কৌশলে পাঠকের চেতনাকে মায়ামুগ্ধ, বশীভূত করতে পারাতেই ডে লুইল কথিত 'মায়াদর্পণের সার্থকতা।

রূপকল্প

বহু আলোচক বহু প্রসঙ্গে জীবনানন্দের কবিতায় পূর্বোক্ত উন্নতমানের চিত্রকল্প নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন। তাই এ বিষয়ে আর বাগ্‌বিস্তার না করে আমরা এবার নেমে আসতে চাই বাক্ প্রতিমার এক নিম্নতর সোপানে—যা চিত্র নয়—চিত্রকল্পই, কিন্তু তার আয়োজন এত নয়। এগুলির সৃষ্টির পিছনে প্রতিভার অতখানি সক্রিয়তা দেখা যায় না, হয়তো প্রয়োজনও হয় না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকল্পকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে আমরা 'রূপকল্প' শব্দটি ব্যবহার করবো। (যাঁরা 'রূপকল্প' শব্দটিকে চিত্রকল্পের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত তাঁদের কাছে আমরা মার্জনা চাই।)

রূপকল্পে চিত্রকল্পের তুলনায় কল্পনার বিস্তার কম, প্রকরণের প্রাধান্য বরং বেশি। কখনো কখনো মনে হতে পারে রূপকল্প যেন বিশেষ কোনো অলংকারের বিশিষ্ট প্রকাশ। মনে হয় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনে, প্রতিচ্ছায়াবাদ প্রতীক-বাদ চিত্রকল্প-বাদ ও পরাবাস্তববাদে বাক্ প্রতিমার যে নানা রূপ ও বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল জীবনানন্দ সজ্ঞানে সেইসব ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের অনুসরণ করে জীবনের পর্বে পর্বে এমন বহু বিচিত্র রূপকল্পের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন।

'বনলতা সেন' পর্ব অবধি জীবনানন্দের উপমা ও রূপকল্প প্রয়োগের মধ্যে প্রতিচ্ছায়াবাদী বর্ণচেতনা এবং অনুভূতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের রূপকল্পগুলিতেও

উপমাশ্রয়িতা লক্ষ্য করা যাবে। 'উপমা' অর্থে এখানে যেকোনো তুলনাত্মক অলংকারের কথা বুঝিয়েছি।

১। উৎসব লোভে অলি
আসেনি হেথায়,
কীটের আঘাতে শুকায়ে গিয়াছে কবে কামনার কলি
২। অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল, নরম লালিমা
জ্বলে গেছে।
৩। যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে
আরেক আকাশ যেন।
৪। কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
ফেলিয়াছে আলো
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মত
রেখে গেছে ক্ষত
সবজীব সবুজ রুধিরে।
৫। কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হয়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে।

লক্ষ্য করবেন, এগুলি মুখ্যত অলংকারই। কিন্তু সেই অলংকারের শব্দে বর্ণনার অনুপুঙ্খে প্রতিচ্ছায়াবাদী বর্ণ ও ভাবের অনুভূতি একে ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত করে তুলেছে। দেখবেন জীবনানন্দের কল্পনা যত পরিণত হয়েছে ততোই যেমন তাঁর বিশেষণের বিস্তার ঘটেছে তেমনি উপমাত্মক রূপকল্পে খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রাচুর্যে বাগ্‌প্রতিমাওলি বিশাল ব্যাপক ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কল্পনার এই বিস্তার ও সৌন্দর্য 'বনলতা সেন' গ্রন্থেই সবচেয়ে বেশি।

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের উপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।

: হাওয়ার রাত

লক্ষ্য করবেন, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কবি ছবিটিকে যত নিখুঁত করেছেন অন্তঃস্থিত ভাবটি তত নিপুণ অভিব্যক্তি পেয়েছে। এই রকম ব্যাপক ও বিশদ রূপকল্প কবির সৃষ্টিশীল কল্পনার ফসল তাতে সন্দেহ নেই। এমন রূপকল্পই আমাদের মুগ্ধতার গলিপথে চিত্রকল্পের মহান আসন অধিকারের জন্যে হাত বাড়ায়।

কিন্তু চিত্রকল্পের সঙ্গে রূপকল্পের পার্থক্যটা মনে রাখতে হবে। চিত্রকল্প শুধু অলংকার নয়, যেখানে অনুভূত ভাব বা রূপকে ব্যক্ত করতে একটি চিত্র আসে এবং সেই চিত্র আবার পাঠকের চেতনাকে এক ভাবলোকে উত্তরিত করে দেয়। কিন্তু রূপকল্প গুণীভূত ব্যঙ্গের মতো তার অলংকারত্ব অতিক্রম করে না।

আরো এক ধরনের রূপকল্প আছে। প্রতীকবাদী কবিদের রীতিই হলো ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির হেরফের ঘটিয়ে অথবা বস্তুকে গুণের মতো, গুণকে বস্তুর মতো ব্যবহার করে বর্ণনা করা। এর ফলে অতি সহজে যে সব বাক্‌প্রতিমা গড়ে ওঠে তাকেও আপাতদৃষ্টিতে চিত্রকল্প মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলির সৃষ্টির নেপথ্য-কৌশল কঠিন নয়, যান্ত্রিক ; কল্পনা সঞ্জাত নয়, প্রতীকী প্রকরণজাত। এমন রূপকল্পের নমুনা

১। চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ, মেয়েলি হাতের স্পর্শ নিয়ে গেছে তারে।

২। শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে....

গন্ধের ধূসরতা, মাছের চোখের নির্জনতা, ঘুমের ঘ্রাণ, মেয়েলি হাতের স্পর্শ, স্পর্শের মানুষের মত সজীবতা, বা পরের দৃষ্টান্তে শিশিরের শৈত্যের বদলে গন্ধ, রৌদ্রের বর্ণ বা তাপের বদলে গন্ধ, রঙের মতো গন্ধেরও মুছে যাওয়া। আলোর মতো রঙেরও নিভে যাওয়া—এইসব বর্ণনার কৌশলে এক ধরনের সমাসোক্তি বা Personification জাতের অলংকার এবং বাক্‌প্রতিমার এক ধরনের কল্পনাধর্মী উত্তরণ লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু রীতি নিয়ন্ত্রিত এইসব ব্যঞ্জনাকে রূপকল্পের বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না।

সাররিয়ালিষ্ট চিত্রকল্প ছিল বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবচেতনার উন্মোচন। ভাবনা কল্পনা ও চিত্রের এমন বিশৃঙ্খল সমাবেশ না থাকলেও জীবনানন্দের পরাবাস্তববাদী মনোভঙ্গির রচনাতেও এক ধরনের যান্ত্রিক রূপকল্প রচনায় পারঙ্গমতার চিহ্ন আছে। মহাপৃথিবী ও সাতটি তারার তিমির-এ বিধৃত কিছু কবিতায় এই ধরনের চতুর চটুল রূপকল্পের প্রাচুর্য দেখা যায়, পরস্পরবিরোধী বিশেষণের যোগে অসংলগ্ন বস্তু সমূহকে পাশাপাশি সংবদ্ধ করে বা প্রচলিত কিংবদন্তীকে প্রসারিত করে নির্মিত বাক্‌প্রতিমা দিয়ে এই রূপকল্পগুলি গড়ে তোলা হয়েছে।

১। ধূসর বাতাস খেয়ে একগাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।

. লঘু মুহূর্ত

২। যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিস্কার করে তবু ঘরে
বসে আছে!

: জুহু

৩। পরের খেতের ধান মই দিয়ে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ;

: সৌরকরোজ্জ্বল।

৪। নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে

: প্রেম অপ্রেমের কবিতা

৫। লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইট সব করে ফেলে ফাঁস

: মনোসরণি

এইসব রূপকল্পে বিস্ময়ের চমক আছে, কিন্তু কবিহৃদয়ের তৃপ্তি আছে এমন কথা বলতে পারি না। জীবনানন্দ অন্তত জীবনের অন্তিম পর্বে, এইসব প্রতীকীবাদী ও পরাবাস্তববাদী রূপকল্পের মোহমুক্ত হয়েছিলেন। 'বেলা অবেলা কালবেলায় তিনি এমন বুদ্ধিজীবী রূপকল্প আর রচনা করেন নি, এতেই অনুমিত হয় কবিতার এই বন্ধ্যা প্রকরণে আরো পদচারণা তিনি নিষ্ফল মনে করেছিলেন।

উপমা

পরাবাস্তববাদী শিল্পীর হাতে রূপক-চিত্রকল্পের মধ্যে যে এক অন্ধ শক্তি, প্রচণ্ড আবেগ জন্ম নেয় তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। একদা জীবনানন্দ বলেছিলেন 'উপমাই কবিত্ব'। বস্তুত মহাকবি কালিদাসের মতোই উপমা নির্বাচনের অনবদ্যতার মধ্যে জীবনানন্দের শিল্পীসত্তার অবিনশ্বর পরিচিতি লুকিয়ে আছে। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে উপমা কবিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ, আরোপিত অলংকারমাত্র নয়, এ-কথার যাথার্থ্য জীবনানন্দের কবিতায় বারবার উদঘাটিত হয়েছে। তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু কবিমন যে অনবদ্য কৌশলে উপমার সাহায্যে কাব্যের উপযোগী আবহ সৃষ্টি করে তার দৃষ্টান্ত সর্বত্র মিলবে।

কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
সূর্যের রাঙা ঘোড়া পক্ষীরাজের মতো কমলা রঙের পাখা নাড়ে
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে :

: মবালীরা

কিশোর চিত্তের কল্পনা উচ্ছলতা এখানে বর্ণময় উপমায় ধরা পড়েছে। আবার শিরশির করা শীতল সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিও দেখা যায় অন্য কবিতায়—

এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্‌বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদ রঙের শাড়ি চোরকাঁটা বিঁধে আছে এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশায় রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির;

: দুজন

যেখানে শারীরী সৌন্দর্যের উপরে সময়ের শীতস্পর্শজনিত বেদনা জাগিয়ে দিতে পেরেছেন। অঘ্রাণের খড় শরীরকে ছুঁয়ে ছেনে যায়, কুয়াশা চুলের উপর হাত রাখে, শিশির ঝরে।

উত্তরণ

ইউরোপে চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ আট দশ বছর মাত্র স্থায়ী হয়েছিল। চিত্রকল্পবাদীরা কবিতায় সংহতি ও শুদ্ধতার সাধনা করতে গিয়ে তার রীতি প্রকরণকে এমন এক সীমাবদ্ধ আবর্তে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে জীবন ও জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন কবিতার জন্য অপেক্ষা করছিল অপমৃত্যু। দেখা যায় এই কবিদের অনেকেই এর পরে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাকিরাও ক্রমে অন্য আন্দোলনের সামিল হয়ে যান। বাংলাদেশে তো চিত্রকল্প আন্দোলন দেখা দেয় নি। জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প এসেছিল প্রতীকী কবিতার প্রকরণ হিসাবে পরে সাররিয়ালিষ্ট কবিতার অঙ্গ হিসাবেও চিত্রকল্পের পুষ্টি ঘটেছে তাঁরই হাতে, চতুর্থ দশকের আগের থেকে পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সৃষ্টি পর্ব একসময়ে ফুরিয়ে এলো। সাররিয়ালিজমের কানাগলি ছেড়ে বাস্তবের সুপ্রখর রাজপথে কবি এসে দাঁড়ালেন। জীবনের সমস্যা, জীবনের সংগ্রাম ও জীবনের পিপাসার দিকে ফিরে কবিতার এই অঙ্গরূপচর্চা তাঁরও অর্থহীন মনে হলে। কিন্তু যেহেতু কোনো শিল্প সাধনা, কাব্যসাধনা শব্দ বা প্রকরণ সাধনা নিঃশেষে ব্যর্থ হবার নয়—এই চিত্রকল্পবাদ এই সংযম সাধনা 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্বে তাঁর কবিতায় এক তপঃশুদ্ধ শক্তি ও দ্যুতি দিয়েছিল। শুদ্ধ শিল্পচর্চা ছেড়ে তিমির বিলাসী কবি ইতিহাসযানে জ্ঞানে প্রেমে সমাহিতির মধ্যে স্থির হলেন, তখনো কবিতার এই ভিন্ন বিষয়কেও চিত্রকল্পই নূতন সজ্জা দিল, দিল এক মন্ত্রপূত ঋজুতা, মরমী ব্যঞ্জনায় ভরে দিল তাঁর কণ্ঠস্বর।

> ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
> দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
> হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়
> মানুষ মেরেছি আমি তার রক্তে আমার শরীর
> ভরে গেছে : পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
> ভাই আমি।

: ১৯৪৬-৪৭

এই হিংসার চক্রবেড় আগুন থেকে উদ্ধারের পথ, প্রেম ও করুণা, আলো। অতীতের মূঢ়তার তিমির কেটে এসেছি আমরা, আজকের জ্ঞানপাপের চিত্তদাহ পেরিয়ে আর এক

মহৎ তিমিরের, মহান আলোর সঙ্গমে পৌঁছাতে হবে আমাদের—

অনেক আঁধার আলো দেখেছি তবুও
আরও এক বড় আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীরভাবে বোধ করে মন

: দুটি তুরঙ্গম

'আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।'

এই অন্তিম পর্যায়ে জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প / বাক্‌প্রতিমা বিরল, কিন্তু যেখানেই আছে তা নিছক কাব্যকলা কুতূহল বশে আসে নি। বোধ ও বোধির সমীকরণে তা উজ্জ্বল, আন্তর উপলব্ধির মর্মরসে তা উজ্জীবিত। তখন আলো আর পার্থিব আলো নয়। পাখি তখন আবহমানের ইতিহাসচেতনা, যাত্রী সেখানে অনন্ত মহাজীবন, প্রকৃতি সেখানে অন্তহীন শুশ্রূষা। সেই পর্বে চিত্রকল্পকেও চিত্রকল্প মনে হয় না আর। মনে হয় কবির হৃদয় রহস্যের মিষ্টিক মর্মবাণী। যেমন তাঁর অন্তিম কবিতায় তাঁর আত্মোপলব্ধ আশাবাদের ঘোষণা :

আমি সেই মহাতরু— লাবণ্য সাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

অন্ধকার জানালায় হঠাৎ উটের দীর্ঘ কদাকার গ্রীবাটুকু দেখলে অসম্বৃত মানুষ যেমন চমক, ভয় ও অস্বস্তি বোধ করে ক্লান্ত লোকটির চেতনায় দুঃসহ নিস্তব্ধতা তেমনি আত্মহত্যার প্রলোভন নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

উপরি-উক্ত চিত্রকল্পগুলি তারই অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;

এই সব উপমা-চিত্রকল্পের মধ্যে জীবনানন্দের পরিণত শিল্পী-স্বভাব উদঘাটিত হয়েছে। তাঁর কবি জীবনের পর্বে পর্বে এই শিল্পী-প্রাণের ক্রমোন্মেষ ও ধারা-বদলের ইতিহাসও নিহিত আছে। বস্তুত জীবনানন্দের চিত্রময়তা, বর্ণময়তার উৎস কোথায়? 'ঝরাপালক'-এর আমল বর্ণানুরাগের কাল। এত উজ্জ্বল, এত সুন্দর চিত্র 'রসেটি'র কাব্য ছাড়া আর কোথাও মিলবে না। তবু সেই বর্ণোজ্জ্বলতা হৃদয়-রাগ রঞ্জিত হলেও তার ভাব-রস ক্ষীণ; রসেটির কবিতার মতোই সে চিত্রশালা মূক।

'বনলতা সেনে'র স্তরে এই রূপের মধ্যে ভাষার, রঙের মধ্যে প্রাণের রেখার মধ্যে ব্যথার উৎসার হয়েছে। বাংলা শিল্পকলার যে সূক্ষ্ম সংবেদনা, কবি-সুলভ মনোময়তা ও

যে বর্ণিল উজ্জ্বল উজ্জীবন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের হাতে, তার সাথে জীবনানন্দের চিত্রকুশলতার কোনো আত্মিক যোগ অন্তত এই পর্বে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। 'ঝরাপালক'-এর বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতা নেই আর। বরং এক মনোভাব চেতনার অনুষঙ্গে কবিতাগুলি রূপময় এখন।

> শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;
> সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
> হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

: শিকার

আগুনের অনুষঙ্গে কুঙ্কুমের কল্পনাই কেবল আসতে পারতো তখন—এখন নূতন এক অনুভবের আলোয় সেই কুঙ্কুমের পুরানো বর্ণাভা মুছে গিয়ে সেই আগুনই এখন হয়ে উঠেছে রোগা শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

আরো পরের কালে তাঁর মনে আধুনিক শিল্পীদের প্রভাব যে কত গভীর হয়েছিল তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি। এযুগের চিত্ররূপের মধ্যে সেই প্রভাবের বিস্তার কি ভাবে হয়েছে নীচের উদ্ধৃতি তার দৃষ্টান্ত

> অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
> ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার;
> মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর;
> অথবা কিসের ছবি? কিসের ছবির হাড় গোড়?
> কেবল আধেক ছায়া—
> ছায়ায় আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি র'য়ে গেছে।

· অবরোধ

এখানে শুধু অবান্তরভাবে আঁরি মাতিস্ (১৮৬৯—১৯৫৪), পল সেজাঁ (১৯৩৯—১৯০৬)ও পাবলো পিকাসোর মতো মহান শিল্পীর নাম বা কয়েকটি শিল্প-প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়নি এমন মনে করলে ভুল হবে। কবি এখানে শিল্প-চেতনার যুগ-যুগব্যাপী বিবর্তনের সংক্রান্তিতে দাঁড়িয়ে তার ব্যর্থতাকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবু এখানেও এই ধ্বংসমান ঐতিহ্যের যে ছবিটি কবি শব্দের আখরে এঁকেছেন তাও কি আধুনিক শিল্পরীতি স্মরণ করিয়ে দেবে না? ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'সৃষ্টির তীরে' কবিতায় তিনি আলোছায়ার জাদু শিল্পী পল গগ্যাঁর ছবির প্রসঙ্গ যেভাবে এনেছেন তার মধ্যে আধুনিক শিল্পের আরো নিগূঢ় উপলব্ধি নিহিত আছে—

> ... নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
> স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
> একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে ;
> অথবা তা' ছায়া নয়—জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে।

আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি ;
গগ্যাঁর ছবির মতো—তবুও গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাক-চেখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে ;
নিভে যায়—জ্ব'লে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হত তাকে।

সৃষ্টির তীরে

এখানে আধুনিক কিউবিষ্ট ও সার-রিয়ালিষ্ট ছবির আভাস খুঁজে পাওয়া যাবে।

আধুনিক শিল্পীর মতোই জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প ও উপমা সর্বদাই সৌন্দর্যমুখী নয়, প্রয়োজন মতো বীভৎস ও ঘৃণ্য দৃশ্যও তিনি এঁকেছেন। বিদ্রূপ করতে গিয়ে তাঁর কলম যখন খরশান হয়ে উঠেছে সেখানে তার রূপ—চোখে অক্ষম পিঁচুটি আর মাংস কৃমি খোঁটার বর্ণনায় যে অকুণ্ঠ ঘৃণার নগ্নতা—বাংলার সাহিত্য ঐতিহ্যে তাকে চূড়ান্ত কল্পনা প্রতিভা ব'লে স্বীকার করতে বাধা নেই।

এই সব চিত্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীত হবে—তাঁর চিত্রকল্পগুলি ফরাসী প্রতীকী বা পরাবাস্তববাদী কবিদের চিত্রকল্পের মতো নয়। শেষোক্তদের চিত্রকল্প বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবচেতনার উন্মোচন। ভাবনা-কল্পনা ও চিত্রের এমন বিশৃঙ্খল স্বচ্ছন্দ সমাবেশ জীবনানন্দের কবিতায় খুব বেশি দেখা যায় না। ইংরেজ ও মার্কিন চিত্রকল্পবাদী (Imagist) বা এই ফরাসী রীতিকে সমর্থন করেন নি। তাঁরা বরং চেয়েছিলেন বর্ণনাকে আরো বস্তুনিষ্ঠ, ভাবনাকে আরো ঘনীভূত, ভাষাকে আরো সহজ বোধ্য ও কথ্য করে তুলতে। তাঁরা চেয়েছেন স্বয়মাগত ভাবনা প্রবাহ ও চিত্র পরম্পরাকে পাঠকের অনুভূতিগম্য এক তাৎপর্যগভীর কাঠামোর মধ্যে ধরে দিতে। সার-রিয়ালিষ্টরা পাঠকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নির্বিকার, কিন্তু ইমেজিষ্টরা ততখানি নন। তবু তাঁদের চিত্রকল্প সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টতর হলেও বা অর্থের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। 'সাতটি তারার তিমিরে' শেষ দিকের রচনায় চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধরনের বাঞ্ছিত বিবর্তন দেখা যায়। তিনি তাঁর কবিতাকে অর্থ বা আবেগময়তা থেকে খুব বেশি সরে যেতে দেন নি। সাতটি তারার তিমিরের 'দীপ্তি', 'সূর্য প্রতিম', বেলাঅবেলা কাল বেলার 'সময় সেতু পথে', 'আমাকে একটি কথা দাও' প্রভৃতি কবিতা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হবে। তাঁর চিত্রকল্পের দ্বিতীয় বিশেষত্ব অন্যান্য কবির মতো বস্তু-জগৎ ও জীবন তাঁর অনুভূতিতে কোনো তত্ত্ব হয়ে আসেনি ; অথচ বস্তু সম্পর্কে কবির সদা-জাগ্রত কৌতূহল এবং সন্ধিৎসাই অনুভবের আকারে অজস্র ত্বরিত উপমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ভাব থেকে রূপ অর্থাৎ রূপকে চলে যেতে কবির কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি চিন্তাই অনুষঙ্গক্রমে এক একটি চিত্র এনে দেয়; সেই চিত্র আবার নূতন পরিবেশের সৃজনে ভাবটিকে উজ্জীবিত করে তোলে। এই সলীল দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যেন সর্বদাই চলেছে। অর্থাৎ একদিকে ভাব চিত্রকে বহন করে আনছে, অন্যদিকে চিত্র আবহ সৃষ্টি করে ভাবকে মূর্ত করে তুলছে। কবির সতর্ক রূপচেতন মনের কাছে কোনো শক্তিই অপব্যয়িত হচ্ছে না।

কবির এই রূপচেতনা বিচ্ছিন্ন অনুভূতি হয়েই নেই। মনের গোপন মণিকক্ষে পরস্পরের সংযোগে তারা যে এক অখণ্ড সমান্তরাল রূপজগৎ গড়ে তুলেছে তার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি

আছে 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটিতে। যদিও জীবনানন্দের মধ্যবয়সের অধিকাংশ কবিতায় একটা মনঃকল্পিত সৌন্দর্যলোকের ইশারা পাওয়া যায়—তবু সেগুলি থেকে এই কবিতাটি স্বরূপত ভিন্ন—সেই জন্যেই এর বিশেষ মূল্য আছে। ঐসব কবিতায় প্রায়শই কোনো বিশেষ দেশ ও কালের চিহ্ন আছে অথবা পরিবর্তনশীল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মনের অবচেতনে এবং ভূমিকা নৈর্ব্যক্তিক। হৃদয়ের আকাঙক্ষা থেকে যে সৌন্দর্যলোকের জন্ম এ সেই অমর্ত্যলোকের কাহিনী। অথচ নৈর্ব্যক্তিক হয়েছেন স্বর্গচ্যুত আদমের মতো। জাতিস্মরের স্পষ্ট চেতনা ও দৃঢ় বিশ্বাসই কবিতাটির ভিত্তি। এবং কবিতাটির পর্দায় পর্দায় রূপ-রং-স্পর্শগন্ধময় আবরণ খুলে খুলে যে সম্মোহনের অন্তহীন ক্ষেত্রে কবি আমাদের পৌঁছে দেন সেখানে বাস্তবিকই—

কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

. নগ্ন নির্জন হাত

দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যের সমাপ্তি নেই—রহস্যময় দৃশ্যান্তরের ইঙ্গিত—এখানেই সৌন্দর্য-শিল্পীর প্রতিভার অমেয়তা। ঠিক এমনই ইঙ্গিত মুখর রূপ-জগতের অনুভূতি ছিল কোলরিজ, ভ্যালেরি প্রমুখ পাশ্চাত্য কবির। সেই ক্বচিৎ-দৃষ্ট শিল্প-বৈশিষ্ট্যে জীবনানন্দের অমরতা।

মরমিয়া

মরমিয়া

এক জাতের কবি আছেন, রসের কবি। কাব্যের বিষয় ঘিরে তাঁদের অনুভবের ব্যাপ্তি, কল্পনার দীপ্তি, আলোকিত হৃদয়ের প্রসন্নতা ছড়িয়ে থাকে। তাঁরা মনসিজ—মন্মথও। কালিদাস এমনই একজন।

অন্য এক জাত—বলছি, মনীষী কবি। তাঁরাও রসিক—কিন্তু রসের অন্তরে কঠিন বস্তুসারও থাকে কিছু। রক্ত-মাংসের গভীরে থেকে কঙ্কাল যেমন দেহের আকার দেয়, চিন্তা ও মনীষার কাঠিন্য তেমনই তাঁদের কাব্য-শরীর গেঁথে রাখে। সেই কাঠিন্য কোথাও জীবন-দর্শন, কোথাও সমাজ-চেতনা, কখনো বা অন্য কিছু। যা-ই হোক তা কবিতার শিল্প সর্বৈবতা ঘুচিয়ে তাকে মহত্তর সার্থকতা দিতে পারে।

তৃতীয় এক জাতের কবি আছেন—সচেতন চিন্তা-মনীষা তাঁদের থাকতেও পারে, নাও পারে—কিন্তু মনের মর্মকোযে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের বিদ্যুৎ-বিকাশ। বলবো, মরমী কবি। হাড়ের ভিতরে যেমন লুকানো থাকে মজ্জা, তেমনই কবিতার ভাব বা বিষয়ের অন্তরে অন্তঃশীল অব্যক্ত চেতনার খেলা দেখা যায় সেখানে। তার তাৎপর্য পুরোপুরি ব্যক্ত হয় না কখনো। কবির কাছেও নয়। তবু তার অনিবার্য অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যখন স্নায়ুতে তার অনুরণন বাজে।

বাউল কবিরা, সুফী কবিরা ইউরোপের 'মিষ্টিক্' কবিরা অনেক সময়েই কবিতায় এই দিব্য-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। সকলেই নয় অবশ্য। অনেক অনুকারক কবি প্রথানুগভাবে রহস্য ঘনিয়েছেন কবিতাতে। তাঁদের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে এঁদের প্রত্যেকের অন্তরে এক আশ্চর্য অন্তর্বাণীর লুকোচুরি খেলা। পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না। খানিকটা আলোয় থাকে কিছু বা আঁধারে ঢাকা। সেই অন্তর-রহস্য উদ্ঘাটনেই জীবন কাটতো তাঁদের।

জীবনানন্দ দাশকে এমনই এক মরমী কবি বলবো আমরা। তাঁর কবিতায় রসের দীপ্তি, অনুভবের বিস্তার, কল্পনার লীলা-শক্তি, আলোকিত হৃদয়ের উত্তাপ কতদূর সঞ্চারিত—পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে, সে তাঁর রসিক সত্তার পরিচয়। তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টি, সমাজবোধ, বস্তু-ভাবনা—এসবও আলোচিত কিছু কিছু—এ তাঁর মনীষার দিক। কিন্তু তাঁর কবিতার সেই মিষ্টিক মর্মবাণী সেই মরমিয়াবাদ—শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ঈষৎ অঙ্গুলি-সঙ্কেত ছাড়া সেদিকে কেউ লক্ষ্য করেন নি।

জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য-শরীরকে যদি একটি এককোষী প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে তার 'নিউক্লিয়াস' ওই 'মিষ্টিক্' চেতনা। আলো এবং অন্ধকারকে কেন্দ্র করে তাঁর এই মরমী বিশ্বাস আবর্তিত ও আলোড়িত হয়েছে। তাঁর যে ইতিহাস-দৃষ্টির

কথা বলা হয়ে থাকে তাও এই বিশিষ্ট চেতনার অঙ্গ মাত্র। কবিজীবনের সূচনা থেকে আলো আর অন্ধকারকে তাঁর কবিতায় যেভাবে পাওয়া যায় তার মধ্যে রহস্যময় প্রতীকী-দ্যোতনা লুকিয়ে ছিল। অথচ এই সঙ্কেতটিকে সজ্ঞান চেতনায় পেতে জীবনানন্দকেই 'সাতটি তারার তিমির' অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাই শ্রীযুত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো প্রবীণ আলোচকও জীবনানন্দের কবিতায় এই ব্যঞ্জনা-গর্ভ বিষয়টির আকস্মিক আবির্ভাবের মূলে 'ভারতীয় মনের প্রাঙ্‌-নিবিষ্ঠ রতি'র কথা ভেবেছেন।

বাস্তবিক, 'ঝরাপালকে'র আমলে তাঁর কবি-চরিত্র যখন সবদিক থেকেই অপরিণত ও অগভীর ছিল, তখন তাঁর চেতনায় একটি অস্ফুট অনুভবের এমন প্রবল উন্মেষ মনকে নাড়া দেবেই। 'সেদিন এ ধরণী'র কবিতায় আলো ও অন্ধকার সম্পর্কীয় মরমী অনুভবটি তাঁর অসংজ্ঞান সত্তায় এলো তখন থেকেই তাঁর মধ্যে দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের বিরোধ। তাঁর এক সত্তা অতিদূর নক্ষত্রের কামনায় অধীর—আরেক সত্তা এই পৃথিবীর মায়ায় মুগ্ধ। এক সত্তা

> 'ক্ষুধাতুর দুটি আঁখি তুলে
> অতিদূর তারকার কামনায় তরী মোর দিয়েছিনু খুলে।'

আর দ্বিতীয় সত্তা চায়

> 'নয়ন মুদিনু ধীরে—শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে,
> সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।'

সেদিন এ ধরণীর

এই বিপরীত আসক্তি এই দুই বিরোধী সত্তার যুগ্মতায় তাঁর কবি-চরিত্রের ভিত্তি। একদিকে 'অনন্তের শুল্ক অন্তঃপুরে'র আহ্বান, অন্যদিকে সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধকার আচ্ছন্ন আবরণ। দুই মিলিয়ে পৃথিবীর 'আধো আলো আধেক আঁধারে'র আশ্চর্য মায়াময়তা।

এই আশ্চর্য আলো-অন্ধকারের কাহিনী, এই আলোক-অভীপ্সা ও তিমির পিপাসার গান জীবনানন্দের অন্তর্জীবনের এক গভীর রহস্যের আবরণ উন্মোচন করবে। আলোক ও অন্ধকারের এই রহস্য-নিবিড় সাঙ্কেতিক দ্যোতনার মধ্যে কবিচেতনার উদয়-বিলয়ের নূতন পরিমিতি খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু সেতো পরের কথা। আশ্চর্য এই যে 'ঝরাপালকে'র মধ্যেই এই পরিণত চিন্তাবলয় কি করে ছায়া ফেলে যায়? আমাদের যেন বিশ্বাস করতে বাধ্য করে প্রত্যিটি কবি এক একটি অন্তর্বাণীকে রূপ দিতে পৃথিবীতে আসেন—সেই বাণী যতদিন না পরিস্ফুট হয় ততদিন তাঁর কবিজীবনের ব্যাপ্তি, ততদিনই তাঁর সৃষ্টি-যন্ত্রণা—আর তা ব্যক্ত হলেও প্রকৃত অর্থে তাঁর মৃত্যু। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেই অন্তর্বাণী অভিব্যক্তির প্রান্তবলয় স্পর্শ করার আগেই শরীরী মৃত্যুর আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। যদিও তার পরম উচ্চারণ আমরা শুনতে পেলাম না, তবু তাঁর কবিতার ধারানুসরণে সেই সাধনার রূপ, চরিত্র ও লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পাবো।

আলো-কণা

জীবনানন্দকে যখন মরমী কবি বলি তখন প্রাচীন কবিদের যে অর্থে মরমী বলা হতো সে অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না। মধ্যযুগের মরমী কবিরা লৌকিক প্রেমের অভিসারের রূপকে এক রস-নিবিড় আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের রূপ দিতেন। তাঁদের মতো গভীর ভাগবত-বিশ্বাস অবশ্যই জীবনানন্দের কবিতায় মিলবে না। কেননা আধুনিক মননে তাঁর বৈপরীত্য আছে। এ যুগ সংশয়ের যুগ। বস্তু-পৃথিবীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাব সীমা অতিক্রম করতে আমরা স্বভাবতই নারাজ। আমাদের অজ্ঞতার মোহ কেটে কেটে সৃষ্টির অন্তর্লীন রহস্য যতই বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে; স্রষ্টা-ঈশ্বরের অনিবার্য স্থিতি সম্পর্কে আমরা ততই নিঃসন্দিগ্ধ অবিশ্বাসী হয়ে চলেছি। এই আধুনিক বস্তুনির্ভর বিজ্ঞান-বোধ জীবনানন্দের পুরোমাত্রায় ছিল বলেই তিনি কখনোই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছুতেই বিশ্বাসী নন।

আমরাও কেউ অলৌকিকতায় বিশ্বাসী নই। কিন্তু বস্তুনির্ভর চেতনা আর বস্তুসর্বস্ব চেতনার মধ্যে প্রভেদ আছে। বস্তুতন্ত্রতার বাইরে আর কিছুতেই আমাদের শ্রদ্ধা নেই। অথচ এই ইন্দ্রিয়গম্য পৃথিবী ঘিরেই এক বৃহত্তর চেতনাবলয় রয়েছে যা অতিলৌকিক কিছু নয়—তবু শুধু পরিশুদ্ধ চেতনায় তার ছায়া পড়ে। যা কিছু দেখি তাতেই তার অন্ত নেই; তার অন্তঃস্থিত গভীর পরিচয় অনুভবে ধরা পড়ে। বস্তু-দৃষ্টি থেকে আসে অভিজ্ঞতা, কিন্তু খণ্ডিত অভিজ্ঞতা সমূহকে সমন্বিত করে অখণ্ড আকারে পাওয়াই প্রজ্ঞা। সেই প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে পৃথিবী এক নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দের মিষ্টিক ভাবনা এই পরিশুদ্ধ চেতনা-সঞ্জাত। তাই আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের বদলে সেখানে রয়েছে এক প্রাচীন ঐতিহ্যবোধ। জীবাত্মার অধ্যাত্ম অভিসারের কাহিনী আর নয়। ববং ইতিহাসের অতীত অন্ধকারে দৃষ্টি ফেলে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রথম প্রাণবিন্দু আলো-কণার অভিসার যাত্রা। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত এই সব আলোকবিন্দু অনেক প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক স্তর-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাদের অ-ক্ষান্ত বন্ধুর যাত্রাপথ অন্ধকার অতীত থেকে আলোকিত বর্তমান, বর্তমানের রূঢ়শিখা দহন থেকে শুভ্রজ্যোতি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় তিমির-সাগরের মধ্যে কয়েকটি আলোক-বলয়। প্রাণকণা প্রবুদ্ধ নাবিকের মতো তিমির-সমুদ্রের সেই আলোকিত বলয়গুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে; তাদের আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে সেই বিস্মৃত অতীত। কখনো সাগরের নিবিড় অন্ধকারে প্রাণকণারা বিলীন হয়ে গেছে—কোনো উজ্জ্বলতর আলোকতীর্থে আবার ফিরে আসবে বলে।

অথবা কখনো এই ইতিহাস-চেতনাকে মনে হয়েছে পাখির মতো। সেই আলোকের পাখি—কোন দূর অতীতের লুণ্ঠনের ক্লান্ত পাখি নয়। মৃত্যুর সাগর লঙ্ঘন করে সে বর্তমানের প্রাণময়তায় পৌঁছেও অক্লান্ত পাখায় ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর জগতের অনুসন্ধানে চলেছে।

তবু এই যাত্রাই শেষ কথা নয়। পথেরও এক ইতিহাস আছে। সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি আশায়-বেদনায় রক্তাক্ত এক ইতিহাস। যুগের পর যুগ আসে। এক সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর আরেক সভ্যতা গড়ে ওঠে। জীবনের উত্তরাধিকার কখনো নিঃশেষ ধ্বংস পাবার নয়। যে দৃষ্টিতে জীবনানন্দ অতীতকে দেখেছেন তাতে মৃত্যুর স্থান গৌণ। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'। সভ্যতা ধ্বংস হয়, রক্তের ভিতরে তার অনুরণন রেখে যায়। যা অতীতে ছিল বর্তমানে নেই তা লুপ্ত হয় নি, অবচেতনার গভীরে সুপ্ত হয়ে আছে।

নানা অন্ধকার ও আলোকক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে আসতে আসতে বে বিষ, যে মালিন্য প্রাণকণাকে আচ্ছন্ন করেছে আমরা উত্তরাধিকারে রক্তের ভিতরে সেই বিষ বহন করে চলেছি।-তাই আমাদের হিংসা, আঘাত, ঘৃণা ও মৃত্যুর বেদনা। পরকে আঘাত না করে আমরা সুখী হতে পারি না—অথচ সেই আঘাতের ব্যথা মর্মে গিয়ে বাজে। পরস্পরের আলো আড়াল করে আমরা আলোকিত হতে চাই—সেই লোভ সেই হিংসা এক অদ্ভুত আঁধারে আমাদের ঢেকে ফেলে। অজ্ঞানতার আদিম তিমির ছিন্ন করে এসেও হিংসার আমিষ তিমিরে আমরা আবিল হয়ে আছি।

অতীতেও নানা অজ্ঞতা ও সুসংস্কার জীবনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। কুটিল বুদ্ধির দ্বারা আবিল হয়নি বলে সেই অন্ধতাও সভ্যতার অগ্রগতিকে বেগ দান করেছে। আজকের বিজ্ঞানী মন দিয়ে তাকে অন্ধকার বলে চিনলেও সেদিন তার অশেষ সার্থকতা ছিল। 'কি এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি' (—উন্মেষ)। অথচ এখন তিমির শিকারী নাবিককে হারিয়ে তিমির-পিপাসী রমণীকে হারিয়ে যখন নিজেদের অস্তিত্ব ও সব কিছুর সঙ্গতি হারিয়ে বসেছি, তখন অতীতের ঐ সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণও ভালো মনে হয়। সেই নির্মল অন্ধকারে অন্তত আজকের মতো মৃত্যু-রক্ত-কোলাহল ছিল না।

আলো-অন্ধকার

অতীতে এই সৃষ্টিকে ঘিরে আশ্চর্য এক আভা দেখেছিল কেউ কেউ। তারা বলেছিল, 'মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার ক্রমেই আলোর মতো হতে চায়।' পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের আড়ালে আরেক বড়ো আলো তারা দেখেছে। আজ আর সেই আলো দেখা যাবে না। আজ আর সে-কথা বিশ্বাস করে না কেউ। অতীতের মানুষেরা যে আলো দেখেছে তা কি তবে লুপ্ত এক বড়ো পৃথিবীর আভা? অথবা তাদের দৃষ্টিভ্রম, তাদের হৃদয়ের দোষ?

বিশ শতাব্দীতে, আলো আর অন্ধকারের অন্যরকম মানে। আধুনিক মানুষেরা সূর্যের আলো, নক্ষত্রের বা প্রদীপের আলোর বাইরে আর কোনো আলো স্বীকার করে না। যেখানে জাগতিক আলো নেই—সেখানেই ওদের মতে অন্ধকার। এ যুগের মনীষীরা এভাবে শুদ্ধ চিন্তা করে, সমাজকল্যাণ চায়, দিক্ নির্ণয় করে। এঁদের বস্তুমুখী জ্ঞান ও ধারণা স্থূল চিন্তার বাঁধ দিয়ে নিসর্গকে টেনেসি, দামোদর, কোশীর মতো বাঁধতে চায়।

কিন্তু জল, আগুন, বাতাস, প্লাবনের একটি মাত্র অর্থ—বাঁধ ভেঙে নতুন সেতু গড়া। তাই মাঝে মাঝে বাসুকীর মাথা টলে। প্রলয় কম্পনের ফলে চিন্তার বাঁধে চিড় ধরে; ক্লান্তি যায়, শান্তি আসে। পৃথিবীর বন্দিনীরা হেসে ওঠে।

এই জন্যেই বিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায় সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই। অনেক কল্যাণশীল নগর হয়েছে, দিনে সূর্যের জ্যোতি, রাত্রে নিয়ন টিউব, গ্যাসের দীপ্তি। তবু আজকের—

> সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
> প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে?

: এইখানে সূর্যের

অথচ সমুদ্রের নীলপথে যখন মহেন্দ্রের অভিযান চলেছিল, সমস্ত ভারত শিলালিপির উদ্যমে আনন্দে ভরে উঠেছিল। তেমন উৎসাহের দিন আজতো আর নেই। আজ শুধু ছক, ছলা, শব্দ-যোজনার সতর্ক সঙ্গতি; ততটুকু চিন্তার সাধুতা; হৃদয়ের খুচরো টুকরো ব্যবহার। এযুগে মহৎ হতে গেলে মহত্বের প্রয়োজন নেই। শাদা কালো রঙ বারবার এসে কেবলি অন্ধকারে মিশছে।

তবু তার মধ্যেও মানুষের অবিরাম প্রয়াণ চলেছে। শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি থেকে প্রেম পাওয়া যায় কিনা তারই সন্ধান অবিরত। মহাযুদ্ধ শেষ হলে আবার যুদ্ধের ছায়া, পটভূমি দ্রুত সরে গেলে রূঢ় দেয়ালের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছি। অথচ চীনে, কুরুবর্ষে, গ্রীসে, বেথলহেমে আমরা যে সূর্যের প্রাণ-উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছি, যে শিশুসারল্যকে মূর্খের আরাধ্য স্বর্গ ভেবে অবজ্ঞা করেছি, তার থেকে, এমনকি তার মতো, 'সূর্যের মধ্যদিন বড়ো ভাস্বরতা' এখনো খুঁজে পাইনি।

এখানে দিনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই। আমাদের আহত নগরী সকাল-বিকালের কাকজ্যোৎস্নার ছায়ার মধ্যে মৃত বলে মনে হয়। অথচ মৃত্যুর মধ্যে যে শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা আছে পৃথিবীর মানুষ নগর সে রকম আন্তরিকভাবে মৃত নয়।

অথচ ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনো আসেনি এখানে। রাত্রির মায়ের মতো নিঃসৃত অন্ধকার নেই—যা মানুষের বিহ্বল দেহের দোষ ক্ষালিত করে—বিহ্বল আত্মাকে ক্লান্তিকর পুরানো প্রশ্নে বিক্ষত না করে শব্দহীন মৃত্যুহীন অন্ধকারে ঘিরে রাখে। সব অপরাধ, ক্লান্তি, ভয়, ভ্রান্তি, পাপ, কামনা বিনষ্ট হয় যাতে ; জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়। আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার আর নেই। বাতাসের গভীরতা ও পবিত্রতা নেই। তবু আজকের মানুষ যে অন্ধ দুর্দশা থেকে কান্তিময় আলো, স্নিগ্ধ আঁধারের প্রয়োজন অনুভব করে সেদিকে আজও অনবনমনে চলেছে তাতে বোঝা যায় তার হৃদয়ের ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম করে চেতনার বলয়ের নিজ গুণ রয়ে গেছে।

তিমির-পিপাসা

আমরা দেখেছি, 'ঝরাপালকে' নক্ষত্রের শুক্র আলোর অভিমুখে অভিযান ব্যর্থ হবার পরে ক্লান্ত নির্বেদ কবিকে আচ্ছন্ন করেছিল। বসুন্ধরার প্রগাঢ় অন্ধকারে আপনাকে নিঃশেষে সঁপে স্তব্ধ ছিলেন তিনি।

আমরা বলেছি, 'ঝরাপালকে'র এই প্রগাঢ় অনুভবের মর্মে পৌঁছাতে কবিকে 'সাতটি তারার তিমির' অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কেন এই আলোক সন্ধান, কেন এই অন্ধকারের গর্ভে ক্লান্ত নিবিড় ঘুম, কেনইবা তিমির-সাগরে-সাগরে নাবিকের মতো অক্লান্ত অভিসঞ্চার কিছুই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি তখন। এমন কি 'বনলতা সেন' বইটি অবধি এসেও।

'বনলতা সেনে'র নাম কবিতার যে ক্লান্ত-প্রাণ নাবিক নিশীথের অন্ধকারে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ঘুরেছে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে যার আনাগোনা, হাজার বছর ধ'রে পথ হেঁটে সেই প্রাণ সন্ধ্যার কুহেলি-ছায়ায় নারীর চোখের গভীরে শান্তির নীড় খুঁজে পেলো। সেই আধো-চেনা নারীর রূপেও যেন ছড়িয়ে রয়েছে কালান্তরীণ স্মৃতির অন্ধকার। তার চুলের অন্ধকারে বিদিশার রহস্যময়তা, তার দেখার লগ্নে গোধূলির আচ্ছন্ন আবেশ। জীবনের ক্লান্ত লেনদেন অন্ধকারে বনলতা শাশ্বত যাত্রীর মতো সেনের নির্জন মুখশ্রী।

অতীতের অন্ধকার পথে পথে ক্লান্ত প্রাণের যাত্রা, তার সামনে কোনো স্থির লক্ষ্য ছিল না—অন্তত তার উল্লেখ নেই এখানে। এক তিমির সাগর থেকে আরেক তিমির-তীর্থে শুধু তার অনবচ্ছিন্ন আনাগোনা। সেই চিরন্তন নাবিকের শ্রান্তির জন্য কদাচিৎ কোনো নারীর চোখে দু'দণ্ডের নীড়ের শান্তি শুধু। এ যাত্রা কোথাও তাকে উত্তরিত করে না—এ অন্ধকার কোনো প্রসন্ন আলোর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।

'অন্ধকার' কবিতায় কবির চেতনা কিন্তু নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠেছে। তবু 'ঘুমের আস্বাদে লালিত আত্মা' অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চায়। হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারে সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চায়। যেন তার নিদ্রাবিলাসী চেতনায় ভোরের আলোকে 'মূর্খ-উচ্ছ্বাস' বলে মনে হয়। রক্তিম আকাশের সূর্যের নির্দেশে জেগে উঠে তাঁর হৃদয় ঘৃণায় আক্রোশে ফেটে যায়।

বোঝা যায়, 'ঝরাপালকে' অনন্তের শুষ্ক-অন্তঃপুরে যে সত্তা ছুটে গিয়েছিল—সেদিনের ব্যর্থতার অভিঘাতে সে নির্বেদ আশ্রয় করেছে। অন্ধকারের অতলে নিদ্রার মধ্যে সে নিজেকে সঁপে দিয়ে মৃত্যুর নিশ্চল শান্তি উপভোগ করেছে। জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ যিনি ভালোবেসেছেন, যাঁর মনে হয়েছে স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো—স্পন্দন-সংঘর্ষ-গতি, উদ্যম-চিন্তা-কাজ তাঁর শক্তিকে আহত করে তাকে শুধুই বিক্ষুব্ধ করে তুলবে।

অথচ আসলে তিনি নিশ্চেতনার কবি নন, আসলে তিমির-বিনাশই তাঁর মুখ্য চরিত্র। এই অনুভব 'সাতটি তারার তিমিরে' এসেছে। এখানেই তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছেন তিমির শিকারে যারা এসেছে তিমির পিপাসা তাদের সাজে না।

তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী।
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

: তিমির হননের গান

এখন থেকেই মরমী চেতনার পথে তাঁর সজ্ঞান পদক্ষেপ।

সূর্যতামসী

শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন মিত্র 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক মূল্যবান নিবন্ধে 'সাতটি তারার তিমিরে'র প্রতীকায়ণের তাৎপর্য সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছিলেন। দুই মহাযুদ্ধের সমকালীন ও অন্তর্বর্তীকালে মানুষের বিপর্যস্ত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিফলন বিরোধাভাস অলংকার সমৃদ্ধ এই কাব্যে কিভাবে হয়েছে তা তিনি দেখিয়েছেন! মানুষ তার সৌরজ্ঞানের শৈশব থেকে উত্তরাকাশের সধ্রুব সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দিশারী বান্ধব বলে জেনেছে। আবহমানকাল এর আলো পথভ্রান্তের কাছে পথনির্দেশ করেছে। সাতটি তারার আলো তাই আশ্বাসের দ্যোতক—দিশাহীনতার নয়। কবি কিন্তু এ কাব্যের নাম দিলেন সাতটি তারার আলো নয়, তিমির। তিনি বোঝাতে চাইলেন, যুগযুগান্তর ধরে যা কিছু আমাদের কাছে সত্য বলে, ধ্রুব বলে গণ্য ছিল, মানব ইতিহাসের চালিকাশক্তি বা দিশারী সেইসব বিশ্বাস সংস্কার আজ অচল বলে প্রতিভাত হচ্ছে। সভ্যতার এই সংক্রান্তিতে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ মানুষের নূতন অভিজ্ঞতার সনাতন মানদণ্ডগুলির আকস্মিক স্থানবিচ্যুতি ঘটেছে। বহুমুখী এই বিপর্যয় একদিকে যেমন ব্যক্তি মানবের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে তেমন বিশ্বের অস্তিত্বের কেন্দ্রে নিসর্গেও সম্প্রসারিত।

সুতরাং যা কিছুকে আমরা সত্য বলে, আলো বলে চিনতাম, তাতেই এখন তমসার অভিসঞ্চার। এই বক্তব্য শুধু কাব্যটির নামকরণে নয় ভিতরেও নানা পংক্তিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

১। তারার আলোক দিকে চেয়ে নিরালোক

: তিমির হননের গান

২। সনাতন সত্যে অন্ধ হয়ে-তবু-মিথ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে

: বিস্ময়

৩। অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার

: নাবিকী

৪। অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে

: রিষ্টওয়াচ

৫। আলো আছে তবুও আলোয় ভরে রয়েছে অন্ধকার

: মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল

'সূর্যতামসী' শীর্ষক আরেকটি কবিতাতেও এই একই বিরোধ্যভাস আভাসিত। (Epiquam)-এর বৈশিষ্ট্যই হল আকস্মিক আপাতবিরোধের আঘাতের তীব্রতায় আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। জীবনানন্দই সমকালকে বারবার যুগসন্ধি, ক্রান্তিকাল বা সঙ্কট মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছেন।

এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব আগুনে আলোয় জ্যোর্তিময়

: উত্তর প্রবেশ

নাটকের সঙ্কট সমস্যা বা crisis সচেতন কবি 'রিরংসা, অন্যায় রক্ত উৎকোচ কানাঘুষা ভয়' কণ্টকিত বর্তমানকে এইভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পৃথিবী ক্রমেই বিচ্যুত হয়ে আসছে।

সূর্য অনেকদিন জ্বলে গেছে

: রাত্রির কোরাস

সূর্যালোক নেই

: তিমির হননের গান

বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে

: বিভিন্ন কোরাস

আবার বিকেল বেলা নিতে যায় নদীর খাড়িতে

: খেতে প্রান্তরে

এই সূর্য যে সবসময়ে প্রাকৃত সূর্য নয়, তা সহৃদয় পাঠককে উপলব্ধি করে নিতে অসুবিধে হবে না। সত্যসন্ধ মানুষের সামনে এই আলো নিভে আসা যে ভয়াবহ পরিবেশের আশঙ্কা জাগায় তা এসব কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে। আবার কিছু কবিতায় কবিকে পৃথিবীতে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কথা রাতের তমসার কথা বলতে শুনি—সেও এই একই অভিজ্ঞতার রূপভেদ।

এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

: মকর সংক্রান্তির রাতে

একি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।

: সূর্যতামসী

সূর্যালোক নিভে গেছে বলেই এখন রাত। কিন্তু এ রাত নক্ষত্র খচিত বা চন্দ্রালোকদীপ্ত নয়। এ রাত্রি বিদিশার অন্ধকার নিশার মতই বিভ্রান্তির জনক। অথবা যদি নূতন প্রত্যুষের

সূচনা হয়েও থাকে, নূতন আলোর উন্মেষ ঘটে থাকে কোথাও, তার খবর আমাদের চেতনায় এসে পৌঁছায়নি।

এইজন্য কবি বিভিন্ন কবিতায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত নিয়ে অসংখ্য অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে বিশ্বনিয়মের এই বিপর্যয়টাই বোঝাতে চেয়েছেন, কার্যকারণের বৈপরীত্য প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির উদ্ভট আকস্মিকতা উপস্থাপনই তাঁর উদ্দিষ্ট :

অন্ন নেই। হৃদয়বিহীন ভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্ন লোভাতুর।

: দীপ্তি

আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার।

: সোনালি সিংহের গল্প

শতাব্দী আবেশে অস্ত যায়
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ করে যায় স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ

: সূর্যপ্রতিম

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে।

: সৃষ্টির তীরে

প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে।

: ঐ

রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড-বাস্কেট খেলো শেষে

: ঐ

সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

: লঘুমুহূর্ত

তবু
মধ্যবিত্ত মদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে

তিমির হননের গান

'আমরাও মরে গেছি সব'—
দলিলে না মরে তবু এ-রকম মৃত্যু অনুভব
করে তারা

: সূর্যপ্রতিম

মৈত্রেয়ীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অন্নের প্রলোভনের ঊর্ধ্বে তিনি উঠবেন। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও হাহাকার তাঁকে নিচে নামিয়ে এনেছে। আমাদের পরিশ্রমের ফসল আমাদের অভাব মিটাতে পারে না, মিডলম্যানদের কল্যাণে তা আমাদের হাতছাড়া হয়ে বিদেশের বন্দরে পাড়ি জমায়। এই আবিষ্ট শতাব্দীতে বিপ্লবীর মধ্যে দেখিছ অর্থলোভ, প্রেমিকের মধ্যে দেখেছি কামুকতা ও নিষ্ঠাহীন দেহাসক্তি। বিপর্যস্ত বিশ্বনিয়মে যা বিপরীত তাই ঘটছে। তৃণভোজী হরিণ যেন আমিষাশী শিকারীকে খাচ্ছে। যারা রুটি খেতে চায় তারা তার বদলে ব্রেড-বাস্কেট খেয়ে তৃপ্ত হলো। নানা আশ্চর্য ও বিপরীত ব্যাপার যেন মায়াবলে যুগপৎ চলছে; ধোপা আর গাধা একই সময়ে পরস্পরের পিঠে চড়ে রয়েছে। চারিদিকের এই বেদনায় পরিবেশেও আমরা মধ্যবিত্তরা অনুভূতিহীন বেদনাহীন, কেননা শারীরিক ভাবে না মরলেও আন্তরিকভাবে দেখলে আমরা যে মৃত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু এই বিপর্যয় ও বিনাশের ছবিই নয়, উদ্বেগ ও আশঙ্কার ভয়াবহ মুহূর্তগুলিকে কবি নানা কবিতায় নানা চিত্রকল্পে অভিব্যক্ত করেছেন :

অবরুদ্ধ নগরী কি? বিচূর্ণ কি? বিজয়ী কি?

: মকর সংক্রান্তির রাতে

শত্রু কি শহর ঘিরেছে? শহর কি চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো? না, নগরবাসীরাই বিজয়ী হয়েছে? এই আক্রান্ত নগরীর চিত্রকল্পে মানুষের উদ্বেগ কণ্টকিত বিনিদ্র অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন। আবার :

আমাদের জানালার অনেক মানুষ
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা
ভীত মুখশ্রীর সাথে এরকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে ;

: বিভিন্ন কোরাস

সাধারণ মানুষের এই ভীত বিভ্রান্ত মুখ, তাদের অসহায়তা কবি যেভাবে অনুভব করেছেন তাকেই আশ্চর্য রূপময় করে বর্ণনা করেছেন। এই আতঙ্ক ও অস্বস্তি শুধু আমাদের জীবিত মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে,
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।

: ঐ

মৃত্যুতেই মানুষের আতঙ্কের অবসান হচ্ছে না, জীবনের দুর্দশার অবসানে মৃত্যুতে মানুষ যে প্রশান্তি খুঁজে পায় আজকের ভাগ্যহত মানুষ তাও হারিয়েছে।

বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এইসব উপলব্ধি জীবনানন্দের সৎ-কবিচিত্তকে আলোড়িত

ও অভিভূত করেছিল। তিনি সাধারণ মানুষের সর্বব্যাপী মূঢ়তা কাটিয়ে 'মহাবিশ্বলোকের ইশারায় উৎসারিত সময়চেতনার' ভূমিকায় আবহমান মানবসমাজকে স্থাপন করে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান দিয়ে তাকে মূল্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই সংশয়িত উদ্বেগাকুল চিত্তের দ্বিধা প্রতীকের সেই বিরোধাভাসের মধ্যেই বিম্বিত। আলো ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা, জীবন ও মৃত্যু, কোন শক্তি প্রবল সে কথা কে বলতে পারে। The Ancient Mariner-এর অলৌকিক পাশা খেলায় জীবন জয়ী হয়েছিল। জীবনানন্দের পক্ষে সমাধানে পৌঁছানো অত সহজ ছিল না। তবু তিনিও ক্রমে সংশয় অতিক্রম করে যে মৃত্যু থেকে জীবনের অভিমুখেই অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

'রিষ্টওয়াচ' কবিতাতে এমন এক সর্বাত্মক মৃত্যুর চিত্র পাওয়া যায়। কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হয়ে অসংখ্য সৈনিকের শর চন্দ্রালোকে পাহাড়তলীতে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। তাদের কারো কারো মণিবন্ধের ঘড়ি এই নির্মানব প্রান্তরে সমুজ্জল নক্ষত্রের আলো গিলে এখনো সময়ের কাঁটা ঘুরিয়ে চলেছে। যাদের কথা বলার কথা, তারা স্তব্ধ। কিন্তু জাগ্রত প্রহরীর মতো ঘড়ি কথা বলে চলেছে, যার জন্যে কথা বলা তাদের অভাবে সে কথা অর্থহীন। একইভাবে কাল যে অফুরন্ত রোদের আলো ছড়িয়ে পড়বে তা আর আলোকিত করবে না দশ দিক, কেন না মানুষের দৃষ্টির ভিত্তিতেই সূর্যের আলোকময়তা, রৌদ্র তাই উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ, তা আর তিমির হন্তারক নয়,—তিমিরময়।

'আরেক' কবিতায় যুদ্ধোন্মাদ জাপানের সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গে বলেছেন—

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিল তারা,

. লোকসামান্য

তারা সামান্য মানুষ অলোকসামান্য নয়, তাই তাদের যা বোঝানো হয়েছে তাই বুঝেছে, বাস্তব সত্যকে লক্ষ্য করেনি। নীলিমার সূর্যকে তাচ্ছিল্য করে নিশানের সূর্যকে মহত্তর বলে শেখানো হয়েছিল তাদের। শ্লোগানের আনুগত্যের পরিণামী এই রক্ত মৃত্যু হাহাকার কি তাদের প্রকৃত উপলব্ধির দিকে, চরিত্রসংহতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে? অন্ধ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃত আলোর দিকে পৌঁছানো যায় না একথা মানুষকে বুঝতে হবে।

চারিদিকে "অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়", "দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক /কেবলই আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়"। এই মৃত্যু হতাশার ঘনঘটার মধ্যে কখনো কখনো মনে হয় "কলকাতা থেকে দূর গ্রীসের অলিভ বন"—সেই লক্ষ্যে বোধহয় পৌঁছানো যাবে না, কিন্তু এই চূড়ান্ত আশাহীনতার মধ্যেও কবি উত্তরণ সম্পর্কে বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করে গেছেন।

অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হবে নাকি!—
সূর্যে, আরো নবসূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।

: মকর সংক্রান্তির রাতে

প্রত্যাশা করেছেন ইতিহাস চেতনা, স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর করে দেখার শক্তি জোগাবে।

মহাজিজ্ঞাসা

আলো জল আকাশের টানে দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে কেন কাকে ভালোবেসে প্রাণ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল? তার চিহ্নগুলি জন্মহীন মৃত্যুহীন কুয়াশায় হারিয়ে গিয়েছে। জীবন-মৃত্যুর শাদাকালো অভিজ্ঞতা হৃদয়ে জড়িয়ে এমনই একদিন মানুষেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। আবহমানের রক্ত আর কংকাল, অঙ্গার আর কালির ভিতরে মানুষের যে করুণ ইচ্ছার ইতিহাস সংগুপ্ত রয়েছে তার মধ্যে মানুষই আপন জন্মচিহ্ন চেনাতে এলো। কাকে চেনাতে? আকাশ পৃথিবী, সূর্য ধূলিবর্ষা অণুপরমাণুকে? নাকি নগর বন্দর রাষ্ট্র এসবের ভিতর যে জ্ঞান ও অজ্ঞানের পৃথিবী রয়েছে তাকে?

সৃষ্টি সূচনার কুয়াশা আর ধ্বংসের পরের কুয়াশার অন্ধকার আজকের আলোর বলয়ে বার বার ছায়া ফেলে যাচ্ছে। প্রেম মানুষকে নীলিমার দিকে টানে কিন্তু অজ্ঞতা বারবার সনাতন তিমির সাগরের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তবু সূর্য পৃথিবীর দিকে আলোকেই সঙ্গে করে আনে। প্রকৃতির এই খেলা এই জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বের তাৎপর্য মহা-ইতিহাস এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

মানুষ নিত্য পদচিহ্নের মতো গ্লানি, প্রেম ক্ষয়ের ইতিহাস পিছনে ফেলে এক লক্ষ্যের অভিমুখে চলেছে। নদীর মতোই মানুষের ধূসর হৃদয়ও নিত্যধাবমান। রাত্রির শেষে ভোর আছে, শতশত ভোর; নূতন সূর্য নূতন পাখি নূতন সভ্যতার চিহ্ন এনে দেয়, নূতন যাত্রীরা এসে প্রাণ যাত্রীদের ভিড় বাড়িয়ে দেয়। চলমান মানবতা হৃদয়ে গতিব গান নিয়ে প্রেম নিয়ে অকূলের অভিমুখে শাশ্বত যাত্রীর মতো এগিয়ে চলবে।

আদিম পৃথিবীতে একটিমাত্র আলো লক্ষ্য করে এক একটি সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। যুগের অভিসরণের সাথে সাথে যুগপৎ অন্ধকার ও আলোর রূপভেদ হয়েছে। একদিকে যেমন আদিম সৎ অন্ধকার, আবিল আমিষ অন্ধকার হয়ে উঠেছে; তেমনই যে ম্লান আলোর অভিমুখে প্রাণকণারা প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল—তা আর নেই এখন। আলো চাইতে গিয়ে নিজেদের ঘিরে আমরা অগ্নির রক্তিম উল্লাস সৃষ্টি করেছি। প্রতিনিয়ত আমাদের লক্ষ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। শুভ্র থেকে শুভ্রতর, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোর দিকে গতি আমাদের।

এমনকি আদিম পৃথিবীর মতো একটিমাত্র আলো নিয়ে চিরদিন বসে থাকার দিন চলে গেছে। শত শতাব্দীর সঙ্গে আমাদের সৃষ্টি বহুগুণে বেড়ে গেছে, আমাদেরও জটিল করে তুলেছে। অতীতে একদিন মানুষেরা যা চেয়েছে আজ আর তা চাইবে না। সেদিন—

> মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
> দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে ;
> চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিবের ধারা।

: আবহমান

কিন্তু এখন তাতে আমরা তৃপ্ত নই। এখন—

> যদি কেউ এসে বলে : 'এই সেই নারী,
> একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
> তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?

· ঐ

আমাদের লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়েছে। সে লক্ষ্যেও এক নয়, বহু। একই সঙ্গে অনেক কিছুর সাধনা আমাদের এখন—মহৎ কিছুকে চেয়ে।

আদিম পৃথিবীতে নানা সভ্যতার মৃত্যু হয়েছে—দেখেছি। আজকের পরিণত সভ্যতায় পৌঁছে আর আমাদের একান্ত মৃত্যু নেই। কিন্তু যে গ্লানি ও মালিন্যের বিষ উত্তরাধিকারে বহন করে চলেছি তার ফলে সভ্যতার মর্মেই আজ অন্ধকারের বাসা।'

> তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের আজ মর্মস্থলে
> অন্ধকারে ভাসে।

কারণ নিরন্তর বহমান সময়ের স্রোতে আমরা আর ভেসে চলছি না, সময়ের জালে জড়িয়ে পড়েছি। মানুষ যেভাবে যে পথে অগ্রসর হয়েছিল সেই পথে আর তারা নেই—

> অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
> যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
> যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই,—প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই
> পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
> যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
> এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
> মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
> শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

অদ্ভুত আঁধাব এক

স্বীকার করতেই হবে—এমন বিচিত্র পৃথিবীতে সৎ মানুষের দাঁড়াবার মতো স্থান নেই আর। তবু প্রজ্ঞার আলোকে দেখলে এতখানি হতাশায় অভিভূত হবার কিছু থাকবে না। ইতিহাসের যে পথ থেকে আমরা উৎক্রান্ত হয়ে পড়েছি, সেই পথে আমাদের ফিরে যেতে হবে। 'বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে'—এই সময়টুকুর মধ্যেই আমরা দিকভ্রান্ত পথচ্যুত হয়ে পড়েছি। কিন্তু প্রকৃতির বুকে এসে দাঁড়ালে, বুঝতে পারি, সামান্যতম কৃষকও এই সঙ্কট থেকে ত্রাণের পথ জানে। আমাদের হৃদয় অস্বাভাবিক বলে আমরা চিনতে চাই না। সেইপথ—সততা ও প্রেমের পথই বুদ্ধের পথ, প্রজ্ঞাপারমিতার পথ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পথ।

তার মানে এই নয় যে—তা অত্যন্ত সরল অনুকরণের পথ। অর্থাৎ বর্তমান থেকে অতীতের জগতে ফিরে গেলেই আমরা ত্রাণ পাবো না। 'কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসর

সূর্যালোক নেই'। বর্তমান সভ্যতার জটিল রূপ যে সব সমস্যা ও সঙ্কট তুলে ধরে, তাকে ইতিহাস-পুরুষের সপ্রতিভ আঘাত বলে মনে করতে হবে। এই আঘাতের ভিতর দিয়ে সঙ্কটের গিট খুলতে খুলতে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

বর্তমানের যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আগামী সভ্যতার যে রূপ আমরা দেখি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত দূরদৃষ্টি ছাপিয়েও তার সামনে আরো কিছু আছে মনে হয়। মনে হয়, অতীতে যেমন মূঢ়তার তিমির কেটে এসেছি, বর্তমানে যেমন জ্ঞান-পাপের তিমির কেটে চলেছি তেমনই এর পরে মহত্তর তিমিরের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। সেই তিমির বিনাশ করে তবেই আমরা এক অবিনশ্বর শুভ্র 'আলো-পৃথিবী'তে উপনীত হতে পারবো। তাই—

অনেক আঁধারে আলো দেখেছি, তবুও
আরও এক বড় আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীর ভাবে বোধ করে মন
আকাশ প্রান্তর পথ নক্ষত্রলোকের কাছে গিয়ে।

: দুটি তুরঙ্গম

সেই আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে পৃথিবীর বর্তমান সংক্রান্তিতে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলকে এক আত্মানুসন্ধানের সম্মুখীন হতে হয়। অন্তহীন বেদনার পথে নেমেও যারা বেদনাহীন, জীবনের অসামান্য অপচয়ের মধ্যেও যারা নিঃসাড়, তাদের মধ্যেও দু-একটি লোকের মনে এক মহাজিজ্ঞাসা জেগে রয়েছে—

তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো;—হয়তো সত্য আলো।

: অবিনশ্বর

তাঁদের মনের পটে আঁকা সেই আলোই সত্য আলো কিনা আজ বলা সম্ভব নয়। তবু কয়েকজনের চেতনা থেকে সেই মহাজিজ্ঞাসা সবার মনে ছড়িয়ে দিতে হবে। "আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।"

কাব্যস্মৃতি-১
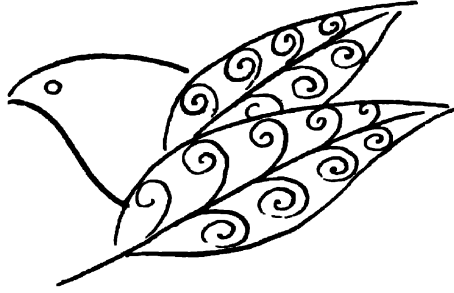
ঐতিহ্য

বাংলাদেশের আবহমানের কাব্যধারার মধ্যে জীবনানন্দকে উৎক্রান্ত মনে হয়—এমন কথা বলেছেন অনেকে। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বিহারিলাল—এঁদের কাব্যচেতনার উত্তরাধিকার সাধারণ অর্থে জীবনানন্দের কাব্যজগতে খুব ক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়ে নেই। সম্প্রতিকালের কোন কবি সম্পর্কেই বা সেকথা বলা চলে, হৃতপ্রভাব কালিদাস রায়-কুমুদরঞ্জন গোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে! কবিতায় উত্তরাধিকার—টি. এস. এলিয়ট যাকে বলেছেন 'ইতিহাস চেতনা'—তার পিছনে আবহমানের অঙ্গীকরণ ও আত্মস্থ করার সাধনা থাকবে, অতীতের নিষ্প্রয়োজন কালচিহ্নের ভার বর্জন করে কবিতার মর্মরস ঘনীভূত করার শক্তি থাকবে, তার গভীরে বর্তমানের যুগ ও জীবনের ভাবনা-বেদনার স্পর্শ থাকবে, আর থাকবে মুক্ত বুদ্ধ ভবিষ্যতের বোধ। ঠিক এই অর্থেই ইতিহাস-সচেতন বলে, জীবনানন্দের মতো স্বতন্ত্র কবিচেতনা নিয়ে বাংলাদেশে কোন কবি কবিতা লেখেননি, আর সেই কারণেই একথাও সমানভাবে সত্য যে জীবনানন্দের মতো ঐতিহ্য-সচেতন উত্তরাধিকার গর্বিত কবিও কেউ নেই! আমরা যে যুগের মানুষ, এই যুগে কবির মৌল সমস্যাই ঐতিহ্য-ঘটিত। কেননা অতীত যুগন্ধরদের সৃষ্টির বৈচিত্র্য স্মরণে আনলে চিন্তার মৌলিকতা প্রায় অসম্ভবই। সব কবিই তাই প্রভাবমুক্তির অবিরাম আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে বিব্রত। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে জীবনানন্দ কেমন অবলীলায় এই সঙ্কটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

জীবনানন্দের কবিতা ভালভাবে পড়লে জানা যাবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ তিনি তো অন্যের মতো সচেষ্টভাবে অতীতের কবিদের প্রভাব এড়াতে চাননি, বরং জেনেছেন, পূর্বতনেরা সৃষ্টির মাধ্যমে কবিতাকে, কবিতার অন্তর্লীন প্রত্যয়কে কোন অভিমুখে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। সাধারণ কবিরা যখন এলোমেলো সৃষ্টি প্রয়াসের দ্বারা পূর্বসূরীদের বিচরণ-ভূমিতে স্থান করে নেবার দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্রতী—জীবনানন্দ তখন জানেন কোনখানে পূর্বসূরীরা থেমেছেন এবং তারপরে কোন অববাহিকায় কবিতার ধারাটিকে প্রমুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে ভগীরথের মতো।

তাই সাধারণ কবিদের মতো সৃষ্টির বিষয় নিয়ে পূর্বতনদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই—বরং প্রাগ্বর্তী কবিতাই তাঁকে সঙ্কেত দেয় তাঁর কবিতার বিষয় এবং প্রযুক্তির। সেই কারণেই প্রাচীন কবিতার অনুবর্তন তাঁর কবিতায় দুর্লভ, কিন্তু সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দুর্লভ নয়। এই উত্তরাধিকার বোধ, ঐতিহ্যের এমন সুস্পষ্ট স্বীকৃতি অবশ্যই 'রূপসী বাংলা'য় সবচেয়ে বেশি। কারণ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো 'রূপসী বাংলা' চলমান জীবনের কবিতা নয়, তা বিগত অতীতের সুখস্মৃতির গাথা। গতির চেয়ে স্থিতিই তার লক্ষ্য। গ্রন্থটি উৎসর্গিত

হয়েছে 'আবহমান বাংলা, বাঙালী'কে। 'আবহমান' শব্দের মধ্যে অতীতের দাবিই মুখ্য, ভবিষ্যতের ততটা নয়।

বাস্তবিক, 'রূপসী বাংলা'র মূল সুরটাই তাই। দেশ তো কেবল ভূগোলের সীমায় চিহ্নিত মাটি বা তার মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী নিয়ে নয়, দেশ হচ্ছে মানুষের হৃদয়ানুভবের রক্তরাগ আলেখ্য, জাতির আবহমানের ঐতিহ্য-চেতনা। কালপ্রগতির সঙ্গে তাই দেশের একটা চরিত্র গড়ে ওঠে। বাংলা ও বাঙালীর জীবনের সঙ্গে তাই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে পুরাণ-কথার মায়া, লোকগাথা, রূপকথা, কীর্তন, পাঁচালীতে বিধৃত জীবনতত্ত্বের অঙ্গীকার। বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে প্রাচীন কবি-কথিত এই জগৎ অদ্বয়ভাবে মিশে আছে। স্তম্ভে প্রাকারে পরিখায় উদ্ধত নাগরিক-সভ্যতা খণ্ডকালীন ও ধ্বংসমান। কিন্তু বাংলার গ্রামের এই রূপের মধ্যে এক অবিনাশী সত্তা আছে। যে তার স্বাদ পেয়েছে সে লোভ-লালসার উন্মাদনা, কীর্তি-প্রতিষ্ঠার মোহ ভুলে শান্ত শুকের মতো আত্মলীন তৃপ্তি নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চায়!

'রূপসী বাংলা'র গভীরতম স্তরে তাই রয়েছে প্রাচীন সাহিত্যের পৌরাণিক পটভূমি। অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনায়, উমা-চন্দ্রশেখরের সশ্রদ্ধ উল্লেখে, অনুরাধা, রোহিণী, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিত্বের প্রতীকী ব্যবহারে এই জগৎ ও জীবনের নিগূঢ় কিন্তু প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় মিলবে।

> সতীর শীতল শব বহুদিন কোলে লয়ে যেন অকপট
> উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে—চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
> উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে ;

: ২৩ রূ. বাং.

অথবা যেমন

> তুমি কবি করিয়াছ স্নান
>
> সাত সমুদ্রের জলে—ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারীদেশে
> অর্জুনের মতো আহা—

: ৩৫ রূ. বাং.

পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের এই জগৎ 'রূপসী বাংলা'র খণ্ডকালেই একবার দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে এমন নয়। পরেও এমন অজস্র আশ্চর্য প্রয়োগ তাঁর ঐতিহ্য অবহিতির সাক্ষ্য দেবে। সেখানে কবিতার বিষয়ের মধ্যে তার প্রয়োগ এত বিশিষ্ট, এত উজ্জ্বল-ভাবনাদীপ্ত যে ঠিক অনুরূপ উপস্থাপন নৈপুণ্য সমকালীন অন্য কোনো স্বদেশীয় কবির মধ্যে দেখা যাবে না। সভ্যতার বর্তমান সংক্রান্তিতে মানবাত্মার গ্লানিমুক্ত হওয়ার, পবিত্রতর হওয়ার রক্তাক্ত সাধনা বোঝাতে যখন কবি সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও খ্রিষ্টের রক্তাতিপাতের উল্লেখ করেছেন তখন তার ব্যঞ্জনা এই ছোট্ট কবিতাটিতে ভাবগত চূড়ান্ত সিদ্ধি এনে দিয়েছে—

প্রতিটি রেশম থেকে সীতা তার অগ্নিপরীক্ষায়—
অথবা খ্রীস্টের রক্তকরবী ফুলের মতো লাল।

: সাবলীল মহাপৃথিবী

অথবা আরো একটি কবিতায়—

ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে?

: অনুপম ত্রিবেদী

প্রবাদের বলি রাজা বামনের তৃতীয় পদ ধারণ করেছিলেন মস্তকে। কিন্তু একালের কবিই আবিষ্কার করলেন আরো বিশালতর ভূখণ্ড নিহিত রয়েছে আধুনিক বলির হৃদয়ের অন্তস্তলে।

এমনই আবার সার-রিয়ালিষ্ট কবিতার বিমিশ্র ভাবাবহ সৃষ্টিতে যখন তিনি তাঁর পৌরাণিক প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন তার বিচিত্র স্বাদেরও একটু নমুনা রাখছি—

১। ঘরের ভিতর থেকে খসে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদান পরিপাক করে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চলে যায়,

: বিভিন্ন কোরাস সা তা. তি.

২। ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দেখায়ে সমাপ্ত হলে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সঙ্কেতে
পৃথিবীর জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিল আড়ি পেতে...

: মহিলা

অথবা আরো পরবর্তীকালে যখন বর্তমানের জগৎ ও জীবন তাঁর চেতনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সমস্ত আলঙ্কারিক রূপ-রীতি বর্জন করে কবি যেন মুক্ত-শুদ্ধ-ঋজু ও অনাড়ম্বর হয়ে উঠেছেন, যেখানে কবি প্রায় দৈবজ্ঞের (Prophet) ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সময় ও সভ্যতার প্রকৃতি ও গতি-নির্দেশ করছেন তখনো তাঁর পরিণত চিন্তায় প্রাচীন প্রসঙ্গ তাৎপর্য-গভীর ভাবে বারবার এসেছে।

১। সে-হৃদয় মানুষের আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়
শচীর মতন এসে দাঁড়াচ্ছে ;
অথবা সে ইন্দ্রাণীকে ভেদ করে অহল্যার মতো;
সহস্র চোখ না যোনি এতদিন পরে আজ কলকাতায় ইন্দ্রের শরীরে?

: এইখানে সূর্যের

২। নদী এসে বার-বার যযাতিকে যৌবন দেয়
ঘনজলধন্যা নদী—স্থবিরতা নেই ;

: কখনও মুহূর্ত

এমনই দক্ষ প্রজাপতি, কল্কি, মৈত্রেয়ী, সগর, কপিল, নচিকেতা, কীচক, চার্বাক, বরাহ অবতার, উষা, অনিরুদ্ধ, তপতীর মতো প্রসঙ্গের উল্লেখ গণনাতীত বার পাওয়া গেছে।

বস্তুত অতীতের মহান সাহিত্যের এই ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় ভুলে গিয়ে কবিতা রচনা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলেও সমীচীন কিনা সেকথা এ যুগের কবিদের বিবেচনার সময় এসেছে বোধহয়।

লোক-নিরুক্তি

অথচ এই পৌরাণিক পৃথিবীর চেয়ে আমাদের বাংলাদেশের লোকগাথায় প্রবচনে কিম্বদন্তীতে রূপকথায় বিবৃত যে জগৎ, তাই জীবনানন্দের কবিমনকে প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট করেছে। সংস্কৃত-সাহিত্য-তত্ত্ব যদি ভূগর্ভস্থ ভোগবতীর মতো তাঁর কবিতার অন্তস্তলে প্রবাহিত হয়ে থাকে, এই সব রূপকথা লোকগাথার প্রসঙ্গ তাঁর কবিতার উর্ধ্বলোকে আকাশগঙ্গার মতো জ্যোতির্ময় শোভা নিয়ে চন্দ্রাতপের মতো রয়ে গেছে। সেই আকাশে স্বচ্ছন্দ ডানা মেলা। সেই স্বর্গে জীবনের জটিলতা থেকে নিশ্চিন্ত পলায়ন।

আমাদের এই লৌকিক পৃথিবী, এই বাস্তব জীবন, রূপসী বাংলায় কবি এরই পাশাপাশি মিলিয়ে দিয়েছেন এই রূপময় মায়ারাজ্য, এই চন্দ্রমালা শঙ্খমালা, কঙ্কাবতী, কাঞ্চন মালার অশ্রুসজল শীতল কাহিনী, মীনকন্যা ও পক্ষীরাজের কল্পিত আশ্চর্য বৈভব। অথচ তাঁর রচনার এই জগৎ এত সত্য, এত বাস্তব যে মনে হয় তিনি সেই সজীব জগতে যেন হারিয়ে গেছেন। সেখানে গেলে—

> কান পেতে থাক যদি—শোনা যায় সরপুঁটি চিতলের স্বর
> মীনকন্যাদের মতো ; সবুজ জলের ফাঁকে তাদের পাতালপুরী ঘর
> দেখা যায়—রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ—রূপালি মাছের দেহ : গভীর উদাসী
> চলে যায় মন্ত্রিকুমারের মতো, কোটাল-ছেলের মতো,
> রাজার ছেলের মতো মিলে
> কোন্ এক আকাঙ্ক্ষার উদ্ঘাটনে কত দূরে—

: ৫৮ রূ. বা.

সেই কৈশোরের সবুজ বিশ্বাস ও আশ্চর্য রহস্যবোধ এইসব কবিতার অনুষঙ্গী হয়ে আছে। যেন কবির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৈশোর-সত্তাও সেই সব স্থানগুলি দেখে আসে—

> যেইখানে পাটরানী আর তার রূপসী সখীরা শুনিয়াছে
> বহু—বহুদিন আগে;—যেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
> সে কত শতাব্দী আগে মাছরাঙা-ঝিলমিল ;

: ৩২ রূ. বা.

এইভাবে সেই অতীতের সোনার স্বপ্নকে হারিয়ে ফেলে, তার স্মৃতি তার স্বপ্নকে হাতড়ে ফেরার বেদনায় তিনি কবিতাগুলিকে রসমধুর করে তুলেছেন। আমাদের জীবন থেকে শৈশবের সেই বিস্ময়ের দিনগুলো হারিয়ে গেছে, জগৎ থেকে সেই রূপকথার দিনগুলোও। কোনোদিনই তারা আর ফিরবে না—তাই কি তারা মিথ্যে হয়ে গেছে?

কবির দৃষ্টিতে এই রূপকথার রূপলোকের সঙ্গে পাঁচালী ও পদাবলীর অর্ধ-প্রাকৃত জগতের বাস্তবিক কোনো ভেদ নেই। বর্তমানের বাংলার অন্তরে তিনি কেবলই সেই হারানো বাংলার পুরানো দিনগুলিকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাই তাঁর মনে হয়েছে—

ফণী মনসার বনে মনসা রয়েছে নাকি?—আছে ; মনে হয়।
এই নদী কি কালীদহ নয়? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি নাকি? বিষণ্ণ মলিন ক্লান্ত কী যে
সত্য সব—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

: ৯ রূ. বা.

এই বিশ্বাসের ধ্রুব জগৎ থেকে বাংলার নারীকে দেখে তাঁর অনায়াসে সংশয় হয়—

চেয়ে দেখ সুন্দরীরে : গোরোচনা রূপ নিয়ে এসেছে কি রাই
নীল নদে—গাঢ় রৌদ্রে—কবে আমি দেখিয়াছি—করেছিল স্নান—

৩৪ রূ. বা.

কেবল রাইকেই তিনি নীল নদে স্নান করতে দেখেননি। তিনি যেন স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করেন সেই দিনটিকেও—

যখন মুকুন্দরাম, হায়
লিখিতেছিলেন বসে দুপহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়—থেমে থেমে যায়—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল

: ৩১ রূ বাং.

তারপরে আর পৌরাণিক, রূপকথার, মঙ্গলকাব্যের জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের অতীত থেকে বর্তমান অবধি মিলিয়ে নিতে তাঁকে বেগ পেতে হয় না।

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালীদহে ক্লান্ত গাঙশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার :
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

: ২৩ রূ. বা.

শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, ধনপতি, বল্লাল সেন, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ থেকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের দেশবন্ধু অবধি সবই তাঁর কবি-দৃষ্টিতে সমান প্রত্যক্ষতা নিয়ে উপস্থিত।

একটি লক্ষণীয় দিক অভিনিবেশী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না যে এই রূপকথার রূপলোক, পদাবলীর মধুর মায়া জীবনানন্দকে ততদিনই আকৃষ্ট করেছিল যতদিন তিনি

গ্রামীণ কল্পনার জগতে চিন্তাহীন সৌন্দর্যের স্বর্গে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু যখন শহরে এলেন, নব-চেতনার আলো জ্বললো, মানবভাগ্যের পরিণতির অভিমুখে সন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন তখন এই মায়ালোক তাঁকে আর বাঁধতে পারলো না। 'বনলতা সেন' যেহেতু মিশ্র অনুভূতির কাব্য, যেহেতু এর এক কোটিতে 'অন্ধকার' কবিতার গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে লালিত তাঁর আত্মা, এবং অন্য কোটিতে 'সুচেতনা'র ক্লান্তিহীন নাবিকের সূর্যকরোজ্জ্বল মানব-সমাজ-গড়ার প্রতিজ্ঞা, তাই এই গ্রন্থেও রূপকথার 'শঙ্খমালা'কে আবার দেখা গেল বিচিত্র আকার, বিচিত্র রূপ নিয়ে, বিচিত্র স্বাদ হয়ে আসতে।

চোখ তার,
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

: শঙ্খমালা

কিন্তু এবারে হিজল কাঠের রক্তিম চিতার আগুনে শঙ্খমালাকে পুড়ে যেতে হলো। বাস্তবিক জীবনানন্দের কাব্যে শুধু একবার 'রূপসী বাংলা'র রূপ-জগতেই রূপকথার মায়ালোককে তার স্বাভাবিকতায় পাওয়া গেছে, পরে আর পাওয়া গেল না।

এই গ্রন্থে রাধিকার প্রসঙ্গও একবার এসেছে বটে কিন্তু কোনো গভীর ব্যঞ্জনা নেই তাতে, সেখানে রাধিকা খণ্ডকালীন সৌন্দর্যের প্রতিমা মাত্র।

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো ;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

: মিতভাষণ

বরং এবার থেকে বৌদ্ধযুগের গৌরবদীপ্ত লোকশ্রুতির রাজ্যে তাঁর ক্রমবর্ধমান আনাগোনা। কেননা, পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন, আর তাই শুশ্রূষা ও শান্তি খুঁজে, প্রাণের অন্তিম আকাঙক্ষা নিয়ে কবিরও সে এক উতরোল সমুদ্রাভিযান—

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

: সুরঞ্জনা

বলা বাহুল্য সেই শান্তি, সেই শুশ্রূষা প্রেম করুণা ও অহিংসা।

অথচ আমাদের কাল রণ-রক্ত-সফলতাকেই চরম বলে মেনে নিয়েছে। মানুষের

মৃত্যুর মূল্যে আমরা সোনার ফসল উৎপাদন করি—এই বিমূঢ়তা, এই নির্বোধ গৃধ্নুতার বেদনা দুরপনেয়।

> সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
> শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
> আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ
> মূক করে রাখে ;

: সুচেতনা

এখানে বুদ্ধ বা কনফুশিয়স ব্যক্তি নন—অতীতের সেই সব প্রাজ্ঞরা সার্বিক কল্যাণের কথা মনে রেখে ব্যক্তি স্বার্থের প্রলোভন ভুলতে পেরেছিলেন। বিশ্বমানবের প্রতি পরম করুণায়—'স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিলো ভুলে।' কিন্তু তাতেও, তারপরেও মানুষের দুর্গতির নিরসন হয়নি। তাঁদের সেই সাধনা, সেই আত্মত্যাগ কি অর্থহীন হয়ে গেছে?

আরো পরবর্তীকালে জীবনানন্দ অনুভব করেছেন পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের আড়ালে আরো এক আলো আছে। অতীতের মনীষীরা তার কথা উল্লেখ করে গেছেন—

> মাদালীন দেখেছিল—আরো কেউ-কেউ;
> অম্বাপালী সুজাতা ও সঙ্ঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
> আড়ালে আর-এক আলো দেখেছিলও ;

: এইখানে সূর্যের

সেই উজ্জ্বলতর আলোকক্ষেত্রকে আমরা আমাদের হৃদয়ের দোষে আজ হারিয়ে ফেলেছি। বুদ্ধের মৃত্যুর পর কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে এই পথচ্যুতি। কিন্তু আজো যদি আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পথে, প্রজ্ঞাপারমিতার পথে এসে দাঁড়াই তবে আর ভয় থাকবে না। তাই প্রাচীন ইতিহাসের গভীরে জিজ্ঞাসার ভাষা নিয়ে তাঁর বারবার অভিযান।

> একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে
> বিজ্ঞানে প্রবীণ হ'য়ে—তবু—কেন অম্বাপালীকে
> চেয়েছিলো প্রণয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠে!
>
> চেয়েছিলো—
> শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে :

: মানুষের মৃত্যু হলে

আসলে বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব জীবনানন্দকে জীবনের এইসব মৌলজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে পেরেছিল। তাই জীবনের অন্তিমকাল অবধি বারবার উদয়ন, দেবদত্ত, নাগার্জুন, বিম্বিসার প্রভৃতির প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে দেখা দিয়েছে।

সাধারণ বিচারে এইগুলিকে কখনোই প্রভাব বলে গণ্য করা হয় না। আমাদের চিরকালীন নির্বোধ পাণ্ডিত্য নিয়ে আমরা পংক্তিতে পংক্তিতে সাদৃশ্য খুঁজে গম্ভীর উচ্চগ্রামে

ঘোষণা করবো জীবনানন্দ একান্ত উৎক্রান্ত কবি। বুঝবো না এতে গৌরবেরও কিছু নেই, সত্যেরও সংস্রব অল্প। কবিস্বভাবের মধ্যে এই যে গভীর অন্তর্লীন একাত্মতা—যার মধ্যে প্রভাবের যাথার্থ্যটি নিহিত—তা অনায়াসেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

প্রভাব-পর্ব

প্রথানুগ দৃষ্টিতেও জীবনানন্দ দাশকে সর্বপ্রভাব বর্জিত বলার কারণ আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। একেবারে সূচনায় 'ঝরাপালকে' সে যুগের নামী কবিরা প্রায় সকলেই তাঁর লেখায় ছায়া ফেলেছিলেন তা আজ আর কারো অপরিজ্ঞাত থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও—আমরা সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি,—এই পর্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি প্রধানেরা কিভাবে তাঁর কবিতার বিষয়ে এবং বিন্যাসে উপস্থিত দু-একটি দৃষ্টান্তে তা প্রতিপন্ন হবে।
সত্যেন্দ্রনাথের 'কিশোরী' কবিতার একটি স্তবক—

তার সিঁথার রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগল ভুল।
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান লাগল মেঘে,
কানে জোড়া দুল দেখে তার
ঝুমকো-জবা দোলায় দুল ;
তার সরু সিঁথার সিঁদুর মেখে
রাঙা হল রঙন ফুল।

শুধু ছন্দ নয়, এর সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার বিষয় এবং ভাষা সৌষ্ঠবটাও লক্ষ্য করুন।

খস্‌খসাল শাড়ি কাহার!
উস্‌খুসাল চুল গো !
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে ;
জুল্‌পি কাহার উঠলো দুলে!
দুলল কাহার দুল গো!
উস্‌খুসাল চুল গো।

: ছায়াপ্রিয়া

খসখসাল, উসখুসাল ইত্যাদির মতো ধ্বন্যাত্মক নামধাতু ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথেরই প্রিয় রীতি। পূর্বোক্ত 'কিশোরী' কবিতাতেই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন 'কুলিকুলিয়ে ঢেউগুলি

যায়'। শুধু এই রকম সাদৃশ্যই নয়, সত্যেন্দ্রনাথের অনুরূপ বিশিষ্ট ভাবনার কবিতাও 'ঝরাপালক' গ্রন্থে মিলবে—

এ ভারত ভূমি নহেকো তোমার, নহেকো আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ,—মুসলমানের রেখা;
—হিন্দু মনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে
ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে।
পাটলিপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রটিছে কীর্তি লীলা
—ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণা!

: হিন্দু-মুসলমান

আরো একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর প্রথম দুটি পংক্তিতে নজরুলের ভাষারীতির চিহ্ন রয়েছে। আর শেষ দুটি পংক্তির পর্ববিন্যাসে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাগুচ্ছের বিশিষ্ট পর্ববিন্যাসের ভঙ্গি স্মরণে আসবে।

বাস্তবিক 'কল্লোলে'র যারা কবি তাঁদের চিন্তা-চেতনায় নজরুলের ব্যক্তিত্ব যেন প্রাণের নিবিড়ে মিশে আছে। নজরুলের মতো আরবি ফারসি শব্দপ্রয়োগ ও ভাষাবিন্যাস জীবনানন্দের প্রথম জীবন-পর্বে কত প্রবল ছিল তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। উপাদানে নয় কেবল, 'ঝরাপালকে'র কোনো কোনো কবিতায় নজরুল ইসলামের বক্তব্যও ক্বচিৎ অনপনেয় ছাপ রেখেছে। আমরা দুটি নমুনা রাখলাম।

১। অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণ তলে
বারবার যবে কেঁদে কেঁদে গেল কাতর আঁখির জলে
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুমদলে!
কোথা পাপী? তাপী কোথা?
—ওগো ধ্যানী, তুমি পতিত পাবন যজ্ঞে সাজিলে হোতা!

. বিবেকানন্দ

২। গাহি মানবের জয় !
—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয়!
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি কোটি বুকে দেউটি জ্বলিছে,—কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানব দেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয়!
—জয় মানবের জয়!

: নব নবীনের লাগি

নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছের প্রতিধ্বনি এখানে রয়েছে, এ তথ্য বিদগ্ধ পাঠকের কাছে বাহুল্য বিবেচিত হবে।

'বনলতা সেন' কবিতার প্রতিতুলনায় স্মরণে আসবে নজরুলের একটি বিখ্যাত গান—

দূরদ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো
সুমন্দ ভাষিণী।
প্রশান্ত সাগরে তুফানে ও ঝড়ে
শুনেছি তোমারি অশান্ত রাগিণী।

জীবনানন্দের অতি দূরে সফেন হালভাঙা দিশাহারা নাবিক দারুচিনি দ্বীপের মতই আশ্রয় খুঁজে পায় পরিচিতা বনলতার কাছে। নজরুলেরও তুফানে ও ঝড়ে বিপন্ন নাবিক দূর দ্বীপবাসিনী দারুচিনি দেশের বিদেশিনীর মধ্যে পরিচিতাকে খুঁজে পেয়েছে। এতখানি সমতাকে আকস্মিক মনে করা কঠিন।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টির অনুবর্তন নেই। তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতির প্রভেদও দুস্তর। তাই এই আকস্মিকতাকে বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে 'ঝরাপালকে'র একটি কবিতায় যেন প্রমথ চৌধুরীর গোপন স্পর্শ নিহিত। তাঁর শ্লেষের তির্যক তীক্ষ্ণতা নয়, শুধু বর্ণনার ভঙ্গিটুকু। তাঁর বিখ্যাত 'ব্যর্থজীবন' সনেটটির রীতি ছিল নঞর্থক বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণনীয়ের চারিত্র্যধর্ম ফুটিয়ে তোলা।

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে।...

: ব্যর্থ জীবন (প্রমথ চৌধুরী)

জীবনানন্দের আলোচ্য কবিতাটিরও রীতি একই। আংশিক তুলছি—

সুধার সন্ধানে লক্ষ বিষ পাত্র চুমি
সজোনিকো নীলকণ্ঠ ব্যাকুল বাউল!
অধরে নাহিকো তৃষ্ণা চক্ষে নাহি ভুল,
রক্তে তবে অলক্ত যে পরে নাই আজও রানী,
রুধির নিঙাড়ি তব আজও দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন!
কারাগার নাহি তব, নাহিক বন্ধ ;

: কিশোরের প্রতি

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি আনুপূর্বিক পড়ে দেখতে পারেন আগ্রহীরা।

প্রবীণ সমালোচক ডঃ সুকুমার সেন 'ঝরাপালক'-এর সমকালীন, গ্রন্থে অসংগ্রথিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-যতীন্দ্রমোহন-কালিদাস রায়েরা যে পল্লী-রোমান্সের বর্ণনায় খ্যাতি পেয়েছিলেন সে যুগে জীবনানন্দও তেমন কবিতার চর্চা করেছিলেন। সার্থকও হয়েছিলেন বলতে হবে।

পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদুলি মেয়েটি কই!
কতদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের;
সারা দিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
কই কই বালা আজিকে তোমার পাই না কেন গো টের!

তোমার নখের আঁচড় আজিও লুকায়ে যায়নি বুকে,
কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে!
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারি ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে!

কই বালা কই!—প্রণাম দিলে না!—মাথায় নিলে না ধূলি!
—বহুদিন পরে এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে
কুটিরের পথে ফুটিয়া রয়েছে রাঙা রাঙা জবাগুলি,—
উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে!

পলাতকা (বঙ্গবাণী)

'বনতুলসী', 'উজান-নদী', 'জবা'* ইত্যাদি শব্দগুলি প্রয়োগের কৌশল থেকেই বোঝা যায় এই ঋণকে প্রচ্ছন্ন রাখার বিন্দুমাত্র প্রয়াস কবির নেই; বরং তাঁদের কাব্যের স্মৃতিকে পাঠক চিত্তে জাগিয়ে ধ্বনিময় করে তোলাই তাঁর অভিপ্রায়।

কিন্তু এই ঋণ-প্রমাণের জন্যই এই পরিত্যক্ত কবিতাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে বসিনি। করছি এই কারণে যে 'রূপসী বাংলা'র পল্লী-প্রীতির আদি উৎসে এই নিবিড় রসের কবিতাটি পাওয়া গেল। 'রূপসী বাংলা'র ভাবভূমির পশ্চাৎপটে যে এইসব কবিদের পরোক্ষ স্পর্শ রয়ে গেছে তারই ছিন্ন সূত্রটি এই কবিতাতে উদ্‌ঘটিত হলো। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে প্রাগুক্ত কবিগোষ্ঠী যেখানে পল্লী-প্রকৃতি এবং গ্রামীণ মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার রসে কবিতাকে ঋদ্ধ করতে চেয়েছেন জীবনানন্দ সেখানে সেই জীবনের মধ্যে আত্মলীন হয়ে গিয়েছেন বলেই গভীর আন্তরিকতার স্বতন্ত্র স্বাদ এসেছে।

ভাব-সারূপ্য

হাঁসের পিঠের জল যেমন ডানা ঝাড়লেই ঝরে যায় সমকালীন কবিদের প্রভাব 'ঝরাপালকে'র পরে জীবনানন্দ নিঃশেষে কাটিয়ে উঠেছেন। তবু পরের পর্যায়ের কবিতাতেও ক্বচিৎ কখনো কারো কারো কবিতার একটি-দুটি পংক্তি বা ভাবের খণ্ডাংশের চিহ্ন

---

* উজানি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত কাব্যগ্রন্থ
বনতুলসী—ঐ
জবা—কালিদাস রায় রচিত কাব্যগ্রন্থ

পাওয়া যাবে। 'বনলতা সেনে'র 'অন্ধকার' কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি স্মরণে আসে—

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন?

. অন্ধকার

অথবা প্রেমের ক্ষণিকতা এবং স্মৃতির দহন বোঝাতে গিয়ে জীবনানন্দ যখন লেখেন—

১। সব শেষ হবে—তবু আলোড়ন, তাকি শেষ হবে।

: অনেক আকাশ

২। আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মতো তবু জ্বলে
আমাদের এ-জীবন!

. প্রেম

তখন আমরা অনুভব করি এই বক্তব্যই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাবেই তুলে ধরেছিলেন 'ত্রিযামা'য়।

তোমার যৌবন গেছে
তবু আমি আছি বেচে—এ বড় বিস্ময়
আজি ওই তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন—শুধু স্মৃতিময়!

. শপথ ভঙ্গ

এ কোনো সাদৃশ্য নয়—কিন্তু চিন্তার সারূপ্য যেন চেতনার অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। এক একজন কবি এক একটি বিষয়ের উপর নিজের প্রতিভার এমন দৃঢ় মুদ্রাঙ্কন করে যান যে জেনেও আমরা ভুল করি, বুঝি ওই বিষয়টাতেই কবির অধিকার। কিন্তু বিষয়মাত্রই সর্বজনের। কোনো কবির তা তো একান্ত হতে পারে না। আরো একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। মোহিতলালের কবিতায় দেহবাদের এক বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। সমকালীন 'কল্লোলে'র অনেকের মতোই জীবনানন্দও সেই দেহচেতনায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে। কিন্তু তবু যখন আমরা দেখি মোহিতলালের মতোই, দেহজ দুঃখ আর জীবন যে অদ্বৈত, জীবনকে ভালবাসা দুঃখকে স্বীকার করে নেবার অন্য নাম, মোহিতলালের ভাষায়—

'প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ'
কেননা 'যত দুঃখ, যত শোক—তত সত্য এ ভব-ভবন'

. নারী স্তোত্র (মোহিতলাল)

এই বক্তব্য জীবনানন্দের লেখাতে রয়েছে দেখি, তখন আশ্চর্য মনে হয়।

আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া!—মুকুলে-মুকুলে
শুধু কীট,—আঘাত,—দংশন,—
চায় আজ মন!
... ...
আমি তবু ব্যথা দেই—
ব্যথা পাই ফিরে!—
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ ব্যথায় সুখ!

· পিপাসার গান

এইভাবেই 'বনলতা সেনে'র 'শঙ্খমালা' পড়তে পড়তে যখন অজিত দত্তের 'পাতাল-কন্যা'র স্মৃতি জেগে ওঠে, মনে হয় পাতাল কন্যার স্নিগ্ধ মাধুর্য এখানে কালের প্রেতস্পর্শে বীভৎস রসাপ্লুত হয়ে উঠেছে, তখন অনুভব করা যায় এক কবির সঞ্চরণভূমিতে ভিন্ন জাতের প্রতিভা এলে কি ফল ফলে উঠতে পারে।

কিন্তু সে কথা অবান্তর। জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে ক্বচিৎ কখনো প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা স্মরণে আসে। মনে হয়, অনেক সময়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা তাঁর সৃষ্টির পিছনে অন্তর্লীন প্রেরণার মতো। জীবনানন্দের দুটি অল্পখ্যাত কবিতা থেকে তুলছি।

১। শহর ও গ্রামের দূর মোহানায় সিংহের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে—
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।
... ...
সিংহ হুঙ্কার করে উঠছে;
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।
চারদিককার আবছায়া সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে
যায় সব।

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।

: শীত রাত

২। আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে?
পিরামিড যারা গড়েছিল একদিন—আর যারা ভাঙে—গড়ে—

মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস্ যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচামালে;
যে সব ভ্রমণ শুরু হল শুধু মার্কো পোলোর কালে;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে সব জ্যোতি
দেশলাই কাঠি নয় শুধু আর—কালপুরুষের গতি;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হলে কি করে চলে—
আমাদের প্রভু বিরতি দিও না; লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।

: প্রার্থনা

প্রথমটিতে প্রেমেন্দ্রের 'বাঘের কপিশ চোখে' কবিতার প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট। দ্বিতীটিতেও তাঁর কবিতার অনুভাবনা অলক্ষিত নয়।

ইতিহাসের অতীত প্রেক্ষাপট উন্মোচন করতে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভালবাসেন।

পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর,
সুমের, মেম্ফিস, উর, নিনেভে, ওফির,
মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর ;

: বিনিদ্র (প্রেমেন্দ্র)

সুমের, উর, নিনেভে, জীবনানন্দেরও প্রিয় স্থানবাচক নাম। মৃত্যু কবলিত অতীতের রূপক হিসাবে 'ঘুম' কথাটিকে জীবনানন্দও বারবার ব্যবহার করেছেন। ইয়েট্‌সের কবিতাতেও অনুরূপ ভাবনার দেখা মিলবে। যেমন—

Out of dark night where lay the crowns of Nineveh.

মনে হয়, এই একই উৎস থেকে উদ্দীপিত হওয়ায় উভয় কবির ভাবনাতেই এই ঐক্য এসেছে।

'রূপসী বাংলা'কে উদ্দেশ্য করে জীবনানন্দ লিখেছেন তাঁর যখন মৃত্যু হবে, তাঁর আজকের এই গভীর ভালবাসা মুছে যাবে, তখন এই রূপসী বাংলার সঙ্গে—

আবার কাহার সাথে ভালবাসা হবে তার—আমি তা জানি না;—
মৃত্যুরে কে মনে রাখে?...কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারোমাস
নতুন ডাঙার দিকে—পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায়—শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ?

১৮ : রূ. বা.

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?' এই উক্তিটি কি প্রেমেন্দ্রের ঐ নামের কবিতাটিকে স্মরণে আনবে না!

জীবনানন্দের 'পাখিরা' কবিতার সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের 'সাগর পাখীরা' কবিতার আরো গাঢ়তর সাদৃশ্য নজরে পড়বে। 'বনলতা সেন' গ্রন্থে 'বুনোহাঁস' কবিতাকে প্রেমেন্দ্রের 'মৃত্যুত্তীর্ণ' কবিতার প্রেরণায় লেখা বলে মনে হবে। কিন্তু দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে যেটা বলা প্রয়োজন তা হলো ভাবনার বিচিত্র নূতনত্ব প্রেমেন্দ্রের কবিতায় থাকলেও ভাব যে পর্যায়ে ও পদ্ধতিতে রসায়িত হয়ে ওঠে সেই পরিণতির অভাব আছে একথা স্বীকার্য। তাঁর কবিতা অনেক ক্ষেত্রে স্মরণীয় ভাষণ মাত্র। সেই উপকরণ দিয়েই জীবনানন্দ রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি করেছেন। উভয় কবির উদ্ধৃতনাম চারটি কবিতা পাশাপাশি নিয়ে পড়লে বোঝা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভাব কোথায়, আর কোথায় জীবনানন্দের সার্থকতা।

রবীন্দ্রানুসৃতি

কেউ কেউ বলেন, জীবনানন্দের কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। তাঁদের এমন উক্তি নিঃসন্দেহে বিস্ময়-উদ্রেকী। একথা সত্য, শিল্পী জীবনানন্দের রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ খুব সামান্য। কাব্যের আঙ্গিকে এবং প্রকাশ-পদ্ধতিতে তিনি একান্ত স্বকীয়তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। হয়তো পাশ্চাত্য আঙ্গিকের অনুসরণ করেছেন কখনো কখনো। কিন্তু ভাবনা-কল্পনার অন্তত কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রচ্ছন্ন নেই। এই সাধর্ম্য যে শুধু অনুকরণাত্মক হবে এমন কোনো কথা নেই, বিরোধাত্মকও হতে পারে। আমরা অন্যত্র প্রেম প্রসঙ্গে, প্রকৃতি প্রসঙ্গে, ঋতুবর্ণনায় জীবনানন্দের এই স্বাতন্ত্র্য—রবীন্দ্রকাব্যের ভাবনুষঙ্গের অননুরূপ আবহ গড়ে তোলার শক্তি ও সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি। তার পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। 'কল্লোলে'র আমলে এই ইচ্ছা সমকালের কবি মহলে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার প্রাণ ও প্রয়োজন প্রমাণ করার জন্যে উদগ্র হতে দেখা গিয়েছিল।

'ঝরাপালকে'র 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতাটির নাম রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি তুলেই করা হয়েছে শুধু স্পষ্ট প্রমাণ করতে যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজমের পথ থেকে এ কবিতা ভিন্ন পথের। ডঃ সুকুমার সেন প্রথম তুলে ধরলেন—রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে' কবিতার বিপরীত চিত্র রয়েছে 'ঝরাপালকে'র 'অস্তচাঁদে'। তিনিই দেখিয়েছেন—'ধূসর পাণ্ডুলিপি' রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মতোই নিঃসঙ্গ দুর্বোধ্য কবি-আত্মার অস্পষ্ট আত্মানুভব বলেই শুধু 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' ব্যবহৃত নানা উপমা ও চিত্রকল্প এই পর্যায়ে ফিরে ফিরে আসছে এমন মনে করার কারণ নেই।*

---

* ডা. সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে নীচের পংক্তিগুলি উদ্ধার করেছেন—

১। শত শত মৃত তারকার/মৃতদেহ রয়েছে শয়ান। (তারকার আত্মহত্যা)

২। শুনিতে পারিনে আর একই গান, একই গান। (হৃদয়ের গীতিধ্বনি)

এর সঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এই পংক্তিগুলির যথানুক্রমিক মিল দেখিয়েছেন।

১। যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত। (নির্জন স্বাক্ষর)

২। যে কোন জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়। (বোধ)

বরং 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র ভাব ও সুরই এখানে এবং এর পরের কবিতা গ্রন্থগুলিতে অভিব্যক্তি পেয়েছে।

আরও পরে দেখা যাবে—এমন আপাত সদৃশ মনোভঙ্গির মূল আরো গভীরে প্রোথিত। প্রাণের যে অভিযাত্রার কাহিনী জীবনানন্দের কাব্যের মূল উপজীব্য, উত্তরসূরী হিসাবে তার উপকরণ তিনি রবীন্দ্রকাব্য থেকেই সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জীবনের উদ্বর্তন সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবনার সংশ্রব ছিল। জীবনানন্দের রচনায় তাঁর স্বকীয় মরমী-রীতিতে প্রাণের বন্ধুর পথক্রমার ইতিহাস রচিত হয়েছে যেন। তাঁর কাব্যের নায়ক জীবনের প্রতীক আলোকণা। প্রাণ-কণা আলোকমুখী, তবু তার গতি সরল নয়। অনেক চড়াই উৎরাই, পাকদণ্ডীর বেদনা সহ্য করে তার অগ্রযাত্রা। অনেক অন্ধকারের আবহ অঙ্গীকার করে তার আলোক-তপস্যা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ভূমিকায় তাঁর যে ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ, এতখানি অন্য কোন আধুনিক কবির সঙ্গে দেখা যায় না। একথা খোলাখুলি স্বীকার করায় জীবনানন্দের কবিকৃতিকে কোন ভাবে খাটো করা হবে মনে হয় না। বিশেষত, মনের অসংজ্ঞান লোকে অভিসঞ্চারে তিনি তো রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে গিয়েছেন।

উপরি উক্ত কথাগুলির বিস্তৃততর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। প্রাণের অভিযাত্রার কাহিনী ঠিক রবীন্দ্রকাব্যের মূল কথা নয়—তা রবীন্দ্রনাথেরই প্রাণ সম্পর্কিত ভাবনা-কল্পনার প্রসারণ মাত্র। রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধানতত্ত্ব—জড় থেকে চেতনার ক্রমবিকাশবাদ। জড় থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে জঙ্গম জীবের মধ্যে চেতনা ক্রমবিকশিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে চেতনার এখন প্রবল প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন নিম্নতর জীব, উদ্ভিদ এমন কি জড় 'স্থাবর বিশ্বের মধ্যেও এই চেতনাই সুপ্ত আকারে নিহিত আছে। তাই রীবন্দ্রকাব্যের একটা বিশেষ প্রবণতা—চেতনাগত ব্যাপ্তির আকাঙক্ষা, বিশ্বকে আত্মস্থ করার সাধনা। তাঁর অনুভূতি কেবলই ছড়িয়ে পড়তে চায়। তাই সকল প্রাণীর সাধর্ম্যের উপরেই তিনি জোর দেন, বৈষম্য এড়িয়ে চলেন। নিখিল বিশ্বের মধ্যে একই প্রাণময় আনন্দ-সত্তার স্পন্দন তিনি অনুভব করেন। 'অহল্যার প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রমুখ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের চেতনা সমস্ত স্বকীয় প্রাণীগত বিশেষত্ব বর্জন করে নিখিল প্রাণ ও প্রাণের উৎস জড়-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। তার ফলে ধরিত্রীর গোপন বেদনা তিনি যেমন হৃদ্‌স্পন্দনে অনুভব করেছেন তেমনই বনস্পতি প্রমুখ জীবজগতের অন্যান্য প্রকাশের সঙ্গে আপনার চেতনাগত সাযুজ্য অনুভব করেছেন।

জীবনানন্দের কবিতাতেও ঠিক এই ভাবনা অদ্ভুতভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষের সমস্ত বাহ্য-বৈষম্য পরিহার করে তিনি প্রাণীজগতের সামান্য লক্ষণ অঙ্গীকার করতে পেরেছেন বলেই ঘাস, পাখি, কমলালেবু কিম্বা হরিণের সঙ্গে আত্মলীন হয়ে যেতে পারেন। তাদের আনন্দ বেদনাকে আপন অন্তরে অনুভব করতে পারেন। শকুন বা পেঁচা কিম্বা 'গলিত স্থবির ব্যাঙ'কে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন হয় না। তার মধ্যেই আপনার প্রতীকী রূপ খুঁজে পান। তিনিও অহল্যার মতোই 'পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনা' অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মতোই মানব-শিশুর জন্য 'মাটি-মা'র আর্তি প্রতিধ্বনিত

হয়েছে 'ঝরাপালকে'র একটি কবিতায়—

> আমার এ শিরা-উপশিরা
> চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন—
> শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন,
> মোর তরে পিছুডাক মাটি-মা, তোমার!
> ডেকেছিল ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস—জোনাকির ঝাড়!
> ... ...
> ভ্রূণ-ভ্রষ্ট সন্তানের তরে
> মাটি-মা ছুটিয়া এল বুকফাটা মিনতির ভরে—

. সেদিন এ ধরণীর

ভাবনার নৈকট্য সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে এর প্রকাশরীতিতে দৈন্য আছে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিশিষ্ট দার্শনিকতার পরিমণ্ডল এ কবিতায় গড়ে ওঠেনি। তবু অনুভবের তীক্ষ্ণ-সততায় শব্দ-প্রয়োগ ঋজু ও বিশিষ্ট হতে পেয়েছে।

জীবনানন্দের কাব্যজীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ব্যবধান আরো বেশি হয়েছে। তখন যদিবা কোনো কবিতায় দুই কবির যৎসামান্য চিত্রগত বা ভাবগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়—মনোভাবনার এমন সারূপ্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতার পৃষ্ঠপটে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার অস্তিত্ব সমালোচকরা নির্দেশ করেছেন। বাস্তবিক আগন্তুকের প্রতি সকরুণ আঁখি মালবিকার জিজ্ঞাসা 'হে বন্ধু আছ তো ভাল?' আর বনলতার প্রশ্ন 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' পরস্পরের উক্তির পরিপূরক যেন। 'কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যায় পাখীর মত' এই রাবীন্দ্রিক চিত্রকল্পটি জীবনানন্দের কবিতায় দুবার দুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে বনলতার চোখের উপমায় 'পাখির নীড়ের মত' বিশেষণ রূপে আর পরিণামী সান্ধ্য পরিবেশ রচনায় 'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী' পংক্তিটিতে। কিন্তু এইটুকু মাত্র। বিষয় বা মানসিকতায় এঁদের কোনো সাধর্ম্য পাওয়া যায় না।

কেননা উভয় কবির মনোগঠন এবং কাব্য-প্রেরণাই বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনটাই সার্বভৌমিক—cosmic বিশ্বকে সহজেই তিনি তাঁর বিশাল হৃদয় এবং কল্পনায় টেনে নিতে পারেন। এই সর্বানুভূতি প্রায় আধ্যাত্মিক। অপর পক্ষে জীবনানন্দ বিশ্বের থেকে গুটিয়ে এনে, জাগতিক অভিঘাত থেকে নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে এক ধরনের কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, 'নষ্টালজিক' বেদনার ভিতর দিয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে এক সংকীর্ণ সচ্ছল বিশ্ব গড়ে নিয়েছেন। সেই পলাতকের স্বর্গে, ইন্দ্রিয়লীন মনোরাজ্যে, কমলালেবুর মাংসল রসোচ্ছলতায়, আতার ক্ষীরের ঘনত্বে, গুলিবিদ্ধ প্রেমিক হরিণের যন্ত্রণায়, ঘাসমাতার শরীরের সবুজ সুঘ্রাণ অন্ধকারের সান্নিধ্যে একান্ত হতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা যেখানে মহত্তম দার্শনিকতায় উপনীত, জীবনানন্দ সেখানে মনোগহনের রহস্যে লীন হয়ে অনুভূতির সেই চেতনা-লোকই আবিষ্কার করলেন অন্য

এক পথে, পৃথক এক স্বাদে ও সার্থকতায়। একজন অনায়াসে মুক্ত-বিহঙ্গের মতো নভোলোকচারী, অন্যজন মাটির গভীরে আত্মগোপন করতে গিয়ে মাটি-পাথর গলিত লাভার উত্তাপের ভিতর গিয়ে ভূগর্ভ ভেদ করে আবার মুক্ত আকাশের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। দুজনের অভিজ্ঞতাই সমান স্বাদু হতে বাধা নেই।

হৃদয়ানুভূতির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন বলেই 'ব্লিজার্ডের তাড়া খাওয়া পাখিরা যখন উড়ে চলে উষ্ণতর জগতের সন্ধানে, তাদের প্রত্যাশা ও বেদনা অনায়াসে জীবনানন্দের অনুভূতিতে ধরা পড়েছে।

কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে ;—
কোথায় রয়েছে পড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চলে যায় কোন্ এক খেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ,
ভালবাসা আর ভালবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর।

: পাখিরা

এই স্বাদের উপলব্ধি তাঁর কবিতায় প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করেছে। তিনি জেনেছেন পাখিদের জীবনের কামনা, বেদনা ও সমস্যা মানব জীবন থেকে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নয়। এই গৃহহারা-প্রাণের যাত্রার সাথে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' অথবা 'বলাকা'র পাখিদের উড়ে যাওয়ার যতখানি সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, তার চেয়ে কম নয়। ঝিলম-তীরের হংস-বলাকা জীবনের এক অনির্দেশ্য গতির দিকেই ইঙ্গিত করছে। এখানে পাখিদের উড়ে যাওয়া জীবনকে ভালবেসে, জীবনের দুঃখ-বেদনা মেনে নিয়ে। 'দুঃসময়ে'র বিহঙ্গটি মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, জীবনানন্দের পাখিদের এখানে শুধু অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম নয়, বংশধারার মধ্যে প্রাণপ্রবাহকে প্রসারিত করে দেবার আকাঙ্ক্ষাও অনুস্যূত। 'বলাকা' তত্ত্ব, 'পাখিরা' প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সত্যতর। জীবনানন্দ তাই মানুষের নিকটতর লোকের কবি।

কাব্যস্মৃতি-২
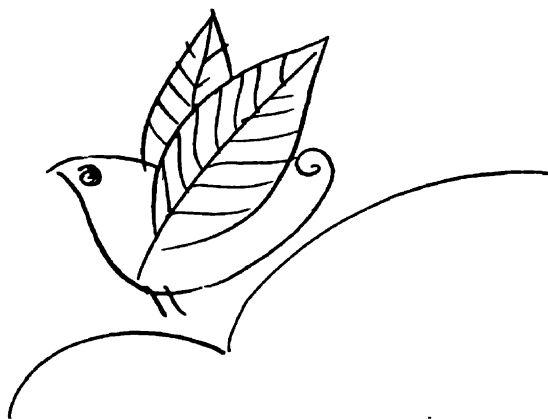
বিদেশী প্রকরণ

ঘরোয়া এক আলোচনায় জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকরণের বিজাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন জনৈক কবি-বন্ধু। তাঁর বক্তব্য ছিল জোরালো। আর এমন আলোচনায় উপস্থাপনের উপর অনেক কিছু তো নির্ভর করে। আমরা ঠিক সেভাবে বিষয়টি তুলতে পারছি কিনা জানি না।

তিনি বলেছিলেন, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভিনদেশী চিত্রকল্পের প্রয়োগ সুপ্রচুর, কিন্তু উপযোগিতা ততখানি নেই। নাবিক, সমুদ্র, লেগুন ইত্যাদি চিত্রগুলি আমাদের জাতীয়-মানসে সংস্থিত নয়। 'গঁগ্যার ছবি', 'পিস্‌টনের উল্লাস' বা 'চক্ষের ফস্‌ফোরেশনস্‌ সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে না। এমন কি 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সেই বিখ্যাত চিত্রকল্প—'উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা' বাঙালী পাঠকের চেতনায় তেমন দৃশ্যমান হয়ে না ওঠার সঙ্গত কারণ আছে। এদের সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞান যখন প্রতীচী পাঠকের মতো নয়, তখন এগুলি প্রয়োগ না করাই সমীচীন। বরঞ্চ বিদিশা, উজ্জয়িনী ইত্যাদি প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ তাঁর কবিতার পটভূমিকে ব্যঞ্জনাগভীর করতে সহায়তা করেছে।

এ যুক্তি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা জানি না। অন্তত এর বিরুদ্ধেও অনেকগুলি জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা চলে। আমাদের মনে হয়, কবির মনে কোন চিত্রকল্প সজীব ও উজ্জ্বল হয়ে এসেছে তাই বিচার্য—তার জাতীয়তা বিজাতীয়তা নয়! জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে শ্রাবস্তী বিদিশা অতীত ঐতিহ্যজ্ঞাপক শব্দমাত্র মনে হয়। নির্বিশেষত্ব এর লক্ষণ। তাই এক নাম অন্য নামকে স্থানচ্যুত করলে ধ্বনিগত পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনো তারতম্য ঘটে না। যে গভীর ভাবনা-ঐশ্বর্যে একটি নামের উল্লেখ তার স্বকীয় লক্ষণ ও পূর্ণ অবয়ব নিয়ে দেখা দেয় এবং কবিতার বরাঙ্গ হয়ে ওঠে তার অভাবে উক্ত নামগুলি অকারণ বাক্‌বিভূতি মনে হতে পারে। কোন্‌ চিত্রকল্প পাঠকের পরিচিত, কোন্‌টি নয়, কাব্য-বিচারে সেটা খুব একটা বড় কথা নয়। প্রথমে দর্শনীয়, কবি যা দিতে চেয়েছেন তা ঠিকমতো দিতে পেরেছেন কিনা এবং তা পাঠকের মনে অভিপ্রেত রসসঞ্চার করছে কিনা। ভিন্‌দেশী রূপকল্পে কবিতার সংবেদনার লাঘব হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি নূতন এক রূপলোকের অনভিজ্ঞাত বিস্ময় ও মায়া স্বাদের বৈচিত্র্যও আনতে পারে।

যদি ধরেই নেওয়া যায়, এর ফলে সামান্য রসাভাস হয়েছে, তবু একথা অনস্বীকার্য এই সব নূতন চিত্রকল্প তাঁর রচনাতে যত সতেজ ও বলিষ্ঠ, ভারতের প্রাচীন প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিভার ততখানি স্ফূর্তি নেই। জীবনানন্দের কবিপ্রাণ ইউরোপীয় কবিতার রসে জারিত বলেই এগুলি যত সজীব ও স্বচ্ছন্দ, ভারতের পৌরাণিক কল্পকাহিনী কখনই তেমন নয়।

তাই ঐ 'ইমেজ'গুলিতে জীবনের গভীর অনুধ্যান আছে বলেই বিজাতীয়তার অজুহাতে ঐ ঐশ্বর্য-সম্ভোগে আমাদের অনীহা নেই। আমরা বিশ্বাস করি, আজকের অপরিচিত ভাবপরিমণ্ডল ক্রমে সাধারণ পাঠকেরও সুপরিচিত মনে হবে—তখন আর আজকের বাধা প্রধান বলে গণ্য হবে না।

সুতরাং বিদেশী প্রকরণের বিরুদ্ধে যদি কোনো অসার্থক শিল্পপ্রয়োগের অভিযোগ থাকে তবেই তা গ্রাহ্য হতে পারে—অন্য কোন অভিযোগ নয়। 'সে কত পুরোনো কথা' কবিতায় প্রেমিকের হৃদয়ের দহন যখন দেশলাই জ্বলার চিত্রকল্প হয়ে ওঠে—

'যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে।

. যেন এক দেশলাই

তখন দেশলাই জ্বলার রূপকল্পটি যদিও সার্থক,—মনে হয় 'জ্বলিবেই' শব্দটির প্রয়োগ শিথিল, এমন কি অনাবশ্যক, রসহন্তারক।

শব্দের বা বাক্যাংশের পুনঃপ্রয়োগ দ্বারা রসব্যঞ্জনার কৌশলটি দক্ষ প্রয়োগের ফলে টি. এস. এলিয়টের হাতে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই কৌশল প্রয়োগে জীবনানন্দও কোথাও কোথাও আশ্চর্য সফল হয়েছেন। 'নগ্ন নির্জন হাত', 'আদিম দেবতারা' ইত্যাদি কবিতায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু কদাচিৎ এমন পুনরুক্তি তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। যেমন—

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের ক্ষেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে—জ্বেলে— 'নিভে গেলে—নিভে গেলে?'
বলে তারে জাগায় আবার ;
জাগায় আবার
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

: নিরালোক

এখানে 'ঘুম পায় তার'—এই শেষ বাক্যটি ছাড়া আর কোনো পুনরুক্তি যে খুব সার্থক হয়েছে তা বলা যায় না।

ইউরোপীয় কবিতার কাব্যস্মৃতি এবং আরোপ (Allusion) অলঙ্কার তাঁর কবিতায় কোথাও কোথাও উজ্জ্বল অবয়ব এনেছে। কিন্তু সেজন্য সাধারণের অপরিচয়ের ফলে এগুলির আস্বাদনে যে কোথাও বিঘ্ন হয়েছে এমন কথা স্বীকার করবো না। ধরা যাক

'আকাশলীনা' কবিতাটি—

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;

· আকাশলীনা

ইউরোপীয় সাহিত্যমোদীদের কাব্যস্মৃতিতে 'নক্ষত্রের রুপালি আগুন' শেক্সপিয়রের পংক্তি অথবা পুরাতাত্ত্বিকদের প্রাক্-বিজ্ঞান কিম্বদন্তী (myth) অথবা ইয়েটসের 'the flame of the blue star of twilight'-এর স্মরণ, যাই ঘটাক না কেন, ওই অ্যালুশান ছাড়াই বাঙালী পাঠক-এর রসাস্বাদ করবে। আরো একটি কবিতায়—

হৃদয়, অনেক বড়ো বড়ো শহর দেখেছ তুমি;
সেই সব শহরের ইটপাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

· শহর

রসগ্রহণে কোনোই বাধা ঘটায় না। কিন্তু এলিয়টের কবিতায় যিনি পড়েছেন—

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars.
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms.

* * *

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of deaths twilight kingdom
The hope only
Of empty men.

· The Hollow Men

তিনি জানেন কি অর্থব্যঞ্জনা ওই 'ভয়াবহ হৃত চক্ষু'র পশ্চাৎপটে। তখন ওই কবিতার স্বাদ যায় পালটে।

ভিনদেশী প্রসঙ্গ

বাস্তবিক ইংরাজী সাহিত্যে এলিয়টের সঙ্গে জীবনানন্দের মনোভাবনার একটু আত্মিক নৈকট্য আছে। সভ্যতার দুর্বহ নিরর্থকতা জীবনানন্দের মতো এলিয়টকেও বিচলিত করেছিল। আমাদের ক্রিয়াকলাপের অর্থহীন অসঙ্গতি এবং তার অন্তস্তলে চক্রনিষ্পিষ্ট মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন এলিয়টের কাব্যেরও মূল আখ্যান বস্তু। তবু জীবনকে দেখার ভঙ্গির মধ্যে উভয় কবির মৌল পার্থক্য রয়েছে। এলিয়ট জীবনকে দেখেছেন এক শ্লেষনিষ্ঠ বুদ্ধি দিয়ে। জীবনকে তিনি যথাযথভবে বর্ণনা করেছেন অথচ বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতা, তার বৃথা আড়ম্বর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে উহ্য হয়েছে কবির নির্মোহ বিতৃষ্ণা। জীবনানন্দের ঠিক এই মনোভাব নয়। কাব্যসৃষ্টির এক পর্বে হতাশা ও ব্যঙ্গ তাঁরও প্রবল ছিল, তখন জীবনের বেদনা ও ব্যর্থতা তিনি ছোট করে দেখেন নি, তবু সব মিলিয়ে ভবিষ্যতের প্রতি অটুট আস্থা আছে। এমন কি, বর্তমানেও কৃত্রিমতার গ্লানির বাইরে তিনি একটি সান্ত্বনার স্থান, ধ্বংসের রলরোলের বাইরে একটি শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন, তা হলো প্রকৃতি। বুদ্ধিকে পরিহার করে, হৃদয় আশ্রয় করে প্রকৃতির নিরাবিল সাহচর্যে মানুষ সাময়িক সান্ত্বনা পেতে পারে— জীবনের শেষপর্বে এ বিশ্বাস তিনি সঞ্চয় করেছিলেন।

এলিয়টের প্রতিভাকে অবশ্য জীবনানন্দ যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন না। তাঁর 'কবিতার কথা' বইটিতে তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু যে কবিকে অশ্রদ্ধা করা হয় তার সঙ্গে গভীরাত্মক মিল সাহিত্যের ইতিহাসে এই একক মাত্র নিদর্শন নয়। মধুসূদন একদা 'কৃষ্ণনগরের সেই লোকটার' প্রতি প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন, কিন্তু আজ সাহিত্য পাঠকদের অজানা নেই যে অন্তত প্রযুক্তির দিক থেকে ভারতচন্দ্রের কাছে মধুসূদনের ঋণ অনেকখানি। এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া চলে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। মনস্তত্ত্বে নাকি বলে ঘৃণা প্রীতিরই পর্যায়ভেদ। অন্তত সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত রইল। এই মিল জীবনানন্দের নিকট উদ্‌ঘাটিত হলে তিনি কি বিরক্ত হতেন?

Waste Land বইটি আধুনিক জীবনের সাঙ্কেতিক স্বরূপ এবং তার পূর্বনির্দিষ্ট পরিণাম নির্দেশ করতে গিয়ে এলিয়ট জ্যোতিষ-বিদ্যার সাহায্য নিয়েছিলেন। জীবনানন্দও 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ে সমকালীন জীবনের রূপচিত্র আঁকতে রাশিচক্রের আখর কেটেছেন—

১। নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে ;
অগ্নিপরীক্ষার মতো কেবলি সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সে সব।
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের একতিল বেশি অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন করেছে প্রত্যক্ষ অনুভব!

: প্রেম অপ্রেমের কবিতা

২। হে কালপুরুষ, ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার?—ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

. পরিচায়ক

৩। যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব—বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নীচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

. গোধুলিসন্ধির নৃত্য

৪। স্বাতীতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে-মানুষ নরক বা মর্ত্যে বাহাল
হতে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।

· সৃষ্টির তীরে

এর আগেও 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদিতে নক্ষত্রমণ্ডলের উপর জীবনানন্দের কৌতূহল ছিল। কিন্তু এখানে তার সঙ্গে সাঙ্কেতিকতা যুক্ত হয়েছে। এইখানেই এলিয়টের প্রভাব। কিন্তু এলিয়টের কবিতায় জ্যোতিষের ইঙ্গিত সব মিলিয়ে অবশ্যম্ভাবী অপমৃত্যুর সূচনা করেছে, জীবনানন্দের কবিতায় বৃষ ও মেষের পাশবিকতা, বৃশ্চিক ও সিংহের হিংস্রতা প্রেমের ছোঁয়া পেয়ে কন্যা মীন মিথুনের কূলে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

ভিনদেশী প্রসঙ্গের এ জাতের অঙ্গীকরণ নিয়ে আলোচনার বিশেষ কিছু নেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে বিদেশী কবিতার প্রভাব কোনো বিশেষ কবিতা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। 'সিন্ধু সারস' কবিতায় শেলির To a Skylark কবিতার প্রভাব কিছু মাত্র প্রচ্ছন্ন নেই।

অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি ;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয় বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?
জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

: সিন্ধু সারস

শেলির কবিতাটিকে নিজের চিন্তা এবং অনুভবের মাধ্যমে যেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। কিন্তু To a Skylark কবিতা থেকে পরিণামে এ কবিতা একেবারেই স্বতন্ত্র। সৌন্দর্য-সাধনাকে যে ক্ষুধার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়, মানুষের ইন্দ্রধনু ধরবার আয়োজন যে নিশ্চিত ব্যর্থতার নিরসিত হয়—সেই বেদনার করুণ রূপ লিপ্ত হয়ে থাকে পৃথিবীতে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,

: ঐ

এবং এই পার্থিব সুখ-ব্যথারও একটা আকর্ষণ আছে। স্নিগ্ধ সূর্য থেকে শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায় যে পাখি উড়ে চলেছে, এই ব্যথাতুর স্বাদ তার অনায়ত্তই থেকে যায়। শেলির স্কাইলার্কে শুধু অভাব আর অতৃপ্তির সুর, 'সিন্ধু সারসে' চরম অভাবের মধ্যে একটা পরম প্রাপ্তির আনন্দও মাখানো আছে।

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছিলাম ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রখরতায় আর স্বভাবের সমজাতীয়তায় কীটসের সঙ্গে জীবনানন্দের মিল গভীরতর। দুই জনেই শরীরী চেতনার কবি। আর কীটসের কবি-প্রাণ ইংল্যাণ্ডের দ্বীপভূমিতে জন্ম নিয়েও হেলেনিক সৌন্দর্য রসেই সঞ্জীবিত, তেমনি জীবনানন্দের সাহিত্য পটপ্রচ্ছদের অন্তরে বিধ্বস্ত প্রাচীন আর্যসভ্যতার ঐতিহ্যের অনুধ্যান। তাই তাঁর কবিতার স্তরে স্তরে দ্বারকার বিচূর্ণ থামের চিহ্ন পড়ে থাকে, কাঞ্চীবিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে যায়, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ বার বার ছায়া ফেলে।

শুধু এমনই নয় জীবনানন্দের অনেক কবিতাতেই কীটস্ সজীবভাবেই প্রত্যক্ষ। নমুনা হিসাবে কয়েকটি পংক্তি তুলছি আমরা। জীবনানন্দ লিখেছেন—

রোগীর জ্বরের মতো পৃথিবীর পথের জীবন

: জীবন

কীট্সের কবিতায় পাই—

The wearines, the fever and the fret
Here, where men sit and hear each other groon;

: Ode to a Nightingle

মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো—প্রিয়ার মতন!
চকিত শিশুর মতো তার কোলে লুকায়েছি মুখ ;...

: জীবন

পরের স্তবকেই আবার

মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে।

: ঐ

এ পংক্তিগুলি কি কীট্‌সের সেই স্মরণীয় কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয় না?

Darkling I listen; and, for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Called him soft names in many a muse'd rhyme,
To take into the air my quiet breath;

Ode to a Nightingale

আবার অন্য একটি কবিতায়---

ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা ;
ডেকে লব আইবুড় পাড়াগাঁর মেয়েদের সব;--
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

অবসরের গান

এর সঙ্গে কীট্‌সের পূর্বালোচিত কবিতার—

O, for a draught of vintage' that hath been
Cooled a long age in the deep-delve'd earth,
Tasting of Flora and the country green,
Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!

Ode to a Nightingale

আবার ঐ কবিতারই শেষের অংশে—

এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর—
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর ;
ভালোবাসা আসিবে না---
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর !

অবসরের গান

এর পাশাপাশি কীট্‌সের একই কবিতার---

Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes
Or new love pine at them beyond to-morrow

ভাবসাম্য দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। এই কবিতাতেই কীট্‌সের Ode on Indolence কবিতারও প্রভাব পড়েছে।

বনলতা সেন এবং এড্‌গার এলান পো-র 'To Helen' কবিতাটির সাদৃশ্য কেউ

কেউ উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর উক্তি উদ্ধার করছি—

> "বনলতা সেন ও 'Helen, thy beauty is to me'-এ দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ, 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ' এসবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র। কিন্তু যেমন 'হায় চিল' কবিতায়, তেমনি এক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছেন। জীবনানন্দের প্রথম জিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা ও সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়) এবং দ্বিতীয় ও আরো বড় জিৎ উভয় স্তবকের শেষ পংক্তি দুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পোর শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।"
>
> : শার্ল বোদলেয়ার তাঁর কবিতা

এ সবই সত্য এবং তার সঙ্গে আরো স্মরণীয় জীবনানন্দের আরো একটি কবিতাতেও এই কবিতার সুস্পষ্ট প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়—

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন :
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে ব'লে
মহিলারী প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

শ্যামলী

এর সঙ্গে তুলনা করুন—

হেলেন, তোমার মুখ নিসিয়ার জাহাজের মতো
পাড়ি দিত গন্ধময় একখানি সমুদ্রের বুকে,
ঘরহারা, নাবিকেরে পরিচিত তীরে পৌঁছে দিত,
নিরাপদ নীড়ে তার, জন্মভূমি, উত্তরিত শোকে,
পুরাকালে লক্ষ্যভেদী অমোঘ যাত্রার সুখে-দুখে।

: হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ

তবে হেলেনের মুখ যেখানে গৃহহারা নাবিককে গৃহের জন্য উন্মুখ করে তুলতো, শ্যামলীর মুখ তার বৈপরীত্যে সুদূরে বাণিজ্য যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করতো। আবার মণিকা-আলো হাতের 'মিত ভাষণ' কবিতার নায়িকারূপে হেলেনের agate lamp হাতে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছেন শ্রীযুক্ত বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়।

শুধু এঁরা কেন জীবনানন্দের নিত্য অনুশীলিত মনে আরো অনেক ইংরেজি কবিতার ছায়া অবশ্যই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অনেকে এমন আলোচনা করেছেন বা করবেনও।

'ঝরাপালকে'র 'বিশ্বমানবিকতায়' হুইট্‌ম্যানকে খুঁজে পাওয়া যাবে—

নিখিল আমার ভাই
—কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই ;
যে প্রাণ গুমরি কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি,

* * *

আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনাপীড়ার দান
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,

: নিখিল আমার ভাই

কিন্তু সে না হয় উন্মেষ পর্বের কাহিনী। বনলতা সেনের পরিণতিতে পৌঁছেও অনুভব করা যায় ম্যাথু আর্নল্ডের অলক্ষ্য উপস্থিতি। আর্নল্ড লিখেছেন—-

Yes! in the sea of life enisled
With echoing straits between us thrown
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions we alone.

The Marguerite

আর জীবনানন্দের রচনায়—

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।

. সুচেতনা

অথবা—

তোমার মুখের রেখা আজও
মৃত কত পৌত্তলিক খ্রিস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন,
কতো আছে—তবু কতো দূর।

: সবিতা

অথচ অন্তত এসব কবিতায় ইচ্ছে করলেই এই চিন্তাসমতা পরিহার করা চলতো। কিন্তু তার প্রয়োজন কি? ভাবনাই মূল্যবান। আর সেই ভাবনা যাতে উজ্জ্বল অবয়ব পেতে পারে তাই কবির একমাত্র দ্রষ্টব্য। ছুৎমার্গীর মতো ছায়া বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে ভাবনাকে কবিরা ক্ষুণ্ণ করবেন এইটাই কি আমাদের দাবি?

এইসব বিচ্ছিন্ন কবিতা এবং কবি ছাড়া সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে সুইনবর্ন, এড্‌গার অ্যালান পো, লরকা, সিট্‌ওয়েল্‌ এবং ইয়েট্‌স—এঁরাই জীবনানন্দের মনোভূমি

গঠনে সবচেয়ে প্রবল শক্তি। এলিয়ট—অবশ্য আগেই বলেছি, কবিতার রূপ প্রকরণ এবং গঠন বিন্যাসে যতখানি প্রভাব রেখেছেন মনের সমতায় ততখানি নয়।

জার্মান কবি রিল্‌কের রচনার সঙ্গে জীবনানন্দের ভাবনা কল্পনার মিল প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়তে পারে কোনো সতর্ক পাঠকের। তাই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই খ্যাতনামা কবির সৃষ্টির সঙ্গে জীবনানন্দের পূর্ব-পরিচয় ছিল না। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন অবান্তর। কবির মৃত্যুর পরে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম জীবনের কোন সময়ে রিল্‌কের কাব্য ওঁকে স্পর্শ করেছিল কি না—বললেন, না, রিল্‌কে ওঁর বিশেষ জানা নেই। জীবনানন্দের কাব্যে একটা নির্লিপ্ত গোছের খোলামেলা ভাব ছিল, জার্মান কবি চিন্তায় এবং চৈতন্যের ভাবে অনেক সময় ডুবে যেতেন।"

অন্য উৎস

ইয়েট্‌সের অনেক কবিতা জীবনানন্দের কবিতার মূল উৎসের মতো মনে হয়। কবিতা কখনো অনূদিত হতে পারে না। জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থগুলিতে কোথাও অনূদিত কবিতা নেই। কবিতা প্রতিভাব স্পর্শ পেলে নূতন ভাষার আঙিনায় এমন নবজন্ম নিয়েই যায়। নইলে সাধারণ অনুবাদ কবিতায় যে মারাত্মক রসবিপর্যয় প্রায়ই দেখা যায়, তার বেদনা থেকে নিষ্কৃতি নেই রসগ্রাহীদের। কিন্তু ইয়েট্‌সের এই সুন্দর কবিতাটি—

O curlew, cry no more in the air
Or only to the water in the West
Because your crying brings to my mind
Passion dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my brest
There is enough evil in the crying of wind

He Reproves the Curlew

যখন জীবনানন্দের রচনায় নূতন করে পেলাম—

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।

: হায় চিল

তখন শিখলাম নবরূপায়ণই সার্থক তর্জমা। ভাষান্তর এমন ভাবেই হয়ে থাকে, হওয়া উচিত।

অথবা ইয়েট্‌সের কাব্য-সঙ্কলন হাতে নিয়ে চমকে উঠতে হয় যখন নজরে পড়ে এই কবিতাটি—

Blad heads forgetful of their sins,
Old, learned, respectable blad heads
Edit and annotate the lines
That youngmen tossing on their beds,
Rhymed out in love's despair
To flatter beauty's ignorant ear.

All shuffle there; all cough in ink,
All wear the carpet with their shoes;
All think what other people think;
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did their Catullus walk the way?

. The Scholars

বোঝা যায় জীবনানন্দের নিম্নোদ্ধৃত বিখ্যাত কবিতার উৎস কোথায়? অথচ তা কতো আশ্চর্য সার্থক হতে পেরেছে এখানে—

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে—ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

: সমারূঢ়

অথবা 'মহাপৃথিবী'র সেই স্বল্প পরিচিত কবিতাটি দেখুন—

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চলে গেল যুবকের দল;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে

শুনিল আধেক কথা;—এই সব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরই কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকের দল :
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে

: ইহাদেরি কানে

যে ব্যঙ্গটি সুপ্ত ছিল ইয়েট্‌সের উদ্ধৃত কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ তিনটি পংক্তিতে তা এখানে স্বতন্ত্র হয়ে তীক্ষ্ণ শাণিত হয়ে উঠেছে। অথচ এই অংশটি 'সমারূঢ়' কবিতায় উল্লিখিত না থাকায় সেখানের রস আরও প্রগাঢ় হতে পেরেছে। আসলে ইয়েট্‌সের কবিতাটির গঠন শিথিল।' তার শেষ স্তবকটির আবেদন তেমন প্রগাঢ় হবার অবকাশ পায়নি, বক্তব্যের স্থূলতা কাটিয়ে রসের নিবিড়তায় যেভাবে জীবনানন্দের প্রথম কবিতাটি পৌঁছেছে তেমন হয়নি ইয়েট্‌সের। আবার 'ইহাদেরি কানে' কবিতায় জীবনানন্দও পুরোপুরি সার্থক হতে পারেননি। কবিতাটি আরো সংহত হতে পারতো অনায়াসে। কিন্তু সমারূঢ়ের গঠন তীক্ষ্ণ ঋজু এবং অমোঘ।

আরেকটি কবিতায় ইয়েট্‌স লিখেছিলেন—

The trees are in their autumn beauty,
The woodland paths are dry,
Under the October twilight the water
Mirrors a still sky;
Upon the brimming water among the stones
Are nine-and fifty swans

: The Wild Swans at Coole

এর সঙ্গে 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'হাঁস' কবিতার ভাবসাদৃশ্য আকস্মিক নয়—সেখানে ঐ চিত্রটি রূপ নিয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—

চারিদিকে উঁচু উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা;
অনেক সময় ধ'রে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে সময়ে নীলাকাশ ব'লে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল
মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে ;

: হাঁস

মানতে হবে নূতন প্রতিভার আশ্রয়ে কবিতাটি নূতন করে জন্মেছে আবার। ঠিক এই রকমই হয়েছে আরো একটি কবিতায়—

I would that we were, my beloved, white birds on the
foam of the sea!
We tire of the flame of the meteor, before it can fade and flee;

: The White Birds

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি।
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে,

: আমি যদি হতাম

এ আসলে প্রভাব নয়, কাব্যস্মৃতি অলঙ্কার। একটি ভাব বা চিত্রের রূপ-সান্নিধ্য স্মরণে আনবে আর একটি কবিতার রূপলোক; গাঢ়তর হবে পাঠক চিত্তের মুগ্ধতা ও বিস্ময়। প্রসঙ্গক্রমে এর পাশাপাশি মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'লুকোচুরি' কবিতা—

আমি যদি দুষ্টমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি।

অথবা 'ইচ্ছামতী' কবিতায়—

যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি,
আমি তবে এক্ষুণি হই ইচ্ছামতী নদী।

আবার ইয়েট্‌সেরই আরেকটি কবিতার—

Nor know that what disturbs our blood
Is but its longing for the tomb

পংক্তি দুটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তের ভিতর উদ্ভাসিত হয় জীবনানন্দের কবিতার এই পংক্তিগুলি—

অর্থ নয়, কীর্তি নয়। সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

: আট বছর আগের একদিন

রক্তের ভিতরের এই তাড়নাই আমাদের মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেয়। একে দুই কবিই অনুভব করেছেন কিন্তু তার প্রকাশ, আর অভিব্যক্তি কত বিভিন্ন দুজনের ক্ষেত্রে।

জীবনানন্দের প্রিয় কবিদের বিশিষ্ট কবিতার ছায়া তাঁর অনেক রচনাতেই বারবার এসে পড়ে। ইয়েট্সের—

> They mauled and bit the whole night through,
> They mauled and bit till the day shone;
> They mauled and bit through all that day
> And till another night had gone.

The three beggars

শ্রদ্ধেয় শুদ্ধসত্ত্ব বসু দেখিয়েছেন এই রীতির প্রতিধ্বনি জীবনানন্দের মধ্যে—

> একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
> একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
> একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
> তবে আমি হেঁটে চলে যাবো মানে-মানে।

ভিখিরি

তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন 'তোমাকে' কবিতার শেষ স্তবকেও এই রীতি প্রযুক্ত হয়েছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মনে হয়েছিল 'এক পয়সার একটি' সিরিজে কবিতা বিক্রির প্রসঙ্গ ও প্রতিক্রিয়া এতে রয়েছে। আমাদের মনে হয় 'লঘু মুহূর্তে'র তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরী'র কল্পনার ভিত্তিমূলেও ইয়েট্সের প্রাগুক্ত কবিতাটি আছে।

ইয়েট্সের আরো একটি কবিতার পংক্তি তোলা যাক্—

> Autumn is over the leaves that love us,
> And over the mice in the barley sheaves .
> Yellow the leaves of the rowan above us,
> And yellow the wet wild-strwberry leaves.

: The Falling of the Leaves

দেখা যাবে জীবনানন্দের কবিপ্রাণকে বার বার উদ্দীপিত করেছে এই কবিতার পংক্তিগুলি—

> ১ । অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
> সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
> হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে, 'ঘাসের উপরে সব বিছানো পাতার
> মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
> ছড়িয়ে পড়েছে জলে'

: অঘ্রাণ প্রান্তরে

২ । চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে,—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;

: দুজন

৩ । দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,

: মৃত্যুব আগে

এই রকম দৃষ্টান্ত অনেক বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু কোন সার্থকতা নেই তাতে। বিদগ্ধ পাঠক মাত্রই জানেন উভয় কবির সহমর্মিতার জন্যই ইয়েট্সের কবিতার ইন্দ্রিয়ঘন রূপলোক বিচূর্ণ হ'য়ে ছড়িয়ে রয়েছে জীবনানন্দের সমগ্র সৃষ্টিতে। বর্তমান প্রবন্ধে তার সুবিস্তারিত আলোচনা অবান্তর।

সংখ্যা-দ্যোতনা

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। সাধারণত বাঙালী কবিরা কবিতায় সংখ্যা-শব্দের প্রয়োগ করেন না। করলেও, গাণিতিক মান-নির্দেশ ব্যতীত তার কোন নিহিত তাৎপর্য থাকে না। তবু আমরা জানি, প্রতি ভাষাতেই এমন কতকগুলি সংখ্যা আছে, যার সঙ্গে দুর্জ্ঞেয়তার, অলৌকিক রহস্যময়তার, শুভ এবং অশুভের সূক্ষ্ম-সংস্কার জড়িয়ে থাকে। আমাদের কাছেও এক, দুই, তিন, পাঁচ, ছয়, সাত, নয়, তেরো, ষোল, একুশ, একশ' এক, হাজার ইত্যাদি শব্দগুলো শুধু সংখ্যা জ্ঞাপক নয়, এর সঙ্গে নানা বিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় ও প্রত্যয়ের বিচূর্ণ-বাসনা জড়িয়ে আছে। বহুকালের পূজা অর্চনায়, তান্ত্রিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ও লোকাচারে ব্যবহৃত হয়ে হয়ে এই সব সংখ্যার সঙ্গে মরমী বিশ্বাস মিশে গিয়েছে। নানা ভগ্নাংশ সংখ্যাও এসঙ্গে ধরতে হবে। যথা দেড়, আড়াই, সোয়া পাঁচ, সাড়ে চুয়াত্তর ইত্যাদি। ইউরোপের বহুকবি এমন সব 'মিষ্টিক' সংখ্যার সঙ্গে জড়িত সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে কবিতায় সুফল পেয়েছেন। এদিকে ইংরাজ কবি ব্লেকের কথা স্মরণীয়। বাংলাদেশে জীবনানন্দই সম্ভবত প্রথম কবি যিনি এই সব সংখ্যা শব্দের সঙ্গে যুক্ত বাঙালী মনের প্রাঙ্নিবিষ্ট সংস্কারকে কবিতার প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছেন। এমন কি ইউরোপীয় ভাবানুষঙ্গও কোথাও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

তাই তাঁর কবিতায় কোথাও বা 'এক মাইল শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে,' কোথাও দেখা যাবে 'কালো দুটি তুরঙ্গম' উজ্জ্বল সময়ের সাগরকে অনন্তের দিকে টেনে নেয়, কোথাও বা 'তিনজন আধো আইবুড় ভিখিরি'র আনাগোনা, আবার 'দু-তিন ধনু দূরে', সম্রাটহীন

বিপ্লবহীন খেতের দুপুরে চাষা বলদের নিঃশব্দতা, কোথাও মানুষ 'পাঁচফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে', অথবা 'আট বছর আগের একদিনে' 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/মরিবার হলো তার সাধ,' কোথাও 'সাতটি তারার তিমির' তরঙ্গ সপ্তর্ষির আলোর আভায় অমেয় রহস্যে নিলীন থাকে, কোথাও জলপাই-পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে 'নয়টি হাঁসকে' রোজ চোখ মেলে দেখা যায়। কোথাও একটি চোর সাতজন প্রেমিককে খুন করে যায়, কোথাও দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক কেউ সহসা দেখতে পায়, সেখানে 'কুড়ি বছর পরে' কুয়াশায় কারো সাথে যদি আবার দেখা হয় সেই প্রত্যাশায় দিন গোনা। এমনকি 'হাজার বছর' ধরে পৃথিবীর পথে পথে পথ হাঁটা।

এই সব প্রয়োগের মধ্যেও শিল্পী-চেতনার স্পর্শাতুরতা লক্ষ্য করার মতো। তিনজন ভিখিরির সংখ্যা-দ্যোতনা 'আধো আইবুড়' বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েই সঙ্কেতগভীর হতে পেরেছে। আবার 'বনলতা সেনের' হাজার বছর আমাদের উপলব্ধিতে সহস্রাব্দের ব্যাপ্তিটুকু মাত্র নয়, যেন অনন্ত অতীত থেকে ক্রমবহমানতার স্মৃতিভারাতুর অফুরন্ত কালচেতনা। ইয়েট্সের Nine and fifty swans চোখের সামনে অগণ্য হাঁসের একটি মেলা, জীবনানন্দের হাতে মাত্র নয়টি হাঁস হয়ে বাংলার স্বাভাবিক শান্ত পল্লীশ্রীতে সঙ্গতি পেয়েছে, আর স্বচ্ছ জলের স্থিরতায় যেন মায়াবীর জাদুর ছোঁয়া লেগেছে—

> তিনবার তিনগুণে নয় হয় পৃথিবীর পথে
> এরা তবু নয়জন মায়াবীর মত জাদুবলে।

: হাঁস

হাঁসগুলির নানা সংখ্যায় ভাগ হয়ে অসংখ্যরূপে সারাদিন সাঁতার কাটার ছবিটি এখানে যেমন আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে, ইংরাজী কবিতাটির সংখ্যার ভিড়ে সে ছবি হারিয়ে যাবে।

অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে, ছাত্রস্থানীয় কোনো তরুণ শিল্পীর কাঁচা হাতের ছবিতে তিনি হয়তো তাঁর মায়াতুলির একটি আঁচড় বুলিয়ে দিতেন, ছবিটি নূতন আর আশ্চর্য হয়ে উঠতো। জীবনানন্দও তেমনই একজন শিল্পী যিনি দেশী বিদেশী উপকরণকে স্বচ্ছন্দে আপন করে নিতে পারেন এমনি আলতো দু-একটা টানে। যাঁর শক্তি কম, স্বকীয়তা অল্প, তিনিই প্রত্যেককে ভয় করেন, সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আলগোছে চলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিমা গড়তে মাটি কোন দেশের তা যেমন জানা অনাবশ্যক, চোখ টানে শিল্পীর কারুকর্ম, তেমনি সব প্রভাব-প্রকরণের উপর প্রতিভার কি দৃঢ় মুদ্রাঙ্কন পড়ল সেটাই সবিস্ময়ে দেখবার, অন্য কিছু নয়।

হাস্যরস

কৌতুক লক্ষণ

সুকুমার রায় লিখেছিলেন—

হুঁকো মুখো হ্যাংলা বাড়ি তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?

আবোল তাবোল

বাঙালী কখনো হাসে না। বাংলাদেশে 'হাসির গানের' আসর নেই, হাসির গল্পের শ্রোতা নেই, প্রহসনের দর্শক নেই, আর কৌতুকরসের উপন্যাসের কেউ কখনো নামই শোনেনি। এই রামগরুড়ের ছানার রাজ্যে কৌতুকরসের কবিতা লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। বাঙালী তাঁকে কবি বলে গণ্যই করে না বোধ হয়।

বেরসিকের কাছে রসের নিবেদনের মতো দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই। বাধ্য হয়ে এদেশে কৌতুক অভিনেতাকে ভাঁড় সাজতে হয়, প্রহসনের লেখককে সিনেমার বিয়োগান্ত গল্প লিখতে হয়। হাস্যরসিকের পক্ষে সেও বিয়োগান্ত ব্যাপার বই কি!

বাংলাদেশে কৌতুকরসের কবিতা তাই দুর্লভ। আর সব সাহিত্য পাঠকের অপেক্ষা না রেখেও লেখা যায়, হাস্য কৌতুক নৈব নৈব চ। কাতুকুতু দিতে হলেও মানুষ লাগে। এই জন্যে আধুনিক কবিদের কারো কারো, ব্যঙ্গ রচনার স্বভাবজ ক্ষমতা থাকলেও বিনা চর্চায় তা নষ্ট হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বনফুল, সমর সেন প্রমুখ অনেকে এর উদাহরণ। কবি জীবনানন্দ দাশের মধ্যেও সেই ক্ষমতা ছিল যা উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে পরিশীলিত হলে সার্থক বিদ্রূপরসভূয়িষ্ঠ কবিতা রচনা করতে পারতো।

একজন বিদেশী প্রাবন্ধিক লিখেছিলেন হাসির মূলে আছে অবচেতন আত্মপ্রসাদ। কেউ যে অবস্থায় যে আচরণ করেছে আমি হলে তা কখনোই করতাম না, এই জাতের আত্মপ্রত্যয় থেকে হাসির জন্ম। লেখক এখানে হাসি বলতে কৌতুকের হাসিই বুঝিয়েছেন। নইলে শিশু যখন মাকে দেখে হাসে তখন তাতে আত্মপ্রসাদের কি থাকতে পারে? অনাত্মীয় অপরিচিত পরিবেশে সে অসহায় বোধ করে। পরিচিত কোনো মুখ দেখলে সে ভরসা পায়, নিশ্চিন্ত হয়, খুশি হয়—সেই তৃপ্তি তার হাসিতে ফুটে ওঠে। আনন্দের হাসিমাত্রই শিশুর হাসির মতো বাইরের অনাত্মীয় পরিবেশে মানবাত্মার অধিকার ঘোষণা!

সাহিত্যের মধ্যে এ হাসির অবশ্য কোনো অভিব্যক্তি নেই। কবির হৃষ্ট মেজাজ কবিতার সুরের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠতে পারে শুধু। সুতরাং সাহিত্যের হাসিমাত্রই কৌতুকের হাসি। অন্যের দুর্গতিতে, এমনকি নিজের দুর্গতিতে নিজের হাসি। কৌতুকের

মূলে থাকে অসঙ্গতিবোধ। যা হওয়া উচিত ছিল অথচ হয়নি, তার উপলব্ধিতেই কৌতুকের উদ্ভব।

কৌতুকের মধ্যেও অবশ্য জাতিভেদ আছে। অন্যকে কিছুমাত্র আঘাত না করেও ঘটনার উদ্ভটত্বে রসসৃষ্টি করা যায় ; আবার অন্যের নির্বুদ্ধিতা, দুর্নীতি, অন্যায় প্রভৃতির জন্যে বিদ্রূপে বিদ্ধ করেও রসসৃষ্টি করা সম্ভব।

৬. সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর বার্ণার্ড শ'র উপর লেখা বইটিতে শ'র স্যাটায়ারগুলিকে আন্তর ধর্মের দিক থেকে হিউমার প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হলো যাঁর বিষয়ের উপর মমত্ব থাকে তিনি কখনোই যথার্থ স্যাটায়ারিষ্ট হতে পারেন না। কৌতুকহাস্য স্রষ্টা হিসাবে লেখকের শ্রেণীনির্দেশের প্রয়োজনে লেখকের মনোবিশ্লেষণ করে ব্যঙ্গের প্রকৃতি নির্ণয় করা চললেও চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক কৌতুক ও বিদ্রূপ এমন ভিন্ন গোত্রীয় কিছু নয় যে একই ব্যক্তির পক্ষে একই বিষয় নিয়ে দুইজাতের হাস্যরস সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে।

বাস্তবিক কৌতুক এবং বিদ্রূপ দুটির রস ও রূপ পৃথক। এদের প্রভেদ দেখলেই চেনা যায়। সুতরাং কোনো কিছু কৌতুক বা বিদ্রূপ কিনা নির্ণয় করতে হলে মনোবিশ্লেষকের কাছে দৌড়াতে হয় না। উভয়ের পার্থক্য কেবল মনোভঙ্গিগত। সময় ও অবস্থা ভেদে একই বিষয় সম্পর্কে মানুষ কখনো সহানুভূতিশীল কখনো বা নির্মম হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং কবি কখনো হিউমার সৃষ্টি করেন, কখনো বা স্যাটায়ার। অবশ্য ব্যক্তিভেদে কারো হয়তো শ্লেষ-বিদ্রূপের প্রতি আসক্তি কারো বা কৌতুক-রসের প্রতি। কিন্তু যিনি হিউমারিষ্ট তিনি যে কখনো স্যাটায়ার লেখেন না বা লিখতে পারেন না এমন কথা যুক্তির অনাচার। স্যাটায়ারিষ্টের পক্ষেও ওই কথা।

এমনধারা মানসিক প্রবণতার কথা তুললে জীবনানন্দের হাস্যরসাত্মক কবিতাকে বিদ্রূপের স্তরে ফেলতে হয়। কিন্তু তাঁকে ঠিক স্যাটায়ারিষ্ট বলতে যেন বাধে। বাস্তবিক তিনি এমন প্রগাঢ়-চেতনার কবি, এমন ধীর স্তিমিত মেজাজ তাঁর কবিতার, যে স্যাটায়ারিষ্টের তীব্র চকিত তীক্ষ্ণতা, মনোভঙ্গির এই তারল্য ও দ্রুততা তাঁর লেখায় যেন ঠিক আশ্রয় পায় না। ট্র্যাজেডির নায়ককে বিদূষকের সজ্জায় দেখলে যেমন আহত হয় মন। বাস্তবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম পর্দায় পর্দায় যাঁর আলোকিত সঞ্চরণ, রূপজগতের বিচিত্র বিস্ময়ে যাঁর সাবলীল অধিকার, বুদ্ধির এই শাণিত ছোরাখেলায় তাঁকে আমরা আশা করবই বা কেন? কীটস্ যদি পোপ্ হতে চাইতেন সেটা কি কাম্য হতো?

এ প্রসঙ্গে হয়তো মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু একথা সত্য জীবনানন্দের কবিতায় ব্যঙ্গরসের অধিকার-সীমা বিশেষ এক পর্বে সীমায়িত। মনস্তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন ব্যক্তিগত জীবনে, হয় মনোজগতে, নয় বহির্জগতে লেখক যখন আহত, পরাজিত, হতাশ বা বিতৃষ্ণ, সেই সময়ে মন এক স্বচ্ছতায় স্থিত হ'লে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্ম হয়। জীবনানন্দের লেখায় যে বিদ্রূপরসের কবিতা দীর্ঘকালব্যাপী হয়নি তার মূলও নিশ্চয় এইখানে।

জীবনানন্দের ব্যঙ্গ-কবিতার সূচনা কখন থেকে বলা কঠিন। কিছুকাল পূর্বে উত্তরসূরী

পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি' কবিতাটিকে এর একটি আদিম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা চলে। এরপর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের রচনাকাল অর্থাৎ প্রধানত অসহযোগ আন্দোলনের অস্থিরতা থেকে ১৯৪৬-এর যুদ্ধ ও দাঙ্গা পর্যন্ত—এর মধ্যেই তিনি তাঁর প্রায় সব ব্যঙ্গরসের কবিতাগুলি লিখে গেছেন।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে স্পষ্টই অনুভব করা যায় এসময়ে কিভাবে তাঁর উপরে নানাদিক থেকে চাপ আসছিল। অস্থিরতা তখন বাংলার আকাশে বাতাসে; হতাশা, দুর্দশা ও নানা গ্লানি চিন্তাশীল মন অধিকার করে ছিল—কিন্তু আজকের মতো এত গা-সহা, এত নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বাইরের চাপের থেকে মনোজগতের চাপই বেশি মারাত্মক। তবু তার মধ্যেও মনের যে স্থিতিশীলতা থাকলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্ম হয়, তা তাঁর ছিল। কিন্তু সেই ব্যঙ্গ প্রবণতাকে কদাচিৎ তিনি তরল লৌকিক রঙ্গ -পরিহাসের স্তরে নামিয়ে আনতে পেরেছেন। ব্যবহারিক জীবনে যাই হোক, কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ মূলত হিউমারিষ্ট ছিলেন না, স্যাটায়ারিষ্টও নন। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি, সার্থক স্যাটায়ার লিখতে যে গুণগুলির প্রয়োজন তা তাঁর ছিল।

বিদ্রূপ-স্রষ্টার যে প্রথম গুণটি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা হলো তাঁদের বিশিষ্ট পরিভাষা। আমাদের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে আমরা যে সব শব্দ প্রয়োগ করি ব্যঙ্গ-রসিক তার মধ্যে এমন কতকগুলি বেছে নেন, যাতে তাব প্রয়োগমাত্রই আমাদের মনে এক হাস্যোদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শুধু শব্দনির্বাচনে নয়, শব্দপ্রয়োগের বিশিষ্টতাতে এই একই সাফল্য হাস্যরসিকের আয়ত্তে আসে।

১। অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক **মিহিন কামিজে**
কাটাতেছে যেন অগণন **গিরেবাজ**।

বিভিন্ন কোরাস

২। বাইরে রৌদ্রের ঋতু বছরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে;
হোক-না তা; প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে **অতীব প্রবীণ**;
হিসেবে বিষণ্ণ সত্য র'য়ে গেছে তার;
এবং নির্মল **ভিটামিন**।

· প্রতীতি

৩। বিকেলে গা ঘেঁষে সব **নিরুত্তেজ সরেজমিনে** ব'সে
বেহেড আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির **লোকসানে**।

সোনালি সিংহের গল্প

কিন্তু শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য থেকেও হাস্যরসিক কবির উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব রূপপ্রয়োগের দক্ষতায়। অত্যন্ত অল্প ইঙ্গিতে এমন সব উদ্ভট, অসম্ভব অথবা হাস্যকর দৃশ্য তিনি

আমাদের মনের পটে এঁকে দেন যে কৌতুক অনুভব না করাই কঠিন। এই জাতের চিত্রকল্প নির্মাণে জীবনানন্দের পারদর্শিতা অসামান্য। আগাগোড়া শরীরটা দিয়ে কানার তাঁত বোনাব অভিলাষ অথবা নূলো শাঁখারীর হাতে করাতের কার্যকারিতা, অনুপম ত্রিবেদীর কান ধরে হেগেল ও মার্কসের দুই পথে টেনে নিয়ে যাওয়া; অথবা—

১। তবুও বেদম হেসে খিল ধরে যেত বলে বেরালের পেটে
ইঁদুর 'হুররে' বলে হেসে খুন হ'তো সেই খিল কেটে-কেটে।

সুবিনয় মুস্তফী

২। ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

· পরিচায়ক

৩। বলে তারা রামছাগলের মতো রুখুদাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব করে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নীকে।
এ-মেয়েটি এক দিন হাঁস ছিলো হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।·

. লঘুমুহূর্ত

হাসতে হাসতে পেটে যে খিল ধরে ইঁদুরের সেই খিল কাটার প্রচণ্ড প্রয়াস আমাদের সুকুমার রায়ের শ্লেষ-বক্রোক্তিধর্মী কবিতাগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। 'সরিষা'র আগে 'প্রশান্ত' বিশেষণটি এমন একটি মানুষের মুখ চিত্তপটে এঁকে দেয় যে হাস্যসংবরণ করাই কঠিন। অবশ্যই 'সরষের ভিতর ভূত' এই পরিচিত প্রবাদটিই এর ভিত্তি। এমনই রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে কথা বলায় ছবি অথবা সেই শাঁকচুন্নি মেয়েটি যে এখন দেখতে হয়েছে 'হাঁসহাঁস'—এই অর্থহীন শব্দটিতে এমন এক মেদবহুল রূপহীনতার আভাস দেয় যা অন্য কোনো অর্থবান শব্দে অসম্ভব হতো—এসবই উচ্চাঙ্গের হাস্যরস রসিকতার নিদর্শন বলে গণ্য হবে।

হাস্যরসিকের তৃতীয় কৌশল হলো উদ্ভট ঘটনা-সৃষ্টি এবং বর্ণনা কৌশলে তাকে রসোপেত করে তোলা। প্রায় অধিকাংশ কৌতুকরস স্রষ্টাই এই কৌশলে পাঠকের চিত্তহরণ ক'রে থাকেন।

যদিও তাদের দেশে জন্মেছিল অপরূপ নারীমুণ্ড—
শঙ্খের মতন শুভ্রস্তন।

. এখন রাতের শেষে

স্তনের এবং নারীমুণ্ডের জন্মগ্রহণের অবিশ্বাস্যতা এখানে অদ্ভুত রসের জন্ম দিচ্ছে। জীবনানন্দের কবিতাতেও উপস্থাপন নৈপুণ্য যেমন অনেক বহুবর্ণিত বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে তেমনই ঘটনা-কল্পনার মৌলিকতাও বিরলদৃষ্ট নয়। একটি উদাহরণ—

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

: রাত্রি

ভিন্ন জাতীয়দের সঙ্গীত সাধনার অক্ষম প্রয়াস নিয়ে ব্যঙ্গ বাংলা সাহিত্যে এর আগেও অনেকে করেছেন। কিন্তু উপস্থাপনের কৌশলটি এখানে জীবনানন্দের নিজের।

পরিসীমা

জীবনানন্দ যে হাস্যরসের পশারী সে-হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে প্রচণ্ডবেগে সশব্দে উদ্‌গীর্ণ হবে এমন আশা নেই। এ সেই জাতের হাসি যাতে মুখে হয়তো ক্ষীণ একটি কৌতুক রেখার আভাস ফুটবে অথবা তাও নয়, অন্তরিন্দ্রিয়ের একটু অলক্ষিত রসানুভব হবে মাত্র। আর সেটুকুই আমাদের প্রত্যাশার পক্ষে পর্যাপ্ত।

অবশ্য জীবনানন্দ আদৌ হাস্যরসের কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। আর তর্কের খাতিরে হলেও আমরা তাঁর প্রকাশিত সমগ্র রচনা থেকে পাঁচ ছ'টির বেশি পূর্ণাঙ্গ হাস্যরসের কবিতা উদ্ধার করতে পারবো না। আমরাও ইতিপূর্বে সেই কথাটাই বলতে চেয়েছি অর্থাৎ হাস্যরসিকের যে চতুর, অন্তর্ভেদী এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টি, হাস্যরস-রচনার সর্ববিধ উপকরণের উপর যে অধিকার তাঁর ছিল তাতে তাঁর পক্ষে সার্থক হওয়া দুরূহ ছিল না। কিন্তু এই সব উপকরণকে ঠিকমতো গুছিয়ে প্রয়োগ করে বিদ্রূপ রসের সৃষ্টি তাঁর আর হয়ে উঠল না। লোক-ব্যবহারের অসঙ্গতি, প্রত্যাশা ও পরিণামের অসামঞ্জস্য সম্পর্কে তাঁর মনের বিক্ষোভ কবিতার নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কুয়াশার মতো ছড়িয়ে থাকলো, ঘন হয়ে মেঘের মতো জমাট বেঁধে বিদ্যুতে বর্ষণে নেমে এলো না।

কারণ, জীবনানন্দ মূলত হৃদয়ানুভবের কবি। কিন্তু ব্যঙ্গ-রস বুদ্ধিনির্ভর। কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড থেকে বুদ্ধির আলোকে কোনো ব্যক্তি বা সমাজের চিন্তা কার্য ও আচরণের যাথার্থ্য নির্ণয়। যখন কোনো সমাজপদ্ধতি ভেঙে যায় অথচ নূতন সদ্‌বুদ্ধিচালিত পরিণামদর্শী কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না, তখন মানুষের আচরণে যে অর্থহীন আসক্তি, নির্বোধ হঠকারিতা, অহেতুক লোভ, নিষ্ঠুর বৈষম্য ইত্যাদি প্রকাশ পায় যে কোনো স্থিতধী মানুষের স্বচ্ছ-দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে ব্যঙ্গের উদ্ভব হতে পারে। এই অসঙ্গতি সেদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল। সুতরাং জীবনানন্দের প্রবুদ্ধ চেতনায় তা যে ধরা পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর নিষ্ফলা আঘাত এবং আক্রোশ তাঁর পথ নয়। 'বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু'। যে cynic মনোবৃত্তির জন্যে লেখকেরা বিদ্রূপকে হাতিয়ার করেন সেই মনোভাব জীবনানন্দের

স্বভাবের বিরোধী। বুদ্ধির অতিরেক শুধু ভাঙতেই শেখায়, কিন্তু হৃদয়ানুভূতি মানুষকে চরম দুর্দৈবের মধ্যেও আলোক-বর্তিকার মতো সত্য লক্ষ্যের দিকে নির্দেশ করে। মানসিক গঠনের এই বিশিষ্টতার জন্যই সময়ের সাময়িক উত্তেজনা সত্ত্বেও জীবনানন্দের বিদ্রূপ-সৃষ্টি-প্রেরণা সার্থক হয়নি। কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে যে পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গ রসের কবিতা বাংলা সাহিত্যে রচিত হতে পারে এমন প্রত্যাশা তিনি পোষণ করতেন—'বাংলা কবিতার ভবিষ্যত' নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,—"ভবিষ্যতকালে (খুব দেরি না করেও) দীর্ঘ কবিতাও শ্লেষে লিখিত মহা কবিতা আসতে পারে।" (কবিতার কথা)

তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিদ্রূপরসের কবিতা বলে আমরা 'কবি' রচনাটিকে নির্দেশ করেছি। কবিতাটি দীর্ঘ তিন পাতা লম্বা হওয়ায় এর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে গেছে। ফলে কবিতাটি বীভৎস রসের হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাণীবিন্যাসের যে নৈপুণ্য থাকলে মনের ঘৃণা সঞ্চারিত করে দেওয়া সম্ভব তা এখানেও দেখা যাবে—

শীতের সকালে চামসে চাদরখানা ভালো করে জড়িয়ে নেয় গায়
ঘড়ি ঘড়ি মুখে একবার হাত বুলায়
মাজনহীন হলদে দাঁত কেলিয়ে একবার হাসে।
মাইনাস-এইট লেন্সের ভিতর আধমরা চুনো মাছের মতো দুটা চোখ :
বেঁচে আছে? না ম'রে?

কবি

দাঁত কেলিয়ে শব্দটি অত্যন্ত অশ্লীল। কিন্তু ভেবে দেখলে ঘৃণার অভিব্যক্তিতে আশ্চর্যভাবে সার্থকও। শব্দনির্বাচনের এই দক্ষতা যদি ভাবসংহতির সঙ্গে যুক্ত হ'তো আলোচ্য কবিতাটি তবে অনবদ্য হ'তে পারতো।

'মহাপৃথিবী'র 'পরিচায়ক' কবিতায় আগুনকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীকী অর্থে; যে ভাস্বর আগুনের ইশারায় সভ্যতা এগিয়ে চলে, কবি বলছেন,

আজ এই শতাব্দীতে পুনরায় সেই সব ভাস্বর আগুন
কাজ ক'রে যায় যদি মানুষ ও মনীষী ও বৈহাসিক নিয়ে
সময়ের ইশারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা
আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িয়ে,

দেয়ালের 'পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছায়ার জীবন
জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায় আগুনের রঙ আরো বিভাসিত হলে—
গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতিবিশোধন।

: পরিচায়ক

এইসব কবিতার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ কবির প্রতীকী ভাবনার অন্তরালে চাপা পড়ে তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। অবশ্য ঐ জাতের সাররিয়ালিষ্ট কবিতায় ব্যঙ্গের ম্লান সুরটিই কবির

অভিপ্রেত, তার উদ্ভাসিত তাৎপর্যময়তা নয়। বোঝা না বোঝার আলোছায়ায় জ্ঞান ও অনুভবের বিমিশ্রতায়, ব্যঙ্গ আর গাম্ভীর্যের সমন্বয়ে এক জটিল ঐকতান রচনাই কবির লক্ষ্য, অর্থগূঢ়তা আদৌ নয়। যেমন বিপ্লবের প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

এরকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হতে পারে;
অন্য কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে
স্থির হয়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব?

: বিভিন্ন কোরাস : ম পৃ

এই ধরনের কবিতায় ব্যঙ্গের সুর আরো স্পষ্ট, আরো স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান। কারণ এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনা কম, আর কবির চিন্তার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার চেয়ে প্রধান হয়েছে সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক সঙ্কট। অপেক্ষাকৃত মনন-প্রাধান্যই কবিতাটির বিদ্রূপধর্মিতাকে বলবত্তর করেছে।

আবার 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা'য় বিষয়টি নামেই আরো স্পষ্ট করে নির্দেশিত রয়েছে, তাই এই কবিতায় ব্যঙ্গের সুর সার্থকতর অভিব্যক্তি পেয়েছে।

শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়—যদি কেউ চায় ;
সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।
তারপর অনুভব করে গেছে রমণীর ছায়া বা শরীর,
অথবা হৃদয়,—
বেড়ালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে ;
প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মত নয়।

: প্রেম অপ্রেমের কবিতা

এই বিদ্রূপের রসও অবশ্য সর্বসাধারণের জন্য নয়। রসবোধ মার্জিত না হলে এবং বৈদগ্ধ্য না থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বিদ্রূপের আবেদন পাঠকের কাছে ব্যর্থ হবে। তবু কিছু কিছু কবিতায় এর বিপরীত দৃষ্টান্ত মিলবে না এমন নয়। মহাপৃথিবীর 'ইহাদেরি কানে' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'মূর্খ-সসম্মানে' বা 'সোনার পিতল মূর্তি'র মতো চমকপ্রদ অলঙ্কার আছে ব'লে নয়, বিষয়বস্তুর স্বাচ্ছতার জন্যই এর বিদ্রূপ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে যুদ্ধাহত পৃথিবীর বিচূর্ণ বিশ্বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সভ্যতার দন্তুর মুখশ্রীর সামনে তাঁর বিদ্রূপ-প্রবণতা আরো তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী হয়ে উঠতে পেরেছিল।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

: রাত্রি

অথবা

অগণন লোক ম'রে যায়,
এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয় ;—
সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয়।

: দীপ্তি

মানুষের এইভাবে জন্তুর মতো আত্মাবমাননা, অনর্থক অজস্র মৃত্যুর রলরোল কবির মনে ক্লান্ত বিষণ্ণতার ছাপ রেখে গেছে। আবার অন্যত্র যেখানে মানুষের ব্যবহারে বিচিত্র অসঙ্গতি ব্যক্ত হয়েছে সেখানে তাঁর কলম ক্ষুরধার হ'য়ে উঠেছে।

শতাব্দী আবেশে অস্তে চলে যায় :
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ করে যায়
স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোনখানে জীবনের আশ্বাস রয়েছে,

: সূর্যপ্রতিম

আকণ্ঠ-মরণে ডুবে থেকেও বিপ্লবী যদি স্বর্ণের লোভে মুগ্ধ হয়, প্রেমিকের হৃদয়ে যদি বণিক্ বৃত্তি জেগে থাকে তবে জীবনের আশ্বাস কোথায় মিলবে? এই নিরাশ্বাস যে কবির মনকে কত গভীর ভাবে আন্দোলিত করেছিল তার প্রমাণ অন্যত্রও রয়েছে—

একটি বিপ্লবী তার সোনা রূপো ভালোবেসেছিল ;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিলো পরবর্তী জীবনের লোভে ;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিল ;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।

৫ কে

লোক-ব্যবহারের মধ্যে এই প্রবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা ও নির্বুদ্ধির অভিশাপ—এর বেদনা ব্যক্তিগত ভাবে সব চিন্তাশীল মানুষকেই ব্যথিত করে। সভ্যতার বর্তমান উন্নত পর্যায়ে এসে মানুষের কাছে প্রবুদ্ধ ব্যবহার আমরা যখন প্রত্যাশা করি, তখন এই জড়তা, এই অসংযম একান্তই দুঃসহ বলে মনে হয়। আবার সুশিক্ষিত মননসম্পন্ন মানুষও যখন নানা বন্ধ্যা রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ইতস্তত চালিত হয় তখন সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে তাদের বিদ্ধ করা ছাড়া করণীয় কিই বা থাকে?

> ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু করে
> হেগেল ও মার্কস : তার ডান আর বাম কান ধরে
> দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিল;
> *   *   *
> জড় ও অজড় ডায়ালেক্‌টিক্ মিলে আমাদের দু দিকের কান
> টানে বলে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিলো টান।

অনুপম ত্রিবেদী

হেগেল ও মার্কস জড় ও অজড় ডায়ালেক্‌টিকের কূটতর্ক নিয়েই যদি আমরা ব্যাপৃত থাকি, জীবনের ক্ষেত্রে যদি এই সব রাজনৈতিক ও দার্শনিক জ্ঞান প্রযুক্ত না হয়, তবে কি এই সব তত্ত্বালোচনা নিরর্থক নয়?

সাম্প্রতিক কালে পৌঁছে জীবনানন্দের মনে একটি চিন্তা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানুষের সভ্যতা তার অগ্রগতির পথে চলতে চলতে বর্তমান শতাব্দীতে এসে মানুষের স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতার জালে আটকে গিয়েছে। আজ যখন সব কিছুই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ও স্থান-ভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখনো প্রথানুগ মানুষের চেতনাহীন আচরণের কোনো ব্যত্যয় হচ্ছে না।

> আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হল;
> আকাশ কুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে।
> তবুও পৃথিবী নিজে অভিভূত বলে
> ইহাদেরও নেই কোনো ত্রাণ:
> সকলি মহৎ হতে চেয়ে শুধু সুবিধা হয়েছে;
> সকলি সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

: ভাষিত

আমাদের লক্ষ্য ছিল সুমহান কিন্তু আজ সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সুবিধা ও স্বার্থের লোভে আমরা বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ তৈরি করে চলেছি। কারণ আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে উদ্যম ছিল না—কানার তাঁত বোনার অভিলাষের মতো, নুলো শাঁখারির হাতের করাতের কার্যকারিতার মতো আমাদের শুভেচ্ছার সঙ্গে সামর্থ্যের সমন্বয় হয়নি। আমাদের কোনো সুষ্ঠু পরিণতিতে

গিয়ে পৌঁছানোর শক্তি নেই—শুধু সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে, সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টিকে স্তূপীকৃত করে তুলতেই আমরা সক্ষম হয়েছি।

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ ;

: সৌরকরোজ্জ্বল

তবু এই অনাচারের মধ্যেও মানুষ আজ নির্বিকার।

মানুষেরি ভয়াবহ স্বাভাবিকতার সুর পৃথিবী ঘুরায় ;
মাটির তরঙ্গ তার দুপায়ের নীচে
অধোমুখে ধসে যায়—চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে :
এ রকম রিপুচরিতার্থ করে বেঁচে থাকা মিছে।

: প্রতীতি

আমাদের সর্ববিধ আচরণের মধ্যে এই ভণ্ডামি আজ ধরা পড়ছে। অন্তরে যে কামাতুর, মুখে সে ভাণ করে এই ভাবে রিপু চরিতার্থ করে বেঁচে থাকতে সে লজ্জিত। কবি এই সব কবিতায় এই ভণ্ডামির মুখোশটাকেই অনাবৃত করে খুলে দিয়েছেন।

তিনি দেখেছেন জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই অন্যায়, এই অসঙ্গতি, এই অপবুদ্ধি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। যে চাষী পরিশ্রম করে সোনার ফসল ঘরে তুললো সেই ফসলে তার অধিকার নেই।

আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,

: সোনালি সিংহের গল্প

এবং সেই ফসল আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তাই 'উন্মেষ' কবিতায় যখন কবি বলেন—

দেয়ালে একটি ছবি : বিচারসাপেক্ষ ভাবে নৃসিংহ উঠেছে ;
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হয়ে যাবে অচিরাৎ।

: উন্মেষ

তখন বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় এই নৃসিংহের আবির্ভাব কল্পনা কবির বিশ্বাস না ব্যঙ্গ, তাঁর আশা না উপহাস? কারণ তাঁর পরের স্তবকেই কবি লিখেছেন—

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ—অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ করে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চ'ড়ে।

: ঐ

নারীর অন্তরতর সত্তা প্রজ্ঞাময় পুরুষের আশ্রয় চায়। কিন্তু তার বদলে যদি সে কেবল আবহমানের গর্দভবাহন ভাঁড়কেই দেখতে পায় তবে তাকে বরমাল্য দিয়ে বরণ করতে কি ঘৃণাবোধ করবে না? প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির এই বিপুল বৈপরীত্যই মনুষ্যপ্রকৃতির চরম নিয়তি বলে মেনে নিতে হ'বে?

এমনি আরো একটি দৃষ্টান্তে জীবনানন্দের বিদ্রূপ-ধর্মিতার স্বরূপ-লক্ষণটি ব্যক্ত হতে পারে—

একসাথে বেড়াল ও বেড়ালের-মুখে-ধরা ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার
ইঁদুরকে খেতে-খেতে শাদা বেড়ালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হতে হতে সেই ভারিক্কে ইঁদুর :
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তারা দুইজনে কতখানি দূর
ভুলে গিয়ে

: সুবিনয় মুস্তফী

শাদা বিড়াল ও কালো ইঁদুরের রূপকে শ্বেত ও কৃষ্ণকায় জাতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সন্দেহ করে অথবা না বুঝে, খাদ্য-খাদকের বিচিত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গে স্বর্গ-নরকের প্রশ্ন তুলে, করুণ অনিবার্য ঘটনার শেষ সান্ত্বনাকেও তিনি যেভাবে শ্লেষে বিদ্ধ করেছেন তাতে পাঠক চিত্তে হাসি নয় অথচ ঐ জাতীয় এক ম্লানরস জাগবে নিঃসন্দেহে।

এমনি নানা কবিতায় জীবনানন্দের বিদ্রূপ-পারঙ্গমতার চিহ্ন বিচূর্ণ মর্মরস্তম্ভের কারুকার্যের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রোথিত হয়ে রয়েছে। হঠাৎ যখন নজরে পড়ে তখন চমকে যেতে হয়, মুগ্ধ হতে হয়—কিন্তু রসাপ্লুত হবার অবকাশ থাকে না, মনে ক্ষোভ জাগে যদি পরিপূর্ণ আকারে পাওয়া যেত, কিন্তু 'সমারূঢ়' কবিতায় কবি পাঠকের এই অতৃপ্তি আশাতীত রকমে পূর্ণ করে দিয়েছেন। ভাবের সংহত দৃঢ়সংবদ্ধ প্রকাশে, প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় এবং বিদ্রূপের মর্মভেদী ঋজুতায় বাংলা আধুনিক কবিতার মধ্যে তা দ্বিতীয়-রহিত। আগে কবিতাটিকে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। সৃষ্টি-ক্ষমতাহীন ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের ঘৃণ্য অক্ষম মূর্তিটি তার কুৎসাজীবী পরভোজী স্বরূপ, তার পণ্ডিতমন্যতার ছদ্মবেশ কবি খসিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত কবিতাটির এই পংক্তি ক'টিতে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—

কালি আর কলমের পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর
অধ্যাপক ;

: সমারূঢ়

এখানে কালি কলম পত্রিকার কোনো প্রসঙ্গ নিহিত রয়েছে কি? তাঁর কোনো কবিতা সম্পর্কে 'কালি কলমে'র সম্পাদকের কোনো মন্তব্যই কি আহত বিক্ষুব্ধ কবিকে এই

কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল? যাই হোক, এই চমকপ্রদ সূচনা, অধ্যাপকের রূপ ও তাঁর জীবিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মধ্যে যে ঘৃণার সঞ্চরণ হয়েছে তার শিল্পিতা অনন্যসাধারণ। অন্য যে কোনো কবি হলে সমালোচকের অনুদ্ধৃত উক্তি তুলে হয়তো একে সনেটের আকার দিতেন। কিন্তু তাহলে এর রসব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতো।

যিনি সূচনায় একটি সুদীর্ঘ বিদ্রূপ-রসের কবিতায় কবিকে শ্লেষে বিদ্ধ করেছিলেন তিনিই তার শ্রেষ্ঠ এবং প্রায় অন্তিম বিদ্রূপ কবিতায় অধ্যাপককে কশাঘাতে জর্জরিত করলেন। অথচ তিনি নিজে কবি এবং অধ্যাপক দুই-ই ছিলেন। এর অন্তরশায়ী রহস্য অবশ্য খুব বেশি অস্পষ্ট নয়।

বর্ণ বৈভব
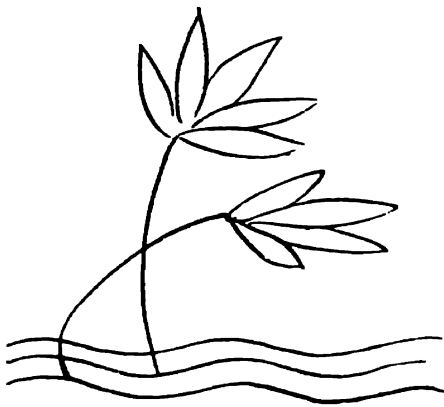
বর্ণ পরিচয়

জীবনানন্দের বর্ণচেতনা সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত নিবন্ধে ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এক নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জীবনানন্দকে যাঁরা 'ধূসরতা'র কবি বলেন তাঁরা জীবনানন্দের বর্ণানুভূতি সম্পর্কে কতখানি অজ্ঞ। তিনি জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যসম্ভার তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান ও তালিকা করে দেখিয়েছেন পূর্বাপর সমস্ত জীবন ধরে তিনি কত সচেতনভাবে উজ্জ্বল ও আলোকদীপ্ত বর্ণ সম্ভারের পশরা সাজিয়েছেন এবং সেই জন্যেই তাঁর বর্ণ ব্যবহারের বিশেষত্বের সঙ্গে তাঁর কবি মানসের সমীকরণ করা কত কঠিন।

মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন বর্ণচেতনা মানুষের মনোগহনের অনেক রহস্য উন্মোচিত করতে পারে। মধুসূদনের মহাকাব্য মেঘনাদ বধে যখন আদি ও উজ্জ্বল বর্ণসম্ভার—লাল নীল শাদা কালো হলুদ সবুজ রূপালি সোনালির প্রাচুর্য দেখি, তখন উপলব্ধি করি, এই কবির মনোগঠনে আদিমতা ও সরলতার এক ক্লাসিকসুলভ ভিত্তি আছে। আবার আধুনিক কবিদের রচনায় যখন গোলাপি, বেগুনি, আকাশি, পিঙ্গল, বাদামি প্রভৃতি নানা মিশ্র রঙ প্রাধান্য পাই তখন সহজেই শনাক্ত করতে পারি তাঁদের মানসিক জটিলতা ও নানা প্রবণতার। কেন না যে কোনো রঙ একটি স্বতন্ত্র মানসিকতাকে দ্যোতিত করে। তাই বিশেষ কোনো কবির কোনো কোনো বিশেষ রঙের প্রতি আসক্তি তা নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করতে পারে তাঁর চারিত্রিক কোনো কোনো বিশেষত্বের। সুতরাং জীবনানন্দের বর্ণানুরাগের সূত্রসন্ধানে তাঁর কবিতার পংক্তি-পরিক্রমা পণ্ডশ্রম বিবেচিত হবে না, বরং তাঁর অন্তর-রহস্য উন্মোচনে নূতন পথের নির্দেশ দেবে সন্দেহ নেই।

রসজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন 'ঝরাপালক' গ্রন্থের নামকরণে যে মানসিক পরিণতির চিহ্ন আছে, তার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিতে ততখানি নেই। 'ঝরাপালক' নামটির অনুষঙ্গে যে বিষণ্ণতা, আঘাত, বেদনা ও মৃত্যুর অনুভূতি আছে এর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তুতেও তা নেই। এই কাব্যে ব্যবহৃত বর্ণসম্ভারও ঠিক একই প্রমাণ দেয়। প্রথমাবধিই তাঁর লেখায় আদি বর্ণের চেয়ে মিশ্র বর্ণ বেশি। তার মানে লাল নীল শাদা কালো এই সব রঙ সরাসরি ব্যবহার করার চেয়ে রঙের নানা মিশ্র সূক্ষ্ম স্তরভেদ তিনি তুলে ধরতে ভালবাসেন। 'ঝরাপালকে' ব্যবহৃত রঙগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রঙ হলো লাল। এ বইয়ের মোট ৩৫টি কবিতার মধ্যে রক্ত-বর্ণ বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বার চল্লিশেক। আবার সোজাসুজি লাল রঙ বলে তাঁর তৃপ্তি নেই—তার নানা সূক্ষ্ম shade ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় নানা বর্ণবাচক প্রতিশব্দ, নানা বিশেষণ, নানা উপমা তিনি ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষার দৈন্য হলো বর্ণের অসংখ্য তারতম্যকে আমরা পৃথক পৃথক শব্দ দিয়ে নির্দেশ করতে পারি না। আমাদের ভাষায় মূল কয়েকটি রঙের নাম আছে মাত্র। কিন্তু

প্রত্যক্ষদৃষ্ট যে কোনো একটি রঙের নির্দিষ্ট shadeটি যদি ভাষার মাধ্যমে অন্যদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে চাই তাহলে উপযুক্ত পরিভাষা বাংলাতে জুটবে না। জীবনানন্দকে এই দৈন্য পূরণ করতে হয়েছিল প্রাকৃতিক নানা বস্তুর উপমা এবং নানা বিশেষণের যোগে। জীবনানন্দের আজীবনের সমস্ত বর্ণনার রঙগুলিকে যদি স্তরভেদ ক্রমে কেউ সাজিয়ে দেন তাহলে ভাষার একটা বড় অভাব হয়তো পূর্ণ হতে পারে।

কিন্তু সে কথা থাক। ঝরাপালকে লাল রঙের তালিকাটা এই ধরনের : অরুণ, আরক্ত, কুঙ্কুম, খুন, টুকটুকে, নারাঙ্গি, ফাগ, লালিমা, লোহিত, শোনিমা, হিঙ্গুল। এ ছাড়াও রয়েছে নটকান রাঙা, রুধির লাল, রাঙা অঙ্গার মালা, গিরির গোধূলি রঙিন জটা, আঁখি গোধূলির মত গোলাপি রঙিন, ডালিম ফুলের মত রক্তিম, নাশপাতি গাল, রাঙা নার্গিস, আপেলের মত লাল ইত্যাদি ইত্যাদি। রক্তবর্ণের অজস্র স্তরভেদ যথাযথ বর্ণনার জন্য উপমা নির্বাচনে তরুণ কবির এই আপ্রাণ প্রয়াস এবং অতৃপ্তিবোধ প্রমাণ করবে জীবনানন্দ বর্তমানের যুগোপযোগী সূক্ষ্ম ও জটিল মননের মানুষ।

এখনো প্রশ্ন থেকে যায়, ঝরাপালকে অন্য সব রঙের চেয়ে লাল রঙের এত প্রাচুর্য কেন? লাল তো কামনার, উত্তেজনার, অনুরাগের, প্রাণপ্রাচুর্যের রঙ। লালের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মুগ্ধতা, ভয়, আঘাত ও বিপদের সঙ্কেত। ঝরাপালকের নামের মধ্যে নিহিত বিষাদ ও মৃত্যুর অনুভূতির সঙ্গে এ রঙের সঙ্গতি কোথায়। নামকরণের সঙ্গে সঙ্গতি পেতে হ'লে এতে বিশাদ আর নৈরাশ্য শোক আর বেদনার রঙ কালো বা ধূসরতার আতিশয্যই তো দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। ঝরাপালকে কালো রঙও আছে; তিমির ধূম্র ধূসর পাংশু পিঙ্গল প্রভতি শব্দের যোগে তার যথেষ্ট বৈচিত্র্যও রয়েছে; কিন্তু অন্যান্য বর্ণসম্ভারের বিচিত্র ও উজ্জ্বল সমারোহের মাঝখানে তাকে বড় নিষ্প্রভ মনে হয়।

ধূসরতা

জীবনানন্দকে বলা হয়েছে 'ধূসর কবি'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তো 'ধূসর' নামাঙ্কিত বই। এখানেও কিন্তু একই ইতিহাস। বরং এখানে রঙের তালিকা আরো বিস্তৃত, সেই তালিকায় বিশেষণের বৈচিত্র্য আরো বেশি। যে 'কনক' বর্ণ একবার মাত্র দেখা গিয়েছিল 'ঝরাপালকে', এখানে তারই কত প্রাচুর্য, কত বৈচিত্র্য ঃ পাখির সোনালি চোখ, মেঘের সোনালি চুল, নারিকেল ফুল সোনা, ধানের সোনার ছড়া, রোদের সোনালি রেণু, বিকেলের সোনার ভিতর, এই শেষ বিষণ্ণ সোনালি তুলিটুকু, সোনা আকাশের চাঁদ, সোনালি প্রেমের গল্প—এইসব। হৃদয়ের কত দরদ কত মুগ্ধ আমেজ এতে মিশে আছে। রূপো আর রূপালি এসেছে। শাদা রঙ আরো বর্ণাঢ্য এখানে; আরো বিচিত্র তার ব্যাপ্তি ও বিশেষণ। ঝরাপালকে বিচিত্রবর্ণ নীল ছিল, এখানেও আছে। এ বইতে হলদে রঙে বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতা কম, পাণ্ডুরতা বেশি। পাণ্ডুরতার সঙ্গে বিবর্ণতা, রোগ ও মৃত্যুর যোগ আছে। পাণ্ডুর রঙ তাই ধূসরতারই অনুষঙ্গী। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নামকরণে এই দুটি বর্ণের সমীকরণ ও সহাবস্থান লক্ষ্য করতে অনুরোধ করি। 'পাণ্ডুলিপি' শব্দে ভিন্ন এক তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্যই এখানে প্রাসঙ্গিক এবং যথার্থতর সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও এখানে বিশ্লিষ্ট করে

আলোচনা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস জীবনানন্দ নামকরণের সময় এর গৌণ তাৎপর্যের কথা ভুলে যান নি। কবির সজ্ঞান চেতনায় এটি শ্লিষ্ট এবং পুনরুক্তবদাভাস হয়েই ছিল।

যাই হোক, শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা শব্দকোষে 'ধূসর'কে শাদা-কালো বা হলদে শাদার মিশ্র রঙ বলেছেন। 'পাণ্ডু' শব্দের অর্থও ঠিক তাই। শাদা-কালো বা শাদা-হলুদের সমাহার বিবর্ণ রঙ। রঙের এই পাণ্ডুরতা যে জীবনানন্দের একান্ত প্রিয় ছিল তা আলোচ্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অথবা তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থের বর্ণ প্রয়োগ প্রমাণ করবে না। তবুও 'ধূসর' শব্দটি তাঁর কাব্য পাঠকদের কাছে অবিস্মরণীয় মনে হয়েছে ঐ প্রতীকী ব্যঞ্জনাটির জন্যে। অস্পষ্ট, বিগত, বিলুপ্ত, দূরস্থিত—এইসব ভাব যেমন করে এই শব্দের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, পাঠক চিত্তে দাগ রেখে গেছে, তাঁর কবিতার বহুবার ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য উজ্জ্বলতর বর্ণের অভিব্যক্তি ততখানি সাড়া জাগাতে পারেনি।

কিন্তু 'ধূসর' এই শব্দে পাঠক নয়, জীবনানন্দ স্বয়ং কি বুঝতেন, নানা কবিতায় এই শব্দটির প্রয়োগ থেকে আমাদের তা বুঝে নিতে হবে। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় কবিতায় রঙকে তিনি দুইভাবে ব্যবহার করেছেন। কোনো বস্তুর রূপের নির্দেশের জন্য রঙকে, অথবা বিশেষ কোনো ভাবের অভিব্যক্তির জন্যও রঙকে জীবনানন্দ ব্যবহার করতেন। 'ধূসর' শব্দে যখন তিনি বর্ণ বোঝেন তখন লেখেন :

পেঁচার ধূসর ডানা
নেউল ধূসর নদী
অনেক ধূসর ঘোড়া
ধূসর সন্ধ্যা
ধূসর বকের সাথে
বিকেল বেলার ধূসরতা
আভার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তি
মাথার সকল চুল হয়ে যায় ধূসর ধূসরতম শন।

ধূসর এখানে সর্বত্রই অন্ধকারের নিকটবর্তী শাদা-কালো-বাদামির একটা মিশ্র রঙ। ধূসর, আমরাও জানি, ধূলির রঙ, ছাই-এর রঙ। সুতরাং পেঁচার ডানার রঙ, বেজি-র রঙ, বকের পিঠের রঙ, কাঁচা পাকা চুলের রঙ, সন্ধ্যার আবছা আঁধারের রঙ—সবই ধূসরের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু 'ধূসর' শব্দকে জীবনানন্দ যখন বাচ্যার্থ থেকে প্রসারিত করে নেন ভাবলোকে তখন এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা এসে যায়। যেমন :

ধূসর চিবুক
উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে
ধূসর বাতাস
তুষার ধূসর ঘুম
ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ
বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ
বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা (বোস)
ধূসরিম মহিলার।

বুঝতে কষ্ট হয় না 'ধূসর' এখানে ম্লান, বিশুষ্ক, অস্পষ্ট, অচেতন, বিলুপ্ত, দূরবর্তী, লোকান্তরিত, মৃত প্রভৃতি অর্থ বহন করে। 'ধূসর' শব্দটি প্রয়োগ না করেও কবি এই একই ভাব নানা কবিতায় ব্যবহারও করেছেন, যেমন : পাণ্ডুর পাতার রঙ, ফ্যাকাশে পাতা, হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি, মড়ার চোখের রঙ, বিবর্ণ বাদামি পাখি, 'যদিও পিঙ্গল ধূমা কোথাও রয়েছে কাছাকাছি'। তাঁর ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও এই মৃত্যুমুখী, নেতিবাচক ভাবনার সন্ধান পেয়েছেন ড. অমলেন্দু বসু। ঘুমায়ে গিয়েছে, আসেনি, ঝরিয়া গেছে, ছিঁড়ে, থাকিবে না, নিভায়ে, যেতেছে নিঃশেষ হয়ে, থামিতে হয়, ফুরায় হাওয়া হয়ে, ভূত হয়ে ইত্যাদি। তাই 'ধূসর' কথাটি জীবনানন্দের কবিতায় একটি শব্দ-মাত্রে আবদ্ধ নেই, একটি বিশিষ্ট চেতনায় পর্যবসিত হয়েছে।

আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য-চেতনার পিছনে রয়েছে মৃত্যুর প্রসারিত পটভূমি। 'যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,' যে বিলুপ্ত অতীতের প্রিয়দের মুখ এবং স্মৃতির বেদনা কখনো ভুলতে পারে না, 'কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইশারায়,' 'মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর,' যে দেখে 'পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে' রাখা যে অনিবার্য জানে, নিজের হৃদয়কে যার মনে হয় 'মৃত এক সারসের মত' ; সে কবির কাব্যে 'ধূসরতা'র চেতনা পরিব্যাপ্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রচনার শেষ পর্যায়ে বেলা অবেলা কালবেলা-র শেষের দিকে ধূসর শব্দটির প্রয়োগ তো প্রায় আর পাওয়াই যায় না। তবু এই চেতনাকে পরিহার করা গেছে কি? জীবনানন্দের সারা জীবন ভরে এই মৃত্যু, বিচ্ছেদ, ব্যথা, স্মৃতি ও বিষণ্ণতা এক ধূসর বর্ণাভা রেখে গেছে। রসদৃক্ষ্ম পাঠকের চেতনায় জীবনানন্দ তাই 'ধূসরতার কবি'।

বর্ণচেতনা

ঐখানে সারাদিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে
হলদে সবুজ নীল রঙ তার বুকে :
পাখি মেঘ রৌদ্রের

ঐখানে সারা দিন

হলদে সবুজ নীল—এই যে রঙগুলি উল্লেখ করলেন কবি এতো পর্যায়ক্রমে পাখি, মেঘ রৌদ্রের রঙ নয়। হলদে যদি রৌদ্রের রঙ হয়ও, নীল নিশ্চয় আকাশের রঙ, অথবা পাখির। সবুজ হয়তো ঝাউবনের রঙ, পাখিরও হতে পারে। মেঘের রঙ কল্পনা দিয়ে এঁকে নিতে হবে পাঠককে। সবটাই তো একই পদ্ধতিতে পাঠককে দিয়ে কল্পনা করানো। ঐ যে রঙগুলির উল্লেখ তা শুধু পাঠকের দিকে রঙ তুলি ইজেল এগিয়ে দেওয়া, বিষয়ের রেখাচিত্রটিও দিয়ে দিলেন। তার পরই তো খেলা শুরু। পাঠক খুশি মতো রঙ বুলিয়ে সম্পূর্ণ করে নিক ছবি, যার যেমন পছন্দ বা ক্ষমতা, যার যেমন শিক্ষা বা রুচি। যেমন ধরুন নীল। নীল তো শুধু বর্ণ নয় একটা ভাবও। কবির ভাষায়

১। নরম সন্ধ্যার রঙে নীল হয়ে আছে শরবন।

. জানিনা কোথায় তুমি

২। শিবের কণ্ঠ নীলকণ্ঠ বিহঙ্গমের অসীম নীলায়
মিলায় মিলায়!
গাঢ় নীলে রৌদ্র সাগর অগ্নিশাদা ডানায় জ্যোতির্ময়,
নভোনীলের আলোয় মনোনীলিমা জেগে রয়।

: ভোরের কবি জ্যোতির কবি

৩। এখানে আকাশনীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা—

. ৩১ ক. বাং

নীলকণ্ঠ, নীল বিহঙ্গম, অসীম নীলিমা, নীল সমুদ্র রৌদ্রোজ্জ্বল উড়ন্ত জ্যোতির্ময় নভোনীল পেরিয়ে এক মনোনীলিমার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে কবির চোখে। তার সঙ্গে কবি চেতনায় ইতিহাসের ক্রান্তি-নীলিমা।

আবার 'সুন্দরবনের গল্প' কবিতাতে কবি কি বর্ণাঢ্য প্রতিসরণীয় ছবি আঁকছিলেন কথা দিয়ে!

কাল চৈত্রের জ্যোৎস্নায়
রূপালি শিশির বেগুনি ছায়ার দেশে
জাফরিকাটা জানালার রাজ্যে
সবুজ জাফরান রঙের বাতাসের উষ্ণতায়
প্রান্তরে প্রান্তরে চাঁদের আলোর কমলা বর্ণের মদিরার ভিতর
এরা দুজনে অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি করেছিল কাল
এই হরিণ—এই চিতা—

তারপর

সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল
জানালার মতো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে
চৈত্রের বাতাসে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো নীল হয়ে যাচ্ছে আবার
যেন মেহগিনির গহন ঘন ছায়ায়
হয়ে যাচ্ছে মেহগিনি কাঠের হরিণ
নীল দারুময়ী বাঘিনী
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মতো,

. সুন্দরবনের গল্প

এসব বর্ণনায় রঙ বোঝাতে শুধু পরিচিত বর্ণগুলি মাত্র নেই—শিশির, মদিরা, মেহগিনি কাঠ, দারুময়ী, বাঘিনী সবই বর্ণবাচক হয়ে উঠেছে। বর্ণ থেকে ভাব, বস্তু থেকে বর্ণ, বস্তু থেকে ভাব, এই চলাচল প্রতি মুহূর্তে চলেছে। সেই পটচিত্রে এসে মিশছে বর্ণগন্ধ স্বাদ স্পর্শের অজস্র সংকেত। কবির বর্ণ চেতনাকে এভাবেই দেখতে ও বুঝতে হবে।

বর্ণমালা

রঙকে জীবনানন্দ কোন বইয়ের কোন কবিতায় কতবার ব্যবহার করেছেন তার এক নিশ্ছিদ্র তালিকা দেবার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা বরং দেখতে চাই অভিজ্ঞতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির বর্ণচেতনার উত্তরণ কিছু হচ্ছে কিনা? তাঁর নিছক রূপদৃষ্টি ভাবের জগতে কোনো স্পর্শ রেখে গেল কিনা।

আমরা দেখেছি ঝরাপালকের কবির মধ্যে সেই সম্ভাবনা ছিল। যিনি লেখেন নীহার নীল, বকের পাখার মত লঘু মেঘ, অথবা কুয়াশার শাদা ডানা, তিনি রঙকে ছাড়িয়ে আরো কিছু দেখতে পান বৈকি। আমরা লক্ষ্য করেছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবির বর্ণানুভূতি আরো পরিণত হয়েছে; বর্ণবৈচিত্র্য বোঝাতে যেমন নানা কৌশল নিয়েছেন, 'অজস্র গভীর রঙ' ছড়িয়ে দিয়েছেন চারপাশে, 'বাদামি সোনালি নীল রোম!' 'বাদামি সোনালি শাদা ফুটফুটে ডানা' বিচিত্র বর্ণের অজস্র পাখির ছবি ফুটিয়েছেন আকাশে, অথবা 'মাছরাঙা, তাব রঙ', 'প্রজাপতি রাঙা মেঘ,' অথবা 'সন্ধ্যার রঙ' যে বর্ণাঢ্য সুষমা ছড়ায় তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। রঙের উজ্জ্বলতা, সুচিক্কণ মসৃণতা ফুটেছে 'ভেলভেট জ্যাকেটের মাছ রাঙা', আবার বিবর্ণতা বা বর্ণহীনতাকে রূপ দিতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না—। 'বিকেলের রঙ—রঙের শূন্যতা'। এই শিল্পিতা অবিস্মরণীয়। তার চেয়েও বড় কথা এই পর্বে এসে তিনি রঙকে চেতনা-কল্পনার মধ্যে পেয়েছেন। লাল রঙ বোঝাতে কবি যখন 'মশালের আগুনের রঙ' লেখেন তখন আমরা পাঠকরাও যেন তার উত্তাপ আর জ্বালা অনুভব করতে পারি। অথবা যখন লেখেন 'রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মত লাল' তখন সেই কবোষ্ণ ঈষৎ রক্তাভ রোদটাকে আদর করতে ইচ্ছা করে।

বনলতা সেনের 'শিকার' কবিতাটি সযত্নে খুঁটিয়ে পড়তে অনুরোধ করবো পাঠকদের। যেখানে 'আকাশের রঙ ঘাস ফড়িঙের দেহের মত কোমল নীল', যেখানে পেয়ারা ও নোনার গাছ 'টিয়ার পালকের মত সবুজ', সেখানে রাত্রে দেশোয়ালীরা যে 'মোরগ ফুলের মত লাল আগুন' জ্বেলেছিল 'সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর ; হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো'। কুঙ্কুমের মতো আগুনের রোগা শালিকের হৃদযের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো হয়ে যাওয়ায় উজ্জ্বল দিবালোকে আগুনের নিষ্প্রভতাই শুধু বোঝায়নি, নিভন্ত আগুনের নিস্তেজ অবলুপ্তির ইশারাও ফুটিয়ে তুলেছে।

'সাতটি তারার তিমিরে' বিভিন্ন বর্ণের উপাদান কোথাও কোথাও আরো ব্যঞ্জনাময় ও কাব্যধর্মী। 'রিষ্টওয়াচ' কবিতায় দূর সমুদ্রের শব্দ কবির চেতনায় 'শাদা চাদরের মতো'। 'সপ্তক' কবিতায় কবি লিখেছেন 'জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে' ; অন্যত্র নভশ্চর 'সারস দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্ব ফেলে যায়'। আর একটি কবিতায় নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয়—

> হাতে তার তুলাদণ্ড;
> শান্ত—স্থির;
> মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।

: অভিভাবিকা

নীল হলো ঔদার্য, মহত্ত্ব, আভিজাত্যের রঙ। 'নীলাভ বৃত্তি' বলতে কবি কোনো উদারতা ও মানবিক মহত্ত্বের আভাস দিতে চান নি কি? রঙের বর্ণনায় আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলছি :

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।

· বিভিন্ন কোরাস · সা. তা. তি.

উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে যে বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাকে সবুজ বলেই মনে হচ্ছে— এভাবে যদি বলা হতো, তাহলে ঘাসের সবুজকে এত সুন্দর আমাদের কল্পনায় প্রতিভাত করে তোলা যেত না।

শাদা-কালো

বিখ্যাত বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন বলেছিলেন, মানুষের চোখের দুটি পৃথক ধর্ম আছে। যখন পার্থিব আলো উজ্জ্বল থাকে চোখের পর্দায় বস্তুজগতের রঙিন ছবি ধরা পড়ে। কিন্তু রাত্রে বা অন্ধকারে, আলো স্তিমিত হয়ে এলে ঐ চোখই শাদা-কালো রঙে বস্তুর অবয়বটাকে চিনিয়ে দেয়, তার রঙ চিনিয়ে দিতে পারে না।

জীবনানন্দের কবিতার বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। জীবনের শেষ পর্বে এসে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় পৌঁছে রঙ সম্পর্কে এই সব উত্তেজনা, রূপরচনায় এই ঐকান্তিক আগ্রহ ও যাথাযথ্য আর তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। ভাবের আরো গভীরতর জগতে কবির মনোযোগ আকৃষ্ট ; সুতরাং উপমা ও বিশেষণের প্রাচুর্য দিয়ে রঙকে বিশদ ও লক্ষ্যভেদী করার সাধনা তত প্রবল নয় আর। কাব্য রচনার এই সায়াহ্ন বেলায় তাঁর কবিদৃষ্টি থেকে রঙ যেন মুছে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। একেবারে লুপ্ত হয়েছে বললে ভুল হবে। রাত্রে যেমন উজ্জ্বল আলোক রশ্মি-পাতে মানুষ সব রঙ আবার দেখতে পায় তেমনি এ পর্বের কোনো কোনো কবিতায় বর্ণসুষমা দেখা যায় বৈকি! যেমন, 'এই পথ দিয়ে', 'মানুষ যা চেয়েছিল', 'হে জননী হে জীবন' ইত্যাদি। তবু জীবনানন্দের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরাও বলতে পারি—

আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো।
আকাশ তেমন নীল? আকাশ তেমন নীল নয়,
মেয়েমানুষের চোখে নাই যেন তেমন বিস্ময়,
মাছ রাঙা শিশুদের পাখি আজ : শিশুরাও কারো
রেশমি চুলের শিশু নয় আজ :

: সে

বর্ণাঢ্যতার বদলে বরং রঙকে এখন থেকে এক বিশেষ ভাবের বাহন হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। আর এই নূতন ভাবনা প্রধানত শাদা আর কালো এই দুটো রঙকে আশ্রয় করেই রূপায়িত হয়েছে।

'শাদা-কালো রঙ এসে বারবার—কেবল মিশছে অন্ধকারে'।

: এইখানে সূর্যের

শাদা রঙ জীবনানন্দের চেতনায় প্রজ্ঞা, সংস্কৃতি, অগ্রগতি, শ্রম এবং জীবনের প্রতীক। কালো অপরপক্ষে অজ্ঞানতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, হিংসা, হানাহানি এবং মৃত্যুর দ্যোতক। আমরা আগে অন্যত্র আলোচনাও করেছি যে আলো এবং অন্ধকার শাদা এবং কালো মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে দুই বিরোধী শক্তি, জীবনানন্দ এইভাবে বুঝেছেন বা বোঝাতে চেয়েছেন। অন্তিম পর্বের অজস্র কবিতায় শাদা ও কালোকে এই অর্থে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন—

এই দুরঙই ভালো,
শাদা পাখির কালো
কালের পাখি সাথী
উড়ছে দেশে দেশে।

তোমার আমার ভালোবাসা—তাকি
একটি পাখি—একটি শাদা পাখি!

তোমার আমার

প্রেমই হলো শাদা পাখি আর কালো পাখিই হলো মৃত্যু। অথচ তারা সাথী, পাশাপাশি তারা দেশে দেশে উড়ে চলে। কিন্তু শাদা পাখিই কালো পাখি কিনা তা কবির জানা নেই।

আবার—

অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে
শঙ্খসাগর এ রোদ ভালো লাগে
এখুনি ঘুম এল যাবে, কাছে
কালের কালো মহাসাগর আছে।

: তোমায় আমি দেখেছি ঘুরেফিরে

শঙ্খ শাদা সাগরই হলো জীবন, রৌদ্রই হলো জীবন, কালের মহাসাগরের রূপ হলো কালো। সেখানে ঘুমিয়ে পড়া মানে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া। শাদা কালোর এই ধাঁধার মধ্যে জীবনানন্দের বর্ণচেতনার অন্তিম পরিণতি খুঁজে নিতে হবে।

বাক্‌শিল্প
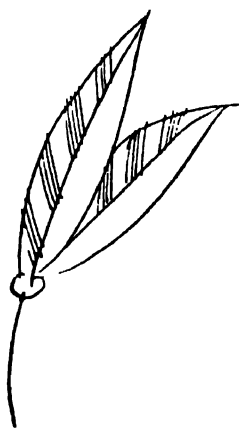
ভাষা

গাছ চিনতে যেমন সাহায্য করে গাছের পাতা ও ফুল, কবিকে বুঝতে তেমনি তাঁর ভাষাও পরখ করা যেতে পারে। প্রাবন্ধিকের মতো বিষয়ের অর্থব্যক্তই তো কবির লক্ষ্য নয়, রূপময় অভিব্যক্তিই আসল কথা। তাই কোন্ ভাষায়, কি বাণীবিন্যাসে তাঁর কবিতা রূপায়িত হলো তার ভিতরে কবিসত্তার নিগূঢ় পরিচয় লুকানো থাকে।

আমাদের সাংসারিক হাজারো প্রয়োজনে যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি, কথা বলি, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি—অতি-ব্যবহারের মালিন্যে তার উজ্জ্বলতা মুছে যায়। অর্থের মধ্যে আর নিটোল ব্যঞ্জনা থাকে না, শান না দেওয়া ক্ষুরের মতো ভোঁতা, কোম্পানির আমলের তামার পয়সার মতো সিংহের মুখ উঠে গেছে, সব লেখা মুছে গেছে, পুরানো চকমকি পাথরের মতো তার তীক্ষ্ণ কোণগুলি চোট খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে গেছে। দৈনন্দিনের দাবি এতে হয়তো কোনোক্রমে মেটে, কিন্তু যখনই আমরা নূতন কিছু, বিস্ময়কর বা উত্তেজক কিছু বর্ণনা করতে চাই তখন বুঝতে পারি এই ভাষায় কুলাবে না—আমাদের হাতড়াতে হয় তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আন্‌কোরা কোনো শব্দের জন্য। এই ভাষায় তো আর চেতনার সঙ্কেত-গূঢ়তা, অনুভবের শিলীমুখ তীব্রতা আনা সম্ভব নয়, তাই প্রতি যুগের প্রধান কবিকেই নিজের উপযোগী করে ভাষা বানিয়ে নিতে হয়।

ভারতচন্দ্রের আমল থেকে কবিতার আসরে যে ভাষা চালু ছিল তাতে মধুসূদনের প্রতিভার নবত্ব অভিব্যক্তি পেতো না বলেই ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রতিভার একান্ত ভিন্নধর্মিতার জন্য সে ভাষা পরের কবিরা নিতে পারেননি পুরোমাত্রায়। আবার হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ভাষা-ঐতিহ্য ভেঙে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাকে নূতন করে নিয়েছিল।

এমনই হয়ে থাকে। যে কবির নূতন চেতনা ও অনুভূতি নেই, তাঁর চিরায়ত কবিভাষাতেই কাজ চলতে পারে। কিন্তু প্রতিভা যাকে স্বতন্ত্র বানিয়েছে তাঁকে পৃথক পরিভাষা গড়তে হবেই। নইলে প্রথাগত ভাব ভাব-পরিধির বাইরে কবি যাবেন কি ভাবে?

জীবনানন্দের কবিতার ভাষা বাংলার সর্বজনীন কবি-ভাষা তো নয়ই, এমনকি তাঁর নিজের মুখের ভাষাও নয়। আপাতত প্রহেলিকার মতো মনে হতে পারে একথা। জীবনানন্দের কবিতার মনোযোগী পাঠকরা জানেন আমরা কি বলতে চাইছি। একদা ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতাকে কৃত্রিমতা মুক্ত করতে চেয়ে কবিতার পৃথক চিরায়ত কবি-ভাষাকে পালটে কথ্য ভাষাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এই রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিক কবিরা সকলেই আরো নিষ্ঠার সঙ্গে এই রীতি অনুসরণ করেছেন। কবিতার ভাষা এবং মুখের ভাষা সেখানে

অদ্বৈত, কিন্তু জীবনানন্দ কবিতার এই কথ্যরীতি ছেড়ে দিয়ে এককভাবে সাধুভাষার রীতিতে ফিরে গেলেন। অরুণকুমার সরকার জানিয়েছেন "মনে পড়ে 'আকাশলীনা' নামক কবিতায় 'কী কথা তাহার সাথে?—তার সাথে!' এই বাক্যটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলুম। প্রশ্ন ছিল, একই বাক্যে 'তাহার' এবং 'তার' কেন ব্যবহৃত হলো?... জীবনানন্দ... বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'তাহার' এবং 'তার' কথাটির অর্থ অভিধানে এক হলেও ব্যঞ্জনার দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 'নড়িতেছে' এবং 'নড়ে' তাঁর কাছে সমার্থবাচক শব্দ নয়। এই কারণেই তিনি 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি' লিখেছিলেন, লেখেননি 'হেঁটে চলি' যা মুখের ভাষার কাছাকাছি হত, কিন্তু যাতে 'হাঁটিতেছি'র প্রবহমানতা থাকত না। লিখিত ভাষা বনাম কথ্য ভাষার সমস্যা জীবনানন্দকে কোনোদিন ব্যস্ত করেনি। যে সব শব্দের ধ্বনিতে বিস্তার আছে, আমার মনে হয়, সেগুলিই তিনি পছন্দ করতেন। বস্তুত শব্দ বাছাইয়ের পার্থক্য থেকে এক কবিকে অন্য কবির থেকে আলাদা করে চেনা যায়।"

দূরের আকাশ, তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী

মহাকাব্যের কবিরা ভাষাকে পৃথক বিশিষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলবেন—ইউরোপীয় অলংকার শাস্ত্রে এই নির্দেশ আছে। জীবনানন্দ গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও কি তাই করতে চেয়েছেন? অথবা তাঁর এ প্রয়াস শুধু কবিতার রসসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে? তাঁর শব্দ সন্নিবেশ রীতি সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ভাবকে আরো স্পষ্ট আরো সুচারুভাবে ব্যক্ত করতেই যে তিনি দেশী বিদেশী শ্লীল অশ্লীল যে কোনও শব্দ প্রয়োগ করেছেন—তা কিন্তু আদৌ নয়, বরং ঐসব শব্দ প্রয়োগে ভাবকে অস্পষ্ট ও অস্ফুট করে তোলার একটা সচেতন প্রয়াস প্রতীকী কবিদের মতো তাঁর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা সুরেশ সমাজপতি থাকলে ভাষার এই বিজাতীয়তাব জন্য তীব্র কটূক্তি কবির প্রাপ্য হতো। যেহেতু একালের কাব্যবোধ ওঁদের কাল থেকে অন্তত কিছু এগিয়েছে—তাই ভাষা বিচারের মানদণ্ড এখন আলাদা। এখন অন্তত ব্যাকরণগত বিজাতীয়তা নিয়ে পাঠকের অভিযোগ নেই—অভিযোগ অস্বচ্ছতা এবং দুর্বোধ্যতাকে ঘিরে। বলা বাহুল্য, ভাষার বিজাতীয় বিন্যাস তার একটা কারণ হতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার বিরুদ্ধে, 'সাতটি তারার তিমির'-এর একটি সংকীর্ণ অধ্যায় ছাড়া দুর্বোধ্যতার অভিযোগ নেই, আর সাতটি তারার তিমিরে দুর্বোধ্যতার হেতু ভাষা নয়, কবিতারই এক স্বতন্ত্র কলাবিধি। কিন্তু কবিতা যদি দুর্বোধ্য না হয়, তার আবেদন যদি অটুট থাকে, তবে তার ভাষার বিরুদ্ধে বিজাতীয়তার অভিযোগ টিকতে পারে না।

তবু কবিতার ভাষা বিচারে এ প্রশ্ন উঠবেই যে জীবনানন্দ যে ভাষায় কবিতা লিখেছেন তা দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাঁর বা আমাদের কারো মুখ থেকে উচ্চারিত হয় কি না। এ ভাষা এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি-মনের ভাষা, ব্যক্তির অনুভবের ভাষা, যে ইংরেজিতে পড়েছে, ভেবেছে। ইংরেজি মননে মানুষ হয়েছে এমন এক বাঙালী শিল্পী যেন ইংরেজি কবিতার আশ্চর্য স্বাদু অনুবাদ করেছেন এই মনে হবে প্রায়শ তাঁর কবিতা পড়ে। অনুবাদই

বলবো—কারণ ভাষান্তরিত হওয়ায় তার প্রকৃতি পাল্টায়নি। ভাষার সেই বিশিষ্ট প্রকরণটি এখানে পরিত্যক্ত যাতে স্বচ্ছ বাংলা হয়।

কিন্তু কবিতার তাতে ক্ষতি হয়েছে কি? কবির কাজ পাঠকের স্তিমিত চেতনাকে নাড়া দিয়ে হৃদয় এবং প্রকৃতি, বিশ্বের অন্তর্লোক আর বহির্লোক সম্পর্কে সজ্ঞান করে দেওয়া। ক্লাসিক্যাল রীতির প্রবক্তারা তাই ভাষাকে বিজাতীয় ও স্বতন্ত্র করে তুলতেই পরামর্শ দেন। বাস্তবিক কবিতাতে ভাষারীতির ততটুকু পংক্তি-লঙ্ঘন মার্জনীয়—এমনকি প্রত্যাশিত, যাতে ভাবের পরিস্ফূর্তি সম্ভব হয়। কবিতায় আমরা একটু কৃত্রিমতা, একটু স্বাতন্ত্র্য, ভাষার একটু নূতন চাল আশা করি; গদ্যে তা সহজে বরদাস্ত হয় না। জীবনানন্দের বাংলা গদ্য এবং বাংলা কবিতা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে উভয়েই একই আধারে তৈরি, কিন্তু কবিতায় যা স্বাদু বলে গণ্য হয়েছে গদ্যে তাই তিরস্কৃত হবে।

> "এই রকমেই চলেছে—অনেক কাল থেকে ; এবং কবিমানসের প্রমত্ততা বা তার মহাভাবনার দৌরাত্ম্য তাকে যতই নিরাবলম্ব ও অস্পষ্ট করে তুলতে চাক না কেন—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাকবিই এই অস্বস্তি বোধ করেছে—জনসাধারণের নিজেদের বাচনরীতির সফল স্বচ্ছতার দাবি সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি ; এ জিনিষ তাকে—তার অন্তরিন্দ্রিয়কে গঠন করে আসছে অনেক আগেকার যুগ থেকে—এমনই ভাবে, যে কবিতা সৃষ্টি করবার সময় সে তার নিজের আদর্শ উপায়কে যতটা স্বায়ত্ত মনে করুক না কেন, ততদূর স্বাধীন তা নয়। যে সময় সে বাস করেছে, এবং যে সময় বাস করেনি, যে সমাজে, সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে, এবং যেখানে সে নেই—এই সকলের কাছেই সে ঋণী। যদিও শিল্পসৃষ্টি করবার সময় এই ঋণ কঠিন উত্তমর্ণের মতন তাকে আক্রমণ করতে আসে না, এবং এই জন্যে উভয়-পক্ষেরই মঙ্গল, তবুও ঋণ বিস্মরণের মানুষ কবি নয় ; এ জিনিষ ঋণও নয়, উপায় বরং—মর্মার্থী হয়ে বেঁচে থাকবার ; —কবির অনুচেতনায় এবং কখনো-কখনো কল্পচেতনার ভিতর সঞ্চারিত থেকে তার প্রতিভাকে সাহায্য করছে তার বিশেষ অভিজ্ঞতাকে দূষিত না করে যতদূর সম্ভব পরার্থপর করে তুলতে।"
>
> : মাত্রাচেতনা

ভাষার এমন জটিল বুনন বাংলার চরিত্র লক্ষণ নয়। জটিলতা সব ভাষাতেই থাকে, কিন্তু তার রূপ যদি এমন হয় যে অর্থনির্ণয়ের জন্য পদে পদে হোঁচট লাগে, চেতনাকে সদাসর্বদা সতর্ক রাখতে হয় পাছে কোথাও কোনো বক্তব্য গুলিয়ে হারিয়ে যায়—তবে সে ভাষাকে বিজাতীয়ই বলতে হবে। এমন অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এমন অস্বচ্ছ লেখা বেশিক্ষণ পড়া কঠিন। মন ক্লান্ত হয়। লেখক মাতৃভাষায় লিখলে এবং পাঠক মাতৃভাষায় পড়লে এ বিড়ম্বনা কেন হবে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অথচ এই লেখাটিকেই মনে মনে ইংরেজিতে তর্জমা করে নিলে হয়তো তেমন কঠিন ঠেকবে না। মানি, সমালোচকের

পরিভাষা যথাযথ এবং সংহত হওয়া দরকার, কিন্তু ভাষাকে ক্লিষ্ট করে নয়। জীবনানন্দের ভাষার ক্লিষ্টতা শুধু অর্থসংহতির জন্য নয়, ভাষার যে বিজাতীয় চাল রয়েছে তার জন্যেই। তিনি ইংরেজি মননে ভেবেছেন, বাংলা শব্দে সেই ভাবনা সাজিয়েছেন, বাংলা ভাষা-প্রকরণ মানেন নি। এখানেই তাঁর ব্যর্থতার সূত্রপাত। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে বক্তব্য কম। চিন্তার ভিতর একটা অগোছালো ভাব। ব্যাপ্তি অল্প। যদিও বেশ গভীর অনেক জায়গায়। সহৃদয় এবং দুঃসাহসী। শব্দ-প্রয়োগের যাথার্থ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ-সজাগ। এই শেষ সৎগুণটিও ভাষার প্রসাদগুণ বাড়াতে সাহায্য করেনি। অবশ্য সাহিত্য আলোচনার পরিধি ছাড়িয়ে জীবনানন্দ যখন সাধারণ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, আত্মস্মৃতিময় আলোচনা করেছেন তখন এই ইংরেজি সুলভ ভাবনার রীতিতে এই রকম অজস্র clause কণ্টকিত পদ্ধতিতে লিখতে আর দেখা যায় না তাঁকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১. "ইংরেজি চলে যাচ্ছে। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা। ভারতীয়দের তা শিখতে হবে। ইংরেজির তুলনায় হিন্দি ঢের অশক্ত ভাষা—গরীব সাহিত্যের। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের ছোট বড় ব্যাপারে হিন্দিতে অনর্থক সাচ্ছল্যে চলতে হবে বলে এ ভাষা এখন থেকে হয়তো সমস্ত দেশেরই বোধবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার আশ্রয়ে তৈরি হতে থাকবে। এ ভাষার সম্ভাবনা কতদূর আমি এখনই ঠিক কিছু বলতে পারছি না। তবে হিন্দিও সংস্কৃতের মত বড় ভাষার থেকে জন্মেছে। ফার্সির কাছেও ঋণী।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব ভবিষ্যৎ (দেশ)

২ আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু বর্ষণের কোনোও লক্ষণই দেখছিনে। মাঝে মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপল পত্রকান্তিভি কৃচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশি সন্নিভৈঃ' মেঘমালা দুরদিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দুদণ্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই আবার আকাশের 'সেরুলিয়ান ভ্যাকেন্সি'। ডাক পাখির চিৎকার, গাঙচিল শালিকের পাখার ঝট্‌পট্‌, মৌমাছি গুঞ্জরণ—উদ্দাম অলস নিরালা দুপুরটাকে আবো নিবিড় ভাবে যে ভরে তুলবে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা পত্রাংশ

কিন্তু এই সহজ সাবলীল সারল্য 'কবিতার কথা' বইতে খুবই দুর্লভ।

কিন্তু কবিতাতে এই একই রকমের জটিলতা একটা অস্পষ্ট ব্যঞ্জনার আভাস সৃষ্টি করেছে বলেই তার আবেদন আলাদা। প্রবন্ধ-পাঠকের মূল বক্তব্যটা বোঝা চাই—যা এই বক্তব্য বুঝতে বাধা সৃষ্টি করে তা প্রবন্ধের দোষ। কিন্তু কবিতায় বক্তব্যের প্রাধান্য নেই। ছন্দ, ধ্বনি ও রূপ অনুভূতির সঙ্গে মিশে যে আবহ গড়ে ওঠে তাই কবিতায় আস্বাদ্য। তাই সেখানে অভিযোগ উঠবে না। 'মানুষের মৃত্যু হলে' নামক বিখ্যাত কবিতায় রয়েছে—

ফসলের পরিবর্তে মানুষের শরীরে মানুষ
গোলাবাড়ি উঁচু ক'রে রেখে নিয়তির
অন্ধকারে অমানব ;

তবুও গ্লানির মতো মানুষের মনের ভিতরে
এই সব জেগে থাকে বলে
শতকের আয়ু—আধো আয়ু—আজ ফুরিয়ে গেলেও এই
শতাব্দীকে তারা
কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা করে
আশায় উজ্জ্বল রাখে; না হলে এ ছাড়া
কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।

: মানুষের মৃত্যু হলে

এখানে আরো জটিল, আরো তর্জমার মতো দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যেত। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। একটি শ্রেষ্ঠ সাবলীল কবিতা থেকেই এই উদ্ধৃতি তোলা হলো। একদা আদি আধুনিক কবি মধুসূদনের ভাষা সম্পর্কেও বিজাতীয়তার অভিযোগ উঠেছিল কিন্তু যুগপরিবেশ ও ভাষার পরিণতির বিচারে জীবনানন্দের বিরুদ্ধে যুক্তি তীক্ষ্ণতর হবে। হয় এ অনবহিতি, নয় স্বেচ্ছাচার—এমন তর্কও এড়ানো যাবে মনে হয় না। এখানে আবার স্মরণ করানো ভালো আমাদের বক্তব্য প্রবন্ধের ভাষার বিরুদ্ধে, কবিতার ভাষা সম্পর্কে নয়।

অথচ অনায়াস বাংলা লেখা যে জীবনানন্দের আয়ত্তের মধ্যেই ছিল তার প্রমাণ তাঁর গল্পে রয়ে গেছে। অত্যন্ত সহজ ঘরোয়া ভাষার আধারে দেশজ বিদেশাগত, শ্লীল, অশ্লীল, সব শব্দ আশ্রয় করেই সংলাপে, বর্ণনায়, মনোবিশ্লেষণে সর্বত্র তিনি এই ভাষাকে স্বচ্ছন্দ করে তুলতে পেরেছেন।

'ডক্টর সেনকে কত দেওয়া হবে?'
'দশহাজার ওয়ার্ডস্', ঘোষ বললে, 'শ-দেড়েক পাবে। কারণ, গুণে দেখলে ওসব প্রবন্ধে বড় জোর তিন-চার হাজার ওয়ার্ডসের বেশি দম থাকে না লেখকের; বাকিটা সব কাঁথা সেলাই আর মুড়ি ভাজা—'
'সেন এই রকম লিখছেন বুঝি আজকাল?'
'সব শালাই লিখছে—ধানাই-পানাই ফেঁদে গলায় গামছা দিয়ে টেনে চেক আদায় করতে পারলে লিখবে কে হে। লেখা' লেখা তো মামদো হয়ে উড়ছে।'
'কিন্তু সেন দেড়শোতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না।'
'এখন হবেন; জানেন তো হাডসন নেই; বাঙালী লিখছে, বাঙালী টাকা দিচ্ছে। একশোও দেব না সেনকে; পঞ্চাশ দেব কিনা ভাবছি; পঁচিশেও রাজি করাতে পারব।' ঘোষ ট্রাউজারের পকেট থেকে পাউচ বের করে বললে। টেবিলের উপর পাইপ ছিল, পাশে পাউচ রেখে দিয়ে বললে, 'আপনি প্রুফ দেখুন গিয়ে—আমিই যাব সেনের কাছে।'

: বিলাস

শুধু সংলাপই নয়, বর্ণনার বা আত্মচিন্তার ভাষাতেও এই স্বচ্ছতা রয়েছে।

"পৌষের রাত প্রায় তিনটে হবে। কলকাতায় এবার শীত পড়েছে খুব। শান্তিশেখর যে-ঘরটায় থাকে, সেখানে দিনের বেলা, খুব কম রোদ পড়ে বলেই রাত খুব প্রখর ভাবে ঠাণ্ডা। কুঁকড়ে-সুকড়ে নিজের অজ্ঞাতসারে অবোধ ভাবে ছেঁড়া লেপ জড়িয়ে শুয়ে আছে সে। বাইরে কোথাও জল ঝরার শব্দ—প্রায় সারারাতই শুনতে পাওয়া যায়; কার বিরাট চৌবাচ্চা ভরছে হয়তো—কিম্বা অন্যমনস্ক ভাবে কল খুলে রেখে গেছে কেউ—হয়তো রসাতলবাহী পাইপের জলধারা রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আধোঘুমের কানে ছলছলিয়ে চলকে ছলছলিয়ে কোথার থেকে কোথায় চ'লে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন। না, তা নয়। তা যদি হ'ত, তাহলে কলকাতার মাটি ও দেওয়ালের ভেতরের পাইপগুলোতে কত যে জলদেবী ধরা পড়ত। আধোঘুমন্ত মানুষের হৃদয় এমন নির্জন রাতে একজন দেবিকাকেই চায় তবুও ; জলের থেকে উঠে আসুক—উঠে আসুক রাস্তার শামদানের বিদ্যুতের থেকে। কিন্তু কেউই এল না। ঘুমিয়ে পড়ল শান্তিশেখর আবার। বাকি রাতটা কতকগুলো হিজিবিজি হাড় হাভাতে স্বপ্ন দেখল সে। দিনের বেলা কোন স্বপ্নের কথাই মনে রইল না তার। তার শরীর তাকে বুঝিয়ে দিল রাতে ভাল ঘুম হয়নি—ক্যাজা শরীরটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবারও উপযুক্ত নয়—অথচ সারাদিন তাকে লাফিয়ে নেচে রণপায়ে ছুটে ঝকমারি করতে হবে।

ঐ

এই ভাষা সম্পর্কে অভিযোগ থাকা উচিত নয় কারো। অথচ এ ভাষাও চিরাচরিত নয়—সাধারণ নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া—যাকে বলে 'ষ্টাইল'—এই ভাষার আছে। অথচ প্রথমোদ্ধৃত প্রবন্ধের ভাষার দুরূহতা এখানে নেই।

মনে হয়, গদ্যের বিষয় যখন জীবন থেকে আসে তখন এক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন তিনি। কিন্তু যখন তা মননে পরিশ্রুত হয়ে দেখা দেয় তখন তিনি এক স্বতন্ত্র শিল্প-ব্যক্তিত্ব। ইংরেজি সাহিত্যের পরিমণ্ডলে সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে তাই তার অভিব্যক্তিই আলাদা। জীবনানন্দের রচনায় সেই শিল্পী-ব্যক্তিত্ব কিভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, 'ঝরাপালক' থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সেই পরিণতির স্তরগুলি দেখানো যায়—কিন্তু আমাদের আলোচনায় বর্তমানে তার অবকাশ নেই।

শব্দ

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের চর্চায় যেমন বহিরঙ্গ পর্যবেক্ষণের পরেই আসে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, ভাষা বিচারেও তেমনি সাধারণ পর্যালোচনার পরে দরকার পুঙ্খানুপুঙ্খ শব্দ-বিশ্লেষণ। আমরা অবশ্য শব্দ-তত্ত্বের স্থূল আলোচনায় নামবো না। বরং সেই সমস্ত বিষয় ও লক্ষণগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করবো যা কবির মনোজগতের ভূসংস্থান নির্ণয়ে পর্যাপ্ত আলোকপাত করবে।

প্রাচীনেরা বলতেন, শব্দই ব্রহ্ম। কারণ, তাঁরা মনে করতেন, শব্দ অপরিবর্তনীয়, অজর ও অক্ষয়। সুতরাং শব্দ পরিবর্তন বা নামভেদ রূপভেদেরই নামান্তর। কৃষ্ণই কানু, গোপাল, গোবিন্দ, দ্বারকানাথ, যশোদানন্দন বা রাধারমণ বটে, কিন্তু নামান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্যানে এঁদের রূপ পাল্টায়। তাই সাধক কখনোই নামান্তর আশ্রয় করবেন না, তাঁর আরাধ্য দেবতার রূপ ভিন্ন নামে ফুটবে না।

আমরা ধর্মের সাধক নই, সাহিত্যের রসের সন্ধানী। তবু অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে শব্দের এই অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্বে আমাদেরও আস্থা আছে। প্রত্যেক শব্দের একটি ধ্বনিমূল্য থাকে, এক স্বতন্ত্র ভাবানুষঙ্গ থাকে। অভিধান থেকে তার অর্থান্তর তুলে দিলে সেই ধ্বনিমূল্য সেই ভাবানুষঙ্গটি আর পাওয়া যায় না। তার স্থান অধিকার করে স্বতন্ত্র এক ধ্বনি, পৃথক এক ভাবানুষঙ্গ। এই কারণেই ভালো কবিতার কখনো ঠিক ঠিক অনুবাদ হতে পারে না। প্রতিটি ভাষার এবং প্রতিটি শব্দের একটি বিশিষ্ট চরিত্র থাকে। এই সব মিলে ভালো কবিতায় যে ভাবাবহ গড়ে ওঠে তাকে ভিন্ন শব্দে ভিন্ন ভাষায় অক্ষুণ্ণ তর্জমা করা যায় না।

যেমন বাংলা ভাষার কথাই ধরা যাক। এর প্রকাশ-শক্তির মধ্যে বলিষ্ঠতা যতখানি তার চেয়ে লালিত্য বেশি। কর্কশ নির্মম কোনো ভাব উপযোগী গাম্ভীর্য ও সঙ্গতি বজায় রেখে এ ভাষায় সুষ্ঠুভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এর স্বভাবটি কোমল, আস্বাদ মিঠে মিঠে। এর মেরুদণ্ডটাই দুর্বল ; তাই দৃঢ়তার অভাব কিছুতেই যেন দূর হতে চায় না। ভাষার এই চরিত্র, তার উত্তরাধিকার—এই সব মিলে ভাষায় এমন এক পৃথক পরিমণ্ডল রচনা করে যেখানে বক্তব্য ঘিরে ব্যঞ্জনার এক জ্যোতির্বলয় গড়ে ওঠে—তার প্রাধান্য অনেক সময়ে ভাবগত অর্থ থেকে বেশি।

এই ভাবেই প্রতিটি বড় কবির হাতে নিজের এক শব্দভাণ্ডার, এক স্বতন্ত্র পরিভাষা গড়ে ওঠে। নিজের বিশিষ্ট-ভাবনার উপযোগী শব্দগুলো ভাষা থেকে বেছে নেন বলে চিরাচরিত কবিভাষা থেকে তাঁরা দূরে সরে আসতে বাধ্য হন। কথায় এবং কাব্যে অপরিজ্ঞাত নূতন শব্দ তাঁরা আবিষ্কার করেন, বিদেশী ভাষা থেকে আহরণ করতেও সঙ্কোচ করেন না ; প্রচলিত গ্রাম্য, শ্রুতিদুষ্ট শব্দকেও নূতন অর্থমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সাথে ভাব পরিমণ্ডলকেও নূতন না করে তাঁদের তৃপ্তি নেই। যাঁর মধ্যে এই স্বকীয়তার চেতনা যত উগ্র তার শব্দভাণ্ডার তত বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বাংলার আবহমানের কবিভাষা তাই মধুসূদনের কাজে আসেনি; নিজের নূতন শব্দ-প্রকরণ তাঁকে সৃষ্টি করে নিতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাজ হয়নি মধুসূদনের পরিভাষা নিয়ে।

শব্দেরও একটা রূপ আছে। মধুসূদনের ভাষার কথা মনে করলে মনে হয় রুক্ষ তীক্ষ্ণ চিক্কণ সুউচ্চ কালোপাথরের স্তূপ যেন! রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল আলোকিত শ্যামল সুরভিত মঞ্জরিত বনবীথি থেকে আদিম উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ-চাঞ্চল্যে বর্বরের মতো বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন আধুনিক কবিরা। নজরুল ইসলামের শিকলছেঁড়া উদ্দামতা আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আনকোরা রুক্ষ মরুময়তার যুগ সেটা। আরবি ফারসি শব্দের

প্রাচুর্যে ভাষাকে জোরদার করা, অমার্জিত গ্রাম্য সংলাপের ভাষা দিয়ে কবিতার মধ্যে নূতন মেজাজ আনার চেষ্টা সেদিনের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনানন্দের প্রথম আমলের লেখাতেও তাই আরবি ফারসি ও দেশজ শব্দের প্রাচুর্য। তবু নজরুলেব মতো বর্বর-বলিষ্ঠতা নেই। 'ঝরাপালক'-এর শব্দ-ভাণ্ডাব এক ম্লান, বিষণ্ণ, শ্লথ, প্রাযান্ধকাব, ক্লিন্ন জীবনের আবহ তুলে ধরে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'ব জগৎ আবার ভিন্ন—যেন এক অলস, উচ্ছল, মদির, আলোছায়াচ্ছন্ন বিকেলের ছবি ; 'বনলতা সেন' যেন শুভ্র, স্নিগ্ধ, আলোকিত, রক্তাক্ত ভোর ; 'সাতটি তারার তিমিব' যেন যুদ্ধ-মৃত্যু-সমাকীর্ণ নাগরিক রাত্রির মত্ততা। আবার পরিণতিব শেষ স্তরে কবিতার ভাষা যেন প্রৌঢ় বলিষ্ঠ উদ্ভাসিত রৌদ্রময় দিন।

'ঝরাপালক'-এ ব্যবহৃত ফারসি ও আরবি শব্দেব প্রায় সবই বাংলা ভাষায় ঐতিহ্য সূত্রে এসেছিল। কারণ ফারসি ভাষা একদিন এদেশের দরবারী ভাষা ছিল। ফারসির চর্চা উঠে যাওয়ার পর থেকে এই বলিষ্ঠ ভাষার অপর্যাপ্ত শব্দ-সম্ভার আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ এর শব্দের ধ্বনির যে জোর রয়েছে তাকে ব্যবহার করতে পারলে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও ঋজু করে তোলা যায় কবিতার বক্তব্যকে। এ তথ্য নজরুল ইসলামের জানা ছিল। তাই তাঁর সিদ্ধিও অনেক বেশি উল্লেখনীয। কিন্তু জীবনানন্দ ততখানি সার্থকতার সঙ্গে এ ভাষার শব্দকে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর হাতে আরবি ফারসি শব্দ একটা নূতন আবহ গড়ে তুলতে, একটা ভিনদেশী পরিবেশ বচনায় ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে যেমন হতো। এর পিছনে অন্তরের তাগিদ ছিল না বলে 'ঝরাপালক'-এব পরে যখন তিনি স্বভাবের উপযোগী কবিভাষা খুঁজে পেয়েছেন, তখন আর এসব শব্দ দেখা যায়নি বড় একটা। আমরা কয়েকটি মাত্র শব্দকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ কবেছি। আরবি শব্দ ফারসি ভাষার মাধ্যমে এসেছে বলে সেগুলিকে পৃথক করা হলো না।

আখের, আশান, আশেক, ইদ, ইদগাত, ইবলিশ, ইয়োসোফ, কলেজা, কাফের, খুন খারাবি, খবরদারি, খুশরোজি, খেয়ালখুশ, খেলাপ, খোশ, গজল, গুলজাবিয়া, জবান, জাজিম, জিঞ্জির, জিন, জৌলস, তখত, তসবি, তালাস, দরাজ, দরিয়া, দস্তুর, দিওয়ানা, দিলদার, দিলাওয়ার, দুষমন, নহবত, নিরিখ, পশমিনা, পেয়ালা, ফকির, ফরাশ, বান্দা, বেদুইন, বেহুঁশ, মশগুল, মশলাদার, মসুদ, মস্তানা, মিনার, মুয়াজ্জেন, মুসল্লা, মুসাফের, মেজাজ, রবার, রোজা, রোশনাই, শাহদারা, সরাই, সরাবখানা, সাকি, সোয়ার।

কিন্তু 'ঝরাপালক'-এ তাঁর হাতে তদ্ভব ও দেশজ কথ্য শব্দের ব্যবহার আরো চমকপ্রদ। আগুনদানা, উপাসী, ফোঁপরা, জ্যান্ত, দানোয় পাওয়া, রাতবিরেত, ফাগুয়া, মিঠা, পোষলা, পিলাই, সোয়াদ, সাঙ্গাত, হাপর ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার শুধু সেই আমলের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক নয়, আজও এগুলিকে কবিতাতে অস্বস্তিকর বা গ্রাম্য মনে হবে। অথচ প্রয়োগের নিপুণতায় এতে এমন চরিত্র ফুটে উঠেছে যাকে অমার্জিত কিছুতেই বলা যায় না।

ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও জীবনানন্দ এই গ্রন্থে নূতন পথে নেমেছেন। এসেছিল, নেমেছিল,

গেছিল, বসল, কাঁদছে, ফোঁপাস, দিলেম. রেখেছে, ডাকলে, কেটেছে, দেখিনি, পেয়েছি, খুঁজে, যাচ্ছে, ঘুরছিল প্রভৃতি কথ্য সংক্ষিপ্ত বা অভিশ্রুতিজাত ক্রিয়াপদ জীবনানন্দের হাতে বেশ অস্বাভাবিক মনে হবে; কেননা পরবর্তীকালের কবিতায় আমরা শুধু দীর্ঘ ক্রিয়াপদ দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। তেমন ক্রিয়াপদও—যেমন, ভুলিবে, চিনিবে, যেতেছে, খুলিয়া, ডাকিয়া ইত্যাদি অল্প অল্প পাওয়া যাবে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ঝরাপালক'-এর কিছু কিছু ক্রিয়াপদ ও বাগ্‌বিধির ব্যবহারে বরিশালের বিশিষ্ট বাগ্‌ধারার নিদর্শন আছে।

১। নাচতে আছিস আকাশ খানার গোখরো ফণার নীচে,
২। চলতে আছিস,—দ'লতে আছিস,—জ্বলতে আছিস ধূ-ধূ

ফাল্‌তু এই অর্থে 'জলিফলি' আঞ্চলিক শব্দটির ব্যবহার করেছেন কবি।

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, পরবর্তীকালের লেখাতে কোথাও কোথাও বরিশালের বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি এবং বাক্যরীতির ছাপ দেখা যায়। যেমন, 'অইখানে' তাঁর কবিতায় বহুল ব্যবহৃত। 'ঘুমে' বা 'চুপে' শব্দকে নামধাতু হিসাবে প্রয়োগ করতে আর কাউকে দেখা যায় না। 'এমনি বাহিরে ঘুরিতে আছে,' 'ঘোড়া চড়ে কোই যাও হে রায় রায়ান,' 'কত বীজ কলায়ে গিয়েছে' ইত্যাদি স্মরণযোগ্য।

'ঝরাপালক'-এ ক্বচিৎ অরুন্তুদ, উদধি, উরস যোনিচক্রস্মৃতি ইত্যাদি অনতিপ্রচলিত তৎসম শব্দের ব্যবহার হলেও পরবর্তীকালে এদিকে তাঁর উৎসাহ ও অন্বেষণ অনেক বেড়েছে। চার, পাঁচ, ছয়, কি তার চেয়ে বেশি অক্ষরের সংস্কৃত শব্দ বা সমাস-নিষ্পন্ন পদ সাধারণত কবিরা যা নাড়াচাড়া করতে বিব্রত বোধ করেন বলেই পাশ কাটিয়ে যান সেই সমস্ত শব্দ সম্পর্কেই জীবনানন্দের বিশেষ প্রবণতা ছিল। বাস্তবিক, এই সব শব্দের অর্থের দুরূহতা এবং গদ্য স্বভাব দেখে কবিতার পক্ষে অনুপযোগী মনে হলেও জীবনানন্দ ব্যবহার করে প্রমাণ করলেন কবিতার কোনো স্বতন্ত্র পরিভাষার দরকার নেই, যে কোনো শব্দ ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে কবির হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। কবিতার রসানুভবের জন্য পাঠকের পক্ষে সব শব্দের অর্থ জানারও প্রয়োজন হয় না। নমুনা হিসাবে কয়েকটি শব্দ রাখছি।

অকুতোভয়তা, অক্ষিগোলক, অগ্নিপরিধি, অননুতপ্ততা, অনন্যোপায়, অনুকল্প, অনুপ্রাণনা, অনুসূর্য, অবাচী, অভিভাবিকা, অতিবৈতনিক, আনুপূর্ব, আস্ফোটে, ঈঙ্গিত, উৎসরণ, উদীচী, উপস্থাপয়িতা, ঊর্ণা কঙ্কাল, কিন্নরকণ্ঠ, ক্রমমুক্তি, চর্মচক্ষুস্থির, তিতীর্ষু, দণ্ডীদের, দিৎসা, নভোচারী, নিরুৎকীর্ণ, নির্দেশবশত, নিশিত, নিস্তেল, প্রতিপন্ন, প্রধূমায়মান, প্রসববেদনা, প্রামাণিক, বিমান, বিস্তীর্ণতায়, ভবিতব্যতা, ভূয়োদর্শী, ভ্রান্তিবিলাস, ভ্রূণ, মুখপাত্রী, মৈথুনকাল, ম্লানায়মান, রিরংসা, রোল, শ্রুতিবিশোধন, সঙ্ঘারাম, সংপ্রসারণে, সময়গ্রন্থি, সময় সুখ্যাত, সূর্যোকরোজ্জ্বল, সূর্য-তাড়সে, স্বর্গতি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে তাঁর কবিতার ক্ষেত্র গদ্যের চরণভূমিতে স্বাধীনতা পেয়েছে তবু তা গদ্য নয় কিছুতেই—এই অলক্ষ্য জাদু পর্দার ব্যবধান পাঠককে সর্বদা অনুভব করতে হয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও তার পরের কাব্যগ্রন্থগুলিতে দেশজ শব্দের ব্যবহার কম নয়। শব্দগুলির বিশেষত্ব তার প্রয়োগের অপূর্বতায়।

সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা, শাদা,—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,—
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!
কাঁচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!

: পরস্পর

সেই যুগে 'শাদা' অথবা 'শরীর' শব্দের ব্যবহারে যে বিস্ময়কর অভিনবত্ব ছিল তা নিয়ে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল'-এ মনোরম আলোচনা করেছেন। আমরা বরফের কুচি, কাঁচের গুঁড়ি, শেমিজ এই শব্দগুলির ব্যবহার দেখতে বলবো। এমনি আইবুড়, আঁচলের খুঁট, আঁচ, আঢুল, আঁশটে, উজাগর, উপছায়ে, উম, কুটুম্বিনী, কুলুপ এঁটে, কুঁজ, কুঁড়েমি, ক্বাথ, খুঁজি, গলগণ্ড, গিরেবাজ, ঘেসেড়া, চুলের ঝুঁটি, ছানি, ছিঁড়ে ফেড়ে, ট্যাক, ঠ্যাঙের তুরকে, ডিম, তালাসে, তেপান্তরে, গল্প, থুতনি, থ্যাঁতা, দিনমান, দেশোয়ালি, নিকেশ, নুলো, পরানকথা, পাখিপাখালি, বেনোজল, বিয়োবার, মানুষী, মাংস, রগড়, লাবণি, শরীরে ননীর ছিরি, শাঁখচুন্নী, হাঁটুভর, হাড়হাভাতে—এই সব শব্দ আমাদের চেতনায় সদ্য পরিচয়ের এমন বিস্ময় চমক দেয় যে কখনো অস্বস্তি আসে, কখনো বিমুগ্ধ হতে হয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত জায়গায় অপপ্রযুক্ত মনে হয় না কখনো। জীবনানন্দের পাঠক সমাজের, তা সে আজকের হোক, বা এক বা দুই দশক আগে যখন কবিতাগুলো লেখা হচ্ছিল তখনকারই হোক—এই অনুভূতি এত পরিচিত যে এর উল্লেখই বাহুল্য বোধ হয়।

শব্দের সন্ধান শুধু নয়, শব্দের প্রয়োগেও জীবনানন্দের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের অপ্রত্যাশিত অন্বয়ে যে বিস্ময়রসের সৃষ্টি হয়, শব্দের মৃত শরীরে যেভাবে প্রাণ জেগে ওঠে তা বুঝে সুচতুর ব্যবহারে কবিরা কবিতায় রসের উন্মেষ ঘটাতে পারেন। জীবনানন্দ ঠিক এই ভাবেই যখন লেখেন এক মাইল শান্তি কল্যাণ, গ্রাম পতনের শব্দ, ব্রহ্মাণ্ডের কারুশিল্প লোক, শত শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারী, ছিপছিপে ধূর্ত মোমের আলো তখন শব্দযোজনার জাদুশক্তির পরিচয় পাই। আবার কোনো কোনো শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে বাংলার প্রাচীন চিরায়ত অথচ হালে পরিত্যক্ত প্রিয় বাক্‌রীতি তুলে ধরেছেন। যেমন,

১। মুখের রূপ ঠায় ভালবেসে

২। পাঁচ সাত ধনু দূরে
৩। খিঁচড়ে ওঠে খচ্চরের মতন
৪। ডোডোমির অতল ক্রেঙ্কার

শেষ শব্দটি জীবনানন্দ কেমন অবলীলায় সৃষ্টি করে নিতে পারলেন! ডোডো নামের পরিলুপ্ত পাখিটির সঙ্গে বাংলার তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংযোগে প্রত্যাশিত তাৎপর্যও এসেছে সুন্দর।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা ভাষারীতির আরেক সম্পদ। ভারতচন্দ্র থেকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অবধি বা তার আগে পরেও বহু কবি এর প্রয়োগের পারদর্শিতায় বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন। সাম্প্রতিক কালের কবিরা উন্নাসিক দৃষ্টিতে সে সব কবিতাকে তাচ্ছিল্য করতে পারেন কিন্তু প্রবুদ্ধ যিনি, তিনি জানেন সে সম্পদ অবহেলার যোগ্য নয়। জীবনানন্দও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এই দিকে অতিরেক নয়, সংযমই যে কবির পক্ষে কাম্য রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি তা জানতেন ও মেনে চলতেন। এদিকে তাঁর সাফল্যের দু-একটি নিদর্শন—

১। বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার
২। পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড় কড়!
৩। ফিক করে হেসে
৪। টসটসে ভিজে জামরুল

আরো কিছু শব্দ যেমন—ঝিকমিক, চ্ছল চ্ছল শব্দ, ঝিলিক, রলরোল, খলখল অন্ধকার, টুপটাপ, ঝরে ঝরঝর। অথবা এই শব্দগুলি—হেঁচকা, লিকলিকে, হিঁচড়ায়, ছিমছাম। অথবা এমন বর্ণজ্ঞাপক শব্দ—ফুটফুটে, ধবধবে। অথবা শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ, যেমন, উড়ুউড়ু, খড়িখড়ি, খিঁচেখিঁচে, চুনচুন এইসব শব্দে জীবনানন্দের সিদ্ধি বিস্ময়কর মনে হবে। একটি কবিতায় শব্দের অর্থহীন উল্লাস ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

পৃথিবীর কাছে আমাদের
সব কথা—সব কথা বলা
ডাভেণ্ট্রি ডোমেই টাসে ষ্টেফানিতে
যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
বেঁধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
শব্দের অপরিমেয় অচল বালির—
মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে;

· অনির্বাণ

শতকের অপরিমেয় অচল বালির যে মরুভূমি মানুষ সৃষ্টি করেছে তা পরিস্ফুট

করতে এই সহজ সুবোধ্য কবিতার মধ্যে ধ্বনির এই বিচিত্র বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

উত্তরকালের লেখায় আর 'ঝরাপালক'-এর যুগের মতো—আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের চেষ্টাকৃত অতিরেক নেই। তবু এই বাংলা ভাষার সূচনা থেকে ভাষায় আগন্তুক শব্দের সম্পদ হারাতেও ইচ্ছুক নন। তার প্রমাণ জমিন, জাঁহাবাজ, জুলপি, বেলেয়ারি, লঙ্গরখানা, শাদা, হুণ্ডি ইত্যাদি ফারসি শব্দ এবং কবর, কুলুপ, খারিজ, তাবিজ, দলিল, মসজিদ, মসলাদরাজ, রেওয়াজ ইত্যাদি আরবি শব্দ তাঁর পরের কবিতায় দেখা যাচ্ছে।

জাফরি শব্দটি উর্দু। বাংলায় বহুল ব্যবহৃত।

জীবনানন্দের লেখায় বিদেশী শব্দের মধ্যে ইংরেজির ব্যবহারই, সবচেয়ে দুঃসাহসিক ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তবু তা আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী কথাবার্তার ইংরেজির অহেতুক প্রয়োগের মতো নয়—একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সেখানে যে শব্দ ব্যবহার করে যে ফল আদায় করা হয়েছে অন্য কোনো প্রতিশব্দে সে আবহ গড়ে তোলা অসম্ভব হতো। কামিজের মতো দুটি একটি পর্তুগিজ অথবা ইংরেজি ফারসি বা রুশ শব্দ যে তাঁর লেখায় নেই তা নয়। সাধারণত এই শব্দগুলিকে ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে পেয়েছি বলে এদের নিয়ে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমরা পরিশিষ্টে ভিনদেশী শব্দের একটি পরিপূর্ণ তালিকা দেবার চেষ্টা করেছি।

বিশেষণ

জীবনানন্দের কবিশক্তির অনেকখানি দাঁড়িয়ে আছে বিশেষণের কুশলী নির্বাচন ও চমকপ্রদ প্রয়োগের উপর। অভিনিবেশপ্রবণ কাব্যরসিকমাত্রই মানবেন কবির কবিত্ব সুষ্ঠু ও সুপ্রযুক্ত বিশেষণের মধ্যেও থাকে। হৃদয়াবেগে স্পন্দিত হয়ে উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তিমূলক বিশেষণে আমরা কোন বিষয়ের স্তুতিনিন্দায় মুখর হতে পারি কিন্তু প্রবুদ্ধ পাঠকের কাছে সে উচ্ছ্বাস অর্থহীন, এমন কি বাহুল্য বোধে নিন্দিত হতে পারে। অতি সামান্য বস্তুকেও কবি সুপ্রযুক্ত বিশেষণে এভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম যে অতিরঞ্জনও আমাদের কাছে অত্যাবশ্যক মনে হবে। আশ্চর্য, সুন্দর, অপূর্ব, অপরূপ, অনবদ্য অথবা কুৎসিত, কদর্য, বীভৎস ইত্যাদি গুরুতর বিশেষণ অযথা প্রয়োগ করে আমরা এদের অর্থ খেলো করে তুলি। বড় কবি নূতন নূতন বিশেষণে বর্ণনাকে আকর্ষণীয় ও রম্য করে তোলেন, তেমনি যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়ে চিরাচরিত বিশেষণও হারানো অর্থমূল্য ও অবলুপ্ত মর্যাদা ফিরে পায়।

তবু কোনো ভাষার কাব্যধারায় প্রাণবেগে স্তিমিত হলে বিশেষণ-সন্ধানের এই নবায়মানতা হ্রাস পায়। নূতন বিশেষণের সন্ধান ও সৃষ্টি পুরানো বিশেষণের মধ্যে নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার তখন আর দেখা যায় না। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের কবিতায় যে জীবন্ত সরল, মর্মছোঁয়া ঋজু বিশেষণ দেখা গিয়েছিল, বিদ্যাপতির মৈথিল পদে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য থেকে বিশেষণ সন্ধানের যে চমৎকৃতি দেখা গিয়েছিল

অথবা গোবিন্দদাস কবিরাজের বিশেষণের নিখুঁত কারুকৃতিতে যে শ্রী ফুটেছিল তারই নিশ্চেতন অনুবর্তনে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতা অর্থমূল্য হারিয়েছিল।

বস্তুত, বিশেষণ বহ্নিমান অঙ্গারের মতো। কোনো কবি শব্দের তিমির-গহ্বর থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রতিভার প্রোজ্জ্বল শিখায় জ্বালিয়ে তোলেন, সেই বহ্নিদ্যুতিতে কবিতা ভাস্কর হয়। আমরা পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হই। কিন্তু প্রতিভাহীন পদ্যকারের হাতে পুনঃপুন ব্যবহারে তার না থাকে দাহ, না থাকে দ্যুতি। তাই সেই ভস্মশেষ অঙ্গারপুঞ্জ কাব্যকে উজ্জ্বল করতে পারে না, মসীলিপ্তই করে কেবল। আবার যখন কবি আসেন সেই ভস্মস্তূপ থেকে খুঁজে আনে দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গারখণ্ড, প্রতিভার স্পর্শে আবার আগুন জ্বলে, নির্ধূম ভাস্বর আগুন।

আধুনিক যুগেও কবিদের সজাগ সন্ধানের শেষ নেই। তাঁদের অতন্দ্র তপস্যা ও নব নব পথনির্মাণের ফলে বিশেষণ সম্পর্কে বৈয়াকরণদের সংকীর্ণ ধারণা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। বিশ্বাস করতে শিখেছি স্বকীয় রূপদৃষ্টি নিয়ে এলে নূতন বিশেষণ রচনা কোনো কবির পক্ষেই দুঃসাধ্য নয়।

কারণ বিশেষণ এ যুগে শুধু গুণ বা অবস্থাকেই ব্যক্ত করে না; এইসব রূপোন্মেষশীল মননজীবী বিশেষণ কল্পনাকে দিগন্তবিসারী করে দিয়ে কখনো সমাসোক্তি কখনো আরোপোক্তি কখনো বা চিত্রকল্পে গিয়ে পরিসমাপ্ত হচ্ছে। বিশেষণ প্রয়োগে শিল্পীর সূক্ষ্মতা জীবনানন্দের রচনার সূচনা থেকেই দেখা যায়। বোঝা যায় তাঁর সচেতন শিল্পবুদ্ধি এর পরিণতি সম্পর্কে সজাগ।

আমরা একটি আশ্চর্য পংক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রয়েছে—

> এইসব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু ;—আবার করিছে আরোহণ
> আঁধার বিশাল ডানা পাম্ গাছে,—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;
>
> : শকুন

'শৃঙ্গ' নয় 'শিঙ' দেওয়াতেই পাহাড়গুলো বুনো মহিষের মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি 'ডানা' শব্দের যোগে পাম্ গাছকে মনে হয়েছে বিরাট পাখির মতো। জড়ের মধ্যে এমন চেতন প্রাণীর ধর্ম কল্পনা সমাসোক্তির মূল লক্ষণ। বিশেষণ না হলেও এমন কয়েকটি ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ সমাসোক্তির ভাবব্যঞ্জন এনেছে। যেমন : 'আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি', 'কাঁকরের রক্ত', 'রক্তাতিপাতের দেশে', 'নদীটির শ্বাসে', 'স্নায়ুর আঁধার', 'লোকোত্তর সূর্যের আমোদে'। আবার এমনি 'অসুস্থ পাতা', 'ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা', 'সবজীর সবুজ রুধির' ইত্যাদি বিশেষণের ইন্দ্রিয়চেতন কবির রূপদৃষ্টি, রোম্যান্টিক ভাবকল্পনা ও সজাগ স্বকীয়তার নিদর্শন মিলবে।

'মহাপৃথিবী'তে উপচয়িত বিশেষণ (transferred epithet) বা আরোপোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে। 'কৌতুকী আকাশ' অথবা 'খল খল অন্ধকার' উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই জাতের অলঙ্কারও কখনো কখনো অচেতন বস্তুতে চেতন প্রাণীর ধর্ম

আরোপিত হয় বটে, কিন্তু সমাসোক্তি ও আরোসক্তি এক বস্তু নয়। সমাসোক্তিতে আলোচ্য বিষয়ে বর্ণনার চাতুর্যে অন্য বস্তু বা প্রাণীর ধর্ম আরোপ করা হয় মাত্র, কিন্তু এই আরোপিত অলঙ্কারটি বক্তব্যের পক্ষে অনাবশ্যক। কিন্তু আরোপোক্তিতে বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই গুরুত্ব সমান। সেখানে একটি প্রয়োজনীয় বিশেষণ এক স্থান থেকে অন্য একটি বিশেষ্যের পাশে উপচয়িত বা স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র। 'আঁধার বিশাল ডানা পাম্ গাছে' সমাসোক্তিতে পামগাছটিই বর্ণনীয়। 'বিশাল ডানা' বিশেষণটি গাছের মধ্যে পাখির রূপ আরোপ করে পাঠককে চমক দিচ্ছে মাত্র। এটি না থাকলেও কবিতার বক্তব্যের দিক থেকে কিছুই অসুবিধা হয় না। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে ব্যবহৃত 'প্রতারিত রাজপথ' অথবা 'সাহসিক নগরে বন্দরে' বাক্যদুটিতে 'প্রতারিত' এবং 'সাহসিক' বিশেষণ অন্য অনুল্লেখিত বিশেষ্যের পাশ থেকে ছিটকে এসে যথাক্রমে 'রাজপথ' ও 'নগরে বন্দরে'র পাশে বসে গেছে। সুতরাং তা কবির বক্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত এবং অপরিহার্য। এমনি 'বনলতা সেন' গ্রন্থে রয়েছে 'অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন', 'রক্তক্লান্ত কাজ', 'ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা'।

উপস্থাপন কৌশল ও চিন্তারীতির ঈষৎ পরিবর্তনে সাধারণ মননধর্মী বিশেষণ সৃষ্টি, সেখান থেকে উপচয়িত বিশেষণ এবং সমাসোক্তিতে গতায়াতেই শুধু নয়, যার সূচনায় 'মেধাবী নীলিমা', 'নিমীল ফসলরাশি', 'লিপ্ত অভিধান', 'অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগ', 'উশখুশু খোপা'—তাই-ই পরিণামে 'স্ফীত মাতাল বেলুন', 'মৌসুমী সমুদ্রের পেট', 'প্রেমিক চিল-পুরুষের শিশির ভেজা চোখ', 'আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানা', 'দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্র', 'অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাস', 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা', 'আকাশের রূপালি শস্য', 'নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার', 'খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা', 'সবচেয়ে গোধূলিমদির মেয়েটি', 'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু', 'ভোরের আলোর মুর্খ উচ্ছ্বাস', 'নির্জনবিমিশ্র চাঁদ', 'হিম কমলালেবুর করুণ মাংস, 'সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্র'।

আলোচ্য প্রসঙ্গে ডঃ শিশিরকুমার দাশ বিষয়টিকে অনির্চনীয় গভীরতায় নিয়ে গিয়েছেন। তিনি জীবনানন্দ স্মৃতিগ্রন্থে এক নিবন্ধে লিখেছেন,

"এই রকম আরো অজস্র উদাহরণ জীবনানন্দের কবিতার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, যেখানে প্রচলিত ইন্দ্রিয়বোধের নির্দিষ্ট সীমা শুধু বিধ্বস্ত তাই নয়, বস্তুর পরিচিত সত্তা বা ধর্মের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি ছাড়া আরো কোন স্বতন্ত্র ধর্ম আছে তার আবিষ্কার। এই ব্যাপারটিকে আমি 'ইন্দ্রিয়বোধের সচেতন বিপর্যয়' নাম দিতে চাই। সাধারণ উপমা, রূপক, সমাসোক্তির কাঠামোয় এই ব্যাপারটি বোঝা যায় না। 'ধবল শব্দ বাতাস তাড়িত পাখিদের'—এই শব্দগুচ্ছে 'ধবল শব্দ' আমাদের মন আন্দোলিত করে, শব্দ সহসা বর্ণময়ী হয়ে ওঠে। একথা বলা যথেষ্ট নয় 'ধবল' প্রকৃতপক্ষে পাখিদের বিশেষণ মাত্র ; পাখিদের শুভ্রতা বর্ণনাতেই তার ব্যবহার : অথবা যদি কেউ বলেন, ইংরেজী অলংকারের অনুসরণে 'ধবল' শব্দের এই ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে একটি transfered epithet কিন্তু 'ধবল শব্দ' ব্যবহার আসল ধাক্কা আমাদের বোধে। শব্দকে আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে

জানি, তাকে চোখে দেখি না, স্পর্শ করি না, রসনায় স্বাদ পাই না, শব্দকে উপলব্ধি করার নির্দিষ্ট পথ আছে। 'ধবল শব্দ' সেই নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটির বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, কারণ শব্দ এখন নয়ন পথেও উপলব্ধি করতে পারি। 'রৌদ্রের গন্ধে' রৌদ্র ঘ্রাণের যোগ্য হয়ে উঠল, 'আলোকের বিশুষ্কতা'য় আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার ঘটল বিপর্যয়, আলোক হয়ে উঠল স্পর্শবোধের অন্তর্গত এক বস্তু। ...সমগ্র বিশ্বের আপাত শ্রেণীবিভাগ তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো ভাব যে কোনো বস্তুতে, যে কোনো বস্তু, যে কোনো ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কবিতার জগৎ হয়ে উঠেছে এক বিস্তীর্ণ মায়াবী জগৎ।"

কবিতার ভাষা : জীবনানন্দ

আসলে ইন্দ্রিয়বোধের এই যে রূপান্তরের কথা ডঃ দাশ এখানে বলেছেন একথা কিন্তু আমরা ঢের আগে 'প্রতীক' এই শিরোনামে বিশদ আলোচনা করেছিলাম। তবু রসিক পাঠকের কাছে একই বিষয়ের শব্দগত, ব্যাকরণগত অলঙ্কারগত, চিত্ররূপগত বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছি। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, 'বনলতা সেন' গ্রন্থের বিশেষণে চিত্রকল্পগুণ যেমন বেড়েছে তেমনি একটি দুটি শব্দের মধ্যে আর তা আবদ্ধ থাকছে না। রূপটিকে সম্পূর্ণ করে আঁকতে একের পর শব্দ যোজনা করে বিশেষণকে বিশাল করে তোলা হচ্ছে। কবি-কল্পনার এমন অপরূপ স্ফূর্তি, বিশেষণের এমন অফুরন্ত প্রয়োগ আর কোনো পর্বে দেখা যায় না। স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পৈশ্বর্যের দিক থেকে কবি-কল্পনা এখানে শিখর স্পর্শ করেছে। বিশেষণের এমন দীর্ঘ, নিপুণ রূপময় এবং কল্পনা-সমৃদ্ধ প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রতিভার উদয়বিলয়ের যেন একটা অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। এমনই হয়ে থাকে,—এমনই হওয়া উচিত। কবির শিল্পীমন যতই বিকশিত হয় ততই বিশেষণ প্রয়োগ নিপুণতর—আবার প্রতিভার ক্রমাবলুপ্তির পাশাপাশি বিশেষণ প্রয়োগও শিথিল হতে বাধ্য।

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে বিশেষণ অনেকখানি সংক্ষিপ্ত সংহত, কিন্তু ভাব-বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্ত পরিণত কল্পনায় বিস্ময়কর। 'নরকের নির্বাচন মেঘ', 'ফিচেল পাতাল', 'দিনের বিশ্রুত আলো', 'মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ', 'জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা', 'স্থির শুভ্র নৈসর্গিক কথা', 'নির্ধূম আনন্দ', 'একরাশ প্রাদেশিক ঘাস', 'বড় বিভোর পরিধি', 'হতমান সোনা', 'অন্ধকার ডাইনী মাইল', 'লোল হাস্য', 'লবেজান হাওয়া', 'তনুবাত শিখরের প্রশান্তি'। এইসব বিশেষণের মধ্যে যে জগৎ বিধৃত তা 'বনলতা সেন' গ্রন্থের প্রাকৃতিক রূপজগৎ নয়, তা বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক জীবন ও হিংসাদ্বেষ-কোলাহল আবর্ত-সংক্ষুব্ধ পাতাল-পৃথিবীর, যে জগতের প্রতিচ্ছবি ইউরোপের আধুনিক যন্ত্র-স্পন্দিত উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম এবং একমাত্র আবির্ভাব জীবনানন্দের মানস-কল্পনায়।

'বেলা অবেলা কালবেলা'য় আগের নানা আমলের বৈচিত্র্যের দেখা মেলে, তবু তা ক্লান্তি-রক্তে মাখা যেন। বিশেষণের বিশাল প্রাচুর্যও যেমন আছে তেমনি রয়েছে বিচক্ষণ সংহত সুষমা। কিন্তু সব কিছু এখানে 'জন্ম জন্মান্তর মৃত স্মরণের সাঁকো' বেয়ে আসে, সেখানে 'অন্ধঅন্ধকার তুষার পিচ্ছিল এক শোন নদী', 'সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের

রক্তে' ভরে যায়, সেখানে ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের রেড়ির আলোর মতো আশাবাদ' আর 'অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে সঞ্চারিত উৎসব', সেখানে 'সৃষ্টিবিসারী গান', 'বালিপ্রলেপী মরুভূমি', 'বেতসতন্বী সূর্যশিখা', 'মিশরী শঙ্খরেখা সর্পিল গাগরী', 'অভিচারী বাতাস', 'জাতকূলশীল সময়', 'তিমিরবিদারী রীতি' আর 'ধ্বংসমত্ত অন্ধকার'।

শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে গৃহীত পরবর্তী আমলের কবিতায় বিশেষণের সেই অজস্রতা ও কল্পনার সরসতা আর নেই। তবুও কোথাও কোথাও তার চমকপ্রদ বিকাশ দেখা যায়। 'অপব্যয়ী কল্পনার ইন্দ্রত্বের আসন', 'অবিনাশ দ্বৈপ পরিবার', 'অনবতুল আমি' ইত্যাদি। তবু এই বৈচিত্র্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও অনুভব করা যায় 'সাতটি তারার তিমির'-এর সেই সংকীর্ণ গহ্বর চেতনালোক ক্রমশ এসে যেন মিশেছে দিগন্তব্যাপী মানবহৃদয়ের সমুদ্র সৈকতে।

ছন্দোভাবনা

ছন্দোবৈচিত্র্য

ছন্দের যে নব নব বৈচিত্র্য ও পথসন্ধানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে জাদুকর বলা হতো জীবনানন্দকে কখনোই তেমন কোনো নামে অভিহিত করা যাবে না। অনুভূতিশীল কবিপ্রাণ যেমন অন্তরস্থিত আবেগ ও আকূতিকে প্রকাশ করতেই ব্যগ্র থাকে, কাব্যের বহিরঙ্গ রূপকলা ও প্রসাধন বহিরঙ্গ বলেই যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি মূল্য পায় না। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। নইলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে দেখা যাবে ছন্দের যে কটি রীতি মিশ্রকলাবৃত্ত, কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত ও গদ্যছন্দ তার কোনোটাতেই জীবনানন্দের অধিকার কম ছিল না।

আমাদের আলোচনার অবকাশ সংক্ষিপ্ত। স্থূল কতকগুলি তথ্যের সমাহার করেও এখানে কিছু লাভ নেই। আমরা যা বলতে চাইছি তা হলো, কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গেছে ছন্দের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর কবিসত্তা উদ্দেশ্য থেকে উপায়কে বড় করে দেখতে শেখেনি। অন্তরের অভিব্যক্তির তাগিদে যেমন স্বতই কবিতার ভাষা এসেছে, তেমনি ছন্দও স্বাভাবিক ভাবে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে এবং কবির ভাবানুভূতির বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন অনুযায়ী তারই উপযোগী রীতি—কখনো মিশ্র কলাবৃত্ত, কখনো কলাবৃত্ত, কখনো দলবৃত্ত, কখনো বা গদ্যছন্দ—কবিতার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে।

কবিপ্রতিভার উন্মেষ স্তরে, ঝরাপালকে, ছন্দের যে অশেষ বৈচিত্র্য ছিল একথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম। একমাত্র গদ্যছন্দ ছাড়া উল্লিখিত তিনটি রীতিই নানা প্রকরণে সেখানে দেখা যাচ্ছে। নানা কবির রচনাধারায় প্রভাবিত বলে, নিজের কোনো বিশিষ্ট মনোভাবনা গড়ে ওঠেনি বলে, ছন্দের মধ্যে কবির ব্যক্তিত্বকে অবশ্য চেনা যায় না। তার প্রমাণ মাঝে মাঝে ছন্দ-পতনে কোথাও বা আকস্মিক ছন্দ পরিবর্তনে দেখা যাবে। পরবর্তীকালে ছন্দ সম্পর্কে জীবনানন্দ এত স্পর্শাতুর যে অভিযোগটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে মনে করেই আমরা একটি দৃষ্টান্ত তুলছি এখানে।

বাংলার মাঠে ঘাটে ফিরেছিনু বেণুহাতে একা,
গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিল দেখা!
'ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনই রূপালি রাতে
কদম তলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে!

* * * *

তাহারই নধর অধর নিঙাড়ি উথলিল বুকে মধু,
জোনাকির সাথে ভেসে শেষরাতে দাঁড়াতাম দোরে বঁধু!

মনে পড়ে কি তা! চাঁদ জানে যাহা জানে যা কৃষ্ণা তিথির শশী!
বুকের আগুনে খুন চড়ে—মুখ চুন হয়ে যায় একেলা বসি!

: অস্তচাঁদে

একটি স্তবকেব মধ্যে এমন দুবার ছন্দ পরিবর্তন ছন্দ সম্পর্কে তাঁর অনবহিতির সাক্ষ্যই বহন করছে। 'অস্তচাঁদে' কবিতাটি মূলত ছিল মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের। কিন্তু 'বাংলার মাঠে ঘাটে' এবং 'গঙ্গার তীরে কবে' পর্ব দুটিতে প্রত্যাশিত আটমাত্রা এসেছে কলাবৃত্ত রীতির মতো বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে। এখানে প্রথম চরণ দুটির পর্ববিন্যাস ৮ + ৮ + ২ তার পরেই ছন্দটি আকস্মিক মোচড় খেয়ে ৬ + ৬ + ৬ + ২ পর্বে পরিবর্তিত হলো। বলা বাহুল্য, এবার রীতি নিঃসন্দিগ্ধভাবে কলাবৃত্ত। কিন্তু এই রীতিও শেষ দুটি স্তবকে বজায় থাকলো না। নূতন পর্ববিন্যাস হলো ৬+৬+৬+৫। সমস্ত কবিতাটিতে এমন শিথিলতা আরো আছে।

তবু ঝরাপালকের বিক্ষিপ্ত ছন্দপ্রয়াসের মধ্যেও স্তবক রচনার বিচিত্র শিল্পিতা ছিল। ৬ + ৬+৮ মাত্রার কলাবৃত্ত পংক্তির মধ্যে দু-একটি অপূর্ণপদী আট মাত্রার পংক্তি দিয়ে চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি যেমন লিখে গেছেন, সেই রীতিতে কবিতা লিখলেও পঞ্চপদী, ষটপদী বা অষ্টপদী নানা বিচিত্র স্তবক রচনার ফলে কবিতাগুলি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণ 'বিবেকানন্দ', 'আমি কবি সেই কবি', 'নব নবীনের লাগি', 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে', 'নিখিল আমার ভাই', 'হিন্দু মুসলমান' প্রভৃতি। এরকম মিশ্রকলাবৃত্ত, দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, ছন্দের অন্যান্য রকমের পর্ববিন্যাস ও স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত তোলা যায়। কিন্তু সে কথা যাক্, ঝরাপালকে সবচেয়ে লক্ষণীয় দলবৃত্ত ছন্দে কবির অসামান্য দক্ষতা। 'চলছি উধাও', 'স্মৃতি', 'ছায়াপ্রিয়া', 'মিশর', 'মরুবালু' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই অনুমিত হবে দলবৃত্তের দ্রুতলয় যে অভিশ্রুতি-জাত ক্রিয়াপদই দাবি করে একথা জীবনানন্দ বুঝেছেন। তবু ঝরাপালকের পরে কাব্যরচনার শেষ পর্যায়ে না পৌঁছে কবি-প্রতিভা আর দলবৃত্ত ছন্দ কেন অবলম্বন করেনি সে কথা অবশ্যই ভাবতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস, জীবনানন্দের স্তিমিত প্রগাঢ় মনোভঙ্গি এই দ্রুতলয়ের ছন্দ প্রকরণকে আয়ত্ত করলেও একে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেনি। অথবা হয়তো সে যুগের অনেক কবিই ছড়ার ছন্দের দ্রুত লয়কে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে কাজে লাগিয়েছেন বলেই জীবনানন্দ সে পথ থেকে সরে এসেছিলেন। এমনকি জীবনের শেষ পর্বে এসে যখন কবি আবার দলবৃত্ত ছন্দ আশ্রয় করে কবিতা লিখেছেন সেখানেও দেখা যাবে ছন্দের লয়ের দ্রুততা ভাষায় মৃদু বিলম্বিত চাল দিয়ে শোধন করে নিয়েছেন। আমরা এই দুই স্তরের দুই নমুনা তুলছি। 'ঝরাপালক'-এ আছে—

ওরে কিশোর, দুর-সোহাগী ঘর-বিবাগী সুখ!
—টুকটুকে কোন্ মেঘের পারে ফুটফুটে কার মুখ
ডাকছে তোদের ডাগর কাঁচা চোখের কাছে তার!
—শাদা শকুন পাখার যে তাই তুলছে হাহাকার
ফাঁপা ঢেউয়ের চাপা কাঁদন,—ফাঁপর-কাটা বুক!

: সাগর-বলাকা

এর সঙ্গে শেষ পর্যায়ের—

মনে পড়ে, জলের মতন ঘুরে অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নীচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার-হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে ;
মৃত্যু এলে, মরে যেতে হবে
ভালবাসা নদীর জলের মতন হয়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

: জল

দুটি কবিতার ছন্দের মাত্রা সমান। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতির চাল যে অনেক বিলম্বিত তাতে সন্দেহ নেই। ছন্দের গতির উপর শিল্পিসত্তার এমন অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ঝরাপালকের পর্বে আসেনি।

জীবনানন্দের বিশিষ্ট কবিচিত্ত ধূসর পাণ্ডুলিপির কালে কিভাবে তার উপযোগী ছন্দটিকে নির্বাচন করে নিয়েছে তা এখানেই দেখতে হবে। এখানেই দেখা যাচ্ছে, সত্যেন দত্ত যেমন ছন্দের নানাবিধ রূপ-কলায় আকৃষ্ট হতেন জীবনানন্দ তেমন নন। বরং পর্বসংখ্যা অসম রেখে, ছোট বড় পংক্তিতে সাজালে যেটুকু বৈচিত্র্য আসে তাতেই তিনি যেন খুশি। মিল-ক্রমের অভিনবত্ব ও নানাবিধ স্তবক রচনার কৌতূহলও সূচনায় দেখা গেলেও কালক্রমে স্তিমিত হয়ে গেছে।

শ্রেষ্ঠ কবিতায় নির্বাচিত ঝরাপালক-এর তিনটি কবিতাই অসমপদী মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের। একেই প্রচলিত রীতিতে 'মুক্তক' ছন্দ বলে। এগুলি ছাড়াও ঐ রীতিতে আরো অনেকগুলি কবিতা ঝরাপালকে পাওয়া যাবে। 'কিশোরের প্রতি' 'নাবিক', 'একদিন খুঁজেছিনু যারে', 'ওগো দরদিয়া', 'শ্মশান' 'আলেয়া' প্রভৃতি। আসলে এই রীতির ছন্দই পরবর্তীকালে জীবনানন্দের কবিতার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছিল।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে ইংরেজী ছন্দ-প্রকরণ জীবনানন্দকে আকৃষ্ট করেছিল। এতে যে তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা আছে 'জীবন', 'অনেক আকাশ' ও 'প্রেম' তিনটিই নয় পংক্তির স্তবকে গঠিত। তার আগের দুটি 'স্পেনসরীয় স্তবক' রীতির

যে মুহূর্ত চলে গেছে,—জীবনের যেই দিনগুলি
ফুরায়ে গিয়েছে সব,—একবার আসে তারা ফিরে ;
তোমার পায়ের চাপে তাদের করেছ তুমি ধূলি
তোমার আঘাত দিয়ে তাদের গিয়েছ তুমি ছিঁড়ে!
হে ক্ষমতা, মনের ব্যথার মতো তাদের শরীরে
নিমেষে নিমেষে তুমি কতবার উঠেছিলে জেগে!
তারা সব চ'লে গেছে;—ভূতুড়ে পাতার মতো ভিড়ে

উত্তর-হাওয়ার মতো তুমি আজও রহিয়াছ লেগে!
যে-সময় চলে গেছে তা-ও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে—আবেগে!

: অনেক আকাশ

এই স্তবক রীতিতে মিলের বিন্যাস ক খ ক খ খ গ খ গ গ, বলা বাহুল্য শেষ পংক্তিটি একটু আয়তনে বড়। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটির পংক্তি-বিন্যাস ওয়ার্ডসোয়ার্থের Laodamia কবিতার পংক্তি-বিন্যাসের মতো। 'শকুন', 'অঘ্রাণ', 'শীত শেষ', 'এই সব', 'এই শান্তি','পায়রারা', 'যেন এক দেশলাই', 'বুনোহাঁস', 'নদীরা'—আকারে চতুর্দশপদী হলেও আসলে Terza Rima ছন্দের। এই ছন্দের সনেটে পাঁচটি স্তবক থাকে। প্রথম চারটি স্তবক তিন পংক্তি নিয়ে গঠিত হয়, শেষটি দুই পংক্তির ; প্রতি স্তবকে প্রথম পংক্তির সঙ্গে তৃতীয় পংক্তির মিল। দ্বিতীয় পংক্তির মিল ফিরে আসবে পরের স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে। দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তির মিল আবার ফিরে আসবে তৃতীয় স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে। শুধু শেষ স্তবকের পংক্তি দুটি হবে পয়ারের মতো মিল যুক্ত। আরো লক্ষ্য করার এই যে জীবনানন্দ এই রীতির সব কটি সনেটেই ৮ + ৮ + ৮ + ২ এই মিশ্রকলাবৃত্ত মাত্রা-বিন্যাস করেছেন যেমন :

আজ রাতে শেষ হয়ে গেল শীত—তারপর কে যে এল মাঠে-মাঠে খড়ে
হাঁস গাভী শাদা-প্লেট আকাশের নীল পথে যেন মৃদু মেঘের মতন,
ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও আর যাবো নাকো ঘরে

তাহার রূপালি রোম জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত করে যায় মন,
হৃদয়ে আস্বাদ এলো ফড়িঙের—কীটেরও যে— ঘাস থেকে ঘাসে-ঘাসে তাই
নির্জন ব্যাঙের মুখে মাকড়ের জালে তারা বরং এ অধীর জীবন

ছেড়ে দেবে—তবু আজ জ্যোৎস্নায় সুখ ছাড়া সাধ ছাড়া আর কিছু নাই;
আছে না কি আর কিছু? পাতা খড়কুটো দিয়ে যে আগুন জ্বেলেছে হৃদয়
গভীর শীতের রাতে— ব্যথা কম পাবে বলে— সেই সমারোহ আর চাই?

জীবন একাকী আজো— ব্যথা আজো—এখন করি না তবু বিয়োগের ভয়
এখন এসেছে প্রেম;— কার সাথে? কোনখানে? জানি নাকো; তবু সে আমারে
মাঠে-মাঠে নিয়ে যায়— তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় : সে এক বিস্ময়

এ শরীর রোগ নখ মুখ চুল—এ-জীবন ইহা যাহা ইহা যাহা নয়;
রঙিন কীটের মতো নিজের প্রাণের সাথে একরাত মাঠে জেগে রয়।

: শীত শেষ

লক্ষ্য করুন, দ্বাদশ পংক্তিটি বৃহত্তর। এমন বিস্তৃতি এ পর্বে বিরল।

'বনলতা সেন'-এর 'পথ হাঁটা' কবিতাটিও এই রীতির সনেট। অথচ ধূসর পাণ্ডুলিপিতেই 'তোমার শরীরে', 'একরাশ পৃথিবীরে', 'তোমারে দেখেছি, তাই', তিনটিই রূপপ্রকরণে সাধারণ সার্থক সনেট।

পুরনো 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থে মাত্র চারটি কবিতা বাদ দিলে সবগুলিই সনেট—প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত রীতির সনেট। এই সনেটগুলির 'অষ্টক' অংশে পেত্রার্কীয় কখ খক কখ খক মিল বিন্যাস এবং পরবর্তী 'ষড়ক' অংশের অজস্র মিল বৈচিত্র্য কবির সনেট সম্পর্কিত ধারণা ভাবনার কিছুটা পরিচয় দেবে। আমরা জানি, ফ্র্যান্সিস্কো পেত্রার্কা 'অষ্টক' অংশের মিল বিন্যাসে কোনো শৈথিল্য দেখান নি। কিন্তু ষড়কের মিল বিন্যাসে তাঁরও একাধিক বৈচিত্র্য ছিল। এই বৈচিত্র্যকেই জীবনানন্দ প্রসারিত করেছেন এখানে এবং দেখিয়েছেন মিলের এই বৈচিত্র্য ভাব ও গঠনের সংহতিকে অক্ষুণ্ন রেখেও করা সম্ভব। এই রীতিটি রাখার সার্থকতা এবং সনেট হিসাবে এব সাফল্য সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি বিশিষ্ট কবিতা যেমন মুক্তক ছন্দের, ধূসর পাণ্ডুলিপিতেও তেমনই এই গ্রন্থে মুক্তক রীতিতে কবিপ্রতিভা প্রতিষ্ঠিত। তবে ভাষার বিশিষ্টতায় ছন্দের স্বাভাবিক ধীরলয় কোথাও কোথাও ধীরতর হয়েছে মনে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য কবিতা সৃষ্টির সূচনায় অমিল মুক্তক ব্যবহার করেছিলেন। 'ক্যাম্পে' কবিতাটিতে জীবনানন্দও প্রথম অমিল মুক্তক লিখলেন।

কোথাও বাঘের পাড়া/বনে আজ/নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ/কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,/
সন্দেহের আবছায়া/নাই কিছু; /
কেবল পিপাসা আছে, /
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে/হয়তো চিতারও বুকে/জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ/-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে /উঠিতেছে সব দিকে/
আজ এই /বসন্তের রাতে;
এইখানে/আমার নক্টার্ণ্—।

: ক্যাম্পে

ইংরেজি চতুষ্পদী ব্যালাড স্তবকের বৈশিষ্ট্য হলো, এর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির অন্ত্যানুপ্রাস আছে, প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে নেই। ফলে দুইটি পংক্তি মিলে একটি পয়ারের পংক্তির মতো মনে হয় যেন। জীবনানন্দের অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতার মিল-বিন্যাস এইরকম। 'ফিরে এসো', 'সবিতা', 'সুচেতনা', 'তোমাকে', 'সাতটি তারার তিমির'-এর 'নাবিক', 'হাঁস', 'প্রতীতি', 'ভাষিত', 'সোনালি সিংহের গল্প' প্রভৃতি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

: তোমাকে

এই ধরনের চতুষ্পদীর সঙ্গে আরো দুটি সমিল পংক্তি যোগ করেও জীবনানন্দ অনেক কবিতা লিখেছেন। 'মিতভাষণ', 'সুচেতনা', 'শ্যামলী' প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

· মিতভাষণ

এমন তিনটি সমিল পংক্তির যোগে 'লঘু মুহূর্ত' কবিতাটির রচনা। কিন্তু শুধু ছন্দ নয়, জীবনানন্দের কবিতার মিল পরিকল্পনার কোথাও কোথাও নূতন পথের সন্ধান রয়েছে এবং সেগুলি আমাদের অবশ্য আলোচ্য। 'ক্যাম্পে' কবিতার মতো অমিল মুক্তক ছন্দে আরো অনেক কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি—

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময়;
সেইখানে মৃত্যু তবু;
এই শুধু—
এই ;
চাঁদ আসে একলাটি;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায়;

: উত্তর প্রবেশ

এইভাবে অমিল রীতিতে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত কবি যখন বলেন—

অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব, আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

: ঐ

পরিসমাপ্তির এই অপ্রত্যাশিত অন্তিম অনুপ্রাস আশ্চর্যভাবে অন্তরকে রসাপ্লুত করে তোলে।

অন্ত্যানুপ্রাসের এই রকম কৃপণের মতো ব্যবহারও যে ভাবের ক্ষেত্রে কতখানি সার্থকতা আনতে পারে জীবনানন্দের রচনা থেকে তার প্রচুর উদাহরণ তোলা সম্ভব—

জানি আমি জানি আদি নারীশরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি,
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বকুলের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে গ্লেশিয়ারে জলে
অসতী না হ'য়ে তবু স্মরণীয় অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন ক'রে কোথায় নভের দিকে চলে।

· জনান্তিকে

এমনি অমিল মুক্তকের শেষপর্বে এসে অন্ত্যানুপ্রাসের আকস্মিক সমারোহ কি আশ্চর্য 'এফেক্ট' সৃষ্টি করে তা তিনি জানতেন বলেই এখানেও ক্বচিৎ মিল রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে 'যাত্রী', 'স্থান থেকে' ইত্যাদি কবিতাও স্মরণ রাখা উচিত।

বনলতা সেনের একটি কবিতায় একটি বিস্ময়কর অন্ত্যানুপ্রাসের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করবো।

কাঁচ পোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে প'ড়ে আছো তুমি।

· তুমি

ঘুমের সঙ্গে অনুপ্রাস দেওয়া হয়েছে 'তুমি'। অনুপ্রাসটি খুব সুখকর না হবারই কথা। কিন্তু পড়তে গিয়ে তা মনে হয় না। প্রথম পংক্তির 'ঘুমিয়েছে'র পরে 'ঘুমে' আম নিম হিজলের ভিড়ে কখন হারিয়ে যায় যে 'তুমি' উচ্চারিত হওয়ার সময় ভুলে যাই প্রথম পংক্তিতে কি ছিল।

কিন্তু তা হলেও এর পরেও কবিতাটি আমায় বারবার ভাবিয়েছে। বারবার মনে হয়েছে ঐ 'ঘুমের' জায়গায় কবি কি 'ঘুমিয়েছে' লিখেছিলেন কখনো? লিখে দুই পংক্তির মধ্যে ভেঙে দিয়েছিলেন শব্দটিকে। তারপরে দ্বিতীয় পাঠের সময় সেটিকে পালটে দিয়েছেন? এসব জিজ্ঞাসার আর কোনো জবাব পাওয়া যাবে না।

কবিতায় এরকম নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা জীবনানন্দ আরও করেছেন। 'মহাপৃথিবী'র 'মনোবীজ' কবিতাটিকে দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠা মিশ্রকলাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে লেখার পর কবি শেষ স্তবকে এসে সরল কলাবৃত্ত ছন্দে রূপান্তরিত করলেন।

অনেক মেধাবী মুখ স্বপনের বন্দরের তীরে,
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে।

...	...	...	
প্রেম কি জাগায়	সূর্যকে আজ	ভোরে?	
হয়তো জ্বালায়ে	গিয়েছে অনেক	অনেক বিগত	কাল
বায়ুর ঘোড়ার	খুরে যে পরায়	অগ্নির মতো	নাল
জানে না সে কিছু	তবু তারে জেনে	সূর্য আজিকে	জ্বলে।

: মনোবীজ

তার ফলে ছন্দে যে দ্রুততা ও গতি সঞ্চারিত হলো তা কবিতার ভাবমূর্তিকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায় শ্রেষ্ঠ কবিতার 'অনন্দা'য়। সেটি দলবৃত্তের লঘু ছন্দে শুরু হয়েছে! পরে কিন্তু ভাবের পরিণতির সঙ্গে তাল রেখে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে পরিবর্তিত হয়েছে ; সার্থকতা প্রশ্নাতীত। 'লঘু মুহূর্ত' কবিতায় ব্যবহৃত মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ কবিতার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আশ্চর্য লঘু হয়ে গেছে—

কী করে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে ;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কর লাভ—
এই নিয়ে চারজনে করে গেল ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে ;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দ্যাখে—যত দিন মুখ দেখা চলে।

: লঘুমুহূর্ত

'সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে' এই পংক্তির পর্ববিন্যাস বিস্ময়কর। কোথাও ছন্দ পতন হয়নি কি?

আশ্চর্য এই যে প্রাজ্ঞ ছন্দোবিজ্ঞানী ড. নীলরতন সেন জীবনানন্দের ছন্দ কুশলতা সম্পর্কে এক পরিশ্রমী রচনায় অসতর্ক ভাবে আলোচ্য কবিতাটিকে আট মাত্রার 'মাত্রাবৃত্ত' বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেছেন, এর কোনো কোনো পর্বে 'অক্ষরবৃত্তের সংহত উচ্চারণ প্রবেশ করেছে। তাঁর মতে, "সেটি সম্ভবপর হয়েছে এ ছন্দের আট-দশ মাত্রার দীর্ঘ যতিভাগের ফলে। নিঃসংশয়ে এটি একটি নতুন পরীক্ষা।" সাধারণ কোনো লেখকের উক্তি হলে আমরা এ মন্তব্য উপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু ডক্টর সেনের অভিমত বলেই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে আমরা কখনো কখনো দশ মাত্রার মতো বড় পর্বভাগে দেখিনি। দ্বিতীয়ত, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ পর্বের মাত্রা-সমকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে 'অসমান মুক্তক পঙ্‌ক্তি' দেখা যায় না। তৃতীয়ত, এ ছন্দে 'অক্ষরবৃত্তের সংহত উচ্চারণ' কিছুতেই স্থান পেতে পারে না—তাতে ছন্দ ভেঙে পড়ে। কিন্তু ড. সেন লক্ষ্য করেছেন এখানে "ছন্দ পঙ্গু হয়নি"। ছন্দ যে অটুট আছে তার কারণ হ'লো এ ছন্দ মাত্রাবৃত্ত নয়, অক্ষরবৃত্ত। মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দেই কেবল সেই শোষণশক্তি বা স্থিতিস্থাপকতা আছে যা এজাতের ব্যতিক্রমকে মানিয়ে নিতে পারে। কলাবৃত্ত ছন্দের সে ক্ষমতা নেই।

পর্ববিন্যাসের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য জীবনানন্দের অন্য কবিতাতেও দেখা যাবে। আমরা এর আগে অন্য প্রসঙ্গে 'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতাটির আলোচনা করেছিলাম।

সুজাতাকে ভালো বাসতাম আমি
এখনো কি ভালো বাসি?
সেটা অবসরে ভাববার কথা,
অবসর তবু নেই;
তবু একদিন হেমন্ত এলে অবকাশ পাওয়া যাবে;
এখন শেল্‌ফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভ্‌লভ্ ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা।
পুরানো চিঠির ফাইল কিছু আছে;
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা;

: লোকেন বোসের জার্নাল

কবিতাটি কলাবৃত্ত ছন্দের ছয় মাত্রার পর্বে রচিত? নাকি দলবৃত্ত ছন্দে? দলবৃত্ত ছন্দের মতোই এর পর্বের মাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। নিম্নরেখাঙ্কিত পর্বগুলি দেখুন। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি সার্থক হয় তবে বাংলা ছন্দোবিজ্ঞানে তা গুরুতর বিপ্লব বলেই গণ্য হবে।

গদ্য কবিতা

গদ্য রীতিতে কবিতা লিখতে জীবনানন্দ কবে প্রথম উদ্বুদ্ধ হন, কোনটি তাঁর প্রথম গদ্য কবিতা তা সম্ভবত আজ বলা সম্ভব নয়। 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি' কবিতাটিকে জীবনানন্দের আদি ব্যঙ্গ কবিতা বলে আমরা ইতিপূর্বে নির্দেশ করেছি। সম্ভবত এটিকেই জীবনানন্দের প্রথম গদ্য কবিতার নিদর্শন হিসাবে গণ্য করতে হবে।

কবিকে দেখে এলাম,
দেখে এলাম কবিকে
আনন্দের কবিতা একাদিক্রমে লিখে চলেছে
তবুও পয়সা রোজগার করবার দরকার আছে তার
কেউ উইল করে কিছু রেখে যায়নি,
চাকরি নেই
ব্যবসার মারপ্যাচ বোঝে না সে।

: কবি

এই যদি সূচনা হয়ে থাকে অথবা নাও হয় তাতে কিছু আসে যায় না। জীবনানন্দের

রচনায় প্রথম গদ্য কবিতার প্রাচুর্য দেখা গেল মহাপৃথিবী-বনলতা সেন পর্বে। একটি দুটি নয়, অজস্র। 'শ্রাবণ রাত', 'মুহূর্ত', 'শহর', 'শীত রাত', 'আদিম দেবতারা', 'আজকের এক মুহূর্ত', 'ফুটপাতে', 'হঠাৎ মৃত', 'ঘাস', 'হাওয়ার রাত', 'বেড়াল', 'শিকার', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'আমি যদি হতাম', 'অন্ধকার', 'কমলালেবু', 'আমাকে তুমি' প্রভৃতি। আর এইসব গদ্য কবিতার রূপ কি—কমনীয় শ্রী কত বেশি! রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতায় খুঁজেছিলেন 'দুর্গম নির্মম'কে, চেয়েছিলেন, 'কঠিন-চিত্ত উদাসীনের গান'—তাই তাঁর কবিতা মনে হবে যেন রুক্ষ পাথরের কর্কশতা। জীবনানন্দের এই স্তরের কবিতায় গদ্যছন্দের সাধনা ও সিদ্ধি ভিন্ন জাতের—সামান্য নমুনা :।

১। ভোর :

সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের
বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল!
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য;
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;
এই নীল আকাশের নীচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

শিকার

২। বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কতবার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে গেল বাঘ—জঙ্গলের অন্ধকারে ;
কতবার হটেন্‌টট্—জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম ;

কিন্তু সেই সব মূঢ়তার দিন নেই আর সিংহদের ;
নীলিমার থেকে সমুদ্রের থেকে উঠে এসে
পরিস্ফুট রোদের ভিতর
উজ্জ্বল দেহ অদৃশ্য রাখে তারা ;
শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের
আর কোনো শেষ বক্তব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

: আজকের এক মুহূর্ত

প্রকৃতির সজীব সান্নিধ্যে, কবি চিত্তের মুগ্ধতা ও আবেগের নির্বাধ সঞ্চরণ যেমন প্রথম কবিতায় দেখা যাবে, দ্বিতীয়টিতে তেমনি জীবনের ক্রূর কুটিল রূপ ব্যঙ্গের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায় ব্যক্ত হয়েছে। বিষয়ের সঙ্গে ছন্দরীতির এই অদ্বয় এককত্ব এখানে লক্ষণীয়।

গদ্য কবিতার এই সমৃদ্ধি ও সাফল্য কিন্তু পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হয়েছে বলতে হবে। কেননা 'সাতটি তারার 'তিমির'-এর সাঙ্কেতিক কবিতাগুচ্ছের মধ্যে একটিও গদ্য কবিতা স্থান পায়নি। এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'র চিন্তা-ভূয়সী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে মাত্র দুটি গদ্য কবিতা 'আমাকে একটি কথা দাও' এবং 'সময়ের তীরে' পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ঐ গ্রন্থের সুবিস্তৃত 'সূর্য নক্ষত্র নারী' কবিতার প্রথম অংশটিও গদ্য কবিতায় লেখা। 'সুদর্শনা'য় সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচটি 'সবার ওপর', 'অনির্বাণ', 'আমি', 'চিঠি এলো' ও 'শবের পাশে' গদ্য কবিতা। কিন্তু প্রশ্ন হলো শিল্পসিদ্ধি সত্ত্বেও গদ্য কবিতাকে জীবনানন্দ সচেতনভাবে এইপর্বে পরিহার করলেন কেন? আমার হাতে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য উপস্থিত নেই। অনুমান করি, সাঙ্কেতিক কবিতার প্রকরণগত জটিলতা এবং বক্তব্যধর্মী কবিতার বিষয়-জটিলতার সঙ্গে ছন্দোহীনতাকে সংযুক্ত করলে সাধারণ পাঠককে খুব বঞ্চিত ও বিমুখ করে তোলা হবে মনে করে হয়তো ছন্দের ঈষৎ আন্দোলন, মিলের একটু আমেজ তিনি বজায় রেখে চলেছিলেন। কিন্তু পূর্বোক্ত কবিতাগুলি যত্ন করে পড়লে এটাই প্রতীত হবে এই সাবধানতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা ভাবের সংহতিতে, ভাষার সাবলীল বিন্যাসে বাণীর সৌন্দর্যে এসব গদ্য কবিতা প্রায় বেদ মন্ত্রের মতো সুমহান। এই নমুনা :

> আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
> সহজ মহৎ বিশাল,
> গভীর ; —সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে
> মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন :
> আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।
> সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো ;
> সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
> সেই উজ্জ্বল পাখিনীর—পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
> অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিম শরীরিণী মোমের মতন।
>
> . আমাকে একটি কথা দাও

জীবনানন্দের অসংগ্রথিত কবিতার মধ্যে আরো কিছু গদ্য কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'যাত্রা' নামে একটি সুদীর্ঘ কবিতার অংশ-বিশেষ তুলছি : লক্ষণীয় এগুলির চলিত ক্রিয়াপদ ও অসমাপিকা

> কারো কারো মন স্বভাবত নিহতচেতন ;
> হাসছে খেলছে গুলগল্পে গরমে মেতে আছে—
> খাচ্ছে-ছুটছে-চালানি মালের মতো দিনরাত দিচ্ছে নিচ্ছে
> দেহ—ভালবাসা—(দেহ-মাংস) ;—

সারাদিন চামড়া মাংস বিকিকিনি শেষ হয়ে গেলে
তারার আলোয় এসে ঘ-মানুষের মতো এরাও মানুষ :
আচ্ছন্ন করুণ, চেতনা জেগেছে, পথ নেই, বিন্দুর ভিতরে
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে জাহাজ—মুর্গির খাঁচার মতো যেন ;
তবুও তা নয় ; —
আকাশ বিমুক্ত হয়ে আছে।

: যাত্রা

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'শিশুতীর্থ' কবিতার সমতুল্য ও সমান্তরাল বলে গণ্য হতে পারে। 'যাত্রা' নামে আরো একটি গদ্য কবিতা উত্তরসূরী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখছি :

কতদিন হয়ে গেল—
কতবার কাঁচা ধান কার্তিকের সূর্যে গেল পেকে ;
পউষের চাঁদ পড়ে ঝরে গেল।
খড় শুধু পৃথিবীর মুখখানা ঢেকে
রয়ে গেল ;

. যাত্রা (উত্তরসূরী)

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কখনও মুহূর্ত' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলবো। মোট কথা রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে গদ্য কবিতার স্রষ্টাদের মধ্যে জীবনানন্দের আসন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

বিক্ষিপ্ত চিন্তা

অতিপ্রাকৃত

ইংরেজী সাহিত্যে কোলরিজ যে অনন্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত আছেন তার অন্যতম ভিত্তি অবশ্যই তাঁর অতিলৌকিক কবিতাগুচ্ছ। যদিও অতিলৌকিকতা রোম্যান্টিকতারই লক্ষণ বিশেষ, তবু এইরকম অদ্ভুতরসের কবিতা পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় রচিত হয়নি। যা হয়েছে তার রসসিদ্ধিও কতদূর উচ্চাঙ্গের তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এই জন্যেই এ বিষয়ে কোলরিজের মহত্ত্ব স্বীকৃত। পরবর্তীকালে মার্কিন কবি এড্‌গার এলান পো এ বিষয়ে উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে যে জীঅতিলৌকিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন তাই নয়, এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধিও যে কোনো প্রধান কবির ঈর্ষার কারণ হতে পারে। অথচ আশ্চর্য, জীবনানন্দের কৃতিত্বের অনেক অনন্যসাধারণ দিকের মতো এদিকেও রসিক পাঠকের তেমন লক্ষ্য ছিল মনে হয় না। থাকলে, তাঁর জীবিতকালে এই সকল কবিতা আদৃত, অন্তত আলোচিত হলে—এদিকে আরো কিছু সৃষ্টির জন্য কবির চিত্ত উদ্দীপিত হতে পারতো।

'ঝরাপালক'-এর 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতাটি এই পর্যায়ের আদি কবিতা। যদিও পরিণত শিল্পচেতনার অভাবে কবিতাটি তেমন রসনিবিড় হয়ে ওঠেনি। এখানেই তাঁর অতিলৌকিক চেতনার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ। এই কবিতাটিই আবার পরবর্তীকালে ভাব পরিণতির ফলে 'বনলতা সেন'-এ 'হাওয়ার রাত' হয়ে উঠেছে। কৃতূহলীরা অবশ্যই কবিতা দুটিকে পাশাপাশি নিয়ে পড়বেন। স্বপ্ন ও চেতনার অন্তর্বর্তী এক স্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতির রূপ দুটি কবিতাতেই দেওয়া হয়েছে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সিগনেট সংস্করণে সংযোজিত কবিতাগুলির মধ্যে 'বৈতরণী' এবং 'মেয়ে', এই দুটি অপ্রাকৃত রসের কবিতা স্থান পেয়েছে। 'বৈতরণী' কবিতায় মৃত আত্মার মৃত্যুপুরী থেকে বিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষায়, প্রিয়জনের সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় শকুনের মতো উড়ে যাওয়া এবং পরিশেষে সেই বেদনার্ত মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসা—

আবার চলেছি উড়ে একা একা শকুনের কালো পাখা মেলে
পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি—আজো তারা মনে করে রেখেছে আমারে,
ভালবাসে,—রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি—আমার এ-সংসর্গের ভালবাসা পেলে,
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন করে পেলে
তাহারা বাসিত ভালো আরো বেশি—আরো বেশি—এই শুধু—আর কিছু নয়—
সাত-দিন সাত-রাত তাহাদের জানালায় পর্দায় উড়ে-উড়ে কেবল ভেবেছি এই কথা

আবার পেতাম যদি সে সে-শরীর—সে-জীবন—তাহলে প্রণয় প্রেম সত্য হত;
আজ তা বিস্ময়—
আজ তা বিস্ময় শুধু—শুধু স্মৃতি শুধু ভুল—হয়তো কর্তব্য বিহ্বলতা :
সাত-রাত সাত-দিন পৃথিবীতে কেবলই ভেবেছি এই কথা।

তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু জাগে—মৃত্যু তাই আর একবার,
বিবর্ণ বিস্মৃত পাখা মেলে দিয়ে মাঝ-শূন্যে আমি ক্ষিপ্র শকুনের মতো
উড়িতেছি—উড়িতেছি;—ছুটি নয়—খেলা নয়—স্বপ্ন নয়—যেইখানে জলের আঁধার
বৈতরণী—বৈতরণী—শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম—ঘুম অবিরত
তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।
. বৈতরণী

কবিতাটি পড়তে পড়তে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুপুরীর বিখ্যাত চিত্রগুলি স্মরণে আসবে। মনে পড়বে—মেরি কোলরিজের বিখ্যাত গল্প 'King is dead, long live the king' কাহিনীর সারনির্যাস। কিন্তু ঐ গল্পে মানুষের নিপ্প্রেম নির্দয়তার কথাই ব্যক্ত হয়েছে,এই কবিতায় মানুষের দেহাশ্রয়ী ভালবাসার মানবিকতার স্বাভাবিক রস এর করুণ পরিণতিকে সুস্থ করেছে। আমরা মৃত স্বজনকে ভালবাসি, কিন্তু বিদেহী আত্মাকে নয়, তার দেহ সংলগ্ন সামগ্রিক সত্তাকে ফিরে পেতে চাই, তাই এই আত্মাকে আবার ফিরে যেতে হলো মৃত্যুপরীর দিকে।

বক্তব্য প্রায় একই তবু অলৌকিকতার রস-বিচারে 'মেয়ে' কবিতাটি আরো সার্থক, আরো সুন্দর হয়েছে। কবিতাটির পটভূমিতে রয়েছে কন্যাহারা পিতৃহৃদয়ের আশ্চর্য অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। পিতা মৃত মেয়েটিকে ফিরে পেতে চান কিন্তু জীবিত সন্তানের বিনিময়ে নয়। W. W. Jacobs-এর 'The Monkey's Paw' যে-অর্থে এক আশ্চর্য অলৌকিক নাট্য-রচনা, প্রায় অনুরূপ অর্থে 'মেয়ে' কবিতাটিও সার্থক সৃষ্টি। সেখানে মিঃ ও মিসেস হোয়াইটের যুগ্ম চরিত্রে যেমন পিতৃমাতৃহৃদয়ের মৃত সন্তানকে জীবিতভাবে ফিরে পাবার বাসনা এবং সন্তানের বিকৃত অবস্থার কথা কল্পনা করে ভয়,—একজনের সাগ্রহ আকাঙক্ষা অন্যজনের বিবেচিত বিরুদ্ধতায় পরাভূত হয়েছে। প্রায় সেই রকম নাটকীয় অবস্থা এখানে। এই ছোট্ট লিরিকটি কবি এমনভাবে ব্যঞ্জনায় ভরে দিয়েছেন যে কবিতার সমাপ্তিতে যেন পিতার ভীত নির্দেশ এবং মৃত কন্যার বেদনাতুর প্রতিপালনের কারুণ্য পাঠকের মনে অবিনশ্বর বর্ণে মুদ্রিত হয়ে যায়।

তবু তারে চাই আমি—তারে শুধু—পৃথিবীতে আর কিছু নয়
রক্তমাংস চোখ চুল—আমার সে মেয়ে
আমার প্রথম মেয়ে—সেই পাখি—শাদা পাখি—তারে আমি চাই :
সে যেন বুঝিল সব—নতুন জীবন তাই পেয়ে

হঠাৎ দাঁড়াল কাছে সেই মৃত মেয়ে।
বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ, তাই ছোটো বোনটিরে—
তোমার সে ছোটো-ছোটো মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নীচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এতদিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল মেয়ে,
বলিলাম ঃ 'আবার ঘুমাও গিয়ে—
ছোট বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

ব্যথা পেল সেই প্রাণ—খানিক দাঁড়াল চুপে—তারপর ধোঁয়া
সব তার ধোঁয়া হয়ে খসে গেল ধীরে-ধীরে তাই
শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়াল সে একবার
কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক—
চেয়ে দেখি ছোটো মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে—আর কেউ নাই।

: মেয়ে

'জোনাকি' কবিতাটির কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়বে। এটিও 'মেয়ে' কবিতাটির মতোই বাৎসল্য রসেরই কবিতা। চার বছরের ছোট মেয়েটি সুন্দর নীল শিম পেড়ে নিয়ে আঁচল ভরে চলে গিয়েছে। তারপরে—

বেলা শেষ হলে
শুনলাম ডুবে গেছে পুকুরের জলে।
অনেক গভীর রাতে দেখা গেলো জোনাকি পোকার সাথে নক্ষত্রের তলে
শিমগুলো খেলা করে শিশিরের জলে ;
আমাকে দাঁড়াতে দেখে বলে তারা ঃ 'বুঝেছ তো কে এই জোনাকি?'
'চিনেছো?' বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি।

: জোনাকি

অতিপ্রাকৃত কবিতার যে কোনো সার্থক শিল্পীর মতোই জীবনানন্দের কবিতায় অলৌকিকতার অবতারণা মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় পথ ধরে। কন্যাহারা পিতার বিশ্বাস মৃত শিশুই বুঝি জোনাকির রূপ নিয়ে নীল শিমগুলোর সঙ্গে খেলতে এসেছে। এই বিশ্বাস তর্কাতীত, কারুণ্যের স্পর্শ পেয়ে এ কবিতা অনায়াসে রসোত্তীর্ণ। কিন্তু মহাপৃথিবীর 'স্বপ্ন' কবিতাটি ঠিক এই জাতের নয়। জাগ্রত চেতনার ভিত্তিভূমি থেকে এক অতিপ্রাকৃত জগতের অভ্যন্তরে তার স্বপ্নপ্রয়াণ—

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম বসে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খসে ;

নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি
উড়ে গেল কুয়াশায়—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।
তাহারই পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেল বুঝি?
অন্ধকার হাতড়ায়ে ধীরে ধীরে মেলাই খুঁজি ;
যখন জ্বালিব আলো, কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পারো?

: স্বপ্ন

প্রথমে রাত্রির প্রত্যক্ষতা, বাইরের আশ্চর্য নিভৃত পরিবেশ, নিমের শাখায় একাকীতম কোন পাখির অকস্মাৎ ডানা ঝাপটিয়ে দূরের কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপের নির্বাপণ—যেন এই জগৎ লোপ করে দিয়ে অন্য এক জগতের উদ্‌ঘাটনেরই রূপক। এইবার হাতড়ানো দেশলাইয়ের আলোতে যে মুখ ভাসবে সে নিশ্চয় অতীতের কোনো অবলুপ্ত পৃথিবীর কোনো পরিচিত মুখাবয়ব। কেননা কিছুই লুপ্ত হয় না পৃথিবীতে, বর্তমানের রূপের আড়ালে স্বপ্নের মতো সবই বিরাজ করে চিরকাল, আমরা মানুষেরা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেলেও স্বপ্নের জগৎ থেকে লোপ পাবো না কখনো।

এইসব কবিতায় সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে কবি সক্ষম হয়েছেন যেখানে পাঠকের অবিশ্বাস অবদমিত হয় স্বেচ্ছায়, রসের প্রাবল্যে। আর এটাই চরম কথা।

মনোকণিকা

কবিতার পরিমাপ কতখানি হওয়া সঙ্গত, এ প্রশ্ন যেমন মহাকাব্যের যুগের তেমন এই যুগেরও। অবশ্য সাময়িক পত্রিকার কল্যাণে বাংলা কবিতার একটা মোটামুটি আকার সীমা আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। তবু চার ছয় বারো লাইনের কবিতা ও সনেট যা কিছুদিন আগেও পত্রিকায় পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হতো তার সঙ্গে শতাধিক পংক্তির বা তার কাছাকাছি আকারের কবিতার সম্মানমূল্য সমান ছিল না। এখন দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ হলেও আমরাও এদের এক পংক্তিতে বসাতে চাই না।

গল্পের সঙ্গে ছোটগল্পের যে ভেদ, কবিতার সঙ্গে 'কবিতিকা'র তেমনই পার্থক্য আছে। একটি ছোট কবিতা ও একটি বড় কবিতা কি গুণগত ক্ষেত্রে সমান, এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েও আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটা' বা 'পৃথিবী'র পাশাপাশি 'ধূসর গোধুলি লগ্নে' বা 'রূপনারাণের কূলে'র কোনটি ভালো, বলা হয়তো কঠিন। কিন্তু একটার স্বাদ অন্যটায় মিলবে না।

আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে ছোট কবিতা যে ছিল না তা নয়—এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' এবং পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসায়রের ছোট কবিতাগুলি অবশ্যই মনে পড়বে। অবশ্য প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে যাকে 'চিত্রকাব্য' বলা হয়েছে এগুলি সেই পর্যায়ের। একটুকু ভাব, একটা নীতিকথা, এক টুকরো কৌতুক এই কবিতাগুলির প্রাণ—পর্যাপ্ত রসমূল্য এদের আছে এমন মনে করা যায় না সর্বদা।

ছোট কবিতার এই রসমূল্য সম্পর্কে আমাদের প্রথম সচেতন করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'জাপান যাত্রা' প্রবন্ধে এই উপলব্ধির খবর মিলবে, রবীন্দ্রনাথই একে 'কবিতিকা' বলে নামকরণ করে সাহিত্যের আসরে বরণ করে নিলেন। এগুলি আর ছন্দায়িত তত্ত্বমাত্র রইল না। তাঁর লক্ষ্য হলো জাপানি hokku-র মতো ক্ষুদ্রায়তনের চিত্ররসময় কবিতা। আকারে ছোট বলে এদের ভাবগত বা শিল্পগত মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', 'লেখন' ও স্ফুলিঙ্গ'-এর অধিকাংশ কবিতাই যে এই অর্থে কবিতিকা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে।

কিংবা

তুমি যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

এই জাতের আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ কবিতা খুব বেশি সেখানেও নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ক্ষুদ্র কবিতা লিখতে হয়েছিল চলতি পথে স্বাক্ষর-শিকারীদের তাগিদে। ভাবনা ও অনুভূতির যে স্তব্ধতা থেকে সেরা কবিতার জন্ম হয় এভাবে অন্তত তা আশা করা যায় না।

আসলে ছোট কবিতার একটি বিশিষ্ট স্বরূপ-লক্ষণ আছে। ভাব সেখানে কঠিনতম সংযমে আবদ্ধ, তবু রস সেখানে নিবিড়। অনেক কবিতাতেই চেতনার এক দীপ্ত উদ্ভাস দেখা যায়। ছোট কবিতার আয়তনের একটা পরিসীমা থাকা চাই, তবে ধরা যেতে পারে ১০/১২টি পংক্তির বা তার চেয়ে ছোট পরিধির কবিতাই কবিতিকা হতে পারে। অবশ্য পংক্তি গুণে কখনোই কবিতিকা কিনা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। আসল কথা এর সংযত-চরিত্র, পংক্তির সংখ্যা নয়। চর্যাপদের দশ পংক্তিতে রচিত কবিতাগুলি আকারে ছোট হলেও প্রকৃতিতে বড় কবিতাই বলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের পরেও কয়েকজন নিষ্ঠার সঙ্গে ছোট কবিতার চর্চা করেছেন। আমাদের অবশ্যই মনে পড়বে সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' আর 'মণিমঞ্জুষা'। প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পত্রলেখা'তে কয়েকটি সুন্দর কবিতিকা পাওয়া যাবে। একালের মধ্যে এমন ছোট কবিতায়

জীবনানন্দ দাশ, অন্নদাশংকর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কানাই সামন্ত ও মৃণালকান্তি দাসের সিদ্ধি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

জীবনানন্দ তাঁর ক্ষুদ্র কবিতার কয়েকটিকে 'মনোকণিকা' নাম দিয়েছেন। মনোকণিকা নামটিতে তাঁর কবিতিকার চরিত্র-স্বরূপ কিছু পরিমাণে ব্যক্ত হতে পারে। বারিবিন্দুতে যেমন সিন্ধুর স্বাদ পাওয়া যায় তেমনই এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাকণার মধ্যেও কবিমনের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। 'রূপসী বাংলা'র এই ছোট্ট কবিতাটি যেমন—

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে মৃদু নীরবতা :
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে ;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে;
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে-আকাশে।

: ৬০ রূ. বাং.

এই শান্তি, এই স্তিমিত মন্থর গতিই 'রূপসী বাংলা'র মূল-সুর। এই ছোট্ট কবিতার বাক্-সংযমের মধ্যেও তা অটুট রয়েছে। আকাশ নক্ষত্রব্যাপী বিরাট পটভূমির সৌন্দর্য ও প্রেমিক হৃদয়ের মুগ্ধ প্রশান্তি একই প্রযত্নে এখানে এঁকে তোলা গিয়েছে।

জানি না কোথায় তুমি—সূর্য নিভে গেছে ঃ
তোমার মননে আজ স্থির
সন্ধ্যার কুমোর পোকা—বাঁশের ছ্যাঁদার ঘূণ—
শাদা বেতফলের শিশির।

: তুমি

বিরহী চিত্তের যে আর্তি নিয়ে এই কবিতা, তা সূচনার একটি পংক্তির মধ্যেই পরিব্যক্ত। পরের তিনটি পংক্তি জুড়ে একটি অনুযোগ তিনটি নৈসর্গিক চিত্র অনুক্রমে অশ্রুপ্লুত বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকৃতি ও হৃদয়ের সাজুয্যে এ কবিতাও অসামান্য রসোপেত।

আরো ছোট একটি কবিতায়—

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দুজনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে

সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনদিন সেদিকে যাবে না।
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে।

: ঘড়ির দুইটি ছোটো (কবিতা)

কবিতাটির ক্লাসিক সংযম ও উত্তেজনাহীন আবেগ লক্ষ্য করতে হবে। মৃত্যুর শাশ্বত বেদনা এই প্রেমের কবিতাটির প্রাণ; মানুষের সাহস সংকল্প প্রেম অমরতার অভিলাষী অথচ ঘড়ির যুগল কাঁটার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে মানুষের দেহ সব ইচ্ছা সাধ ব্যর্থ করে দিয়ে প্রেমিকদের মৃত্যুর শীতল মৃত্তিকালীন প্রকোষ্ঠে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

এসব কবিতা আকারে ক্ষুদ্র হলেও ভাবৈশ্বর্যে কোনো বড় কবিতা থেকে দীন নয়। এমনি একটি আশ্চর্য সার্থকতার কবিতা—

এখন অনেক বাতে বিছানা পেয়েছ।
নরম আঁধার ঘর
শান্তি নিস্তব্ধতা ;
এখন ভেবো না কোনো কথা।
এখন শুনো না কোনো স্বর।
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মতো মুদে থাকো।

. কোনো ব্যথিতাকে

কথকের হৃদয়ের অনুভাবিত ভালবাসা, ব্যথিতাকে সব আঘাত থেকে আড়াল করে শুশ্রূষা ও শান্তি দিতে চেয়েছে। সমবেদনার এইরকম সুস্নিগ্ধ প্রকাশ জীবনানন্দের কবিতায় শুধু নয়, বাংলা কবিতাতেই দুর্লভ।

এইরকম আরেকটি ছোট নিসর্গপ্রীতির কবিতা—

এখন রজনীগন্ধা—প্রথম—নতুন—
একটি নক্ষত্র শুধু বিকেলের সমস্ত আকাশে;
অন্ধকার ভালো বলে শান্ত-পৃথিবীর
আলো নিভে আসে।

অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো ;
রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে।

: রজনীগন্ধা

আঁধার আকাশের বিশাল নীরব পটভূমিকায় একক নক্ষত্রের মতো, বিকেলের নির্জনতায় নতুন রজনীগন্ধার প্রথম ফুলে একটি মৌমাছির মতো, কবিতাটিকেও আশাতীত মধুময় মনে হতে পারে আমাদের।

আসলে প্রকৃতিই জীবনানন্দের কবি-সত্তার আশ্রয়ভূমি। মানব জীবনে প্রকৃতির অসীম দাক্ষিণ্যই তাঁর কবিতার একটি মূল বাণী। সেই ভাবনাই বার বার তাঁর মনে দোলা দিয়ে গেছে ;

এখানে নক্ষত্র ভরে রয়েছে আকাশ,
সারাদিন সূর্য তার প্রান্তরের ঘাস;
ডালপালা ফাঁক ক'রে উঁচু উঁচু গাছে
নীলিমা সিঁড়ির মতো সোজা, আঁকাবাঁকা হয়ে আছে

যে যাবে—সে যেতে পারে তার ; নীল রোদের ভিতরে
অনেক জলের শব্দে দিন
হৃদয়ের ক্লান্তি ক্ষয় কালিমা মুছিয়ে
শুশ্রূষার মতো অন্তহীন।

: এখানে নক্ষত্রে ভরে

বিপুল মহাপ্রকৃতি তার সজীব সৌন্দর্য নিয়ে ব্যাপ্ত মহিমা নিয়ে মানুষের ক্লান্তি ক্ষয় কালিমা অনন্ত শুশ্রূষায় মুছে মুছে যায়। আর সুনীল আকাশ যেন সিঁড়ির মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কিন্তু প্রকৃতি বা প্রেমের কবিতাই শুধু কেন, রসের বিচিত্রতাও মনোকণিকার এক আশ্চর্য সম্পদ। দুটি উদাহরণ দেবো—প্রথমটি রঙ্গরসের, দ্বিতীয়টি নব্যবাস্তবের

১। মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিতো—
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিলো ভুলে),
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিতো,
পরচুলা এঁটে নিতো স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ-সব কাজ করে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হতো, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হতো কে নিজের মুখের রগড়ে।

· মানুষ সর্বদা যদি

২। পৃথিবীতে তামাশার সুর ক্রমে পরিচ্ছন্ন হয়ে
জন্ম নেবে একদিন। আমোদ গভীর হলে সব

বিভিন্ন মানুষ মিলেমিশে গিয়ে যে-কোনো আকাশে
মনে হবে পরস্পরের প্রিয়-প্রতিষ্ঠ মানব।
এইসব বোধহয় আজ এই ভোরের আলোর পথে এসে
জুহুর সমুদ্র পারে, অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে
এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাঁক, ধর্ম মরেছে;
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

: সমুদ্র তীরে

এই রকমই মহাপৃথিবীর, 'ফিরে এসো', 'ইহাদেরি কানে', 'বনলতা সেনের 'হায় চিল', 'কমলা লেবু', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে', 'স্বপ্নের ধ্বনিরা', 'ধানকাটা হয়ে গেছে', সাতটি তারার তিমিরের 'যেইসব শেয়ালেরা', 'সপ্তক', সুদর্শনার 'জল', 'কে এসে যেন', 'রশ্মি এসে পড়ে', 'অন্তর বাহির', 'অনেক রক্তে', 'আজ', 'মরুতৃণোজ্জ্বলা', 'হে জননী হে জীবন', এইসব কবিতার রসবৈচিত্র্য ও স্বাদের তুলনা হয় না। কিন্তু এগুলি নিয়ে অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে বাদ দেওয়া হলো।

তবু একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় প্রতিটি ছোট কবিতায় জীবনানন্দের এই অসামান্য সিদ্ধির হেতু কি? সাতটি তারার তিমিরের 'সপ্তক' কবিতাটির কথাই ধরা যাক্। সেখানে সরোজিনীর সমাধিক্ষেত্রের কাছে এসে ভাবনার স্রোত এলো কবির মনে।

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে; জানি না কে এইখানে শুয়ে আছে কি না—

: সপ্তক

প্রথম পংক্তি থেকে পাঠকের সমস্ত প্রত্যাশাকে মুহূর্তে মুহূর্তে পরাভূত করে চমকপ্রদ নূতনত্বের স্বাদ দিয়ে তৃপ্ত করতে করতে ভাব ও ভাবনা পরের পংক্তিতে গড়িয়ে চলেছে। দিনের শেষে যে অন্ধকার নেমেছিল সেই অন্ধকার আবার আলোর আবেগে যেমন জেগে ওঠে; দিনের ক্লান্তির শেষে রাত্রির বিশ্রাম, রাত্রির শয়ন থেকে পুনরাবর্তিত আলোর ঢেউয়ের মতো কেউ কি চলে যায় দূরবর্তী মেঘের আড়ালে। কল্পনার স্বর্গলোকে যীশুখ্রিষ্টের পুনরুত্থান হয়েছিল যেমন। অথবা সে কি মৃত্তিকার গভীরে জ্যামিতিক অস্তিত্বের মতো রয়ে গেছে? জ্যামিতিক শাস্ত্রে অন্তত তার কিছু উত্তর মেলে না। লুপ্ত বেড়ালের শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসির মতো এক জাফরান আলোকের বিশুদ্ধতা সন্ধ্যার আকাশের বুকে লেগে থাকে শুধু।

ছোট ছোট কবিতায় এমন ভাব ও রসের বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্যের এটাই সম্ভবত কারণ যে, এইসব মনোকণিকার সৃষ্টিতে তাঁর সামগ্রিক প্রয়াস ও হৃদয়ের ভালবাসা ছিল। কবি যখন এদের ছোট বলে উপেক্ষা করেন নি, আমাদেরও এগুলিকে অবহেলা করার অধিকার নেই।

সুদর্শনা ও অন্যান্য

জীবনানন্দের কোনো নতুন কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ কাব্য-প্রেমিকদের কাছে নিঃসন্দেহে আনন্দ সংবাদ। তাই যাঁর অনলস উদ্যোগে ও শ্রমে 'সুদর্শনা' প্রকাশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের সেই তন্নিষ্ঠ সেবক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র রায় সকলের অকুণ্ঠ ধন্যবাদার্হ। আরও আনন্দের খবর শুধু এই বইয়ের চল্লিশটি প্রেমের কবিতাই নয়, নানা গ্রন্থাগার ও ব্যক্তির সংগ্রহ ঘেঁটে ও অন্যান্য জীবনানন্দ অনুরাগীর সহায়তায় আরো শতাধিক কবিতা তিনি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর লেখা জীবনীগ্রন্থ 'জীবনানন্দ'-এর পরিশিষ্টে সতেরোটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যাশা করা যায় বাকি কবিতাগুলি এক বা একাধিক সংকলন গ্রন্থে অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে।

এসবই সুখের কথা। এবং 'সুদর্শনা'র কবিতাগুলি পড়ে আমরা যে পরিতৃপ্ত হয়েছি একথা বলারও অপেক্ষা রাখে না। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৪ সালের নিকটবর্তী সময়ে রচিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এইসব কবিতা যদিও কবি কর্তৃক পরিমার্জিত হবার সুযোগ পায়নি তবু জীবনানন্দের পরিণততম চিন্তা, উপলব্ধি ও কাব্যশৈলীর প্রকাশ যে এতে হয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। 'বেলা অবেলা কালবেলা'তে ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতা ছিল। এই বই শুধু যে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র সমকালীন ও সমান্তরাল তাই নয়—এতে জীবনানন্দের জীবনের শেষ চারটি বছরের (১৯৫১-১৯৫৪) বেশ কিছু কবিতা বিধৃত হয়েছে, যে অধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত বিরল সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ পাঠকদের এতদিন অপরিজ্ঞাতই ছিল। সুদর্শনার প্রকাশে এই আমলের প্রেম সম্পর্কিত কবিতার বিকাশ আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম।

কিন্তু সে আলোচনার আগে ব্যক্তিগত একটা আক্ষেপের কথা উল্লেখ করি। জীবনানন্দের যে কোনো গ্রন্থের প্রকাশকালে সাধারণভাবে সম্পাদক প্রকাশকদের যত্ন, সুরুচি ও সংযমের পরিচয় পেতে আমরা অভ্যস্ত তার অভাব এখানে আমাদের যথেষ্ট বেদনা দিয়েছে। প্রচ্ছদের অত্যন্ত অপটু অঙ্কন বা পরিকল্পনা থেকে তার শুরু। আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-সজ্জা, সূচীপত্রের পরেই বাগ্-বহুল বিস্তারিত ভূমিকা আমাদের সুখী করতে পারেনি। 'মহাপৃথিবী'র সিগনেট সংস্করণে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সূচনায় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সংযোজিত কবিতাগুলি সাজিয়ে দিয়েছিলেন এবং গ্রন্থের পরিশেষে আপন বক্তব্য 'সম্পাদকের নিবেদন' শিরোনামায় সংযত সংহতভাবে লিখেছিলেন, দুঃখের বিষয় তার পরিচয় এতে মিললো না। কবিতার বইয়ের ভূমিকায়, কোন পত্রিকার সন্ধান কোথায় পাওয়া গেল বা গেল না তা সম্ভবত আলোচ্য নয়। এর মধ্যে উপস্থাপিত চিঠিগুলি এবং তার বিশ্লেষণ যদিবা জীবনীগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো—এখানে তার সন্নিবেশ অবান্তর। জীবনানন্দের কবিতা পরিমার্জনের নেশার উল্লেখ করলেই আমাদের মতে পর্যাপ্ত হতো। জীবনানন্দের কিছু কবিতার নামকরণ অন্যেরা করেছেন তা কি সম্পাদক মহাশয় মূল পাণ্ডুলিপি দেখে নিশ্চিত হয়েছেন? নইলে 'কোনো ব্যথিতাকে'

প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ও অযুক্তিসিদ্ধ। যাই হোক, সম্পাদকীয় ভূমিকা এক পৃষ্ঠার বেশি হলে বইয়ের পরিশিষ্টে দেওয়াই শোভন ও সঙ্গত হতো। আমরা আশা করবো এই বইয়ের ভবিষ্যৎ সংস্করণের সময়ে এবং অন্যান্য সংকলন গ্রন্থের প্রকাশকালে শ্রদ্ধেয় গোপালবাবু পাঠকদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন।

গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির বিন্যাসে গোপালবাবু সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত বিষয়ক্রম অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। অভিনিবেশী পাঠে প্রতীত হবে এর সব কটি কবিতাই যে প্রকৃতপক্ষে প্রেমের কবিতা—একথা বলা যায় না। এবং তাঁর এই বিন্যাসরীতিও সুফলপ্রসূ হতে পারেনি। বিষয়ের যত বৈচিত্র্যই থাক যে কোনো কবিতা গ্রন্থ আগাগোড়া পড়ে গেলে একটা ভাবের বিকাশ আমরা অনুভব বা প্রত্যাশা করি। যেহেতু এটি প্রেমের কবিতার বই সেজন্য অন্তর্লীন যোগসূত্র রচনা সহজ সাধ্য ছিল। কিন্তু স্থূলভাবে বিষয়বিন্যাস করতে গিয়ে সম্পাদক মহাশয় ভুল করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেননি যখন রচনাগুলির কালগত ব্যবধান এত বেশি তখন তার ভাব ও বিষয় ভঙ্গিগত বিকাশের দিক থেকে সাজালে পাঠকরা আবো বেশি তৃপ্তি পেতে পারতেন। গ্রন্থের নামকরণ বিষয়েও সম্পাদক নিষ্প্রয়োজনে নানা কথা বলেছেন। অভিনয় কলায় 'নেপথ্যে-বিধান' বলে একটা কথা আছে তার সার্থকতা এই প্রসঙ্গে বারবার মনে পড়ছে।

'সুদর্শনা'র কবিতাগুলিকে যদি মোটামুটি কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় তবে তার মধ্যে জীবনানন্দের প্রেমভাবনার বিকাশ ও বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর 'আজ (২)' 'ফসলের দিন' প্রভৃতি কবিতায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেম কবিতাগুলির অনুরূপ ভাব ও ভাষার বিন্যাস লক্ষ্য করা যাবে। সেখানে কবির প্রেমিকসত্তা যে নারীর কাছে প্রেমের আর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেই বধির বিমুখ নারী অন্য পথগামী। কবি অনুভব করেন হয়তো অন্য কোনো প্রেমিকের উদ্দেশ্যে সেই ঈপ্সিতার অন্তরে প্রেমের উৎসার হতে পারতো, কিন্তু আজ দুর্দশা-চক্রে তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে নিষ্প্রেম ও উদাসীন। তাতে দুঃখ নেই। কেননা নারীর প্রেম শুধু প্রেমিকেরই লভ্য। কিন্তু যে হৃদয়বত্তা পুরুষ মাত্রেরই প্রত্যাশা তাও কেন দুর্লভ হলো? অথচ একদিন তো এই নারীই প্রেমের দাক্ষিণ্য নিয়ে এসেছিল। আজ আর সেই দয়িতামূর্তিতে সে ফিরবে না, তবু কালের মহিমায় নূতন চেতনার ঐশ্বর্যে নবীন প্রেমিকের মতো তিনি ফসলের গন্ধে ভরে উঠেছেন।

এর পরের স্তরের কবিতার নমুনা হলো 'এখন এ পৃথিবীর' এবং 'নদী নক্ষত্র মানুষ'। এ পর্যায়ের কবিতার সঙ্গে বনলতা সেনের প্রেমচেতনার মিল পাওয়া যাবে ;—বিশেষ করে 'দুজন', 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে। এখানেও হৃদয়ের 'বিষণ্ণ গোধুলিতে', আকাঙক্ষার সুতীব্র আবেশ যখন নষ্ট হয়ে গেছে নারী পুরুষ পাশাপাশি অঘ্রাণ প্রান্তরে নেমে এলো। নিসর্গের সান্নিধ্যে প্রেম ও বাসনার পুনরুন্মেষ ঘটলো তাদের ; তবু তারা অনুভব করলো, যে চেতনা অতীতে অর্থময় অভিব্যক্তি পেতে পারতো সেই প্রেম আজ দেহ থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে, হৃদয়কে অঙ্গীকার করে

প্রকৃতির মাঝে এসে দাঁড়ালে পুরানো ভালবাসা নূতন পথ কেটে নেবে এই আশ্বাস এই দুঃখী মানুষ দুটি খুঁজে পেতে চেয়েছে।

'হে জননী, হে জীবন', 'শবের পাশে', 'অন্ধকারে', 'চিঠি এলো', 'ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি কবিতায় 'সাতটি তারার তিমিরে'র সমান্তরাল অনুভূতি দেখা যায়। আরো পরের পর্যায়ের কবিতার দৃষ্টান্ত হলো 'এই পথ দিয়ে', 'অন্তর বাহির', 'আলোকপাত', 'অনির্বাণ', 'স্বাতীতারা', 'রাত্রি ও ভোর', 'আমি'। অন্তিম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে 'তুমি আলো', 'তোমায় আমি', 'এসো', 'তোমায় আমি (২)', 'তোমার আমার', 'জল', 'কে এসে যেন', 'রশ্মি এসে পড়ে', 'হৃদয় তুমি', 'মনকে আমি', 'তুমি আজ', 'অনেক রক্তে', 'মরু তৃণোজ্জ্বলা', 'তুমি', 'কোনো ব্যথিতাকে','এখন ওরা', 'তোমাকে', 'শান্তি ভাল' ইত্যাদি। এই শেষ পর্যায়ে কবিতা কেমন নির্ভার, অনুভূতিঘন, সরল, ছন্দোময়।

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
চলেছ কোথায়।
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায়!
হয়তো আলোর ছায়া নেই;
আলো তুমি তবুও তো—
আলো তুমি ছায়ারও মনেই;
বাহিরে বিশাল ঐ পৃথিবীর জাতীয়তা অ-জাতীয়তায়
তুমি আলো।

: তুমি আলো

দয়িতাকে এইভাবে তুমি বলে সম্বোধন করা তাকে এমন আলোর সঙ্গে, জলের সঙ্গে, নদীর সঙ্গে সমীকৃত করে দেখা, কবিতার বক্তব্যের এমন মিষ্টিক উৎসার শেষ পর্বের বৈশিষ্ট্য।

ভাষার যে বিবর্তনের কথা বলেছি তাও কবিতার এই কালানুক্রম অনুসরণ করলেই বোঝা যায়। প্রথম পর্যায়ের 'আজ (২)', 'ফসলের দিনে' প্রভৃতি কবিতায় যে ধরনের কৃত্রিম কাব্যিকতা ছিল তার উদাহরণ :

১। আমার হাতের কাজ আজ রাতে **গিয়াছে ফুরায়ে**—

: আজ (২)

২। আমারে **বাসনি** ভাল তবু আজ ফসলের ভারে
নূতন ধানের গন্ধে **উঠিয়াছি** ফ'লে
নবীন প্রণয়ী আমি—পৃথিবীর কোলে!
চেয়ে আছি—আসিবে কখন!

: ফসলের দিন

কবিতার জন্য পৃথক কোনো পরিভাষা চাই না—এমন কোনো আপ্তবাক্যে জীবনানন্দের আস্থা ছিল না। তাঁর আজীবনের কবিতা তার প্রমাণ দেবে। যে কোনো উৎসজ শব্দচয়ন করে কবিতা লেখায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। ২নং দৃষ্টান্তে দেখা যাবে ছন্দের সৌকর্যার্থে কথ্য ক্রিয়াপদের পাশে সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও তাঁর দ্বিধা নেই। অথচ পরে ভাষা ব্যবহারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল রূপান্তর ঘটেছিল তার প্রমাণ :

৩। কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিল বাতি,
বলে 'আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী
তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে;

কে এসে যেন

ছড়ার ছন্দে লেখা বলেই যে এমন হয়েছিল তা নয়—

৪। রশ্মি এসে পড়ে—ভোর হয়,
ঝেঁজে ওঠে পানীতাপীদের গালাগালি ;
চারিদিকে মানুষের মৃত্যু হয় মাছির মতন ;
মনে হয় অন্তরীক্ষে সৃষ্টির মরালী
হয়ে যেতে—তুমি যদি সে রকমের আশ্বাসের দেশে
রয়ে যেতে ;

· রশ্মি এসে পড়ে

৫। বিষণ্ণতা : তাও নেই—পাতা ঝরবার
স্বর শুনি, ঢেউ নড়বার শব্দ পাই;
এই পৃথিবীতে যেন কিছু নেই আর।

নদী নক্ষত্র মানুষ

চিরাভ্যস্ত সাধু ক্রিয়াপদ যোজনার রীতি বর্জন করেছেন এখানে। এ পরিবর্তন শুধু দ্রুতলয়ের দলবৃত্ত ছন্দের জন্যই হয়নি। ধীরলয়ের মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দেও তিনি এই রীতি অনুসরণ করেছেন। কোনো কৃত্রিমতাই রাখতে চাননি বলে ৫নং দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে 'পাই' শব্দের অনুক্রমে পরের পংক্তিতে 'নাই' লিখলে যে অনুপ্রাসের শ্রুতিসুখকরতা পাওয়া যেত তাও সযত্নে পরিহার করেছেন।

'প্রেমের অর্থকে যথেষ্ট প্রসারিত না করলে 'সবার ওপর', 'কে এসে যেন', 'অনির্বাণ', 'ইতিবৃত্ত' বা 'হে জননী, হে জীবন'-এর মতো কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলা যায় না।

রস-পরিণাম

আগেই বলা হয়েছে কোনো বিশেষ কবিতা বা বিশেষ যুগের কবিতা দিয়ে জীবনানন্দের কবিকৃতির পূর্ণ বিচার করা যায় না। কারণ সেগুলি যেমন স্বতন্ত্র অনুভূতির কবিতা তেমনই সেই সব 'মুডে'রও আবার ক্রমবিকাশ ও ক্রমাভিব্যক্তি আছে। 'ঝরাপালকে'র কবি যেমন কালে ও মনোভঙ্গিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের সগোত্র, কাব্যকৃতিতেও তেমনই বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যের অনুসারী। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কল্পনার ঐশ্বর্যে তিনি আবার নূতন ঐতিহ্য সন্ধানী। 'রূপসী বাংলা'র গ্রামীণ সংস্কৃতিবোধ, 'বনলতা সেন'-এর ইতিহাসনিষ্ঠ প্রেম, 'মহাপৃথিবী'র নৈরাত্ম্য বিশ্বাস, 'সাতটি তারার তিমির'-এর আত্মবীক্ষণশীল ইতিহাসদৃক্ষা এবং মৃত্যুর অব্যবহিত প্রাগ্বর্তী আস্থা ও আশ্বাসের অনুভূতি—এর কোনোটাই এককভাবে সম্পূর্ণ নয়। সব মিলিয়েই জীবনানন্দের কবিসত্তার পরিপূর্ণ পরিচয়।

এমনি অখণ্ডদৃষ্টিতে যদি বিচার করি, তবে তাঁকে মূলত কোন রসের কবি বলে গ্রহণ করবো? আমরা দেখেছি তিনি প্রেমিক কবি, কিন্তু কখনো প্রকৃত প্রেমের কবিতা লেখেননি। আনন্দের বা ব্যথার গানও তিনি গাননি। অদ্ভুত রসের প্রতি তাঁর বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল। শকুন পেঁচা উট ব্যাঙ প্রভৃতি কদাকার প্রাণীরা তাঁর লেখাতে আদিকাল থেকে আসর জমিয়েছে। মৃত্যু, রক্ত, শিকার, ভ্রূণ কিছুই তিরস্কৃত হয়নি সেখানে। কোথাও কাঞ্চীবিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরেছে। কোথাও বা হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী জল চেটে নিয়েছে।

> শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
> শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর;
> এইসব ভয়াবহ আরতি!

অন্ধকার

> চোখে কালো শিরার অসুখ,
> কানে যেই বধিরতা আছে,
> যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
> নষ্ট শশা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
> যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
> —সেই সব।

: বোধ

জীবনের কোনো ঘটনাকেই কোনো অভিজ্ঞতাকেই তিনি কাব্যের জগতে এড়িয়ে যেতে নারাজ। এই জন্যেই তাঁর কবিতার বিশিষ্ট মনোভাবের সঙ্গে যাদের প্রাক্ পরিচয় নেই তাদের কাছে এসব কবিতা কেমনতরো লাগতো। হঠাৎ কোনো শব্দ বা প্রসঙ্গ এমনভাবে আসে যার জন্যে মনের প্রস্তুতি নেই। তাই প্রথমে কিছু কিছু আলোচক নির্মম হয়ে ওঠেন

তাঁর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাঁর মেজাজের স্বাদ পেলে এই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না। তাঁরা বোঝেন, সুন্দর কুৎসিতের প্রচলিত ব্যবহারিক মানদণ্ডে নয়, পৃথক বিশুদ্ধ রূপাত্মক বিচারেই এ সব প্রসঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে।

পূর্বাপর সর্বত্রই এটা অনুভব করতে হয় কবিতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা বিশ্বাস অনুভব ও অভিজ্ঞতা আমাদের মতো নয়। কবিতা তাঁর কাছে শিল্প নয়—সাহিত্যও নয় আদৌ। রিয়ালিজম্; আইডিয়ালিজম্, ন্যাচারালিজমের ছকটানা চিন্তার খোপে তাকে মেলানো যাবে না। এইসব তুচ্ছ বিতর্কের চেয়ে অনেক উপরের, অনেক দূরের জিনিস কবিতা। কি হলে কবিতা হয়—সে সম্পর্কে প্রাচীন কলাবিধিকে অত্যন্ত অপূর্ণ, হাস্যকরভাবে সংকীর্ণ মনে হবে এসব কবিতার স্বাদ পেলে। কবিতা জীবন নয়, জীবনের দর্পণ নয়, জীবনের ব্যাখ্যাও তাকে বলা চলে না—কবিতা জীবনের নব নব বোধ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যক্তির আত্ম-উদ্‌ঘাটনের রেখালিপি—অভিব্যক্তির অপ্রতিরোধ্য আবেগ অথবা আরো অতল অগম অস্পর্শ কিছু।

রিয়ালিস্টিক কবিতা লেখার মোহে অথবা শিল্প সৃষ্টির তাগিদে এই উপলব্ধিটি জীবননানন্দ বিস্মৃত হন নি। তিনি জানতেন বাস্তব জগতের অসুন্দর—কাব্যের জগতে অপাংক্তেয় নয়। কিন্তু তাকে স্থান করে দিতে গেলে জীবনের প্রগাঢ় অনুভবের মধ্যে অন্বিত করে আনতে হবে, তবেই তা সার্থক হয়ে উঠবে। অসুন্দরের সৌন্দর্য তার অসংশয় অস্তিত্বের মধ্যে, তার ব্যক্তিত্বময় স্থিতির মধ্যে। যে শক্তির বলে জগতে সুন্দরের পাশাপাশি তারা টিকে থাকে, আমাদের মনের মধ্যেও সেই শক্তির সঙ্গে তাদের সংলগ্ন করে দিতে হবে। তখন তাদের সেই অবিনাশী আত্মতা সেই অপ্রতিরোধ্য আগমনকে তুচ্ছ রূপের দোহাই দিয়ে রোধ করা যাবে না। তাদের অস্বীকার করতে গেলে আমাদের নিজের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে ওঠবে।

এইভাবেই পূর্বোক্ত বীভৎস প্রসঙ্গগুলো এসেছে বলেই আমাদের অন্তরের বিরূপতা ছাপিয়েও ভালোমন্দের অনুভূতি সরিয়েও তা সম্পূর্ণ চেতনা অধিকার করে বসে। লাসকাটা ঘরের গল্প যখন সাহিত্যে আসে তখন সুন্দর কুরূপের প্রশ্নই নয়—সে দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্বার, মোহময়। এই জন্যেই তথাকথিত রিয়ালিস্ট কবিদের মতো বস্তুরসের কাব্য লিখতে তাঁকে জোর করে রোমান্টিসিজম্ বর্জন করতে হয়নি, অথবা বস্তুজগতে হাতড়ে বেড়াতে হয়নি।

তবু জীবনানন্দ অদ্ভুত রসের কবি নন। অদ্ভুত রসের আবেদন আছে বলেই আমরা তাঁর কবিতা পড়ি একথা যথার্থ নয়। তাঁর কাব্যের মূলরস ঈষৎ বিস্ময় মিশ্রিত শান্তরস। ধীর লয়ের বাইশ অক্ষরের প্রবহমান পয়ার ও [illegible]ক ছন্দই তাঁর প্রতিভার প্রকৃষ্টতম বাহন। কবিতায় স্বরের বিশেষত দীর্ঘ স্বরের আধিক্য, প্রেমসম্পর্কীয় কবিতায় মিত-আবেগ স্বগতোক্তিও এই শান্ত মেজাজজনিত।

তথাপি শান্ত-রসকে কাব্যের মূলরস হিসাবে গ্রহণ করাতে আপত্তি ওঠা উচিত। মনে হয় যেখানে কাব্যগুণের কোনো কারণ দেখানো যায় না সেখানেই অগত্যা শান্তরসের কল্পনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ শান্তরসের কবিতা যদি রসোত্তীর্ণ হয় তবে তার মূলে অবশ্যই অন্য কোনো কারণ নিহিত থাকবে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেই

মূলরস প্রধানত 'রোমান্টিক' রস! সুদূরের মোহ ও সৌন্দর্যের অনুরাগ এই রোমান্টিকতার লক্ষণ। সৌন্দর্য মানে এখানে জাগতিক রূপসুষমা নয়, সঙ্গতি-সঞ্জাত রম্যানুভূতি। সুতরাং তথাকথিত কুরূপ যখন যথোপযুক্ত পরিবেশে স্থাপিত হয়ে সৌন্দর্যময় সঙ্গতি পেয়েছে তখন তাই সুন্দর হয়ে উঠেছে—তাই কবির কাব্যে আশ্রয় পেয়েছে। কেননা পরিণামী বিচারে জীবনানন্দের কবিপ্রাণ সৌন্দর্যেরই সাধক। তাঁর এই 'রোম্যান্টিক' মনোভঙ্গিই তাঁকে সুমিষ্ট নামের প্রতি, সুমিষ্ট নাম সম্বলিত বস্তুর মেঘসিঁড়ি, নীলডানা, হিজল, জলপিপি, বনঝাউ ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এই 'রোম্যান্টিক' রসই কখনো ইতিহাসচেতনায় কখনো কল্পনার ঐশ্বর্যে কখনো বাস্তব জীবনসম্ভূত মানব রসে বিলসিত হয়েছে। এই 'রোম্যান্টিক' রসই আবার পরিণতির ধাপে ধাপে 'মিষ্টিসিজমে' উপনীত হয়েছে।

কথাশিল্পী

কথাসাহিত্য

১৯৪৬ সালে একটি চিঠিতে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি জীবনানন্দ লিখেছিলেন : "আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্যপ্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস—স্বদেশী ও বিদেশী—নেহাৎ কম পড়ি নি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচে নি। শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও অবসরের অভাবে দানা বাঁধতে পারছে না। না পারছি মহৎ নাট্য-সমালোচকের নেতিবাচক নিরাশা ভঙ্গ করে তেমন কিছু নাটক লিখতে। এই দারুণ সংগ্রাম-কঠিন সময়ে নানারকম আধিজৈবিক দায়িত্ব মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকে তাতে সাহিত্যের কোনো একরকম অভিব্যক্তি (যেমন কবিতা) নিয়েই যতদূর সম্ভব পটভূমির প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো যায়, সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে। কিছু পরিমাণে এই জন্যই কবিতা লিখতে উৎসাহ পেয়েছি।"

'ময়ূখ' জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় উদ্ধৃত

জীবনানন্দের সাধ ও সাধনার একটা আভাস এ-চিঠিতে আছে মনে হয়। আর তাঁর প্রথম প্রকাশিত তিনটি গল্প ও একটি উপন্যাস পড়ে মনে হয়েছিল তাঁর এই ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার হওয়ার সাধ তাঁরই লেখা আগাগোড়া শরীরটা দিয়ে কানার তাঁত বোনার অভিলাষ বা নুলো শাঁখারীর হাতে করাতের কার্যকারিতা মাত্র নয়—এটুকু অন্তত বিশ্বাস হয়েছিল।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি **'জীবনানন্দ দাশের গল্প'** বইটি প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর বিভিন্ন সময়ের তিনটি গল্প—১৯৩২ সালের লেখা **'ছায়ানট'**, ১৯৩৬ সালের রচনা **'গ্রাম ও শহরের গল্প'**, এবং ১৯৪৭ সালের **'বিলাস'** প্রকাশিত হয়। গল্প ত্রয়ের সম্পাদকদ্বয় কোন দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প তিনটি নির্বাচন করেছিলেন তা বোঝা দুষ্কর। এই পৃথক পৃথক কালপর্বে জীবনানন্দ যে প্রচুর সংখ্যক গল্প লিখেছিলেন তার সংবাদ অথবা পরিচয় কি সম্পাদকরা জানতেন? এবং তার মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দ মাফিক তিনটি গল্প বেছে নিয়েছিলেন। নাকি আপন বোধ ও বিবেচনায় গল্পের প্রচলিত আঙ্গিকের পূর্ণতার দিকে কিংবা বিভিন্ন কাল-খণ্ডে রচিত গল্পের বৈচিত্র্য ও পরিণতির নমুনা হিসেবে এই গল্প ক'টি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। নাকি যে গল্প পেয়েছিলেন তাই ছেপেছেন?

এমনও হতে পাবে জীবনানন্দের অধিকাংশ গল্পে যে পারিবারিক অর্থ-কৃচ্ছতা ও অশান্তি এবং দাম্পত্য অতৃপ্তির চিত্র আছে তার প্রকাশ তখনই যাতে জনসমক্ষে না ঘটে সে জন্যেই পরিবারভুক্ত কেউ সম্পাদক ও প্রকাশকদের গল্প তিনটি বাছাই করে দিয়েছিলেন। কেননা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে পত্রিকায় তাঁর গল্প উপন্যাসের

চাহিদা দেখা গেলেও কবিপত্নী কিংবা কবি-পরিবার তখনই এগুলির নির্বিচার প্রকাশে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জীবনানন্দের মৃত্যু। তারপর আরো ৪৪ বছর পেরিয়ে গেছে। আজও তাঁর মোট গল্প উপন্যাসের সংখ্যা, অন্তত গল্পের সংখ্যার সঠিক হদিশ মিলল না। জীবনানন্দ সমগ্রের দ্বাদশ ও সংযোজন খণ্ড পর্যন্ত তাঁর যা কিছু গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর সাহিত্য জীবনের তিনটি কালপর্বে প্রবল আবেগের সঙ্গে তিনি এগুলি লিখেছিলেন কিন্তু জীবৎকালে একটিও প্রকাশ করেননি। কল্লোল কালিকলমের অন্যান্য কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর মতো অনেকেই যখন কবিতার মতো কথা-সাহিত্যেও উত্তাল আলোড়ন তুলছেন, তখন তার পাশাপাশি জীবনানন্দও যে কথাসাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী হতে পারেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাঁর অনেক গল্পই আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে বিষয়ের মাহাত্ম্যে চিত্তাকর্ষক হলেও কেন তাঁর মৃত্যুর আগে একটি রচনাও আলোর মুখ দেখেনি এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। শ্রী সুনীলকুমার নন্দী অনুমান করে লিখেছেন যে তাঁর কবিতার অনুরাগীর সংখ্যা কবির জীবিতকালে যখন তেমন ছিল কিনা সন্দেহ, তখন চারপাশের এই অশিক্ষিত বেদরদীর ভিড়ে গল্প-উপন্যাসের উপস্থাপনায় তাঁর অভিমান-মিশ্র দ্বিধা আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

হয়তো এইজন্যই দেখা যায় তাঁর অধিকাংশ গল্পের নামকরণও তিনি করেননি। সব রচনাগুলি সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক প্রচুর। অনেক লেখারই বিষয়বস্তু এমন সাদৃশ্যযুক্ত যে, একথা মনে করা যেতে পারে, কোন লেখা অপর কোন লেখার পরিমার্জিত লিখন হওয়াও সম্ভব।

প্রায় প্রতিটি রচনায় পরিবর্তন পরিমার্জনের চিহ্ন আছে। হয়তো রচনাকালেরই কাছাকাছি সময়েই পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হস্তাক্ষর, ব্যবহৃত কালি বা পেন্সিলের লেখা কালক্রমে দুষ্পাঠ্য ও অপাঠ্য হয়ে গেছে। যাঁরা সম্পাদনা করেছেন তাঁরা কিছু কিছু শব্দ উহ্য রেখে গেছেন। কিছু বা ভুল রয়ে গেছে। নিবিড় পাঠে তা ধরা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পাঠান্তর উদ্ধার করা যায়নি বলে বর্জিত পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে।

যেমন 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থখানি কবি জীবিতকালে প্রকাশ করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে অবিকল সেকথা বলা যায় না। গল্পগুলির অধিকাংশেরই যে নামকরণ লেখক করে যান নি, তাতে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে ঐগুলি প্রকাশের কথা তিনি গভীরভাবে ভাবেন নি। প্রতিটি রচনার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার আগে আমরা তাঁর যাবতীয় গল্প-উপন্যাসকে স্তবক বিন্যস্ত করতে চাই।

জীবনানন্দের কথাসাহিত্য সৃষ্টিকালের প্রথম পর্বে যেসব প্রসঙ্গ পাঠকদের কৌতূহলোদ্দীপক মনে হতে পারে, বা আত্মজীবনের যেসব ঘটনা ছায়া ফেলে গেছে তার গল্প-কাহিনীতে সেগুলি হল—১৯১৭ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অনার্সের ছাত্র হিসেবে জীবনানন্দের পঠন-পাঠন। ১৯১৯ সালে অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে থেকে এম. এ. পড়েন। ১৯২১ সালে এম. এ. পাশ করার পরেও তিনি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে

থেকে আইন পড়তেন। তারপর ১৯২২ সালে সিটি কলেজে টিউটরের কাজ নিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৯২৮ সালে জীবনানন্দ সিটি কলেজের অধ্যাপনার কাজ থেকে অপসারিত হন। তখন কবি বেকার। কবির কনিষ্ঠ ভাই অশোকানন্দ উপার্জনশীল। টিউশন থেকে আয় এবং অশোকানন্দের অর্থসাহায্য জীবনানন্দের অভাব পূরণ করতো। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট কলেজে মাস তিনেক ইংরেজির অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে ঐবছরই দিল্লির রাজযশ কলেজে আবার তিনি অধ্যাপনার কাজ পান। এবং ১৯৩০ সালের মে মাসে শ্রীমতী লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের জন্য তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন। কিন্তু দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি আর ফিরে যান নি। কলকাতার হ্যারিসন রোডে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউসে থেকে তিনি কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩১ সালের তাঁর কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়। দীর্ঘকাল বেকার জীবনযাপনের পর ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে টিউটর হিসেবে জীবনানন্দ বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে যোগ দেন এবং পরের বছর লেকচারার নিয়োজিত হন।

গল্পের ধারা

প্রথম স্তবক

এই স্তবকের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ১৯৩১ সালের অক্টোবরে লেখা চারটি এবং নভেম্বরে লেখা সাতটি মোট ১১টি গল্প।

জীবনানন্দ সমগ্রের সপ্তম খণ্ডে প্রকাশিত **'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়'** শীর্ষক গল্পটি তাঁর লেখা প্রথম গল্প হতে পারে। এর রচনাকাল অক্টোবর, ১৯৩১। গল্পের নায়ক হিমাংশুর চরিত্রে লেখকের যে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে তাতে কোন সংশয় রাখেন নি লেখক। গল্পের প্রথম বাক্যটিই এইরকম—"বিনোদ নিজের জীবনের একটা গল্প লিখছে।" "নিজের জীবনের কথাই, নামগুলো মাত্র বদলে দিয়ে লিখতে শুরু করেছে সে।" বস্তুত জীবনানন্দের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বিষয় অবলম্বনে লেখা তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পেই নায়ক লেখক স্বয়ং এবং মুখ্য চরিত্রে তাঁর স্ত্রী নানা নামান্তরে ঘুরেফিরে এসেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট মেয়ে খুকু, খুকুন বা খোকন জায়গা করে নিয়েছে।

আলোচ্য গল্পে নায়ক হিমাংশুর বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমন্ত্রিত পূর্ব প্রেমিকা অরুণা তাকে পত্রে যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল তার মধ্যে তাচ্ছিল্য ও তামাশা ছিল। বিচ্ছেদজনিত কোন ব্যথা সে পেয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ হিমাংশু জানে সরোজিনীকে বিয়ের পর জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টাবে। আজকের ভাবনা-চিন্তাই মনে হবে তামাশা। অথচ চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়েও হিমাংশু না ছিঁড়ে তুলে রাখল।

ছয় বছর কলকাতায় সে কাজ করেছে, দিল্লি বা অন্যত্রও এক আধ বছর। এখন সে বেকার। কবে কাজ জুটবে কে জানে? হিতৈষীরা বিয়েতে সবুর করতে বলেছিল, কিন্তু অরুণার উপেক্ষা ও অবহেলা তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

অরুণার এই শেষ অপ্রেমের চিঠি যৌবনের অপচয়ের শেষে একটা শীতল সমন্বয়ে পৌঁছে দিয়েছে।

হিমাংশুর অভিযোগ, অরুণা মানতে কিন্তু প্রস্তুত নয়। হিমাংশু বলে, বিয়েতে অরুণা এলো কেন, এসেও এত পরিতৃপ্তি কিসে? আসলে অরুণা ভালোবাসেনি তাকে। অরুণার কথা হল, যদি তারই আগে বিয়ে হত, হিমাংশু কি তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করত? সংসারে নানারকম চাপে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মানুষকে কত কি করতে হয়। কিন্তু হিমাংশুর তবু ক্ষোভ, অরুণার ভালোবাসা গভীর হলে সংসারের চাপের চেয়ে বেশি চাপ সে সৃষ্টি করতে পারত। ভালোবাসার কি কোন মাধুর্য নেই? এই বিয়ের সাত বছর পরে হিমাংশুর বউ সরোজিনী আর মেয়েকে নিয়ে সে এখন শান্ত। অরুণারও বিয়ে হয়ে গেছে।

বিনোদ ওরফে হিমাংশু প্রেমিক বটে তবে আবেগপ্রবণ ও হঠকারী। অরুণাও সমাজ-পরিবেশ সচেতন ; সংযমের মূল্য ও বেদনা সে বোঝেনি। বর্তমানে কালের যথেষ্ট ব্যবধানে গল্প লিখলেও কোন মানস প্রশান্তিতে পৌঁছতে পারেনি। লেখকও কোনো শিল্প-সিদ্ধতায় পৌঁছে দিতে পারেননি। গল্পের পূর্ণতা তিনি হয়তো দিতেও চাননি। জীবনেরর নানা উত্তেজক অভিজ্ঞতাকে ধরে রেখেছেন ডায়ারির মতো, পরে হয়তো কখনো শিল্পরূপ দেবেন—এই অভিপ্রায় ছিল।

১৯৩১-এর অক্টোবরের আর একটি গল্প **'মেয়ে মানুষের ঘ্রাণে'**। এখানে নায়ক প্রবোধ ওরফে সুবোধ ইউনিভার্সিটি থেকে পাঁচ-ছবছর হলো বেরিয়েছে। দু-চার বছর কলেজে কাজ করেছে। ওকালতির চেষ্টা করেছে। লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েছে, আসামে ব্যবসার চেষ্টা—সব কিছুতেই ব্যর্থতার কাহিনী। চরিত্রগুলি উদ্ভট। প্রবোধের ভাগ্নী-জামাই বোথা জমিদারের ছেলে। বিপান, অমিয়াংশু, হরেনমাস্টার—সবই হতাশগ্রস্ত অস্পষ্ট চিত্রিত। বোঝা যায় জীবনানন্দের কাছে ছোটগল্পের সংজ্ঞা আলাদ। সেই সংজ্ঞা স্পষ্ট না হলে এইসব জীবনোত্থিত কাহিনী পূর্ণ ও সার্থক মনে না হতেই পারে।

এর পরের গল্প **'মাংসের ক্লান্তি'** জীবনানন্দ সমগ্রের সপ্তম খণ্ডভুক্ত ; রচনাকাল অক্টোবর ১৯৩১। বিষয় অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী অমূল্যর সাংসারিক বিড়ম্বনা।

নিছক গ্রামীণ পরিবেশে বিয়ের পর এসে শহুরে মেয়ে হেম খুশি হয়নি। গজগজ করছে। আলাদা পাকা বাথরুম করে দিতে হয়েছে, স্বামীযে সেখানে স্নান করবে এ হেমের অপছন্দ। হেমের মেজাজ আঁচ করতে পারেনা অমূল্য। চা করতেও বলতে ভরসা পায়না। ছ-মাস পরেও ছবিটা পালটালো না। একই সাবান, চিরুনি হেমের অরুচির ব্যাপার।

বিয়ের পরেই সন্তান হয়ে ধরেছে সুতিকা রোগ। সৌন্দর্য উবে যাচ্ছে, স্বামী অবহেলা করছে। এতদিন হেম নম্রতা সংযম ক্ষমা দেখায়নি কাউকেই : এখন অমূল্য ধর্মত্যাগ করে তাকে ডাইভোর্সের হুমকি দিচ্ছে। এ হয়তো কথার কথা, কিন্তু হেম সন্ত্রস্ত। উঠানের কিনারে একলা গান গাইছিল হেম, স্বামী ডাকছে শুনে তড়িঘড়ি ছুটে এসেছে। কেউ ওর গান শুনতে চায় না বলেই জামতলায় গিয়েছিল সে। সুতিকা সারছেনা। তার জন্য হেমের আকুতিতে একবার যথেষ্ট সেবা করেছে অমূল্য আর তার মা। কিন্তু হেমের অসহিষ্ণুতায়

আবার অবহেলা এসেছে। হয়তো আমৃত্যু শাশুড়ি ও স্বামীর দায়িত্ববোধের উপরর করুণার উপর নির্ভর করতে হবে হেমকে। অমূল্যকেও ভদ্রতা দেখাতে হবে। জীবনানন্দের লেখায় অনেকগুলি স্বার্থপর অসহিষ্ণু নববধূর কাহিনী মেলে। এখানে তার জন্য পর্যাপ্ত শাস্তি পেয়েছে হেম। তবে স্বামী শাশুড়ির করুণা বঞ্চিত হওয়া খুব রূঢ় ও নিষ্ঠুর। গল্পের বাস্তবতা থাকতে পারে। কিন্তু চরিত্র সৃজনে রুচি বা মহত্ত্বের দিশা মেলেনা। গল্পের পরিবেশনেও সৌন্দর্য ফোটেনি।

১৯৩১ সালের অক্টোবরে রচিত **উপেক্ষার শীত** গল্পটি জীবনানন্দ সমগ্রের দ্বাদশ খণ্ডে সর্বশেষ স্থান পেয়েছে। এখনেও কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়ের নায়ক-নায়িকারা যেন তাদের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত।

শরদিন্দুর বিয়ের চিঠি পেয়ে জব্বলপুর থেকে ট্রেনে স্টিমারে হাজার মাইল পেরিয়ে একা এসেছে অরুণা। শরদিন্দু তাই সব সময় তার কাছে এসে বসে থেকে লজ্জায় ফেলছে অরুণাকে। শরতের কোনো পরোয়া নেই। সে মনে করে নিন্দে কুৎসা এসব নিতান্ত সাময়িক। অরু বলে সবাইকে অগ্রাহ্য করে একা তার কাছে থাকলে অন্যরা ভাবে আমরা কেউ নই, জব্বলপুরী অরুই সব। তাদের অভিমানে লাগে। তাছাড়া শরদিন্দুর কি দরকার মিটবে অরুর কাছে এসে? যদি সকলের নজরবন্দী না থেকে খুব নিরিবিলিও থাকতে পেত ওরা, শরতের কি সাধ মেটাতে পারত অরু? বরং বাস্তব প্রয়োজন বুঝে শরৎ যে বিয়ে করছে এটাই ভালো। অরু এমনটাই চেয়েছিল।

শরদিন্দুকে অরু ভালোবাসে। আর কাউকে নয়। দুজনেই এটা জানলেও বিচ্ছিন্নতার পর্দা ঘোচে না। সারাজীবন প্রতীক্ষার পর যদি বা মেয়েটিকে পাওয়া যায় তখন কি শরতের প্রয়োজন থাকবে মেয়েটিকে? দরকারি জিনিস সময়ে মেলা চাই। বিয়ে জীবনকে ঢের কিছু দেয়। ভিতরে রেখেও বিয়ের অতিরিক্ত জীবনে পৌঁছে দেয় মানুষকে। জীবনের অনাবিষ্কৃত বিস্তৃত মননের মধ্যে পৌঁছে দেয়। তাই দাম্পত্যহীন ভালোবাসাকে ধরে রাখলে চলবে না। বিয়ে বন্ধ হবে না। কিন্তু তার আগে এই ক'টি দিনও খুব দামি। এ আর ফিরে আসবে না। কিংবা এলেও শরতের এ তৃষ্ণা থাকবে কি?

অরু ভেবেছিল শরদিন্দু বোধহয় আর বিয়েই করবে না। তাই নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে তার মনে হল বিয়ের প্রয়োজনের তুলনায় বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞার মূল্য নেই। এজন্যই তার উপরে অরুর বিশ্বাস একটুও কমেনি। বরং বিবাহিত বলেই নির্ভয়ে তাকে বিশ্বাস করতে পারবে এখন। যেদিন জব্বলপুরে বিশে পৌষ সবদিক বিবেচনা করে অরু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, শরদিন্দু বলেছিল, 'চুলোয় যাক সব'। নানাভাবে চেপে ধরেও মত আদায় করতে পারেনি। তখন তার ভীষণ কথা শুনে অরুর মনে হয়েছিল তখনই মরে গিয়ে সে তাকে নিস্তার দেয়। শরদিন্দু প্রশ্ন করে অরুকে বিয়ে করতে না পারলে সে তখন যা যা করবে বলেছিল অরু কি তা বিশ্বাস করেছিল? অরু জানায় সেদিন শরদিন্দু তা সত্যিই বলেছিল। আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতি। তাই শরদিন্দুর প্রত্যাশা মেটাতে না পেরে অরু খুব কষ্ট পাচ্ছিল। শরদিন্দুকে লেখা পরের চিঠিগুলোতে তাকে বিয়ে করার জন্য নানাভাবে প্ররোচিত করেছে। এজন্য বিয়ে স্থির হওয়ায় সে খুব খুশি। অরুণার খুশিবোধেই শরতের কষ্ট। শরতকে অরুণা

সত্যিই ভালবাসে। অথচ তার বিয়েতে দুঃখ পেল না, ঈর্ষাবোধ করল না। এটাই আশ্চর্য লাগে শরতের। অরুর বিয়ে হলে ভগবানের কথাতেও শরৎ স্বাভাবিক আচরণ করতে পারত না। ব্যথার অতলের অতল থেকে অরু কিভাবে শরতের বিয়ের রাতে স্ফূর্তি করবে, বৌদিকে নিয়ে মজা করবে? তার হিংসে হওয়া উচিত।

হিংসে কাকে? বিস্মিত অরুর এ প্রশ্নে শরদিন্দু বলে, সে কি তা বলে দেবে! প্রেমিকারা তা নিজেরাই খুঁজে পায়। অরু জানায়, শরতের কাছে কেন অভিনয় করবে সে! ভগবান জানেন, তাকে ছাড়া আর কাউকে সে ভালবাসে না। ঈর্ষা হয় তো পুরুষের স্বভাব-ধর্ম। পশুর মতো সম্পূর্ণ অধিকার করার আকাঙক্ষা। মেয়েদেরও থাকতে পারে। অরু তেমন বোধ করে নি।

শরদিন্দু বোঝে মেয়েটি যা দিতে পারছে না। তার অন্তরে সে জিনিসের জন্ম হয় নি। যে আসছে, হেমনলিনী, জীবনে অবসন্ন হয়ে শরৎ যাকে পছন্দ করেছে, সে কোনো পুরুষের অন্তরে প্রেম জাগিয়ে ছিল কি? অরুর মত ভালবাসা ভেবে শুধু মমতা দিয়েছিল? নইলে এমন স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করতে পারছে কিভাবে। অরুও একদিন কাউকে বিয়ে করবে এমন!

অরু বলে 'কি ব্যথা তোমাকে দিয়েছি জানি না। কিন্তু আজও বলছি আর কাউকে আমি ভালবাসিনি।' শরতের অস্থির জিজ্ঞাসা, সে কেন শরতকে দেখিয়ে আর কারো সাথে মিথ্যে ভালবাসার ভান করল না। বিস্মিত অরুকে বলে, এতেই তৃপ্তি পেত সে। খেলা শেষ হয়ে গেলে অরু বলত, অন্যকে ভালবাসার অভিনয় করে শরতকে এত ব্যথা দিয়েছে সে। তার বেদনার পরিপূর্ণতা দেখে তৃপ্ত হয়েছে। কারণ তার প্রেমের গভীর অতলটা সে অনুভব করতে পেরেছে। ব্যথার নরক থেকে মুহূর্তে আনন্দের বৈকুণ্ঠে শরতকে পৌঁছে দিতে পারতে অরু। তবু অরুর কাছে সে কৃতজ্ঞ। কেননা তার জীবনে অরু না এলে শরৎ প্রেমও বুঝত না, অপ্রেমও না।

অরু তাকে থামতে বলে। তার কথায় কষ্ট পায় অরু। জব্বলপুরে যেদিন শরবিন্দু এমন বকে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে আজকের একট মস্ত তফাৎ আছে। এই পার্থক্যই শরতকে স্থিরতায় পৌঁছে দেবে। আর অরুর সান্ত্বনা শরদিন্দু যাই ভাবুক, ভগবান জানেন, তা প্রমাণের রুচি তার নেই। নিজের জন্য সে ভাবে না। শরতের কথাই সে ভাবত। এত ঈর্ষা আর সন্দেহ নিয়ে সে কোথায় যাবে! শরৎ বলে ভালবেসে মানুষ নানা জিনিস চায়, নানারকম কষ্ট পায়। সেসব আকাঙক্ষা আর কষ্টের মানে অরু কোনোদিন বুঝবে না। অরু কিন্তু ভালোবেসে বরাবরই তৃপ্ত, আনন্দিত। একটা কষ্টই ছিল তার, শরতকে সে তৃপ্ত করতে পারেনি। কিন্তু যেদিন জেনেছে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সেদিন থেকে সে নিরঙ্কুশ আনন্দিত। একটা মানুষ তো শরতের কাছাকাছি চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে, তাকে খুশি করতে পারবে। একটা ভার কমে গেল অরুর।

অরুর এসব কথার উত্তর দিচ্ছিল না শরৎ। সে স্পষ্ট বুঝছিল মমতা ও দাক্ষিণ্য থেকে একথাগুলির জন্ম। করুণা মানুষের কষ্টের উপশমে খুশি হয়। কিন্তু ভালোবাসা একলা পৃথিবী জয় করে। সেই ভয়াবহ মাধুর্য অরুর থাকলে এ বিয়েতে নানা ঝঞ্ঝাট

ঘটত। কিন্তু অরু এসেছে, বিয়েতে সাহায্য করতে, বউ ভাতের মজা মারতে। এ প্রেম নয়, হৃদয়হীন দাক্ষিণ্য।

শরৎ জানে, বিয়ের পর সে আগের মত থাকবে না। হয়তো একদিন অরুকে আর ভালবাসবে না। অরুর তাতে হয়তো ক্ষতি বা কষ্ট হবে না। অরুর জীবনে তার ভালবাসার মতই সেও অনাবশ্যক হয়ে পড়বে।

শরদিন্দু বিয়ে করতে যাচ্ছে। ভালবাসার ড্রেনেজের জন্য সঙ্গী আনছে। তবু সব ফেলে ছড়িয়েও তার অন্তরে অরুর জন্য যে ভালবাসা উদ্‌বৃত্ত তা অরুর ভালবাসার চেয়ে ঢের বেশি। অরুকে অনাবশ্যক মনে হবার ঢের আগেই শরৎ অরুর জীবনে আগাছা হয়ে পড়বে।

প্রায়ই শরৎ অরুকে প্রশ্ন করতো সে বিয়ে করবে কাকে। অরু ওসব নিয়ে ভাবে না। অরুর কাছে আজ সে যা আছে, চিরকাল তাই-ই থাকবে। কিন্তু শরৎ কি তাকে সত্যিই ভুলে যাবে। বৌদিকে শরৎ প্রাণ দিয়ে ভালবাসুক। ওদের দাম্পত্য শান্তিময় আনন্দময় হোক। কিন্তু সেজন্য অরুকে ভুলে যাবার কোনো কারণ আছে কি? বোনের প্রতি ভাইয়ের মমতার কি কোনদিন শেষ হয়। এইটুকুই চায় মাত্র সে।

শরৎ ভাবে ভালবাসার জন্য উপযুক্ত বয়স চাই। তাতো শুধু হৃদয় ও কল্পনার রঙ নয়। দেহের উপরে প্রেমের ভিত। জীবনের যে সময়ে মানুষ এইসব দাবি সবচেয়ে বেশি মেটাতে পারে সে সময় দীর্ঘস্থায়ী নয়। শরদিন্দুর জীবনে সেই সঠিক সময়ে অরু এসেছিল। প্রেম বলতে যা কিছু বোঝায় সব সে অরুকে উজাড় করে দিয়েছে, দিচ্ছে। কিন্তু এরপর সে যে স্নেহ ও দাক্ষিণ্য চায় তাই দেবে। তার চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারবে না। প্রেমের বোধ, প্রয়োজন ও ক্ষমতা থাকবে না বলে।

হয়তো একদিন আসবে তারও প্রয়োজন থাকবে না। তখন উপেক্ষার শীতে ডুবে যাবে সব। তাহলে প্রেমের গল্প আর জমবে না। অরুর কোনো অভাব থাকবে না বটে— কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে তামাশাবোধ ছিল না কোনোদিন. তা এখনই জমে উঠেছে। ভবিষ্যতে ভালবাসায় সমস্ত আবেগ ও প্রাণ হয়তো এটাই সর্বাগ্রে নষ্ট করে দেবে।

অরুকে নিয়ে ভালবাসার গল্প জমল না। উপকরণ সব ছিল, মেয়েটি হল ভুল পছন্দের। এর আগে যে মেয়েটি শরদিন্দুকে ভালবেসেছিল, তখন পুরুষকে প্রস্তুত পায়নি। আর ভবিষ্যতেও প্রেমের গল্প জমবে না শরদিন্দুর জীবনে। কেননা উপযুক্ত মেয়ে এলেও প্রাণের সেই উপকরণগুলো আর থাকবে না।

অরুর ঘাড়ে মাথাটা রেখে স্তব্ধভাবে কর্তব্য অকর্তব্য ভুলে যাচ্ছিল শরদিন্দু। আস্তে আস্তে তার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে কুণ্ঠিতভাবে অরু বলল, 'অনেকক্ষণ তুমি আমার কাছে বসেছ— এখন যাও।'

বিবাহপূর্ব প্রেমের পরিণামী পরিস্থিতি নিয়ে অনুরূপ গল্প জীবনানন্দ কয়েকটাই লিখেছেন। কিন্তু প্রেম মনস্তত্ত্ব নারী মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ নিপুণতা দেখাতে পারেন নি। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পের হিমাংশুর মতই এগল্পের শরদিন্দু অবুঝ, আরোগপ্রবণ : কিন্তু তার বক্তব্য যুক্তি অরুকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিষণ্ণ করেছে। অরুণা

চরিত্রসৃষ্টি সুন্দর, শরদিন্দুও। বাস্তবিক বিয়ের আগে জীবনানন্দ কি কোনো মেয়েকে প্রগাঢ়ভাবে ভালবেসেছিলেন? প্রথমপর্বে ১৯৩১ সালের গল্পে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্রণই ছিল জীবনানন্দের রীতি।

১৯৩১-এর নভেম্বরে বিরচিত গল্প **'বিবাহিত জীবন'**। এ গল্পে বিয়ের পরে আগের প্রেমের উপলব্ধি রূপায়িত হয়েছে। এক অর্থে বলা যায় 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পটির ঠিক পরের স্তরের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে এখানে। এখানের নায়ক অজিত এবং নায়িকা সুপ্রভা ও সতী। জীবনানন্দ বিয়ে ব্যাপারটিকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন বা দেখাতে চেয়েছেন তা এ দুটি গল্পে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। যেন প্রেমিকার উপর আক্রোশ চরিতার্থ করতে অজিতের বিয়ে করা। সে আহত হোক, তার প্রাপ্য অধিকার অন্যে ভোগ করবে মনে করে ঈর্ষান্বিত হোক। কিন্তু উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যায় কেননা সুপ্রভার সঙ্গে সতী সুসম্পর্ক গড়ে নেয়। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি, তার কাজের মধ্যে অজিত কি স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্যশীলতা দেখাতে পেরেছে? সামাজিক বিয়ে যখন সম্ভব ছিলনা—অজিত ও সতী অবিবাহিত থাকতেই তো পারতো। এর পর সতীরও বিয়ে হয়েছে। সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে। এই নূতন বেদনার আবির্ভাবে পুরোনো আবেগ ফিকে হয়ে আসে। এই আমাদের জীবন। এই উপলব্ধি হচ্ছে অজিতের।

এখানেও আবেগপ্রবণ নায়ক তার হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রেমের সমাধিকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে সতীর চরিত্রে প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা এগল্পে বেশি।

জীবনানন্দ সমগ্রের প্রথম খণ্ডে প্রথম যে ছোটগল্পটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটির নাম **'আকাঙক্ষা কামনার বিলাস'**। গল্পটি রচিত হয়েছিল ১৯৩১ সালের নভেম্বরে। পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিতের সময় 'প্রতিক্ষণ' সম্পাদক গল্পের অন্তবর্তী কোন পঙ্‌ক্তি থেকে এই নামকরণ করেছিলেন। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পটির সঙ্গে এই গল্পের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আসন্ন বিয়ের আগে এত দিনের ভালোবাসার মেয়েটিকে একবার নিভৃতে একান্ত করে কথা বলার সুযোগ বঞ্চিত নায়ক প্রমথর বেদনা গল্পের কথা-বস্তু। বিয়ে উপলক্ষে আমন্ত্রিত প্রমথর বন্ধু শুভেন্দু কল্যাণীর পূর্বপরিচিত ছিল। বাক্যবাগীশ শুভেন্দুর স্থূল আলাপচারিতায় প্রমথর দুর্লভ প্রাপ্ত মুহূর্তগুলি অপচয়িত হল বলে খুবই ক্ষুণ্ণ প্রমথ।

প্রমথ কল্যাণীকেই ভালোবাসত, আজও বাসে। কিন্তু সমাজবিধি উপেক্ষার সাহস ছিল না বলে কল্যাণী তাকে বিয়ে করেনি। তবু কল্যাণীর দেহ-মনের মূল্য ও মর্যাদা প্রমথ চিরকাল দিয়েছে। আজ কল্যাণীর কাছ থেকেই একথা জেনে সে বিস্মিত যে, ভগ্নীপতি ললিতের সঙ্গে খুনসুটি করতে, ছ্যাবলামি করতে তার মন্দ লাগে না। অতএব শুভেন্দুর বেয়াদপিতেও কি আসে যায়? মেয়েটির শরীরের উপর এমন অব্যাহত অধিকার যার, তার একটি রোমের রস উপলব্ধির ক্ষমতাও কি আছে? বিধাতা এমনই অপ্রার্থিত জায়গায় তাঁর সুধার ভাঁড় ভাঙেন।

গল্পটি মন্দ হয় নি। প্রমথর আকাঙক্ষা ও কামনার বিলাস যে পূর্ণ হবার নয়, বাস্তব জীবনে স্থূল রুচির জন-সমাগমে সে যাকে গভীর মর্যাদা দিয়েছে সেই নারীও আপন মূল্য ও মর্যাদা অন্যদের কাছে না পেয়ে বিষণ্ন নয় এতটুকু। কে বলবে অপাত্রে ন্যস্ত

হয়েছিল কিনা প্রমথর প্রেম। নাকি বিনষ্ট প্রেমের জন্য নিজের কোন ব্যগ্রতা বা বেদনা বুঝতে দিতে চায় না কল্যাণী।

'নকলের খেলায়' গল্পটি রচিত হয়েছিল নভেম্বরে ১৯৩১ সালে। দরিদ্র স্বামী পরিচিত জনের সান্নিধ্যে অসুস্থ স্ত্রীকে হাওয়া বদলের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই হল এর বিষয়বস্তু। কৃচ্ছতা, বেকারত্ব মানুষের জীবনে যেসব বিষাদ মনক্ষুণ্ণতার কারণ হয়ে ওঠে—এই গল্পগুলি তার চিত্র মাত্র। মৃণালের মা বাবা নেই, স্বামীকে ছেড়ে কোথাও যেতেও চায় না সে। মৃণালের রূপ অক্ষুণ্ণ বটে, কিন্তু এমন রূপসীর যে মূল্যও মহিমা প্রাপ্য তাই বা কোথায় দিতে পেরেছে দেবব্রত? দিল্লীতে পরিচিত আত্মীয়তুল্য হরীন্দ্রবাবুরা আছেন, ধনী এবং হৃদয়বান। দেবব্রতর ব্যবস্থায় সেখানে মাস কয়েক কাটিযে এলে মৃণালেব শরীর মনের সমৃদ্ধি ঘটবে। রবীন্দ্রবাবুর ভাইপো অনাদি মৃণালের অচেনা নয়, আব তাঁব বাড়ির মেয়েরাও খুব চেনা। ওরা যদি যান সঙ্গে সিমলাতেও ঘুরে আসতে পারবে। দেবব্রত যাবেনা তাকে কলকাতায় চাকরির খোঁজ করতে হবে। দেবব্রত স্ত্রীকে পরামর্শ দেয় সেখানে গিযে স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে মিশতে মৃণাল যেন কোনো আড়ষ্টতা না রাখে, স্বামী স্ত্রীর প্রথাসিদ্ধ সম্পর্কের ছকের বাইরে সে নানা সম্পর্কের সম্ভাবনা থাকে তাকে স্বীকার করে নেবার কথা বলেছে। অবুঝ মৃণালকে জানিয়েছে নারীপুরুষের আদর ভালবাসা সোহাগ ধর্ম সে তেমনটি ভেরে রেখেছে তেমন কখনো ছিলনা। এখন একেবারেই নেই, স্ত্রী হলেও সেও স্বাধীন। নূতন অভিজ্ঞতা তাকে যেন স্তম্ভিত করে কদর্যরূপে দেখা না দেয়, প্রাণের থেকে একজনকে ভালবেসেছে আর কাউকে ভালবাসা চলবেনা এমন নয়। স্বামীস্ত্রীর ভালবাসার মধ্যেও—মানব সম্পর্কের এই উপলব্ধির কথাটুকুই এগল্পে অভিনব—যদিও তা তত্ত্বমাত্র—জীবনে বিকশিত হয়ে উঠেছে লেখক তা দেখাননি।

পরবর্তী গল্প **'মা হবার কোনো সাধ'** জীবনানন্দ সমগ্রের সপ্তম খণ্ডের কাহিনী ১৯৩১এর নভেম্বরের রচনা। বিরূপ সংসারে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে দরিদ্র বেকার স্বামীর বিড়ম্বনা।

অদৃষ্টের পরিহাসে প্রথম বিয়ের পরেই চাকরি পাবে প্রত্যাশায় বিয়ে করে বাস্তবিক চাকরি পেলনা। চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় অনেক ঘোরাফেরা করে প্রথম শেয পর্যন্ত একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেশে ফিরলো। নিয়োগপত্র পর্যন্ত পেয়েছিল সে। খুব সুস্থির মনে স্বামীস্ত্রী একসাথে মিশতে পেরেছিল। সন্তানটি তারই ফসল।

কিন্তু এরপরেও কাজ পেলনা। যোগ দেবার তারিখ পিছিয়ে প্রথমে টেলিগ্রাম এলো। তারপর জানানো হলো নূতন লোক নেবার সামর্থ্য তাদের আর নেই। যাই হোক এই অসুখী দম্পতি দরিদ্র বলেই পরিজনের পরিহাস টিটকারির পাত্র হয়ে রইল। জমিদারতনয় হলে ভাগ্যবিধাতার এই দান আন্তরিক সমাদর পেতো। অভিমানী শেফালী নিরবিচ্ছিন্ন বেদনাই পেল এর ফলে। আত্মীয় স্বজনের ভয়ঙ্কর শাস্তির চেয়ে শেফালীর দেওয়া অকথিত শাস্তিই বড় মনে হলো প্রমথর। শেফালী ব্যথার উপশমের চেষ্টায় কলকাতায় গিয়েও কিছু পারলোনা সে। শুধু শেফালীর চিঠিতে তার দুঃখ ভয় সাধ, স্বপ্ন প্রকাশ হতে থাকলো। পূর্ণিমার দিন টেলিগ্রাম এলো, মেয়ে হয়েছে কিন্তু মা চলে গেছে।

প্রমথ মেয়েটিকে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেবে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নগ্ন বাস্তবতা নিয়ে এই কাহিনী।

'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা' এমন এক সংসার চিত্র। নিজের জীবনে ব্যর্থ প্রেমিক সত্যব্রত বোঝে প্রেমহীন দাম্পত্যের তুচ্ছতা। কিশোরী বোন মাধুরীর জীবনে পরিবর্তনের কুহক আসন্ন অনুভব করতে পারে সত্যব্রত। জ্ঞানবাবুরা দেশে গেলেন ছেলে বিনয়েশ বাংলোয় থেকে যায়, তাদের বাড়ির গ্রামোফোনে রেডিওয় বাছাবাছা গান বাজে। বিনয়েশ শুনছে। কিন্তু মাধুরী দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে শুনতে শুনতে আঁচলে চশমা মুছছে। বিনয়েশ মাধুরীর হৃদয় রক্তাক্ত প্রেম প্রণয়তায় দাঁড়াতে হয়তো দেরি আছে।

প্রতিবেশী মথুর বাবুদের দারিদ্র্য শত চেষ্টাতেও ঘোচেনি, তাঁর ছেলে অসিতও চেষ্টা করবে, তার প্রেমে আত্মপ্রত্যয় আছে কি? সাহস স্বাধীনতা? সত্যব্রতর এইসব অনুমানের বেড়াজাল ভেঙ্গে খাঁটিখবর এনেছে তার স্ত্রী সাধনা। কি লজ্জা ও কলঙ্গের কথা মাধুরীর ডায়েরি থেকেও জানা গেছে তার ভালবাসার কথা। কিন্তু ভালবাসার ধারণা ও প্রতিদান সম্পর্কে দায়িত্বহীন সংকীর্ণতা ও অনুদারতা প্রেমের পরিণতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। সংসারের শৃঙ্খলা মেনে লজ্জার আড়ষ্টতা কাটিয়ে সে প্রেমিক শীতাংশুর চিঠির উত্তরটুকুও দেয়নি। তাকে প্রতীক্ষার অন্তহীনতায় দাঁড় করিয়ে নিজেকে সফল ও গর্বিত মনে করেছে।

মাধুরীর বন্ধু অনুপমাকে ভালবেসেছিল সত্যব্রত। তারই ভাই শীতাংশু। সত্যব্রত ভালবাসার কথা জেনে স্তম্ভিত মাধুরী, তারা প্রশ্ন অনুকে ভালবাসতে যাবে কেন সত্যব্রত? সত্যব্রত সাহস ছিলনা। প্রেমকে সফল করে তোলার। মাধুরীও শীতাংশুর চিঠির কোনো উত্তর দেয়নি মায়ের নিষেধে, কেননা বাবা কাকাদের ও দিকে অনুমতি হবেনা। তাই শীতাংশুর ভালবাসা আন্তরিক জেনেও, মাধুরীর মনে হয়েছে ভালবেসেই তার তৃপ্ত থাকা উচিত। সে মনে করে তার ছোটবোনের সঙ্গী অনুপমাকে বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও সত্যব্রত কেন ভালবাসবে? ঠিক তেমনি মাধুরীর কথা 'উনি (শীতাংশু) আমাকে অমন করে ভালবাসতে এলেন কেন?' এই সমাজ-ভীরু সব মেনে প্রেম করার বিষয়টিকে ব্যঙ্গ করেছেন লেখক এগল্পে। এমন সামাজিক নারী কখনো প্রেম করতে পারেনা।

১৯৩১ নভেম্বরে লেখা সপ্তম খণ্ডের গল্প প্রেমিক স্বামী। নিজের স্বামীও স্বজনকে ছেড়ে, অন্যদের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের খিদমদগারি করার গ্লানি এগল্পে বর্ণিত। মলিনা ভেবেছিল মীরা ছুটু তার বড় ঘনিষ্ঠ ও আপনজন। মীরার বাবা প্রভাতের জেঠামশাই সপরিবারে দিল্লি যাবেন কয়েক মাসের জন্য তিনি মলিনাকেও নিয়ে যেতে চান। ভুজঙ্গ বাবুর প্রস্তাবে উৎফুল্ল মলিনা।

প্রভাত মলিনাকে ভালবাসে, আর তাই দারিদ্র্য বশত যে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেনা তার অন্তরায় হবেনা। দিল্লি যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে, মলিনাকে কাছে পাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। স্বামীর কাছ থেকে বিদায়ের আগে তাকে সান্নিধ্য দেবার কামনাও যেন নেই মেয়েটির।

যাত্রার দিন পিছিয়ে গেছে। প্রভাত শ্লেষের সঙ্গে বলে. 'মানুষের কবজি টিপতে, খুন্তি নাড়তেই তো তোমার জন্ম হয়েছিল। ভগবান বুঝে বুঝেই মানুষকে ঠিকঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে যান।' মলিনা ব্যথা পায়। তবু প্রভাত নিষ্করুণ। কেউ তো প্রভাতের খোঁজ

নেয় না, কিন্তু যে তার স্ত্রী, সে যাকে তেমন সম্মান ও আদর দিয়েছে সে স্বামীর কি পেয়েছে? বিশ্বসংসারের সকলের মন জোগাবার জন্য মেয়েটিকে আনা হয়েছে? নিজের দাম্পত্য সম্পর্কেও বা এত নিস্পৃহ কেন মলিনা? মলিনা কাতর কণ্ঠে বলে দুদিন পরে চলে যাব। অমন করে কথা বোলোনা। মলিনা বোঝাতে চায় এই যৌথ পরিবারের মধ্যে থেকে, অন্যের মন না জুগিয়ে চলা যায় না। প্রভাত যদি এর বাইরে মলিনাকে নিয়ে যেতে পারতো। বিয়ের পরের ভালবাসার নিবিড়তা দুজনেরই কমে গেছে।

যাবার আগে প্রভাত মলিনাকে নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে স্বাধীন মানুষের মত চলবার অধিকারের কথা স্মরণ করিয়েছিল। ওঁরা ভগবান সমাজধর্ম কিছুই জানেন না, নিজের ধর্ম নিজেই তৈরি করেন। মলিনা যদি ওদের কাছ থেকে ফিরে আসার প্রয়োজন বোধ করে তাহলে তার পরিবর্তিত জীবনের রূপ দেখে তৃপ্ত হবে প্রভাত।

দিল্লির চিঠি প্রায়ই আসে। পাঁচ মাস কাটলো। নিজের ভাগ্যকে পাল্টাতে পারলোনা প্রভাত। ভুজঙ্গবাবুরা মলিনাকে ছাড়তে চাননা। তাদের জীবনে সে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সমরের সঙ্গে সম্বন্ধেই মলিনার উন্নতি, আনন্দ বেশি। দিল্লি ঘুরে দেশে ফিরে এসেছে প্রভাত। সবকিছুই যথাযথ স্থির ভাবে চলেছে। যথাযথ স্থির ভাবে।

গল্পটি যেন 'নকলের খেলায়' গল্পের অনুষঙ্গী ও পরিশিষ্ট। দরিদ্র স্বামী প্রভাত এবং স্ত্রী মলিনার দাম্পত্য চিত্র এখানে আধুনিক এবং মুক্ত। তার প্ররোচনা এসেছে স্বামী প্রভাতের কাছ থেকে। কিন্তু এই পরিণামী প্রশান্তি, স্বামীকে সামনে পেয়েও নির্বিকার থাকা কি মলিনার পক্ষে সম্ভব? গল্পের সমাপ্তি ঠিক বিশ্বাস্য হলো না।

গল্পের ধারা

দ্বিতীয় স্তবক

১৯৩২ সালে জানুয়ারি মাসে রচিত হয়েছিল জীবনানন্দ সমগ্রের অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত **'পাতা তরঙ্গের বাজনা'** গল্পটি। মুসৌরি থেকে কলকাতায় ফিরেছে দেবেন। তার বালিগঞ্জে কেনা নতুন বাগান-ঘেরা বাড়িতে। অসুস্থ স্ত্রী মালতীকে নিয়ে চেঞ্জে গিয়েছিল। ব্যবসার নেশায় ফিরে এসেছে। আঠারো-কুড়ি বছর আগে মালতীকে বিয়ে করে দুই ছেলের মা বানিয়ে তার ভাঙা শরীর আর ঠিক করতে পারেনি দেবেন। জ্বর, টিউবার কিউলেসিস স্বাস্থ্যনিবাসে চেঞ্জে গিয়েও কিছু লাভ হয়নি। দেবেন চেঞ্জে গিয়ে নিজে পাহাড়ী মেয়ে বেছে নেয়। কলকাতায় নানা জাতের নানা মেয়ে। মালতীকে জানানোর দরকার বোধ করে না। কিন্তু এমন বাঁচার মধ্যে আস্বাদ আছে কিছু? অন্য মেয়েরা মাংসমাত্র, মালতী সুস্থ থাকলে তার সঙ্গে সহানুভূতি আবদার পরামর্শ জীবন কত সাধের জিনিস পেত। কিন্তু মালতী আর চেঞ্জে যেতে চায় না। তিনদিন পরেই সে মারা গেল।

আবেগপ্রবণ দেবেন কিছুদিন পিস্তল নিয়ে খেলেছে। এখন প্রশ্ন করে নিজেকে, লালসা বশে স্ত্রী থাকতেও কেন অন্য মেয়েদের খুঁজত? ঘৃণা ও ন্যাক্কার অনুভব করে।

প্রথম প্রথম মালতীর বিরহে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছিল। ক্রমে ব্যবসায় আবার মন বসল। রাত্রে শুরু করল বিচার বিবেকের বই পড়া। ডায়েরি লিখতে শুরু করল। একটা বই সে লিখে যাবে, যাতে গভীরতা থাকবে। এইভাবে দেবেন স্বাভাবিক হচ্ছিল। হঠাৎ দেবেনের চেয়ে বছর ছয়েকের বড় এক বিধবা মিস্ সেন বিশাল এক সেন্টিমেন্টাল চিঠি লিখে দেবেনকে বিচলিত করে তুলল। চিঠির উত্তর সে দিল না। থিয়েটার-বায়োস্কোপে মন বসাতে পারল না। ভুলতে পারল না যে সে মালতীর স্বামী।

কিন্তু শীত যেই এল, প্রকৃতির মধ্যে পাতা তরঙ্গের বাজনা। দেবেনের আবার চাপল আরমানী বাই। তারপর হঠাৎ এক সদ্‌বংশজাত, সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করে বসল দেবেন।

বিশাল বাড়িতে দ্বিতীয়া স্ত্রী অতসীর নিঃসঙ্গ লাগে। সে চায় বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে আসুক। ব্যস্ত দেবেন ভাড়াটের বদলে নিয়ে আসে আড্ডাবাজ আর্টিস্টদের। চায়ের আসরে এই মানুষগুলোর ভাষা সাধারণের থেকে আলাদা। কেউ কবি, কেউ শিল্পী। অতসী তাদের সযত্নে গান শোনায়। সুন্দরীর পাশে বসে নিজেকে সুকুমার অনুভব করে সুন্দর। বছরখানেক পরে সুকুমার খবর পায় অতসীর একটি ছেলে হয়েছে। মনে পড়ে বসন্তের দুপুরে ড্রেসিং-রুমে তাদের চায়ের আসর। কিন্তু অতসীকে সুকুমার আর ধরতে পারে না। দেবেনকেও না। তারা দুজনে মিলে গেছে থিয়েটারে কিংবা রেসকোর্সে।

একদিন অতসীকে দেবেনের সঙ্গে সে দেখল। মোটরে চলেছে। দেবেন স্থবির, কুৎসিত, তৃপ্ত, আকাঙ্ক্ষাহীন আর অতসীর মধ্যেও আগের সেই অব্যবসায়ী সৌন্দর্যও আর নেই। ঐ লোকটির পাশে বসে সেও তৃপ্ত যেন। সাংসারিকভাবে সুন্দর।

আর্টিস্ট হিসেবে সৌন্দর্যের এই বিকার সুকুমারকে ব্যথিত করে। মনে হয় তারই একটা কবিতা কেউ কালির আঁচড়ে ভরে দিচ্ছে।

এই গল্পের আদ্যন্ত তো একটা পরিকল্পনার মধ্যে আসা দরকার। এখানে তা কোথায়? অনেক চরিত্র—মালতী, দেবেন, মিসসেন, অতসী, সুকুমার, বিচিত্র তাদের পরিস্থিতি পৃথক, রুচি, নানাধরনের চাওয়া পাওয়া। সবই আছে, বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে। গল্পের পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেনি। তবে চরিত্র সৃষ্টি মন্দ হয়নি।

১৯৩২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে কৈশোরের প্রেম নিয়ে লেখা হয়েছিল **'মহিষের শিং'**। কাহিনীটি জীবনানন্দ সমগ্র সপ্তম খণ্ডে আছে। মানব চরিত্রের এক গভীর পরিচয় এখানে আছে। শোভনা হুজুগ ও আড়ম্বর-প্রিয় তবু কেন কে জানে কবিস্বভাব চারু শোভনাকেই চায়। আর রানির মধ্যে উদারতা সত্ত্বেও তাকে সে ভালোবাসতে যাবে না। নামকরণ মহিষের গোঁ হলেই ভাল হতো যেন।

এই স্তবকের তৃতীয় অন্তর্ভুক্ত গল্প **'আর্টের অত্যাচার'**। গল্পটিতে তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে বহুদিন পরে একত্রিত তিন সাহিত্যিক বন্ধুর আড্ডা। এখন তারা দূরে দূরে থাকে। তাদের পরস্পরের সান্নিধ্যে প্রকাশ পায় আত্মম্ভরিতা। জীবনে তারা আর সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে না।

এই তিনজনের অন্যতম নিখিলের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে রচিত দ্বিতীয় স্তর। কবি হিসেবে তার কৃচ্ছ্রতা, হতাশা, ব্যর্থতা, তার পেশা পরিবর্তনের অসম্ভবতা ইত্যাদি। তার ধারণা অন্য সমস্ত পেশা ভাতের ক্লেদের উপর দাঁড়িয়ে, অথচ নিখিলও দুটি অন্নের জন্য নীচ নিরুপায় প্রতারণার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কবিতা বা লেখক-বৃত্তি তাকে জীবন-সৌষ্ঠব দেয় নি।

গল্পের তৃতীয় স্তরে নায়িকা অমিতা। সে আর্টিস্ট। পেশা হিসেবে সে ছবি আঁকা নেয় নি। নিজের তৃপ্তিকেই সে চরম ভাবে। তার আর্ট সৃষ্টির কারণ ও প্রেরণা হল তার নিঃসঙ্গতা। অথচ এই নিঃসঙ্গতা এই কুমারী জীবন তার সৌন্দর্যহীনতা বা মেজাজের অশোভনীয়তার পরিণাম নয়। বহু পুরুষ তার পাণিপ্রার্থী। তবু সে অবিবাহিত রয়েছে। সে আঁকে শুধু প্রকৃতি-চিত্র। আর কিছু আঁকে না কেন? অমিতা বোঝাতে চায় জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই বলে সে ছবিতে অন্য কিছু ফোটাতে পারে না। অথচ পুরানো অনুভূতি তাকে প্রায় কাঁদিয়ে দেয়। লেখক এ গল্পে দেখিয়েছেন আর্টিস্টের সমস্যার মূলে পেশাদারী মনোভাব। আর্টকে বৃত্তি করতে গেলে এমন দুর্গতিই ঘটে। তাছাড়া গল্পের তিনটি স্তরের মধ্যে কোনো যুক্তিসিদ্ধ পারম্পর্য বা সামঞ্জস্য নেই।

১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারিতে রচিত জীবনানন্দ সমগ্রের অষ্টম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত **'বিস্ময়'** গল্পটি অস্তিবাদী গল্পের ধাঁচে রচিত। এসব গল্পের কাহিনী প্রসঙ্গে কি কেন ইত্যাদি প্রশ্ন অনর্থক। যেমন বরফ খণ্ডগুলি পাশাপাশি থাকতে থাকতে জমে অখণ্ড এক চাঙ্ হয়ে ওঠে তেমনি আর্টিস্ট-এর মনে বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলি অসংলগ্নভাবে মিশে গল্পের আকার দেয়।

ব্যর্থ লেখক সুবোধ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে শহরের পথে ঘুরছিল। রাত তিনটে তখন। মনুমেন্টের কাছে এক পোড়ো বাড়ির উপরতলা থেকে কে যেন ডাকল। তাকাতেই দেখতে পেল বাতাসে বন্ধ হয়ে গেল জানলা।

পরদিন বিকেলে ঐ বাড়িতে গেল খোঁজ নিতে। কে এক তারাপদ মজুমদার ও তার স্ত্রী ওখানে থাকত, আজই বাড়ি খালি করে কোথায় গেছে কেউ হদিশ দিতে পারল না। যে জানলাটা বন্ধ হয়েছিল তার কাছেই এক গোলটেবিল ঘিরে ক'টি চেয়ার, বাইরে দেখা যায় সেই কলেজ, বছর দশেক আগে সুবোধ যেখানে পড়া সাঙ্গ করেছে। তার নিবিড় বেদনার সময় কে যেন তাকে ডেকে বলেছে আমি আছি। সে এক নিঃসঙ্গ নগ্ন মেয়ের মুখ যেন দেখেছে। পৃথিবীর পরিচিত কুয়াশাহীন স্থূল শরীরী মাংসের রহস্য মাত্র নয়। যেন সুন্দর ডোরার রূপসী বাঘিনী মানবী সেজেছে। অথবা শঙ্খচিলরা দুঃখের রাতে সৌন্দর্যের শেষ ক্ষোভ মিটিয়েছে সুবোধের মুখোমুখি। যেখানে সুবোধ এখন দাঁড়িয়ে ঐখানেই সে ছিল কাল। জানলাটা বাতাসে বন্ধ হয়েছিল।

জীবনের গভীর বেদনার সময় পৃথিবীর অসার অশ্লীল যুক্তিতর্ক এড়িয়ে এই মেয়েটি শুধু রইল সুবোধের মৃত্তিকাহীন প্রিয় জীবনের ক্রমান্বয়ে বিস্ময়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে। সুবোধের বাস্তবধর্মী উপন্যাসটা সম্পাদকরা নেয়নি। দার্জিলিং-এ এক রাজপুত্রকে তিন মাস পড়ানোর কাজ না নিয়ে অসহ্য গরমে সুবোধ কলকাতায় রয়ে গিয়েছিল

উপন্যাসটি লেখার জন্য। কিন্তু কলম তাকে কোন পুরস্কার দিল না। কিংবা দিয়েছে। নইলে এখনও আর একটি উপন্যাস লেখার বাসনা রয়েছে কেন?

তারাপদকে সতী বলেছিল পুরানো বাড়িটাই ভালো ছিল। রাস্তাঘাট আকাশ অনেক দূর দেখা যেত। তারাপদর মতে, এ-বাড়ি কত বড়, কত সুন্দর! শৈশব থেকে চেনা তারাপদকে স্বামী হিসেবে পেয়েছে সতী। কিন্তু ভালোবাসার মমতা মধুর তীব্রতা যেন মরে যাচ্ছে। সতীর কোন প্রেমিক নেই। স্বামীকেই সে ভালোবাসে। ঈর্ষা নেই, তৃতীয় কেউ নেই। তবু স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় যেতে ইচ্ছে হয় না তার। আর্টের ভক্ত হলেও সতী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু দেখতে চায় না। এক সময় অভিনয় করতে চাইত। আজও রাজি অভিনয় করতে। সতীর ধারণা, বাংলাসাহিত্যে তবু কিছু আর্ট আছে। তারাপদ তার খোঁজ রাখে না।

ময়দানে হাওয়া খাওয়ার নাম করে এনে তারাপদ সতীকে অনুনয় করে সিনেমা দেখতে। হলের মধ্যে বসে সারাক্ষণ সতীর মনে হয় পুরানো বাড়ির জানলার পাশে কে যেন আছে। যখন বাতাসে জানলাটা বন্ধ হল তারাপদ তাকে বিছানায় টেনে নিল। সিনেমা দেখতে দেখতে সতীর ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, বন-চালতার সবুজ খাঁজকাটা পাতার অজস্র রহস্যের চালতা ফুলের সুগন্ধি মসৃণ পাপড়ির রেণু মৌমাছির মত তার প্রাণ ঘিরে রয়েছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে উপন্যাস লেখা ছেড়ে মাসিমাকে স্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিল সুবোধ। তাদের ট্যাক্সি যখন এগোচ্ছে পাশ দিয়ে মোটরে কারা চলে গেল। স্টেশনে নেমে সতী তারাপদকে বলল, আজ ফিরে চলো। তারাপদ তার পাগলামিতে কান দিল না। নিজের ঘরে ফিরে সুবোধ চুরুট জ্বালালো। প্রতিদিন অনেক হাঁটতে হয়, ক্লেদাক্ত হতে হয়। তবু সুবোধ টিউশন ছাড়তে পারে না। দিনাজপুরের জমিদার হরিপ্রসন্নবাবু সন্ধ্যায় ব্রিজের আড্ডায় রেশের ঘোড়ার টিপস্ দেয়। সুবোধ তা নিতে পারে না। স্টেশনে সুবোধ চা-কাট্‌লেট খায়, তৃপ্ত হয়। কিন্তু বিষণ্ণতা তাকে ছাড়ে না। গাড়ির মধ্যে কত সুন্দর মুখ কিন্তু অনুসরণের ইচ্ছে জাগে না। রাত্রে মৃত ভাইয়ের স্বপ্ন দেখে সুবোধ। সে টাকা পাঠালে, টিউশন করতে হত না সুবোধকে। এমন প্রিয় স্বপ্ন যেন রোজ দেখে।

সন্ধ্যায় একটা মড়ার পিছু পিছু শ্মশান-যাত্রীদের সঙ্গে হাঁটছিল সুবোধ। ভাবছিল, আজ ঘুমোবে, লিখবে না আর। কাল টিউশনে যাবে না। মেয়েরা বারুণী-স্নান করে ফিরছিল। একজনের মুখ এমন সুন্দর—কিন্তু তার বদলে মৃতের খাটিয়ার পিছনে হেঁটে চলল সুবোধ।

যখন সতীর মুখের কাপড় খোলা হল, পীড়িত হৃদয়ের রক্ত ঝংকার দিয়ে উঠল। আর্টিস্টের নিষ্ফলতা শুধু নয়, আরো কিছু। একটা নিবিড় ঘুম তাকে ঘিরে ফেলতে লাগল। রহস্য, বিস্ময়, সৌন্দর্যস্বপ্ন রোমান্টিসিজম বোধ হয় এইসব গল্পের নাম!

১৯৩২-এর এপ্রিলে রচিত **'শাড়ি'** গল্পটির নামকরণ জীবনানন্দের করা। এটি অষ্টমখণ্ডভুক্ত। একান্নবর্তী পরিবারের উপেক্ষিত ভ্রাতুস্পুত্র রণজিতের শ্বশুরকুলের কোন আত্মীয়ের অভ্যর্থনা বা মর্যাদা নেই সংসারে। কিন্তু স্ত্রী উষার জেদ আত্মীয় পুত্র রমেনকে

সে আনবেই। তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ হলে রমেনকে আনার জন্য যে চিঠি উষা লিখেছিল তা ছিঁড়ে ফেলে। স্বামীর সঙ্গে কথা বন্ধ। সংসারে কাজকর্মও সে দেখতে যাচ্ছে না।

দাম্পত্য এই সমস্যায় রক্ষাকর্তা বাইরের মানুষজন। ফেরিওয়ালা ·বিশ্বেশ্বর শাড়ির ডালা নিয়ে বসল। উৎসাহ দেখাল রণজিৎই। অর্থ-কৃচ্ছ্রতার কথা ভেবে সে খদ্দরের প্লেন শাড়ি খুঁজছিল। শেষে প্রত্যাশা মতই মেয়েসুলভ দারুণ স্পৃহা নিয়ে উষা বাঘিনীর মত এসে দাঁড়াল। তখন রমেনের জন্য তার একরত্তি আগ্রহ বা ক্রোধ নেই। 'শাড়ি বাছবে পুরুষ মানুষ? তোমার কাজে যাও আমি বেছে নেব এখন।' বাঘ যেমন শিকার অধিকার করে রাখে। একখানা খাসা শাড়ি হাঁটু ও কোলের মধ্যে গুঁজে নিয়েছে উষা, হাল ফ্যাশনের শাড়ি দ্রুত আনার অর্ডার দিয়েও একটা মুর্শিদাবাদী সিল্কের জন্য ঝুঁকে পড়ল।

রণজিতের এখন থামাবার পালা। অন্ন-সংস্থানে জিব বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপত্তি করতে গলা কাঠ হয়ে গেল। বিশ্বেশ্বর ও উষার মিলিত আক্রমণ সে ঠেকাবে কিভাবে। উষা কি তার নিজের মানুষ! রুষ্ট স্ত্রীকে তুষ্ট করতে গিয়ে ফাঁদে পড়ে গেছে রণজিত। একি নারী সুলভ লালসা, নাকি আক্রোশ বসে প্রতিশোধস্পৃহায় প্রত্যাঘাত বোঝা গেল না। দুঃস্থ বেকার রণজিত কিভাবে বাঁচবে এ সংকট থেকে? এগল্পের নায়িকাও স্বার্থসর্বস্ব অবিবেচক পত্নী, জীবনানন্দের গল্পে খুব সাধারণ চরিত্র। যাইহোক প্রত্যাশা ও পরিণামের বৈপরীত্যে গল্পটি জমেছে।

এপ্রিল ১৯৩২-এর আর একটি গল্প **'হাতের তাস'**। প্রমথ শিক্ষিত যুবক কলকাতায় কলেজে অস্থায়ী পদে অধ্যাপনা করত। এখন বেকার উকিল। বাবা ভবতোষ বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তাকে ছানি কাটিয়ে ফের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য কয়মাস ছুটি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রমথকে বেশি যোগ্যতা আছে বলেই বাবার পদে অস্থায়ীভাবেও নেবে না।

সংসারের অবস্থা খুব খারাপ। ছোট অবিবাহিত ভাই প্রবোধ পঞ্চাশ টাকা করে পাঠায়, তাতে সংসার চলে। দুইমাসের ছুটিতে বাবা চোখের ছানি কাটিয়ে চেঞ্জে যাবেন, খরচ অনেক। প্রমথ সঙ্গে গেলে খরচ বাড়বে। জেলা স্কুলের টিচার নবীনবাবু প্রতিবছর বেড়াতে যান, সে তার সঙ্গে বাবাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। প্রমথ আইন পড়েছিল, উকিল হতে পারেনি। জার্মান ভাষা শিখেছিল, সম্পূর্ণ হয়নি। রাইনল্যান্ডের মতো লেখার ধরনে প্রমথও লিখতে পারে কিন্তু সে আর্টিস্ট নয়। তার স্ত্রী সুমিত্রা নিজেকে কেরানি শ্বশুর আর দজ্জাল শাশুড়ির পুত্রবধূ মনে করে। মেয়েও তাকে যন্ত্রণার একশেষ করল। তাদের দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা দূরের জিনিস। অথচ প্রমথর কোন প্রেমিকা ছিল না কখনো। সম্বন্ধ করে তার বিয়ে হয়েছিল। সে নাকি সেই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছে। শান্ত-মধুর-গৃহধর্মের প্রতীক্ষা তার পূর্ণ হল না।

মা হেমন্তশশী ছেলের বিয়ের পর থেকে তার প্রতি বিমুখ। সুমিত্রা শাশুড়ীর সম্মান রাখেনি, তাই তাঁর অভিমান। প্রমথ বোঝায় সুমিত্রার দিদির আই সি এস-এর ঘরে বিয়ে হয়েছে বলে এমন মানসিকতা। কিন্তু এত সহজে এই কৈফিয়ত হেমন্তশশীর গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আপন ঘরের পরিচ্ছন্নতার কথা তাঁকে বললে তিনি জানান "ঐ নিজের

ঘরদোরই, আমাদের এদিক ভেসে গেলেও আমাদেরই সামলাতে হয়।" উপরন্তু সুমিত্রা যেটুকু "খাটে হলো বেড়ালের মত তার জন্য রাগে ফোলে।" হেমন্তশশীর কথা হল, "বাছা এর চেয়ে তুমি খাটেই শুয়ে থাক, আমাদের শান্তি দাও।" প্রমথ বিদেশযাত্রার আগে শাড়ি না কিনে সুমিত্রার কটি শাড়ি ও শাল নিতে বলেছিল। হেমন্তশশী রাজি নন। তাঁর ক'গাছা সোনাব চুড়ি নিয়ে সুমিত্রা নিজের জন্য নতুন ঢঙেব ব্রেসলেট বানিয়েছে। বলেছে "ওতে সোনা ছিল নাকি আবার, ভেজাল।" বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া তিনটে গিনি দিয়েই নাকি বানিয়েছে ব্রেসলেট। ক্ষমা ছাড়া এর আর ওষুধ নেই।

মায়েরা চেঞ্জে গেছেন। অপারেশনে বাবার চোখ নষ্ট হয়েছে। প্রমথ ভাবছিল জীবন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে তার। হতাশা, বধূ নির্যাতন, আত্মহত্যার দিন চলে গেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ খেলোয়াড়ের ধর্ম নয়। যে তাস হাতে পেয়েছে তাই নিয়েই সে খেলে যাবে। অসুখী দাম্পত্য জীবনেও বিবাহবিচ্ছেদেব কথা ভাবেনি প্রমথ। সমালোচক অতীন্দ্রিয় পাঠকের ধারণা গল্পেব "এইসব স্ত্রীচবিত্রে হয়ত একটু অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব বলা যায় না।"

১৯৩২ সালের এপ্রিলে রচিত আর অষ্টম খণ্ডের গল্প **'কোন গন্ধ'** সার্থক গল্প হয়ে ওঠে নি। দুবছর সুধীশের বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী কাঞ্চনমালা বিবেচনাহীন, স্বার্থপর। শিশু-কন্যার প্রতি বাৎসল্য বশে এবং কর্তব্যেব তাগিদে মাযেব আত্মসর্বস্বতার মধ্যে ক্লান্ত সুধীশ সাবারাত জেগেছি। একদিকে স্ত্রী আক্রমণশীল, অন্যদিকে মা সবোজিনী চতুর, বিবেচনার ভাণ দেখাতে পটু। কিন্তু ছল করে দায এড়াতেও পারে বেশ। শেষ বাত্রে সুধীশ ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম যখন ভাঙল কেউ খোঁজ করেনি তাব চা চাই কিনা। পাশের ঘরে সেলাই কলের শব্দ। স্ত্রীর নয়, কেননা তার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে অন্যত্র। হয়তো সুধীশের বোন অনুপমা সেলাই করছে। তাকে চা দেবার জন্য বলবে কিনা ভাবতে ভাবতে সুধীশ দেখে বিস্মিত হল মেজশালী সুভা। সে রাত জেগে ট্রেনে এসেছে। এসেই সুধীশের বিছানা থেকে তার শিশু-কন্যা খুকিকে তুলে নিয়ে শান্ত করেছে, সুধীশের মশাবি তুলে দিয়েছে। তাব পরে এসে বসেছে সেলাইয়ে। এই যে সুভার সেবা ও বিবেচনা এই দুর্গন্ধ-কবলিত জীবনে যেন এসেন্সের গন্ধের মত প্রীতিপ্রদ মনে হয়। তাকে আবার চায়ের জন্য অনুরোধ কবতে সুধীশের বিবেকে বাধে।

বেশি বয়সের ভালবাসা শীর্ষক গল্পটি ১৯৩২ সালের এপ্রিলে রচিত হয়েছে। আভা টিচারি নিল। ভেবেছিল ব্যারিস্টার হবে। বাবা মারা গেলেন, টাকায় কুলালো না। তার দ্বিধা আছে খুব, কুঁড়েমি নেই। ভেবেছিল শিক্ষকতা ছেড়ে লেখা শুরু করবে,—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। কবিতাই প্রথম লিখল, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, কল্পিত কিছু নয়। ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে লিখল রাজনীতি নিয়ে, তবে বিদেশী-বর্জন নিয়ে নয়। কবি দেবেন সেন, গোবিন্দ চন্দ্র সম্পর্কে লিখবে। ময়নামতীর গানের মতো বাংলা আর নেই। দেবেন সেনের চেয়ে বাঙালিও নেই। একালের কবিরা ইউরোপীয় কাব্যের নানা ইজম্ নিযে মাথা ঘামায়। যেন এসব ছাড়া চিন্তা কল্পনার কিছু নেই।

মেজদা সুহৃদ বলে বাংলার আধুনিক কবিদের কাছে জর্জিয়ান কবিতা নিকটতর।

তাদের কাছে তাদের নিজের কবিতা এরই রূপান্তর। বিলিতি খিস্তি, ভালোবাসা, স্টাইল, ভাব, ভাষা। আভা প্রতিবাদ করে বলে ইংল্যাণ্ডে রেনেশাঁস যেমন শুধু ইতালির চোরাই জিনিস নয়, তেমনি আধুনিক বাংলা কবিতাও কন্টিনেন্টাল জিনিসের ফিরে ফিরতি নয় শুধু। আভা একসময় ভালোবাসার কবিতা লিখত। উপেক্ষা উদাসীনতার কবিতা। তারপর একদিন প্রেমিক ছেলেটির উপর মন বিমুখ হতে ঘাস, ফড়িং, হিজল, জোনাকি নিয়ে লিখেছে। এমন লিখে আমোদ পেত কিন্তু সেগুলি কবিতা হত কিনা বলতে পারে না। বছর তিনেক লেখা ছেড়ে দিয়েছে। কি নিয়ে এখন থাকবে সে।

না পড়েই সুহৃদ বলে, আভা যা কিছু লিখেছে সবই নিষ্ফল। সাতখানা ছাপানো বই, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা, প্রকাশক, মলাট, কাগজ, তারপর বোনের কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস সে আধঘণ্টাখানেক নাড়াচাড়া করল, নিভানো চুরুটটা খুঁজল। আভার মনে হল মেজদার এটা ভব্যতা নয়, হৃদয়হীনতাও নয় কি।

সুহৃদের মতে ১৩৩৭ সালে ছাপানো আভার শেষ বই। গত তিন বছর সে লেখেনি। আগের লেখার মধ্যে ছাপানোর যোগ্য কিছু নেই। এখন ১৩৪০। সুহৃদের স্তব্ধতা আভাকে আঘাত দেয়। সুহৃদ বলে, অনেক পরিশ্রমে অপচয়ে লেখক তৈরি হয় ; যেমন প্রকৃতির মধ্যে অজস্র পাখির নীড় ভাঙা ডিম, নষ্ট বীজ। আভা বুঝতে পারে না, বোনের লেখা সম্পর্কে সুহৃদ কি বলতে চায়। তা কি নষ্ট-নীড়, না তাতে প্রাণসম্পদ কিছু আছে। সুহৃদ খোঁজ নেয় বই-এর সংস্করণ হয়েছে কিনা, টাকা পেয়েছে কিনা। ইতিবাচক উত্তরে খুশি হয় সে। তাকে আরো তৃপ্তি দিতে আভা জানায় কবিতার বই নিজে ছাপালেও বিক্রি কিছু না হলেও গল্প লিখে টাকা মেলে। সারা জীবনে পাঁচশো গল্প, গোটা পাঁচেক উপন্যাস লিখলে কপিরাইট বেচে কত পাবে। ইউরোপে এইটথ্ রেট লেখকও হাজার গুণ বেশি পায়। লিখে কি লাভ?

আভা বিমূঢ়। অনেকদিন তার কলমে আগ্রহ নেই। কল্পনা ও আবেগের পুনরুত্থানের অপেক্ষা করছিল সে। তার আবেগ, শক্তি ও কল্পনা গ্যেটে, ভবভূতি, মিসেস হাম্‌ফ্রি ওয়ার্ড বা ব্যারেট ব্রাউনিং-এর মত? লিখে অনেকে কিছুই পায় না। অথচ শেক্সপিয়ার অনির্বচনীয়, ফ্লবেয়ার বা শরৎচন্দ্র কিছুটা সফল। আভা এদের কাছে ঢের হেঁট। বরং মেজদা যা বলছে লিখে লাভ নেই। সে কলম থামাল। আগে যেমন লিখত এখন তাও পারে না। এখন আনন্দও পায় না লিখে। আভা প্রেমে পড়েছিল পনেরোতে, চারবার ভালোবেসেছে। শেষ ভালোবাসা বাইশ বছর বয়সে, টেকেনি। এখন বয়স আঠাশ। সুহৃদ বলে ভালোবাসা বলে কিছু নেই। ছেলেবেলায় নির্বুদ্ধিতা বেশি, সেক্স অ্যাট্রাকশন কম, বড় হলে উল্টে যায়। ভালোবাসার নামে আমরা একে চালাই। যত বয়স বাড়ে, তত ভালোবাসা জমে, তাতে থাকে সন্দেহ, শ্লেষ, বৈদগ্ধ্য, ক্ষুধা, লাম্পট্য, উপেক্ষা, আক্রোশ, ঘৃণা। এগুলি প্রাণকে অভিভূত রাখে। জীবন আর কিছু চায় না।

ভোরে সুহৃদ বলল সন্ধ্যায় আভা যেন তৈরি থাকে, এক পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবে। আভা আশান্বিত। লোকটার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। ছিল ভ্যাগাবন্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে। ই. আই. আর. এ. চাকরি করে। ছ-সাতশ মাইনে। রুক্ষ মুরগির মত আভাকে কেমন

পায়রার মত মনে হচ্ছে এখন। এই কবিতা লিখেছে, সুন্দর কবিতা। এখন ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড সম্পর্কে কৌতূহলী। ভোরে আভা মার্কেট থেকে কিছু জিনিস আনাল ড্রয়িং রুম সাজাবে বলে। মেঝেয় বিছানো নিজের বইগুলো মাড়িয়ে চলে গেল আভা।

আসলে সুহৃদ আভাকে নিয়ে একটু খেলল, সন্ধ্যার সময় মেয়েটি ছটফট করবে, কেউ আসবে না। সুহৃদের মতই আভাকেও বুড়ি মাস্টার হয়েই মরতে হবে। ওদের জীবনে কোন জাদু নেই। বিধাতা তো দিনরাত মানুষকে নিয়ে খেলছেন। সুহৃদ আজ আভাকে নিয়ে খেলল। নূতন ধরনের গল্প। আভা সুহৃদ দুটি চরিত্রই আকর্ষণীয়। তবে গল্পটি পরিমার্জনা করলে ঔজ্জ্বল্য বাড়তো হয়তো।

বত্রিশ বছর পরে গল্পটি বরিশালে ১৯৩২-এর এপ্রিল মাসে লেখা হয়েছিল। এও দাম্পত্য সমস্যার গল্প। লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা। বাপের বাড়ি থেকে দেড় বছরের রুগ্‌ণ মেয়ে খুকুনকে সঙ্গে নিয়ে অভয়ের স্ত্রী ফিরেছে। অভয় শেষ খুকুনকে দেখেছিল তিন মাসের। তখন বরং ভালোই ছিল। এখন ঠ্যাং দুটো পাখির মত, দেহে চুনের অভাব, দাঁত উঠছে দেরিতে, পেটে লিভার। পৃথিবীকে সে মোটেই ভালোবাসে না। আগে বরং আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা, জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি পেত। এখন কেমন সে হয়ে গেছে। লিকপিকে স্বর্ণ খুকুনকে প্রসব করে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। তখনও এত দুর্গতি হয়নি। যদি তখন স্বর্ণ মারা যেত হয়ত ভালো হত। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে এত অবসাদ! অভয়ের কোনো প্রেমিকা ছিল না। নারীর যা কিছু সৌন্দর্য অভয়ের কাছে সমস্তই নিরর্থক। অন্য কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

টুকুনকে শিক্ষা দিয়ে কি লাভ। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বা মাদাম কুরী নাই হল। বড় হয়ে টিচারি করতে পারবে না। নিজের প্রয়োজন ও সমারোহ নিয়ে উজ্জ্বল পবিত্র কাঠিন্য নিয়ে তার মন গড়ে উঠবে। মেয়েকে মানুষ করা সম্পর্কে অভয়ের এমন ধারণা। কিন্তু তাকে মানুষ করতে গেলে তার নিজের জীবনের সুযোগগুলো খুকুনের পিছনেই খরচ করতে হবে। খুকুন রাতদিন বাবাকে ব্যাপৃত রাখে, কিছু করতে দেয় না। মাঝে মাঝে স্বর্ণ টুকুনকে ডাকে। টুকুন ইতস্তত করে। অভয় তাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ায়, পাখা ঘুরিয়ে ঘুম পাড়ায়। গরীব বলে তার সমস্ত দিন ভস্ম হয়ে যায়। তবু স্বর্ণ তুষ্ট হয় না। বড় কিছু সে নিজেও করে না। নিজের জন্য নরম বালিশ বেছে নেয়। অভয়কে দূরে সরে শুতে ও ঘুমোনোর আগে মশারি ফেলতে বলে। অভয় যদি বলে—কাল থেকে টুকুনকে আমার কাছে দিও না, বিবাদ বেধে যায়—দু'বছর ক'মুহূর্ত বিশ্রাম পেয়েছি শুনি। বাস্তবিক নিরবচ্ছিন্ন দেড় বছর সে মেয়েকে সামলেছে। অভয়ের কিছু বলার থাকে না।

অভয় বোঝে, স্বর্ণতো বাপের বাড়ি থেকে দারিদ্র্য আনে নি। অস্বাচ্ছন্দ্যে সে বিরক্ত, টুকুন কাঁদলে অভয়কে জোরে হাওয়া করতে বলে, যেন তার গায়েও হাওয়া লাগে। কলকাতা থেকে ফেরার পর আজই প্রথম অভয় স্বর্ণর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। পাপিয়ার ডাক কেশবতী নীলাম্বরীর সুন্দর শরীরের ওম অভয়কে উন্মনা করছিল। তখনই দরজায় ধাক্কা, মা ডাকছেন, 'অভয় ঘুমোচ্ছিস?' বিরক্ত স্বর্ণ ফিসফিস করে বলে দেয়, অভয় যেন বলে, স্বর্ণ ঘুমিয়েছে। অভয় বাইরে আসতে কমলেকামিনী জানান

মজুমদার বাড়ি থেকে লুচি, মাংস, মিষ্টি পাঠিয়েছে। গরমের রাতে নষ্ট হবে হয়ত। মাংসের লোভে স্বর্ণ উঠে আসে। খেয়ে তৃপ্ত সে। মশারির মধ্যে গুটুলি পাকিয়ে এইভাবে আড়াই হাজার বছর থাকতে পারে যেন।

অভয় ভেবেছিল বাইরে ক্যাম্প খাটে রাত কাটাবে। টুকুন কেঁদে উঠতে আবার মশারিতে আসতে হল। পাখা থামালেই সে কাঁদে। সারারাত জাগতে হল অভয়কে। মনে হল এতদিন মা কমলেকামিনীকে বোঝেনি অভয়। বোঝেনি স্বর্ণকেও। সন্তান প্রসবের অমানুষিক কষ্টের চেয়েও সন্তান পালন কি কঠিন। বত্রিশ বছর আগের আপন শৈশব অভয় দেখতে পাচ্ছে। ক্লান্তিহীনভাবে উত্যক্ত রেখেছে মাকে। তিনি যখন দুধ খাওয়াচ্ছেন লাথি মেরে বাটি ছিটকে দিয়েছে, ভাসিয়ে দিয়েছে মায়ের কাপড়। ঐ দুধকে তার প্রিয়তর করার জন্য শালিক, খঞ্জনা, কুকুর, বিড়াল, ঝিঁঝিঁ, জোনাকির কথা বলে তার স্বপ্ন-কল্পনার জানলা খুলে দিয়েছেন। গল্পে বাস্তব অবাস্তবের সীমা রাখেননি।

কলকাতার মেসে চুরুট হাতে অনেক মুগ্ধতার কথা ভেবেছিল অভয়। কিন্তু কমলেকামিনীর বা স্বর্ণর কথা ভাবেনি। বিবর্ণতার ভিতর থেকে সেই রঙ ফিরে আসছে। সেইতো টুকুন। চোখের জলে নরম হৃদয়ে দেখছে ভোরের আলোয় স্বর্ণ আর টুকুন ঘুমোচ্ছে।

"তিমিরময়" ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে বরিশাল থেকেই লেখা গল্প "তিমিরময়"। ছ'বছর বিয়ে হয়েছে। এতদিন বিলাসের মজলিসে অচ্যুত আর যায়নি। তারপর পুত্র জন্মের শেষে রুগ্ণ স্ত্রী জ্যোৎস্নাকে চেঞ্জে পাঠানোর জন্য বিলাসের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা এনে দিয়েছিল। প্রায় দুবছর জ্যোৎস্না চেঞ্জে কাটিয়ে এসেছে।

অচ্যুত ভাবে বিলাস এক অন্তঃসারশূন্য মাতাল। তার আড্ডায় যখন অচ্যুত যেত, মদ খেতে খেতে বিলাসের দিকে এমন কঠিন স্থির দৃষ্টিতে তাকাত, সেই বাক্যহীন স্তব্দতাকে বিলাস ভয় পেত।

বিয়ের পর এই সংশ্রব ছিন্ন হল। জ্যোৎস্না তাকে বাধ্য করেনি। তবু মেয়েটির অস্তিত্বই ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল। হয়ত একটা দামি বই কিনে আনল অচ্যুত। জ্যোৎস্না দেখল না কি বই। পড়ার সময় অচ্যুতের মনে হল বরং একটা দুল বা শাড়ি জ্যোৎস্নাকে দিলে হত। জ্যোৎস্না কিছু চায়-না, সব জেনে উপেক্ষা করে। সন্তান জন্মের পর মরতে বসেছিল। মরলে মন্দ হত না।

অচ্যুত বউকে কিছুদিন করে আম্বালায়, দার্জিলিং-এ, দেরাদুনে আত্মীয় বাড়িতে রেখে ফিরিয়ে এনেছে। ট্রেন থেকে তকতকে যে জ্যোৎস্না নামল অবাক অচ্যুত ভাবছিল তার সংসর্গে শিগ্‌গিরই আবার মনমরা মেয়ে হয়ে উঠবে সে।

দেরাদুনে অচ্যুতের ছোটভাই ফুর্তিবাজ অমিত খোকা ও জ্যোৎস্নাকে মুগ্ধ রেখেছিল। এখানে বই রিভিউ করার সমারোহে জ্যোৎস্না বিরস মনমরা হয়ে যাবে আবার। বই সমালোচনা লিখে অচ্যুত পয়সা পায় না। কেন রাত জেগে লেখে জ্যোৎস্না বোঝে না। অমিত ফুর্তি করে কাটায়, গল্প করে। অচ্যুত কেন অমিতের মতো নয়। অচ্যুত বোঝায়, তার সৎভাই অমিত মায়ের ধাত পেয়েছে। আপন ভাই হলে অচ্যুতের মতই হত। কিন্তু জ্যোৎস্নার অমিতের মনোভঙ্গিই পছন্দ।

জ্যোৎস্না অচ্যুতের স্ত্রী। বাপের বাড়ির সংস্কার তার রক্তে-মাংসে। অমিতের ঘ্রাণ তাকে পুষ্ট করেছে। অচ্যুতের লেখার বিষয়ে জ্যোৎস্নার আগ্রহও নেই, বাধাও নেই। শুধু সে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। অনেক দ্বিধার পর অচ্যুত রিভিউয়ের বইগুলো ফিরিয়ে দিল। বই লেখা নিয়ে অত মাথা ঘামানোর সংকল্প বৃথা। কোনো লেখককেও কেউ মনে রাখবে না। জ্যোৎস্নার চুড়ির ঝনঝন, ছেলেমানুষি গল্প, অবিরাম কাকলি তাকে আকৃষ্ট করছে।

জ্যোৎস্নার শরীর আবার ভাঙছে। তার শরীরে কিছু সয় না। ফুর্তি, ভালো খাবার, বেড়ানো, নিরালা বিছানায় ঘুম এসবের জন্যই তৈরি সে। এমনকি প্রত্যেক স্বামী যা চায়, অচ্যুত খুব কমই চেয়েছে, তাও সে দিতে পারবে না। অচ্যুত জিজ্ঞাসা করে জ্যোৎস্না নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছে কিনা। সেলাই কলে খোকার জন্য জামা সেলাই করে জ্যোৎস্না। ঠাকুরপোকে চিঠি লেখে, আর রদ্দি পত্রিকার গল্পের ধোঁকার মধ্যে থাকে কেবল। জীবনের ভ্রান্তি উপলব্ধি এবং জীবনাচরণের সংশোধন আগেরটির মতো এ গল্পটিরও বিষয়। যদিও এসঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিধাতার পরিহাসে স্ত্রীর দুর্বল স্বাস্থ্যজনিত বঞ্চনা। লেখক সুলভ স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে অচ্যুত কি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল? একসুখী দাম্পত্য গড়ে তুলতে পরেলো? জ্যোৎস্নার শরীরমনের সামর্থ্যের পক্ষে সে যথেষ্ট বিবেচক, আর বেশি আশা করা বৃথা।

"সাত ক্রোশের পথ" একই সময়ের রচনা। নায়ক প্রবোধের ইচ্ছে কলকাতায় থাকে। কিন্তু মা-বাপ-ভাই-বোন নিয়ে কলকাতায় থাকার মত টাকার জোর নেই। তাই এই পাড়াগাঁর শহরে পড়ে আছে। দুবছর আগে বিয়ে করে কলকাতায় গিয়েছিল, ভেবেছিল সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে এসে সবাইকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যবস্থা কিছু হয়নি, টাকা খুইয়ে এসে মাস কয়েক বসে আছে। বাড়িতে আগে যে ঘরে একলা থাকত, সেটা দখল করল ফের। উর্মিলা বোঝে প্রবোধ শিগ্‌গির কলকাতায় যাবে না। বাবা, কাকা, ভাসুরদের উপর চিরকাল নির্ভর করা যায়! প্রবোধ বলে সুদিন আসবে। উর্মিলা চুড়ি, গয়না খুলে দিতে যায়। গত দেড় বছর তার বড় কষ্ট গেছে। সে আর এভাবে থাকতে পারবে না।

প্রবোধ বোঝে এই মমতাহীন, কল্পনাশূন্য, সমাজ-ব্যাকুল পরিবারের মানুষজনের মধ্যে তারই অসহ্য লাগে, উর্মিলা কিভাবে পারবে!

মাত্র পঞ্চাশ টাকা হাতে পেয়ে উর্মিলা হিসাব করে কি কি কিনতে হবে। মেয়েটির আকাঙ্ক্ষা বেশি নেই। তবু তালিকা বেড়ে যায়। বিমর্ষতা কাটে না।

বিয়ের বছর দুই আগে প্রবোধ যাকে ভালোবাসত সেই উষা দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। ছেলেমেয়ে দুটি সুন্দর, কিন্তু ভালো লাগলেও প্রবোধ এবং উর্মিলা কেউই সন্তান চায় না। উষারা দার্জিলিং-এ থাকে। তেমন প্রত্যাশা প্রবোধরা ছেড়ে দিয়েছে আজকাল। যদি পৃথক একটি বাংলো-বাড়ি বানাতে পারত এই সংসারের হট্টগোলের বাইরে।

এক বায়োস্কোপ কোম্পানি নদীর ধারে ছবিঘর বানিয়েছে। এ-বাড়ির নীতিবাগীশ ছেলেরা তাদের মারপিট করে এসেছে। অথচ বিলেত ফেরৎ এক ইঞ্জিনিয়ারকে জামাই করার জন্য স্বদেশী এই পরিবারে বিশেষ চেষ্টা হচ্ছিল। যদিও সবাই দেখেছে, তিনি চুরুট নিবিয়ে খেজুর গাছের খাঁজে রেখে এ বাড়ি ঢোকেন। তৃতীয় প্রজন্মের সকলেই ওসব

খায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্ম ভাবতে ভালোবাসে এ-পরিবারে কেউ তা খায় না এবং খাওয়া অনুচিত। অথচ প্রথম প্রজন্মের পুরুষরা হুঁকা বরদার ছিলেন। চুরুট খেলে নির্যাতন, বাংলা গল্প অশ্লীল, হুইলারের নভেল অবাধ, বিলাত ঘুরে এলে যা খুশি বলা বা করার পাশপোর্ট মেলে। এই অন্তঃসারশূন্য নীতিবাদ উর্মিলা ও প্রবোধকে বিচলিত করে।

গরমের রাতগুলো সুন্দর। একদিন বৃষ্টিতে চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ে খাট বিছানা ভিজল। বর্ষা প্রবোধের খুব প্রিয় ঋতু ছিল। আজ ভাবছে অন্যরকম। তেত্রিশ বছর বয়সী প্রবোধের জীবনে শৈশবের বর্ষারাতের স্মৃতিগুলো উৎসবের আলোর মত স্পষ্ট। ক্বচিৎ স্বপ্ন দেখে সুন্দরীর কপালের কাঁচপোকার অক্ষরে কেউ চিঠি লিখছে প্রবোধকে। শকুনের চেয়েও বিশাল পাখি প্রবোধকে তুলে নিয়ে চলেছে সাঁই সাঁই শব্দে। মাথার ভিতর যুদ্ধের দামামা বাজছে। ব্যাবিলন চূর্ণ হচ্ছে। প্রবোধ দেখে নদীপথে অনেক স্টিমার। আকাশের ছায়াপথ যেন ব্যাবিলন ধ্বংসের ধোঁয়া সমারোহ করে আছে।

একদিন সন্ধ্যায় সবাই যখন বিয়ের নেমন্তন্নে গেছে মালতীলতা এসেছিল। মালতী সুন্দরী। গেঁয়ো বর নিয়ে পাঁড়াগাঁয়ে থাকে। উর্মিলা নেই বলে প্রবোধকে একা পেয়ে বাঘিনী হয়ে উঠতে চেয়েছিল। সৌন্দর্যকে মেয়েটি যেন কাদাকৃমি করে দিল। পালিয়ে গেল প্রবোধ। অনেক রাতে প্রবোধ জ্যোৎস্নায় ফিরতে ফিরতে ভাবছিল এত সাংসারিক চিন্তাতে ও বই পড়েও তার হৃদয় কেন মাংসপ্রিয় হল না। মালতী বরাবরই খুব সুলভ ছিল। মেয়েদের সৌন্দর্য বিস্ময় ও কল্পনার প্রয়াসের জিনিস যেন পরের স্তরে থাকে। ছেলেবেলার বন্ধু মালতীর মুখে গল্প শোনার জন্য সারারাত জাগতে পারত প্রবোধ। কিন্তু মালতী দ্বিধাহীন হৃদয় নিয়ে এলেও স্বপ্নের কুয়াশামাত্র ছিল না তাতে। তাই পেঁচা দেখে যেমন মেঠো ইঁদুর পালায় তেমন পালাতে হল প্রবোধকে। অনেক মাঠ নদী পেরিয়ে মালতী ফিরে গেছে। তার কুঁড়ের মেঝেতে হয়ত ঝরছে তার চোখের জল। কয়েকটি ভোর, নির্জন দুপুর, বিষণ্ণ রাত প্রবোধের স্মৃতিতে মালতীকে ধরে রাখবে।

এক সন্ধ্যায় কাঁচপোকার টিপ পরে স্বামীর কাছে এল উর্মিলা। স্ত্রীকে যা দেওয়ার নিয়ম তা আদায় করতে হয়নি। বস্তুপ্রিয়তা নয়, রোমহর্ষ নয়, দীপ্তিহীন, বিরক্তিহীন। তারপর উর্মিলা ঘুমোতে গেল, প্রবোধও।

ডায়ারির ঢঙে লেখা বিস্তারিত এই গল্পে বৈচিত্র্য রয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু ছোটগল্পের এককেন্দ্রিকতা আসেনি। পরিবারের স্বাদেশিকতার বাড়াবাড়ি ও সামঞ্জস্যহীনতা উর্মিলা আর ঊষার অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ, মালতীলতা ও উর্মিলার চাহিদার প্রকৃতি ও প্রাপ্তি এসব ভাবায়। প্রবোধের প্রকৃতি-দৃষ্টিতে স্মৃতি ও কল্পনা এমনই সামঞ্জস্যহীন।

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে লেখা আরো গুটিচারেক গল্প আছে। তার একটি হল 'চাকরি নেই'। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক বেকার সুকুমারের যে টিউশন শহরে তার খোরাক যোগাচ্ছিল, তা চলে যেতে স্টিমারে দেশে ফিরছে। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের বর্ণনার পর ঘাটে নামতে মা খুকিকে নিয়ে এল। মেয়ে এক বছরে একটুও বাড়েনি। রিকেটে লিকপিক করছে। শুধু দাঁত উঠেছে তার।

খুকিকেও ভাল লাগে না বেশিক্ষণ। সুকুমার নিরিবিলি থাকতে চায়। আগে কবিতা

লিখত, নদীপাড়ে বসত। দুবছর আগে বিয়ে করে জীবনটা বদলে গেছে। একান্নবর্তী পরিবার। সংসারে উপার্জনশীল বাবার মাইনে সামান্য। বেশিদিন চাকরি থাকবেও না। সংসারে তাঁর প্রাধান্য নেই। জ্যাঠা, খুড়োদের রাজ্যে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক বেকার সুকুমার পরাস্ত। ইউনিভার্সিটির উঁচু ডিগ্রি তাকে সাবলম্বী করল না। নম্র, বাধ্য, সৈনিকের মত সহিষ্ণুতার প্রেরণা দিল। পরিবার থেকে নিজেকে খসিয়ে নেওয়া যায় কিনা দেখতে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হল। এসে দেখল নিজের ঘরটি হাতছাড়া, বইগুলো হারিয়েছে, আলমারি নেই, টেবিল পাল্টে গেছে। সাইকেল আছে, মেরামত দরকার। নির্মলা স্বামীকে বাতাস করছে, কাল সেও পাল্টে যাবে।

বই পড়া বন্ধ। অনেক রাতে নির্মলা এসে বলল, 'তুমি এ বিছানায় কেন?' সুকুমার উঠল। নির্মলা ফিরে ডাকল না। বিরজার সঙ্গে বিয়ে হলেও সেও সুকুমারকে কেয়ার করত না। কিন্তু চমৎকার কথা বলত।

সুকুমার ভেবেছিল বাড়ি ফিরে ঢের কিছু লিখবে। অনেক ভাবনা জমেছে। এই পরিবার নিয়েই অনেক লেখা যায়। কিন্তু কোথায় বসে লিখবে। চিরকাল কবিতা লেখা, বই পড়া, বেড়ানোর সাধ, কিন্তু তাল সামলানো শক্ত। নির্মলা আর খুকি ওর জীবনটাকে কাকের বাসা বানিয়ে দিল।

রাত এগারোটায় ফিরে যখন নির্মলা ঘুমোবে, সুকুমারের বাতি সরিয়ে নিতে হবে। চোখে লাগবে নইলে। সুকুমার বাতি সরিয়ে অন্যত্র যাবে ভাবল। ভীতু নির্মলার আবদার, আগে সে ঘুমিয়ে নিক তারপর সুকুমার যেন ঘুমোয়। মাঝে মাঝে জেগে উঠে সে বলে, 'কিসের শব্দ! ওগো ঘুমিও না, ঘুমিও না।' পাহারাওয়ালার মত জাগতে হবে তাকে। এই তার স্ত্রী।

তবুও সংসার গড়া যায় যদি সুকুমার ষাট টাকাও রোজগার করত। পঞ্চাশটা টাকাও! জীবনানন্দের গল্পের এটাই চিরপুরাতন বিষয়। চিরন্তন হাহাকার। এই গল্প যেন বত্রিশ বছর পরে গল্পের প্রথমাংশের পাঠভেদ। শুধু মায়ের প্রসঙ্গ বাদ গেছে। স্বর্ণ আর নির্মলার তফাৎ কমই। নায়কের কথা তো বলা বাহুল্য।

পরের গল্প **'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া'** একই সময়ের লেখা, একই পরিবেশ নিয়ে। দু এক কলম লিখে থামতে হল বিরাজকে। একেবারেই অসম্ভব লেখা। মাথায় ঢের কথা আছে, কিন্তু কমলা তো জানতে চায় না, স্বামী কি লেখে, লিখতে পারছে না কেন?' খুকুনের চিৎকার ব্যতিব্যস্ততার ভিতর আর টিকতে পারে না। বিয়ে করা আর্টিস্টের পক্ষে মারাত্মক। বিরাজ যে পরিবারের ছেলে তারা সারাদিন ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। আর্টিস্টের চাই অবসর ও শান্তি। উপার্জনের সুবিধা না থাকায় এদের করুণার উপর নির্ভরশীল বিরাজ তা পাবে কিভাবে! আর্টিস্টের যে বিচার সংযম দরকার বিয়ে করে নিজেই সে বর্বরের মতো তা নষ্ট করে বসেছে। আর্টিস্টকে একাই থাকতে হয় সাংসারিক সচ্ছলতা নিয়ে। ভোরে ডেক চেয়ারে বসে বাইরের সবুজ ফুলন্ত গাছটা দেখে তৃপ্তি পেত। সেই গাছ কে কেটে ফেলল। কমলা নাকি বাধা দিয়েছিল। যুক্তি হল অনেক কাঠ পাওয়া গেছে।

কমলার ইচ্ছে ঢাকার ইডেনে থেকে আই. এ. পড়া। এ-বাড়িতে থেকে লেখাপড়া

করা অসম্ভব। কিন্তু ইডেনে যেতে হলে খুকিকে ছেড়ে যেতে হবে। বিয়ে এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মোহ জাগায় নি। কেউ ব্যথা বোধ করে না। সব বিয়েই কি এমন আন্তরিক বিচ্ছেদে দাঁড়ায়?

শিল্পী-প্রাণ একা। পরিশ্রান্ত কমলা এই পরিবারে স্বামীর কাছে এক ধরনের বন্ধুত্ব চায় হয়ত। কিন্তু খোলাখুলি কথা কোনো সমাধানে পৌঁছয় না। অন্য কোথাও কোনো মুগ্ধ স্বচ্ছল স্বামী, উদার পরিবারে বিয়ে হলে ঢের ভাল হত। দুজনেই তা বোঝে। কমলা চায় আই. এ. পাশ করে টিচারি করবে। টিচারি করতে করতে বি. এ. পড়বে। বিরাজের ভাই রমেনকে কমলা চিঠি লিখে জেনেছে সে মাসে পনেরো কুড়ি টাকা দেবে, তা থেকে বোর্ডিং-এর জন্য আট টাকা, মাইনে তিন টাকা। কিন্তু তার দুশ্চিন্তা বিরাজের কাকা জ্যাঠারা রাজি হবেন না। বউ ম্যাট্রিক পাশ এই ঢের। কোথায় আবার যাবে? হস্টেল, কলেজ তাদের কাছে পৈশাচিক। এই নীতিনিষ্ঠ পরিবারে ভাগ্যিস বিরাজ বেশি লেখা ছাপায়নি। প্রকাশ করলে তাকে পরিবার থেকে তাড়িয়ে দিত। এই সংকীর্ণ পরিবারে দিনরাত রেহাই নেই। গভীর রাতেও খুকি কিম্বা কমলা বিরাজকে নিস্তার দেয় না। খুকিকে যত সহজ মনে হয় তা মোটেই নয়। মেঝের ধুলো থেকে উঠিয়ে ঝেড়েপুঁছে নাক ভরা কফ পরিষ্কার করে সময় অপব্যয় হয়ে যায়। পিতার প্রাণ তুষ্ট হয় কিন্তু এই পরিবারের নিয়মকানুন, অদ্ভুত লোকগুলোর দাবি কেউ তাকে লিখতে দেয় না।

কমলার ছোটবোন অমলা কিছুদিনের জন্য আসতে চায় বেড়াতে। কাকা জ্যাঠারা বলেন অসম্ভব। বিরাজ অতিকষ্টে রাজি করায়। কমলার চেয়ে আর একটু লম্বা, ফর্সা, আরবি ঘোড়ার লেজের মত চুল। এখানে এসেই তার দ্রুতগতি থেমে গেল। হিল্লোল ম্লান হল। গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল বিরাজের টেবিলের পাশে। তার আবদার ছোড়দির সঙ্গে বেড়াতে যাবে বাইরে। কিন্তু এবাড়ির নিয়ম নয় মেয়েদের বাইরে বেরোন। দু-একজন কাকিমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। জীবন যেখানে আরো প্রসারতা চায় এই পরিবারে তার চিহ্ন মেলে না কোথাও। এশুধু একজন লেখকের সমস্যা ও উপলব্ধির নির্যাস মাত্র। একই সমস্যা তুলে ধরা হয়েছিল 'চাকরি নেই' গল্পেও। এখানে শুধু অসহনীয় পারিবারিক সংকীর্ণতা এবং সহানুভূতিহীন অসহনশীলতা বর্ণিত। কিন্তু জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনাকেই জীবনানন্দ হয়তো গল্প বলে মনে করতেন।

পরের গল্প **'শেষ পছন্দের সময়'**। জীবনানন্দ সমগ্রের অষ্টম পর্বভুক্ত এ গল্পটিও ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের রচনা। স্টিমার নোঙর করেছে সন্ধ্যায়। কিন্তু সুবোধ দেখল জেটিতে কেউ তাকে নিতে আসেনি। নানা সময়েই তাকে নানা ঘাটে ফিরে ফিরে আসতে হয়েছে। তবু মন চায় কেউ অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করুক। এই বিষণ্ণতা কেটে যাচ্ছে সুবোধের। সব প্যাসেঞ্জারের পিছনে স্টিমার ছাড়ল সে। চেনা গাড়োয়ান আজিজের গাড়িতে চড়ল। এ গাড়িগুলো অনেক সুন্দর কলকাতা, দিল্লি, মিরাটের চেয়ে। রমাসুন্দরী বললেন, 'চৈত্রমাসে এসেছিস। হাতে কি কিছু নেই তোর?' সুবোধ জানাল ঢাকা, কলকাতা, পাটনা, মুঙ্গের ঢের ঘুরে লাইফ ইনসিওরেন্সের ব্যবসা করে কোনো কেস পায়নি। গাঁটের টাকাই নষ্ট শুধু। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মর্মাহত সুবোধ--এই চা না খেলেই হয়।

শস্তা বটে। মালতী পাঁচ-ছয় মাস চা ছেড়েছে। রমাসুন্দরীও ছাড়বার মুখে। শুধু বাবা কাকারা কয়জন খান। দামি চা কেনার অবস্থা এ পরিবারের নেই। বাড়িতে পা দিয়েই সুবোধ বুঝেছে এদের আরো খারাপ পরিস্থিতি। খবরের কাগজ বন্ধ। বইয়ের কথা এদের ব্যথিত করে তোলে। মালতী বরং লাইফ ইনসিওরেন্সের কথা জিজ্ঞেস করে। সুবোধ জানায় তার হাতে কিছু নেই। কাকারা কিছু পাঠাননি। বাবা কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না। একশ টাকা আছে সুবোধের কাছে বইয়ের রয়্যালটি পেয়েছিল। নানাভাবে উপার্জনের চেষ্টা করেছে সুবোধ। মাস্টারি করেছে, গার্জেন টিউটর, দালালি। কিন্তু লিখতে চেয়েছে বরাবর। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে ঠিক করেছে শুধু লিখে যাবে। কিন্তু খেয়ে তো বাঁচতে হবে!

কিন্তু লেখার সময় কাউকে খাওয়াবার কথা, নিজের খাওয়ার কথাও মনে থাকে না। স্ত্রী ও বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখার সময় অনেক চমকপ্রদ মধুর জিনিসও চেপে যেতে হয়। সুবোধের গল্পগুলো ছাপানো হয়ে গেছে মালতীকে জানালে কিছু এগোতো না শুধু লজ্জিত হতে হত।

সাহিত্য প্রভৃতি কালচারের সম্পর্কে মালতী উদাসীন। স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন শুধু টাকার হিসাব, চায়ের পেয়ালার মাধুর্য নিয়ে। সুবোধের লেখার সম্পর্কে মেয়েটির কোনো কৌতূহল নেই। জীবন একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে এখন, শেষ পছন্দের সময়। যা পাণ্ডুলিপি-বদ্ধ আর নেই, ছাপা হয়ে গেছে বা হচ্ছে মালতী বা রমাসুন্দরী তা হয়ত ঠেকিয়ে দেবেন। মালতী বলে, 'আর সব না হয় নমো নমো করে চলবে, কিন্তু খাজনার পঞ্চাশ টাকা কে দেবে?' কাকারা টাকা পাঠাননি। বাবাকে কোনো রকমে চালিয়ে নিতে হবে। বাবার শক্তি সুবোধের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু শক্তির মর্যাদাবোধ কম। আধ শতাব্দী ধরে একটা বাড়ি আগলে রাখা, একটা পরিবারের গাধার গড্ডলিকা তাড়িয়ে নেওয়া ধৈর্য ও বিশ্বাসের কাজ। কিন্তু আর্টিস্টের কাছে এসব ভুসি শুধু।

মেজকাকা সব দেখে গেছেন তবু সাহায্য পাঠাননি। ওরা সুবোধদের ভিখারির মতো দেখেন। বাড়ি যে সকলের দায় এ ওঁরা বুঝতে চান না। মালতী বলে, 'বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশি খারাপ লাগে।' নির্যাতনে নির্যাতনে মুখটা কেমন হয়ে গেল। হঠাৎ সুবোধের মনে হল 'আর্টিস্ট? একটা বিরাট মিথ্যা বিলাপ, জঘন্য কাপুরুষতা। সুবোধ পালিয়ে গেল নদীর ধারে বেড়ানোর নাম করে। ফিরে এসে শুনলো বাবার ট্রানস্লেশন বইয়ের টাকা পাবলিশার্স পাঠিয়েছিল তা দিয়ে খাজনা মেটানো হয়েছে।

মালতীর ইচ্ছে সুবোধ এমন পাঠ্যবই লিখুক। বাবা যেমন সন্তানদের লালন ও সংসার সংরক্ষণ করে চলেছেন, সুবোধ 'আর্টিস্ট' না হয়ে, জীবন-পলাতক না হয়ে, সংসারে প্রয়োজনে লাগে এমন পাঠ্যবই লিখুক। সুবোধ ভাবল সন্তানদের মানুষ করা সংসার চালানো এমন দুঃসাধ্য কাজ যারা করে যাচ্ছে, সেই অবহেলিত মানুষগুলির প্রতীক হিসাবে বাবার একটা জীবনী লিখবে।

পরে ভাবল পৃথিবীকে শেখাতে যাবার অর্থ হয় না। পৃথিবী শেখে না। বরং সে 'টিচারি' খুঁজুক, স্কুলের ম্যানুয়াল লিখুক। মালতী সুবোধকে সাহায্য করবে। শ্বশুরকে সে

হাজার পৃষ্ঠা কপি করে দিয়েছে। সুবোধ ভাবল তার গল্প লেখার সময় মালতী সাহায্য করতে আসে নি। প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে কেমন ম্যানুয়ালে বেশি টাকা মেলে। এ সুবোধের পরাজয় নয়, আহুতিও নয়; জীবনের নতুন মোড় নেওয়া। সন্তান জন্ম দেবার, শিশুকে মানুষ করার, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়াসের মহিমার তুলনায় পৃথিবী ও ইতিহাস নিতান্তই হেয় মনে হয়। পুরস্কারকে হীন ভেবে যারা সাহসে সহিষ্ণুতায় এমন কাজ করে চলেছে সুবোধের তেমন জীবনই পছন্দ।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নূতন উপলব্ধি—জীবনধারার খাত পাল্টানো 'তিমিরময়' গল্পের মত এগল্পেও দেখতে পাই।

গল্পের ধারা

তৃতীয় স্তবক

১৯৩২ সালের মে মাসের একটি গল্প **'প্রণয় প্রেমের ভাব'**। গল্পটি ইতিপূর্বে আলোচিত 'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা' গল্পের অনুষঙ্গী যেন। এদেশে বার্ধক্য বড় দ্রুতগামী। স্ত্রী অচিরেই হয়ে দাঁড়ায় গিন্নি—এই কথাই যেন এই গল্পের সারবস্তু।

হেমলতার ধারণা মাত্র সতেরো বছর বয়সেই সে প্রবীণ। বিবাহিতা, অবগুণ্ঠিতা, দায়িত্ববোধসম্পন্না, কর্তব্যভারাক্রান্তা, বিরূপা বিরস-নয়না, ছেলেমির বয়স আর তার নেই। সুতরাং কুড়ি বছর বয়সী স্ত্রীর সান্নিধ্যে সুবোধের হৃদয় রাত্রে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও তা নিরোধিত রাখতে হয়। হেমলতার ভয়ে সুবোধ অনেক কিছুই করতে পারে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর জানালার পাশে বসে সুবোধ বিয়ের আগে পরিচিত একটি মেয়ের কথা ভাবে। সাত-আট বছর আগের সেই মেয়ে—সরোজিনীর চিঠি পড়ছিল সুবোধ। সরোজিনী এখন অবিনাশের স্ত্রী, চার-পাঁচ সন্তানের মা। তবু ঐ চিঠিগুলির মধ্যে একটি নারীর কোমলস্পৃহা, নরম অনুভব যেন মধুর এক জগৎ তৈরি করে। কিন্তু সুবোধ নিজেকে এভাবে প্রলুব্ধ করবে না—চিঠির বাক্স সরিয়ে রাখে।

সুবোধ জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে বাঁচতে লিখবার চেষ্টা করেছে। নিজের মনের নির্জন কথাগুলিকে চিঠির মত করে লিখতে পারে সে। কাকে পাঠাবে সে চিঠি। যারা লিখে তৃপ্তি পায়, সুবোধ তাদের দলে নয়। নিজের মনের খুশিতে সে লিখতে পারে না।

হেমলতা সুবোধকে নিয়ে এক অর্থে নিশ্চিন্ত। তার তরলতা ফাজলামি নেই, নেই কোনো বিচ্যুতি, সিগারেট, নস্যি, হো হো হাসি এসব অপ্রাসঙ্গিক উচ্ছ্বাস নেই। মাঝে মাঝে একটা জানোয়ারের মত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে যেন—কিন্তু সে খুব ক্ষণস্থায়ী। সুবোধ ইংরেজি উপন্যাসে পায় সাতচল্লিশ বছরের জার্মান পুরুষ উনচল্লিশ বছরের ইংরেজ প্রেমিকাকে পেয়ে জীবনে প্রথম প্রেম শুরু করে। সুবোধের কুড়ি বছরের স্ত্রীর জীবনে সব ফুরিয়ে গেছে। বইটা তার প্রণয়হীন জীবনকে টিটকারি দিচ্ছে। প্রতিবেশী বুড়ো শঙ্করবাবু তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে আদর করে কামনা চরিতার্থ করছে, সুজলা স্বাস্থ্যবলী

মেয়েটির আন্তরিক মাধুর্য অনুভব করে সুবোধ উদাসীন হয়ে ওঠে। সব বিষয়েই স্ত্রী—হেমলতা খুব শীতল। দাম্পত্য জীবনের বৈচিত্র্য মাধুরী সুবোধের কাছে সত্য নয়।

সুবোধের বোন সুধা স্কুলটিচার। প্রতিবেশী ফ্লার্ট যুবক নীরদকে ভালোবাসে। জেনে সুবোধ সুধার উপর অভিমান করে। পরে বোঝে সুধা, সুবোধ, হেমলতা প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। তবু কারো বিরুদ্ধতা করতে তাদের এখন মন চায় না।

এ গল্পের নায়ক প্রেমিকাকে পায়নি। কিন্তু মাত্র ২০ বছর বয়সী স্ত্রীর মধ্যে পেয়েছে জীবনের রূপরস স্পৃহহীন প্রথা ও সংস্কারের প্রবীণা জড়পিণ্ডকে। ইউরোপে যে বয়সে যৌবন শুরু হয়, এমন কি বৃদ্ধ প্রতিবেশী যে বয়সে তার তৃতীয়পক্ষ স্ত্রীকে নিয়ে ভোগোন্মত্ত থাকেন তার পাশে সুবোধের ভাগ্যই এমন। সুবোধ বোঝে সংসারে প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন। বোন সুধা অবাঞ্ছিত যার সঙ্গে প্রেম করছে তাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা বা পরামর্শ দিতে যাওয়া অর্থহীন বুঝে সুবোধ নিরস্ত হয়। গল্পের গঠন ও চরিত্রসৃষ্টি জীবনানন্দীয়।

১৯৩২ সালের মে মাসে লেখা হয়েছিল **'নষ্টপ্রেমের কথা'** গল্পটি নববিবাহিত পুরুষের সমস্যা নিয়ে। কবি তখনও বরিশালে আছেন। এই গল্পের বিষয়বস্তু, মোহিত যাকে ভালবেসেছিল তার প্রতারণায় জীবনের স্থিরতা আনতে সে দেরি করে ফেলল। জীবন তো পরিকল্পনা মেনে চলে না। জগতে যেমন সুগন্ধী চারের মতো রূপ মানুষকে আকৃষ্ট করে বড়শির মতো হৃদয়কে বিদ্ধ করে—তেমন সহিষ্ণুতা দাক্ষিণ্যও আছে, উপহাস শ্লেষ আছে, সহনশীলতা আছে। এ নিয়ে জমে ওঠে গাজনের রস।

যখন ভালোবাসত মোহিত ছিল শ্রদ্ধাবান, অপেক্ষাতুর ; ব্যর্থ হয়ে হয়েছিল অবিশ্বাসী। এখন বুঝেছে জীবনের পূর্ণতায় দুয়েরই দরকার। ব্যথা বিহ্বলতা পেরিয়ে এক অন্তর্দৃষ্টি জেগে ওঠে। এখন সংসার ধর্মের জন্য মন তৈরি। নারীকে ভালোবেসে পেয়েছিল ঘৃণা। বধূর কাছে মমতা ও সমবেদনা চায়, ভেবেছিল প্রেমিকা দুর্লভ, বধূ দুর্লভ নয়।

সুলক্ষণা মনে করে যে বউকে আনা হলো গৃহপ্রবেশের পরই সে শোবার ঘরে খিল দিল। মোহিত এলে যদি বা দরজা খুলল, আত্মীয়াদের বিরুদ্ধে তার তীব্র অভিযোগ। দাম্পত্যের স্বপ্ন-কল্পনা মিলল না। সুরূপার ধাত আলাদা। মোহিত ভোরে বেড়াতে যায়। সুরূপা আটটার আগে ওঠে না। ছোট-বড় কোনো আত্মীয়কেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু চায় তারা তার স্নানের জল তুলে দিক। বাড়ির সন্তান সংখ্যা নিয়ে কটূ মন্তব্য করে জেঠি পিসিদের। সাতদিনেও ঠাকুমার কাছে দেখা দেয় না। জীবনের কর্তব্যগুলো অবহেলা করছে। নিজের ঘরে চা করে খায়, গল্পের বই পড়ে, সেলাই করে। মোহিত অনেক বলেও সুরূপাকে ঠাকুমার কাছে পাঠাতে পারল না। ঠাকুমার চোখদুটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বই পড়ার অবস্থা নেই। সুরূপাকে বলছিল মোহিত ঠাকুমার কথা।

বাড়ির যে ছোট্ট ছেলে ছুটকুন যাকে সুরূপার বড় ঘৃণা। আরও চোখের অসুখ। ঠাকুমা সম্পর্কে আনুপূর্বিক শোনার পর সুরূপা বলেছিল—'তবু ভালো, বুড়ো বয়সে চোখ গেল। ছুটকুনের তো দেড়বছর। আহা, বেচারি।' বিস্মিত মোহিত ভাবছিল স্ত্রীর মনের মধ্যে কোথায় সহানুভূতি লুকিয়ে আছে কে জানে! জীবনানন্দের অনেক গল্পেই নববধূর কাছে প্রত্যাশা পূরণ হয় না। এগল্পেও 'সুখের শরীর' গল্পের মতো সেই ক্ষোভের

রূপায়ণ। কিন্তু কখন কার বাহ্য ব্যবহারের স্বার্থপরতা, অসভ্যতা, অসহিষ্ণুতার মধ্যে থাকে হৃদয়ের অস্তিত্ব কে জানে? সুরূপা চরিত্র এইদিকেই ব্যতিক্রমী।

আরেকটি গল্প—**'কুষ্ঠের স্ত্রী'**—নব বিবাহিতের দাম্পত্য সমস্যার আরেকটি ছবি। সম্ভ্রান্ত স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে সুশোভনের মুখ বছর কুড়ি আগে আগুনে পুড়ে জায়গায় জায়গায় শাদা দাগ হয়েছিল। দেখে মনে হয় ধবল বা কুষ্ঠ। সুদর্শন ছেলেটির বিয়েতে অসাধ ছিল না; কিন্তু কন্যাপক্ষ সব শুনে বুঝেও পিছিয়ে যায়; উপযুক্ত মেয়ে জোটে না। ইতিমধ্যে আরও পড়াশুনো করে বড় ডিগ্রি পেল সুশোভন। কান্তিমান সুপুরুষ সম্পদশালী হল। শেষে মেয়েও মিলল নিখুঁত সুন্দরী নয়, লাবণ্য আছে। পিতৃমাতৃহীন মেয়েটিকে শিক্ষিত করেছেন তার মামা।

বিয়ের রাতে চন্দনের ফোঁটায় সুন্দর লাগছিল সুশোভনের মুখ। পরদিন অতসী নখ দিয়ে ঘুঁটে চন্দনের ফোঁটাগুলো তুলছিল। তার ইচ্ছে সুশোভন মুখ ধুয়ে নিক। বরের বাড়ি এসে রাতে তত নজর করেনি অতসী। বরং রূপের অহঙ্কার নিয়ে সুশোভনকে একবার খোঁটা দিল। সুশোভন ভাবল মেয়েটি তার মুখের গঠন ছাড়া আর কিছু দেখছে না। অতসী স্বামীর সংসারের লোকদের তুলনায় নিজেদের পরিবারের নারী-পুরুষকে উন্নত রূপ মাধুর্যের কথা বলে অহঙ্কার করে। সুশোভন প্রতিবাদ করে না। তার স্বচ্ছল সংসারে তার উপার্জিত টাকা অতসী অশোভন লোলুপতায় সদ্ব্যবহার করবে বলে। সুশোভন চুপ করে থাকে। দুজনেরই দেহকামনা কম। পরদিন ভোরে সুশোভনের ঘুম ভাঙে রূঢ় ধাক্কায়—তার মুখ লক্ষ্য করে অতসীর জিজ্ঞাসা—'এ সব কিসের দাগ?'

এ যে চামড়ার দাগ, কুষ্ঠের নয়, বিশ্বাস হয় না অতসীর। সুশোভন জানায়—সে ঠকায়নি। মামাকে জিজ্ঞাসা করুক অতসী। কিন্তু ক্রুদ্ধ স্ত্রী তাকে শাসায়—'আমাকে নষ্ট করলে সব সম্পত্তি লিখে দিতে হবে আমাকে। উকিলের ভয় দেখায় সে।'

অন্তরাত্মা আহত হয়েছে বলে বা সৌন্দর্যবোধের আঘাতের জন্য অতসী সব ছেড়ে যেতে চাইলে সুশোভন দুঃখ পেত না। তার দৃষ্টি স্বামীর সম্পত্তির দিকে। স্বামীকেই অনুনয় করে বলে, কি সম্পত্তি আছে তার, যেন জানায় সুশোভন। 'শত হলেও আমি মেয়েমানুষ, তোমার সঙ্গে পারব কেন? ধর্ম ন্যায়ের কথা ভেবে আমাকে ঠকাতে যেও না।' ঐ সম্পত্তি পেলে পশ্চিমে একটা বাড়ি নিয়ে একা পুজো আজা করবে, সতীই থাকবে, প্রার্থনা করবে পরজন্মে সুশোভনের এমন না হয়। সুশোভন বলে—'পরজন্মে তোমার স্বামী হব?' অতসী তা জানে না। সুশোভন জানায় এ ধবল বা কুষ্ঠ নয়, আগুনে পোড়া দাগ।

অতসীর দাঁতগুলো নোংরা জামের বিচির মতো। দুর্গন্ধ, তিনটে দাঁত বাঁধানো—তাই নিয়ে গর্ব তার। রোগা, খাঁচার মত বুক, চিমসে মুখ। কিন্তু স্বামীর পোড়া চামড়াই যখন এমন মমতাময়ী পতিপরায়ণা হয়ত সহানুভূতি দেখাবে, ভালোবাসবে না। অতসী আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল। স্বামী কথা বলছে না—অসন্তুষ্ট না কি! অসহিষ্ণু হয়ে ঢের বাজে কথা বলেছে তাকে—নানা কদাকার মানুষের মাঝে বড় হয়েছে অতসী। রূপের মর্ম বোঝে না। কামনাও করে না। সুশোভনের মুখের ঢৌলটি লক্ষ্য করছিল সে। ঘাড় নেড়ে বলল—

'তা আমি পারব।' কুষ্ঠ মেহেতো যখন নয় ; ছোঁয়াচের যখন ভয় নেই, স্বামীর কাছে থাকা উচিত তার। কিভাবে পুড়ল জানতে চাইল অতসী—'আহা! একটু সাবধান হতে যদি।'

মানিক বন্দ্যোপাধায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে স্বামী স্ত্রীর বোঝাপড়া নষ্ট হয়েছিল বিবেচনাহীনতায়। জীবনানন্দের গল্পে সেই বোঝাপড়ায় পৌঁছতে পারল তারা। তবে গল্পের পরিণামে পৌঁছানোর জন্য শেষটায় হঠাৎ অতসীর দাঁতমুখ শরীরের কদর্যতা বর্ণনার প্রয়োজন ছিলনা। যাইহোক গল্পটি উৎরে গেছে।

বিবাহ উপলক্ষে পুরুষের প্রত্যাশা এবং বাস্তবে স্ত্রীর চরিত্রের ব্যবহারে তাঁর হতাশাময় রূপান্তর এবং উভয়ের অন্তর্সংঘাতে স্বভাবান্তর জীবনানন্দের 'বাসর রাত' গল্পের বিষয়বস্তু। বাসন্তী বাসর রজনীতে নববধূকে একান্ত আপন ভেবে তৃপ্তিবোধ করছিল প্রেমনীহার। শ্যামবর্ণা এই লাবণ্যবতী যেন বৃন্দাবনের কিশোর রাখালের অনির্বচনীয় সুষমা পেয়েছে। তার চুলে বিলি কেটে আদর করতে গিয়ে তার রুক্ষ কথায় ও আচরণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে। বাস্তব ও স্বপ্নের এই পার্থক্য আরও পরিস্ফুট হয়েছে যখন কলকাতার বাসায় এসেছে মনিকা। গরীব ঘরের মেয়ে হলেও তার আকাঙক্ষা অসীম। জীর্ণ ভাড়াবাড়িতে তার মন ওঠে না। কেন পুরী দেওঘরে প্রেমনীহারের বাড়ি নেই। প্রতিবেশী ঘোষালদের মত ময়ূরপঙ্খী বাড়ি হতো তার, যদি প্রেমনীহারের পূর্বপুরুষরা সুবিবেচক হতেন। তার সিদ্ধান্ত, সুন্দরী মেয়েদের কখনও বনেদি ঘর ছাড়া বিয়ে দিতে হয় না।

প্রতিবেশী ঐ রাজবাড়ির মত বাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্নে যেতে পেরে মনিকা খুশি। কিন্তু স্বামী অসুস্থ ভাইপোর সঙ্গে থাকার জন্য কেন নিমন্ত্রণে গেল না, ত্রিকালনষ্ট বুড়োর মত মনোভাব কেন তার স্বামীর। স্ফূর্তি তামাশায় বিয়েবাড়ি চমকাবে এমন তার স্বামী নয় ভেবে মনিকার প্রচণ্ড কষ্ট। নতুন বৌ-এর বাসর ঘরে তিনটে ফ্যান, হাতপাখা দিয়ে স্বামীর হাতের বাতাস খেতে খেতে এ নিয়ে আক্ষেপ করে মনিকা।

সারাক্ষণ মনিকার বিয়েবাড়িতে পড়ে থাকা গুরুজনরা অপছন্দ করছে। ভাইপো মিন্টু কাকিমাকে ভয় পায়। কাকিমা নেই এই অবকাশে কাকার সঙ্গে লুডো খেলতে চায়। গতকাল মনিকা বাচ্চাটির লুডোর বোর্ড উল্টে দিয়েছিল রেগে। এই ভয় কাকারও আছে। অল্পক্ষণ খেলার পর মনিকার আসার সময় হয়েছে ভেবে মিন্টুকে চলে যেতে বলে। কিন্তু মনিকা এল রাত এগারোটায়, ক্লান্ত অবসন্ন। যেন কারা ওকে ব্যবহার করে চলেছে , তাদের উপভোগে ব্যবহৃত হয়ে গভীর তৃপ্তি পাচ্ছে মেয়েটি। মনিকার ঘুম পাচ্ছে না, ভালোও লাগছে না। বিয়েবাড়ির লোকেরা পুরী হয়ে মুসৌরি পাহাড়ে গেল। মনিকা স্টেশনে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। বরের ভাই সুষমাবাবু শ্বেতপদ্মের তোড়া দিয়েছেন মনিকাকে। প্রেমনীহার তোড়াটিতে হাত বোলাচ্ছিল। মনিকা কেড়ে নিল। সুষমাবাবু নিষেধ করেছেন কাউকে দিতে। ঐ নিষেধটাই মেয়েটির ব্রত যেন। অভিনিবিষ্ট মনিকা স্তব্ধ জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলগুলি দোলাচ্ছে। প্রেমনীহার একবার পদ্মগুলি দেখছে; একবার মনিকাকে। বাস্তবিক এগল্পে মনিকা চরিত্রই দর্শনীয়। আত্মকেন্দ্রিক, অশোভন, নির্বোধ, লোভী, সমালোচনাপ্রবণ অথচ একটা রূঢ় ব্যক্তিত্বও আছে তার। এই নারীকে নিয়ে কি সংসার করা সম্ভব হবে?

প্রথম খণ্ডের 'বাসর রাত' গল্পের মতই অষ্টম খণ্ডের 'সুখের শরীর' গল্পেও নূতন

বউয়ের স্বামীর সংসারে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা বর্ণিত হয়েছে। খুব ভোর—তখনও বাঁশঝাড়ের আগায় উজ্জ্বল চাঁদ। স্টিক হাতে নিরুপম বেড়াতে গেল। লক্ষ্যহীনভাবে নদীর কিনারে ঘুরেফিরে আটটায় ফিরল। উঠোনে জেঠি, খুড়িরা আনাজ কাটতে ব্যস্ত। আট দশদিন বিয়ে হয়েছে নিরুপমের। বউ আসার পর নিরুপমের এই পথউদাসী মন তাদের নজরে পড়েছে। ওর ঘরে মশারিতে ইন্দিরা এখনও ঘুমাচ্ছে। বোন কমলা জানাল ফুলশয্যার রাতেই নিরুদা বুঝেছে কি স্বার্থপর মেয়ে কপালে বিঁধল। খুড়িরা আক্ষেপ করছেন—রূপ তো কত! কিন্তু কি দেমাক। বিয়ের কনে সবার সমাদরের জিনিস কিন্তু ওর ভাবটা আমরা সবাই যেন ওর তাঁবে। পিসিমা চান না, বাপ-মা-হারা ছেলেটার বউকে মুখঝামটা দেওয়া হোক। কিন্তু এও সবার ধারণা সংসারের জন্য খাটবে, প্রাণের টান বোধ করবে, এমনই তো চিরদিন হয়ে এসেছে। এ বউ ছোটহাতা ব্লাউজ পড়ে। বাক্সভর্তি শাড়ির একটি কাউকে দেবার প্রবৃত্তি নেই। ননদ কমলা, সন্ধ্যা শাদামাটা শাড়ি পড়ছে। ওর তসর, গরদের শাড়ি বাগিয়ে বেড়ানো কি ভালো দেখায়?

নিরুপম ঘরে এসে ইন্দিরাকে ওঠালে ইন্দিরা রেগে যায়। বাপের বাড়ি হলে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিত। জানলা খোলার জন্য স্বামীকে ধমকায়। রাতে আলসেমি করে শাড়ি ছাড়ে নি। কোঁচকানো শাড়ি পাট করতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। ইন্দিরা এ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে জেঠিমারা কি ভাববেন? কিন্তু সে ঘুমাবার আগে শাড়ি পাট করার পরামর্শ নেবে না। তার চোখে ঘুম নামলে বিছানা পাতবারও চাড় থাকে না। মেয়েটি নিজের রুটিন নিজে ঠিক করে। খুড়িমাদের সমালোচনায় ইতস্তত করে না। তাদের অনেক সন্তান। কিন্তু সন্তানের অনাস্বাদিত বিস্ময়ের জগতে সে ঢুকবে না, তা ফুলশয্যার রাতেই বুঝিয়ে দিয়েছে নিরুপমকে।

উঠোনে তরকারি কোটা প্রায় শেষ। তবে ইন্দিরা যাবে কি করতে? নিরুপম বোঝায়, যাবার একটা মূল্য আছে। ইন্দিরা বাড়ির বউ, সকলে কাছে পেতে চায়। কিন্তু স্পিরিট জ্বেলে এক কাপ চা না খেয়ে, সে উঠবে না। চা বানিয়ে দিতে হলো নিরুপমকে। কিন্তু নিরুপম চা খেতে চায় কিনা জানতেও চাইল না সে। সকালে নিরুপম চা খায় নি। মা বেঁচে থাকতে তিনি ওর চায়ের তৃষ্ণা বুঝতেন। বউ নাকি মায়ের মমতা নিয়ে আসে। কিন্তু নিরুপম বুঝছে গতদিন আর ফিরবে না। বিয়ের পর নিরুপম কমলাকে চা করতে বলতে পারবে না। ইন্দিরা না থাকলে তারা খোঁজ নিত, ব্যবস্থা করত। চা খেয়ে ইন্দিরা চান করতে গেল। দাম্পত্য-জীবন দেবতা নিরুপমকে বুঝিয়ে দিলেন ইন্দিরার 'সুখের শরীর'।

বিশুদ্ধ বদমেজাজী অসভ্য বউ হলো এগল্পের ইন্দিরা। জীবনানন্দের রচনাতেও তার জুড়ি নেই।

জীবনানন্দ সমগ্রের নবম খণ্ডের ভিন্ন ধরনের গল্প প্রণয়ী প্রণয়িনী। ১৯৩২ সালের মে মাসেই বরিশালে লেখা। ত্রিশ বছর বয়সের শিক্ষিত তরুণ রমেশ তার গ্রামেরই মেয়ে বিরজার কাছে রোজ সন্ধ্যা কাটিয়ে আসে। বিরজার স্বামী শশধরের লগ্নির কারবার। রাত এগারোটার আগে সে ঘরে ফেরে না। সন্ধ্যা থেকে দশ-এগারোটা পর্যন্ত গল্প করে রমেশ।

বিরজার বয়স চব্বিশ, তবু তাকে সে দিদি বলে ডাকত, এখন নাম ধরে ডাকে। বিরজা ঠাকুরপো বলত, এখন রমেশ বলে।

ব্যাপারটা এর বেশি এগোয় না। বিরজা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে ওঠে। রমেশ তখন বিরজাদি বলে তার গুমর তৃপ্ত করে। গল্প ফুরিয়ে যায়। অন্ধকারে বিরজা একটু ঘেঁসে বসে। তেল, হলুদ, মশলায় শাড়ির ঘ্রাণে অন্ধকার স্নিগ্ধ, নিবিড়, লম্পট হয়ে ওঠে। রমেশ বোঝে এর বেশি বিরজাকে ঘাঁটানো চলে না। জানালার কাছে গিয়ে শিকনি ঝেড়ে নাকে নস্যি নেয়। বিরজাও পরিপূর্ণ শশধরের স্ত্রী হয়ে একপ্রান্তে বসে থাকে।

বিয়ে করেনি রমেশ। তার জীবনের একমাত্র মেয়েমানুষ বিরজা। সম্পর্কটা ন্যায্য, বৌদি-ঠাকুরপোর। কৈশোরে স্বগ্রামে রমেশ ছিল বিরজার দাদা। এখন কি করে অনুগত ঠাকুরপো হয়ে গেল! মাঝে মাঝে রমেশ সংকল্প করে আসবে না। হয় বিয়ে করবে, নয় নিজের মেয়েমানুষ বেছে নেবে। কিন্তু সন্ধ্যা এলেই গুড়িগুড়ি শশধরের নির্জন বাড়িতে। গল্প করতে করতে একটা কেমন বিহ্বল সময় আসে। দুজনেরই কিম্বা একজনের। সেটা উতরে যায়। স্নেহশীলা মায়ের মতো বিরজা এক একদিন ভাত খাইয়ে দেয় রমেশকে।

সেদিন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গল্প চলছিল দুজনের। শশধর ঢুকল। ঘর অন্ধকার কেন? সুইচ টিপল সে। রমেশ একটু সরে গেল। বিরজা বলল, 'জানালায় আলো আসে। মিছিমিছি লাইট জ্বালিয়ে কি হবে?' শশধর চুরুট ধরিয়ে রমেশকে 'ছোকরা' বলে ডেকে বলল, পরস্ত্রী কি খেলার জিনিস? ঘেঁসে বসেছিল কেন? রোজ আসে নাকি? বাল্যে, যৌবনে যত পিরিতই থাকুক বিরজা এখন পরস্ত্রী, রমেশের মায়ের মত। বিয়ে করার সাধ নেই, কিন্তু পরের স্ত্রী নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার সাধ গেল না? তাই যদি রমেশের মতলব, ভাল শিকার চায় তো ভালো জায়গায় ব্যবস্থা করে দিতে পারে। সেখানে সোফা, আতরদান, ফুলদানি, মখমলের পর্দা, চায় তো হুইস্কি কর্নিয়াক।

বিরজার মৃদু প্রতিবাদে কান দেয়না শশধর। রমেশকে বলে, 'তুমি ভাই আর এসো না, রমেশ। তোমার ন্যায় বুদ্ধিতে যা কুলোয় কোরো।' রমেশ উঠে যাচ্ছিল। বিরজা তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল ভাত খাওয়াতে।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার এল রমেশ। বিরজা আগের দিন বারবার ঠাকুরপো বলেছিল, তাতে প্রবল আপত্তি তার। সে মনে করে, হয় সে বিরজা, নয়তো শশধরবাবুর স্ত্রী। রমেশ জানে, বিরজার কোনো ভড়ং নেই। তার সতীত্ব তার রক্ত-মজ্জার জিনিস।

রমেশ চলে যাওয়ার পরে কাল কি হয়েছিল জানতে চায় সে। বিরজা বলে, কোনো খেঁকশিয়ালের গর্তে হাঁসের মতো পড়ে যায়নি সে। স্বামীর ঘরে স্ত্রী সারারাত ছিল। রমেশের দাবি, সে ছাড়া বিরজার তো বলার লোক নেই। কি ঘটেছে বলতে হবে তাকে। রমেশের স্পর্ধায় বিস্মিত হয় বিরজা। রমেশ চায় যে দুঃসহ জীবন বিরজা সাত বছর ভোগ করছে তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে। বিরজা বলে সেই তো চালিয়েছে, বেশ স্বস্তিতে চালিয়েছে। নাছোড় রমেশ তর্ক তোলে। শশধরের বয়স পঞ্চাশ নয়, সত্তর। তার সঙ্গ উপভোগ করবে কি করে বিরজা? সে স্বামীকে ভালোবাসে না, দাক্ষিণ্য করে। ভালোবাসা কি বিরজা বোঝেনি।

বিরজা বিদ্রূপ করে, 'তোমাকে ভালোবেসে বুঝতে হবে?' রমেশ বোঝায়, বিয়ের আগে বিরজার রূপের মাধুর্যে আকৃষ্ট অনেক তরুণ তাকে প্রেমপত্র দিয়েছে। বিরজা উত্তর দেয়নি। তাদের কান্নার মানে বোঝেনি। বিরজা মনে করে প্রণয় হল কলঙ্ক। যেখানে প্রণয় সেখানেই বিয়ে করতে হবে নাকি? রমেশের মতে প্রণয় এক অনির্বচনীয় কুহক। অসহ্য পুলকে দিনযামিনী যাপন। যে না বোধ করেছে তাকে বোঝানো যায় না। ভালোবাসা কি বোঝার আগেই বিরজা স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল। তাই সতী হয়েছে ও। কিন্তু যারা সাত বছর আগে মেয়েটিকে ভালোবেসে কত রাত নদীর পাড়ে বাবলা জিউলির জঙ্গলে যন্ত্রণায় কাটিয়েছে, তাদের মধ্যে পাড়াগাঁয়ে আরো কিছুদিন থাকলে কোনো ছেলের রূপের ফাঁদে পড়লে বিরজা প্রণয় কি বুঝতো। অনিল, শঙ্কর, দেবীদাসের জন্য খেলার সাথী হিসেবে ছাড়া বিরজার কোনো আকর্ষণ জাগে নি। নিজে রূপসী হয়েও সে রূপের দাম বা ইশারা বোঝেনি। প্রণয়ের ধারণা থাকলে সে বুঝত শশধরকে সে ভালোবাসে না, মমতাবোধ করে মাত্র।

এখন এই চব্বিশ বছর বয়সেও কি প্রণয় সম্ভব? রমেশ বলে, 'হয়তো সম্ভব, কিন্তু মন্দারডাঙায় যা সহজ ছিল, এখানে তা হওয়া কঠিন।' যেমন বিজয় বিরজাকে ভালোবাসত, সে মরে গেছে। সে তো দয়া চায়নি। ভালোবাসলে বিরজাও এমন কাউকে নিয়ে একটা কলঙ্কের জীবনযাপন করত। বিরজা জানায়, উপভোগ তার কাম্য নয়, স্বামীকেই সে ভালোবাসতে চায়। এই তার প্রেম। রমেশ বিদ্রূপ করে বলে, প্রেম বিরজা বোঝে না। সাত বছরে সন্তানও হয়নি তার। সন্তানস্নেহও বুঝল না। জীবনে তার কি রইল? বিরজা প্রতিবাদ করে 'সবই আছে রমেশ। প্রেম, প্রণয়।' রমেশ উত্তর দেয় সাত বছর রাতের পর রাত একটা সত্তর বছরের বুড়ো সঙ্গে সন্তান জন্মাবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা আছে শুধু।

এই ত্রিকোণ কাহিনীর মধ্যে শশধর অধিকার-সচেতন স্থূল সামাজিক মানুষ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় স্ত্রীর উপর সে শারীরী জুলুম কিছু করে নি। রমেশের আচরণে ক্রুদ্ধ হলেও অশালীন চিৎকার চেঁচামেচি করেনি। যুক্তিপূর্ণ তথ্য দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে তার সংসার থেকে সরে যেতে। বিরজা স্বামীর প্রতি অনুগত, কিন্তু তার অসংজ্ঞান আকর্ষণ রমেশের প্রতি। রমেশ বেশ ধূর্ত। বিরজার মোহের সুযোগ সে নিয়েছে। তার অন্তর্প্রকৃতির ধারণা থাকায় বুঝেছে কতদূর পর্যন্ত বিরজা তাকে সহ্য করবে। সেই মাত্রা মেনে তার প্রেমের খেলা বন্ধ হয়েছে শশধরের সামনে ধরা পড়ে, তখনই সে বিরজাকে প্ররোচিত করতে চেয়েছে, দাম্পত্য বন্ধন ভেঙে প্রণয়ের মাদকতা উপভোগ করতে। বিরজাকে আয়ত্ত করতে না পেরে শশধরকে প্রজনন-শক্তিহীন অপবাদ দিতে তার বাধেনি।

পরের গল্প **'মেয়েমানুষের রক্তমাংস'** আবার বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের বিশ্লেষণ কাহিনী। লীলার দীর্ঘকালের শখ স্বামীর সঙ্গে নৌকা বিহারে যাবে। অজিতই বিয়ের পর মিরাট ক্যান্টনমেন্ট থেকে এই প্রস্তাব তাকে দিয়েছিল। ভাঁওতা দেয়নি। বিয়ের পর নতুন মোহে আন্তরিকভাবে বলেছিল। যেমন বলেছিল ফরাসি উপন্যাস লীলাকে অনুবাদ করে শোনাবে।

আজ সে কুহক নেই। পরিস্থিতিও পাল্টেছে। ফরাসি রিয়ালিজম তথা অশ্লীলতা ধাতস্থ করার মতো লীলার যেমন সাহিত্য বোধের পরিপক্বতা নেই, তেমনি অজিতের

মনে নৌকা বিহারের আন্তরিক আগ্রহও নেই আর। জ্যোৎস্না রাতে স্বামীর সঙ্গে বাড়ির বাইরে মুক্ত প্রান্তরে বেড়াতে সে অনিচ্ছুক, পারিবারিক বাধার জন্য। কিন্তু তার আকৈশোরের স্বপ্ন মন্দারডাঙার খালে অন্তত একদিন ভালো একটা বজরা ভাড়া করে জ্যোৎস্নারাতে বেড়ানো, এ ব্যবস্থা এত দিনেও অজিত করতে পারল না। খরচের সংস্থান লীলা করে দিলেও করল না। লীলা বোঝে স্বামী তাকে এড়াতে চায়। রোজগেরে না হলেও গুণবান স্বামী সম্পর্কে লীলার মর্যাদাবোধ প্রগাঢ়। অজিত লীলাকে ভালোবাসে বটে, মনের বিরক্তি অসহিষ্ণুতার আকারে প্রকাশ পায়।

আনাতোল ফ্রাঁসের গল্প অনুবাদ করে লীলাকে শোনালে লীলা এই অশ্লীল মাথামুণ্ডুহীন কাহিনী সম্পর্কে আপত্তি জানায়। অজিত লীলার মানসিক সীমাবদ্ধতা বোঝে। তাকে সে স্পষ্ট জানায়, যখন মিরাট ক্যান্টনমেন্টে ছিল তখন স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা ছিল। কেউ তো চিরদিন কারো প্রতি মোহান্ধ থাকে না। আজ তাই সেই ভালোবাসা নেই। সাজাহান যদি আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচত, তাহলে হয়তো তাজমহল তৈরি হত না ; কিংবা নতুন বেগমের হুকুমে তা ভেঙে ফেলা হত। মোহান্ধ মানুষের এই পরিণাম। কিন্তু যুক্তিযুক্ত মানুষ নতুন প্রেমের অভিসারে না গিয়ে পত্নীর প্রতি স্নেহ বা করুণা করছে। মোহ প্রেম আর নেই। কালক্রমে অতি গোঁড়া দম্পতিও হয়তো মনে মনে চায় এ বাঁধন খসে যাক। কিন্তু খসায় না। তাতে ভালোমন্দ দুইই হয়, দাম্পত্যে যে কোনো নারীই এক। রূপ কিম্বা বৈদগ্ধ্য অথবা মেয়েমানুষের রক্তমাংস এর একটা বা সবকটা কতদিন মানুষকে তৃপ্তি দেবে?

অজিত খুশি কেননা তার স্ত্রী অপ্রেমের মানে বোঝে না। তার দেহ স্বামীর কাছে পাত্রের মত উন্মুক্ত। সে শেষদিন পর্যন্ত সতী থাকবে। এর অভাবে কত জীবন পশু হয়ে যায়। অজিত মনে করে দাম্পত্যের আনন্দ স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় মনে উত্তর প্রত্যুত্তরের চমক নিয়ে নয়। অনেকখানি দেহের আদান-প্রদান নিয়ে। কত রাজা বা কবির মোহ ক্ষুধাহীন স্ত্রীর অনিচ্ছায় নষ্ট হয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে অজিতের স্ত্রী তা নয়। যখন ঘরেব বাতি নিভে গেল, তখন মশারির মধ্যে উভয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অবারিত উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

আত্ম-সমর্পিতা লীলাকে ঘিরে এই বিতর্ক অবতারণাব সার্থকতা বোঝা গেল না। এ গল্পে অজিত লীলা সম্পর্কে কুহক মুক্ত। অথচ তারই রক্তমাংসের আকর্ষণে অবশেষে মশাবিতেই ঢুকে পড়ল। তবে এত ধানাই-পানাই করছিল কেন? বোঝা যাচ্ছে দাম্পত্যের সমস্যা ও রূপরেখা স্পষ্ট হয়নি এখনো। জীবনানন্দের এজাতীয় লেখার অধিকাংশই স্ত্রীর অবুঝ আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থপরতার ফলে দাম্পত্যের ব্যর্থতা বা সাংসারিক বেদনার কাহিনী। এগল্পটি সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। অজিতের প্রেম-বিষয়ক তত্ত্ববিলাস লীলার মানসিক দীনতা, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার অভাব, উভয়ের সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু লীলা যদি বিদ্রোহ করত গল্পের পরিণাম কি দাঁড়াত?

একঘেঁয়ে জীবন গল্পটি জীবনানন্দ সমগ্রর নবম খণ্ডে আছে। রচনা জুন '৩২-এ।

ব্যবসায় ফেঁপে উঠে একসময় ভাদুড়ি অনেক কলিয়ারি কিনেছিল। এখন বিক্রি করে দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে নয়, হিসাব কষে। ফ্যাশানদুরস্ত কিন্তু, উড়নচণ্ডী নয়। কলিয়ারিগুলো বিক্রি করে সাড়ে আট লাখ টাকা পেয়েছে। ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে।

সমরেশ বড়লোকের ছেলে, অনেক সম্পত্তি উত্তরাধিকারে পেয়েছে। যেমন খুশিমতো ব্যবসা করে। নতুন ব্যবসা ধরে নতুনত্ব ঘুচলে ছেড়ে দেয়। টাকার ওপর মায়াও আছে, টাকাও আছে। সে ভাল সেতার বাজায়। শিল্পীস্বভাব। সে ব্যবসা ফাঁদতে পারে। ঘোর ব্যবসায়ী নয়। ব্যবসার নেশা তার নেই। একে একে আট নটা ব্যবসা করলো। সব গেল ফেল মেরে। আসলে সে ঐ লাইনের লোকই নয়। কিন্তু কিছু না করলে লোক বলতো ব্যাটাচ্ছেলে কেমন সেতার সঙ্গত করে, বাঈজি পুষে, মদ খেয়ে পয়সাগুলো উড়োলে দেখত, এর বাপের এজন্য মুখে রক্ত ওঠে নি?

সমরেশ কখনো মেয়েমানুষ করে নি, জানে ভাদুড়ি। সেতার সঙ্গতও প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ভাদুড়ি বললো, ব্যবসা তুমি ছেড়ে দাও, ওদিক তোমার রুচি নেই, হাতযশও নেই। মনে আঘাত লাগল সমরেশের। মাত্র ১৫/২০ বছর আগে চৌরঙ্গির ফ্লাটে ফার্ম খুলেছিল সমরেশ। পরিশ্রম করেছে কঠোর। এতদিনে সাত লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। ভাগ্যে পৈত্রিকসম্পত্তি ছিল আগে। এদিকে ভাদুড়ি পথে পথে খুচরো চা বিক্রি করত। পুঁইশাকের চচ্চড়ি খাবার পয়সা জুটতো না। ৭/৮ লাখ কামাই করে ফিরছে।

সমরেশের ছবি আঁকায় ঝোঁক নেই। সাহিত্যে লোকে অলস অকর্মণ্য বলবে। এই বয়সে ৪৬/৪৭, সরকারি চাকরি হবে না। বিলেত গেলেই বা কি লাভ! এখানে বসেও টাইটেল জোগাড় করা যায়। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হতে হলে সাহেবি কায়দার হ্যাট টাই ছাড়তে হবে। কাউন্সিলরের এখন কি মান? অলডারম্যান হওয়া ভারি শক্ত। আন্তরিক স্বরে সমরেশ বলে, ১৫ বছর আগে ব্যবসায় নামার আগে তাকে পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না।

ভাদুড়ির অফিসে পরদিন তিনটায় সমরেশ গেল। কেউ বলতে পারলো না কোথায় সে। তার সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টাইপিস্ট হ্যানবারি জানালো ভাদুড়ি গ্রিলে আছে। সমরেশ গ্রিলে খুঁজতে গেল না। সন্ধ্যায় ভাদুড়ির দেখা মিলল ক্লাবে। তাকে আনলো নিজের ড্রইংরুমে। স্ত্রী প্রেমদা আর ছেলেমেয়েরা থাকে না এসময়। দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতা প্রগাঢ় হয়ে উঠল এখন। দুজনেই একমত ওদের জীবনে সুখ নেই। ভাদুড়ি টাকা করেছে বটে। ছেলেপিলেদের হয়তো সুখ হবে—কিন্তু এই একঘেয়ে জীবন বাঞ্ছিত নয়। পঁচিশ বছর আগে সমরেশ বিয়ে করেছিল প্রেমদাকে। সেই বিয়ের রাতে এমন কোনো বিশেষ পুলক ছিল না। ভাদুড়িরও। বরং বিয়ের আগে অন্যদের বিয়েতে ঢের ফূর্তি পেয়েছে ওরা, ভেবেছে নিজের বিয়ের রাতে এমন এক রূপসী বধূ কি গভীর উপভোগের জিনিস হবে। সুখ স্বর্গ পাবো। সকলেই যা ভাবে। দুজনেরই রূপসী বৌ। কিন্তু রূপের প্রতি এমন হতশ্রদ্ধ হলো কেন ওরা। ভাদুড়িকে বলে ও দেহের কোনো মূল্য নেই। মানুষটারও কোনো মূল্য নেই। একথা কাউকে বলারও নয়—এই স্ত্রীদের ভালোবাসতে চেষ্টা করতে হবে।

সমরেশের মনে হয় তা অসম্ভব। তাই বলে অন্য কাউকে তো ভালবাসতে পারবে না।

ভাদুড়ির মাঝে মাঝে মনে হয় মিস্ হ্যানবারি, তার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান টাইপিস্ট ছুঁড়িটাকে নিয়ে সটকে পড়ে। সমরেশের খারাপ লাগে।

প্রেমদারা এলো। সটান ঢুকে গেল ভিতরে। ওদের আলোচনা কি স্ত্রীকে বলবে ওরা?

প্রেমদাও কি জানাবে দুঘণ্টার পুরো ইতিহাস? জীবনটা ওদেরও একঘেয়ে, পারলে ওরাও পালিয়ে যেত। কিন্তু দাঁতকপাটি মেরে সহ্য করাই ভদ্রতা'।

ভাদুড়ি চলে যেতে প্রেমদার ঘরে ঢুকলো সমরেশ। প্রেমদাকে খুঁজলে কেন যে বিরক্ত হলো বৌ? কোমল করে সমরেশ শুধালো 'খেয়েছো?'

—'না বাকি আছে।'—'আমাকে খেতে দেবে না?'—'সুধাকে বলো'।

—'সুধা ঘুমিয়েছে।'—'সুধা ঘুমিয়েছে বেশ করেছে, মকবুলটা আছে কি করতে?'

মকবুল সমরেশকে খেতে দিল। সমরেশ ভাবছিল ভাদুড়ির কথাটা। ভদ্রলোকের মতো পালিয়ে যেতে পারলে স্ত্রীরাও পালিয়ে যেতো। সমরেশের মনে হচ্ছে ঘরের ভিতরে ওরা অভদ্রের মতোও পালিয়ে যেতে চায়।—পালায়।

এই তত্ত্ব, কালক্রমে মানুষের প্রেম প্রণয় ফিকে হয়ে যায়। তীব্রতা হারায়। জীবনানন্দের অনেক গল্পের মতো এখানেও বর্ণিত হয়েছে। তখন দিনযাপনের গ্লানি দুঃসহ হয়। ভদ্র সংযত মানুষ সামাজিক স্থিতাবস্থা রাখার জন্য বিচ্ছেদ দাবি না করে বিবাহিত যুক্ত জীবনযাপন করে, কিন্তু তার অন্তর বাইরের রূপ কেমন, সেটা এ গল্পে পরিস্ফুট।

জীবনানন্দ সমগ্রর নবম খণ্ডে **'কিন্নর লোক'** লেখা হয়েছিল ১৯৩২ সালের জুন মাসে।

একটা মাটির ভিটে। একটা পাকা ভিতের ঘর। আশ্বিন-কার্তিকে মাটির মেঝে ড্যাম্প বলে সরযূ আর ছোট মেয়ে হারানিকে সুবোধ শান বাঁধানো ঘরে পাঠিয়ে দিল। নিজে রইল পুবের স্যাঁতসেতে ঘরে। অন্য কোঠায় সুবোধের পিসিমা ও কাকা-কাকিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আছেন।

দক্ষিণের ঘরে সরযূ ননদ ঠাকুরপো পিসিমা কাকিমাদের সঙ্গে আনন্দে ও সুস্থ দেহেই আছে। দেড়মাস পুজোর ছুটি, হাতে কাজ নেই সুবোধের। প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করে বৌ খোঁজ করতে আসবে। তারপর পারস্পরিক মান-অভিমানের ভান। কিন্তু এসব তার কল্পনা, বিয়ে হয়েছে চারবছর। বউ সুন্দরী, সুস্থ, শিক্ষিত, হৃদয়ে প্রেম আছে। তিনদিন দক্ষিণের ভিটেয় চলে গেছে। সুবোধের কাছে এ তিনদিন যেন তিনবছর। খবরের কাগজ কতবার পড়া যায়। খুট শব্দ হলে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সরযূ এলো কিনা।

একটি বই পড়ছিল সুবোধ। সরযূ ও হারানিকে ভুলে অভিভূত হয়ে গেল সে। খাওয়ার পর দক্ষিণের ঘরে সবাই খেলে, সরযূ পানের ডিবে দিলে সুবোধকে। পান মুখে পুরে হারানিকে আদর না করেই পূবের ঘরে চলে গেল সুবোধ; ভুলে গেল ওদের কথা। বিকেল অবধি বই নিয়ে বেশ কাটলো। এখন একা থাকতে ভাল লাগছে তার। ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলে ঘুম ভাঙলে দেখলো বিড়ালের দুটো বাচ্চা তার দিকে তাকিয়ে আছে। দক্ষিণের ঘরে অনর্গল বকছে হাসছে সরযূ। অনেকে জুটেছে। সুলতা সুবোধকে চা দিয়ে গেল। 'সাধে কি বউদি তোমার কাছে আসে না। লম্বাছুটি বই পড়ে আর ঘুমিয়ে দেবে উতরে'। 'বউকেও কি বয়কট করেছো' রসিকতা করে সুলতা অন্তর্হিত হলো। ঠাণ্ডা সরপড়া চা। ধোঁয়া আর দুধপোড়া গন্ধ। তবু সুবোধ খেল। রেকাবিতে ঠাণ্ডা লুচি, পটলভাজা। সরযূ বেশ জানে গরম ছাড়া সুবোধ কিছু খেতে চায় না। খাচ্ছিল সে।

আধখানা লুচি কুকুরকে, আধখানা কাককে বিলিয়ে ফুরিয়ে গেল। অভিমানে নয় নিশ্চয়ই। হৃদয় রূপহীন গরম লুচি আর চায়ের চেয়ে সরযূ যদি আদর করে একবাটি মুড়িও এনে দিত! সুবোধ কবি নয়, প্রকৃতির ছবি দেখতে চাইল না সে। সংসারী মানুষ ; দুদিন ঘরটায় ঝাঁট পড়ে নি। ঝাঁট-দেওয়া, ধূপ-দেওয়া চাকরদেব দিয়েও করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। সুবোধ কেন বলতে যাবে? পাঞ্জাবি গায়, স্টিক হাতে সুবোধ পানের জন্য অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়ল। মিউনিসিপ্যালিটির পথ ছাড়িয়ে গাঁ পর্যন্ত গেল। নিস্তব্ধতা যেন গিলতে আসছে। অন্ধকারে কত জোনাকি, নিজেকে মনে হলো জোনাকি কাঁচ-পোকারও অধম। কুয়াশায় নদীর দিকে তাকিয়ে এক নিষ্ফল বেদনা পেয়ে বসল সুবোধকে। যেন কত জন্মের ফাঁকে ফাঁকে কত কি তার হারিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে সব ভুলে গেল সুবোধ।

বারান্দায় একটা লণ্ঠন রয়েছে। যে রেখে গেছে সে ঘর সাফাই করার দরকার মনে করেনি। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল। ঠাকুর বললো, ঢের রাত হয়েছে। ওঁরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। 'সাড়ে নটা এমন আর কি রাত ঠাকুর?' টেবিলের ওপর কাগজ পেতে ঠাকুরকে ভাত এনে দিতে বলল সুবোধ। রামচরণ কথকতা শুনতে গেছে। ঠাকুরও যাবে। ভাত এলো ঠাণ্ডা, উনুনে হয়তো আগুন নেই আর, হয়তো রান্নাঘরে গিয়ে নিজের ভাত গিলছে বেচারা। খাচ্ছে সুবোধ, বউর উপর অভিমান করে ভাত খাবে না কেন? মাকে অবশ্য মাঝে মাঝেই সুবোধের অভিমান ভাঙাতে হতো। জননী ছিল, আর এ বধূ।

জানা গেল, সুবোধ আসার আগেই ঠাকুর খেয়ে নিয়েছে। পিসিমা, নরেন, মণ্টু— সবাই গাঙ্গুলিবাড়ি কথকতা শুনতে গেছে। সরযূও হয়তো ভেবেছে স্বামী কথকতায় গেছে বোধহয়। একা কিভাবে থাকবে ভেবে হয়তো পিসিমার চাপাচাপিতে সরযূ গেছে।

কিন্তু ঠাকুর জানালো, সুলতা আর সরযূ যায়নি। ওদের একটু দেখবেন। ঠাকুর দৌড় দিল গাঙ্গুলিবাড়ির দিকে। সরযূর নাকডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কল্যাণী বউ, স্বামীকে হাতে গরম জিনিস পরিবেশন করতে পারলো না। অভিমান করবে না সুবোধ। হয়তো প্রেম ওর হৃদয়ে নেই সুবোধের জন্য। ভিক্ষা করতে যাবে না সে। নিজের অনুভূতির কল্পনার গোপন জগতে পৃথিবীর বিপুল রসস্রোতের অপ্রতিহত সঙ্গীতের ভিতর সুরবিলাসী কিন্নরের মত সে ঘুরে বেড়াবে। নবজীবন হবে তার।

বিয়ের আগে সুবোধ কবি ছিল। এখন সে বাস্তববাদী সমীচীন মানুয। কিন্নরলোক নিয়ে থাকা যায় না। আবার ভাতে হাত দিল সে। ভড়ভড়ে ভাত তরকারি দিয়ে মেখে নিল। অপ্রেম অবহেলা সে অনেক পেয়েছে। বুঝেছে প্রেম কোথাও জমে না। কল্পনা করতো বরবধূর মিলনের ভিতর দিয়ে জীবনের অনির্বচনীয় শিহরণের সুরা অনিবার পান করবে সে।

স্বপ্নের রাজকন্যাকে তো সুবোধ পেল। ঘুমন্ত পুরীর হিরের পালঙ্কে সরযূকে খুবই সুন্দর মানায়। সুন্দরী বউ সে।

স্ত্রীর দাম্পত্য কর্তব্য পালনের দাবি পূর্ণ না হওয়ায় স্বামীর অভিমান এ গল্পটির বিষয়। জীবনানন্দের অনেক গল্পে বড়ো একান্ন পরিবার ও স্বামী একপক্ষ আর অলস কর্তব্যহীন,মুখরা স্ত্রী প্রতিপক্ষ। এ গল্পে কিন্তু বিপরীত চিত্র। এখানে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সরযূ

সংসারের পাঁচজনের মিলেমিশে ফূর্তিতে আছে। অলস বিরামের জীবনযাপন করছে। স্বামীকে যথাযথ তোয়াজ দেখাশুনা করছে না এই মনঃক্ষুণ্নকর অভিযোগ নিয়ে সুবোধ যেন মামলা সাজাচ্ছে। প্রস্তুত হচ্ছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম বিবাদের। এই সেন্টিমেন্টালিজম গল্পের মান ক্ষুণ্ন করছে।

জীবনানন্দ সমগ্র সপ্তম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত **'বাসর শয্যার পাশে'** গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৯৩২ সালের মে মাসে। বিবাহপূর্ব জীবনের বন্ধনসমূহ পেরিয়ে মেয়েদের বিবাহিত জীবনের বন্ধনসমূহকে স্বীকার করে নেবার মানসিকতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে এ গল্পটিতে।

নম্র নিষ্ঠাবান বংশের সন্তান দেবব্রত পূজনীয়দের অনুগত হয়ে চলে। কাকা মেয়েটিকে পছন্দ করে এলে দেবব্রত তাতেই সম্মতি দিয়েছিল। বিয়ের সময়েও এমন আবেগে কেটেছে তার নববধূকে ভালো করে দেখার অবকাশ পায় নি। ইতিমধ্যে সে উড়ো খবর পেলো জানলার ফাঁক দিয়ে দেবব্রতকে দেখে বউ নাকি কেঁদেছে খুব। এ ছেলেকে বিয়ে করতে চায় নি। কিন্তু কার্যত কন্যাপক্ষে কোনো চিহ্ন ছিল না এমন অস্বস্তির, যথাযথভাবে বউ এলো, অনুষ্ঠান ঠিকমতোই হলো।

দেবব্রত লম্বা দোহারা ফরশা বরং—পুরুষোচিত সুন্দর সুদর্শন সে, মনে হয় না তার দৈহিক কোনো খুঁতের জন্য নীহারের মন বেঁকে বসতে পারে। আসলে বেচারাম ওই এক বাচাল কুচুটে মানুষ—তার কথার ঠিক কি?

বাসরে অনেক রাত করে বউ এলো। চৌকির এক কিনারে বসে বাইরের গাছ-গাছালির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। দেবব্রতর দিকে তাকালো না। দেবব্রতও স্থির করলো বউকে বিরক্ত করবে না। বাসরে নতুন বর-বৌ পরস্পরের কাছে একটু লঘু আমোদ মমতা প্রথম দাম্পত্যের নিবিড়তার স্বাদ আশা করে হয় তো, হয়তো সব বাসরশয্যাই একটু বিমণ্ডিত হয়। যাই হোক বিমুখ মেয়েটিকে দেবব্রত ত্যাগ করবে না। তাকে একটু ফিরেও বসতে বলবে না। এই মুখ দেখবার ঢের সময় তার হাতে রয়েছে। নিজের কুমারী জীবনের এই শেষ বিদায়-বিধুর রাত সে নিজের মত করে উপভোগ করুক।

দুরে বনে নদীর কিনারে জ্যোৎস্নায় মৃদু বাঁশির শব্দ। নীহার নড়েচড়ে উঠলো। যেন এমন কিছুর অপেক্ষা করছিল সে। মোহাবিষ্ট হয়ে শুনছে। হয়তো কোনো ভালোবাসার ইশারা। এ মেয়েটির প্রতি গাঁয়ের কোনো ছোকরার প্রণয়। নীহারের কান্নার মানে বোঝা যায়। আত্মহারা না হয়েও অনেকে ভালোবাসে। ব্যথা অনুভব করে। সহানুভূতির গভীরতা নিয়ে নীহারকে দেখলো দেবব্রত। হয়তো ছেলেটি কিশোর, এর সমবয়স্ক, সাথী, প্রলুব্ধ প্রণয়ী বিচ্ছেদ বেদনাতুর। দেবব্রত কখনো নিজেও এমন ছিল নাকি?

বাঁশি থেমে গেছে। কে গুনগুন করে গান গাইছে। রাধিকার বিচ্ছেদের গান। নীহার আস্তে আস্তে উঠে গেল। দেবব্রত ডাকলেও শুনলো না। বিয়ে না হতেই দেবব্রত হাঁপিয়ে উঠেছে যেন। গান থেমে গেছে। কাছেই কারা হাসছে। ইয়ার্কি করছে। তবু মাঝে মাঝে অশ্রুসিক্ত গলার খাঁকরি। এক সময় একজন বর্ষীয়সী নীহারকে ঠেলে বাসর শয্যার এক কিনারে পৌঁছে দিলেন। তখন ভোর। শয্যাতুলুনির দল হাজির।

নিষ্ফলতার আশঙ্কা কেটে গেছে। ফুলশয্যার ছাপর খাটে বসে পান চিবুচ্ছিল মেয়েটি—

'বেশ পান তো!' না বোবা নয়। বাচাল। অধিকার সচেতন, আত্মসর্বস্ব, অসভ্য, 'আমি কাউকে কেয়ার করে কথা বলি না।' বাসর রাতের গানের প্রসঙ্গ তুলেছিল দেবব্রত। 'ভারি সুন্দর গায়, ছেলেটি কে?' উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলেটির নাম চারু। বিয়ের আগে ছ'বছর প্রেম করেছে সে, কিন্তু 'এখনত আমি পরের স্ত্রী।'

নীহার বলে, চারুকে সে ভালবেসেছিল ঠিক ভাইয়ের ·ত। সে চেয়েছিল নীহার তার স্ত্রী হয়। কিন্তু নীহার পাড়াগাঁয় বিয়ে করতো না। কারণ চারুদের খোড়ো ঘর। আর এক ধিঙ্গি ধ্যাড়ধেড়ে মাগী দিনরাত হাঁড়ি ঠেলে—সে হতো তার শাশুড়ি। আর দিনরাত হাঁড়ি হেঁসেল সামলাতে হতো নীহারকে। নীহারের কাঁচা শরীর, সুন্দরীদের যা হয়, কষ্ট করার ধাত নেই।

সুখ আর স্বার্থের জন্য প্রেমিককে নীহার বিয়ে করেনি। সুখের জন্য সংসারে এসেছে। কাজ করবে না। স্বামী দেবব্রতকেও সে রাত্রে আদর করতে দেবে না। তাকে আলাদা বিছানায় শুতে বলেছে সে।

স্ত্রী আসে অপরিচিত এক পরিবেশ থেকে। তার মানসিকতাও অজানা। কিন্তু স্বামীর কাছে সংসারের কাছে ক্রমে তার স্বভাব স্বরূপ যখন উদঘাটিত হয় তখন বাইরের রূপের অন্তরালে মানুষটা তত আকষর্ণীয়, তৃপ্তিকর মনে হয় কিনা সন্দেহ। এই নিয়েই আলোচ্য গল্পটি। নীহার এক কুঁড়ে বাচাল নির্লজ্জ ও স্বার্থপর মেয়ে। স্বামীকে কিছু দেওয়ার আছে, অন্তত একটা মৌখিক সৌজন্যের সম্পর্কও যে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে এত কিছুর তোয়াক্কাও সে করে না। জীবনানন্দের সদ্যবিবাহিত অভদ্র স্ত্রীকুলের নীহারও একজন সদস্যা। অবশ্য স্বামী দেবব্রত যথেচ্ছ বিবেচক ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিপরায়ণ।

'বাসর ও বিচ্ছেদ' ১৯৩২ সালের মে মাসে রচিত আর এক অসভ্য অশালীন নববধূর কাহিনী। জানি না লেখক কোথায় এর আদল পেয়েছেন। প্রীতিভোজে পরার শাড়ি বাছতে ব্যস্ত অমলাকে হেমপ্রভা রান্নাঘরে নিয়ে যেতে পারলেননা। সে হাসতে হাসতে রূঢ় ভাষায় বলল, 'পোলাও রাঁধব আমি? এখন এই টয়লেটের পর? পেন্টিং অবধি হয়ে গেছে। বাপরে, এ বাড়ির কি আক্কেল!' দাঁড়াতেও রাজি হলো না সে।

বাড়ির মেয়েরা চায় খদ্দর পরুক বৌ। কিন্তু অমলা বার করলো এক অপরূপ জর্জেট শাড়ি। বিলিতি শাড়ি বলে সে আপত্তি গ্রাহ্য করলো না। ডবল করে পরার প্রশ্নও সে অগ্রাহ্য করলো। রোহিণীবাবু তাকে পরিবেশন করার প্রস্তাব দিলে স্পষ্টই নাকচ করে দিল সে। তার মতে এসব 'ভড়ং'। স্বামী প্রসাদ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। মা বোনের মধ্যে যে নমনীয়তা, নম্র মাধুর্য দেখেছে প্রসাদ তার বদলে দেখলো অমলার মুখ রাগে অপমানে ঘৃণায় কান্নায় টসটস করছে। সুন্দরী যে নারীকে বাসর রাতে কুহকিনী মনে হয়েছিল, এখন তার মধ্যে কোনো কুহক ইন্দ্রজাল নেই।

সচ্চরিত্র সফল যুবক প্রসাদ কুহক চায় নি। একটি মধুর চরিত্রের সহচরী চেয়েছিল মাত্র। আলো ছাড়া অমলা নাকি ঘুমোতে পারে না। চড়া আলো চাই। টেবিল ল্যাম্প নয়—ইলেকট্রিক লাইট। প্রসাদের ইচ্ছা হচ্ছিল ছাদে চলে যায়। তবু দাঁড়িয়েছিল সে। বউ বলল—'কেমন হলো বৌভাত।'—'ভালোই'।

অমলা কিন্তু বিকৃতমুখে রান্নার নিন্দা করছিল। শাশুড়িকেও খোঁচা দিল। 'বুড়োধাড়ি মেয়েমানুষকে আবার রান্না শেখাতে হয়!' প্রসাদ কিছু বললো না। অমলার ধারণা, একা মেয়েমানুষ শ্বশুরবাড়ি এসেছে বলে তার উপরে জবরদস্তি চালানো হল।

প্রসাদ বোঝাতে চাইল—'এমন একটা উৎসবের বাড়িতে তুমি একা বিমর্ষ হয়ে রইল—জিনিসটা ভাল হল না। তোমার ভাল লাগল না। আমাদেরও অস্বস্তি বোধ হল। ভেবে দেখ তুমি আজ একটা সুন্দর দেশী শাড়ি পরে নম্র কমনীয় বধূ হয়ে বেরলে কত ভাল লাগত আমাদের। নিজেও কত স্ফূর্তি বোধ করতে, যারা নিমন্ত্রনে এসেছিল, তারাও কত তৃপ্তি পেত'।

অমলার একথা মনঃপূত হলো না। সে লোকজন চায় না, একটা আলাদা বাড়ি, সেখান কেবল প্রসাদ থাকবে, আর কেউ না। আর আরেকটি জর্জেট শাড়ি কেনার জন্যে কালই অমলার হাতে প্রসাদ চারশো টাকা দেবে, সে নিজে গিয়ে কিনে আনবে।

এবার আশ্চর্য! সে নিজে উঠে সুইচটা নিভিয়ে দিয়ে এলো। বললো, 'ঘুম পাচ্ছিল না বলে জ্বেলে রেখেছিলাম।' দেয়ালা করছিলাম এতক্ষণ। প্রসাদকে কথা বলতে বারণ করে সে দেয়ালে মুখ ফিরিয়ে শুলো। বললো যে ইদুরের হাঁচিতে তার ঘুম ভেঙে যায়। নিরিবিলি ঘুমোতে চায় সে। প্রসাদ ছাদে শুতে যাক।

ঘুমিয়ে পড়লো অমলা। কিন্তু মাঝরাতে উঠে পাছে ঝামেলা করে এই ভয়ে ছাদেই চলে গেল যুবকটি।

নববিবাহিতের এমন অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক সন্দেহ নেই।

১৯৩২ সালে জুন মাসে বরিশালে লেখা হয় ছোটগল্প **'মেয়েমানুষ'**। চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে। হেমেন আর চপলা স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে গিয়েছে দ্বিজেনের বাড়ি। তাদের তেতলার ডাইনিং হলে রণচণ্ডী লীলা পাঁউরুটি কাটার ছুরি হাতে নাচছে। রেগে দ্বিজেনের দিকে ছুড়লো ছুরিখানা। ভাগ্যে দেওয়ালে লাগল। লীলার ধারণা হেমেন আর চপলা তুইয়ে-বুইয়ে দ্বিজেনের মাথা খেয়েছে।

চেয়ারসমেত চপলাকে তুলে দ্বিজেন ফ্যানের নিচে বসালে লীলা ক্ষেপে যায়। 'চপলার গায়ে হাত দিলে তুমি।' সামনেই এত, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টা বাইরে সে কি করে বেড়ায়। লীলার বক্তব্য, টাকা জমানোর কি দরকার? চপলা বোঝাতে গিয়েছিল হেমেনও আঠারো ঘণ্টা বাইরে থাকে। কিন্তু লীলা মনে করে টেকো বোঁদা চেহারার হেমেনের সঙ্গে কে গাঁট বাঁধতে আসবে? এইসব ঝগড়া-ঝাঁটিতে তাদের আড্ডা, সিনেমা যাওয়া সব ভেস্তে যায়। পরে একদিন হেমেন আর দ্বিজেন আলোচনা করছিল বাস্তবিক টাকাই তো সব নয়। তার এই চেহারায় মেয়েদের পিছনে ঘুরেফিরে সুবিধে হয় না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের বায়োস্কোপ দেখিয়ে হেমেনের সাধ মেটে না। চপলা চমৎকার গিন্নী। কিন্তু হেমেন চায় মেয়েরা তাকে দেখে ভুলুক। হেমেন কি এমন যে মেয়েরা তার পিছনে ঘুরবে? দ্বিজেনের সুন্দর চেহারা, বড়লোকের ছেলে, মোটা রোজগার। হেমেন ব্যথাটা ভুলতে পারছিল না। দ্বিজেন অনেক ফূর্তি করেছে। এই আধবুড়ো বয়সেও কত ব্যারিস্টার-গিন্নীর সঙ্গে তার ইয়ার্কি চলে। দ্বিজেন বাধা দিয়ে বলে, 'ইয়ার্কি শুধু, আর কিছু না।'

হেমেনের মতে, ইয়ার্কিটাই ঢের মিষ্টি। দ্বিজেন বলে নিজের বউয়ের সঙ্গে হাসিতামাশাই বেশি ভালো লাগে। দ্বিজেন সেখানে ঠকেছে। লীলা তার মনটা খিঁচড়ে দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা তো তাকে ভালোবাসে। ছিনালপনা সবসময়ই ভালো লাগে।

হেমেন ভাবে, দ্বিজেনের মত পরের স্ত্রীদের এমন গুছিয়ে রাখতে কে পেরেছে। কেন এমন হয়? দ্বিজেন বোঝায়, মেয়ে পটানো ত্রিশের পর আর হয় না। সতেরো আঠারো কুড়ি বাইশ বয়সে তার যা হবার হয়েছে। এখন নিজের ঘরে স্ত্রীকে নিয়ে শান্তি পেতে চায়। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মেয়েরা এখন তাদের জ্যাঠামশাই বা ঠাকুরদা ভাবে। হেমেন প্রশ্ন করে, অন্তত ত্রিশ বছরের মেয়েরা? দ্বিজেন বলে জগতে সৌন্দর্যের অভাব নেই। 'কুড়ি ত্রিশ পঞ্চাশ বছরের তিন পুরুষের আঠারো চল্লিশ পঞ্চাশ সুশ্রী মেয়ের মধ্যে যেমন আঠারোর দিকেই মন যাবে তেমনি মেয়েদের মন পৃথিবী বিকিয়ে দিলেও পঞ্চাশ বছরের বুড়োর দিকে ছুটবে না।'

দ্বিজেনের বউ লীলার তুলনায় স্ত্রী চপলার কথা ভেবে হেমেন তৃপ্ত। সে দ্বিজেনকে তার সঙ্গে শহরে চক্কর দেওয়ার প্রস্তাব দিল, দ্বিজেন গেল না। গাড়ি নিয়ে হেমেন চলে গেল। দ্বিজেন ট্যাক্সি নিয়ে চপলার কাছে গেল। চপলার বিরাট মেদ হলেও তার তলায় যে হৃদয় আছে তা চমৎকার নমনীয়। তার সাথে রাত দশটা অবধি কাটল দ্বিজেনের। হেমেন ফিরবে এখনই। দ্বিজেনকে আগেই চলে যেতে হবে। অনেক ড্রইংরুমে সে ঘোরে বটে, কিন্তু এমন বেরিয়ে যেতে হয়। গিন্নীরাও চায় স্বামী আসুক। এ অতিথি বেরিয়ে যাক। দ্বিজেন বেরিয়ে গেল।

উচ্চমধ্যবিত্ত নারীপুরুষের স্বভাবচরিত্রের ছবি ফুটেছে এই গল্পে। লীলা বদমেজাজী হলেও চপলাব চেয়ে ভালো স্বভাবের মনে হয়। বাকি সব চরিত্রই মুখে ও মনে ভিন্ন রকম। জীবনানন্দ মনে করতেন বিত্তবান বয়স্ক নারীপুরুষের রিরংসা ও কামুকতা দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতাকে নষ্ট ও ক্লেদলিপ্ত করে। এমন কয়েকটি গল্পের মধ্যে পরের গল্পটিও অন্যতম।

জুন ১৯৩২-এর আর এক সমজাতীয় গল্প **হিসেবনিকেশ** বরিশালে বসে লেখা। সফল ব্যবসায়ী অবনীশ ত্রিশ বছরের বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে তৃপ্ত থাকবে এমন ভাবে না। কিন্তু সমস্ত জীবন ঝেড়ে একটি সুন্দরী মেয়েও খুঁজে পায় না। তার ব্যবসায়ী বন্ধু রাখাল খুব অন্তরঙ্গ। তার কাছে আক্ষেপ করে অবনীশ যে বাড়ি ফেরার মুখে তার স্ত্রী বেরিয়ে পড়ে। ছ'টায় এম্পায়ারে ন'টায় নিউ এম্পায়ারে পারফরম্যান্স দেখে বারোটা একটায় ফিরবে রোজ।

রাখাল বলে, 'ব্যবসা হল জোচ্চুরি। মানুষের ঘরে ভালো জিনিস পৌঁছে দেব এ ধারণা নিয়ে ব্যবসা চলে না। বিজ্ঞাপনের জোরে অন্যদের ঠকিয়ে সাধারণ মাল ভালো বলে প্রচার চালিয়ে বিক্রি বাড়াতে হবে। ভালো জিনিস হয়ত ওঁচা দোকানে মিলবে।' রাখালের কাছে ব্যবসা একটা আর্ট। অবনীশ ভাবে, সে যন্ত্রের মতো এজেন্সি চালায়। অবনীশের মেয়ে কুন্তলাও গান বা বই প্রসঙ্গে আর্টের কথা বলে। নিশ্চয়ই খুব নিখাদ রস পায়। কুন্তলা অবনীশের হাতে পুরস্কৃত যে বই তুলে দেয় তা পড়ে অবনীশ কিছু বোঝে

না। সে তৃপ্তি পায় হুইলারের স্টলের বইতে। সে সব বই দেখে কুন্তলা, সৌমেন ঠাট্টা করে। ছেলে-মেয়েরাও তাকে টপকে গেলো।

সন্ধ্যায় অবনীশ একলা বই পড়ছিল। সে আর স্ত্রী অমলাকে অপরিহার্য ভাবে না। শুধু চায় সে কর্তব্য করে যাক। ভালো না বাসলেও চলবে। তার আড়ালে অন্য পুরুষের সঙ্গে উচ্ছ্বাস দেখালেও আসে যায় না। কিন্তু অন্যদের সামনে অবনীশের সঙ্গে ব্যবহারের ত্রুটি অপমানজনক। এইভাবে প্রেম বিসর্জন দিয়েও ওরা তৃপ্ত আছে।

সেদিন বিকেলে রাখাল এলে অবনীশ বলছিল এবার উপার্জন ছেড়ে দেবে। আকাঙ্ক্ষিত সবকিছু তো পেয়েছে। প্রতিষ্ঠাও মিললো। কিন্তু এই নিরুৎসাহের কারণ বাইরের সাংসারিক সম্পর্কের যে চিড় তা বাইরে থেকে স্পষ্ট না হলেও বিচ্ছিন্নতা আছে। রাখাল জানে আহ্লাদী পুতুলের শোকের মতো অবনীশের এই সাময়িক গোমড়া মুখ কেটে যাবে।

পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের অপ্রেমকে যথেষ্ট সংযমে ও কৌশলে অমলা ঢেকে রেখেছে। কোনো কলঙ্কের ইশারা নেই। অবনীশ একটা কোলা ব্যাঙ। কলঙ্ক করার মত বুদ্ধি, সাহস বা কল্পনা কই! লোকটার জন্য রাখালের কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। সে বরং ঠিক করল অবসর মতো অমলাকে একটুআধটু দেখবে সে। নইলে আমৃত্যু একাদশী করে মরবে কি মেয়েটা?

ব্যবসায়ী ধনবান মানুষদের অসুখী দাম্পত্য জীবন ও লম্পট স্বভাব এই গল্পেও প্রকাশ পেয়েছে। নিজের স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কে তারা তুষ্ট নয়। আসলে সৌন্দর্যবোধ যাদের নেই, জীবনের আর্ট যারা গড়ে নিতে পারে না, ছুঁকছুঁক করে অন্য মেয়েদের পিছনে তারা ঘুরে মরে অথচ ধূর্ত বন্ধুরাই তাদের এই নষ্ট অসুখী দাম্পত্যের সুযোগ নিতে ওঁতপেতে থাকে। আগেই বলেছি এ গল্পটি 'মেয়েমানুষ' গল্পটির অনুষঙ্গী ও পরিপূরক।

'হৃদয়হীন গল্প' ১৯৩২-এর জুন মাসের রচনা। একটা টিনের আটচালা আর একখানা মাঝারি দোতলা দালান। এই নিয়ে যৌথ পরিবার। অমরেশ আর নীলিমা থাকে টিনের ঘরটায়। আগে এখানেই অমরেশের মা বাবা থাকতেন। দালানে কাকা পিসি অন্যান্য পরিজনরা থাকেন। দালানে অনেক কামরা। পরিবারের সবাই এলেও দু-তিনটি বড় বড় ঘর খালি থাকে। নীলিমার খুব ইচ্ছে কোঠাঘরে গিয়ে থাকার, কিন্তু বিয়ের পর তিনবছর হলো। অমরেশ টিনের ঘরেই তাকে রেখেছে।

অমরেশের বাবার টাকায় দালান হয় নি। অমরেশ নিজেও কিছু প্রায় করে না। তাই সে চায়, নীলিমা ইচ্ছে করলে দালান বাড়িতে থাকুক সে নিজে টিনের ঘরেই থাকবে। নীলিমার আকাঙ্ক্ষার উপর জোর ফলাবে না। ঘর ঠিকঠাক করার ক'দিন দালানে থাকলেও, পরে নীলিমাকে সেখানে রেখে টিনের আটচালাতেই সে ফিরে এলো। দেড় বছরের মেয়েটিকে নিয়ে নীলিমা বড় খুড়িমার পাশের ঘরে বিছানা তোরঙ্গ পেতে গুছিয়ে বসলো অমরেশ ভাবলো, সমস্ত রাত একা মেয়েকে নিয়ে থাকতে শ্রান্ত হয়ে বৌ চলে আসবে। আটচালাটাই বা মন্দ কি? অবশ্য দালানের সুখ আলাদা। দক্ষিণের দিকে খোলামেলা ঘর। সামনে দিগন্তখোলা ধানক্ষেত। ঘরের পাশে দুটো

মস্ত শিউলি গাছ—স্থলপদ্ম। নীলিমা ভোরে কুড়োয়, পাড়ে। মিউনিসিপ্যালিটির লাল রাস্তার ঝাউগাছের সারি।

দিন কাটছে। নীলিমা দালানেই টিকে রইল। বেলা বারোটায় উত্তরেব বারান্দায় পাত পড়ে। অমরেশ গিয়ে খেয়ে উঠে আসে। বউ পান সাজছে। কথা কইবার অবসর নেই। মেয়েলি গল্পের তুফান চলে। বউকে ইচ্ছা মতো কাছে পাওয়ার অনুনয় তাকে জানাতে হবে? বরং নীলিমাকে বাদ দিয়েই চলবে সে।

ভোরে সীতানাথ এসেছে চা মুড়ি বাতাসা দিলো। উপদেশ দিলে দরজা খোলা না রাখতে, জানালাও বন্ধ করতে। বউ সবসময়েই জানালা বন্ধ করে দিত। নিজের শরীরের জন্যেই তাকবাক করতো সে। সীতানাথ বলতে পারলো না খুকি দুধ খেয়েছে কিনা। নীলিমা ঘুমোচ্ছে। কান পেতে শুনলো অমরেশ নীলিমা জেগে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

অমরেশ কি আর চায়? শরতের পৃথিবী সুন্দর হলেও, একঘেয়ে দৃশ্য। বই আছে, খবরের কাগজও, মানুষ কেউ কি তার জীবনে থাকবে না। সীতানাথকে পেলেও হয়। নিজে কথা বলতে না পারলেও, শুনতে পারে বেশ। দালানে বউ অনর্গল কথা বলে চলেছে।

দুপুরে দরদালানে অমরেশ নীলিমাকে খুঁজছিল। কিন্তু জানায়নি মুখ ফুটে। জ্যোৎস্না পান দিতে এলে, সে পান নিয়েই চলে এলো না। কিন্তু নীলিমাকে ত্রিসীমানায় পাওয়া গেল না। পিসিমা, কাকিমা, বড় কাকা, বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে তাসখেলার মাছধরার, নদীর চর, ডিসপেপশিয়া ও ডায়াবেটিসের খাদ্যাখাদ্য নিয়ে কথাবার্তা হলো অনেক। কাকার সুখ—স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কেও কাকিমার সতর্ক তত্ত্বাবধানের নানা পরিচয় পেল আবার। নীলিমাও মাঝে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাকা কাকিমার কথাবার্তা শুনছিল। কাকিমা উপরে যেতে সেও অন্তর্হিত হলো। অমরেশের অপেক্ষাই সার। সে ফিরলো না। সীতানাথ জানালো কাকিমা কর্তাবাবুর মাথা টিপছেন। মাথা ধরেছে না কি? সীতানাথের মন্তব্য, ওসব শখ, বাড়িতে গেলে তার বৌও তাকে সুখের বাদশা বানিয়ে দেয়।

স্নানের ঘর থেকে নীলিমার গলা পাওয়া গেল। চপলাকে হাসতে হাসতে বড় কাকা ও কাকিমার কথা বলছিল সে।

নিজের ঘরে ফিরে অনেকবার নীলিমাকে প্রত্যাশা করল অমরেশ। খেয়ে আসবে, খুকিকে বাবার কাছে রাখতে আসবে। অমরেশের ডিবেতে পান ভরে দিতে আসবে। এলো না। বারো দিনের মধ্যে দুবার এসেছিল মাত্র। তাও চপলা তার জ্যোৎস্নার সঙ্গে। একা আসেনি। ভাবলে প্রাণ অসাড় হয়ে যায়।

বিকেলে সীতানাথ চা আনল। সন্ধ্যায় অমরেশ ভাবছিল এখন সে কি চায়। চায় নীলিমা আসুক। কাকা কাকিমার গল্পটা হাসতে হাসতে বলার জন্যও আসতে পারে। দুটি আন্তরিক মানুষের দাম্পত্যকে ঠাট্টা করতেও আসুক। পৃথিবীতে যেখানে প্রেম দাক্ষিণ্য সহানুভূতি—উপহাস করে উড়িয়ে দিয়ে যাক। শরতের শিশিরে এই তিমিরাহত রাতভরে হৃদয়হীন পরান্মুখ এই মেয়েটি থাকুক কেবল।

গল্পটি 'কিন্নরলোক' গল্পের পরিপূরক ; আত্মকেন্দ্রিক নিষ্প্রেম এমন বধূকে নিয়ে জীবনানন্দ অনেক গল্পই লিখেছেন। এটিও তেমনি। কিন্তু ব্যথাহত প্রেমিক স্বামী এখানে স্ত্রীকে কিছুতেই নাগালে আনতে পারলো না। অভিমান জানাবার অবকাশও পেল না। সমস্ত পরিবারের প্রগাঢ় জীবনযাপনের মধ্যে সে যেন পিছলে মাছের মত পালিয়ে ডুবে রইল। অবশ্য অভিমানের প্রবলতা এ গল্পেও নেই।

'বিবাহ ও অবিবাহ' ১৯৩২ সালের জুন মাসে রচিত এই গল্প। অমূল্য লিখছিল। কলম থেমে আছে, এক বিমুখতা ও অবসাদের মুহূর্তে। জল চেয়েছিল সরযূর কাছে। সরযূ হরিচরণের উপর বরাত দিয়ে গেল। হেমন্তের দুপুর। মুমূর্ষু প্রকৃতির বুকে নিজেকে খাপছাড়া মনে হচ্ছিল। অমূল্যের কাছেই কুঁজো—খুব পিপাসা ছিল। জল নেওয়া কঠিন কি? তবু বৌর কাছে চেয়েছিল অমূল্য। হরিচরণ আসতে, জিজ্ঞাসা করতে অমূল্য অস্বীকার করল। হরিচরণ জল দিলেও সে খেল না।

সরযূ এসে দরজা ধাক্কালো। বললে, বড্ড গোলমাল করো তুমি, দেরাজ থেকে এলাচ লবঙ্গ খুঁজছিল সে। পানের মশলা করছিল সে এতক্ষণ। এলাচ-লবঙ্গ কম পড়ে গেছে। ভাগ্যিস তোমার ড্রয়ারে ছিল, নইরে বাজারে পাঠাতে হতো গিরিশকে। আজকে আর কারো পান খেতে হতো না।

'এখনো কারো খাওয়া হয় নি?'—কর্তারা বসেছেন,—'আমিও তো একজন কর্তা।' অমূল্য খেয়ে এসেছিল। সরযূ চলে গেল। দেখলো না হরিচরণের দেওয়া জল এখনো টেবিলে গ্লাসে ভর্তি রয়েছে। বিক্ষুব্ধ অমূল্যর মন। জলটা টেবিলের উপর পড়ে রইল।

সরযূকে দেখা যাচ্ছে বড় ঘরের রোয়াকে পান সেজে খাচ্ছে। সবাইকে প্রীতিভরে সেজে দিচ্ছে। তাকে ইঙ্গিত করে ডাকলে অবশ্যই পান দিয়ে যাবে। কিন্তু অমূল্য অপেক্ষা করছে নিজে থেকে সরযূ দিয়ে যায় কিনা দেখবে। পানের বাটা নিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল সরযূ। অমূল্য নিজে তেমন কোনোদিন পান খায় না। আজ মশলাওয়ালা একটা পানের জন্য মন উশখুশ করছিল অমূল্যের। কিন্তু স্নান-খাওয়া সেরে তার এখন আসতে ঢের দেরি।

লেখাটা শেষ করেছিল অমূল্য। পড়ে তৃপ্তি হলো না; নতুন করে লিখছে আবার; গুছিয়ে শেষ করতে সন্ধ্যা হয়েছে, সরযূও আসে নি, পানও। বিছানা ঝেড়ে শুয়ে পড়লো অমূল্য। একটি বিধবার খটমট প্রকাণ্ড মেমোরিয়াল, লেখার কি কষ্ট কে বুঝবে? শুধু আজ নয়, বিয়ের পর সাতটা বছর অমূল্যর কাটছে অবসাদ অতৃপ্তি ও শূন্যতায়। এই তামাশা অনন্তকাল চলবে। খেয়েদেয়ে এসে দেখে হেমন্তর আকাশ নির্মেঘ কুয়াশায় ভরা, ধান জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা। সরযূর জন্য অপেক্ষা করছিল অমূল্য। পূবদিকের কামরায় সরযূ একা শোয়। হয়তো অমূল্যকে ভালোবাসে সে। সেটি সংরক্ষণ করে রেখেছে এক মৃত্যুদিনের জন্য। মৃতস্বামীর মাথা কোলে নিয়ে তার ভালোবাসা হৃদয়বিদারক হয়ে উঠবে। অথবা সিঁদুরমাখা মাথায় অক্ষয় সতী চলে যাবে যেদিন। আজ তার ভালোবাসা অমূল্যকে স্পর্শ করে না। কখন এসে খট শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সরযূ। অমূল্য একটা বই নিয়ে বিছানায় বসল। এই জীবনে তার সঙ্গী কারা, কলম টাইরাইটার,

অফিস, বিছানা, বই, মা, দু-চারজন বন্ধু, কেউ মুনসেফ, প্রফেসর, মাস্টার—এদের সমগোত্রীয় হলে আড্ডা জমত। যে নভেলটা পড়ছে এখন, অন্তঃসারশূন্য পচা জিনিস। অমূল্যের কাছে সবচেয়ে ব্যথার সময় রাত দশটা এগারোটায় সরযূ যখন নিজের ঘরে ঢুকে খট্ করে দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে থাকে, দরজার বেড়ার পার্টিশানের ওধারে ঘুমন্ত মায়ের নিঃশ্বাস, হেমন্ত যেন ছেলেবেলার মত মায়ের নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়।

সরযূকে কতদিন অমূল্যর নারী-ধর্মহীনা মনে হয়। তাকে সে ঘৃণা করে, কৃপার পাত্র ভাবে। তাদের সম্পর্ক প্রেম অনুভূতিহীন। অমূল্য ঘুমল। চারটের কাছাকাছি ঘুম পাতলা হয়ে এল। বাইরে কাক-জ্যোৎস্নার পান্‌সে রং। আর একটা কঠিন দিন। আটটায় ঘুম ভাঙলে সরযূ চা এনেছিল, তাকে অমূল্য কৌচে বসাল। অনিচ্ছায় সে মনে হয় হাঁসফাঁস করে ওঠে। যেন কত ক্ষতি হচ্ছে। তরকারি কাটা, বাকি বাজার আসবে। 'সারাদিন এসব করে খুব সুখ সরযূ? একঘেঁয়ে লাগে না'! সরযূ হেসে ওঠে। মস্করা মনে করে সে উঠতে চায়। অমূল্য ছাড়ে না। 'কি পিণ্ডি খেয়ে অপিসে যাবে শুনি?' অমূল্য অফিসে যাবে না। অফিস পালাতে তার ভালো লাগে। সে নাগকেশর গাছের বর্ণনা দিতে যায়।

সরযূ বিরক্ত হয়। বাজার এসে গেছে। অমূল্য বলে ভাজে ননদে শাশুড়িতে মিলে সরযূর কাজ করে দেবে। মরিয়া সরযূ কাঁদে। বলে কি চাও তুমি? কোনোদিন স্বামীর মাথা পা টিপে দিয়েছে? নিপীড়িত বোধ করে সরযূ। বলে, 'শোও তুমি, তোমার পা টিপে দিচ্ছি।' 'ফরমাস দিয়ে এ জিনিস ভালো লাগে না সরযূ। নিজের থেকে মাথা টিপতে এক গ্লাস নেবু দই বেলপানা তৈরি করে আনতে ইচ্ছা করলে এনো। আমাকে ভালোবাস না বলেই ননদ ভাজদের সঙ্গে আকাশপাতাল গল্প করো।' সরযূ বলে 'তোমার কোনো অসুখ করেনি তাহলে?' আশ্চর্য হয়। কেমন খেয়াল এ লোকটির। পশ্চিমের দরজা খুলে ধান ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলে। বউ কাজ ফেলে এইভাবে প্রকৃতির শোভা দেখলে তার স্বামীর প্রাণ খুশি হত। কিন্তু ধান ক্ষেতের আকর্ষণ বউকে দু-চার মিনিটের বেশি আটকে রাখতে পারে না। সে সংসারের গল্প বলে। চাল কুমড়োর কাহিনী, বাপের বাড়ির ঘটনার বর্ণনায় জমে ওঠে। অমূল্য এই চায়। বলে অফিসের পর সরযূ এমন গল্প করবে। বলে কাল তোমার কাছে জল চেয়েছিলাম দুপুরবেলা। বিস্মিত সরযূ বলে সে তো হরিচরণ দিয়ে গেল না। বিহ্বল সরযূ ডাগর চোখে তাকায়। হরিচরণের দেওয়া জলে খাকতি পড়ে নাকি। অমূল্যর এধরনের প্রলাপের মানে বোঝে না। অমূল্য চায় যে ছুটির দিনে স্ত্রী তার কাছাকাছি থাকে। ঘরে এসে ঘুমোয়। রাতে ঘুমোনোর আগে অমূল্যর সঙ্গে দেখা করে যায়। সরযূ কখন ঘুমোয় অমূল্য বুঝতে পারে। তার নাক ডাকে। সরযূর ইচ্ছে হলো বলে সারারাত অমূল্য একা বই পড়ে, তা কি তার ভালো লাগে! স্বামীকে সারাদিন সে সঙ্গ দিতে পারে না। সংসারে ব্যস্ত থাকে। অনেক রাতে ফেরে যখন দুচোখ ঘুমে ভেঙে আসে। মনে হয় না তখন সে কারো স্ত্রী। কেউ তার স্বামী। স্নেহ, ভালোবাসা, সেবার প্রয়োজন আছে কারো। ভাবতে, কথা বলতে ইচ্ছাই করে না। রাত আরো দীর্ঘ হোক। ঘনায়মান রাতের গভীর ঘুম বিধাতা যেন আর না ভাঙে।

একান্নবর্তী পরিবারের দাবি কিভাবে দাম্পত্য সম্পর্ককে স্বামী-স্ত্রীর আশা-সাধকে নষ্ট করে দেয়। বিবাহের সার্থকতা থাকে না। উভয়ের মধ্যে জন্ম নেয় অহেতুক অভিমান ও

ক্ষোভ। এটাই এগল্পের বিষয়বস্তু। নারীপুরুষ হিসাবে দায়-দায়িত্বের পার্থক্য কবি-প্রকৃতি ও সাংসারিক প্রকৃতি মানুষের স্বভাবের পার্থক্য এবং পরিশ্রম ও ক্লান্তির আধিক্যে এই সমস্যাটি জটিল করে তোলে। সরযূ ঠিক করতে পারে না কিভাবে সে স্বামী ও সংসারের দাবির দ্বন্দ্ব সামাল দেবে।

বিষয়টি সুন্দর, তবে লেখার দোষে তত উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। পুনর্লিখন প্রয়োজন ছিল।

গল্পের ধারা

চতুর্থ স্তবক

'জীবনানন্দ সমগ্র'র নবম খণ্ডে স্থিত **'শীতরাতের অন্ধকার'** ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের রচনা। কনকের বয়স ২০/২১ বছর। কিন্তু মনে খুব ছেলেমানুষ। বিয়ে হয়েছে ৪/৫ বছর। অঘ্রাণের সকালে লজিক পড়ছিল। হঠাৎ দেখি বই ফেলে হাঁড়ি মুখ করে বসে আছে। নির্মল পড়তে বলেনি। পড়ার সংকল্প তার নিজেরই, পরীক্ষা দেবে।

বাধা আছে, সাংসারিক অস্বচ্ছলতা। অনেকদিন নির্মলের রোজগার নেই। কাজ জোটে না। মিনি কাঁদে। কনক তাকে মারে। শাশুড়ি বৌ ঝগড়া লাগে। দুধের বোতল ভাঙে। বই মেঝেয় লুটোয়, বিধবা পিসিমা, নিজের বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে জড় পিণ্ডের মতো বসে থাকে। সংসারে যাদের ভরসা—তারা বুড়ো মানুষ,—তারা মরে বিদায় নিতে চায়, তবু বেঁচে থেকে আজও উপার্জন করছে, এ বড় সান্ত্বনার কথা।

বাবা শিবনাথের বয়স ৭০, ৩৪/৩৫ বছর একটা প্রেস চালাচ্ছেন। কলকব্জা বিগড়োয়, ব্যবসার দুর্দিন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১০/১৫ থেকে ৪০ টাকার মতো মাসিক আয়। এর তত্ত্বাবধান ভার নিতে ভয় পায় নির্মল। তার বেকুবিতে এ নষ্ট করে ফেলবে মনে হয়। জানে না বাবা মারা গেলে এ প্রেস নিয়ে কি করবে? ইচ্ছে নতুন প্রেস কিনে চালায়। নিবিড় কবিতা ও গল্পের বই ছাপায়। কোনদিন তা হবে না। জ্যাঠামশাই আগে নিজে ম্যাপ তৈরি করে মন্দ পয়সা পেতেন না। কিন্তু আসলে তিনি শিল্পী—ব্যবসায়ী নন। কাজেই তাঁর কারবার চললো না। তিনি ইস্কুল মাস্টারি করছেন, মাইনে ২৫ টাকা, ভূগোল আর ইতিহাস পড়ান। বিয়ে করেন নি। ছিপছিপে লম্বা মানুষ, গলায় কমফোর্টার, প্রায়ই অসুস্থ।

ভবনাথ কাকা হাঁপানির রোগী। ভাল টাইপ করতে পারেন। স্টিমার অফিসে পারসেল বাবুর কাজ করেন। বেতন গোটা ২০ টাকা। মা-মরা ছেলে আছে একটা কাকার। নিরীহ নির্জীব। কাকা রাত করে ঘরে ফেরেন। জ্যাঠামশাইকে বলেন জাপানি বিড়ি জাকুজা কি করে ২ পয়সায় এক প্যাকেট দিতে পারে? জ্যাঠামশাই সস্তায় ম্যাপ দিতে পারলেন না বলে তাঁর ব্যবসা মাটি হলো। একটু জোচ্চুরির দরকার। কিন্তু পাছে কারো কানে যায় এই ভেবে কাকা আজ পাঁচ টাকা ঘুষ নিতে পারলেন না। ১৫ টাকা যার মাইনে তার কাছে পাঁচ টাকা ঘুষ! ভবনাথ নিতে পারেন নি। হাঁপানির রোগী অন্ধকারে উঠোনে গুঁড়ির উপরে

বসে বকবক করেন। ঘরে গিয়ে তিনি নাকি শান্তি পান না। তিনি ছেলে হাবুলকে জ্যাঠামশাইর কাছে পাঠাবেন না পড়াতে। যদি তাঁর মতই জিওগ্রাফির নেশা ধরে যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েও দাদার সঙ্গে ভবনাথের মতান্তর হয়। তিনি যদি থাকেন তাহলেও আমাদের এ রাজ্য দেখবার অবসর হয় না তাঁর। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জ্যাঠামশাইর কোনো অভিযোগ নেই জেনে বলেন 'আপনারা যেন কোন চূড়োর থেকে কথা বলেন।' চোখ তিন ভাইয়েরই খারাপ কিন্তু কাটানোর মত অর্থের সংস্থান করতে পারেন না সংসার চালিয়ে।

ভবনাথের চাকরি ছেড়ে দেবার বাসনা। কিন্তু জ্যাঠামশাই বারণ করেন। বলেন, চাকরি ছেড়ে দিলে তাঁরা তার ভার নিতে পারবেন না। কাকার ইচ্ছে, মৃত কাকিমার একটা জীবনী লিখবেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে। মেজদার প্রেস থেকে তা ছাপাবেন। দাদা জানান 'শিবুর অত পয়সা নেই।' ভবনাথ আঘাত পান। বোঝেন জীবনটা বড্ড কঠিন। পালাবার পথ নেই, মরা ছাড়া। কিন্তু দাদা বুঝিয়ে দেন তাও ভবনাথ পাববেন না।

ভবনাথ জীবনকে অবজ্ঞা করেন না। দশ-বারোটা হাতে-গড়া গরম রুটি, ডাল, মাছ, দুধ খেয়ে গরম লেপের মধ্যে কড়াইশুটি ভাজা খেতে খেতে জাকুজা বিড়ি ফুঁকে বেশ কাটিয়ে দেন। ভাবেন হাবলু তো আই সি এস-ও পাশ করতে পারে। ভালো বৌ হতে পারে তার। সে এসে যত্নআত্তি করে স্ত্রী মরার শোক ভুলিয়ে দিতে পারে।

নির্মল সারারাত জেগে প্রুফ দেখে। আর কাকা-জ্যাঠার আলাপচারিতা শোনে। এইসব গোলমালে কনকের ঘুম হয় না। এইভাবে শীতের মাসগুলো নির্বিঘ্নে কাটে।

স্কুলের নতুন সেশন শুরু হয়। জ্যাঠামশাই চাকরি ছেড়ে দেবেন। না-বয়সের বা ক্লান্তির জন্য বা চোখের অসুবিধার জন্য নয়। হেডমাস্টার তাকে জিওগ্রাফি পড়াতে পারেন না বলার জন্য। বাবা বলেন, 'আপনি সঙ্গতভাবে পড়িয়ে যান। এ অঞ্চলে আপনার মতো ভূগোল কেউ জানে না।' জ্যাঠামশাই প্রীত হন।

কিন্তু হেডমাস্টার এসে বাবাকে বলেন, জ্যাঠামশাইর মাথা দুর্বল হয়ে গেছে। স্কুলে গিয়ে তিনি নিজেই আধঘণ্টা আগে ঘণ্টা বাজিয়ে ক্লাস শুরু করে দেন। ক্লাস টেনে হেডমাস্টারের ক্লাসে ঢুকে ইংরাজির বদলে জিওগ্রাফি পড়াতে থাকেন। তারপর মর্জিমতো নারকেল গাছের নিচে দপ্তরিকে দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড আনিয়ে ম্যাপ আঁকতে শুরু করেন। ভিড় হয়ে যায়। ডিসিপ্লিন থাকে না। আপনারা ব্যবস্থা না করলে ওঁর স্কুল কম্পাউন্ডে ঢোকা বন্ধ করতে হবে।

বাবা বলেন, 'নির্মল, কি উত্তর দেবো?' বাবা বিছানায় নিরাশ্রয়ের মত কাঁদেন। তাঁদের মত বিশ্বাসী লোক এমন ভেঙে পড়লে দুঃখ লাগে। নির্মল প্রার্থনায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু যাঁরা জীবনভর বিশ্বাস করে এসেছেন, তাঁরা গভীর বিপদে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করলে বড় ভালো লাগে।

সমস্ত রাত, সে একটা প্রেম ও পরিপূর্ণতার জিনিস।

জীবনের বাস্তব অস্বচ্ছলতা একটি গরীব একান্নবর্তী পরিবারকে নষ্ট করে দেয়, অনেকগুলি মানুষের জ্ঞান বিশ্বাস অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে যায়, তার এক নিবিড় সুন্দর চিত্র এ গল্পে ফুটে উঠেছে।

বাসনা কামনার গন্ধ ১৯৩২-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা হয়েছিল। অভাব বেকারত্ব সাংসারিক অসঙ্গতি ও অসচ্ছলতা কিভাবে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত জীবনকে জটিল করে তোলে তার এক বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী।

বিয়ের অনেক আগে মামাবাড়িতে শান-বাঁধানো মেঝেতে জীবন কাটিয়েছে মেয়েটি। এখানে চারিদিকে খালবিল, মাটির মেঝে ভিজে, বাতাসে পাঁকের গন্ধ—মেয়েটিকে সুস্থ থাকতে দিচ্ছে না। সে ভাবে, উপোস দিয়ে জ্বর তাড়াবে। কিন্তু জ্বর বেশ বাগিয়ে ধরে বরং। তার ছেলেটি বছর দেড়েকের, হাঁটতে শিখেছে। তার স্বাভাবিক প্রয়োজন মানুষের অভিনিবেশ। এটাও কনকের পড়াশুনার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারে কেউ কনককে উৎসাহ দেয় না। সে ইংরেজি, বাংলা বেশ লিখতে পারে। এই শিক্ষাদীক্ষাই পর্যাপ্ত মনে করে বাড়ির লোকেরা। তারা চায় সে সংসারের রান্নাবান্না, পরিবেশন, কাপড়কাচা এসব নিয়ে দিনরাত ব্যাপৃত থাক। তার স্বামীর ধারণা বই আর ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজেই এলো না—পাড়াগাঁর অন্য মেয়ে হলে সুস্থ ও কর্মক্ষম বেশি হতো। শরীরের কাঁপুনি অগ্রাহ্য করার জন্য কনকও খ্রিয়মাণ মুখখানা বার করে তাকিয়ে থাকে। সে আরো করুণ মনে হয়। বিয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে কনক স্বামীকে বলে, 'জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। পাড়াগাঁর ইস্কুলে চল্লিশ টাকা মাইনেয় তুমি মাস্টারি করবে ভাবলে কষ্ট হয়।' সে গ্রাম্য মেয়ের মত কথা বলে না। ভগবান, কপাল এইসব কথা শুনতে চায় না। সে জানতে চায় সেক্রেটারিয়েটে কেন স্বামীর চাকরি হলো না। এর মধ্যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের কোনো উদ্দেশ্য আছে—একথা সে মানতে পারে না। সে বলে 'কিন্তু আমি জানি যে সব সময়ই তিনি আছেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও কারু মুখ চেয়ে চলেন না'। স্বামীর বয়স ত্রিশ। কনক বলে 'এক ধরনের লোক, মন দিয়ে অনেক দূর অবধি পড়াশুনো করে। মনে করে লিখে পড়েই তৃপ্তি। পরীক্ষায় পাশ করে, তারপর কিছু করতে পারে না। এরা শেষে কিছু না পেয়ে ইস্কুল মাস্টারি নেয়। আরেকজাত অবাস্তব আদর্শের কথা বলে। এদের জীবনের বিড়ম্বনা হলো এদের আত্মতৃপ্তি। যাঁরা বড়ো হয়েছেন, তাঁরা ফাঁকা আদর্শের চেয়ে সংসারের প্রকৃতিকে ঢের বেশি চিনেছিলেন, চেষ্টা চিন্তা পরিশ্রম দিয়ে উদ্দেশ্য সফল করতে তাঁরা পেরেছেন, ভাববিলাস ছিল না বলে এঁরা টাকা করেছেন পদসম্মান পেয়েছেন।'

স্বামী বলে 'অনেকে পাঁচশো টাকা মাইনে পেয়েও নিজেকে ফকির মনে করে, আবার', কনক বাধা দেয়—বলে 'মুরোদ নেই বড় বড় কথা। সব বইতে জীবন সম্পর্কে নানা উপদেশ থাকে, কিন্তু তার কি মূল্য? বইয়ের কাটতি হলে লেখকের দু'পয়সা লাভ—এই যা। ছেলেবেলায় ভাবতাম এঁরা উদাসীন, আত্মিক পৃথিবীর বাসিন্দা। ক্রমে জানতে পারলাম এরা বেশ নিপুণ সাংসারিক। এদের আদর্শবাদ ছেলে ভুলানো ছল। সবাই টাকা প্রতিষ্ঠা চায়, শুধু বাইরের আচরণে একটা সৌজন্য রাখে। যারা এই সুন্দর মিথ্যেটা আত্মসাৎ করতে পারে না—তাদের বড় দুর্গতি।

কনকের স্বামীর শেলফে কবিতার বই, নানারকম অনেক বই। সে প্রায়ই সেগুলি পড়ে। নতুন বই কেনার সাধ হয়, অভাবের জন্য কিনতে পারে না। অনেক গল্প উপন্যাসও,

সেগুলি ইংরেজি। ইস্কুলের কাজ শেষ হলে এগুলি নিয়েই তার জীবন। কনকের মতে, 'এ বেশ ফাঁকির—জীবনের অন্তঃসার যাদের ফুরিয়ে গেছে তারা গল্প দিয়ে নিজেকে ভোলাতে চায়। বাইরের কাজকর্ম আশা উৎসাহভরা দৈনন্দিন জীবন যাদের কাছে মরীচিকা, তারা বইগুলোকে সাথী ভাবে।' স্বামী প্রতিবাদ করে। কনক বলে 'আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।' লেখক বলে বই পড়ে তার বহির্জীবনের প্রতি সহানুভূতি বেড়েছে। কনক হাসে, বলে 'সহানুভূতির বালাই নিয়ে আমরা কী করব। আমরাই যে ঢের সহানুভূতির পাত্র।' কনকের মতে 'গরীবের ঘরে জন্মালেও ত্রিশ বছর বয়সের একজন এতদিনে জীবনটাকে অনেক দূর পর্যন্ত সাজিয়ে ফেলতে পারতো।' কনক বিশ্বাস করে না চল্লিশ টাকা মাইনের পাড়া-গাঁর স্কুলমাস্টারের বর্তমানের বিড়ম্বনা কখনো ঘুচবে।

সেদিন কনককে একটা বই পড়তে দিয়ে তার স্বামী বলেছিল এর ভিতর জীবন খুব গভীরভাবে ফুটেছে। কনক বইখানা পড়েনি। তার বক্তব্য, এই ঘরের আটচালায় তাদের জীবনও কম গভীরভাবে ফোটে নি। লেখককে স্বীকার করতে হয়—'না, সরঞ্জাম ঢের আছে। যদি কোনো লেখক আসতেন, তাহলে অনেক আশা স্বপ্নের ছাইভস্ম অপচয় ব্যথা ও করুণা বেরিয়ে পড়ত।'

কনক কিন্তু পথের পাশের অশ্বত্থগাছটা ভালো করে দেখে নি! দেখেনি তার ডালে দুটো বুলবুল। সে কলকাতায় গোলদিঘিতে দিনে বিশবার গেলেও সেখানে অশ্বত্থগাছ ছিল কিনা জানে না। সে দেখতো দিঘির পশ্চিমদিকের ঘাটে চানাচুর চিনেবাদাম দিলে মাছ খেয়ে নেয়। ঐ দিঘির ইজারা নিয়ে মাছ ধরে বিক্রি করলে ঢের লাভ। কিন্তু দেখেনি সেখানে গুলিবাঁশ হাতে ছোকরারা বুলবুলি মারে। চাকরির চেষ্টায় তিন বছর কলকাতায় থাকার সময় এসব স্বামী দেখেছে, কনক আশ্চর্য হয়। কেমন চেষ্টা করেছিল সেই জানে! স্বামী জানায়, এ চাকরি তার ভাল লাগে না, তবু চোখের পলকে চার বছর চলে গেল। কনকের বিশ্বাস, 'এইরকম চোখের পলকেই দেখবে বিশ ত্রিশ বছর চলে গেছে।' তার স্বামী শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষার সম্মান আদর যেখানে সে সব জায়গা বেছে নিতে পারে নি। তার ইস্কুলের হেডমাস্টার ৯০ টাকা মাইনে পায়। তার বয়স ৭০। কনক বলে, 'এরকমই হবে আর কি? ঠিকসময়ে পালাতে না পারলে এটুকুও হবে কিনা কে জানে?'

প্রখর উচ্চাশাপরায়ণা শহুরে স্ত্রী স্বামীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেছে। তার নৈরাশ্য এবং স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীনতা সম্পর্কে আক্ষেপ এ গল্পে ফুটেছে।

'অঘ্রাণের শীত' ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে রচিত, অষ্টম খণ্ডের কাহিনী। দাম্পত্য জীবনের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার করুণ পরিণাম এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে। হেমন্তের যে প্রকৃতি চিত্র কবি জীবনানন্দের কবিতার বিশিষ্ট উপকরণ তার অনবদ্য গদ্য রূপায়ণ এ গল্পে মিলবে। সেই দৃশ্য দিয়েই গল্পটি শুরু, চমৎকার এই বর্ণনা :

'বাসায় ফিরে এলেই মা রান্নাঘরে ডাক দেন। গরম গরম ভাত পাওয়া যায়—আর—অন্ধকারের ভিতর নেমে খিড়কির পুকুরে মুখ ধুতে গিয়ে দেখি, যেমন অন্ধকার, তেমনি শীত আর আকাশ ভরে তেমনই নীহার স্রোত। এইসব ছেড়ে সহসা ঘরের ভিতর ঢুকতে ভালো লাগে না। অনেকক্ষণ উঠানে একা একা পায়চারি করতে থাকি। নেবুগাছটা খুব

বড় হয়ে গেছে এতদিনে। তারই ঘন ডালপালার ভিতর থেকে পেঁচা ডাকে। খেজুরগাছের গলায় টাঙানো হাঁড়ির খোঁজে ঝুপ করে বাদুড় এসে নেমে পড়ে। কে যেন ঢিল ছোঁড়ে। অবিনাশবাবুর মেজ ছেলেটি হয়তো। বাদুড় যায় উড়ে। কিন্তু তবুও আবার অনেকক্ষণ পরে রসের হাঁড়ির মাথায় ঘুরে এসে বসে। ছেলেটি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

'মস্ত বড় উঁচু জাম, অশ্বত্থগাছের ডালপালায় মাখা মাখা জোনাকির দল। এদের ভাষা ও গল্প জানবার জন্য সমস্ত জীবনটাকে উৎসর্গ করে ফেলতে ইচ্ছা করে। কয়েকটা শিশির মাখা ঘাসের উপর নেমে এসেছে, এদের আলোয় ঘাসের শিষ আবার মরকতের মতো সবুজ হয়ে উঠল। ঘাসের গোছার ভিতর কোথায় শ্যামা পোকা ঘুমিয়ে রয়েছে, কিম্বা শুধু জমেছে, কিংবা ফসলের গুঁড়ি ছড়িয়ে আছে কিংবা অন্য কোনো প্রেম বা স্বপ্ন জমে আছে জোনাকিরাই তা জানে। বনের এদের নিস্তব্ধ জীবনের প্রবাহ, শিল্প দেখি আমি, বড্ড স্নিগ্ধ ও সুন্দর। কোনো কোলাহল নেই। কাড়াকাড়ি নেই, রক্তাক্ততা নেই, একদিন রাতের পৃথিবী এদেরই হবে। এদের, আর ওই নিমগাছের লক্ষ্মী পেঁচার আর ওই গোয়ালের নিচের ইঁদুরের। মানুষের শেষ হাড়গোড় তখন ঝোপে জঙ্গলে বিস্তৃত। এই আমার মনে হয়, সে খুব সুন্দর দিন হবে তাহলে। তখন খুব নীরব ঠাণ্ডা, ঘন নিবিড় নারকোলের পাতায় নিবিড় জোনাকির মালায় মালায় ভরা সে খুব চমৎকার শান্তির রাত আসবে তখন, একদিন আসবেই। মানুষ তখন থাকবে না।'

জোনাকির আলোয় ঘাসের মরকত আভা আমাদের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়। কিম্বা মনুষ্যহীন পৃথিবীর নীরবতা ও শান্তির রাত বর্ণনায় কবির নিরুদ্বেগ বর্ণনা বিস্ময়কর মনে হয়। লেখক ছাড়ি ছাড়ি করেও দেশের বাড়ি ছাড়তে পারেন না। অঘ্রাণের শীতরাত তাঁর বড় ভাল লাগে। মায়ের বাড়া গরম ভাত, বা তাঁকে তৃপ্ত করার জন্য বাবার কমফারটারে মাথা কান গলা জড়িয়ে উষ্ণতা তিনি উপভোগ করেন। স্ত্রী উমার এসব দিকে নজর নেই। বছর দুয়েকের এক ছেলে আছে তার। মায়ের দুধের অভাব। আর্থিক অনটনে রিকেট হয়ে বিমর্ষ ও প্রবঞ্চিত যেন। উমার চোখে এসব ধরা পড়ে না বলেই হয়তো সে তাকে যখন খুশি পেটায়।

লেখক ভাবেন, নতুন এই শিশুটি এসেছে বলে, তাঁর ভালবাসার ও ব্যথার আরেকটা দিক খুলে গেছে। শুধু প্রেমিক হলে চলে না। পিতা হতে হয়। না হলে জীবনের ভালাবাসা আর দুঃখ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। খোকা তার ঠাকুমার বিছানায় ঘুমিয়ে। মশা কামড়াচ্ছে, ধীরে ধীরে বাতাস করে মশারি টেনে দেন লেখক, চুমো দেন না। পাড়ার মেয়েরা শিশুটির ঠোঁটে গালে অবিশ্রাম চুমা খেয়ে যা অনিষ্ট করার করে দিয়েছে।

উমা খাটে শুয়ে বাংলা উপন্যাস পড়ে। স্বামীকে ডিবে থেকে পান বার করে দেয়। তিনি না নিলে নিজের মুখে পুরে দেয়। উমা মন্দ নেই, স্বামীর চাকরি নেই ভেবে সাময়িক মন খারাপ হওয়া ছাড়া। অঘ্রাণের বিকালে গাঁয়ের পথ দিয়ে লেখক তাকে নিয়ে এক একদিন বেড়াতে যান। কত গাছ, কত পাখির নাম জানে না সে। ধানকাটা মাঠে আটদশটা শকুন। সে বিস্মিত হয়ে অনেকখানি এগিয়ে যায় দেখবে বলে। তার একটা খাদ্যের সন্ধানে হঠাৎ উমাকে তেড়ে এলে উমা ভয়ে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিস্মিত

হয়ে প্রশ্ন করে শকুনদের জিভটা আলাদা। তাই মরা কুকুর-বিড়াল খেতে এরা ভালবাসে। তার মনে হয় 'একটা শকুন যদি তেড়ে আসে একটা মানুষকে ঘায়েল করে দিতে পারে? পারে না?' হালদারদের নির্জন শান-বাঁধানো দিঘিতে বসে তার কলকাতার লেকের কথা মনে হয়। যদিও সে লেক দেখেনি। কিন্তু তার ধারণা 'সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে লেকের মতন এমন একটা জিনিস নেই।' কিন্তু লেখক যখন বলেন—'এই দিঘিটাই মন্দ কি?' তখন স্বীকার করে নেয়।

ভূতের প্রসঙ্গ উঠলে তার সাহস উবে যায়। অনেক দূর তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে হয়। তারপরে গরুর গাড়ির শব্দ পেয়ে তার সাহস ফিরে আসে। 'আচ্ছা, ছাড় তুমি এখন।' নামজাদা বাঙালি ঔপন্যাসিকের লেখায় অশ্লীল প্রসঙ্গ পড়ে উমা সঙ্কুচিত হয়। তিনি তার স্বামীর পরিচিত জেনে স্বামীকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে। কেননা তার মতামত বড্ড খারাপ। অবৈধ প্রেমের বর্ণনা করেছে সে। স্বামীর সঙ্গে উমা জল্পনা করতে ভালবাসে, স্বামী চাকরি পেলে অল্প (সত্তর) টাকায় কিভাবে সংসার চালাবে। স্বামী চাকরির আশা করে না। তবু স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বলে চাকরির সন্ধানে কালই কলকাতা যাবে এবং হিসাব করে কি কি কিনবে তারা, কেমন পছন্দের জিনিস,। কাকে কি দান করতে হবে ইত্যাদি। রাত বারোটা অবধি হিসাব চললো। চার বছর যে স্বামী উমার হাতে একটা টাকাও এনে দিতে পারে নি। সে তাকে খুব সাহায্য করলো হিসাব কষতে। তারপর উমা উপন্যাসের বাকি পাতাগুলি পড়তে বসলো। তখন রাত একটা। উমার ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী পাশে বসলো না।

রাত চারটেয় কি শব্দে ঘুম ভাঙলো লেখকের। এমন কত শব্দই হয় পাড়াগাঁয়। শুয়ে ছিলেন লেখক। ভোর পাঁচটা। বাইরে আবছায়া অন্ধকার। উমার ঘরের দরজা খোলা, সে নেই। খিড়কির পুকুরে তার শরীরটা ভাসছে। কেন মরলো লিখেও যায় নি।

জীবন এরকম। আকস্মিক ভূমিকম্পে তলিয়ে যেতে পারি আমরা যে কোনো মুহূর্তে। তবু যে আজও বাঁচতে দিয়েছে, জীবনের ভয়াবহতা সম্পর্কে লিখতে দিচ্ছে এই যথেষ্ট।

উমার আকাঙক্ষা পূরণের সাধ্যি নেই জেনেও মিথ্যা স্তোক দিয়েছিল স্বামী। তাই কি নিজেকে প্রতারিত ভেবে আত্মহত্যা করেছিল সে? শুধু স্ত্রীর ইচ্ছা নয়, নিজের ও সংসারের প্রয়োজনে ব্যর্থ বেকারত্ব ঘুচাতে কলকাতায় যাবার সংকল্প ছিল লেখকের। কিন্তু জীবনের এই বাসনাগুলো একান্ত মানবিক সম্পর্ককে ঘিরে, তা ধ্বংস হয়ে গেলে, সে ইচ্ছেও পালটে যায়। এ গল্পে তাই হয়েছে। তবু লেখক বলেন, 'উমার মৃত্যুর আগেও আমি এই কথা ভাবতাম। এখনো ভাবি। জীবন সম্বন্ধে আমার মতামত ঠিকই আছে।' তাই কি?

'অশ্বত্থের ডালে' এ গল্পটিও ডিসেম্বর '৩২-এর লেখা। নটার মধ্যে গাঁয়ের লোকরা ঘুমিয়ে পড়ে। উত্তরদিকের খড়ের ঘরে নির্মলের বাবা, মা, মেয়ে, মেয়ের মা এবং বোন ঘুমোচ্ছে। উত্তরদিকের কোণের ছোট কোঠাঘরে লণ্ঠন জ্বেলে নির্মল বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। বিয়ের আগেও এ ঘরে থাকতো। নিজেকে অবিবাহিত মানুষ ভাবতে তার ভাল লাগে।

রাত ১১টায় খবরের কাগজ পড়া শেষ করে সে ভাবছিল ঘুম আসছে না, হুইলারের দোকানে কেনা ইংরেজি উপন্যাস দু-একটা না পড়া রয়ে গেছে, তাই পড়বে কিনা।

জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে, চালতা গাছে বাদুড় এসে বসল, ঝরঝর শিশির ঝরলো পাতায় নাড়া পেয়ে। লক্ষ্মী পেঁচা ডাকছে জামরুল গাছে। মজুমদারদের মস্তবড় বাড়িটা প্রায় পরিত্যক্ত। গায়ক ছিলেন হরনাথ মজুমদার। হয়তো পেঁচা হয়ে তিনি সুর সাধছেন।

দরজা খুলে মজুমদারদের উঠোনের দিকে যায় নির্মল, পেঁচাটা বেউড় বাঁশের জঙ্গলের দিকে উড়ে গেল। মজুমদারদের দরদালান থেকে বংশলোচন বললেন 'কে?'

নির্মল সাড়া দিল, বলল 'পেঁচা ডাকছিল'। সন্দিগ্ধভাবে বংশলোচন বললেন, 'কই শুনিনি তো।' তিনি ঘুমিয়েছিলেন একথায় বংশলোচন বললেন তিনি বারো বছর সারারাত জেগে থাকেন। 'না ঘুমিয়ে মানুষ বাঁচে?' 'সাধারণত বাঁচে না, তবে সিদ্ধ হলে হয়।' 'গরমজলে!' চটে গেলেও বংশলোচন বলে, 'চলে যা এখান থেকে, যা নয় তাই।' উপযাচক হয়ে তামাক সেজে দিলে বংশলোচন বলেন, ঘুমজয়ের ওষুধ জানেন তিনি আর নির্মল আরেকজনকে ধরে ফেলেছিল প্রায়।'

বিস্মিত নির্মলকে এ নিয়ে চিন্তা করতে বারণ করেন তিনি। 'ঘুমোও গে যাও, বউটাকে মিছিমিছি কষ্ট দাও কেন?' বউ আলাদা ঘরে মেয়ের কাছে শোয় জেনে তিনি বুঝে নিলেন বউর সঙ্গে বনে না, নইলে এমন শীতের রাতে একা এককোণে পড়ে থাকা, আর এইখানে আড্ডা মারতে আসা! হুকো নামিয়ে বললেন, পঁচানব্বই বছর বয়সে হরনাথ মারা যাবার সময় বলে গেলেন, 'এই ছ'মাস শুধু আলাদা ঘরে আলাদা বিছানায় শুয়ে গেলাম। আবার এক ঘরে এক বিছানায় শুতে যাচ্ছি।' ছমাস আগে তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। বংশলোচন বললেন, 'এইসব সাবেক কালের কথা। আজকাল আর এরকম হয় না, সব ফাজিল ফোক্কর চোর বদমাসে শহর বাজার ছেয়ে গেছে।' প্রশ্ন করলেন, 'পেঁচার ডাক শুনে নির্মল এখানে এসেছে কিনা! বংশলোচন বললেন, জামরুল গাছে নয়, মহানিম গাছে পেঁচা ডাকছিল। একটা পেঁচা নয়, 'একজোড়া', নির্মল স্বীকার করে না, অতটা সে শোনে নি।

বংশলোচন জানালেন মজুমদার গিন্নী পেঁচকী হয়ে অশ্বত্থের ডালে ছিলেন বলেই মজুমদার মশাইকে রাজপুতানার রাজপুত্র হয়ে জন্মাবার সুযোগ ছেড়ে পেঁচা হতে হলো। নইলে গিন্নিকে হারাতে হয়। এমন ভালবাসা সাবেককালে হতো।

নির্মল বললো—'আজকাল হয় না?' বংশলোচন উত্তর দিলেন, 'তার নমুনা তো তুমি। রাত দুটো অবধি একটা কানার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছ।' হেসে উঠলেন তিনি।

প্রাচীন লোকেরা গুল-গল্প করতেন, কিন্তু তার মধ্যে জীবনের গভীর মরমী শিক্ষাও থাকতো। যেমন বংশলোচন নির্মলকে দাম্পত্যের সুন্দর একটা শিক্ষা দিলেন এইভাবে।

'সমুদ্রের স্রোতের মতো' রচনাকাল ডিসেম্বর ১৯৩২। একটা বেকার মানুষের চাকরির সন্ধানে কলকাতায় নাকাল হওয়ার কাহিনী। এক বেকার কর্মের সংস্থানের জন্য সিঙ্গাপুর অবধি গিয়েছিল, না হলো চাকরি, না ব্যবসা। এখন কলকাতার পথে

পথে সেই চেষ্টা চলেছে। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত কলকাতায় থেকে জীবনটাকে যতদূর দেখা বোঝা গিয়েছে, ৩৫ বছর বয়সে তার চেয়ে বেশি কিছু শিখতে পারে নি। জীবনের মূল সূত্রগুলো পালটায় না।

সে বুঝেছিল, জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, তা সমুদ্রের স্রোতের মত সুন্দর ও ভয়াবহ। নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলে মন্দ লাগে না। সে সুখ সকলের হয় না। কবে হবে কেউ জানে না। কখনো কখনো মনে হয় মৃত্যু খুব অনুপম ভরসার জিনিস। কিন্তু জীবনের একটা গর্ব এই যে, সে হেরে যায়নি, মুছে যায়নি। এই আত্মতৃপ্তিটুকুর জন্যে অনেক অন্ধকার মুহূর্তেও লেখক মরতে যায়নি।

বনের প্রবীণ গাছ যেমন স্বাভাবিক নিয়মে মরে, চুল দাড়ি শাদা বুড়ো মানুষদের মতো তারও বুড়ো হয়ে মরার সাধ।

কলকাতা লেখকের খুব প্রিয়। অনেক পাল্টে গেছে যদিও সাত-আট বছরে। সিঙ্গাপুর থেকে রোজ কলকাতার কথা মনে হতো। কলম্বো থেকেও নানা অভাজনকে চিঠি দিয়েছে কলকাতার সঙ্গে যোগ রাখতে। এখানেই সে আমৃত্যু থাকতে চায়। দীর্ঘদিন বেঁচে তারপর মৃত্যু।

কলকাতায় ইস্কুল ঢের, কিন্তু মাস্টারি পদ খালি নেই। আগে এম. এ.-তেই চলতো। এখন বি.টি. না হলে চলে না। তার বি.টি. নেই। তারপর ১৫ বছরের পুরানো এম. এ. এটাও একটা অযোগ্যতা। কলেজের শিক্ষকতা আরও দুর্লভ। যদিও কাজটা ঢের সহজ। সরকারি কাজে ঢোকার বয়স নেই। কেউ বা কাজ দিতে প্রস্তুত ২/৪/৮ হাজার টাকা জমা রেখে কাজ পেতে হবে। টুইশানও মেলে না। ১০/১৫ টাকারও কমে দুবেলা পড়াতে অনেকেই নাকি রাজি। পাবলিশাররা চান কলেজের প্রফেসর বা স্কুলের হেডমাস্টাররা নোট ম্যানুয়াল লিখে দিক। অন্য লেখক তাদের প্রয়োজন নেই। ছোট পাবলিশাররাও তথৈবচ। প্রুফ রিডারের কাজটা তারা নিজেরাই করে। নিজেকে মনে হয় বন্যজন্তুর মতো; অন্যের মুখের গ্রাসের প্রতি লোভ। কিন্তু খিদে তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ট্রামে কনডাক্টর তার কাছে পয়সা চাইতে আসে না। যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত স্ত্রী তার মরে গিয়েছিল ট্রামে যেতে যেতে। কি যোগাযোগ কে জানে, সেই স্ত্রীর মুখ মনে করে কনডাক্টরকে ডেকে পয়সা দেয় লেখক।

মনে হয় স্ত্রী বিভাকে সুদিন এলে যে নিভৃত বাংলোর স্বপ্ন শোনাতো তার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়ে যায় কর্নিয়াক মদের বোতল। ধর্মতলার এক পুরানো ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে নামজাদা লেখকের মস্তবড় প্রবন্ধ—মানুষের জীবনমৃত্যু সম্পর্কে দেখে কেনার লোভ হয়। কিন্তু অনেক দরাদরি করে ১৪ আনায় রফা হলে মনে হয় বড্ড বেশি খরচ হয়ে গেল। চা খাওয়ার লোভ সামলে অযথা খরচ কমাতে চায় সে। বোর্ডিং-এর রুমমেট হরিহরবাবু সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ২০ বছর আগে সরকারি অফিসে ঢুকে গেছে। এখন ১৫০ টাকা মাইনে। ১২ বছর আগের এম. এ. নিজের যোগ্যতার কথা চেপে যায় তার কাছে। চাকরি পাবার ব্যাপারে নানা অবাস্তব পরামর্শ দেয় হরিহর, নানা ঘুষের গল্প করে। তার তিন স্ত্রী ১৩টি সন্তান। সব অবশ্য বেঁচে নেই। তার বিশ্বাস ভালই হয়েছে মেয়ের ঝাড় মরেছে। ভগবান বুঝেই মারেন। ঘুষ না খেলে এদের চলে?

ইংরেজি খবরের কাগজের সম্পাদক জানালেন তিনিই সটকে পড়তে পারলে বাঁচেন। তাদের স্টাফে যে কজন আছে, তাদেরই ভিতর ছাঁটকাট হবে। সব কাগজেরই 'নো ভেকেন্সি'। দেশি ইন্সিওরেন্স কোম্পানি এজেন্সি দিতে প্রস্তুত, চাকরি নয়। দালালি করার যোগ্যতা লেখকের নেই; যারা তার পরিচিত তারা অসচ্ছল, প্রিমিয়ামও দিতে পারবে না দু একবারের বেশি, বাস্তবিক এজেন্সি নিয়ে একদিন সকাল থেকে রাত অবধি নানা পরিচিত অপরিচিত দুয়ারে ঘুরেও লজ্জা গ্লানি ছাড়া ভরসা মেলে না।

নিজের বেকার জীবনের চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘোরার একটি অভিজ্ঞতা অখণ্ডভাবে এই কাহিনীতে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বিচ্ছেদের কথা' দূর পাল্লার স্টিমার যাত্রীর বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ। স্টিমার স্টেশনে গাড়ি এসে থামলেই দেখা যায় বিশেষ কোনো স্টিমারে গাঢ় ধোঁয়া উঠছে। টিকিট ঘরে নোটের ভাঙানি মেলে না। পান দোকানের উড়ে মালিককে দুআনা পয়সা কবলাতে ভাঙিয়ে যে টাকা দেয় তার মেকি কি ঘাঁটি তা নিয়ে সন্দেহ হয়। টিকিট মেলে। এখনো পনেরো কুড়ি মিনিট সময় আছে। থার্ড ক্লাসের টিকিট নিয়ে বাচ্চা এক মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে স্টিমারে ওঠা। তারপর ঠাণ্ডা হবে বুঝেও নিরিবিলি দেখে সেকেন্ড ক্লাসের ধার ঘেঁসে বিছানা পাতা। তারপর যাত্রীদের দেখা, কোনো মাড়োয়াড়ি অনেক জায়গা জুড়ে আত্মলালসা তৃপ্ত করছে। এক চিনেম্যানের ফার্স্টক্লাসের বাটলারের কাছে গলাধাক্কা, সেকেন্ড ক্লাসের তাড়া খেয়ে থার্ড ক্লাসের কিনারা ঘেষে জায়গা পাওয়া। বাঙালি ও নেপালি যাত্রীদের কলহ, নেপালি ও চিনেম্যানের বিবাদ ও মিটমাট, স্টিমারের স্টলে বিস্বাদ চা পানের অভিজ্ঞতা, চায়ের দোকানি আর হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ বেয়ারার ডিম খাওয়া নিয়ে ঝগড়া, ঘুষ খেয়ে বেগুন ও পালং চোরাচালানের কাহিনী জানার পর স্বস্থানে এসে লেখক দেখেন তাঁর বিছানা গুটিয়ে সরিয়ে রেখে সেখানে এক বুড়ো ভদ্রলোকের বিছানা পেতে নেওয়া হয়েছে।

লেখক আসতেই বুড়ো আর তার সঙ্গী আধবয়সী লোকটি বুঝে নিতে চায় লেখক সরকারি চাকরিজীবী কিনা। তারপর তাকে নিরীহ বুঝে অন্যত্র স্থান খুঁজে নেবার জন্য প্ররোচিত করে। বলে উত্তর মুখে পায়খানার কাছে ভেজা জায়গায় গিয়ে বিছানা পাততে। শেষকালে ভদ্রতা সহানুভূতিশীলতার নানা ভড়ং করে, ইন্টার ক্লাসে ঢুকে পড়ার পরামর্শ দেবার পর স্বজন বিচ্ছেদের কাঁদুনি গেয়ে শেষপর্যন্ত বেদখল জায়গায় বুড়ো আর আধবুড়োটার নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত পরম সুন্দর ঘুম।

এহেন গল্পের এই নামকরণের মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না।

'ছায়ানট' ১৯৩২ সালে লেখা কিন্তু তারিখ মাস জানা যায় না। সম্ভবত ১৯৭২ সালে 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' নাম দিয়ে সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফীর সম্পাদনায় যে তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল তার অন্যতম ছিল 'ছায়ানট'। নানা কারণে ঐ গ্রন্থের প্রকাশ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওখানে প্রতিটি গল্প সম্পর্কে মুখবন্ধ লিখেছিলেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকরা। 'ছায়ানট'-এর মুখবন্ধ ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা। এই গল্প সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী সংস্করণে লেখা হয়েছিল ;

'ছায়ানট'-এর রচনাকাল যদি ১৯৩২ সাল হয়ে থাকে—তবে তখন ঝরাপালক ও ধূসর পাণ্ডুলিপির শেষ কবিতাটিও লেখা হয়ে গেছে। বনলতা সেন, মহাপৃথিবী এবং সাতটি তারার তিমিরের কবিতাগুলি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হচ্ছে। নিকটবর্তী কোনো সময় রূপসী বাংলার কবিতাগুচ্ছটি লেখা হয়ে গেল। এরই কাছাকাছি কালে এলো 'ছায়ানট' একটি সংহত ছোটগল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ গল্পকে বললেন 'মিথুন সমীক্ষণ'। বস্তুত এ নারীপুরুষের সম্পর্কেরই সমস্যা। লক্ষণীয়, এই একই সমস্যা ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ এই বছরের মধ্যে ছড়ানো প্রায় সবকটি গল্পে-উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সমস্ত কথাসাহিত্যের ভিত্তিমূলে রয়েছে দাম্পত্যের রহস্য ও সমস্যা। কিন্তু সে কথা আপাতত থাক। ছায়ানট প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্ভবত মনে হয়েছিল কল্লোল কালি-কলমের লেখকরা যেভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের পিছনে অর্থনীতিক রাজনীতিক সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দের এই প্রথম প্রয়াসের মধ্যে তার এক অভিনব দুঃসাহসিক অভিব্যক্তি ও সফল সার্থকতা দেখা যায়। সমাজ ও অর্থনীতি আমাদের ব্যক্তি-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে—কিন্তু স্থূলভাবে নয়। মানবচৈতন্যের গভীরে সূক্ষ্মভাবে অনুপ্রবেশ করে। ছায়ানটের নায়ক রেবা নামের যে অবলম্বনহীনা মেয়েটির আশ্রয় দেওয়া ও অভাব মোচনের অধিকারে হৃদয়-মনের স্বত্বস্বামিত্ব পাবে আশা করেছিল তার অনতিবিলম্বে বুঝতে কষ্ট হলো না রেবার অন্তঃস্থলের অবরুদ্ধ মুক্তি পিপাসা। তার সেবার মধ্যে যখন অন্তরের বদলে যান্ত্রিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে নির্দেশপালন দেখলো শুধু, অথচ এও দেখলো রেবা, মানুষটা যান্ত্রিক নয়—হৃদয়বান। ভিখিরিকে দুহাত ভরে দিতে তার মুখে তৃপ্তির উল্লাস উপচে ওঠে, সে ভাবলো, মুক্তি দেবে রেবাকে।

কিন্তু পাঁজর দিয়ে গড়া এই খাঁচা ভাঙা কি সহজ! কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাঙ্গণে নবাগত অল্পবয়সী ডাক্তারটি এসে দাঁড়াতেই স্বপ্নের তাসের ঘর ধ্বসে গেল। নিজের ক্ষুধিত আত্মা দিয়ে অনুভব করতে পারলো তরুণ-তরুণীর মোহাকর্ষণ। মনে হলো বলে, 'আমিও বলতে পারি, তোমরা যা বলেছ—সব... আমি যাই হই না কেন, নিজেকে এমন করে ছেড়ে দিতে পারি তোমরা তা পারই না।' কিন্তু তার অব্যক্ত আর্তনাদের উপরে জয়ী হলো প্রণয়ীযুগলের অসংযত চুম্বনধ্বনি।

এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম মানেই মুক্তির প্রাণৈশ্বর্য, তাই দেখা গেল রেবার স্বচ্ছন্দ আচরণে, নায়কও খুঁজে পেল তার পুরনো আকাশ, এখন তার আর রেবার সম্পর্ক সাবলীল অকুণ্ঠ।

বাধ্যবাধকতার বন্ধন প্রেমের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পরিপন্থী—এই কি বক্তব্য ছিল লেখকের? অর্থনৈতিক শক্তির উপরে নারীহৃদয়ের অন্তর্লীন মুক্তি পিপাসারই কি এখানে জয়ধ্বনি? অথবা বয়স থেকে যৌবনশক্তির কাছে, অসুন্দর থেকে

সৌন্দর্যে নারীর আত্মসমর্পণ। কেননা, অর্থনৈতিক শক্তিতে অনুমান করি উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীই সমান।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতে, 'গল্পের পদক্ষেপ কেমন যেন অনিশ্চিত। দুর্বলতা ধরা পড়ার ভয়েই যেন ভাষা সংক্ষেপ।' এ দুর্বলতা কিসের দুর্বলতা? বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সযত্নে চেপে রাখতে চেয়ে কাঁচা লেখকরা যেভাবে কাহিনীকে বিকৃত করে ফেলে, বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি দিতে পারে না—তার কথাই কি ইঙ্গিত করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র? কেননা ভাষা এখানে স্পষ্ট আর নিশ্চিত। কাহিনীর বিন্যাসও যথাযথ, ছোটগল্পের শর্তমাফিক। যাই হোক ছায়ানট ব্যর্থহৃদয় প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসমথিত—অভিজ্ঞতার আলোকে নারীমনস্তত্ত্বের এক বিচিত্র উদঘাটন।

১৯৩২ সালে রচিত **'হেমন্তের দিনগুলো'** গল্পটি 'বিভাব' পত্রিকার জীবনানন্দ দাশ জন্ম শতবর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম যুদ্ধের পরের অবচনীয় অবসাদের কালে কলকাতায় লেখক এলাকায় অসিত তার এক আত্মীয় রমেশের বাড়িতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকে। রমেশ ভাড়াটেদের সঙ্গে গোলমাল বাঁধে বলে বাড়ি আর ভাড়া দেবে না। কিন্তু তাকে পাঁচ বছরের জন্য বাইরে যেতে হবে, অসিতও তখন কলকাতায় অন্য কারো গলগ্রহ হয়ে দিন কাটাচ্ছিল, রমেশের বাড়ি খালি আছে জেনে তার কছে প্রস্তাব রাখতে ব্যবস্থা হয়ে গেল। কয়েক মাস অসিত এ বাড়িতে আছে।

সকালে লেকের পাড়ে বেড়াচ্ছিল অসিত। সৈন্যব্যারাক খালি করে সৈন্যরা চলে গেছে। বালিগঞ্জের ট্রেনে ধোঁয়া উড়িয়ে সগর্জনে যাচ্ছে, অবিশ্রান্ত মোটরের হর্ন তবু কাক বক ঘন গাছ, গাংচিল সূর্যোৎসারিত পৃথিবী গোছানো নির্জন পথ। সূর্যমর্মরিত জল। অনেকে ভালবেসে ডুবে মরেছে। ১৩৫০ সালে অন্নের হাহাকারের সময় ছিঁড়েছে শকুন। আজ বিরাট নগরীর পটভূমিতে শান্ত হ্রদ, ভোরের অন্তহীন অবর্ণনীয় জল, দেখছিল, ভাবছিল অসিত।

বাড়ি ফিরে একটা চিঠি পেল অসিত। মফঃস্বলে যে অফিসে সে কাজ করে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে যত ছুটি পাওয়া সম্ভব সব নেওয়া শেষ করেছে অসিত, তারা চিঠি দিয়েছে, তার কাজের আন্তরিকতার জন্যই নিয়ম শিথিল করে এতদিন একটানা সাতমাস ছুটি তারা দিয়েছে। চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়ল না অসিত। স্ত্রী এলে তার সঙ্গে গ্রামের পুরানো চাকর রামচরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা জোড়ে, এই শ্রেণী-সংগ্রামের যুগে রামচরণের মতো ভালো চাকরের শৌখিনতাই ছেড়ে দিতে হবে। মদনগঞ্জে ফেরার প্রস্তাবে গা করে না অসিত। স্থানীয় চাকর দেখে নেবার ভাঁওতা, ঘরের কাজে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সীতাকে রাগিয়ে দেয় কেবল। সংসার খরচের জন্য দুশো টাকা দিয়েছিল সীতাকে, আরো একশ চাই সীতার ; রেশন আনতে হবে। অসিত বলল, ব্যাঙ্ক থেকে তুলে বিকেলে দিতে পারবে সে।

দেরাজে পাওয়া গেল রামচরণের পোস্টকার্ড, তিন মাসের মাইনে বাকি তার। আগের চারমাসের মত মাসের প্রথমেই পাঠাচ্ছে না। কেন অসিত? আজ পাঁচটা ছটার আগে

ভাত মিলবে না। অসিতের মনে হলো সীতার যোগ্যতা সত্ত্বেও নিজেরই দোষে দাম্পত্য ব্যর্থ হয়েছে তার। এটা হলো অর্থাভাবে। জীবনের যে বহতা সৌন্দর্য প্রকৃতির, নারীর মননের—সে ভালবেসেছিল তা সবই নষ্ট হলো স্বচ্ছলতায়। পাড়াগাঁর হেমন্তকে সে ভালবাসতো। হেমন্তে নারীর দেখাও সে পেয়েছে, তাকে ভালবাসতে চেয়েও তাকে কোথায় রেখে দিয়েছে। প্রকৃতি বেঁচে আছে কিন্তু মানুষ অধঃপতিত। অসিত ভাবছিল, রামচরণকে ত্রিশ টাকা পাঠানো দরকার, সীতার সঙ্গে সনাতনী মিথ্যার খেলা চলছে, আফিসের চিঠি চাপা দিয়েছে তার কাছে। অসিতের সম্পর্কে সীতার মনোভাব এখন দাঁড়িয়েছে দায়সারা। তারা পরস্পরকে ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু তারপর এই সমাজ সংস্থানে ওরা দাঁড়াবে কোথায়?

দেহে মরে যাবার অনেক পথ আছে, মনে মরার বেদনা ঢের বেশি, মনে মনে ভাবছিল অসিত, সীতাও কি বেঁচে থাকা সঙ্গত মনে করে? অজস্র মৃত্যু ঢুকছে ওর সত্তার ভিতর, তবু আগুনে পুড়ে রাঁধছে, ওর দেহ খাবে বলে। সন্ধ্যায় খোঁপা বেঁধে খোকনকে নিয়ে লেকে বেড়াতে যাবে। অসিত মনে করে প্রত্যহের তিমির মৃত্যুকে পরিষ্কার করে নেওয়া চাই, বুঝে নেওয়া চাই জীবন রয়েছে।

রামচরণকে চিঠি লিখল অসিত। অফিসের চিঠিটা পড়ল। তাতে তাকে জানানো হয়েছে পনেরো দিনের মধ্যে সে কাজে না ফিরলে ওরা নতুন লোক রাখবে। অসিত জানিয়ে দিল সে আর ফিরবে না। এবার টাকার সন্ধানে সে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। টাকা পেল না, প্রতিশ্রুতি পেল দু-একটা, কিন্তু প্রতিশ্রুতি চিবিয়ে খাওয়া যায় না। পি. এফ. এর শেষ দেড়শ টাকার একশ সীতাকে দিতে হবে, ত্রিশ টাকা রামচরণকে—এই বিবেক বলে। কিন্তু সীতাকে দিতেই হবে অন্তত। অসমর্থ স্বামীর অবচেতনা তাকে বুঝিয়ে দেয়।

খোকনকে পাঠিয়েছিল মনোহরকে ডেকে আনতে. সিল্কের স্যুট পরে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী খবর বৌদির কিছু হয়নি তো?'

মনোহর বোধহয় মদ খেয়েছে, মেজাজ ছিল তিরিক্ষে। অকারণে খোকনকে ঘুষো মেরেছে, তবু দাঁতে হেসে অসিত তার কাছেই দুহাজার টাকা ঋণ চাইল। মনোহর বললো, না না অতো লাগবে না। চেনা ভালো লেডি ডাক্তার আছে তার, মনোহরের দিদি বিধবা গুণময়ীকে ডেকে আনবে, বৌদির এই ব্যাপারে কাজ হাসিল হবে। কি বলছে মনোহর?

অসিত ও প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ফের দু হাজার চাইল মনোহরের কাছে। মনোহর দিতে রাজি হলো না। বললো, শেয়ার মার্কেটে বিনে টাকায় টাকা পাইয়ে দিতে পারে সে। ক্যাশ টাকা নেই, সেটা দিতে পারে তার বাবা, বন্ধকী কারবার তার।

আসলে সীতাকে মাঝে মাঝে টাকা ধার দেয় মনোহর। সীতা সুন্দরী, মনোহর তাকে সিনেমায় নামিয়ে দেবে। তখন সীতা শোধ দেবে ঋণ। মনোহরের পরিচিত ডিরেকটার প্রডিউসার প্রোপ্রাইটার আছে ঢের। একজন আসতেও রাজি হয়েছিল। সীতার চর্বি গলিয়ে একটু রোগা হতে হবে। কিন্তু মনোহরের জন্যই হুচোট খেয়ে পায়ের একটা হাড় নষ্ট হয়ে গেছে, চলতে কষ্ট হয়। সীতার দাবি অসিত তাকে ঠিক করে দিক।

সীতার পা মচকে গিয়েছিল মনোহরকে ঠেকাতে গিয়ে ; তার মনে হচ্ছিল ও সীতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বুঝি, ওটা ওর মুদ্রাদোষ। কিন্তু এত বেশি ভয় পাওয়াটা নাকি মেয়েদের স্বভাব নয়—মনোহর বলেছিল।

অসিত শুনে বলল, সে পঞ্চানন চাটুজ্জেকে দেখাবে। তাছাড়া তারও দু-একজন চেনা লোক আছে সিনেমায়। মনোহর কেন, সেই সীতাকে নিয়ে যাবে সেখানে। কিন্তু সীতা তাতে রাজি নয়। স্বামীর স্বত্ব হাতে রেখে অসিত যে কারচুপি করবে তা সীতা হতে দেবে না। ও নামিয়ে দেওয়া মানে, নামিয়ে দেওয়া।

পরিশেষে অসিত সীতাকে বলতে বাধ্য হয়—"করে দিতে হবে তো। আমি এতদিন করেছি—এইবার তুমি কর। তুমি নিজেই যাও।" কিন্তু বুঝল সিনেমায় নামার প্রধান বাধা হল সীতা নিজে।

অসিত কোনো চাকরি পেল না, দেনা প্রচুর। রমেশের অনুমতি না নিয়ে তার বাড়িতে ভাড়াটে বসালো, এইভাবে খেয়ে না খেয়ে দিনগুলো কাটতে লাগলো।

সীতা মারা গেল তিন মাসে মেয়ে প্রসব করে, খোকন মারা গেল পাঁচ দিনের জ্বরে। এক অন্ধকার রাতে লেকের জলে পা ডুবিয়ে বসে ছিল অসিত। যেন সমাধির মধ্যে স্বর্গীয় খোকন পাখি, সীতা পক্ষিণী, রামচরণ গিরেবাজটাকে ভাল লাগল তার। বুঝতে পারলো না। সে ডাঙায় রয়েছে, না জলের ভিতরে। চাঁদের কিরণ এসে পড়ল তার উপর। কেউ কোথাও নেই।

কোথায় কথা বলছে সীতা, খোকন, রামচরণ? অসিতের কথারই প্রতিধ্বনি যেন। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছিল সব ভুলে ছেড়ে তাকে যেতে হবে কালো রাজার আর শাদা ইয়ার্কির মেরুনা রঙ্গের দেশে।

পৃথিবীতে নিজেকে মানাতে পারলো না অসিত। ৩০০ টাকা মাইনের চাকরিতে তাকে দেওয়া হলো মাত্র ৭৫ টাকা। তবু কাজ করতে লাগল সে। বাড়ির ভাড়াটে এক বাজে স্ত্রীলোক, বিধবা। সুযোগ পেলে আসতো অসিতের কাছে। কোনো মিলন—সঙ্গম—বা আলতো পরিচয়ও নয়—অদ্ভুত খেলা, এর কোন বিষময় পরিণতিও নেই।

এ যদি গল্প হয়—অবশ্য জীবনানন্দের সব গল্পেরই প্রায় এই ধাঁচ, অভাব দারিদ্র্য কর্মহীনতা স্বামী-স্ত্রীর তিক্ততা, আকস্মিক মৃত্যুতে গল্পের যবনিকা, এখানেও অব্যাহত। আশ্চর্য এই যে, 'দেশ' পত্রিকায় জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত তাঁর ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে লেখা 'সোমনাথ ও শ্রীমতী' গল্পেও প্রায় একই কাহিনী—একরকম পরিণতি। গল্পের অন্তর্বর্তী ১৪ বছরে লেখকের ভাবনা কল্পনা কি কিছু পরিণত হয়নি?

গল্পের ধারা

পঞ্চম স্তবক

১৯৩৩ সালের কাহিনীর ধারা শুরু হয়েছে **'তাজের ছবি'** গল্পটি দিয়ে। জানুয়ারি মাসে রচিত এই ছোটগল্প জীবনানন্দ সমগ্রর সপ্তম খণ্ড ভুক্ত।

বাবার মাইনে সাড়ে চারশো, চারটে সংসার চালাতে হয়। দেনা প্রায় চোদ্দ হাজার টাকা। বিজনের তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু দুবছর পরে রিটায়ার করবেন শ্রীবিলাস, পেনশন দাঁড়াবে ২৫০। বিজনের ধারণা তার ছবি বিক্রির টাকায় সে পৈত্রিক দেনা শোধ করতে পারবে? বাবার সঙ্গে কথা বললেই উপার্জন ও ব্যবসার প্রসঙ্গ—ঋণশোধ। বিজন চায় সমস্ত চিন্তামুক্ত হয়ে ছবি আঁকতে। ছবি নিয়ে ভাবতে।

খামখেয়ালি স্বভাব তার। দুপুর বেলা হঠাৎ গেল মাধবীদের বাড়ি। বিজনের সুট পরার অভ্যাস। কিন্তু তার ইচ্ছে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সিল্কের উড়ানি পরা। মাধবীর সে পোশাক অপছন্দ। বিজনের ইচ্ছা, মাধবী তার নাম ধরে ডাকুক। তাজের ছবি। কথাপ্রসঙ্গে মাধবী তাকে আগ্রা যাবার পরামর্শ দেয়। নিজের বাবার উপর নির্ভরতার কথা বলে, ইঙ্গিত করে বিবাহোত্তর মুক্তির। কিন্তু বিজন সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। কিন্তু মাধবীর বর্ষার পটভূমিতে তাজের ছবি আঁকার প্রস্তাব তার পছন্দ হয়। সে বলে, কালই সে আগ্রা যাবে ভাবছে।

বিজন মাধবীর একটা ছবি আঁকতে চায়। মাধবীর বন্ধ পড়ার ঘরে ছবি আঁকা চলছিল। মাধবীর বাবা প্রভাতবাবু আসলে বিঘ্ন হয়। তিনি বোঝেন না সৌন্দর্য কি? ভাবেন বিজন আর্ট কলেজে না পড়ে আঁকতে শিখবে কিভাবে? বিজন বলে, 'যারা বাস্তবিকই আঁকতে এসেছে তাদের পক্ষেই পৃথিবীর চারদিককার সরঞ্জামই যথেষ্ট।' সে ফটোগ্রাফার নয়।

মাধবীর ছবি আঁকা হলো না, বলে সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গেল। প্রভাতবাবুর কথা ভেবে বিজনের হাসি পাচ্ছিল। মানুষের জ্ঞান কত কম হতে পারে। মাইকেল এঞ্জেলোর উপর একটা প্রবন্ধ পড়তে পড়তে বিজনের মনে কতকগুলো ছবির নকশা তৈরি হচ্ছিল। এগুলোকে রূপ দেবে ভেবে সে লাইব্রেরি ছেড়ে উঠলো। বালিগঞ্জে যাবে, কিন্তু ধরলে শ্যামবাজারের ট্রাম। গোলদিঘির কাছে খেয়াল হতে নেমে পড়ে চুরুট দেশলাই কেনার জন্য টাকা ভাঙালো। তারপর ভিখিরিদের প্রত্যেককে যা হাতে উঠলো ভিক্ষা দিলে। গোলদিঘির একটা ছেলে গুলি-বাঁশ দিয়ে বুলবুল মারছিল। বিজন সেটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে দিল। একটা ইংরেজি নভেল কিনল। তারপর বাসে উঠে টিকিট কেটে যেতে যেতে চাঁদের শোভা দেখবে বলে হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়লো দামি বইখানা বাসেই ফেলে রেখে। তারপর এক কুষ্ঠরোগীর দোকান থেকে ফুলুরি বেগুনি খেয়ে একঘণ্টা ধরে ভিজে বালিগঞ্জের বাসায় হেঁটে ফিরলো।

পরদিন আগ্রা যাবে বিজন। শ্রীবিলাস তাকে হোটেলে না থেকে জানকীবাবুর বাসায় থাকার কথা বলেছিলেন। সে বাবার কাছে চিঠি নিল। কিন্তু বলল, প্রথমে গিয়ে হোটেলে উঠবে। তাতে যা খরচ হবে তা নিয়ে চিন্তা নেই বিজনের। 'এমন কি আর!' কতদিন

থাকবে তারও ঠিক নেই, দশ বারোদিন, দরকার হলে চার পাঁচ মাস লাগতে পারে। আসলে তাজমহলের তিনটে এফেক্ট তার চাই—এফেক্টগুলো বড্ড ফ্লিটিং।

আগ্রায় এক সাহেবি হোটেলে উঠল বিজন। দুদিন পরেই আরো তিনশ টাকা আনিয়ে নিল বাবার কাছ থেকে। আগ্রায় ভীষণ গরম, শ্রাবণেও মেঘ নেই। খুব ভোরে সূর্যের পিঁয়াজি সোনালি রঙে তাজের গম্বুজ মিনার স্বপ্নের মতো মনে হয় বটে, আর জ্যোৎস্নায় সেই হ্যাকনিড্ তাজ, কিন্তু বৃষ্টির করুণ আলোয় যে তাজ সে তাজ সে দেখতে পাচ্ছিল না। তাই দিল্লি চলে গেল।

কয়েকদিন টাঙ্গায় ঘুরে ঘুরে, জামা মসজিদ আঁকলে, দিল্লি ফোর্ট, হুমায়ুনের কবর, চাঁদনীর চক, দরিয়ার দিক, দিল্লির যমুনার শ্রী ছাঁদ, পুরানো শহরের ভাঙা পাঁচিল পাথরের চাঙড় ভরা দূরের কালো পাহাড়টা। এবার বৃষ্টি শুরু হলো। চলে গেল আগ্রায়। সেখানে ঝাঁ ঝাঁ রোদ, বৃষ্টি আগ্রায় হয়েছিল তখন বিজন দিল্লিতে। একদিন দিনের বেলায় খেয়ে দেয়ে ঘুমল। হোটেলের রেলিঙে পেন্টালুন শার্ট শুকুচ্ছিল। ভিজে ছ্বছ্ব করছে। এমন বাদলে তাজ দেখা হলো না। হোটেল ছেড়ে সে বাবার চিঠি নিয়ে জানকীবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠল।

বাড়িতে জানকীবাবু, তার স্ত্রী ও মেয়ে সন্ধ্যা, মাত্র তিনজন। খুব খাতির। বিজন এদের নিজের পরিকল্পনা বলল। বলতে গিয়ে মাধবীর প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত বিজন সন্ধ্যার কাতরতা লক্ষ্য করল না।

একদিন গভীর রাতে সন্ধ্যা তাকে এসে ডাকলো, বৃষ্টি পড়ছিল। বিজন উঠে তাজ দেখতে গেল। দেখে এসে তখনই ছবি আঁকতে বসল। আধঘণ্টা পরে টোস্ট ফল কেক নিয়ে এলো সন্ধ্যা। তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছিল বিজন।

কয়েকদিন পরে বিজনের রেনকোটটা ইঁদুরে ফুটো করেছে। সন্ধ্যা তা সেলাই করে দিচ্ছিল। দেখে নতুন ছবির আইডিয়া এলো বিজনের। নিঃসন্তান বিধবা বাঁচার জন্য লড়ছে। সে সন্ধ্যাকে মডেল করে ছবিটা আঁকছিল।

একবার মনে হলেছিল, স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য ভরা মেয়েটিকে বিয়ে করলে হয়। আবার ভয় পেলো দায়িত্ব বাড়বে। চাকরি নিতে হবে।

কালকাতায় ফিরে বিজন মাধবীকে ছবিগুলি দেখালো। কোনো নামজাদা আর্টিস্ট কিন্তু বিজনের কোনো ছবিরই বিশেষ প্রশংসা করল না। ছবিগুলো ছেলে-মানুষী, ছেলেটির উৎসাহ আছে—প্রতিভা নেই। কেউ কেউ তাকে আর্টস্কুলে পড়ার পরামর্শও দিলে।

আগ্রা থেকে ফিরে বিজন দুমাস একটাও ছবি আঁকলো না। তারপর একটা আর্টস্কুলে ভর্তি হলো সে। জীবনটা কি হয়ে গেলো, ভেবে ব্যথা পেতো। ভরসা ছিল উপেক্ষা লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে তার প্রতিভা একদিন ফুটে বেরুবেই।

মা মারা গেলেন। শ্রীবিলাসও বেশিদিন বাঁচলেন না। ১৪ হাজার টাকা ঋণ তিনি শোধ করেছিলেন বটে, কিন্তু ছেলের জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন নি। বিজন এখন এক মেসে থাকে। বহুদিন কারো খোঁজ করে নি। এখন বৌ, ছেলে পিলে শান্তি এইসব ভাবছিল বিজন। মাধবীকে জীবনসঙ্গিনী করবেই। তাদের বাসায় গিয়ে খবর পেল দুটি

ছেলে নিয়ে মাধবী শ্বশুরবাড়িতে আছে। মেসে ফিরে সন্ধ্যাকে এক চিঠি লিখলো, পোষ্টকার্ডে জানকীবাবুর উত্তর পেলো। সন্ধ্যার স্বামী বালিগঞ্জে থাকে, সন্ধ্যা কলকাতাতেই। সে বাড়ির নম্বর দিয়েছেন জানকীবাবু।

তার তিন রুমমেটই অফিসে চাকরি করে, মাইনে পায়—আর আজ বিজনের নোংরা খদ্দরের জামা, পায়ে ছেঁড়া স্লিপার। গোলদিঘির যে ছেলেটা গুলি বাঁশ দিয়ে বুলবুলি মারছিল তারা সুন্দর বুলবুলিদের মেরে চলেছে। তার হাত ধরে গুলি বাঁশটা ভাঙার ভরসা আজ আর তার নেই।

জীবন যে খেয়াল খুশি মতো চলে না, আবেগ প্রবণতা দিয়ে নয়, খামখেয়ালিভাবে নয়, দৃঢ় সংকল্প ও সাধনার সঙ্গে প্রাপ্ত সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতে হয়, বিলাসিতা বা হঠকারিতার পরিণাম যে কি তা 'তাজের ছবি' গল্পে বর্ণিত। আত্মকেন্দ্রিক হামবড়া এক শিল্পী বিজন। খেয়ালী, অস্থিরচিত্ত। দুটি নারী এসেছিল তার জীবনে—প্রেমময়ী, কিন্তু জীবনসঙ্গিনী বাছতে পারলো না। সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, ফলে দুজনেই হাতছাড়া হয়ে গেল তার।

'নিরুপম যাত্রা' জীবনানন্দ সমগ্রর তৃতীয় খণ্ডভুক্ত এই বড় গল্প নিরুপম যাত্রা লেখা হয়েছিল মার্চ ৩৩-এ বরিশালে। প্রভাত চার বছর পরে কলকাতা থেকে দেশে ফিরবে বলে স্থির করেছে। চার বছর কোন চাকরির সন্ধান পাবার আশায় সে কলকাতায় মেসে এসে বসে আছে, যদিও চুপ করে সে বসে থাকে নি, চাকরির চেষ্টা করেছে খুব। কিন্তু সুবিধা কিছু হয় নি। প্রভাতের বাবা মারা গেছেন। মা তাকে চিঠি লিখে দেশে আসার কথা বলেছেন। বউ তাকে পনেরো কুড়ি দিন পরপর চিঠি লিখে জানতে চায় কিছু করে উঠতে পারলো কিনা। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি সম্পূর্ণ হারিয়ে নিঃস্ব হতাশাগ্রস্ত প্রভাতকে দেশে ফিরতে হচ্ছে। এক বন্ধুর কাছ থেকে ২০ টাকা ঋণ নিয়ে নিজের দেনা মিটিয়ে এবং মায়ের স্ত্রীর এবং ছেলের জন্য কিছু খেলনা বিস্কুট প্রভৃতি কিনে যখন যেতে প্রস্তুত হঠাৎ এক অধ্যাপক বন্ধুর সুপারিশে একটা সাময়িক টিউশনের ব্যবস্থা হয়েছে তার। প্রভাত প্রথমে এই টিউশন নিতে চায় নি। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য এবং স্ত্রী-পুত্রের জন্য তার মন টেনেছে। কিন্তু তার বন্ধু তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে কলকাতায় তিনমাস থাকতে পারলে তার চাকরির সংস্থানও তো হওয়ার সম্ভাবনা হয়। সত্যিই পরে এই টিউশনের সূত্রেই প্রভাত একটি স্কুলে সাময়িকভাবে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছে। দু-চার মাস কাজ করে সে নিজের যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে, সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে এ চাকরি পাকা হবে। এমন সময়ে অসুস্থতার জন্য একদিন সে দু পিরিয়ড পর ছুটি নিয়ে বাসায় এলো। প্রথমে ঠিক করলো, আজই সে দেশে ফিরবে। বিছানা গোছালো। তারপর জ্বর কমতে ঠিক করলো মায়ামমতার দোহাই দিয়ে সে জীবনের লড়াই থেকে পিছু হটবে না। সে বিছানা আবার পেতে নিল—ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর জীবনের সুবিন্যাসের স্বপ্ন দেখলো। সন্ধ্যার মুখে আবার জ্বর হলো। খিদের জ্বালায় সাত মাস আগে খোকার জন্য কেনা বিস্কুটের প্যাকেট খুলে মিয়নো বিস্কুট খেলো। সারারাত রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সকালবেলায় সে মারা গেল। তখনো কেউ তার অসুখের খবর জানে না।

মেসে সকলেই কর্মব্যস্ত। তার সৎকার কে করে? স্থির হলো। কাজকর্ম সেরে ফিরে প্রভাতকে দাহ করা হবে। সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত এই যুবক কখনো কল্পনা করে নি, এইভাবে সে মেসে মরবে। তার নিজের প্রিয় গ্রাম যেখানে সে অনেকবার যাবে সংকল্প করেও ফিরতে পারে নি, ফিরতে পারবে না। রাতে সিগারেট ও পানের ডিবে নিয়ে মেসের কয়েকটি বাবু তাকে নিমতলায় পোড়াতে যাবে।

গল্পটি আকারে বেশ বড়ো ; সমস্ত গল্প জুড়ে প্রভাতের আবেগপ্রবণ হৃদয়ের স্বগ্রাম ও স্বজন, প্রতিবেশী এমন কি ধোপা নিরঞ্জন, কুকুর কেতুর প্রতি সুগভীর প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রী চাকরি সন্ধানের প্রেরণা দিলে বিরক্ত প্রভাত ভেবেছে 'ব্যবসাবোধ মেয়েমানুষের কী ভয়াবহ!' তার গ্রামে ফেরার সংকল্পে যেভাবেই বাধা এসেছে সে খুশি হয়নি। তাই বলে লড়াই থেকে সে পিছিয়েও যায়নি হৃদয়াবেগ ও কর্তব্যের এই টানাপোড়েন প্রভাতের চরিত্রকে জীবন্ত করেছে।

কর্মব্যস্ত মেসের বোর্ডারদের তার প্রতি অবাঞ্ছিত কর্তব্যপালনের আগে সারা দুপুর তার ঘরে পরিত্যক্ত শব বাচ্চাদের ভুতের ভয়ের জোগান দেয়। বড় গল্প বলেই বেদনাময় ঘটনাটিকে নির্মম লেখক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাবার সুযোগ পান।

প্রভাতের মৃত্যু বড় আকস্মিক। কিন্তু জীবনানন্দের কিছু গল্পে এমন আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে এসে পরিণামহীন কাহিনীর পরিণামে পৌঁছানো হয়েছে, যেমন 'অঘ্রাণের শীত' গল্পে উমার আত্মহত্যায় এমন আকস্মিক চমক ছিল। প্রভাতের মৃত্যুও তেমনি অনেকখানি।

'রক্তমাংসহীন' জীবনানন্দ সমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত এই গল্পটি বরিশালে বাসকালে মার্চ-এপ্রিল ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের রচনা। দারিদ্র্যই যে দাম্পত্যের বেদনাতুর বিনষ্টির হেতু সেটা বোঝাতেই যেন এই কাহিনী।

ঊষার ভাই হিমাংশু এসেছে দিদিকে নিয়ে যেতে। শেষ রাতে স্টিমার ছাড়ে। দরিদ্র স্বামীর সংসার। ঊষার বড় ইচ্ছে ছিল না যাবার। কিন্তু স্বামী পাঠাতেই ব্যগ্র যেন। স্টিমার ছাড়ার সময় পালটেছে। পিছিয়ে গেছে। ঊষার তা মনে থাকা না থাকার নাটকীয়তা। শেষে স্বামী জানায় স্টিমারের সঠিক সময়। 'এখনও এক ঘণ্টার উপর সময় আছে।' স্বামীর এই আগ্রহে স্তম্ভিত ঊষা বলে, 'আমাকে যেন তুমি জোর করে পাঠাবেই,...একদিন হয়তো আমাকে তুমি খুনই করবে, তুমিই করবে।' শেষ পর্যন্ত যাবার সিদ্ধান্তই নেয় ঊষা, 'যাই ঘুরে আসি একবার, বাপের বাড়ি তো অনেকদিন যাওয়া হয় না।

তবু স্বামী ঊষাকে থাকতে বলেনা। আর ঊষাকে নিজের ইচ্ছার স্বাধীনতা, বাক্স বিছানা খোলার কথাবলেও খুললোনা। স্বামীর প্রতিক্রিয়া দেখে নিল হয়তো। কাঁদলো অনেকক্ষণ। তারপর স্টিমারে বিদায়দৃশ্য। মামুলি কথাবার্তাও নয়। সমালোচক গৌতম সেনগুপ্তের উক্তি 'একি বাপের বাড়ি যাচ্ছে বউ, নাকি কোনো মসৃণ ঘাতক কাউকে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমিতে।'

কে এই ঘাতক? স্বামী স্বয়ং, না তাদের সীমাহীন দারিদ্র্য। এখানে জানানো হলো দেশ থেকে খবর এসেছে ঊষার 'সন্ধ্যের সময় কলেরা হয়েছে শেষরাতে মারা গেছে। কলেরায় এ রকম প্রায়ই হয়ে থাকে।'

শেষ বাক্যটিতে পাঠকদের সান্ত্বনা দেওয়া হলো। নাকি গল্পের দুর্বলতার জন্য ক্ষীণ কৈফিয়ৎ।

'পূর্ণিমা', 'অঘ্রাণের শীত', 'নিরুপম যাত্রা'র মতো এখানেও আকস্মিক অপঘাত মৃত্যু কাহিনীর সমাপ্তি টেনেছে। অবশ্য এ মৃত্যু যেন দুঃসহ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ করে দিয়েছে। লেখক যেন বোঝাতে চান এক অজ্ঞাত হাত মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। নিজের ইচ্ছা সাধসংকল্পকে নিজের মত পূর্ণ করা যায় না। একটি গরীব স্বল্প-তৃপ্ত বধূর ভালবাসার সাধও পূর্ণ হতে পারে না।

'জামরুল তলা' জীবনানন্দ সমগ্রর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গল্প। এটির রচনাকাল এপ্রিল ১৯৩৩। এ যেন 'রক্তমাংসহীন'-গল্পের উল্টোপিঠ। এখানে শোভনাই উষা—নির্মলের বউ। আমি—নির্মল।

বড়ো একান্নবর্তী পরিবার। জীবনের প্রয়োজনে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ কলকাতায়। তারা কলকাতা ছেড়ে ফিরতে চায় না। দেশের বাড়িকে একটা স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ মনে করে। মা ও বোনের অসুখ হওয়ায় তাঁরা দেশের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় গিয়েছেন। আমৃত্যু ফিরবেন না হয়তো। স্ত্রী শোভনাও বাপের বাড়ি। তার বাবার অসুখ, শোভনাও একবছর সেখানে থাকবে।

পশ্চিম ভিটার টিনের ঘরটা খা খা করে। আট/দশখানার ঘর, আসবাব সব আছে, মানুষ মোটে দুটি মেজকাকা আর পিসিমা। ২০/২৫ জনের ঘরে এখন ঠেকেছে দুজন : এরা মরলে টিকটিকি ইঁদুর। মেজকাকা বিয়ে করেননি। পিসিমা বিয়ের পরেই বিধবা। প্রায় বছর বিশেক আগে বাপের বাড়ি এসেছেন। আমৃত্যু থাকবেন—এ বড় ভরসার কথা। তিনি বড়ি, আমচুর, পুঁইমাচার তদারক করেন। ভালো লাগে।

পূবের খোড়ো ঘরে লেখক একাই থাকে। যে বাড়িতে মজলিশ, দাবার আড্ডা, বিন্তির আসরে চাঁদনি রাত জমজম করতো, তাতে এখনও হরিচরণের মরকুটে ঘোড়া ঘাস খায়, গাঙ শালিকের কিচির মিচির।

লেখকের জানলার সামনের উঠোন প্রান্তরে মিশেছে। মাঠের উত্তর কিনারে আম, অশ্বত্থ, সজনে, পেয়ারা, হিজল, পলাশ, ছাতিম গাছ। কৃষ্ণচূড়ার নিচে মজুমদারদের ভেড়া চরে হয়তো। কোকিল ডাকে। ছেলেবেলার রূপকথার স্মৃতি জাগে। হৃদয়ের রং আশ্বিনের ঘাসের মত হয়ে ওঠে।

জানালার পাশে লেখকের টেবিল পাতা। বড় সেগুন কাঠের, কোণে দোয়াতকলম। একটা চেয়ার, একটা চৌকি। পাশের আর দুটি ঘরে শোভনা খুকি আর মা থাকতো। ওরা চলে যাবার পর ২০ টাকা মাসে পাঠাচ্ছেন দাদা। তাতেই তিনজনের খুব চলে যায়। দাদার তিনশ টাকা মাইনে। খরচও অনেক। সংসারের অনেকেই ভালো চাকুরে, তবু খরচে তাদের কুলোয় না—দেনা জমে, এদের জীবন প্রণালী আশ্চর্য হয়ে ভাবে।

ওরা বলে, লেখকের জীবন কেমন নষ্ট হয়ে গেল। মনে হয়, ৩৫ বছরে জীবন পূর্ণও হয় না—নষ্টও হয় না। স্থানীয় ক্লাবে খবরের কাগজ দেখতে যায়। চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে, অন্য সংবাদে চোখ বুলোয়। নিজেকে অনেক কাজের উপযুক্ত

মনেও হয়, কিন্তু জানি এ আমি পাবো না, তাই এক আধখানা দরখাস্ত করি। টিকিট বাঁচে। উত্তর আসে না অবশ্য। কলকাতায় থেকে চাকরির চেষ্টা করলে হতো। কিন্তু মেজকা একা দেশে থাকতে পারবেন না, ভিটে ছেড়ে সঙ্গেও যাবেন না পিসিমা। যখন বাড়িতে অনেকে থাকতো, তখন এ সমস্যা ছিল না। তখন চাকরির চেষ্টা খুব করেছি। কিছু হয় নি। তাই কলকাতায় যাবার চাড় আমার কমে গেছে। পিসিমার বাগানে তরিতরকারি বিশেষ মেলে না, ডাঃ হরিনাথ বিশ্বাসের ২৫/২৬টা ছাগল, তারাই শেষ করে। বিনা ভিজিটের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, কিছু বলা যায় না। পিসিমা ধামায় ভরা বেগুন, লঙ্কা, লাউ, নিমশাক পাড়ায় বিলোন। হরিনাথ গিন্নীকেও দেন।

মেজকাকার অঢেল সময়, তাই বাজারের আমোদ সকালে তিনি ছাড়েন না। আড্ডা দিয়ে হুঁকো খেয়ে, ইয়ার্কি-ফক্কুরি করে তাঁর দু তিন ঘণ্টার বাজার চলে, মাছ কেনেন না। বরফ দেওয়া হয় পাছে। গরম মশলা ঘি বছর খানেক নেই, কফি না কিনে ভালই করেছেন মেজকা। চা আমাদের জীবনের অসংযম, করমচা পাতার মতো চা, চুনের জলের মতো দুধ, আর আখের গুড়ের চা, তিনজনের ঘনিষ্ঠতা শুধু খাবার সময়। বাকি সময় যে যার মতো চলে, পিসিমা চিঠি লেখেন, তেঁতুল কাটেন, গরু ছাগল তাড়ান, রোয়াকে পড়ে ঘুমোন, দক্ষিণের ঘরে মেজকাকার নাকডাকা শুনি। মনের সুন্দরভাব কাগজের অভাবে নষ্ট হয়, লেখা হয় না। কাগজ কিনে এনে লিখতে বসে মনে হয়, গল্পটা আমার বাংলায় পড়া গল্পের কোনটার মতো হবে কি? হলে পত্রিকায় ছাপানো হবে। কেউ পড়বে, কেউ পড়বে না, পড়লেও ভুলে যাবে। দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি চিন্তা ও ভাবের সংঘাত, হৃদয়ে গুরুতর আঘাত করে না। দু এক মুহূর্তের জন্য চলকায় কেবল। গল্পটা যদি সুন্দর জিনিস হয়, ভালো লাগে আমার, জীবনের পুরানো বিষণ্ণতার ও মূল্যবোধের হাত থেকে নিস্তার দেয়—তবে কাজ হয়।

নির্মল এসে জানায়, যে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিল, গীতার টিকা লিখতো, সেই অবনী মারা গেছে। শেষদিকে সে চাকরি খুঁজছিল। মিছিমিছি সন্ন্যাসী হয়ে এটুলি, মতো বেঁচে থেকে কি লাভ? রাজার মত চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, মনের ঐশ্বর্যও ছিল ঢের, একটি নারীও পেয়েছিল সে হারানি, চৌধুরীদের মেয়ে বয়স আঠারো। সুন্দরী নয় শুধু, তাব অন্তরের কারুকার্য ছিল জয়পুরী শাড়ির মতো।

ম্যালিগ্‌নেন্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গেল অবনী, ডাক্তাররা ধরতে পারে নি। সাতমাস ধরে দিনরাত কী সেবা যে করল হারানি। চৌধুরীদের বাড়ির তেতলার সবচেয়ে সুন্দর নিরিবিলি ঘরে অবনী থাকার জায়গা পেয়েছিল। অবনীকে চেঞ্জেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, অবনী গেল না। অবনীর রুক্ষমুখ দাড়ি ভরা, জটার মতো চুল আর একহারা লম্বা সুশ্রী সুন্দর হারানি। মাঝে মাঝে নায়ক নায়িকা মনে হতো না। মনে হতো হারানি যেন নিবেদিত অনুপম কন্যা।

নির্মল জানায়, তার স্ত্রী, শ্যামবাজারের বিধবা মাসির কাছে থাকে। তার পেটে টিউমার, মেডিকেল কলেজের ডাক্তার বলেছেন, অপারেশন করা যায়। করলেও বাঁচাব

না, না করলেও বাঁচবে না। আট দশদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তার মৃত্যুর আগে নির্মল তার কাছে যাবে? না, না।

আসলে পরশু দুপুরে এসেছে টেলিগ্রাম। শুকনিটা গেছে। পোড়াবার লোক পাচ্ছে না, তাই নির্মলকে টেলিগ্রাম।

জীবনের বিপুল ব্যঙ্গ লেখকের সমস্ত গল্পের পরিকল্পনাকে ধাক্কা দিয়ে যায়, পল্লবিত জারুলের সবুজ ঐশ্বর্য, গাং শালিকের জীবনোচ্ছ্বাস, কৃষ্ণচূড়ার অজস্রকুড়ি, হারানির ভালবাসা, কিছুই লেখককে উজ্জীবিত করতে পারে না।

ক'দিন আগে শোভনা ভোর সাড়ে পাঁচটার ষ্টিমার ধরল বাপের বাড়ি যাবার জন্য। সেই শেষ রাতের কথা মনে পড়লো, শোভনার সঙ্গে।

এই যে গল্পটির তিন পর্বে বিন্যাস, লেখকের দারিদ্র্যপীড়িত পল্লীজীবন। নির্মল কথিত অবনী ও হারানির বেদনা বিধুর প্রেম কাহিনী এবং নির্মলের স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যু অথচ তার নিষ্ঠুর নিঃসাড়তা—এর মধ্যে কোনো যোগসূত্র লেখক গড়েন নি, সঙ্গতিও তেমন নেই। যে হারানির প্রেম ও সেবা সম্পর্কে এত সোচ্চার সে নিজের স্ত্রীর মৃত্যুতেও এত নিঃসাড় এ ভাবা যায় না। শোভনার চরিত্র ও বিদায় প্রসঙ্গও অন্তত যদি আভাসিত হতো তাহলে অন্তঃসঙ্গতি মিলতো কিনা ভাবা যেতো। কিন্তু এখন যেভাবে আছে তা গল্প নয়, গল্পের খসড়াও বলা যায় না মোটেই। লেখক গল্প প্রসঙ্গে মধ্যে কিছু কথা বলেছেন, ব্যঙ্গও করেছেন ; গল্পের সেই তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব সঙ্গতি কিছু নেই এটা দেখাবার জন্যই কি এ প্রসঙ্গের অবতারণা? এ ব্যাপারটাও বোঝা গেল না।

জীবনানন্দ সমগ্র দশম খণ্ডের প্রথম গল্প **'মজলিশে'** লেখা হয়েছিল এপ্রিল ১৯৩৩এ। মানুষের উপরোধে পড়ে কিভাবে বিড়ম্বিত হতে হয় তার কথা বর্ণিত হয়েছে এখানে। মজলিসের আয়োজক তিনকড়ি নাছোড়বান্দা। লেখক নলিনাক্ষ গায়কও নন, হাসিতামাসাতেও দক্ষ নন তবু তাকে মোটরে হ্যারিসন রোড থেকে বেহালা পর্যন্ত নিয়ে যাবেই তিনকড়ি। নারীপুরুষ মিলিয়ে শদেড়েক লোকের ব্যবস্থা করেছে তেতলার হলঘরে। সে মজলিশে তাঁর থাকা চাই।

তিনকড়ি কিছুদিন লেখকের কাছে প্রাইভেট পড়েছিল। বাচাল তিনকড়ি, নলিনাক্ষ যে কল্পনা উপলব্ধি এসব নিয়েই থাকতে চান, তাঁর যে ব্যবহারিক দক্ষতা বা সাংসারিক আকর্ষণ নেই, তা জানে। নলিনাক্ষ মেসে থাকে। পড়িয়ে বা লিখে কিছু উপার্জন করলে তবেই মেসের বকেয়া পাওয়া মেটায়। এহেন মানুষকে তিনকড়ি কেন যে টানা হেঁচড়া করে তা বোঝা দুস্কর। তিনকড়ি নলিনাক্ষকে দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। তার প্রত্যাশা মজলিশে সমাগত নারীদের মধ্যে পছন্দমত কারোকে নলিনাক্ষর ভাল লাগতে পারে, এবং ঐ পরিচয়ের পরিণতি হতে পারে বিবাহে। মজলিশে যেতেই হয় নলিনাক্ষকে, সেখানে আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি নেই। অপরিচিতের ভিড়ে পুরানো পরিচিত এক বন্ধু সুবোধের সঙ্গে বিগত কলেজ জীবনের গল্পগুজবে কেটে যার। একসময়ে নজরে আসে সামনে এক সোফায় বসা এক মহিলা তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। স্মরণে আসে এই মহিলা অমলা। এক সময়ে লেখকের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। সুন্দরী কেতাদুরস্ত অমলা

কাছে এলে নলিনাক্ষ জানতে চাইল রেঙ্গুনে চলে যাবার পর সে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখেনি কেন?

অমলা জানায়, সে মাত্র ছ মাস রেঙ্গুনে ছিল, যক্ষ্মা হওয়ায় কলকাতা হয়ে ভাওয়ালি গিয়েছিল। সেখানে বছরখানেক থেকে ফের কলকাতা রয়েছে ছ বছর। ওদের কথার মাঝখানে শশব্যস্ত তিনকড়ি তত্ত্বাবধান করে শরবৎ দিয়ে গেল। অমলা নিজের গল্প করছিল। ট্রেনিং পাশ করে সে পাঁচ বছর কলকাতার একটা স্কুলে হেড মিস্ট্রেস আছে। অমলার ধারণা জীবনের সবচেয়ে বড় শাস্তি নির্বিবাদ অবসর ভোগ। দিনরাত ব্যাপৃত থাকতে হয়। কালী চক্রবর্তীর গান হচ্ছিল। অমলা দামী হিরের আংটি, হিরের হার পরে এসেছে। সে মনে করে সুন্দরী হিসাবে পৃথিবীতে তার অনেক অধিকার ; স্ফূর্তি স্বচ্ছলতা নিয়ে জীবন। তার সহকর্মী দুটি শিক্ষিকা কিন্তু কেমন যেন কুণ্ঠিত। ভাবে জীবনটাকে ব্যয় করতে গেলেই অপচয় হবে।

একবার তিনকড়ি এসে জানালো, অমলা রিটায়ার্ড সাবজজ বরদাবাবুর স্ত্রী। বরদার বয়স সত্তর। অমলা তখন চলে গেছে।

মজলিশে মানুষ নিজের আসল সত্তাকে গোপন করে এক অতিকৃত স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মপ্রকাশ করতে চায় এটাই কি এই গল্পের প্রতিপাদ্য। নইলে অমলা কিছু প্রকাশ, কিছু গোপন করলো কেন?

দশম খণ্ডের দ্বিতীয় গল্প 'লোভ' ১৯৩৩এর এপ্রিলের রচনা। খাতায় সমাপ্তিসূচক চিহ্ন আছে। নামকরণ জীবনানন্দের নয়।

২৭/২৮ বছরের বেকার যুবক সংসারের কিনারে পড়ে থাকে। শিক্ষা ও যোগ্যতা বেশি হলেও স্থায়ী চাকরি সে জোটাতে পারেনি। যে স্রোত মানুষকে উন্নতি ও আড়ম্বরের দিকে বয়ে নিয়ে যায় সে স্রোত নৃপেনের জীবনে এসে যেন ফিরে গেছে।

সুচারু হাইস্কুলের শিক্ষক, নৃপেনের সঙ্গে পরামর্শ করে সে ইংরেজি অঙ্কের পাঠ দেখে নেয়। বলে, 'আজকালকার ছাত্ররা শয়তান ; ইয়ার্কি দিতে চায়। ভালো করে একসট্রাগুলো দেখে নিয়ে যাই।' কিন্তু তাদের ইস্কুলে নৃপেনকে সে কাজ জোগাড় করে দিতে পারবে না।

সচারু চলে যেতেই ছোট ছেলেমেয়েরা নানা কিছু পড়তে ভিড় করে। নৃপেনের ঘরে এগারোটা পর্যন্ত হাট। তাকে সবাই চা পাঠাতে ভুলে যায়—তা নিয়ে নৃপেনের অভিযোগ নেই। সে শুধু ভাবে সামান্য টাকাতেও সংসারকে সুন্দর পরিকল্পনায় সে সাজাতে পারতো। কিন্তু সে তো কানাকড়িও রোজগার করেনা। মা দুপুরে ছেলেকে কাছে বসে খাওয়াতে চান, তাঁর মমতার কথা শুনে ঝি চাকররাও মুখ টিপে হাসে। তাদের ঘরে যেতে বললে, তারা নানাখানা করে অন্যদের লাগায়। খাওয়ার শেষে তার জন্য পান মেলে না। লবঙ্গ বা শুপুরি কুচিও নয়।

দুপুরের সবুজ নারকেল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে নৃপেনের খুশি মন নিজের ছেঁড়া চপ্পলের ষ্ট্রাপের দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ হয়ে ওঠে। লীলা বলে, মনের ফুর্তিতে নৃপেন দিন দিন মোটা হচ্ছে।

নৃপেনের খাটে অগণ্য ছারপোকা। মেরে শেষ হবেনা। নীলমনির মা মস্ত ধামা ভর্তি চাল ভিখিরিদের বিলিয়ে চলেছে। এক সুন্দর চেহারার বৈরাগীকে সাত মুঠো চাল দিল। যেচে দিল দুটো বেগুন। তেল নুন কাঁচালঙ্কা, খেসারি ডাল। গাছ থেকে কাঁচা এচড়। অন্য ভিখিরিরা নীলমনির মার পক্ষপাতিত্ব নিয়ে অভিযোগ গালিগালাজ চালাতে লাগলো— বিরক্ত নৃপেন ভিক্ষে দিতে বারণ করলে পিসিমা মুখ বাড়ালেন, আমার বাবা সবার আগে বলে গেছেন দরিদ্রআতুরদের বিমুখ কোরোনা। তোমার বাবার চাল?' ভিখিরি ফকরে হেসে উঠলো হো হো করে। চাকরি পেলে মাকে নিয়ে ফিঙের মতো উড়ে চলে যাবার সংকল্প দৃঢ় হলো।

সেজ ঠাকরুণের ছেলে ওভারসিয়ার অমিয় কান্তি এসে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতেই পিসিমা পর্যন্ত সকলের সুর পালটে গেল। ভিক্ষে দেওয়া বন্ধ হলো।

গাঁয়ের স্কুলের লাইব্রেরিতে নৃপেনের পছন্দের বই মেলেনা। সুচারু ৭০ টাকা মাইনে পেয়েছে। ইচ্ছে ছিল নৃপেনের, তার কাছ থেকে দু দশ টাকা নেয়, কাগজ দোয়াত চুরুট কেনার জন্য, লেখার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সুচারু মোটা লাইফ ইনসিওরেন্স করেছে। চাকরি পাকা হল ; এবার বিয়ে করবে। সে নৃপেনকে পরামর্শ দেয়, 'তা দেখো নারীকে বাদ দিয়ে জীবনটাই যেন কাটিওনা নৃপেনদা। কুড়ি টাকা এল আই। ত্রিশ টাকা ব্যাঙ্কে জমানো। দশ টাকা সংসারে খরচ, পাঁচটাকা সিগারেটে লাগে। কেডস পরার পাঞ্জাবি গায়ে দেবার জো থাকে না। পরের মাসে সুচারুকে নৃপেন ব্যাঙ্কে কটা টাকা কম জমিয়ে একখানা ইংরেজি উপন্যাস কেনার অনুরোধ করেছিল। দুজনে পড়বে। দশ শিলিং দাম শুনে প্রথমে বলেছিল সুচারু এত দামের বই কিনে নৃপেনকে পড়াবে তেমন লাট সাহেব সে নয়। তারপর সুচারুই তাকে বইটা অর্ডার দেবার জন্য পোষ্টকার্ডে লিখিয়েও নিল। বলল, আচ্ছা একার্ড আমার পকেটেই থাক, দেখি ভেবেচিন্তে।

দিনের পর দিন গেল। মাসের পর মাস বইটের জন্য নৃপেনের লোভ কমতে কমতে রইলনা শেষ পর্যন্ত।

অমিয়কান্তি চাকরি করে তাই তার গুরুত্ব সংসারে বেশি, নৃপেনের নেই। বৈষয়িক মানুষের বই সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সুচারুর চরিত্রে সুন্দর ফুটেছে। বেকার নৃপেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশেও সে তাকে একখানা বই কিনে পড়তে দিতে পারলনা।

এপ্রিল ১৯৩৩ এ রচিত **'পালিয়ে যেতে'** গল্প জীবনানন্দ সমগ্রর তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

মাদ্রাজে ব্যবসা করতে গিয়েছিল লেখক। প্রথম বছরে হাজার পনেরো লাভ হলেও তারপর থেকে ক্রমাগত লোকসান। শেষ পর্যন্ত ধার দেনা মিটিয়ে স্থানীয় মানুষ নরসিং চেট্টির কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে তাকে ফিরতে হলো কলকাতায়, ব্যবসায় সুদিনে নরসিংকে সে অনেক খাইয়েছে। সেও যথেষ্ট উপকার পরামর্শ দিয়েছে। তাকে জানিয়ে এসেছিল, 'ছ-সাত মাসের মধ্যেই মাদ্রাজে ফিরবো আবার'। সে বলেছে উত্তরে, লেখক দেখুক কলকাতায় ব্যবসা করতে পারে কিনা। কিংবা চাকরি পেলে ঢের ভাল হয়'। বুঝতে পেরেছে কি হতে চলেছে।

কলকাতা এসে হাতে ২০/২৫ টাকা মাত্র ছিল, একটা মাঝারি গোছের বোডিং-এ উঠে দুপুর বেলায় নিজের সুটকেসগুলো, বড় মাঝারি জিনিস সব বিক্রি করেই বসলো। বাড়িতে স্ত্রী মার ও খুকির জন্য ধুতি শাড়ি ছাতা ফ্রক ব্লাউজ কিনে যখন ট্রেনে উঠলো হাতে তখন পাঁচ টাকা সোয়া ছ আনা পয়সা বাকি।

হুইলারের স্টলের নভেলটা পড়ছিল। সাত লাইনের একটা প্যারা। প্রথম প্যারা, আধঘণ্টা ধরে সেটাই পড়লো। কেমন একটা অবসাদ, এখানেই ব্যবসা শুরু করবে? না চাকরি খুঁজবে? মনে কোনো স্বপ্ন চিন্তা রঙ নেই আর এখন। তাড়া নেই। পালিয়ে চলেছে দেশের বাড়িতে। মনে পড়ছে তার ঘরের জানলার পাশে সবুজ সতেজ লেবু গাছটা। স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে নীলিমা খাটের পাশে এসে বসবে, হয়তো খুকিকে লেখকের বালিশের পাশে বসিয়ে দেবে। মা আসবেন। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে কথা হবে, বৈষয়িক নয়—নানা অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ বা সাহিত্য নিয়ে।

মাদ্রাজে বা কলকাতায় শুধু কাজ, কথা, রেশারেশি—নিজেকে রক্তমাংস পুতুল মনে হয়—কিন্তু দেশে ফিরলে মানুষের জীবনের আগ্রহ আস্বাদ ঐকান্তিক হয়ে জমে ওঠে। বাবার জন্য নতুন নভেল নিয়েছে। এবার ওর হাতে প্রমাণ আছে মৃত্যুর পর মানুষের কপালে ছাই হাড় ও অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। শুনে বাবা বেঁকে বসবেন। বলবেন, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চাই।

গতবার সে পাড়ায় ব্রিজ খেলতে গেলে নীলিমা তার শার্ট ধরে আটকে দিত। ফিরে এলে কথা বলতো না, শেষে গলা জড়িয়ে বলতো, সারাদিন আমাকে একা ফেলে ছেড়ে থাকতে এত ভাল লাগে তোমার?'

ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ি। বাড়ির দুয়ারে একটা নেড়ি কুকুর খেঁকিয়ে আসে। একটা ঝামা তুলতে পালিয়ে দূরে গিয়ে কাঁদতে থাকে। অস্বস্তি লাগে।

বাবা একটা টুলের উপর উবু হয়ে খাতা দেখছিলেন, মা আসেন, তাঁদের প্রণাম করে।

'তুমি আসছ তাতো শুনিনি।'

'তাক লাগিয়ে দেব বলে।'

'ব্যবসার কি খবর।'

চুপ করে থাকে।

মা বলেন, 'মাদ্রাজে ব্যবসা করে মানুষে? যদি করো, কলকাতায়।'

মায়ের শাড়ি, চটি, চা, বাবার নভেল তুলে দিই। বাবার চোখে ছানি পড়ছে—বই পড়তে কষ্ট হয়। 'ভগবানের নাম করে সময় কাটালেই পারো, বই পড়ে কি লাভ!' মা বলেন। বাবা চুপ করে থাকেন। তিনি যে অনেকটা সময় ভগবানের নামে কাটান মাকি তা জানেন না!

বইগুলো নাড়তে নাড়তে বাবা বলেন, 'এগুলোর একটা বিশেষত্ব, এতে নোংরামি নেই।'

'কিন্তু মানবজীবনের কোন বিশেষ জ্ঞানও নেই।'

'সে জ্ঞান উপনিষদের ঋষিদের ছাড়া আর কারো নেই।'

তর্কে গেল না আর। বললো, 'টলস্টয়ের মতো চরিত্রজ্ঞানও এদের নেই।'

বাবা বললেন, 'প্রত্যেক লেখকই তার নিজের মনের পুতুলগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন।'

'এই যদি তুমি ভাবো বাবা, তা হলে এ বই পড়ে কী লাভ?'

'বেশ নিরপরাধ ভাবে সময় কাটে খানিক।'

মা চায়ের পেয়ালা হাতে দিলেন, বললেন 'মুড়ি খাবি?'

'না'। চা পানীয়র উপযুক্ত নয়, তবুও নষ্ট করলে ব্যথিত হয় ওরা।

'এ বছর তোমাদের কিছু পাঠাতে পারি নি।'

'তাতে কী।'

'কবে যে পাঠাতে পারবো তাও বুঝে উঠতে পারছি না।' এ প্রসঙ্গে মা বলছিলেন সংসারের অভাবের কথা। মেয়ের জন্য দুধ লাগে। সাজ পোষাক চিকিৎসা ব্যয় আছে, বেবি ফুড, বাবা দেনায় ডুবে আছেন। নীলিমার হাজার অবুঝ বায়না। তোমার সুটকেস কোথায় গেল? মাদ্রাজে থেকে গ্রামোফোন আনলো না কেন? মাদ্রাজী শাড়ি কই? অর্গান নেই সেলাইর কল নেই। টেবিল চেয়ার ছাপর খাট, ঝালর বাতি নেই। নীলিমার গায়ে জ্বর, হাত পা ফোলে, স্যাঁতসেতে ঘর, দালান তুলবে বলেছিলে, ইটের পাঁজা আজো পুড়ছে? ভিটামিন চাই নীলিমার জন্য—একসের দুধ আলাদা চাই, চাই মাছ মাংস ডিম মাখন, দামী ওষুধ কেনা হয় নি টাকার অভাবে। সিল্কের ফ্রক এনো, ব্লাউজ, নকল সিল্ক চলবে আমার। ওকি ঘুমিয়ে পড়ছো?

হাইতুলে তুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

আকস্মিক বেকারত্ব জনিত মানসিক বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির দুর্দশাকে কিভাবে প্রকট ও তীব্রতর করে তুলেছে সেই কাহিনী এটি। লেখক কয়েক বছর কিছু টাকা পায় নি, সংসারে দিতে পারে নি। তবু ব্যবসায় লিপ্ত আছে। দারিদ্র্যের মধ্যে তাই প্রত্যাশার সান্ত্বনা ছিল। ব্যবসায় ফেল করে ফিরে এসেও সে কথা খোলসা করে বলতে পারে নি। তাই প্রত্যেকেরই কিছু প্রত্যাশা ছিল। তারই অভিমান সামলাতে হচ্ছে লেখককে।

১৯৩৩ সালের এপ্রিলে রচিত **মানুষ অমানুষ** গল্পের এ নাম সম্পাদকদের দেওয়া। লেখক জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি—নির্বিকারত্ব এ গল্পের বিষয়।

হেরম্ব একজন লেখক, তাকে নিয়ে কাহিনী, সেই কাহিনীর দ্রষ্টা হেমন্ত। আগ্রা ষ্টেশনে হেমন্তর কামরায় তার সহযাত্রিনী দুই মহিলা, একজন রাণী, মোটা, বয়স্ক, তিনি ধনীকন্যা তন্বী যুবতী উমার জেঠিমা, তাদের সঙ্গে চলেছেন এক নামজাদা বয়স্ক লেখক। আড্ডাবাজ, হুকুমপটু। উমার উপর তার হুকুমদারিতে রাণী বিরক্ত এবং উমা সেই হুকুম তালিম করায় বিস্মিতও। হেরম্বর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী উন্মোচিত হয় আড্ডাসূত্রে। তার রামেশ্বর যাত্রায় সঙ্গী ছিল অভয় ও রাণী। এসেছে উপেনবাবুর কথা, যিনি আগ্রার ধনী বাঙালী কমিউনিষ্ট কর্মী। যাকে হেরম্ব মনে করে গল্পের উপযুক্ত উপাদান। আবার শ্রীপতিবাবুর বোন নির্মলা, রূপসী দিল্লিবাসিনী যে ছিল হেরম্বর লেখার ভক্ত ও কবিতার উপযোগী উপকরণ, সে কালই মারা গেছে। মহারাণীর প্রসঙ্গ এসেছে ইনিও হেরম্বর অনুরাগী। তারপর এসেছে গুপীনাথ ও বিনোদিনীর প্রেমকাহিনী। খুরদাপুরের গুপীনাথ

হলো এ গল্পের 'অমানুষ', সে কুষ্ঠর সেবা করছিল। তারই বাল্যসঙ্গিনী। বিনোদিনী কুষ্ঠরোগিণী। তার স্বামীরও কুষ্ঠ ছিল। শেষ পর্যন্ত গুপী বিয়ে করলো বিনোদিনীকে, সন্তান হলো তাদের, এইজন্যই অমানুষ বলা হয়েছে গুপীকে। আসলে সে মহৎ প্রেমিক।

দিল্লী স্টেশন থেকে ট্রেনে ভ্রমণ কালে নিজের সম্ভবপর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গল্পটি রচিত। একই সময়ে রচিত একই ধরনের কাহিনী জীবনানন্দ সমগ্র দশম খণ্ডের কাহিনী **কল্প জিনিষের জন্ম ও যৌবন** মনে হয় নিজের প্রত্যক্ষ ভিত্তিতে। লেখকের ব্যক্তি জীবনের একটি দিনের ছবি। 'মানুষ অমানুষ' গল্পেরই অন্য এক ভাষ্য যেন। দুটি গল্পই দশম খণ্ডভুক্ত এবং এপ্রিল ১৯৩৩ এর।

এ গল্পের জনৈক লেখক ভগবানবাবুর ৫০ বছর বয়স। লম্বা চওড়া কালো। পুরু চশমা, কুৎসিত দর্শন লেখক, গল্পবাজ। ঠাট্টা করছেন সর্বদা সঙ্গীদের, রাণী, অমূল্য, সুষমা ও অবলা ঠাকরুনের সঙ্গে। দিল্লিতে এসে কি কি দেখেছেন, কি দেখা হলো না নচ্ছার ভিড়ের জন্য। ভগবানবাবুর আচরণ থেকে বোঝা যায় কবিরা চিরযুবক। রাণী যে ট্রাঙ্ক সেকেণ্ড ক্লাসে তোলার উপযুক্ত মনে ভাবে না, তাই তাঁর সঙ্গী।

রাণী বিস্মিত হয়, মানুষের এসব ভাবনাকে আঘাত দেবার জন্যই তো আপনার জন্ম। ভগবানবাবু ঠাট্টা করেই চলেন, দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাণীর জীবনদৃষ্টি প্রসারিত হলো বলেই হজম হলো, ট্রাঙ্কের মানুষটাকেও। অবলা ঠাকরুনের অনুরোধ তিনি চুরুটটা নিভিয়ে ফেলেন। তাঁর মতে গত তিরিশ বছর মেয়েরাই জায়গায় বেজায়গায় তাঁর সঙ্গী। তাদের বিচিত্র ব্যবহার বুঝে চলতে হয়, দিল্লির এ কাগজের তাঁর লেখা বেরিয়েছে তারা তাঁর বানান সংশোধন করেছে। ভগবানবাবুই একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক যিনি সাবেক খুঁটির আশ্রয়ে আছেন। অথচ তাঁর মতামত অতি নবীনের চেয়েও অবৈধ।

যে পত্রিকা তাঁর লেখা নিয়ে এই বাহাদুরি করলো, সেটি সযত্নে বাছ করে রেখেছিলেন ব্যাগের কিনারে—কেননা, কবিতার কপিটি রক্ষা করা ছাড়াও এতে ভগবানবাবু সম্পর্কে যে দীর্ঘ মন্তব্য আছে, তাঁর ফটো ছাপা আছে—তা রাখতে চান। আত্মপ্রতারণা—মনে হতে পারে এঁকাজ। এতক্ষণ অবলা ঠাকুরুন তাঁব সত্য ভাষণের প্রশংসা করেছিলেন, পত্রিকার লেখাটি পড়ে তাঁর মত বদলালো। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অবিশ্বাস, ভালবাসাহীনতা এ নিয়ে ভগবানবাবু কবিতা লিখতে গেলেন কেন ভগবান জানালেন, ওরা চেয়েছিল ওদের সম্বন্ধে আমি কিছু লিখি। প্রবন্ধ ভগবানবাবুর হাতে আসে না। এ বিষয় নিয়ে ঢের গল্প লেখা হয়েছে—ভগবানবাবুও লিখেছেন।

রাণীর মত ফরমাশি লেখার কপাল খারাপ।

সুষমা বলে 'জীবনের দেবতা ক্ষমাহীন। জীবনটাকে সাজাতে চেষ্টা করলে কি হবে? ওটা শুকিয়ে যাবার জন্যে তৈরি।

অমূল্য জানতে চাইল কবিতায় বলা মৃতটি কে? সুষমা উত্তর দিল 'স্ত্রীটির আগেকার প্রণয়ী'। রাণী প্রতিবাদ করে, ভালবাসতে গিয়ে আমরা যা চাই, সেই কল্প জিনিসের যৌবন আমাদের মনের মধ্যেই, বহির্জগতে তা মৃত ও নিঃশেষিত।

কাগজটা ভগবানবাবুকে দিয়ে দিল রাণী। এটি লিখতে না কি চারঘণ্টা সময় লেগেছিল।

এত সময় লাগলো? অমূল্যের মনে হয় এমন সব নামজাদা মানুষের জীবনে সাধনা যত আছে, প্রতিভা তত নেই।

আসলে অক্ষয়বাবুর বাড়িতে সন্ধ্যায় মজলিস শুরু হয়েছিল সাতটায়, শেষ হয়েছিল এগারোটায়। অনেক বিষয়ের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অবসরে রাণীকে বলছিলেন ভগবানবাবু, সে টুকে নিল। অবলা ঠাকুরুনও সে আসরে ছিলেন, আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। কিভাবে বৈঠকের হল্লার মধ্যে কবিতাটি তৈরি করলেন? বিনম্র নমস্কার জানালেও কবিতাটির বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর ধোঁকা গেল না।

অমূল্য কবিতাটির মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তুললে, সুষমা বিস্মিত হলেন। অবলা বললেন. অমূল্যর তো দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা মাত্র নেই—প্রেম বলতে ফক্কুরি বোঝে। নিত্য নূতন নারী নিয়ে বিচিত্রতা ; অবলার দুই বিয়ে, তার প্রথম স্বামী ছিলেন ব্যারিষ্টার—কিন্তু প্র্যাকটিশ করেন নি. ভাবতেন এতে মানুষের চরিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অবলা জানতেন তার স্বামীর একটু আধটু সন্দেহ ছিল।

ভগবান বললেন 'সেই সন্দেহ তো ফলল।'

ক্ষুণ্ণ হলেন অবলা, তাঁর মতে তাঁর জীবনে দাম্পত্য স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। তিনি তর্কে যাবেন না, তিনি বোঝেন শুধু প্রেম-বিচ্ছেদের আনন্দ ও বেদনার আন্তরিকতাটুকু।

রাণী বললেন, 'অবলা দ্বিতীয় স্বামীকেও একনিষ্ঠের মতো পূজো করে আসছেন।' অমূল্যও স্বীকার করলে, অবলাদি সকলের উপরে। জীবনে তার অবসাদ নেই, সন্দেহ নেই, প্রশ্ন নেই, স্বচ্ছলতা আছে। বৈষয়িক সাধ মিটলে সে তৃপ্ত, পৃথিবীর সবাই তার মতো হলে বিধাতার কাজ ঢের সহজ হতো।

অবলা জানালেন, ঘটকালি করে নয়, ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। স্বামী তাঁর উপরে কবিতা লিখতেন। সেগুলি ভেলভেটের বাক্সয় সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা আছে। তাঁর একটাই দোষ, নারী চরিত্রের একনিষ্ঠতায় বিশ্বাস করতেন না।

ভগবানবাবু জামা সেলাইয়ের জন্য সুচসূতো খুঁজছিলেন। পাওয়া গেল। ভগবানবাবু সেলাই করছিলেন। অমূল্য বললে 'দিন না জামাটি রাণীদির কোলে ছুঁড়ে, সে ঢের ভালবেসে করবে। এতক্ষণ রাণী ছটফট করে হয়রান হচ্ছে অনুভূতি আর উপলব্ধির কারবারী হয়েও তা বুঝছেন না।' রাণী বলল, দরিয়াগঞ্জের একটা পাঞ্জাবি মেয়ে ওঁর জামা সেলাই করে দিত। সে ওঁর গল্পের নায়িকা, কিন্তু সৎনাম সিং এসে মেয়েটিকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। রাণীর সঙ্গে কবির কোনো সম্পর্ক নেই। এ কবেকার কথা অমূল্য জানতে চাইল। রাণী বললো কালকের।

ভগবানবাবু জানালেন, সৎনাম কলকাতার এক মোটর ড্রাইভার। বিশ বছর ধরে চিনেন, ঐ মেয়েটি সৎনামেরই মেয়ে। তার স্বামীটা অমানুষ। দরিয়ায় থাকে। কাল সকালে চক্রবর্তী আমার কাপড় সেলাই করেছিল। ভগবানবাবুই সৎনামকে বলেছেন মেয়েটিকে নিয়ে লাহোর চলে যেতে। কাল চলে গেছে তারা। বাজারে আমার নামে যে প্রেমের গল্পগুলো চলে তা এমন, বাস্তবে তা ফলে উঠুক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

রাণী তখন ঘুমোচ্ছে।

লেখক জীবনের বাহ্য আড়ম্বর এবং আভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও নিঃসঙ্গ-বিষাদ এ কাহিনীর কথাবস্তু।

ক্ষমা অক্ষমার অতীত জীবনানন্দ সমগ্রর দশম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গল্প, রচনাকাল এপ্রিল ১৯৩৩।

মফস্বলের এইচ. এল. স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছে লেখক। ইকনমিক্সের এম. এ. কিন্তু পড়াতে হয় নিচের দিকের ক্লাসে। তার পছন্দ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। পয়সা জুটলে নভেল ভালো বই কিনতে ছাড়ে না। মজা এই—আগে যা খুব ভালো লেগেছিল আজ তা অসার মনে হয়। চার বছর নতুন বই কেনে নি। কাপড় চোপড় তেল সাবান বেশি দরকারি। স্কুলটা শহরের একটেরে, যেদিকে তাকায় মাঠ। এক একদিকে বন বাগান। দুপুরের বাতাসে নানান শব্দ ভেসে আসে। জীবনের অনেকটাই শহরে কেটেছে এই তেত্রিশ বছর বয়সে কাকের ডাকও খুব ভালো লাগে তাই। ছেলেবেলায় বাবা মার সঙ্গে পাড়াগাঁয় থাকতো। সেই স্মৃতি মনকে ঝাঁকানি দিয়ে যায়। খেজুরের ছড়ির উপর দোয়েল দুলেদুলে শিস্ দেয়। বউ কথা কও ডাকে। অপরূপ।

ভূগোল পড়ায়। উঁচু ক্লাসে ইংরেজি পড়ানোর আবেদন খারিজ করে দেন হেডমাষ্টার প্রসন্নবাবু, ১৮৭৪ সালের এন্ট্রান্স তিনি। তাঁর কথা হলো বিদ্যা বহুরূপী, নানা জিনিসই উপলব্ধি করতে হয়। দেখো ছেলেরা বাঁশগুলি দিয়ে ঘুঘু না মারে।

ভাবে, আপনারও ছেলেবেলায় করেন নি কি? বলে, 'ছেলেরা স্বভাবতই নিষ্ঠুর, বয়স্করা আমোদ করে ফড়িং-এর ডানা ছেঁড়ে না। ভালো শিক্ষা পেলে ওরাও পাখি শিকার করতে কষ্ট পাবে।' হেডমাষ্টার তাকে নিচের ক্লাসে পড়াশুনার আর বাঁদরামি ঠেকানোর দায়িত্ব দেন। হেডমাষ্টারের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়তে বলেন। তাঁর বইটা নাকি ক্লাসিক। তার ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আর্থার সাহেব। তার বাবা অবশ্য বাঙালী ছিলেন। মা মেম, সে মার পদবি নিয়েছিল।

বইটার পরিপাটি বাঁধাই, ছাপা ভালো, হেডমাষ্টারের ইংরেজি নির্ভুল, বলতেই হলো বেশ হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি কেন ইতিহাস বাংলাও তিনি পড়াতে দিতে নারাজ। তিনি নিজেই ইংরেজি পড়ান। এম. এ. পাশ বাংলার শিক্ষকদের তদারকি করেন সংস্কৃত পণ্ডিত। কিন্তু এ স্কুলে তাদের পণ্ডিতের নীচেই থাকতে হবে। তিনি কোনোদিন ইংরেজি পড়েন নি। টোলে পড়েছেন, এদেশের ভাষা তিনি যা শিখেছেন তা বিদেশী জিনিষের রসে গন্ধে আবর্জনা হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া হেডমাষ্টারের ৩৪/৩৫ বয়সের সময়ও এঁদের চেয়ে ঢের বেশি সর্বজ্ঞ ছিলেন তাঁরা।

পৃথিবী কি দিনের পর দিন নির্বোধ হয়ে যাচ্ছে? এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না হেডমাষ্টার। বছরে একটাকা করে বৃদ্ধি। ৫০ টাকার পর মাইনে বৃদ্ধি স্থগিত। হেডমাষ্টার পান ১২৫। দুজন হিস্ট্রির এম. এ. তারা ইতিহাস ভূগোল পড়ায়—কিন্তু হেডমাষ্টারের বিশ্বাস রসময় বাবু যতদিন ছিলেন ঠিক ছিল। তিনি মারা গেলে হেডমাষ্টার ওপরের ক্লাসে পড়াতেন ওরা নিচের ক্লাসে। কিন্তু সেক্রেটারীর খেয়ালে ওদের পড়াতে দিয়ে ইস্কুলের গুরুত্ব নষ্ট হয়েছে। একথা অবশ্য সেক্রেটারীকে জানাতে তিনি নিষেধ করলেন।

ডিগ্রিওলা লোকেদের হেডমাষ্টার বিশ্বাস করেন না। প্রেম শ্রদ্ধাহীন, তারা বিদ্রোহী স্বভাব। তারা অমানুষ। চাকরি বাকরি না পেয়ে তারা অবশ্য এমন হয়েছে, অভাজন তারা এমনি হয় নি।

কিন্তু হেডমাষ্টার মনে করেন যোগ্যতামাফিক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। তাঁর বিস্ময় এক নবীন উকিল সেক্রেটারী হয়ে অভিজ্ঞ বুড়ো টিচার মরলেই একটি করে ছোকরা এসে আঁটছে। একদল হাড় হাভাড়ে দুগ্ধ পোষ্যের মাঝখানে বটগাছের মতন পড়ে আছেন তিনি আর পণ্ডিতমশাই।

তিনি বলেন নূতন দুটি ইংরেজির এম.এ. তুলনায় গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে রিটায়ার্ড হরিপ্রাণ ভট্টাচার্যকে নেওয়া হলে, ঢের ভালো ইংরেজি শেখাতে পারতেন তিনি। কেননা ওরা পড়ে নভেল, তাঁরা পড়েন গ্রামার। চল্লিশ বছর ধরে গ্রামার পড়িয়েও আজো রোজ তিনি গ্রামার পড়েন। বিলাতে প্রতি দশ বছর অন্তর গ্রামারের সূত্র পালটে যায়—সে সব বিলাতি ঢং শেখার প্রয়োজনে নয়—রোজ রাতে গ্রামার কখানা টেবিলে ছড়িয়ে পরস্পরের মতদ্বৈধতা দেখে সমন্বয়ের চেষ্টায় এক যুগ কেটে যায় তাঁদের। নভেল পড়ে কি লাভ? জন ও মেরির জীবনে কি হলো তার সঙ্গে বাংলাদেশের দরিদ্র কর্তব্যপরায়ণ ইস্কুল মাষ্টারের কি সম্পর্ক? এতে জীবনের কতখানি অপচয়?

তাঁর পরামর্শ তাই নভেল পোড়ো না আর। ইংরেজি সাহিত্য ঘাঁটতে যেয়ো না। বাংলা সাহিত্যের আলালের ঘরে দুলাল বইখানা পড়ো। ছেলেরা কেমন করে নষ্ট হয়। তার নিখুঁত ছবি আছে। বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধ পোড়ো। তাতে যদিও ফক্কুড়িও আছে কিছু। ইস্কুলের পাঠ্য রোজ শিখে যাবে। বিয়ে করেছো? চাকরি পেলে, করবে বিয়ে? বাপু বিয়ে করতে যেও না। বৌ এলেই গণ্ডে পিণ্ডে হবেই। এটা ধরে রাখো। তারপর ধার কর্জ, উকিলের চিঠি, আদালতে জেল, লাঞ্ছনা আত্মধিক্কার। এমনই তো মাষ্টারের দিন গুজরান। তাকে এত কদর্য করে তুলো না।

এক হ্রস্ববোধসম্পন্ন প্রাচীনপন্থী আদর্শবাদী সংকীর্ণচিত্ত প্রধানশিক্ষকের জীবনবোধ ও ধ্যান ধারণা এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে। বিদ্রূপ এখানে ধারালো। কিন্তু প্রসন্নবাবুর স্থূল চামড়া ভেদ করতে পারে নি।

১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে লেখা **ঐকান্তিক অতীত** গল্পের নাম সম্পাদকরা দিয়েছেন।

ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করে নূতন শিক্ষক পদ প্রার্থীকে ইন্টারভিয়ু করতে গিয়ে আধুনিক তরুণদের নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন হেডমাষ্টার। প্রথমে তাদের মহত্ত্বহীনতা নিয়ে। তারপর নিজের স্বপ্ন সাধনার কথা বলেছেন হেডমাষ্টার, 'ভাবতাম প্রেসিডেন্ট হবো, বঙ্কিমবাবুর মতো নভেলিষ্ট হবো। সুরেন বাঁড়ুজ্যের মতো বক্তা হবো। রামমোহন রায়ের মতো সমাজ সংস্কারক হবো। পঁচিশ বছর বয়সেও এসব হাতের পাঁচ মনে হয়েছে। তারপর যখন ত্রিশ একত্রিশ হল, বুঝতে পারলাম, সভা সমিতির করিৎকর্মা জীবন আশাতীত জিনিস। ঘরে বসে বসে যদি কোনো সফলতা পাওয়া যায় তো তা নিয়ে সাহিত্যিক হবো। তাই হওয়া যাক, ম্যানুয়াল আর নোটই লিখতে লাগলাম। আগে ঠিক ছিল ভবিষ্যতে কবিতা আর উপন্যাস লিখব। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ জীবনে আর এল না।

কারণও স্পষ্ট, কবিতা আমি কোনোদিনও লিখতে পারি না। মিল দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। সামান্য কটা মিলের জন্য যতটা রাত জাগতে হবে তাতে দু-চার ফর্মা নোটের জিনিস তৈরি হয়ে যায়। উপন্যাস লিখতে বসে দেখেছি, বঙ্কিমবাবু কিম্বা তারক গাঙ্গুলির অনুকরণ হয়ে যায়, তা ছাপিয়ে কী লাভ?

এই কাণ্ডজ্ঞান আছে বলে নোটবই লিখেছেন। তিনি এবং সেই নোটের প্রশংসা শুনে খুব পরিতৃপ্ত বোধ করছেন শিশুসুলভ সারল্যে। ব্যঙ্গ বলেও বোঝেন নি।

জীবনানন্দের নিজের অভিজ্ঞতা বলেই মনে হয় গল্পটিকে। যদি অবশ্য গল্প বলা যায় একে। ক্ষমা অক্ষমার অতীত গল্পের পরিপূরক এ কাহিনী।

স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ গল্পটি ১৯৩৩ সালের এপ্রিলে রচিত। নামকরণ সম্পাদকের। এটিও দশম খণ্ড জীবনানন্দ সমগ্রে আছে।

মফঃস্বলের এক H.L. স্কুল। মাষ্টারির প্রথম দিন। হরিচরণবাবু (৩৩) স্কুল মাষ্টার, বারো বছর আগে এম. এ পাশ, ইংরাজিতে। মাষ্টারি করতে গিয়ে নিজের অনুভবশীলতা শিশুপ্রীতি কমনীয়তা কিভাবে হঠাৎ হারিয়ে যায় তার প্রতীক কাহিনী, শিশুদের প্রতি সহজাত সহানুভূতি কিভাবে অকস্মাৎ অকারণে নষ্ট হয়ে যায়, মাষ্টারসুলভ হিংস্র নিষ্ঠুরতা পেয়ে বসে মানুষকে তারই গল্প। শিক্ষকতার বৃত্তিতে থেকে নানাশ্রেণীর শিক্ষকের মানসিকতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন পর্যায়ক্রমে তিনটি গল্পে তার প্রকাশ ঘটেছে।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল রচিত দশম খণ্ডভুক্ত **প্রণয়হীনতা** গল্পটির শেষ বাক্য অসম্পূর্ণ, কিছুটা কবিতার মতো এফেক্ট এসেছে তাতে! গল্পটির নামকরণ অবশ্য জীবনানন্দের নিজের দেওয়া নয়।

সুধাংশু একসময়ে কংগ্রেস করতো। তারপর রামকৃষ্ণ মিশন। তারপর সব ছেড়ে লেখালিখি নিয়েছিল। আগে গীতার টিকা লিখতো। এখন যেসব গল্প লেখে তাতে নানা অবৈধ জিনিষকে সে সত্য বলে মানে। মদের দোকানের সামনে যে একদিন পিকেটিং করতো আজ ট্রেনের কারে খাবার এবং হুইস্কি খেয়ে এলো। এসে ঘুমালো, ঘুম হলো সুন্দর। ঘুম ভাঙলো ধানবাদে, সামনে মুখোমুখি একটি মেয়ে। আবার চোখ বুঁজলো সে। এলাহাবাদের পরে ঘুম ভেঙে উঠে বসলো। ট্রেনের যাত্রার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী মনস্তত্ত্ব। প্রেম ও অপ্রেম। নির্মলা ছিল দূরপাল্লার সহযাত্রিণী। সুন্দরী আকর্ষণীয়া, সুধাংশুর নানা উপকার ও অযাচিতভাবে আপ্যায়ন করেছিল। গল্প করতে চেয়েছিল বেশিক্ষণ; সেকি সুধাংশুকে ভালবেসেছিল? তাই তার সুখ সুবিধার জন্য অত কিছু করেছিল, নাকি ওটুকু সমস্তই নারী হৃদয়ের প্রণয়হীন কমনীয়তা মাত্র! ঘুমন্ত নির্মলার কাছে বিদায় না নিয়েই সুধাংশুকে দিল্লিতে নেমে যেতে হলো। নির্মলা সত্যিই ঘুমোচ্ছিল? ওর কোনো দুঃখ নেই। প্রেম নেই, বলেই হয়তো দুঃখ নেই—একথাই মন হচ্ছিল সুধাংশুর।

প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে দশম খণ্ড জীবনানন্দ সমগ্রের অন্তর্গত এপ্রিল ১৯৩৩-এ রচিত ছোটগল্প। নামকরণ সম্পাদকের। এই গল্প প্রসঙ্গে জীবনানন্দের 'জোনাকি' কবিতাটি বিশেষ করে মনে পড়ে।

মস্ত বড়ো এক দোতলা কোঠাবাড়িতে একলা লেখক থাকে। চার পাশে আগাছার

জঙ্গল। বাড়িটায় ৬০/৭০ বছরের জীর্ণ গন্ধ। গত বছর তার বাবা মারা যাবার পর বাড়িটা ভেঙে গেছে। সাড়ে পঁচিশ হাজার টাকা দেনা রেখে বাবা মারা গেছেন। নানা জিনিসপত্র বিক্রি করেও দেনা এখনো দশহাজার বাকি। লেখক নিকটে এক স্কুলে মাষ্টারি নিয়েছে। চল্লিশ টাকা মাইনে।

গত বছর পর্যন্ত মা আর বোন নির্মলা এখানে ছিল, অসুস্থতার জন্য এখন তারা কোলকাতায়। সেখানে ভাই সুধীর কনট্রাকটর। সে কখনো বাড়ি আসে না। অন্য আত্মীয়রাও কেউ এই পাড়াগাঁয়ের একা বাড়িতে এসে থাকবে না। লেখক এ বাড়ির যে ঘরে যেদিন ইচ্ছা রাত কাটায়। একতলার বাঁদিকের যে ঘরে লেখকের স্ত্রী মারা গেছে সেখানে পুরানো পালঙ্কে জেগে বাতাবি ফুলের গন্ধ পায়। কোনোদিন ঝাড়বাতি জ্বেলে পুরানো চিঠি পড়ে। মেঘলা আকাশে চাঁদ গড়িয়ে যায় ; বৈশাখী রাত হু হু করে। জানলা বন্ধ করে ধড়াম শব্দে। বাইরে কালমেঘের জঙ্গলে জোনাকিদের কাঁচ পোকাদের সঙ্গে খুনসুটি আর ফুরোয় না। জীবনের উৎসব আড়ম্বরের দিকগুলো খুব বেশি বুঝতো কল্যাণী, নিঃসঙ্গতা বিচ্ছেদ এগুলি কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারতো না সে। পারলে লেখককে সাজা দিতে জ্বর গায়ে দিঘির জলে অনেকক্ষণ স্নান করে, পান্তাভাত আর তেঁতুলের অম্বল খেয়ে সন্নিপাত ঘটাতো না সে। সাজা কেন? লেখক তো কিছু বলে নি। কথার মধ্যে মা শুধু বরেছিলেন, পাঁচ বছর বিয়ে হলো, তোমাদের কোনো সন্তান হলো না? বংশ রক্ষার কথা ভেবে গেঁয়ো শাশুড়িরা এমন বলেই থাকে। লেখক জানতো স্ত্রীলোকের প্রেম পুরুষের কাছ থেকে সংযম দাক্ষিণ্য চায়। তবু কল্যাণী অভিমান করলো। শাশুড়ির কথা শুনে একরাশ অভিমান নিয়ে কল্যাণী শোবার ঘরে ঢুকলো। বন্ধ করে দিল কপাট। ঘা দিতেও খুললো না। ছাদে পায়চারি করছিল লেখক। চাকরকে দিয়ে ডাকলো কল্যাণী। বালিশ চোখের জলে একাকার। সেই তো দরজা আটকে রাখলো। তারপর বংশরক্ষার সার্থকতা নিয়ে, সম্ভবপর সন্তানের সৌন্দর্য নিয়ে কত আকাঙক্ষার কথা বলেছিল কল্যাণী। তার হৃদয়মনের ঐশ্বর্য নিয়েও, 'তোমার মতোই হত আমাদের ছেলে, হত গো হত, হত। সে ছেলেকে আমি দিনেব মধ্যে কতবার কামনা করি, শত লক্ষবার, কিন্তু তবুও হয় না।'

সেদিন দুপুরবেলাও শাশুড়ি বৌ-তে আবার কিছু কথা হয়েছে। কথাটা বড় মর্মান্তিক। সন্তানহীনতা উপলক্ষে করে বলা। যার সন্তান নেই নিজের কাছে নিজেই তো সে ঢের শাস্তি পায়, মা হবার আকাঙক্ষাও খুব গভীর আকাঙক্ষা। কল্যাণীর কপাল পুড়ে যাচ্ছিল ; জ্বরে কদিন থেকে হচ্ছে। ওর বিশ্বাস এ সারবার জ্বর নয়। এই তার আফিংএর কাজ করবে।

সেই রাতেই ডাক্তার দেখানো হলো। ৩/৪টি ওষুধ এলো। তিনদিন খুব যত্নের সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ওষুধ খাওয়ালো স্বামী, চতুর্থদিনে দুবার ওষুধ খাওয়ানোর পর, তাসখেলার নেশায় দুবার ওষুধ খাওয়ানোর সময় উৎরে গেল। আসতে পারলো না লেখক। তার এই অন্যমনস্কতাটুকু কল্যাণী উপেক্ষা বলে ধরে নিল। স্বামীর ভালবাসাহীনতা। বধূ তাদের পথের কাঁটা।

গরমের আতিশয্যে কল্যাণী দিঘি জলে স্নান করে তেঁতুলের অম্বল খেয়ে সুস্থির। মস্ত লেপের ভিতর কোথায় কল্যাণী পড়ে আছে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া শক্ত। কল্যাণীকে

হাতড়ে বার করে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল 'মরবেই যদি দিঘিতে যখন নেমেছিলে ডুবে মরলেই তো পারতে।' কিন্তু বেশি দুর্ব্যবহার করে কি লাভ, যে তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে!

সন্তানহীনা বধূ স্বামীর ভালবাসা পাওয়া সত্ত্বেও স্বামীর একদিনের অবহেলাকে উপেক্ষা মনে করে, অবুঝ গেঁয়ো শাশুড়ির অসংযত কটূক্তিতে আহত হয়ে, জ্বর গায়ে পুকুর ডুবে এসে, ওষুধ না খেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিল। এখন নির্জন পল্লী বাড়িতে একা লেখক আত্মীয়স্বজন বর্জিত হয় পড়ে আছে। স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছে। তার মা-বোন কেউ নেই, থাকতে চায় না এবাড়িতে।

গল্পের ধারা

ষষ্ঠ স্তবক

১৯৩৩ সালের মে মাসে বরিশালে কবি **সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ** গল্পটি লিখেছিলেন। প্রথম প্রকাশিত হয় ২রা জুলাই ১৯৮৪ সংখ্যা 'প্রতিক্ষণ' পাক্ষিক পত্রিকায়। সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে জানা যায় গল্পটির নামকরণ জীবনানন্দ করেন নি। 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' গ্রন্থে গ্রথিত হয়।

সাধুভাষায় চিঠির আঙ্গিক লেখা এ গল্পটি দাম্পত্য বিষয়ক। নিরাসক্ত দূর বিচ্ছিন্ন স্ত্রী অনুপমাকে অসুখী ব্যক্তিত্বহীন স্বামী চিঠি লিখছে। তাতে বক্তব্য বড়ো কিছু নেই। আপন পারিপার্শ্বিকদের বিবরণ আছে মাত্র।

তিন বছর আগে বিয়ে হয়েছিল উভয়ের—এর মধ্যে সেই বিয়ে মিথ্যে হয়ে গেছে। নইলে পারস্পরিক চিঠি দেওয়া নেওয়া বন্ধ হতো না। ৫০ বছরের বিবাহিত জীবনেও তো সপ্তাহে ৩/৪ টি চিঠির বিনিময় চলে, লেখকের জীবন যেন ব্যতিক্রমী। স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়ে কায়েমী হয়ে বসলো। 'আমিও জানি, তুমিও জানো ইহাদের মতো যদি আমাদের জীবনের ব্যবস্থাও হইত তাহা হইলে এ পৃথিবীর পালাইবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।' পত্রের আদান-প্রদান নেই তাই নয়, স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কও আছে কিনা সন্দেহ। স্বামীকে নিঃসঙ্গ ভেবে সাহচর্য দেবার আকাঙক্ষা অনুপমা অনুভব করে না। তাই বন্ধনহীনতাকে লেখক আজ পরম আকাঙিক্ষত মনে করলেও একদিন তার প্রত্যাশা ছিল অন্যরকম। সে আটবছর আগের কথা। 'মনে হইত, বধূকে দিয়া পা টিপাইয়া লইব—কপালে চুল বুলাইয়া দিবে সে—পাখা দিয়া বাতাস করিবে'। কিন্তু বউ যখন এলো তখন কিছুই করলো না। লোকটিও কিছু চাইতে পারল না। তার সাধ স্বপ্ন সে পালটে নিল। 'ধীরে ধীরে হৃদয়ের ভিতর সাপ খেলানো বাঁশির সুর কেমন যেন বাজিয়া উঠিল আমার।' সে যদি বা ভালবাসতে চায়, কেউ ভালবেসে অষ্টপ্রহর তার পরিচর্যা করুক এতে সে আজ সঙ্কুচিত বা পীড়িত হয়। পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয় তার। স্ত্রীর কাছে এক গ্লাস জল ঢেলে দেবার অনুরোধও কখনো করে নি। ঘরে জলের কলসি রেখেছে জল

গড়িয়ে খেয়েছে। ফলে স্ত্রী তাকে যে গভীর নিঃসঙ্গতার নিস্তার এনে দিয়েছিল, তার রূপান্তর আর সে চায় না।

পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রার যে ঢং তার চেয়ে ভিন্ন রকম, নারীপুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের থেকে পৃথক আরেক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠল অনুপমা আর লেখকের মধ্যে। তার ফলে প্রকৃতির আরো নিবিড় সান্নিধ্যে পৌঁছে গেল লেখক, সে স্ত্রীকে লিখতে পারলো—'এ সুর তোমার জীবনে আছে কিনা জানি না ; যদি না থাকে—আহরণ করিয়া লও, জীবনে এক গভীর অবলম্বন পাইবে।'

কথাগুলির মধ্যে এক তৃপ্তির সুর আছে। স্ত্রীর প্রতি বাৎসল্য ও হিতাকাঙক্ষা আছে, কিন্তু অনুপমার কি এই উপদেশের কোনো প্রয়োজন আছে? লেখককে মনে হয় স্ত্রৈণ ব্যক্তিত্বহীন। আসলে আমার বিশ্বাস, স্ত্রীর কাছে নয়, পত্রের আঙ্গিকে পাঠকদের কাছেই লেখক তার জীবনযাত্রার দুর্দশার ছবিটা আঁকতে চেয়েছেন। নইলে চাকর অর্জুনের পরিচয় দেওয়াই বা কেন? কেনই বা মা আর বিধবা বোন চারুর কাশী চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ যেখানে তাদের কিছুদিন থাকার সাধ। অথচ বুড়ো বাবা বাড়িতেই রয়েছেন। তাঁর তত্ত্ব তলব কে করে? ফাঁকিবাজ ছোকরা চাকর অর্জুন মাঝে মাঝে পালা-পার্বনে ডুব দেয়—যে মাতৃহীন ছেলেটাকে লেখক কিছু বলতে পারে না। যেমন কোনো দাবি করতে পাারে না স্ত্রীর উপর। এই অসুখী নিঃসঙ্গ সহনশীল সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ শান্তিপ্রিয় মানুষটির মেজাজ আমরা পাঠকরা অনুমান করতে পারি। যেমন অনুভব করতে পারি বৈষয়িক ক্ষেত্রে অকৃতার্থ স্বামীর প্রতি কর্তব্য-বোধহীন উন্নাসিক নায়িকা অনুপমার ভূমিকার অন্তর্লীন মনস্বত্ত্ব। কর্ত্রীহীন শ্রীহীন সংসারের স্বেচ্ছাচারী দাসী নিয়ন্ত্রিত সংসারের ছবিটিও নিখুঁত হয়েছে। সব কিছুর ওপর আঁকা হয়েছে আধুনিক দাম্পত্যের এক বিশিষ্ট রূপ। যদি সন্তান থাকতো—অনুপমার—কি করতো সে?

এই বিশাল বাড়িটির আজ ধসে পড়ার মতো অবস্থা। বিশ/পঞ্চাশ বছর পরে যেখানে শেয়ালের কান্না শোনা যাবে শুধু। কামিনীর ঝোঁপে লক্ষ্মীপেঁচা আর জোনাকি রাতের শিশিরের ঘ্রাণ নেবে কেবল। আর অনেক পুরুষ পুরানো কিংবদন্তীর এক সুন্দর সমাপ্তি ঘটাবে।

কিন্তু সে এখনো কিছুটা দূরে।

বাড়িতে লোক নেই। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের ভিড় আছে। রাঁধুনি হিমাংশুর মা-র বাটনা বাটতে কষ্ট, আর জলের মতো ঝোল, তরকারির দিকে তাকিয়ে মা, চারু বা অনুপমার কথা মনে পড়ে। স্বামীকে রেঁধে খাওয়ানোর জন্যই মেয়েদের জীবন, তা অবশ্য লেখক বলে না। কিন্তু ভাতের লপসি বা আঁশটে ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়ে কিভাবে দিন কাটাচ্ছে তারা নুন আর কাঁচালঙ্কা ঘষে খাচ্ছে তা দেখলে সহানুভূতি হতো নিশ্চয়। চিরদিন মায়ের হাতে মোলায়েম রান্না খেয়ে অভ্যাস। অনুপমা এলে তিনি ভাবলেন, বৌ এসেছে, তিনি সরে পড়লেন। এখন হিমাংশুর মার দেওয়া খাবার খেয়ে লেখকের নবীন তৃপ্তির খবর জেনে অনুপমা বেদনা পাবে, না খুশিই হবে, এ জানতেই এত কথা লিখেছে লেখক।

পিসিমার আলাদা চাকর। বেশ রাঁধে। ভিন্ন চুলায়, ভিন্ন উপকরণে চাকরের রান্না তিনি খান। পিসেমশাইর রাখা টাকায় এই বিলাসিনী বিধবার দিন মন্দ কাটে না। ভাইপোরা কি খায় না খায় তিনি দেখতে আসেন না। নিজের হৃদয়কে অন্তর্মুখী করতে পারলে হালুয়া লুচির গন্ধে ক্ষুধিত অন্তরের বিভ্রম জাগে না; সে তাই সেই সাধনা করে। পড়ার বই বারবার পড়ার স্পৃহা হয় না। খবরের কাগজে নাৎসিদের কাণ্ডকারখানা, মস্কো ট্রায়াল, জাপানি যুদ্ধের সংবাদে সকালটা জমে। তারপর হলুদ বৌ কথা কও পাখির দিকে তাকিয়ে সময় কাটে। দুপুর কাটে চোগাচাপকান পরে বার লাইব্রেরিতে—আর অশ্বত্থতলায়। উকিলের গাউনে নিজেকে কোনো আদিম জীব মনে হয়। দুপুরে বাজপাখির দিকে তাকিয়ে চারিদিকের জীবনমৃত্যুর স্রোতের মধ্যে রহস্যময় দুঃখ বিরহ কাতরতা পুলকের গল্প শুনে শিউরে ওঠে লেখক। মনে হয়, দণ্ডক বনের বা অশোক বনের সীতাকে যেন অশোকের মত রক্তিম সুন্দর কোনো নারী। সুবর্ণরেখার তীরে, রেবা, রাবী, তিস্তার কিনারে, ঝিলমের পারে দেবীপীঠগুলি পায়ে হেঁটে কড়ির মত শাদা ধুলো গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াবার জন্য প্রাণ পল্লী চিলের মতো কেঁদে মরে।

ছেঁড়া প্যান্টে নজর পড়ে ঢের, গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোয়, ঝালচানা, ডাব তরমুজ পানিফল কেনার জন্য পয়সা খরচ করতে যায় না আর। ছেলেমানুষ তো নয়। সব প্রেম বিরহ স্বপ্ন বেদনা দুপুরের রোদে তেপান্তরে যেন নবজীবন পায়। সিভিল কোর্টের বারান্দায় অশ্বত্থের পাখিরা লাফিয়ে বেড়ায়। হৃদয়কে নরম রাখার ঢের জিনিস আজো আছে।

সন্ধ্যায় ফিরে খিদে পায়। হিমাংশুর মা রোজ সুজি রাঁধে, চিনি-কিসমিস-ঘির গন্ধ মেলে না। এক আধদিন আটার রুটি বা লুচিও তো করতে পারে। কিন্তু সংসারে সেই একমাত্র নারী—অতএব কর্ত্রী। এক আধদিন পিসিমা চমৎকার ডিশে লুচি পটলভাজা, বা টোস্ট অমলেট পাঠিয়ে দেন। ভয় হয় পাছে এই ডিশ ভেঙে যায়। রেকাবিতে তুলে নিয়ে ডিশ ফেরত দেয় সে। পিসিমা চলে যান। একলা বসে খায়—তখন ঘরে ইঁদুর খচমচ করে।

মনে হয় লেখকই এ বংশের শেষ পুরুষ। অশরীরী পিতৃপুরুষরা যেন অন্ধকার মাঠে তাকে ঘিরে বলেন, 'ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে গৌরবে আমরা যে বংশ রক্ষা করে এসেছি, তুমি তা মুছে দিতে চলেছ। ফেরো। প্রাচীন জীবনপ্রণালী আয়ত্ত করো। বট যেমন দীর্ঘদিন বেঁচে অনেক সন্তানসন্ততি বিলিয়ে যায় তুমিও তাই করো।'

অর্জুনের সাথে দেখা হয় হঠাৎ—'কোথায় ছিলি রে?' ছেলেটি জবাব দেয় না। কোথায় মিলিয়ে যায়। পূর্বপুরুষরা যোগের সৌন্দর্য শিখেছিলেন। বিয়োগের শূন্যতা ও মাধুর্য তাঁরা বুঝতেন না। পল্লবিত বটগাছের দিকে না তাকিয়ে অগ্নিশিখার মতো ঠুটো মঠ নক্ষত্রনিবিড় রাতে তারা যদি তাকিয়ে দেখতেন!

গল্পের শেষে দার্শনিক প্রশান্তি আছে। কিন্তু অন্তর্লীন আন্তরিক তৃপ্তি নেই। এক সন্ন্যাসীর মন এখানে যেন বেদনাহত জীবনবৃত্তান্ত বলে যাচ্ছে। অভিযোগ নেই কিন্তু মর্মে এক হতাশা ও অতৃপ্তি অস্ফুট থাকে না।

'আকাঙক্ষার জগৎ' ১৯৩৩ সালের মে মাসে রচিত। জীবনানন্দ সমগ্রর দশম খণ্ডের এ গল্পটির বর্ণনা সাধুভাষায়, কিন্তু সংলাপ কথ্য ভাষায়। গল্পে জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনের ছায়া। উপমা আর বিভূতির প্রেম ছিল না বিয়ের আগে। ওদের ধারণা প্রণয় অভিসার এসব সংসারের অনুপযুক্ত অবাস্তব কিছু জিনিস। তবু একান্নবর্তী সংসারের এক কোণে নিঃসম্বল স্বামী স্ত্রী তখনো ঠিকমতো সংসার গুছিয়ে বসতে পারলো না অথচ তাদের এক মেয়ে জন্মালো। ঘরটি ছোট বইপত্র জিনিসে ঠাসা। বিছানা পাতার স্থানাভাব। পরিজনেরা বইয়ের প্রয়োজন বোঝে না। বিশ্বসংসারের ঘটনাধারারও ধার ধারে না। বৈষয়িক জীবনে বিভূতির হৃদয় বিমুখ হলে সে বইয়ের ভিতর দিয়ে এক সুন্দরের রাজ্যে অভিসারে যায়, বইগুলো তাই সে অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারে না।

ঘরের অনেক বোঝা কমানো হলো। এমনকি একমাত্র টেবিলটাও এরা নিয়ে গেল। দুপুরে বিভূতির লেখার জন্য টেবিলটা কাজে লাগতো। দড়ির খাটের নিচে ঠাঁই হলো বইগুলির। বাস্তব পরিস্থিতি বিভূতির আকাঙক্ষার জগৎ-কে ক্রমসঙ্কুচিত করে আনে।

বিভূতি বেকার, পরনির্ভরশীল। চার বছর চাকরি পায় নি। দাদারা চালিয়ে নিচ্ছেন। ভিতরের অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম তো তাদের থেকেই যায়। দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিভূতি। ঘুম ভাঙে যখন—তখন সন্ধ্যা। বিভূতি উপমাকে নিজের অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলতে চায়। মন দিয়ে শোনে না উপমা, বলে, ঘরে বড়ো মশা। খুকির জন্য একটা ছাতা মশারি এনো। বিভূতির ইচ্ছে নীল রঙের মশারি আনা। আকাশের রঙ নীল। ধুলো আর ধোঁয়ার ভিতরে আকাশ যেন চিরন্তন ক্ষমা ও করুণার পর্দা হয়ে আছে।

কিন্তু সে যখন ফেরে মশারি সে আনে না। একখানা কাপড় বা জুতো কেনার সামর্থ্যও নেই তার। এক তুচ্ছ চাকরিজীবী হলেও তা স্ত্রী ও মেয়ের পক্ষে ঢের আশীর্বাদের জিনিস হতো। চারবছর আগে বিভূতির বাবার মৃত্যু হয়—তখনো বেকার ছিল সে, গতবছর, মা গেছেন, আজও সে বেকার।

উপমা বিভূতিকে বলে, মেজ খুড়িমা বলছেন বিভূতি নাকি পেশোয়ার যাবে। কে জানে হয় তো ৩০ টাকা মাইনের কেরানিগিরি মিলবে গেলে। কিন্তু বিভূতি ভাবে জীবনে টাকাই কি সব? মানুষ ভাবে না জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে সব গভীর সম্ভাবনা ও সফলতার জিনিস রয়েছে তার মূল্য টাকার ঢের উপরে!

পেশোয়ার বিভূতিকে যেতে হয়নি। সে কথাও ওঠে নি। উপমা শুধু কথাটা তুলে বাজিয়ে দেখছিল বিভূতির প্রতিক্রিয়া কি? শিশু জন্মেছে বলে বিভূতির স্বভাবের আদৌ কোনো রূপান্তর ঘটে নি।

বিভূতির আক্ষেপ উপমার মতো উজ্জ্বল মেয়ে তার সংসারে এসে বেখাপ্পা পরিস্থিতিতে কোনো মূল্য পেলো না। বিভূতির ভালবাসার আন্তরিকতা উপমা বোঝে। তাকে আশ্বস্ত করে। উপমা সস্তা হ্যারিকেনের পাশে বসে কাঁথা সেলাই করে। বিভূতি দেখে। ভাবে বাজারে কত সুন্দর বাতি আছে কিন্তু ওর হ্যারিকেন চিমনির ধোঁয়ায় কালো।

রাত দশটায় বিভূতি খেতে যায়। উপমার খাওয়া নিয়ে কেউ খোঁজ নেয় কিনা, অভিমানী মেয়েটি উপোস দেয় কিনা জানে না বিভূতি। উপমার জন্য বিভূতির ভাবনা

হয় জেনে উপমা হেসে ফেলে। হাসে না কাঁদে বিধাতা জানেন। আধসের দুধ মেলে কি উপমার? কাঁচা টম্যাটো কি খেতে পারে সে? না পারলে যেন টক রেঁধে দিতে বলে। হঠাৎ খুকির দিকে তাকিয়ে বিভূতির মনে হয়, মা বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্কের চেয়ে নিখিল জীবন-স্রোতে ওর সম্বন্ধ নিবিড়তর। চড়াই আর খুকি যেন ভাইবোন। আকাশ নক্ষত্র শাদা মেঘকে সে যত চেনে বিভূতিকে উপমাকে তত চেনে না। উপমা এসব কথা সমর্থন করলে জীবনকে উপলব্ধির অন্তর্দৃষ্টি যে বিভূতির চেয়েও তার বেশি একথা স্বীকার করে সে।

রাতে খেতে গিয়ে বিভূতি রোজকার মতো অফিস বাবুদের সঙ্গে তাস খেলা সেরে অনেক রাতে ফেরে। তখনি ঘুমিয়ে পড়ে সে। শিশুর মত ঘুম। যেন পৃথিবীর কোনো ব্যথা বিড়ম্বনা নেই। উপমার কিন্তু ঘুম আসে না। সে বিভূতির জামা কাপড় রিপু করে, খুকির ইজের বানায়। কাঁথা সেলাই করে। লাল নীল সুতোর উপর পদ্মের নকশা ফুটে অপরূপ লাগে। সেদিকে তাকিয়ে কেন যে কেঁদে ফেলে উপমা।

জীবনানন্দের গল্পে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রায়ই তিক্ত ও অসহিষ্ণু। এ গল্পটি কিন্তু তেমন নয়— অভাব বেদনার মধ্যেও জীবনের অচরিতার্থতার মধ্যেও ভালবাসার আন্তরিকতা দু পক্ষেরই বেশ ফুটেছে। নইলে গল্পের আর কোনো বিশেষত্ব বা সার্থকতা তেমন নেই।

জীবনানন্দ সমগ্রর দশম খণ্ডভুক্ত 'মৃত্যুর গন্ধ' ছোটগল্পটি ১৯৩৩-এ মে মাসের রচনা।

মিষ্টি দাম্পত্যের ছবি। অসুস্থ স্ত্রী, যৌথপরিবারে নিরুপায় স্বামী সেই পুরোনো জীবনানন্দীয় ছক। গল্পটি সাধুভাষায় লেখা।

নীলিমা চাইতো স্থানীয় ইস্কুলে একটা মাষ্টারনির কাজ। স্বামী বেকার ; বাড়তি শাড়ির অনটন। অভাবগ্রস্ত স্বামীর মন থেকে নীলিমা ধীরে ধীরে সরে গেছে। তার মৃত্যুর আশঙ্কাতেও স্বামীকে তেমন বিচলিত হতে দেখা যায় না—মনে হয় 'তখন উনুনের আগুনে পুড়িয়া সমাপ্ত হইয়া গেলেই বা ক্ষতি কি ছিল।' যক্ষ্মা যেন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। পুরী, ধর্মপুর, ভাওয়ালি বেড়াবার কথা কল্পনা করতে পারে না হেমন্ত। একমাত্র আশ্রয় আছে মৃত্যু। হেমন্তর প্ররোচনায় রান্না করতে চায় নীলিমা—পারে না, অসুস্থ হয়ে ফিরে আসে। সে গৃহিণীদের না জানালেও বয়স্ক খুড়িমা বুঝতে পারেন হেমন্তর মন থেকে নীলিমা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘরে ফেরৎ রুগ্‌ণ স্ত্রীকে ফেলে নিষ্করুণ হেমন্ত শীতলবাবুর ব্রিজের আড্ডায় গিয়ে জোটে। যখন ফেরে দেখতে পায় নীলিমা খুকিকে উৎসাহভরে জীবনের উজ্জ্বল গল্প শোনাচ্ছে। নীলিমার মনে হয় বিধাতা চিরকাল অপ্রসন্ন থাকবেন না। নীলিমা খুকি চাঁদ শারীরিক সুস্থতা, সব মিলে সার্থকতা দিনের মধ্যে অনেক সময়ে ফিরে আসে।

নীলিমা যাই বলুক, হেমন্ত জানে বোঝে, ভাবী জীবনে বধূ হিসাবে সে পরিত্যক্তই থাকবে। এক মরীচিকার আশায় দুঃখিনী নারীকে ভুলানো।

নীলিমা পিত্রালয়ে গিয়েছিল। আজ ফেরার কথা। ষ্টিমার ঘাটে অনেক দেরী করে ষ্টিমার এলো মহেশবাবু খবর এনেছেন—'না, সে আর নেই!'

ব্যথাতুর আশাহত বধূর আকস্মিক মৃত্যু দিয়ে জীবনানন্দের বেশ কিছু গল্প পরিসমাপ্ত— এ গল্পটিও তার অন্যতম। এ মৃত্যু নীলিমার স্বামী হেমন্তর আকাঙ্ক্ষিত ছিল, কিন্তু নীলিমা চেয়েছিল কি? কেন তবে তার মৃত্যু আনলেন লেখক? এই গল্পর আর 'রক্তমাংসহীন' গল্পের পার্থক্য নামমাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই লেখক মৃত্যুকে দুঃসহ দারিদ্র্যযন্ত্রণার পথ থেকে মুক্তির সহজপথ বলে মনে করেছেন।

১৯৩৩ মে (?) মাসে লেখা **'প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা'** গল্পটি জীবনানন্দ সমগ্রর দশম খণ্ডে আছে। এ গল্পটিও সাধুভাষায় লেখা, 'মৃত্যুর গন্ধ' গল্পের সমকালীন ও সমধর্মী মনে হয়। এ গল্পের নায়ক স্ত্রী পরিত্যক্ত।

অজয় বেকার যুবক, সাবান বানায়, এখনো স্ত্রীর পিত্রালয় থেকে ফেরার প্রত্যাশায় আছে।

রাজচন্দ্র—বুড়ো দাদু স্থানীয় আগন্তুক। স্বাবলম্বী, বিবেচক পুরুষ।

নির্মলা (নীলিমা)—অজয়ের নিঃসন্তান স্ত্রী। দু তিন বছর, বিচ্ছিন্ন। স্বামীর সংস্রব ছেড়েছে, এয়োতির চিহ্ন ছেড়ে দিয়েছে।

বুড়ো রাজচন্দ্র ভাবে—'ছোকরাটা সারাটা জীবন বসিয়া করিবে বেদনা বিলাস। কিন্তু নগ্ন বেদনায় পচিবে এই মেয়েটিও, একদিন ইহার বাবা মা ভাইবোন সকলেই ইহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। এ দেশের সমাজ ও মানুষ ইহার এই জীবনের ব্যবস্থাকে অসুন্দর ও অমানুষিক বলিয়া পদে পদে ইহাকে কণ্টকিত করিয়া ছাড়িবে। তারপর একদিন নিরুপায় হইয়া নিজের জীবনের গ্লানি নির্মলা, আরো অন্যভাবে অনেক বাড়াইয়া তুলিবে হয় তো। কিংবা, কে জানে, প্রেম, অরুচি, অধর্ম লইয়া স্বামীর ঘরে থাকিলেই হয়তো গ্লানি বাড়িত সবচেয়ে বেশি—প্রেম আকাঙ্ক্ষা ও দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা যেখানে গিয়া মিটিবে তার সেইখানেই প্রসন্ন সুন্দর নারীদেবতার আসন অনুপম হইয়া উঠিবে।'

দাম্পত্যের জটিলতা, সন্তানহীন প্রেমহীন নারী। আসক্তিহীন বেকার প্রেমিক পুরুষের ছন্নছাড়া জীবন বর্ণিত এ কাহিনীতে। লেখক এমন দুঃসহ দাম্পত্যের চেয়ে বিচ্ছিন্নতা বিবাহ বন্ধন মুক্তিকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে যাই হোক লেখাটি গল্প হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে কি?

জীবনানন্দ সমগ্রর দশমখণ্ড ভুক্ত সাধুভাষায় লেখা **'লোকসানের মানুষ'** গল্প ১৯৩৩ সালের মে মাসের রচনা।

এটি একটি সার্থক গল্প। সাধারণ তুচ্ছ জীবনযাত্রা থেকে উঠে এসেছে এক অসাধারণ প্রেমিক মানুষ। সনাতন একটি ভৃত্য মাত্র। বছর দশেক আগে বিয়ে হয়েছিল তার আঠারো বছরের একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে, কিন্তু কুদর্শন স্বামীকে মনে ধরে নি বিলাসীর। যদিও একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল তাদের, কিন্তু মনের অশান্তিতে বিলাসীর রূপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপরে একটি সুদর্শন হাড়ি জাতের তরুণ দ্বিজেনকে ভালোবাসে বিলাসী। দ্বিজেনের একটি পান বিড়ির দোকান আছে, তার সঙ্গেই ঘর ছাড়ে সে। তখন এই দ্বিজেন ও বিলাসী নানাভাবে বিপন্ন ও সমাজে নিন্দিত হয়। দ্বিজেন বিলাসীকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবে, সনাতনের পরামর্শ চায়। স্ত্রীর সুখের কথা ভেবে সনাতন

দ্বিজেনকে সাহায্য করতে চায়। যদি অর্থ থাকতো হয়তো অন্যত্র ঘর বাঁধার জন্য সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হতো না।

সনাতন জানে বিলাসী বিয়ে করে সুখী ছিল না। তার সোনার শরীর পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। মাংস রক্ত শুষে শরীরের হাড় কখানা ধকধক করতো শুধু। যেন সাতবুড়ির এক বুড়ি। সেবা শুশ্রূষা খাওয়া দাওয়ায় কিছু হয় না। স্বামীর সঙ্গে কখনো ঝগড়াঝাটি না হলেও তিনবার গলায় দড়ি দিতে বাঁশ জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছিল সে। তিনবার ধরে ফেলেছিল সনাতন। তৃতীয়বারে সনাতন তাকে ধরে সব জানতে চাইল। কাঁদতে লাগল বিলাসী। তারপর এই দ্বিজেন। সনাতন কোনো বাদ সাধে নি। বরং অনুভব করেছে, তার স্ত্রীর শ্রী ও সৌন্দর্য ফিরেছে। তার এই বর্ণনার মধ্যে যেন এক অহংকার ফুটে ওঠে। অদ্ভুত লোক সনাতন, নিজের স্ত্রীকে যেন মেয়ের মত দেখে। সে বোঝে স্বামী হবার যোগ্যতা তার নেই। সনাতনের অবশ্য নিজের ঘরদোর আছে সচ্ছলতা কম নয়। ভিখিরির মেয়ে বিলাসী বিয়ের পরে সুপাত্রস্থ হয়েছিল বলা চলে। তবু সনাতন জানে রাজার বাড়িতে গেলেই বিলাসীকে মানায়। গ্রামের লোকের সহানুভূতি দ্বিজেনেরা পায় না। তার জমি বিক্রি হয়ে গেছে, বিড়ির দোকান চলে না। বিলাসীকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে দ্বিজেন সনাতনের কাছে। বিলাসীরও তাই ইচ্ছে—কিন্তু অর্থাভাব বড়ো। তাই ভরসা পায় না। এখন আধপেটা খাচ্ছে। লাঞ্ছনা সইছে, তবু তাদের ভালবাসা কি নিবিড়! তবু বিলাসী এখনো বৈষ্ণবী হয় নি। আখড়ায় যায়। বোষ্টম বোষ্টমী হয় না তো।

গল্পটা অসম্পূর্ণ, সনাতনের প্রভুপত্নী এ বিষয়ে শুধোলে আহত কণ্ঠে বলে সনাতন, 'আপনার সহানুভূতি তাহলে এদেরই দিকে! গল্পটি সম্পূর্ণ করেন নি জীবনানন্দ। এমনকি শেষ বাক্যটিও শেষ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অথচ গল্পটি নানা দিক বিচারে যে অসামান্য তা আগেই বলেছি। প্রকৃতপক্ষে সনাতন এক প্রেমিক। বিলাসীকে মুক্তি দিলেও অন্তরে তার যে প্রেম সেই ব্যথা ব্যক্ত হয়েছে, প্রভুপত্নীর উদ্দেশ্যে তার উচ্চারিত কথাটিতে।

'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পটি জীবনানন্দ সমগ্রর দশম খণ্ডভুক্ত ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে লেখা।

এই গল্পে গ্রাম্য যৌথ পরিবারে অন্যের সেবাপরায়ণা সরলা মায়ের দুর্দশা দেখে বুঝে সন্তানের দুঃখ ক্রোধ সহানুভূতি চিঠির আকারে বর্ণিত। জীবনে বাস্তবতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ, এ গল্পের যেটুকু গুরুত্ব, তা দিয়েছে। কিভাবে পরিজনেরা মাকে কষ্ট দেয়—অপমান করে, তার সরলতার সুযোগ নিয়ে সর্বরকমে শোষণ করে, অথচ তাদেরই সন্তুষ্ট করার জন্য, সেবা করার জন্য মা নিজের সন্তানের উপর পর্যন্ত অবহেলা করছেন! কিন্তু সকলকে তুষ্ট করার এসব চেষ্টাই অনর্থক, আত্মপ্রতারণামাত্র—একথা লেখক তার মাকে বোঝাতে পারে না। আগেকার মায়েদের এটাই ছিল স্বভাবধর্ম। এ গল্পে বাস্তবতা ও কল্পনা, সমাজজীবন এবং রহস্যময় প্রকৃতি সম্পর্কে কল্পনা একাকার

হয়ে গেছে। ঝাউয়ের কোটরে তক্ষক ডাকে, শিশুগাছের নিচে শঙ্খচূড় শুয়ে আছে। সাপ নয়, আমাদের জীবনের যবনিকার ওপরে—যাদের আমরা কোনদিন দেখিনা সেই কুয়াশামাখা সম্ভাবনার রজ্যের এক মমতাময়ী রূপসী। হয়তো একই চারুলতা।' বাস্তব ও অবাস্তবরে এই সমীকরণ জীবনানন্দের গল্পে পরবর্তী স্তরে সুপ্রচুর। এখানে যেন. তার পূর্বাভাস।

এ গল্পের অংশবিশেষে জীবনানন্দের 'জীবন' কবিতা এবং 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার ভাষা ও ভাববিন্যাস স্মরণে আসে।

'মানুষের মুখের আভা' জীবনানন্দ সমগ্রর দশম খণ্ডের সর্বশেষ এই গল্পটির রচনাকাল সম্ভবত ১৯৩৩এর মে মাস।

গল্পটি সাধুভাষায় লেখা কিন্তু শেষ পৃষ্ঠা পেন্সিলে লেখা হওয়াতে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সংকলকরা জানিয়েছেন 'গল্পটির শেষে হয়তো আরো কিছুটা লেখা হয়েছিল কিংবা, সেটা শেষ পৃষ্ঠার কোনো বিকল্প লেখনও হতে পারে। গল্পের ভিতরের একটি শব্দগুচ্ছ নিয়ে নামকরণ হয়েছে।'

মাঝরাতে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল শচীন প্রসন্নবাবুকে। কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন না। আতিথ্যও স্বীকার করলেন না শচীনের। অথচ তিনি যাকে চেয়েছিলেন সেই তিনকড়িবাবু আসেন নি প্রসন্নবাবুকে নিতে।

এই গল্প আর 'প্রেম, আকাঙ্ক্ষা দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা'—আসলে একই গল্পের পাঠান্তর যেন। নারীর স্বামীকে বিতৃষ্ণা ভরে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে ভালবাসার কাহিনীর দিক বিচারে এ গল্পের সঙ্গে 'লোকসানের মানুষর'-এরও—সাদৃশ্য। নানা দৃষ্টিকোণে লেখক দাম্পত্যে নারী হৃদয়ের দিকটা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি বয়স্কাদের সংসারে নানাজনকে খুশি করার জন্য আত্মলোপ ও আত্মবলিদান দেখিয়েছেন জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর গল্পের মতো।

স্ত্রীর আত্মীয় প্রসন্নবাবু এসেছেন। কিন্তু শচীন তাকে মাঝরাতে বাড়ি আনতে গেলেও তার সঙ্গে যান নি। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটিয়েছেন কেননা শচীনের স্ত্রী পার্বতী আর ফিরবে না স্বামীর ঘরে। সে বরং অমূল্য বলে এক ছোকরা পুলিসকে খুশি করে খাওয়ানোর জন্য ভোরে উঠে রোদে পিঠ করে বসে কচুপাতায় তেল মাখিয়ে বড়ি দেয়, তাকেই দুবেলা গরম গরম রেঁধে খাওয়ায়।

শচীনের যৌথ পরিবারে অভ্যন্তর পরিস্থিতি মেয়েদের অনুকূল নয়, তবু প্রসন্নবাবু শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করলেন 'মানুষের জীবন তো তার শরীর নিয়েই নয় শুধু, হৃদয়ই যত বিচিত্র গোলমাল বাঁধায়। অনেক বিচিত্র জীব তোমাদের সংসারের পথে বিপথে, তার জন্যও ততটা নয়। তোমাদের স্বচ্ছলতায়ও চলে যেত। কিন্তু আসল কথা পার্বতী তোমাকে ভালোবাসে না।'

একাদশ খণ্ড জীবনানন্দ সমগ্রর সমসাময়িক আরেকটি গল্প **'জন্ম মৃত্যুর কাহিনী'**। মে ১৯৩৩-এর একটি খাতার তিনটি গল্পের দ্বিতীয় গল্প এটি। ভাষা সাধু, সংলাপ কথ্য ভাষায়।

২৫ বছর বয়সে প্রথম বিবাহিত সৌরীন স্ত্রী উমাতারাকে পেয়ে যতখানি বিচলিত বিহুল হয়েছিল ৩৭ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার শঙ্করীকে পেয়েও সেই বিমুগ্ধ হওয়ার শক্তি

হারিয়ে ফেলেছে। শঙ্করী বেশ সুন্দরী বৌ, যা পেয়েছে তার জন্য তৃপ্তি ও অহংকার তার আছে, কিন্তু শুধু বিষয় নিয়ে তৃপ্ত সে নয়, বারবার আন্তরিকতার প্রমাণ পেতে চায়। জীবনের মধুর সুন্দর ধারণা ও কল্পনা এই মেয়েটির সম্বল। কিন্তু ক্রমে বুঝবে নারীত্ব বলতে জীবনের ভাঁটার স্রোতকেই বোঝায়, এখন যে দু একটি সোহাগের কথায় আনন্দ কন্টকিত হয় স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে দেয়, কিন্তু সৌরীন বোঝে ষাট বছর বয়সে শঙ্করীর যা মনে হবে এখনি কেন যেন সেইসব মনে হয় সৌরীনের।

সৌরীনের চেহারায় নবীনতা আছে যথেষ্ট। বধূর প্রণয়াবিষ্ট হৃদয়কে সে দুদণ্ডের জন্য মুগ্ধ করে রাখতে পারে কিন্তু তারপরেই কেমন যেন অবসাদ আসে। উমাতারার সুশৃঙ্খল জীবন-যাত্রার স্মৃতি স্মরণ করে নূতন বিয়ের অসারতা ও অসংযম যেন তাকে ধিক্কার দিয়ে যায়।

শঙ্করী উমাতারার প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করে, সৌরীনের তার কথা মনে করে চোখ ছলছল করে উঠলো কিনা। অস্বীকার করলে বলে তোমরা পুরুষরা এইরকম, বুকের ভিতর ক্ষমা বা দুঃখ যদি থাকে! উমাতারার দশবছরের সেবা ও প্রেম স্বামী অকৃতজ্ঞের মত ভুলে যাক—এ শঙ্করী চায় না, আবার উমাতারার স্মৃতি স্বামীর অন্তরে জাগিয়ে তুলতেও শঙ্করীর ইচ্ছা করে না।

শঙ্করী বলে দুঃখে মানুষের যেমন চেহারা হয় সৌরীনের তো তেমন হয় নি। টোপর মাথায় তাকে শঙ্করীর মনে হয়েছিল ১৮ বছরের নূতন বর। কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করেনি সৌরীন। অথচ সে বলে সে নাকি সব মানুষকেই বিশ্বাস করে।

নূতন বৌর মুখ দেখা টাকা স্বামীকে দিতে গেলে সৌরীন তীব্রভাবে হাত গুটিয়ে নেয়। টাকা চারটে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েটির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। অথচ সে যখন সিঁদুর মাখানো টাকাগুলি সিঁদুরের কৌটায় রাখবে বলে, সৌরীন সম্মতি দিলেও কৌটায় আটবে না—এ সমস্যার কোনো সমাধান করে দেয় না। নূতন বৌর বেনারসী সাজ সৌরীন খুলে রাখতে বলে। কানে হিরের দুল পরার জন্য স্বামীর ভর্ৎসনা তার মনে বিঁধে যায়। সামান্য সুতির শাড়ি পরার নির্দেশ স্বামীর কাছে পেয়ে শাড়ি দেখে ম্রিয়মাণ হয়ে যায় শঙ্করী।

উমাতারার ৭ বছরের মেয়েটিকে খুব ভালবাসে শঙ্করী। ঠাকুমার কাছেই শোয় সে। একরাতে বাবার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, তাকে ঠাকুমার কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে শঙ্করী বলে 'থাক এইখানেই ঘুমিয়েছে এইখানেই থাকুক আজ।' সৌরীন তার প্রস্তাবে খুশি হয়। বাসর রাত্রির আটদশ দিনের মধ্যেই এই পরিস্থিতিতে আহত হয় শঙ্করী। শঙ্করীর দিকে তার স্বামীর দৃষ্টি নেই। মেয়ে বেনুর কোঁকড়া চুল নিয়ে খেলা করতে ব্যস্ত সে। মুহূর্তে মুহূর্তে শঙ্করী নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে জীবনদেবতার দুধারে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তবু এই সাময়িক ভাব কেটে যায়। সৌরীনের পায়ের নীচে পালঙ্কে যে জায়গাটুকু—সেখানেই শঙ্করী শুয়ে পড়ে।

সৌরীন মাঝে মাঝে আভরণহীনা শঙ্করীকে সুগৃহিণী হিসাবে প্রশংসা ও আদর করে। কিন্তু স্বামী সম্পর্কে শঙ্করীর সঙ্কোচ কাটে না। সৌরীন যখন অযাচিতভাবে উমাতারার

প্রসঙ্গ তুলে শঙ্করীকে তার পূর্ব দাম্পত্যের মহিমা বোঝায়, অসহনীয় মনে হয় শঙ্করীর। উমাতারা যে গন্ধতেল মাখতো তাই মাখার নির্দেশ দেয় সৌরীন। বুঝতে পারে উমাতারার ভূমিকায় আজীবন অভিনয় করুক সে, এই শঙ্করীর স্বামীর অভিলাস। উমাতারার মৃত্যুকে জড়িয়ে যাবতীয় দার্শনিকতা সৌরীনের। আর বাৎসল্য, উৎকণ্ঠা বেনুকে জড়িয়ে, শঙ্করীর তাতে নিজস্ব কোনো ভূমিকা থাকবে কি? স্বামীর সে চিন্তা থাকে নি। উমাতারাকে নিয়ে সৌরীনের সাংসারিক জীবন যেমন ছিল শঙ্করীকে নিয়েও অবিকল তাই থাকবে। কেবল তার মেয়ে বেনুর জীবনে ক্রমরূপান্তর ঘটবে। নিজের নূতন সংসারে শঙ্করীকে নিয়ে যে রূপান্তরের প্রয়োজন ঘটেছে তা সৌরীন বুঝতে চায় নি। তার এই অবুঝ দাবির কাছে নতিস্বীকার করে শঙ্করী সন্তর্পণে নিজেকে সরিয়ে নিল।

অতএব তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন ঘটলো আবার।

জীবনানন্দের অত্যন্ত অল্প সংখ্যক যে গল্পগুলি পরিকল্পনায় জীবনদৃষ্টির গভীরতায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে বাস্তবিক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে এ গল্পটি তার অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী বা নিশীথে গল্পের মত মৃত অতীতের কালো অশরীরী ছায়া যেন স্বামীর ইচ্ছা বা নির্দেশের মধ্য দিয়ে উচ্ছলা তরুণীর শঙ্করীর প্রেম আবেগ ও আন্তরিকতার শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। যার ফলে তার মৃত্যু অথবা আত্মহনন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। লেখক যে শঙ্করীর পরিণাম বিশদ করে বর্ণনা করতে যান নি এটি তাঁর যথেষ্ট শিল্প পরিণতির পরিচয় দেয়।

দাম্পত্য মাত্রই নারী পুরুষের সামাজিক জীবনযাপনের প্রশান্ত বোঝাপড়া। তা কেবল সমাজ স্বীকৃত বিবাহের মন্ত্রপাঠের বা প্রচলিত রীতি অনুসরণের যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, তার মধ্যে সজীবতা চাই, প্রাণ চাই। উভয়ের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের সম্ভাব্যতার পূরণ ও দায়িত্ব পালনের সমন্বয় সাধন, এটা একটা কঠিন আর্ট। দোজবর স্বামী মানেই স্ত্রীর খানিকটা খণ্ডিত প্রত্যাশা। ভাঙা স্বপ্নের পুনর্নির্মাণের দুঃসাধ্যতা, স্বামীরও। তা সম্ভব হয় গভীর অনুভবশীলতার সঙ্গে পরস্পরের চাওয়া পাওয়া সম্পর্কে সজাগ থাকার মধ্যে। সৌরীনের মধ্যে ব্যাপারটাই ছিল না। সে চেয়েছিল তার সদ্য বিবাহিত নূতন স্ত্রী প্রথমা স্ত্রী উমাতারার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠুক তার ভূমিকা পালন করুক। এই প্রচেষ্টায় শঙ্করীর ব্যক্তিত্ব যে স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি পাবে না, তার সাধ ও স্বপ্ন অবহেলিত হলে গভীর হতাশা ও ব্যর্থতায় তার হৃদয়কে যে বেদনায় ভরে দিতে পারে তা সৌরীন বিবেচনা করে নি।

'জাদুর দেশ' সাধুভাষায় লেখা ছোটগল্প। রচনাকাল ১৯৩৩-এর মে মাস, জীবনানন্দ সমগ্রর একাদশ খণ্ডের অন্তর্বর্তী।

মহেন্দ্র একটি চাকর মাত্র। কিন্তু একটি অনুভূতিশীল শৌখিন মানুষও। নূতন জায়গায় চাকরের কাজে যোগ দিয়েছে সে। নানা শৌখিনতার জন্য বাচ্চারা তাকে সশ্রদ্ধভাবে দেখছে। অনেকগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে অরক্ষণীয়া আত্মীয় কন্যা পুঁটিদিকে কি চোখে দেখলো, তার কাছে কি স্নেহ প্রশ্রয় পেল যে তার পাড়াগাঁর বাড়িতে তার সঙ্গে চলে যাবার প্রস্তাব করল সে। পুঁটিদি তাকে যেতে বললেও সে কিন্তু সঙ্গে গেল না। শখ সাধ ছেড়ে গেরুয়া জামা পরে খালি পায়ে পথে পথে চলতে ইচ্ছে হয় হঠাৎ

মহেন্দ্রর। কবির মতো মহেন্দ্র বললো—'পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীর সুন্দর সম্পর্কটুকু তাই বেদনার, দুঃখ সাধনার শুধু।'

দিনের কাজ সেরে সন্ধ্যায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে কোথায় চলে গেল। বলে গেল 'পুঁটিদি এ বাড়িতে না থাকলে থাকতে আমার কোনো বাধা ছিল না। থাকব বলেই তো এসেছিলাম!'

প্রেমের এমন ব্যঞ্জনাময় সুন্দর গল্প অল্পই লিখতে পেরেছেন জীবনানন্দ। এ গল্পে অবশ্য একটি মজার অসতর্ক শব্দ প্রয়োগ আছে, 'হরেনের ভাসুর ঝি'—হরেন কি কোনো মেয়ের নাম? নইলে তার ভাসুর ঝি হয় কি করে?

গল্পের ধারা

সপ্তম স্তবক

'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' ১৯৩৬ সালে রচিত। জীবনানন্দ সমগ্রর একাদশ খণ্ডভুক্ত এ গল্পটির সংলাপে কথ্যভাষা কিন্তু বর্ণনা সাধুভাষায় লেখা। এই বছরের প্রথম খাতার প্রথম গল্প।

১৯৩৬ সালের কবিতার মতো জীবনানন্দের গল্পের শৈল্পিক এক উত্তরণ আছে। জীবনের নির্মম বাস্তবতার গল্প আর নয়—এক রহস্যময় অতিলৌকিক জগতের রূপাভাস এই স্তরের গল্পে স্থূল লৌকিক জগতের পরিধি যেন অতিক্রম করতে চায়। তিনি যেন বুঝেছেন গল্পের বুনটের জন্য পৃথক কিছু উপকরণ চাই, বাস্তবতা নয়। প্রায়শই তাই থিয়সফির মালমসলা এসেছে, পরাবাস্তবের অস্পষ্টতা। যেমন কিছু গল্পে নানা ধ্যানধারণার মানুষের চেতনায় নানারকম পৃথিবীর সমান্তরাল অবস্থান, চরিত্রগুলির মনে সন্দেহ ও ভয়ের জন্ম দিচ্ছে। কিছু গল্পে ভাগ্যচক্র মানুষকে অনিবার্য এক পরিণামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেমন এগল্পে অনাদির যক্ষ্মা হয়েছে। সব সময়ে জ্বর। তার ধারণা সে সমাপ্তির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে অন্যদের এমন কি তার মেয়েকেও তার সংস্পর্শে আসা নিষেধ করেছে। লোকনাথ এক রবিবার এবং তার দিন পাঁচেক পরে আরেকদিন তার কাছে গিয়েছিল। প্রথমদিন অনাদি ভেবেছে লোকনাথ তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে। পরের দিন তাকে আরো কাহিল বলে মনে হলো। অনাদি অবিবাহিত লোকনাথকে বললো একটা গরিব সাধারণ ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে, যাকে সে সুখী করতে পারবে। পৃথিবীতে অনেক ব্যথিত স্ত্রীলোক আছে তাদের সান্ত্বনার নীড় তৈরি করা উচিত। অনাদি—তা পারে নি বলে আক্ষেপ করেছিল। লোকনাথ বললো, দশবছর বিয়ে করেছে অনাদি তার সংসারে শান্তি। অনাদির স্ত্রী দুদিন পর সে বাপের বাড়ি যাবে। মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। কবে খুকি ফিরবে তা স্পষ্ট বলল না। খুকি তার মামার কাছে থাকবে। অনাদির স্ত্রী এখন গেল নন্দদিদির কাছে আলতা আর শাঁখা পরবে বলে। খুকি একবারও

এ ঘরে আসে না শুনে লোকনাথ খুকিকে ডেকে আনতে চাইল। অনাদি বারণ করলো। কাশছিল অনাদি, লোকনাথকে বললো শেলফের উপরের ঘড়িটায় দম দিয়ে যেতে। অনাদি জানালো, সুরেশ বলে একটি ছেলে, চাকর গোষ্ঠ, আর ডাক্তারবাবু তার সব করে দেয়। আগে ভয় পেত সে। এখন ভাবনা কমেছে। বুঝতে পারছে সেরে উঠবে।

অনাদি বললো তার স্ত্রী চিন্তা না করে অনেক কথা বলে, সে যা বলে সে তা নয়। তার সম্পর্কে অনাদির ঢের শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু অনাদির স্ত্রীর কথা লোকনাথের শুনে দরকার নেই। লোকনাথ উঠে গেল। অনাদি তাকে চারদিন পরে আসতে বললো, তখন তার স্ত্রী আর খুকি থাকবে না।

লোকনাথ এলো আরো ক'দিন পরে রাত্রে। অনাদি বললো, ডাক্তার বলে সে ভালো হচ্ছে, কোনদিক দিয়ে ভালো? তার মতো মানুষের মরাও তো ভালো।

স্ত্রী আটদিন নেই। চিঠিও দেয় নি। রমেশবাবুও কলকাতা থেকে ফেরেন নি। অনাদির দাড়ি দেখলে খুকি হয়তো ভয় পেত। সে নেই তাই অনাদি দাড়ি কামায় না। ডাক্তার তাকে চেঞ্জে যেতে বলে কিন্তু একা চেঞ্জে যাবে কি করে অনাদি? লোকনাথ বলে মধুপুরে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। বিমর্ষ অনাদি চোখ বুজলো।

অনাদি জানালো, পাশের এক বাড়িতে কে একজন কবি ভোরে গান গায় যেন কোন দূর অন্ধকার নদীতে রাজহংসী এর জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তো প্রেমের হয়তো মৃত্যুর নদী।

অনাদির মতে মৃত্যু প্রেম। মৃত্যু শান্তিও, মৃত্যু একটা ছন্দ, কোনো এক অন্ধকার মায়াসিঁড়ি জলের দিকে গন্ধরাজ ফুলের মতো হংসীর শাদা পালক আসন্ন প্রসবা এক নির্জনরাত্রি। সবই অপেক্ষমাণ তোমার জন্য, সব ছন্দ স্তব্ধ হয়ে যায়।

অনাদি বলে, তর্ক নয়, হৃদয় দিয়ে কি সত্যে পৌঁছানো যায়? লোকনাথ কিছুই বলতে পারে না। লোকনাথ বলে সে হৃদয়হীন মানুষ, সংস্কারহীন, তর্ক দিয়ে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। অনাদি বলে পাশের বাড়ির নূতন ভাড়াটে এসেছে তাহলে। রোজ ভোরে কেমন নূতন আবহাওয়া। রোজ সকাল ৭টায় ভজন গান।

যুদ্ধ চলছে পৃথিবীতে হাজার হাজার লোক মরছে মরবে। কেউ কিছু করতে পারছে না, নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ করবে কি? ভজন গানে অনাদি মৃত্যুর আর এক রূপ দেখে। সে চায়, শাদা পাপড়ি কোন অপার্থিব গন্ধফুল লোকনাথ এনে দিক তাকে ঈশ্বরের পুজোর জন্য, পদ্মফুল দিতে পারবে লোকনাথ? সদ্য পাপড়ি মেলেছে, এমন ফুল অন্ধকারের ভিতর তার বালিশের পাশে রেখে দিয়ে যাবে। আর দায়িত্ব দিল পোষা কুকুরটার খোঁজ নিতে ; অনাদির মতো তার যেন অকালমৃত্যু না হয়। আর তার লেখা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির খাতা ৩০/৪০ খানা। সমস্ত পেনসিল দিয়ে লেখা। পেনসিলের দাগও অনেক জায়গায় উঠে যাচ্ছে, লেখাও এমন বিশ্রী যে কেউ বুঝতে পারবে না। লোকনাথ বললো, সে পেনসিলে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলি কপি করে দেবে। বাক্সটায় ৪০টি খাতা আছে। অনাদি চায়, তার মৃত্যুর পর এই খাতাগুলি যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

তারপর অনাদির ইচ্ছে লোকনাথ একমাসের ছুটি নিয়ে, বসিরহাট থেকে খুকিকে নিয়ে সুরেশকে নিয়ে মধুপুরে যাবে। তার স্ত্রী খুকিকে যেতে দেবে কেন? অনাদি বলে মেয়েটি কি আমার স্ত্রীরই কেবল? অনাদি স্ত্রীর বা খুকির কোনো চিঠি পায় নি। নিজে খুকিকে অনেক চিঠি লিখেছে পোষ্ট করে নি। জড়ানো লেখা বড় বড় চিঠি খুকি পড়তে পারবে না। তাই পোষ্ট করে না। লোকনাথ খুকিকে এনে দিতে পারবে? লোকনাথ বলে অনাদির এসুখও চলে যাবে আস্তে আস্তে। বালিশের নিচ থেকে খুকির লেখার খাতা বার করে নিজের বুকের উপর রেখে দিল অনাদি।

লোকনাথ চলে গেল।

কিছুদিন পর অনাদির বাসায় গিয়ে লোকনাথ অনাদির স্ত্রী মেয়ে এবং রমেশকে দেখতে পেলো। অনাদি নেই, সে যে মরে গেছে তা মনে হলো না লোকনাথের। অনাদির স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে সে অবাক হয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল। মেয়েটা শুধু নিঃসঙ্গ মহিমার মতো বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি যেন বলতে চাইল—'চেষ্টা করে দেখলাম ঢের ; কিন্তু নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ তো পারে না।'

অমোঘ মৃত্যু এবং অবুঝ সন্তান বাৎসল্য এই গল্পের বিষয়বস্তু। এ গল্প যে সময় লেখা তখন যক্ষ্মা ছিল রাজরোগ। তার চিকিৎসা ছিল না। সংক্রমণের ভয়ে আত্মীয়রাও রোগীকে ত্যাগ করে যেত। সেই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি যে বেদনা ও বিচ্ছেদ্ সৃষ্টি করতো তাই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে। শিশুকন্যার প্রতি জীবনানন্দের অপরিসীম বাৎসল্য এ গল্পে প্রগাঢ়তম হয়েছে।

একাদশখণ্ড জীবনানন্দ সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত **'মেহগিনি গাছের ছায়ায়'** গল্পটি ১৯৩৬ সালে লেখা দ্বিতীয় খাতার প্রথম গল্প।

হরিপ্রসাদ চাটুজ্যের বয়স ৭৫। বয়সের ভারে অথর্ব, পরিত্যক্ত। তাঁর পাঁচছেলে সকলেই বড় চাকরি করে। তারই অন্যতম নির্মল নীলকণ্ঠের বন্ধু। ১০ বছর বাদে নীলকণ্ঠ ফিরেছে দিল্লি থেকে, নির্মলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দোতলার কোণের ঘরে তাসের আড্ডা বসেছে, সেখানেই আছে নির্মল, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। নিচের তলায় বুড়ো চাটুজ্যে মশাই একলা বসে। নীলকণ্ঠকে চিনতে পারলেন না। উপরে আড্ডা হট্টগোলে বিব্রত, বরং এখানে নিচের নির্জনেই ভালো আছেন, তাঁর ক্ষোভ তাঁর গিন্নী উপরে ঐ তাসের আড্ডার কাছে কাছেই থাকতে ভালবাসেন। বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গ দেবার দরকার মনে করেন না। তিনি কিন্তু অসুস্থ নন,বাঘের কাঁছে বাঘিনী থাকে তেমন নন চাটুজ্যে গিন্নি।

কথা বলতে বলতে তামাক খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েন চাটুজ্যে। তখনই উপর থেকে নামেন চাটুজ্যে গিন্নী, তিনিও নীলকণ্ঠকে চিনতে পারলেন না। তিনি জানান সন্ধ্যার পরে তাসের আড্ডা না ভাঙলে নির্মলের সঙ্গে দেখা হবে না। ততক্ষণ নীলকণ্ঠ কর্তার ঘরেই অপেক্ষা করুক। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন বটে, এখুনি জাগবেন। চাটুজ্যে মশাইর এটা ওটা সেটা অনেক রকমের দরকার। নীলকণ্ঠ ওখানেই বসুক। দেখুক।

আস্তে আস্তে নীলকণ্ঠ চাটুজ্যে মশাইর ঘরে এসে বসলো। গিন্নী উপরে উঠে গেলেন।

বাঘিনীর গায়ে সুন্দর ডোরা নেই। ঘুমিয়ে রয়েছে বুড়ো বাঘ। মনে হলো নীলকণ্ঠর, চাটুজ্যে মশাই আর না জাগলেও পারেন। বরং ঘুমিয়েই পড়ুন চাটুজ্যেমশাই।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষের দুর্দশা। তার পছন্দ অভিরুচির তোয়াক্কা না করে সুখসুবিধা না দেখে স্ত্রীপুত্রের স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন, তা নিয়ে বৃদ্ধের বিষণ্ণতা এবং দাম্পত্যের আধুনিক পরিণামী রূপ এ গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। এমন উপেক্ষিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও বরণীয়। সেই মৃত্যুকামনা দিয়ে গল্প সমাপ্ত হয়েছে।

একাদশ খণ্ড জীবনানন্দ সমগ্র অন্তর্ভুক্ত **'করুণার রূপ'**। গল্পটি পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খাতার দ্বিতীয় গল্প। কথ্য ভাষায় লেখা। ১৯৩৬ সালের রচনা।

সিদ্ধেশ্বরবাবু সাহিত্যিক। কোলকাতার এক প্রান্তে তাঁর লাল বাড়িখানা বিমলকে শৈলেন এক বৃষ্টির দুপুরে চিনিয়ে দিয়েছে। দুজনের গায়ে আপাদমস্তক রেনকোট। আজ সিদ্ধেশ্বর যা হয়েছেন তাই হতে পারার স্বপ্ন দেখে শৈলেন। কলকাতার অলিগলি দিয়ে আড়াইমাইল হাঁটা হয়ে গেছে। বাড়ির রং লাল, জাফরান, কমলা না বাদামি নির্ণয় করা যায় না। গোলাপ, জবা, রক্তরং, পোড়ামাটি বা চায়ের রংও হতে পারে। বৃষ্টি থামতে বিমল চলে গেল। সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাড়ির সামনে এসে হাতের চুরুট নিভিয়ে ফেললো শৈলেন।

আগে দেখা শৈলেনকে চিনতে পেরেছেন সিদ্ধেশ্বর। ঘরে সোফা নেই, চেয়ার আছে, বা ঘাসের আসন আনিয়ে দিতে পারেন সিদ্ধেশ্বর। তিনি বললেন, শৈলেনকে তিনি দেখেছেন গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে নিজের রচনা পড়তে। সিদ্ধেশ্বর চামড়া কিনে রেখেছেন, নিজের জন্য নিজে জুতো তৈরি করবেন। একটা ছেলে কামিনীগাছের ছড়ি বিক্রি করতে এসেছিল। আসলে সে ছড়ি তৈরি করতে পারে নি, তিনি চেঁচে খুদে দাড়িওয়ালা একটা আশ্চর্য মুখ তৈরি করেছিলেন। সিদ্ধেশ্বর কবিতার বই পাঁচটা বার করেছেন। তাঁর মতে "প্রথমটা বাংলা সাহিত্যের প্রেতাত্মারা এসে আমার জন্য লিখে দিয়েছেন।" সাতবছর আগে বেরিয়েছিল তাঁর শেষ কবিতার বই। তারপরে দেরাজে বাঁধানো খাতার ভিতর রয়েছে সব। "আমার নতুন লেখা কবিতা নিয়ে আমি রাস্তায় কিংবা স্কোয়ারে অথবা কোনো ভিড়ের ভেতর গিয়ে পড়ে শোনাতে ভালবাসি। প্রেসের থেকে যে সব বই বেরিয়ে আসে সে সবের ভিতর একটা রোমশ অস্বাস্থ্যকর গন্ধ পাই যেন। আমার মনে হয়, যারা কবিতা লেখে তারা যেন নিজের হাতের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখায়। তাই আমার ভালো লাগে।" ত্রিশবছর বয়সে সিদ্ধেশ্বর উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। লিখতে শুরু করলেই তার স্ত্রী খাতা টেনে ছিঁড়ে দিত। তার বক্তব্য, লেখাই সিদ্ধেশ্বরের সব—সে বিয়ে করেছে কাগজকলমকে? তাঁর স্ত্রী বলতো, 'এই সমস্তের মুণ্ডুপাত করে তবে ছাড়বে। লিখতে বসলেই আন্তরিকভাবে মুখ ফুলিয়েছে কেঁদে কেঁদে। খান দশেকের বদলে তিনখানা উপন্যাসও যে সিদ্ধেশ্বর লিখতে পেরেছেন তা কেবল চারটের সময় ঘুমের থেকে উঠে লিখতে বসতেন বলে। চারটে থেকে সকাল সাড়ে সাতটা। স্ত্রী ঘুম থেকে উঠলেই তিনি কলম সরিয়ে রাখতেন। স্ত্রীর সহযোগিতা পাওয়ার ভাগ্য সিদ্ধেশ্বরের ছিল না বটে, তবু স্ত্রীর প্রসঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের বিরূপতা নেই। প্রেম না

থাকলেও করুণার জন্ম দিয়ে গেছে স্বামীর হৃদয়ে, রচনার প্রয়োজন রূপ ও প্রেমের চেয়েও গভীর। অনেক রূপসীর মুখ সিদ্ধেশ্বর ভুলে গেছে, কিন্তু একটা ছোটমেয়ের 'রানি পারা' হাত তাঁর হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে আছে, তাই ধরা পড়েছে তাঁর শিল্পকর্মে কাঠ খোদাইতে।

এই গল্পের নায়ক সিদ্ধেশ্বরের নামের আড়ালে ব্যক্তি জীবনানন্দের এক গোপন পরিচয় ফুটে উঠেছে। ফুটেছে দাম্পত্য সংঘাতের ছবি। তার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি অন্তস্রোতা করুণা ও শিশু (কন্যা)র প্রতি নিবিড় বাৎসল্যও সুব্যক্ত হয়েছে। তাঁর ভাষায় এই শিশুর হাতের দিকে তাকিয়ে বুঝবে করুণার রূপ যেন প্রেমের চেয়েও গভীর।

গল্প লেখার সময় প্রায়ই অসতর্ক হলে বিভ্রমে পড়তে হয়। জীবনানন্দ যেমন এগল্পে, ঘটনার সূচনাকাল একবার লিখেছেন "সময় বেলা প্রায় আড়াইটে।" অন্যত্র লিখেছেন "সকাল সাড়ে দশটা বেজেছে"। ভালো সম্পাদনার অভাবে এই ভুল সংশোধিত হয় নি।

লেখক সিদ্ধেশ্বরের অনুরাগী অনুকারী চরিত্র হিসাবে শৈলেন মজুমদার এবং তার বন্ধু বিমল চরিত্র যথাযথ হয়েছে।

'এক এক রকম পৃথিবী' জীবনানন্দ সমগ্রের একাদশ খণ্ডের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে ১৯৩৬ সালের তৃতীয় খাতার এটি প্রথম গল্প।

রোজকার মত অবিনাশ ছোঁড়া পাঞ্জাবি পরে সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছিল। ডান হাতের আস্তিন ছেঁড়া কিন্তু স্ত্রী সেলাই করে দেবে না। অবিনাশের 'পঞ্চাশ টাকা মাইনের জ্যালজেলে চাকরির জমিন' নিয়েই টানা হেঁচড়া করবে। হাসপাতালের পাশের রাস্তা ধরে চলেছিল সে। লোহার খাটে রোগীরা শুয়ে আছে। অবিনাশ কি এমনি শুয়ে থাকতে, মৃত্যুর সঙ্গে সেতু তৈরি করতে চায়?

কলেজের প্রফেসর দুজন, পুরানো ক্লাশমেট হরিলাল, এমন কি সরোজবাবু তাকে দেখেও দেখতে চাইল না। অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবিনাশ চোখে দেখে কম। পথচারীর গায়েরা উপর পড়ার জন্য তাকে দোষী করে। পথে সাহেবদের মোটর যেন ডানা মেলে পাখির মত ওড়ে। অবিনাশ ভাবে মানুষের সভ্যতা শিক্ষাদীক্ষার ভিতর মোটরের কোনো স্থান নেই। কিন্তু পথচারী কুঞ্জবাবু তার ছেঁড়া পাঞ্জাবি নিয়ে মন্তব্য করলেও অপ্রতিভ হয় না অবিনাশ। তাকে লোকটি পথে বা ফুটবলের মাঠে কখনো দেখেনি।

দুজনে ঘাসের উপর রুমাল পেতে বসল গল্প করতে। অবিনাশ বিড়ি তামাক খায় না। কুঞ্জবাবু ভেবেছিল মামদ আলির গল্প করবে। কিন্তু সে মামদ আলিকে ঠিকমত চিনতে না পারলে অবিনাশের পাশে আরেকজন পরিচিত লোক রামজীবন এসে বসে— আশ্চর্য হয়। মহম্মদ আলি হিঁদারামকে সে চেনে না? এখনই তিনজন মানুষ, একজন অবিনাশ সেন, দ্বিতীয়জন নিকুঞ্জও নয় কুঞ্জ, তৃতীয়জন রামজীবন, চেনা অচেনা সন্দেহের অন্ধকারে গল্প করে।

যেন নক্ষত্রের থেকে নেমে এসেছেন, পৃথিবীর সঙ্গে কারবার নেই, কলকাতায় গেলে ট্রামচাপা পড়লে সৌভাগ্যই হতো, কিন্তু মহিষের গাড়ি চাপা পড়ে ফিরে

এসেছেন। কেমন যেন ভৌতিক পৃথিবীতে এসেছেন ওরা, পাকুড় গাছটা আর অন্ধকার এর জন্য দায়ী। অন্ধকার সম্পর্কে অবিনাশ কি বলেন শুনতে চান কুঞ্জবাবু। বিড়ি জ্বালিয়ে মহম্মদ আলি হিঁদারামকে স্মরণ করে পরিচয় জানতে চান অবিনাশের, অবিনাশ কোনো পুরানো বনেদী বংশ নয়, কুটি সাগরের পাশের দরদালান সংলগ্ন বিশকাঠা জমি তাদের নয়—গরিব মানুষ অবিনাশের বাবা মারা গিয়েছিলেন তার জন্মের আগে। নওয়াজপুরের রাস্তার পাশে এক পুরানো ভাঙা দালান, যাতে শিউলি আর কামিনী ফুলের গাছ। লোকজন খুব কম। সেদিকে বরং সাপ বেশি। সাপ মারেন না অবিনাশ, সুন্দর শরীর রূপমতীদের সঙ্গে তুলনীয় সাপিনীদের জন্য কামনা জাগে। বংশানুক্রমে এখানেরই বাসিন্দা তারা। রামজীবনরা দশবছর এখানে এসেছে শুনে হেসে অবিনাশ বলে সে কত দশ হাজার বছর তাদের বাড়িতে কাটিয়ে দিচ্ছে। শুনে চমকে ওঠে কুঞ্জরা। অবিনাশ বলে, “এমন এক-একটা দিন আসে রামজীবন, সকাল থেকে রাত গভীর পর্যন্ত যার পরমায়ু দশহাজার বছরের কম নয়।” কুঞ্জ ও রামজীবনের সন্দেহ হয়। অবিনাশ মানুষ কিনা? রাত বেশি হয় নি। পাকুড় গাছ আর ভূতের থেকে ঢের দূরে বরং নক্ষত্রের নিকট বসে ওরা কথা বলছে যেন, এই পৃথিবীর ভিতরে পেঁয়াজের খোসার মত আরো অনেক পৃথিবী আছে। অবিনাশ যেন তেমন কোথাও ঢুকে পড়েছে। এক এক জনের এক এক রকম পৃথিবী। বৈষয়িক পৃথিবী ছাড়িয়ে অবিনাশ রূপসীকে দেখতে পান সুন্দরী সাপিনী হয়ে হাজার বছর অন্ধকারে খেলা করতে। ধূসর পালঙ্কে জড়িয়ে রয়েছে কুঞ্জ আবার নামজাদা খেলোয়াড় মহম্মদ আলিকে খেলতে দেখে আনন্দ পায়। সে আবার চাকরিও পেয়েছে খেলার জন্য। আজ নয়, রিটায়ার করার সময় হলো।

অবিনাশ নিজের চাকরি প্রসঙ্গে রামজীবনকে জানায়, সাহেব সাগরের ধারে যে পুরানো দালান বাড়ির ও জমির কথা হচ্ছিল সেটা হলো উইলসন সাহেবের জমি ও বাড়ি। যেন পোড়ো বাড়ি কিন্তু পোড়ো নয়, উইলসন সাহেব এখনো ওখানে আছেন। শিক্ষা দপ্তরে বড় কাজ করতেন। অবিনাশ তাঁকে বাংলা শেখাতেন। তিনি বাংলা শিখে গেছেন, কিন্তু অবিনাশের চাকরি যায়নি। এখন উইলসন পাদ্রী হয়েছেন। কতকগুলি বাছাই ইংরেজি বইয়ের বাংলা অনুবাদ করতে হয় অবিনাশকে এখন।

এক একজনের এক এক রকম জীবন, সাপে কেটে কেউ ভাবে জীবন ঠাণ্ডা হবে, আত্মা শান্তি পাবে, কেউ ভাবে আষাঢ়ের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কোনো মানুষী রূপসীকেই দেখছে হয় তো গোখুরা নারী হাজার বছর পৃথিবীতে খেলা করছে যেন।

রামজীবন জীবনের ঐ রহস্য ধরে ফেলতে আগ্রহী নয়—সে বরং জানতে চায়, সাহেব কি কি বই অনুবাদ করতে দেন তাকে। সাহেবের ৭০ বছর বয়স, জাতিতে আইরিশ, বিলাতে ক্বচিৎ যায়, তার মেম মারা গেছে, আর তিনটে ছেলেও যুদ্ধে মারা গেছে। তার বাড়িও যেন প্রেতাত্মার প্রাসাদ। কিংবা অবিনাশের সাপিনীর আস্তানা, ঘুরে ফিরে সাপিনীর প্রসঙ্গেই ফিরে আসে ওরা আবার।

রামজীবন প্রশ্ন করে অবিনাশ বিয়ে করেছে কিনা? করেছে জেনেও বিশ্বাস করে না

কুঞ্জ। বউ থাকলে ছেঁড়া পাঞ্জাবি রিফু করে দিত নাকি সে? হয়তো সাপিনী নিয়েই ঘর করছে অবিনাশ।

রামজীবনের মনে হয় হয়তো অবিনাশের স্ত্রীও তার মতোই কোনো সর্পরাজ অজগরের জন্য হাজার হাজার বছর এই পৃথিবীর কিনারে অপেক্ষা করে আছে। আশ্চর্য কিছু নয়। মানুষের মনের ভিতর থেকেই ঝিনুক, কড়ি, কার্তিকের কুয়াশা, সাপ, মেয়েমানুষ এইসব নিরর্থক বস্তু সৃষ্টিই করে না কেবল, যেন আত্মীয়তা সূত্রে গেঁথে দেয়। প্রেম অশান্তি বেদনা ও স্বপ্নের জন্ম দেয়। অবিনাশও একদিন দিঘির জল হয়ে যাবেন ঝিনুক, কড়ি, সাপিনীর আরেক পৃথিবী থেকে কিছুতেই আর ফিরে আসতে চাইবেন না।

জীবনানন্দের এই পর্যায়ের গল্প ক্রমশ বাস্তবতার পরিধি ছাড়িয়ে রহস্যময় অতি বাস্তবতার আলোছায়া মেখে রূপকথার কল্প জগতের বস্তু হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যায় আলোছায়ায় অচেনা আধচেনা জীবন ও মৃত্যুর ধূসরতা মাখা বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমারেখায় অবস্থিত এই ধরনের কাহিনী জীবনানন্দের চার পাঁচবছর আগেকার বাস্তব পরিবারনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আবেগঘন বেদনামথিত কাহিনী নয়।

'বাইশ বছর আগের ছবি' জীবনানন্দ সমগ্রর একাদশ খণ্ডের গল্প। তৃতীয় খাতার দ্বিতীয় গল্প, আত্মজীবনীর প্রতিভাস আছে এ গল্পে। কিছু মিলও আছে।

রোজকার মতই টিউশন সেরে খানিক রাতে দ্বিজেন বাড়ি ফিরলো ঘরে ঢুকতেই হোঁচট খেল সে। স্ত্রী পটেশ্বরী বা চাকর প্রিয়নাথের সাড়া মিললো না। আগে হলে মাথা গরম হতে' দ্বিজেনের। একটা চেয়ারে বসে প্রিয়নাথকে নরম সুরে ডাকলো। দেখলো প্রিয়নাথ ঘুমুচ্ছে বারান্দায়। চুরুট জ্বালালো দ্বিজেন। মেয়ে পাঁচবছরের মঞ্জুকে ফেলে কোথায় গিয়েছে পটেশ্বরী। মেয়ের গায়ে চাকা চাকা মশার কামড়ের দাগ হয়তো। তার কাঁথা ভিজে, অন্য কাঁথা পাওয়া গেল না। পটেশ্বরীর শাড়িতে হাত দেওয়া চলবে না। নিজের পাঞ্জাবিটা পেতে দিল দ্বিজেন। রোগা মেয়েটাকে মশারি টাঙিয়ে দিল। পটেশ্বরী হয়তো গিয়েছে হরি সংকীর্তনে।

অন্ধকার ঘরে বসে রৌদ্রময়ী অতীতের গল্প মনে পড়ছিল দ্বিজেনের। ১৯৩৪ সালে হেডমাষ্টার মশাই তাকে দেড়মাস পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে দুপুরবেলা বটতলায় কুল তেঁতুল খাবার জন্য সময় নষ্ট করার জন্য ধমক দিলেন। দ্বিজেনের কাকার কাছে শুনেছেন এসব। বারণ করছিলেন কবিতা লিখতে, 'তুমি হয়তো কোনোদিন কবি হতে পারবে না, পরীক্ষার একমাস আগে কবিতা লেখায় ক্ষতি হয় না?' হেডমাষ্টার বলেন 'তুমি একটা স্কলারশিপ পাবে আশা করি আমরা, অঙ্কে কিছু কাঁচা আছো। দুপুর বেলা মথুর বাবুর কাছে অঙ্ক কষো।'

কয়েক বছর পরে, দ্বিজেনের কলেজে পড়া শেষ হয় নি। কবিতা অনেক লেখা হয়েছে, ছাপানো হয় নি, লিখেই সুখ, একটা ইংরেজি পত্রিকা বার করেছিল। তাতেও প্রকাশ করে নি নিজের কবিতা। সম্পাদকীয় কয়েকটি মন্তব্য লিখেছিল কেবল। দ্বিজেন চেয়েছে কলকাতার একটেরে ধূসরবাড়ি, নিরালা জীবন, প্রচুর বই, রাতের বেলা ল্যাম্প। আচমকা হৃদয়ের সবুজ প্রেমের জন্ম হয়েছিল।

চপলার মামা চপলা আর মেজদিকে বাগেরহাটে তার এস.ডি.ও. বাবার কাছে যাবার পথে সঙ্গী হতে বলেছিল। মেজদি সেকেণ্ড ক্লাসের দরজা খুলে দিয়েছিল। দ্বিজেন যেন ভিতরে আসে, বেহুঁশ মহিলাটি হ্যাণ্ডব্যাগটি হারিয়ে, দ্বিজেনকে বুকিং অফিসে খুঁজতে পাঠাচ্ছিল কিন্তু হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল বালিশের নিচে। চপলার সঙ্গে কথা হয় নি একবারও, তবু প্রেম এসে দ্বিজেনের হৃদয়ে হাত রেখেছিল। বুঝেছিল মেয়েটির রূপ অন্ধকারে ঘুমের ভিতরেও দ্বিজেনকে বেদনার গভীরে জাগিয়ে রাখবে।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টাখানেক দেরি ছিল, মেজদি তাকে সেকেণ্ড ক্লাশে বসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার ফাঁক দিয়ে চপলার চোখ, তবু চোখাচুখি হলো না। মেজদি বলল—আপনার তো বনগাঁয় যাবার কথা। দ্বিজেন জানালো মামার নির্বন্ধে সে বাগেরহাটেরই টিকিট কেটেছে। মেজদি খুশি হলো, সকালবেলা খুলনা পৌঁছাবেন, তারপর ষ্টিমারে রূপসা পার হতে হবে। চপলাকে কিন্তু টাইমস অফ ইণ্ডিয়াই অধিকার করে আছে। দ্বিজেন কি ভেবে বনগাঁতেই নেমে পড়ল। মেজদি এতক্ষণ বড়াই করছিলেন কলকাতা থেকে জলন্ধর পর্যন্ত একা গিয়েছি। তিনিই এবার সুর পালটে বললেন, 'মামাবাবু বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই, কোনো মানুষের অপেক্ষা রাখি না আমরা, তাই বলে বনগাঁয় সটকে যেতে পারবেন না।' চপলা শুধু বললে 'কিন্তু দ্বিজেনবাবু, কালভোরে খুলনায় আপনাকে দেখতে পাবই বলে জানলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন।' দ্বিজেন মনে মনে বলল, 'দ্বিজেন চাটুয্যে সে জাতের ছেলে নয়। খুলনায় তাকে কোনোদিনই খুঁজে পাবে না। চলেই যাচ্ছিল। গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে হঠাৎ ফিরে এসে গাড়ির হাতল ধরে ঝুলে পড়ল। 'আচ্ছা বেকুব মানুষ তো, এখুনি কাটা পড়তেন।' গোটা চারেক মানুষের হাত দ্বিজেনকে ভিতরে টেনে নিল। কিন্তু তার সুটকেশটা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে গেল। খুলনা স্টেশনে ভোরে দ্বিজেনকে দেখল ওরা। জিজ্ঞাসা করে জানলো, দ্বিজেনের সুটকেশটা বনগাঁয় রেখে এসেছে। দীর্ঘ শরীরের গৌরব আর ঐশ্বর্য নিয়ে চপলা রাজহংসীর মতো চলেছে গম্ভীর কঠিনতার সঙ্গে। গাঢ় এই রূপসী তবু যেন বাংলায় জন্মায় নি, জন্মাবে না।

ফেরি ডেকে এসে দ্বিজেন ফিরে গেল। কলকাতায় গিয়ে দ্বিজেনের মনে হলো বাগেরহাট গেলেও হতো। সবই হয়তো জমে উঠতো ক্রমে ক্রমে। পরে দ্বিজেন ভাবলো, চপলা যদিও মুসৌরি, আলমোড়া ভাওয়ালি পাহাড়ের পাইন অরণ্যের মতো আর দ্বিজেন বাংলার ঘাসের মতো! তবু চপলাকে পেতে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি চাই। জানতো এ ভুল পথ, তবু নেশার মতো। কিন্তু চপলার সঙ্গে দেখাও হলো না আর, মেজদির পোস্টকার্ডের উত্তর দিতে গেল না। এম.এ. পরীক্ষায় ফল হলো থার্ড ক্লাস। শহরের মেসে থেকে পড়া চালায়। দেড় মাস দাড়ি কামায় নি। বাড়িখানা যেন তুতেন খামেনের কবর। পড়ছে, কিন্তু পরীক্ষা দেবার মতলব নেই। বন্ধু সিদ্ধেশ্বর নিজে থেকে তাকে ব্যাঙ্কে একটা ১৫০ টাকা মাইনের চাকরি দিয়ে গেল। কাজও করছিল চমৎকার। চাকরির ভবিষ্যৎও ভালো। তবু হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল দ্বিজেন।

প্রাইভেট কলেজে চাকরি পেয়েছিল। মনোমতো কাজ। নামজাদা এক ব্যারিষ্টারের

সুপারিশে চাকরি হয়েছিল। কিন্তু চাকরি গেল। প্রিন্সিপ্যালের মতে দ্বিজেন কবিতা লেখে এটা তার অপরাধ। প্রিন্সিপ্যাল ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছাড়া বিশ্বে আর কাউকেই কবি মনে করেন না, পড়েনও না। তাই ব্যারিষ্টারের মৃত্যু হলে, দ্বিজেনের চাকরি গেল। নিজের বই বিক্রি করে চালালো কিছুদিন। টিউশান নিল দু তিনটা অল্প টাকায়। অবস্থা এমন ঝাঁকা মুটেদেরও ঈর্ষা করে দ্বিজেন। সহপাঠী বন্ধু জিতেন অক্সফোর্ড ডক্টরেট, বর্তমানে প্রিন্সিপ্যাল একটা কলেজের। জিতেনকে বলে কয়ে নিয়োগ পেয়েছিল সে। কিন্তু কলেজ সেক্রেটারি বাঙালী বলে তাকে বরখাস্ত করতে বললেন। অপমানিত জিতেনও কলেজ ছেড়ে চলে গেল।

জিতেন বিয়ে করেছিল চপলাকে। দ্বিজেন চপলাকে দেখে নি। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে চাকরি শুরু করার ছমাস পরে নিউমোনিয়ায় মারা গেল জিতেন। তার তিন মাস পরেই এক মাদ্রাজি খ্রিষ্টানকে বিয়ে করেছিল চপলা। কলকাতার রাস্তায় মামাবাবুর মুখে এখবর পেয়েছিল দ্বিজেন।

রাত প্রায় বারোটা। প্রিয়নাথ বারান্দায় নেই, পালিয়ে গেছে তখন। পটেশ্বরী এলো কই। পটেশ্বরী ফিরে না আসুক এ বাসনা দ্বিজেন বহুবারই করেছে। ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দেখলো ভাঁড়ার ঘরের মেঝেয় পটেশ্বরী, শুয়ে, ঘুমোয়নি, কাঁদছে। 'কাঁদছো কেন?' উত্তর নেই। পটেশ্বরী দীর্ঘদিন বাঁচবে, ব্যথা পাবে, ব্যথা দেবে। দুজনের কেউ মরবে না। দ্বিজেন কাঁদে না, কেঁদে কি লাভ? জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস নিস্তব্ধতা।

তবু রোজ সকালে জীবনের যত মৃতধ্বনি, মৃত কথা, মৃত মুখ খুঁজে ফিরবে আবার। নিয়ত পরিবর্তনশীল বাস্তবতা, এসব গল্পের রহস্যের ভিত। এই দেখছি, এই নেই, এই ছিলনা, এই রয়েছে যেমন, এগল্পে প্রিয়নাথ, পটেশ্বরী। অথচ কল্পনার, স্মৃতির, বিগত অতীতের অকল্পনীয় ধূসরতার জগত-ই এই গল্পে যেন সত্যতর। দ্বিজেন ও পটেশ্বরী বুঝেছে তারা আছে তাতে সুখ নেই, সম্ভাবনা নেই বেদনা আছে। তাদের কাছে হারানো বিলুপ্ত স্মৃতির জগৎই মুখ্য অবলম্বন।

জীবনানন্দ সমগ্রর একাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ১৯৩৬ সালের চতুর্থ খাতার প্রথম গল্প **'কবিতা আর কবিতা, তারপরেও আবার কবিতা'**।

দশ বারোদিনের মধ্যে S-এর কাছে আবার গেল লেখক। S-কয়েকদিন মফঃস্বলে কাটিয়ে সেদিন এগারোটায় ফিরেছে। S-কবি, তার খবর কাগজে বেরোয় না। লেখক এক ইংরেজি কাগজে সপ্তাহে দুটি করে আর্টিকেল লিখতো, চোখ খারাপ বলে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। চল্লিশ টাকা দিত কিন্তু তার জন্য দুটি আর্টিকেল লিখে দেবে এমন লোক খুঁজে না পেয়ে ছাড়তে হলো ঐ কাজ। সবাই ব্যস্ত, কে অন্যের জন্য খাটবে।

S-ইংরেজিতে কবিতা লিখতে পারে। নিজের বাংলা গল্পের অনুবাদও করে, কিন্তু খবরের কাগজের ইংরেজি বা বাংলা লিখতে পারে না। লেখককে চোখ দেখানোর, চশমা নেবার, সানগ্লাস পরার পরামর্শ দিল S। তার নিজের চোখ খুব খারাপ। হয় তো বুড়ো বয়সে সে অন্ধ হয়ে যাবে ; কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা করতে তার ভালো লাগে না।

টি-পটে ছ সাত কাপের মত চা ভিজিয়েছে S, কড়া লিকার। দুধ নেই, লেখক মাত্র এককাপ খাবে। S বলে তার মত কবিতা অনবরত লিখলে এমন চাই খেতে হবে

লেখককে, আজ বউনি করুক। S বাধ্য হয়ে মিষ্টি কম খায়। কোনোদিন চিনি না কিনে দুধ কেনে, কোনোদিন দুধ না কিনে চিনি।

লেখক জানতে চায় এত অভাবেও S উপন্যাস লেখে না কেন? S বলে উপন্যাস লিখতে হলে অনেক কাগজ কিনতে হতো। টাকা তো আর পেতো না। বরং দুধ কেনা যাবে ঐ টাকায়। লেখকের ধারণা S উপন্যাস লিখেছেন জানলে প্রকাশক টাকা দিয়ে কপিরাইট কিনে নেবে। উত্তরে S বলে, তাই যদি হয় তবে তার ছাপানো উপন্যাসগুলোর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না কেন? বাংলা ভাষায় লিখে সে কমই টাকা পেয়েছে। গল্প বলতে ভালোবাসলেও গল্প লিখতে ঢের সময় লাগে। স্ত্রী নেই—বাধা দেয় না কেউ যদিও। একটা বাংলা উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করতে পাঁচবছর লেগেছে তার, তার কারণ অলসতা নয়—অসাধ। যে জিনিস ভালো লাগে না তা পড়ে থাকে। ঐ অনুবাদ দশ বছর আগের কথা, ম্যাকমিলান পাঁচ হাজার দিয়েছিল বইখানার জন্য। অর্থাৎ বছরে একহাজার পড়লো। কলকাতায় এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা মাসে আটশো টাকা পায়। S এর সাংসারিক জীবন কোনো প্রলোভনের জিনিষ নয়। লেখকের তবু মনে হয় S এর তবু আরেকখানা উপন্যাস লেখা উচিত ইংরেজিতে। S একথার অর্থ করেন তার কবিতা সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের অশ্রদ্ধা, তিনি তাতে রাজি নন, যদি উপন্যাস তিনি লেখেন বাংলায়ই লিখবেন। বাঙালি তিনি, ইংরেজি সাহিত্যে লিখবেন কেন, টাকা দেয় অবশ্য, কিন্তু টাকার জন্য বেঁচে আছেন মনে করেন না। বেঁচে আছেন সৃষ্টির জন্য, তাঁর কবিতা তাঁর হৃদয় থেকে জন্মায়, গল্পও হয়তো জন্মাবে একদিন।

S চা খান প্রচুর। তিনি লেখককে পরামর্শ দেন চশমা নিয়ে আর্টিকেল লিখতে। কিন্তু লেখক ঐ তামাশার কাজ আর করবে না। তার ভালো লাগে কলকাতার কোনো নির্জন কিনারে, টেবিল চেয়ার কার্পেট, দরকার মতো অজস্র বই, সারাদিন লেখাপড়া চুরুট টানা। তা সে কোনোদিন পাবে না, কখনো কলকাতায় কখনো মফস্বলে, কখনো মাষ্টারি কখনো জার্নালিজম, ৪০্ ছেড়ে ৬০, তা ছেড়ে ৪৫্ টাকা এমনি করেই দিন কাটবে তার!

ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, আই, সি, এস, দেরাদুনে বাড়ি, বালিগঞ্জের প্রাসাদে সুন্দরী স্ত্রী কোনোদিন মিলবে না। যেখানেই থাকবে রাত আসবে, একটা বাতি জ্বেলে এক আধটা কবিতা লিখবে। সমস্ত দিনের অনুষঙ্গ পুড়ে যাবে। এমনই পুড়ে গেছে অনেক দিন, দূর আকাশের নক্ষত্রের রূপালি আগুন।

S বললেন, কবিতা লেখা ছেড়ে, চোখ দেখিয়ে গিরীন্দ্রশেখর বাবুর কাছে মাথা দেখাতে পার।

S এর মতে কবিতার অনুষঙ্গ আর পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য পৃথক জিনিস, পার্থিব প্রতিষ্ঠা আত্মতৃপ্তি দেয়। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর, স্কুলের সেক্রেটারি, তাসের আড্ডা বসানো, স্ত্রীকে চাবুক মারা, নানা রকম জানোয়ারের মাংস খাওয়া—এ এক। কবিতা বা সৌন্দর্যকে সাহিত্যসভার থেকে জীবনের ভিতর টেনে এনে বসানো যায় না। S কখনো চাকরি করেন নি। খোঁজেন নি। মুচি ছুতোর কুমোর যেমন জাত ব্যবসা করে, তেমনি অফিসের

স্বপ্ন দেখেন না। মন মাঝে মাঝে কামড় দেয়। মনে হয় বাদলের দিনে তেতলার ড্রইং রুমে থাকতে পারতুম, কেউ পা মালিশ করে দিত, বিয়ে করতুম আবার, কোনো কলেজে কাজ পেলে নিই।

লেখক প্রশ্ন করে দরখাস্ত দিলেই কি প্রফেসারি পেতেন তিনি? S বলেন, 'তা পারি, আমি খুব জোগাড়ে মানুষ।' ডিগ্রি নেই, অনারারি ডিগ্রির ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। কিন্তু গত দশ বছরে যে কবিতা লিখেছেন তা ছাপাতে যাবেন না আর। তার শেষ চারখানা কবিতার বই যা দুর্ভাগ্যক্রমে বেরিয়ে গেছে—সেগুলো যাতে প্রচলন আর না হয় সে সম্পর্কে সচেষ্ট থাকতে হবে। কেননা এসব বই আমি ঈশ্বরের সমক্ষে বসে লিখেছি। টি. এস. এলিয়টের মুখ মনে করে নয়, আকাশ বাতাস পাখি প্রাণী নক্ষত্রের স্পন্দন আমার জীবনকে নাড়া দিয়ে এসব কবিতার জন্ম দিয়েছে। এসব কবিতা এখনকার শিক্ষা ও উৎকর্ষের কাছে মৃত জিনিস। হয়তো সোয়াশো বছর পরে, আমি তখন অনেক দিন মরে গেছি—এ কবিতাগুলো পরিস্ফুট জন্ম নেবে, অধ্যাপকরা ক্লাসে পড়াবেন। ছেলেরা তারিফ করবে। এসব আমি অনেক দিন থেকেই জানি।

S বললেন, আমি যদি আর কবিতা না লিখি তাহলে এই ৫৮ বছর বয়সেও একটি ৪০ বছর বয়সের বিধবার মন সুস্থ রাখতে পারবো আশা করি। এরপর যদি হাতে টাকা ও স্ত্রী আসেও কেবল দাবা খেলে পান খেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব না, থিওজফি নিয়ে থাকবো।

এমন সময় একটা মোটরে এলেন খুব দামি পোশাক পরা এক ৩০/৩৫ বছরের এক মহিলা, কমলা বললেন, কবিতা কেউই পড়ে না বরং কবচের বিজ্ঞাপন পড়ে। আপনারা এক অধম জিনিস নিয়ে জীবন খুইয়ে গেলেন।

S বললেন 'না, আর খোয়াব না, এবার হরকান্তবাবুর মতো হবো, বিয়ে করবো। তারপর জানালেন চল্লিশ বছরের এক বিধবাকে বিয়ে করে থিওজফি পড়বেন।

বিয়ে যাকে খুশি করুন থিওজফি পড়বেন কেন?

'অতীত জন্মে শুধু কবিতা লিখেছি না, তোমার মত রূপসীকে পেয়েছিলুম? মনে হয় পেয়েছিলুম। ভাবী জন্মে পাবো কিনা, না বেতের ফলের সঙ্গে ম্লান চোখের তুলনা দিয়েই কবিতা লিখতে হবে আমাকে এসব জানতে।'

'একটি বিধবা বিয়ে করবেন শেষ পর্যন্ত?'

এইবার জৈব তৃপ্তিতে কাটবে আমার, কবিতা লেখা ছেড়ে দেবো। স্ত্রী ছাড়াও আরো একটা গভীর আকর্ষণের জিনিস নিয়েও থাকবো, আমার চুল প্রায় পেকে এসেছে। এখন পাকা লম্বা দাড়ি রাখবো, আমার অতীত জীবনকে অস্বীকার করবো। যারা কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে বাঁচে, বক্তৃতায় প্রবন্ধে তাদের নির্যাতন করবো। একটা অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি জোগাড় করে ইউনিভার্সিটির খুব বড়ো মানুষ হয়ে উঠবো। কবিদের মধ্যে একমাত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর ঈশ্বর আমার সঙ্গী হবেন। আটান্ন বছর কবিতা লিখে যে সম্মান পেয়েছি, তিনবছরেই তার চেয়ে সহস্রগুণ গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে পারবো। আমি প্রায় পনেরোটি সন্তানের জন্ম দেবো।

কমলা হরকান্তবাবুর গল্পটা শুনতে চাইল। S জানালেন হরকান্ত একজন মানুষ। সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কমলা জানালেন। তাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে ৬টায় তেতলায় মজলিশ বসবে। শ-তিনেক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আসবেন। সেখানে কবিতা পড়তে হবে S-কে। তিনি জানালেন যেখানে উমাশশীর অভিনয় হলেও চলত বরং তাই-ই ভালো হতো, সেখানে গিয়ে তিনি কবিতা পড়বেন না। তাঁর কবিতা কেউই পছন্দ করে না, এতদিন কেউ তাকে জুতো ছুঁড়ে মারে নি এই আশ্চর্য। তিনি কমলাকে পরামর্শ দিলেন। 'আমাকে বাদ দিয়ে মজলিশটাকে বাঁচাও। আমি তো ওটাকে গুঁড়ো করে মেরে ফেলতাম।'

'মেরে তো ফেলেছেনই—'

প্রার্থনা করো রাস্তার (লোক) যেন আমাকে শুয়োর মনে করে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেয়। কমলা বললো 'তাহলে উঠি সকলকে ফোন করে দিই গিয়ে, S-এর অসুখ তিনি আজ আসবেন না।'

S বললেন—'বেশ তো বলো গিয়ে, তাতে লোক বাড়বে, কমবে না।' চামড়া কেটে ছবি আঁকছিলেন তিনি।

কমলা—'না, আমি বলে দেবো আজ সভাই হবে না।

লেখক তাকে পরামর্শ দিলেন, উদয়শঙ্কর কলকাতায় আছেন, আপনি ডাকলে তিনি আপনাদের সভায় আসতে পারবেন।'

কিন্তু কমলা তো সে উদ্দেশ্যে সভা ডাকেন নি। তিনি রাজি হলেন না।

S বললেন 'উদয়শঙ্করকে পাওয়া শক্ত কমলা।' অর্থাৎ এ সুযোগ যেন কমলা না ছাড়েন। কমলা শুধু বললেন 'আপনাকে পাওয়া আরো শক্ত।'

'মানুষ অমানুষ' 'কল্লজিনিশের জন্ম ও যৌবন' প্রভৃতি কাহিনীর মতো এটিও একটি বিচিত্র খেয়ালি বয়স্ক কবি বা লেখকের স্বভাব চারিতার কাহিনী। এখানেও এক সুন্দরী যুবতীর মুগ্ধ আন্তরিকতা, হয়তো প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা দেখা যায়। তাতে গল্পের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি হয় বটে কিন্তু ছোটগল্প হিসাবে পূর্ণতা পায় কিনা সন্দেহ।

জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃত মূল্যায়ন যে তাঁর সমকালে হয় নি, তার বেদনা যেমন অব্যক্ত নেই। তেমনি ভবিষ্যৎকালে হবে সে প্রত্যয়ও এই গল্পে এবং আরেকভাবে 'মনোবীজ' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে।

'কুড়ি বছর পরে' একাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ১৯৩৬ সালের চতুর্থ খাতার দ্বিতীয় গল্প।

সেদিন প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যায় তাসের আসর না জমিয়ে চার প্রাক্তন সহপাঠী বন্ধু শিবরাম, নীরেন, পীতাম্বর আর অনিল কৈশোরের দিনগুলির কথা স্মরণ করছিল, স্কুলের হারানো দিনগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসেছিল তাদের কাছে। তারা চারজনেই গত বাইশ বছর ধরে চাকরি নিয়ে এই শহরেই একত্র আছে। মৃত হেডমাষ্টার মশায়ের স্নেহের কথা মনে পড়ছে, কিছু সহপাঠী বন্ধুর কথা, পীতাম্বর হেডমাষ্টার মশাইর খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। স্বভাবতই সে একটু বিচলিত। অতীত কখনোই মরে না—তারা ভাবছিল। বাইশ বছর আগের দিনগুলো স্মৃতির মধ্যে একই আছে—তারা চাইলেই ফিরিয়ে আস্বাদ করতে পারে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। আলো নিভিয়ে তারা মনে করছিল কৃতী সহপাঠীদের কথা।

ঈশ্বর বর্মা, বাঙালী কি বিহারী সন্দেহ আছে তাদের। যুদ্ধের সময় চামড়ার কারবারে নেমেছিল। কলকাতার মস্ত তিনখানা বাড়ি। নীরেনের এই সংবাদে সন্দিহান পীতাম্বর জানালো চিরকালের চালবাজ ছেলে বর্মার জীবনে কোনো সার জিনিস ছিল না—এরা সংসারের কাছেও মার খায়। বর্মার বর্তমানে আড়াই লাখ টাকা দেনা।

নীরেন বললো, বর্মা ছিল যেন এক আগ্নেয়গিরি। তার শক্তি দেবতার মতো না হলেও দৈত্যের মতো নিশ্চয়ই, অমানবিক। তার তুলনায় অনিল নিজেদের তুচ্ছ মাছির মতো মনে করবে।

নীরেন বললো আরেক বন্ধু নরেশের কথা, যে এম.বি. পাশ করে সিভিল সার্জেন হয়েছে। বন্ধুদের সিদ্ধান্ত, শুধু টাকার দিক থেকে নয়—বৃত্তির, হৃদয়ের মহানুভবতার দিক থেকে ডাক্তারিই সব চাইতে ভালো।

অনিল জানালো তাদের সহপাঠী যোগেশ এক ওঁচা ছেলে ছিল, সে সম্ভবত পাঞ্জাবে চাকরি করে।

পীতাম্বর মনে করে, দেশের নাম রাখার, বাইরের পৃথিবীতে ও মনের মধ্যে নানা অদৃশ্য জিনিস রূপ ও আনন্দ আছে তা বোঝার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তাদের ইস্কুলের কোনো ছেলের তেমন ছিল না। অনিল বললে পীতাম্বরের ধারণা কবিতা লিখতে না পারলে বড় হওয়া যায় না। অনিলের আক্ষেপ ১০০ টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে সে পড়ে রইল। অন্যরা তাকে বোঝাতে চাইল, অনেক টাকা উপার্জন করলেও জীবনে আনন্দ থাকে না। আস্বাদের সৌন্দর্য নিয়ে, শান্তি নিয়ে সংসার। তাস খেলাটাই নেশার মতো করে না তুলে পৃথিবীর প্রকৃতির সৌন্দর্য শোভা দেখা, পাখির মত জীবন পাওয়ার এক সার্থকতা আছে।

অনিল অবিনাশ ঘোষালের কথা স্মরণ করলো।

অবিনাশ কলকাতায় পড়তো। ম্যাট্রিক পরীক্ষার চার মাস আগে এ.ডি.এম. বদলি হয়ে এলে তাঁর ছেলে অবিনাশ গ্রামের এই স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছিল। পরে সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিল শিবরামের সঙ্গে। অনিল শুনেছিল সে মিশরে খুব বড়ো চাকরি করে। নীরেন শুনেছিল অবিনাশ কনসুলেটে কাজ করে।

সে নাকি সেনাবাহিনীতে ঢুকে লেফটেন্যান্ট হয়েছিল।

অবিনাশ ক্লাসে আসতো স্যুট পড়ে। মফস্বলের স্কুলে বাঙালী ছেলে স্যুট পরার দরকার ছিল না। কিন্তু ওটাই ছিল তার স্বাভাবিক পোশাক। অবিনাশ স্বার্থ বলে কিছু জানতো না। সত্যি কথা বলতে কখনো ভয় পেত না। শোনা যায়, এখন সে বোর্নিওতে আছে, প্রাসাদের মতো বাড়ি করেছে।

কুড়ি বছর বয়সে তার পুরুষালি লম্বা চমৎকার চেহারা হয়েছিল। চুপ করে থাকতে পারতো না এক মুহূর্ত। ছুটোছুটি, গ্রাউণ্ডে গিয়ে একলা ফুটবল কিক প্র্যাকটিশ ; স্কুলে নূতন ক্রিকেট খেলার দল সৃষ্টি ও ক্রিকেট খেলার নেশা ধরিয়ে দেওয়া, এই সব তার কাজ। দুরন্ত ছিল বটে—কিন্তু নীচ অন্যায় বা নিষ্ফল কোনো কাজ সে করতো না।

অন্যেরা ছিল নিরীহ বাঙালী সুলভ হতাশাভরা। কিন্তু অবিনাশ ব্রাহ্মণের ছেলে

হলেও কে জানে তার রক্তে বোধহয় পর্তুগীজ বা ওলন্দাজ রক্তের মিশেল ছিল। মননের পৃথিবীকে বরাবর এড়িয়ে চলতো অবিনাশ। চিন্তা, ভাব, নিস্তব্ধতা, স্থিরতা এসব ছিল না তার স্বভাবে। বিরক্ত বন্ধুরা তাকে বিলিতি কুকুর ভাবতো।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় শিবরাম একদিন অবিনাশের সঙ্গে ট্রেনে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়েছিল। অল্প কয়েকঘন্টার পথ। অবিনাশ ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলো। শিবরাম তাকে সেই দাম দিতে গেলে রেগে সে পয়সা দূরে ড্রেনের জলে ফেলে দিল। তখুনি অন্যায় হয়েছে বুঝে ড্রেনে পয়সা খুঁজতে গেল। পেল না। তখন ক্ষমা চাইল। মুহূর্তেই ভুলে গেল সব। এমনকি শিবরাম সঙ্গে আছে একথা ভুলে অন্যদিকে দৌড় দিল। কয়েকটি রেলের ফিরিঙ্গির সঙ্গে হাসি নাচ ছুটোছুটি করে দৌরাত্ম্য শুরু করে দিল।

শিবরাম তাকে ধুতি পড়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সে সাহেবি পোশাক ছাড়ে নি। ট্রেনে সে এ কামরা সে কামরা অস্থির হয়ে ফিরেছে খাঁচায় বন্ধ বাঘের মতো। এই তার প্রাণধর্ম। ঠিক সাহেবদের মতো বলা চলে না। জার্মানরা দার্শনিক। সে যেন বিলিতি মিলিটারি টিমের এক খেলোয়াড়।

অবিনাশের বোন ছিল না, মা ছিল না। মারা গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মৃত্যু যে নিস্পৃহা বিষণ্ণতা স্থিরতা দেয়, অবিনাশের তা ছিল না। তার আনন্দ যেন জান্তব। প্রভেদ এই, সে কম খেতো। সাধারণ খাবার খেত ; মদ মাংসের আড়ম্বর ছিল না—নারীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না তার। অবিনাশের মতো পুরুষদের মেয়েরা ভালবাসে কিন্তু অবিনাশ মেয়েদের ভিতর যেত না। সাত আট বছরের ছোট ছেলের যেমন নারী সম্পর্কে ভাবনা, অবিনাশের মেয়েদের সম্পর্কে তেমন ব্যবহার ছিল।

নীরেন বলেছিল, বাঙালী ছেলেরা নারীকে পাক বা না পাক, নারী সকলকেই ব্যথা দিয়ে যায়। বাঙালী ছেলেরা চিন্তা করে, বই পড়ে বিষণ্ণ হয়। কিন্তু মননের স্তরে পৌঁছনোর কোনো চেষ্টা অবিনাশের ছিল না। নারীর সম্পর্কে আকর্ষণহীন অবিনাশের কোনো কালচার গড়ে উঠবে না। কেননা অনেক নারী বস্তুমাত্র হলেও তারাই পুরুষের জন্য স্বপ্ন ও মনন নিয়ে আসে।

অবিনাশ বই বেশি পড়ত না। কিন্তু পাশ করতো অবলীলায়। সায়েন্স নিয়েছিল সেই বইও কমই পড়তো। কবিতা তার কাছে জার্মানের মতো দুর্বোধ্য। একবার একটা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই কিনেছিল। কয়েক পাতার পরে আর পড়েনি।

অবিনাশ কলকাতায় ল্যান্সডাউন রোডে আছে জেনে একবার শিবরাম সেখানে গিয়েছিল। সন্ধ্যা। গেট খোলা। নীচের তলা সম্পূর্ণ অন্ধকার নির্জন। একপাশের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল শিবরাম। সেখানেও আলো ছিল না। একটা মস্ত ড্রইং রুমের দরজায় নীল ভেলভেটের মোটা পর্দা ঝুলছিল। শিবরাম ভিতরে ঢুকে সোফা ইজিচেয়ার র‍্যাক ইত্যাদি দেখলেও কাউকে দেখতে পেল না। ফিরে আসবে, তখন গম্ভীর কণ্ঠে শুনলো। 'কে তুমি?'

শিবরাম বললো, সে অবিনাশ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ইজিচেয়ারে শীর্ণ লম্বা চেহারা উজ্জ্বল রঙ, ঢিলে পায়জামা মানুষটি জানালো সেই অবিনাশ। শিবরাম

নিজের পরিচয় দিলে অবিনাশ তাকে আরেক সময় আসতে বললো। শিবরাম পরদিন সকালে আসবে জানাতে অবিনাশ বললো, কাল সকালে তার সময় হবে না, তার কি কথা আছে? অবিনাশ বাতি জ্বালাতে রাজি হলো না। বরং তাকে চলে যেতে বললো। বললো আসবার দরকার নেই আর।

'কেন?' বিস্মিত প্রশ্ন শিবরামের।

অবিনাশ জানালো তার কাছে দু একটি পরলোকের আত্মা আসেন। সে তাদের সঙ্গেই থাকে। শিবরাম পরলোকের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলো।

অবিনাশ বললো, ছোট এই পৃথিবীতে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘুরে ফিরে দেখা হয়। কুড়ি বছর পরে যেমন তাঁদের দেখা হলো। 'তোমার কথাও আমার মনে ছিল না। আমার কাছে তুমি মৃত ছিলে। আজ কুড়ি বছর পরে তুমি বেঁচে রয়েছো। মরে কি কিছু?'

শিবরাম বললো, 'না, কিছু মরে না। কিন্তু বাতি জ্বালতে আপত্তি কেন?'

'জ্বেলে কি লাভ?' শিবরাম তার মুখ দেখতে চাইলে অবিনাশ সাড়া দিল না, শিবরাম তার নির্মনন স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানতে চাইল। নিরুত্তর অবিনাশকে বললো, এপারের জীবন নিয়েই বেসামাল আমরা, ওপারের জীবনের কথা ভেবে কি হবে!

অবিনাশের মুখের উপর জ্যোৎস্নায় দেবদারু গাছের ছায়া খেলা করছিল। তার রূপ ভেঙে গেছে ঢের। অন্যদিকে অসামান্যভাবে গড়ে উঠেছে। সে ভ্রূ কোঁচকালেও নরম গলায় বললো, "পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ থাকতে পারে না যার জন্য আলো জ্বালতে হয়। তুমি আমার কাছে থাকো। আমি অনেক জিনিস বুঝিয়ে দেবো। ক্রমে দেখতে পাবে সব। এমন সুন্দর সংসর্গ পাবে যে কিছুতেই পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইবে না তুমি।"

তার কথার করুণ মিষ্টি সুরে শিবরামের হৃদয় কেঁদে উঠলো।

এই গল্প লৌকিক থেকে অতিলৌকিকে উত্তরিত হয়েছে। স্পষ্ট নয় অবিনাশ জীবিত পৃথিবীর, না মৃত প্রেতলোকের বাসিন্দা। এডগার এলান পোর গল্পের মতো অনেকটা। একসময়ে থিওজফির চর্চা খুব হতো এদেশে। অবিনাশ কি তেমনই একজন থিওজফিষ্ট! তার স্বভাবের এই পরিবর্তন কেন, কি অভিজ্ঞতার ফলে ঘটলো তার কোনো ব্যাখ্যা দেন নি লেখক। সব মিলিয়ে গল্পটি রহস্যময় অতি মর্ত্যালোকের বার্তা এনেছে। গল্পটি নিখুঁত না হলেও আকর্ষণীয়।

তুলনীয় বনলতা সেনের 'হাজার বছর ধরে' কবিতার 'বালির উপরে জ্যোৎস্না দেবদারু ছায়া ইতস্তত / বিচূর্ণ থামের মতো দ্বারকায় দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত ম্লান।' এই সব পংক্তি।

জীবনানন্দ সমগ্র একাদশ খণ্ডে আহৃত **'রক্তের ভিতর'** গল্পটি ১৯৩৬ সালের পঞ্চম খাতার প্রথম গল্প।

এ গল্পটি কবির রোমান্টিক মানসিকতার স্পর্শ দিচ্ছে। বাস্তব জীবন-ধর্মিতার নয়, কবিতা লিখতে গিয়ে কবির মানসিক পরিস্থিতি কি হয়, তাঁর সৃষ্ট কবিতা সম্পর্কে পার্থিব প্রতিক্রিয়াই বা কি হয় এসব নিয়ে গল্প।

একটি কবিতা পত্রিকার অফিস থেকে বিনয়ের কবিতা ফেরত এসেছে। অন্যত্র

পাঠায় নি আর। তারপর ক'দিন কাটছে লেখা হচ্ছে না। টেবিলে কয়েকটি না পড়া বই। কিন্তু পড়তে মন বসছে না। হৃদয় ক্লান্ত।

পরদিন একটি কবিতা লিখতে লিখতে বড়ো হয়ে গেল বেশ। কপি করছিলো কবিতাটি। বহুদিনের পুরোনো এক বন্ধু সুহাস এতদিন বর্মায় ছিল, এসেছে দেখা করতে। সে জানে না এর মধ্যে বিনয়ের বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী ও কন্যা মরেও গেছে ইতিমধ্যে। বিনয়ের নিঃসঙ্গ শূন্যতা নিয়ে সুহাস খুব সহানুভূতিশীল। সুহাসের সিল্কের পাঞ্জাবী দামি সিগারেট কেস ; মনে হয় সে অনেক টাকা জমিয়েছে।

সুহাস যেন শূন্যতায় ভাসছে। কোনো কথা শুনছেই না যেন। উত্তর দেবে কী। টাকার মূল্যও নেই তার কাছে। তাই বর্মার ব্যবসা ফেল হলো। সুহাস চায় মানুষকে বুঝতে। তার জীবন, তার কষ্ট অনুভব করতে, সে নানা জায়গা ঘুরেছে হয়তো, কিন্তু বিনয় তার মনে বেদনা পেয়েছে বেশি। বিনয় বলে, নানা দেশ না ঘুরলেও জ্বালা যন্ত্রণা তারাও কম কুড়োয় না। আসলে ও দুটো আর বেদনা পৃথক জিনিস। একটি শরীরের একটি আত্মার অনুভূতি।

সুহাসের কাছে সেই মানুষের দর বেশি যে যত বেদনা পায়। লোক কেউ মাতাল শয়তান হতে পারে কিন্তু ক্ষতবিক্ষত আত্মার ভিতর থেকে যে অদ্ভুত রক্ত ঝরে তাকে ধারণ করতে যে বাধ্য হয় সুহাস তাকে অবজ্ঞা করতে পারে না।

সে এসেছিল একলা মানুষটার কাছে দু দণ্ড গল্প করে মনটাকে হালকা করে নিতে, কিন্তু এসে জানলো বেচারীর স্ত্রী কন্যা মৃত। সুহাস প্রশ্ন করে বিনয়ের স্ত্রী কন্যা, তাদের মৃত্যুর পরে তার কাছে এসেছিল কিনা কখনো। ঘাসের ভিতর শব্দ, মশারি দুলে ওঠা, এমন কোনো খটকা লেগেছিল কিনা বিনয়ের মনে কোনদিন।

বিনয় ভাবে সে হয়তো তেমন ভালোবাসে নি মেয়ে বৌকে, অথবা তারা দূরে কোনো সুন্দর জায়গায় শান্তিতে আছে। কিন্তু সুহাসের বিশ্বাস, এই যে অদ্ভুত বেদনা নিয়ে একা রয়েছে বিনয়। একদিন চমৎকার জিনিস পাবে সব।

বিনয় বলে, স্ত্রী কন্যার মৃত্যুর সময় কাছে ছিল না সে, কলেরায় মারা গেছে তারা। সে স্বীকার করে স্ত্রী কন্যাকে সে প্রায় ভুলেই গেছে, সুহাস তাদের দেখেনি তবু সুহাসই এসে তাদের প্রসঙ্গ তুলল, এখন বিনয়ের বিশ্বাস জীবনের পথে সে ফের কারো দেখা পাবে, সাদাসিধে সেই মেয়েকে ভালবাসবে।

সুহাস মনে করে, বিনয়ের স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু সৌন্দর্য ছিল যার জন্য তাকে মরে যেতে হলো। বিস্মিত বিনয় জানতে চাইল এ সত্য সুহাস কোথায় পেল? সে যদি আবার বিয়ে করে আবার গৃহস্থ হয়? কিন্তু সুহাসের বিশ্বাস বিনয় আবার খুকিকে স্ত্রীকে খুঁজে পাবে। অদ্ভুত বেদনা নিয়ে বিনয় আশ্চর্য মানুষ আজ। তার দর্শন দিনের পর দিন বাড়বে। একদিন আশ্চর্য জিনিস পাবে সব।

সুহাসের কথা শুনতে শুনতে দিনের আলোর মত পরিষ্কার কঠিন সব রং নিভে যেতে থাকে।

জীবনানন্দের এই পর্বের প্রায় প্রতি গল্পেই প্রেত তত্ত্ব ও অলৌকিকতার কথা।

'মনোবীজ' জীবনানন্দ সমগ্রর একাদশ খণ্ডে সংকলিত ১৯৩৬ সালে লেখা মাসের উল্লেখহীন পঞ্চম খাতার দ্বিতীয় গল্প। জীবনানন্দের লেখক জীবনের অভিজ্ঞতার তির্যক প্রকাশ।

নিজের নামটা বদলাতে চায় চন্দ্রপীড়। কিন্তু হয়ে ওঠে নি। তার গল্প লেখার অভ্যাস, কবিতাও। থাকে কলকাতা থেকে দূরে বাংলাদেশের এক কিনারে। নিজেকে প্রশ্ন করে, সে কি পাড়াগাঁর পথে পড়ে রইল। বাংলাদেশের পাঠক তার নাম শোনে নি। শুনলেও মনে রাখেনি। দুটো বই ছাপিয়েছিল সে, গল্পের বই। বই প্রকাশের পর সে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। বইয়ের খোঁজ করে নি। হৃদয়ের বিমর্ষ ইন্দ্রধনু তাকে হয়তো বলেছিল কবিতা লিখতে। মিছেমিছে অবিরাম ঘটনার যোগপূরণ করে কি হবে? ঘটনার ভিতরে যে কান্না আনন্দ বেদনার রহস্য লুকানো তাকে রূপ দিক সে। চন্দ্রপীড় গ্রামে চলে গেল।

যারা চন্দ্রপীড়ের উপন্যাস কিনেছিল উপহার দিতে কেনে নি। মেয়েরা নয়, কলেজের ছেলেরাও নয়। কিনেছিল বয়স্করা। ভিখিরির মতো মানুষ একজন। আমার কাছে চন্দ্রপীড়ের বই আস্বাদযোগ্য মনে হলেও, যাকেই জানিয়েছি সেই ঠাট্টা করেছে। সমালোচক ইচ্ছে করেই এটি গ্রহণ করলো না। প্রচার হলো না। অলস মানুষ চন্দ্রপীড়ের বন্ধুসৌভাগ্য ছিল না। আকাশে বাতাসে যে মনোবীজ ভাসে তা কেন চন্দ্রপীড়কেই হৃদয়ের উর্বরক্ষেত্রে ফসল ফলালো, কেনই বা সেই সোনার ফসল ভুসির বস্তার মতো অবহেলিত রইল তা ভেবে আশ্চর্য হয়েছি। চন্দ্রপীড় এনিয়ে কখনো নালিশ করে নি। ডাকে সে রচনাগুলো পাঠাতো, মাসিকের সম্পাদক এই নির্জনতা প্রিয় মানুষটাকে চোখে দেখেনি।

চন্দ্রপীড় মফঃস্বলে এসে তুচ্ছ চাকরি নিল। আর কবিতা লিখতে লাগলো। এখন আর বইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রইল না তার। সাহিত্যের নতুন সাধকদের সে চিনল না। বাগানে যেমন ডালিয়া রজনীগন্ধা জন্মায় তেমন নয়, মাঠে যেমন ঘাস বা বনে গাছপালা জন্মায় তেমন তার কবিতা, কখনো লম্বা হতো কখনো অতি সংক্ষিপ্ত। চার পাঁচ বছরে গুটি ত্রিশেক কবিতা জন্মেছিল কিনা সন্দেহ। একবারই কেবল প্রায় আড়াইশো লাইনের একটি কবিতা মনে ধরে গেল চন্দ্রপীড়ের আমাকে সে কবিতাটি পড়ে শোনালো। মুদ্রাদোষ ছিল, ভাল পড়তে পারতো না চন্দ্রপীড়। কবিতাটি, আশ্চর্য, প্রকাশিত হলো অমলেন্দু সেনের পত্রিকায়। অমলেন্দু যেন নিরপেক্ষ বিচারপ্রিয় মানুষ। পরের কবিতাটি চন্দ্রপীড় তার কাগজে পাঠিয়ে বিব্রত করতে চায় নি। পূজা সংখ্যায় অন্য একটি অখ্যাত কাগজে প্রকাশের জন্য অমলেন্দু সেন একটা চিঠি দিলেন চন্দ্রপীড়কে। বেদনাহত চন্দ্রপীড় লেখা পাঠালো না। কিন্তু লেখা জমতে লাগলো। ৭১টি কবিতা, কোনোটির জন্ম মাথার ভিতরে কোনোটি বা হৃদয়ের কবিতা।

একবার স্থানীয় কিছু ছেলে এলো। একটি সাপ্তাহিক কাগজ বার করেছে তারা। অমলেন্দু সেনের কাছে খোঁজ পেয়ে এসেছে চন্দ্রপীড়ের কবিতার জন্য। এক সংখ্যায় কবিতাটি চাপা হলো। বললো, 'আপনার কবিতাটি বড্ড লম্বা, পঁয়ত্রিশ লাইনের, ছ-সাত লাইন আমরা বদলে দিয়েছি',—বাদ দেয় নি। নিজেরাই রচনা করে ভরে দিয়েছে। অমলেন্দু সেন চন্দ্রপীড়ের নাম লিখেছিলেন বলেই তারা চেপেছে। হয়তো রাগ করে

প্রুফও দেখে নি। গায়ে গায়ে ছাপার ভুল ফোঁড়ার মতো পেকে উঠেছে। নীল আকাশের মতো একটা বিস্তৃতিকে জায়গায় জায়গায় কয়লার উনুনের ধোঁয়া দিয়ে ভরে রেখেছে।

চন্দ্রপীড় স্কুলের ছেলেদের খাতা কারেক্ট করছে। লেখক ভাবছেন, আরো দেড়শো বছর না গেলে চন্দ্রপীড়ের এই ফসলের প্রথম আস্বাদন এদেশে সম্ভব হবে না। কিন্তু সম্প্রতি তার কবিতাগুলো গুছিয়ে রাখা দরকার। আজ তার বই ছাপিয়েও লাভ নেই কিছু। কিন্তু তবুও কোনো একটা চমৎকার নিরাপদ জায়গায় তার পাণ্ডুলিপি তুলে রাখা উচিত।

জীবনানন্দের গল্প-কবিতার প্রকৃত মূল্যায়ন যে তাঁর সমকালে হয় নি, এই মানসিকতা এ গল্পের মতো "কবিতা আর কবিতা আবার কবিতা" গল্পেরও বিষয় ছিল।

'কবিতা নিয়ে' ১৯৩৬ সালের পঞ্চম খাতার তৃতীয় তথা শেষ গল্প।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষ নলিনাক্ষ হাত পা ছুঁড়ে চোখ কপাল ফুঁড়ে টেবিলে ঘুসি মেরে কথা বলবে। নিরীহ প্রমথ তার ছায়া দেখলেও ভয় পায়। নলিনাক্ষের মাথায় ঝাঁকড়া চুল। থুতনিতে লম্বা শৌখিন দাড়ি, সাঁতার সমিতির সম্পাদক। ক্রিকেট ক্লাবের মাতব্বর, সে না থাকলে ফুটবল রেফারি কে হবে? ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারদের প্রিয়পাত্র, সব আছে তার। আইনের ডিগ্রি পর্যন্ত। কাউন্সিলে গেলে ভালো করতো সে, কিন্তু আড্ডায় পড়ে কি করলো? বৈষয়িক নলিনাক্ষ জান্তব গৌরবে সংসারের শ্রেষ্ঠ সফলতা পেয়ে গেছে মনে হয়। নির্জন অদ্ভুত জীব ভাবলেও এখনো নলিনাক্ষ তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নি।

নলিনাক্ষের অভিযোগ প্রমথ মানুষের সঙ্গে মেশে না। তাদের ফুটবল ক্লাবের বীরেশ ঠ্যাং ভেঙে বিছানায় সারাদিন পড়ে আছে। শহরের লোক ভেঙে পড়ছে সেখানে ; মায় ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার খোঁজ নিচ্ছে। প্রমথ কোন নবাবনন্দন একবার দেখে আসতে পারলো না।

প্রমথ 'কোন বীরেশ?' তাকে এই প্রশ্ন করতেই ক্ষেপে উঠলো নলিনাক্ষ। প্রমথ তাকে 'ফুটবলিষ্ট'—বলতে অগ্নিশর্মা নলিনাক্ষ তাকে চ্যালেঞ্জ দিল কোন ডিকসনারিতে কথাটি আছে? স্পোর্টসম্যান না বলে ফুটবলিষ্ট বলে নিজের নারীত্বের পরিচয় দিচ্ছে। সরীসৃপের অধম প্রমথর সঙ্গে তুলনীয় পৃথিবীতে জন্মায় নি। বীরেশ মুখুজ্যে সরকারের দিঘি চল্লিশবার সাঁতরে ছিল প্রমথ তখন দেখতে গিয়েছিল জেনে একটু অনুতপ্ত হলো নলিনাক্ষ। সুযোগ বুঝে প্রমথ তাকে চেপে ধরলো। বললো নলিনাক্ষের স্মরণে নেই সেদিন তিনহাজার নয়, দশহাজারের কম লোক হয় নি—অভিযোগ করলে নলিনাক্ষ কি করে ভুলে গেল যে সে প্রমথকে ঘাড় ধরে প্যাণ্ডেলে—(নলিনাক্ষর মনে পড়লো না, প্যাণ্ডেল হয়েছিল কিনা) কিন্তু প্রমথ বললো কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলের মতো প্যাণ্ডেল, তাতে ৫০০ নয়, হেসেখেলে তিনহাজার চেয়ার এসেছিল। আর চায়ের পেয়ালা ভেঙেছিল হাজার দেড় হাজার। জিজ্ঞাসা করলে দাম দিল কে?

নলিনাক্ষ বললো সমিতি নিজের অফিস থেকে দাম দেয়। টাকা জোগাড় করতে হয়। বলল বটে, কিন্তু তার ধাঁধা যাচ্ছিল না। লোক দশহাজার, না হাজারখানেক ছিল, দেড়হাজার পেয়ালা ভেঙেছিল না কি দুটো পেয়ালার বেশি আমদানিই হয় নি। সে বিস্মিত হয়ে ভাবছিল। চাও কি খাওয়া হয়েছিল সেদিন? কই সে তো কাউকে চা খেতে

দেখে নি। নলিনাক্ষ প্রশ্ন করে কাউকে সাঁতার কাটতে দেখেছিল? প্রমথর জবাব, আমি গিয়েছিলাম ভিড় দেখতে।

একথায় আবার ক্ষিপ্ত নলিনাক্ষ বলে আই চ্যালেঞ্জ ইউ—দশহাজার হাজির ছিল। নলিনাক্ষ মহলানবিশ যাতে হাত দেয় তাতে লোক হয় না? প্রমথ ভট্টাচার্যিকে সে মানুষের মধ্যেই ধরে না। আজ সে প্রমথর মাথায় ঘোমটা না টেনে বেরুচ্ছে না।—এই বলে নলিনাক্ষ তার থাবা বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু প্রমথকে আজ মিথ্যায় ভর করেছে। সে বলে চললো, 'সাঁতার শেষে তুমি আমায় বক্তৃতা করতে ডাকলে, আমি সভাপতি বাঁড়ুজ্যে সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে—আবার সংশয়, প্রমথ বক্তৃতা করেছিল সেদিন? প্রমথ বলে নলিনাক্ষ তাকে টানা হ্যাঁচড়া করে প্যাণ্ডেলে নিয়ে গেল আজ সে একথা বলছে! সেদিন প্রমথ কি বলেছিল তার মনে নেই? নলিনাক্ষ স্মরণ করতে পারলো না। প্রমথ অভিযোগ করলে তোমাদের বড় মানুষদের এই দোষ। নলিনাক্ষ প্রমথকে সান্ত্বনা দিল। বক্তৃতা দিয়েছিলে দশজনের জন্য, কর্মকর্তাদের জন্য নয়, শুনবার সময় কি ছিল নলিনাক্ষর, হয়তো চায়ের তদারক করছিল সে। প্রমথ তৎক্ষণাৎ অভিযোগ জানালো সেদিন এক চুমুক চা গলা ভেজাবার জন্য তার জোটে নি। নলিনাক্ষ দরাজ কণ্ঠে বললো, চলো আজই রেস্টুরেন্টে দস্তুর মতো খাইয়ে দিচ্ছি। প্রমথ রাজি হলো না। নলিনাক্ষ ব্যবস্থাপনার দোষ স্বীকার করলে। প্রমথ উল্টে বললো তিন হাজার চায়ের কারবারে এক পেয়ালাও সে পায় নি। বক্তৃতা দিয়েছিল যদিও। আসলে নলিনাক্ষ কোথায় তখন? নলিনাক্ষ ধরে নিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে সব বলতে চায় প্রমথ। তার দুই ঘুষিতে টেবিল বেজে উঠলো। নলিনাক্ষ তৎক্ষণাৎ রাসকেল হরেন সরখেলকে পেলে হিসেব নিকেশ চায়। চাঁদার টাকা কার পিণ্ডি চটকাতে যায়।

প্রমথ এবার সাহস পেয়ে বলে, 'তুমি এসব ছেড়ে দাও।'

'কি ছেড়ে দেবো আমি শুনতে চাই, টু দি পয়েন্ট বলো। নইলে ঘুষিতে তোমার মাথা উড়িয়ে দেবো।

প্রমথ পরামর্শ দেয় বরং কয়েকটা নতুন জিনিস তুমি ধরো। তোমার শরীর মনের আশ্চর্য শক্তি, আমার ইচ্ছা তুমি দেশকে একটা কিছু দাও।

'বায়স্কোপে নামতে হবে?'

'না।'

'কবিতা লিখতে হবে?'

'কবিতা তুমি বোঝো না, লিখবে কি করে?'

'উঠি, অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম।.......ওখানে বলবো একটা গাধার পাল্লায় পড়েছিলাম।'

'বোলো প্যাঁচার পাল্লায়।'

টেবিলে ঘুষি মেরে নলিনাক্ষ জানায়, 'ভট্‌চাজ, তুমি তোমার কবিতাকে আর দেশকে খুব বড়ো মনে করো। তোমার কয়েকটা পয়ার নিয়ে পথে নেমো। আর ফুটবল ফিল্ডে রেফারি হয়ে আমিও নামবো। দেখি দেশের লোক কাকেই বা বাহবা দেয়, কার গায়েই

বা থুতু ফেলে।....কবিতা নিয়ে ভিজে বেড়ালের মতো ঘরের কোণে পড়ে আছে। আর রেফারিগিরি দেখার জন্য স্কুল কলেজের মুলুকের হাজার হাজার মানুষ কাদাবৃষ্টি ঠেলে মাঠে ভেঙে পড়ছে রোজ।'

এই গল্পেও কবিতার চেয়ে সাহিত্য চর্চার চেয়ে মেঠো রেফারিগিরিকে বড়ো করে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনানন্দের বক্তব্য হয় তো—কবিতা জীবন থেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

নলিনাক্ষ আর প্রমথর চরিত্র সৃষ্টি সুন্দর। সরল বিস্মৃতিপরায়ণ স্থূলবুদ্ধি নলিনাক্ষ আর ধূর্ত কূটবুদ্ধি প্রমথর বাকচাতুর্য গল্পের সুন্দর বিষয় হয়েছে।

একাদশ খণ্ড জীবনানন্দ সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত **'রক্তমাংসের স্পন্দন'** গল্পটি ১৯৩৬ সালে লেখা ষষ্ঠ খাতার প্রথম কাহিনী। এক অপরিচিত মহিলার বাড়িতে হঠাৎ পুরানো বন্ধু সোমেশ্বরের সঙ্গে দিলীপের দেখা। প্রায় ছহাত (ফুট ?) লম্বা আগে আকর্ষণীয় রগুড়ে মানুষ ছিল সোমেশ্বর। এখন দিলীপের সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতে রাজি হল না। নানা দেশ ঘুরেছে সে। বিদেশি ভাষা শিখে ঢের বই পড়েছে। বেছে পড়লেও বইয়ের জগৎ যেন সমুদ্র। কত মানুষের চিন্তা সেখানে।

সোমেশ্বরের অপছন্দ কলকাতার গোলমাল। সিংহল অনেক নিরালা। গোলমাল নেই এমন অনেক জায়গা আছে। কিন্তু গোলমালহীন হলেই নিরালা হয় না।

দিলীপ প্রফেসর। বাস কিনে শিখ ড্রাইভার রেখে চালায়। সোমেশ্বরের মতে প্রফেসাররা পড়ে না, এই তাদের অপরাধ। দিলীপ বলে মানুষের চিন্তা হল ভূত। ভালোবাসা ও ঈশ্বরও ভূত। কত ঘাড়ে চাপাবে মানুষ। মেঝের কার্পেটের ভিতর একটা বাচ্চা ইঁদুর ঢুকে গিয়েছিল। তার শব্দ পেয়ে তাকে না মেরে সোমেশ্বর নিজে হাতে বার করে ছেড়ে দিয়েছিল। দিলীপের মতে হাত দিয়ে ধরা ঠিক হয়নি। প্রাণ আছে বলেই ইঁদুর জঘন্য। সোমেশ্বর বলে সাহসীরাই বাঁচে। মৃত বা মৃতকল্পরা নিদারুণ জঘন্য। তাদের ভালোবাসা যায় না। সোমেশ্বরের এই কথাটাকে দিলীপ তামাশা বললে ক্ষুব্ধ সোমেশ্বরের হাত থেকে চুরুট পড়ে কার্পেটে আগুন লেগে যায়। ছ'হাত লম্বা মানুষটা অসুস্থভাবে পায়চারী করে। জ্বলন্ত চুরুটটা দিলীপ জুতো দিয়ে পিষে নিভিয়ে দেয়।

সোমেশ্বর দাড়ি ছাঁটে নি। পেকে মিশনারির মত চেহারা হয়েছে তার। সব বিসদৃশের সমালোচনা করত সে যে নিজেই বেখাপ্পা বেরসিক হয়ে উঠেছে। বিরক্ত সোমেশ্বর দিলীপকে থামিয়ে দেয়। ওর জীবনে কোনো গভীর দুঃখ বা উৎসব এসেছে বলে সোমেশ্বরের মনে হয় না। কোনো মরা মানুষ দেখেছে কি দিলীপ! সাধারণের কাছে মরা কিন্তু আমাদের চেয়ে কত গভীরভাবে জীবিত এ না দেখলে কি আর দেখলে সে। অথচ তা প্রেতাত্মা নয়। মানুষ যাদের মরা ভাবে, তাদের তুলনায় মানুষই বাস্তবিক মৃত। শিল্প, রস, মানবজীবন এসব অসার তার কাছে। দিলীপকে একথা আজ বোঝানো যাবে না। তাই তাকে সে চলে যেতে বলল।

দিলীপ বরং প্রাক্তন সেরা উইকেট কিপার সোমেশ্বরকে তাদের ক্রিকেট টিমের আগামী খেলায় নিয়ে যেতে চাইলে সোমেশ্বর রাজি হল না। সে খেলা ছেড়ে দিয়েছে।

খেলা দেখতেও যাবে না। বিরক্ত দিলীপ বলল সোমেশ্বর কলকাতায় না এলেই পারত। সে কি এখন ক্রিকেট ছেড়ে যাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না তাদের নিয়েই রয়েছে। কমলা বলল, সোমেশ্বরের কাছে সব মেয়েই সমান। কারোর জন্য তার মমতা নেই। সোমেশ্বর বই ভালোবাসে এ মনে করাও ভুল। রমেশবাবু কোথায় জিজ্ঞাসা করতে ঘরের দূর অন্ধকার কিনার থেকে এক ভারিক্কে মানুষ সাহেবি পোশাকে কমলার কাছে এক সোফায় এসে বসল। দিলীপ বলল, 'আপনি তো সাংঘাতিক মানুষ। আমাদের কথা শুনছিলেন। আমাদের সাথে কথা বলার দরকার মনে করেননি।' সোমেশ্বর বলল, রমেশের তৃতীয় পক্ষ চলছে। তার স্ত্রৈণতার সীমা নেই। নারী এল তখন সে এল। বিরক্ত রমেশ হেসে বলল, আমার ক্রিকেট ফিল্ডের ইয়ার যেন। কমলা রমেশকে চটাতে বারণ করল। তার ব্লাড প্রেসার আছে। রমেশ কোন কলেজের প্রিন্সিপাল। পাইপ খাবার অনুমতি চাইল সে কমলার কাছে। তারপর দিলীপ আর কমলার তর্ক জমে উঠল। কমলার মতে সোমেশ্বর ক্রিকেট খেলতে জানে না। শুধু পাশা খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দিলীপ বোঝাতে চায় সোমেশ্বর কত সাহেবি ক্রিকেট টিমকে হারিয়েছে। রমেশ বললেন, সোমেশ্বরের কোনো কথার অর্থ তিনি বোঝেন না। আর কমলা কেন তাকে আমাদের সকলের চেয়ে উঁচু মনে করে? আরো বললেন, মানুষের জীবন কি নিয়ে? উঁচু জীবন কাকে বলে? রমেশের ধারণা কোথাও বা এক কল্যাণ শক্তি আছে যাকে ঈশ্বর বলি। পরস্পরের ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা—এসবের চাষ হল জীবন। দিলীপের মত, তাহলে মানুষের সঙ্গে একটা শুয়ারের তফাৎ রইল কি?

দিলীপের মতে, সোমেশ্বর এখনো যদি মাঠে নামে তার ইনিংস যে কোনো বাঙালীর চেয়ে ভালো, জাম সাহেবের সমতুল্য হবে। কমলার মতে তর্কের খাতিরেই দিলীপ ক্রিকেটের কথা বলছে। আগা খাঁ বা জাম সাহেব হবার ইচ্ছে কোনোদিন ছিল না সোমেশ্বরের। উনি মননের জীবন ভালোবাসেন। এক সময় চমৎকার কবিতা লিখতেন। দাদুর পর অমন কবিতা কেউ লেখেনি। দিলীপের বক্তব্য, দাদু কি একজন বড় কবি? শুনে আহত হয় কমলা। রমেশ মনে করে, কবিতা অসম্ভব নাহলেও, সোমেশ্বর যে ক্রিকেট খেলত এ দিলীপের বানানো গল্প। তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সোমেশ্বর খেলা দূরে থাক ক্রিকেটের দর্শকদেরও পছন্দ করে না। কিন্তু সব মিস্টিকরাই কবিতা লিখে থাকে। সোমেশ্বর সে তর্কে কোনো অংশ নিল না। দিলীপের 'তুমি কি মিস্টিক?' এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিল না। রমেশ বললেন, এই পৃথিবীর ভিতরেই যারা অন্য পৃথিবীর খোঁজ পায় তারাই মিস্টিক। সোমেশ্বরের দুহাত দিয়েই সমান লেখা বেরোয়। কমলার ধারণা এঁর দুহাত অচল হয়ে গেলেও ইনি পা দিয়ে লিখতে পারবেন। কমলার মতে এঁর হাতের লেখা কালির আঁচড় মাত্র নয়। প্রতিটি অক্ষর সূক্ষ্ম ও সুন্দর। মেয়েদের সূচিশিল্পের মত। ইনি ছবিও আঁকতে পারেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস অন্ধ বা রোগা হলেও ইনি ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বড় ডিগ্রি পেতে পারতেন। রমেশের হাতের লেখা সুন্দর শুধু তাই নয়। ভালো বাংলা লেখেন। ওঁর প্রবন্ধ বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে পড়ার মত জিনিস। বঙ্কিম যখন হৃদয় দিয়ে লেখেন একরকম হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে ছেলেমানুষ হয়ে

পড়েন। রমেশ বললেন বঙ্কিমের স্ত্রী চরিত্রের পরিণতি এত ছেলেমানুষি যে বাংলাদেশ একে সমর্থন করলে বুঝতে হবে মহাপুরুষ আর নভেলিস্টের পার্থক্য তারা বোঝেনি। তাঁর মতে বঙ্কিমবাবু নভেলিস্টের চেয়ে মহাপুরুষই বেশি। নক্ষত্রের কল্যাণে তাঁর শিল্পীর আসন ভাঙবার চেষ্টা করলেও হয়ত ভাঙবে না। রমেশ পরে এক মাসিক পত্রিকা ছাপিয়ে চেষ্টা করবেন নিজের কবিতা, উপন্যাস বার করে শিল্পী হবার। যদি নক্ষত্রেরা সাহায্য করে শিল্পের অনুসরণ করে মহাপুরুষ হওয়া সহজ। সোমেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল। ভুল রমেশ, তার প্রধান বাধা আপনার কুমড়োর মত শরীর। আমাদের তো কেউ খাবে না। আমাদের শরীরই আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয় না। ইন্দিরা, ইন্দিরা তুমি কোথায়! আমি তোমার জন্যে বসে আছি। একদিন আমার এ শরীর থাকবে না। তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। জন্তুর মত কষ্ট দিচ্ছে আমাকে।' কমলাকে জিজ্ঞেস করল দিলীপ 'সোমেশ্বরের কি হল? ইন্দিরাই বা কে?' ছটফট করছিল সোমেশ্বর। কমলা তার মাথায়, চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছিল 'এই যে আমি—ইন্দিরা—দেখ তাকিয়ে।' রমেশ ঈর্ষার দৃষ্টিতে কমলার দিকে তাকিয়েছিল। কমলা যে বইটা নাড়াচাড়া করছিল সোফা থেকে চুপিচুপি সেখানা তুলে নিয়ে দিলীপ বেরিয়ে গেল। ওটা ফেরৎ দেবার অজুহাতে একদিন আসতে পারবে ভেবে।

রহস্যময় সামঞ্জস্যহীন এই কাহিনীটির মধ্যে অন্তঃসংগতির যেমন অভাব আছে তেমন যথেষ্ট ছাপার ভুলও আছে। 'কুড়ি বছর পরে' গল্পে যেমন অতি লৌকিক আবহ সৃষ্টির চেষ্টা ছিল ; একটি চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে তার বিবর্তন বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছিল, তেমনি এখানেও অনেকখানি করা হয়েছে। সোমেশ্বরের প্রায় অতি মানবিক বহুমুখী প্রতিভার বর্ণনা ছেলেমানুষী হয়েছে। তার আকস্মিকভাবে 'ইন্দিরা ইন্দিরা' বলে আকুল হয়ে ওঠা অর্থহীন আবেগপ্রবণতা মনে হয়। তেমনি ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে রমেশের বেরিয়ে আসা, তার অলৌকিক কিছু কার্যকলাপ, উদ্ভট কথাবার্তা অন্ধের হস্তিদর্শনের মত। কমলা ও দিলীপের বিতর্ক একথা বুঝিয়ে দেয়, লেখক কি করতে চেয়েছেন তা যেমন অস্পষ্ট ছিল, তেমনি তার সাফল্য অধরা থেকে গেছে।

জীবনানন্দ সমগ্রের একাদশ খণ্ডে উদ্ধৃত ছ'নম্বর খাতার দ্বিতীয় গল্প **'ধূসর পাণ্ডুলিপি'**। মা মরা ছেলেটাকে বাপ বিমানবাবু রোজ মেরে খুন করে। সহ্য করতে পারে না প্রতিবেশী নিঃসন্তান গৃহবধূ সুকৃতি। সে খুশি যে তার সন্তান নেই।

সুকৃতি স্বামীর পাশের ঘরে একা শোয়। লেখক স্বামী অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। আলো সইতে পারে না, ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাই আলাদা ঘর। বেড়ার ওপাশে শুয়ে সুকৃতির ঘুম আসে না। জানালায় কাকে দেখে ভয় পায় সে। পঞ্চান্ন ছাপান্ন বছর বয়সের কস্তাপেড়ে শাড়ি পড়া বিচ্ছিরি দেখতে এক বউ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুকৃতির দিকে। বিচ্ছিরি ঐ মুখটা কোথায় দেখেছে স্মরণ করার চেষ্টা করে সুকৃতি। পরে আর একদিন স্বপ্ন দেখে আবার। স্বপ্ন বলে মানতে রাজি হয় না। মুখটি তার মায়ের মুখ নয়। তার বাপের বাড়ির কেউ নয়। জানলা বন্ধ করলে ঘর গরম, খোলা রাখলে ভয়। স্বামীর কাছে এক ঘরে শুতে রাজি নয় সুকৃতি। তার বিশ্বাস কেউ

প্রকৃতই জানালায় এসেছিল। কাল বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে সে পাড়ায় যাবে। যদি কোনো শয়তানির সঙ্গে বউটার মুখের মিল দেখতে পায় কি করবে মনেই আছে তার। এইসব তার সান্ত্বনা। সুকৃতির স্বামী নিজের ঘরে যেন এক স্বপ্নের জগতে কল্পনার অমেয় সুরভিতে মজে যান। অন্ধকারে চুরুট খান। কুকুর বারান্দার মাটি খুঁড়ে শোবার ব্যবস্থা করে নেয়। কৃষ্ণচূড়ার ডালে পেঁচা এসে বসে। হামিদের মরকুটে ঘোড়াগুলো ঘাস খুঁটে খায়। হঠাৎ সুকৃতিকে আসতে দেখে চমকায় সে। কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। তার অভিযোগ 'অদ্ভুত মানুষ, বই-ই তোমার সব!' এই নির্জন ঘরে জেগে উঠে শুধু কয়েকটা মশাকে সঙ্গী মনে হয় সুকৃতির।

স্বামী হেসে বলে 'নিজের ঘর, নিজের বিছানা তবু তো ছাড়বে না তুমি।' সেজন্যে কে দায়ী, ভাবতে বলে বউ। সে তো সেধে মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে পারে না। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে সুকৃতি বলে জেগে উঠে মশা আর ছারপোকা মারছিল। হঠাৎ জানালায় সে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা বিচ্ছিরি বউটাকে দেখল তাকিয়ে আছে।

স্বামীর হাত থেকে চুরুট খসে গেল, রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। 'বল কি?' সুকৃতি উত্তর দেয় মরতে চাইনি। এ পৃথিবীতে বাঁচতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। 'পাগল তুমি। কিছু হয়নি ; আমরা কাল সকালে এবাড়ি ছেড়ে দেব সুকৃতি, আমার মনে হয় তুমি আবার স্বপ্ন দেখছিলে'—বলে চিৎকার করে উঠতেই দেখল 'ঘর অন্ধকার। মশারিতে একা শুয়ে আছে। তাহলে আজ রাতেও এসেছিল সে?'

সুকৃতি বেঁচে থাকতে ঐরকম স্বপ্নের কথা কখনো স্বামীকে বলেনি। সে ভারি পরিস্ফুট মনের মানুষ ছিল। রহস্য তার ত্রিসীমানায় ছিল না। কিন্তু স্বপ্নের কি কোনো মানে আছে? যে মরে যায় সে তো মরেই যায়। আর তো কিছু জানা নেই। এত রাতেও কৃষ্ণচূড়ার ডালে একটা পাখি বসে আছে, পুরানো সেই পেঁচা শিং-এর মত বাঁকা কান তুলে। আর জেগে আছে রহস্যময় চাঁদ।

জীবনানন্দের গল্পে অতি-লৌকিক কাহিনী খুব অল্পই। কবিতা অবশ্য দুচারটি আছে। এখানে সেইসব কবিতার অনুষঙ্গগুলি হামিদের মরকুটে ঘোড়া, রাতের অন্ধ পেঁচা, মা মরা সন্তানের মার খেয়ে কান্না এইসব সুন্দরভাবে প্রয়োগ করে গল্পের পরিবেশ গড়া হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছিন্নতাজনিত অভিমান, নিঃসঙ্গতা এসবও খুব পরিচ্ছন্ন নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন লেখক। তার সঙ্গে স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নের কাহিনী শুনে লেখকের রক্ত শুকিয়ে যাওয়া, প্রতিশ্রুতি শেষে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বপ্নের মধ্যে উভয়ের কথোপকথন, ঘুম ভাঙা, নৈশদৃশ্য সব নিখুঁতভাবে পরিবেশিত।

১৯৩৬ সালে লেখা ষষ্ঠ খাতার শেষ গল্প **'পৃথিবীটা শিশুদের নয়'**। এ গল্পের বিষয়বস্তু অভিনব। শিশুদের আকাঙ্ক্ষা, অভিমান, ইচ্ছা, অনিচ্ছার সুন্দর কল্প-জগতের সঙ্গে বাস্তব সামাজিক যুক্তিবাদী পৃথিবীর দ্বন্দ্ব ও জয়-পরাজয় কাহিনীকে আকর্ষণীয় করেছে।

শীতের রাতে টিউশন সেরে আলের পাড় দিয়ে ফিরছিল লোকটি। এক বছর-চারেকের মানব শিশু পড়েছিল সেখানে মড়ার মত। তাকে কুড়িয়ে আনা হল। জিজ্ঞাসা

করে জানা গেল তার নামটি রঙ্গিল। ভদ্রছেলেটিকে নিয়ে লোকটির স্ত্রী এবং বাচ্চা মেয়ে আবেগে উন্মথিত হল। তার ঠিকানার সন্ধান করতে রঙ্গিলকে নিয়ে রাতে লোকটির বাইরে যাওয়া চলবে না। কে জানে তাকে সাপে কামড়ায় যদি। একই কথা বলে মেয়ে বিনু আর মা সুধা। নতুন সঙ্গী রঙ্গিলকে খেলনা এনে দেয় বিনু। তাকে খাইয়ে দাইয়ে আলাদা বিছানা পেতে দেওয়া হয়। শোয় সে। রঙ্গিল বলে সে তার মা বাবার কাছে যাবে না। কেন? ও বাড়িতে সকলের কথাবার্তা শুনে রঙ্গিল বুঝে নিয়েছে তার না যাবার পক্ষে একটা যুক্তিই অমোঘ। সেও তাই বলে। গেলে তাকে যদি সাপে কামড়ায়! সুধা হাসে, বিনু বায়না ধরে, রঙ্গিলকে এখানে রাখা হোক। অবুঝপনার জন্য মেয়ে মায়ের কাছে মার খায়। বিনুকে তার খেলনার মোটরকারটা ফিরিয়ে দিতে চেয়েও রঙ্গিল কি ভেবে দেয় না। সে বিছানায় শুয়ে লেপমুড়ি দেয়। ভদ্রলোকও অন্ধকারে বালাপোষ টেনে চুরুট জ্বালিয়ে চিন্তা করেন। পৃথিবীটা যদি শিশুদের হাতে থাকতো।

শীতের শান্ত রাত। উত্তেজিত কোলাহল, অনেক লণ্ঠনের আলো আলোড়িত হয় অবশেষে। বাবা, খুড়োরা খুঁজতে বেরিয়েছে। 'এ পৃথিবীটা আমাদেরই' শিশুদের নয় এবার মনে হল লেখকের। রঙ্গিলকে এখন বিদায় নিতে হবে।

শিশুদের আবেগপ্রবণ ভালোবাসার জগৎ বাস্তব বুদ্ধির পৃথিবীতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায় না। যুক্তি ও ঔচিত্যবাদী বয়স্কদের বিবেচনার আধিক্যের জন্য বাচ্চাদের পছন্দ, অপছন্দ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালোলাগা কোনো মূল্য বা পাত্তা পায় না।

গল্পের ধারা

অষ্টম স্তবক

জীবনানন্দ সমগ্রের দ্বাদশ খণ্ডে সংগৃহীত **'করুণার পথ ধরে'** গল্পটি প্রথম গল্প। ১৯৩৬ সালে লেখা। এর নাম রেখেছেন সম্পাদক।

কার্তিকের সন্ধ্যা যেন হঠাৎ নেমে এল। অবিনাশ ঘোষাল অনেক রাতে ঘুমোতে যায়। আবার অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ে। কাছেই পৃথক পালঙ্কে মা মেয়ে ঘুমোয়। মশারির ভিতরে দুটি ঘুমন্ত করুণ মুখ। নীল মশার ওড়াউড়ি চাঁদের আলোয় রাতের এমন গভীর মুহূর্তে মশারির দিকে তাকাতে নেই।

ক্রমে দিনের আলোয় ছেয়ে যায় আকাশ। মা রান্নাঘরে। মেয়ে বিছানায় বসে আছে। হাসিকান্না নেই। কথা আকাঙ্ক্ষা নেই। কোলে তুলে নেয় অবিনাশ। বড় সেগুন কাঠের টেবিলের কিনারে তাকে এনে বসায়। একটা কবিতার বই ছাপিয়ে ছিল অবিনাশ। দপ্তরীর দোকানে পচছে। সেই বইয়ের মত এই মেয়েটিও অবিনাশের সৃষ্টি, তার মৃত্যুর পর দু-চারজনের মনে এ হয়তো তখন নারী হয়ে উঠবে। তার স্মৃতি জাগিয়ে রাখবে।

পৃথিবীর অশ্লীল আঘাত মানুষকে স্থিরতা দেয় না। টেবিলের উপরেই মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। মুখে ভোরের ঘাসের মত গন্ধ। কার্তিকের ঘাসের মত হলুদ শরীর।

নির্দিষ্ট চাকরি নেই অবিনাশের। সারাদিন বাইরে কাটে তার। দুটো ছেলে পড়ায়। একটা কাপড় কাচা সাবানের স্বদেশী দোকান আছে। আনাড়ি কর্মীদের অনেক অপচয় সইতে হয়। দোকানে দোকানে সাইকেল নিয়ে মাল ফেরি, কাঁচা মশলা জোগাড়, লোকসান দিচ্ছি ভেবে পিছু হটা চলবে না। লোককে খোশামোদ করতে হবে। তারপর রাত দশটা এগারোটায় বাবলা আর হিজলের ছায়ার ভিতর দিয়ে ঘরে ফিরবে। নক্ষত্রের রূপালি আগুনে আকাশ ভরা গাঁয়ের মৃত রূপসীরা হিজলের ডালে। অবিনাশ সাইকেল ঘুরিয়ে মাঠে নামবে। জারুল গাছ থেকে পেঁচা। ধানক্ষেতের উপর দিয়ে তার প্রণয়িনীর ডাক এক মোহময় সেতু রচনা করবে।

হয়ত কিছু পড়ার জিনিস সংগ্রহ করে আনবে অবিনাশ। কোন মৃত কবির কবিতা বা দোঁহা, রাত বারোটার পরে তা পড়ার সময় পাবে সে। অমলা চৌধুরীকে মনে পড়ে। কোথায় সে আজকাল? অবিনাশের রূপ অমলার হৃদয়ে একদিন প্রেমের কবিতার জন্ম দিয়েছিল। সুন্দর কবিতা লিখত সে। আজও লেখে, নাকি ভাবনা, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে কে জানে? অবিনাশ যেমন সাবানের কারবার খুলে শুয়োর হয়ে গেল। এখন রক্তের ভিতর কামনার খিদেও নয়, শুধু অন্নের খিদে। অমলারও তেমন কিছু যায় আসে না। অবিনাশ শুয়োর কি সিংহ হয়েছে, মানুষের সেবক কি কল্পনার প্রিয়পাত্র হয়েছে এসব জেনে, ঠাট্টা করে কি লাভ! অমলাকে অনুশীলন করলেও সে কি অবিনাশের জন্য অপেক্ষা করত? সে তার নিরাপদ কারুকার্যময় পুরুষ খুঁজে নিয়েছে অনেকদিন। তাদের জীবন ধূসর হতে চলল প্রায় অবিনাশের মতই।

ঠাকুরদার আমলের পালঙ্কে মস্ত স্থবির পাখির মত অবিনাশের স্ত্রী ঘুমোচ্ছে। অনেক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে মৃতপ্রায়। বড় প্রদীপ নিভবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট প্রদীপটিও নিভে যাবে। এদের কেউই দীর্ঘকালের জন্য অবিনাশের কাছে আসেনি। এক ঘরে থেকেও রাতে ঘুমের ভেতর বার বার যার মুখের স্বপ্ন দেখে অবিনাশ, নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্রের পরপারে সেই মুখের কাছে পার্থিব কোনো সেতুই তাকে পৌঁছে দিতে পারবে না। যে হারিয়ে যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

দিনের সমস্ত কাজ ফুরিয়ে গেলে অবিনাশ কবিতা পড়ে, প্রেমের কবিতা, প্রণয়ের গল্প। বেতের ফলের মত অমলার ম্লান চোখ অজস্র চুলের রাশি মনে পড়ে। তার নিঃশ্বাসের গন্ধ পায়। হৃদয়ে কামনা ও বেদনার কুয়াশা জমে। কিন্তু এপথে নক্ষত্রের দরজায় কোনদিন পৌঁছনো যায় না।

পড়সিনীর বাড়ি শনি-পুজো দেখতে গিয়েছিল অবিনাশের স্ত্রী। ফিরে এসে কি হয়েছিল সে গল্প করার সময় কথার চেয়ে হাসিই বেশি তার। যেন মানবীয় সুখ ছিঁড়ে এক অশরীরী হাসি জন্ম নিয়েছে। রোগা হাত একটা পাখির অনুভূতি জাগায় কেবল। কোথাকার অমৃত ঝড়ের আঘাত যাকে ক্ষুণ্ণ করে পাঠিয়ে দিয়েছে অবিনাশের কাছে। একদিন আকাশের আলোর ভিতর অন্ধকার নক্ষত্রের ভিড়ে পাখির মতই হারিয়ে যাবে সে। জীবনের দিনগুলি পর্দার ওধারে যেন মৃত্যুশয্যায় কাটিয়ে দিচ্ছে ওরা। সকালে যেমন মেয়েটি টেবিলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মৃত্যু যেন ওদের অধিকার করে নিয়ে গেছে।

প্রতিরাতে বাসায় ফেরার সময় অবিনাশ লজেন্‌চুস বা বিস্কুট আনত। মেয়ে সকালে খেতে চায় না। দুপুরে তার মা তাকে দেয়। সাবানের দোকানে কাজ করতে করতে অবিনাশ ভাবে জ্যান্ত পৃথিবীর জিনিস মেয়েকে মৃতের দেশে নিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর কুহক দেখার জন্য অবিনাশ একদিন চিলের মত আকাশের দিকে উড়েছিল, আস্বাদ করতে চেয়েছিল রৌদ্রের মত রক্তিম প্রেম। কোথা থেকে মা আর মেয়ে এসে অবিনাশকে শিকার করে নিয়ে গেল।

জীবনানন্দের একটি গল্পের নাম সম্পাদক রেখেছিলেন 'মৃত্যুর গন্ধ'। বোধহয় এই গল্পটির নাম 'মৃত্যুর গন্ধ' হলেই ভালো হত। অবিনাশ তার স্ত্রী কন্যাকে যেন অপার্থিব মৃত্যুর আলোয় আবিষ্কার করছে। তার হৃদয়ে তীব্র বিলুপ্ত এক ভালবাসা। কিন্তু জীবনের প্রশান্ত বাৎসল্য এবং দাম্পত্য তাকে শেষ পর্যন্ত অভিভূত করল। এগুলি প্রগাঢ় বলেই মৃত্যুর ভয়। এই গল্পের মধ্যে কবি জীবনানন্দকে সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়।

জীবনানন্দ সমগ্রের দ্বাদশ খণ্ডভুক্ত **'ভালোবাসার সাধ'** গল্পের রচনাকাল ১৯৩৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর। নামকরণ করেছেন সম্পাদক।

অন্ধকারে লেখকের বুড়ো বাবা আর প্রৌঢ় কাকা তারানাথ সংসার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। অন্তরালে বসে লেখক শুনছেন। স্ত্রীলোকহীন সংসারে লালিত্য আনতে একটি ঝি রাখার সুপারিশ করছিলেন কাকা। তিনি দীর্ঘদিন বিপত্নীক। বিয়ের কিছু পরেই পিত্রালয়ে গিয়ে কাকি মারা যান। কিন্তু সাধুতার অহংকারে তখন বিয়ে না করলেও স্ত্রীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি বজায় রাখতে পারেননি। এখন তারানাথের বয়স চল্লিশ-একচল্লিশ। বাবার ইচ্ছে বরং দ্বিতীয়বার বিয়ে করুক ভাই। সে চাকরি করে। পঞ্চাশ টাকা বেতন। বড়লোকের মেয়ে নয়, গৃহস্থ ঘর থেকে লক্ষ্মীর মত কেউ এসে বাড়ির শ্রী-ছাঁদ ফিরিয়ে আনুক।

দশ বছর আগে মা মারা গেছে লেখকের। কাকা তাঁর কথা স্মরণ করে বলেন বাবার অনুরোধ শুনলে তাঁর বড় কষ্ট হয়। বউঠান থাকলে বুঝতেন। বিয়ে করার অধিকার তাঁর নেই। বাবার কাছে তিনি ঝিটাকে রাখার প্রস্তাবের জন্য মাপ চান। বাবা জিজ্ঞাসা করেন ঝিয়ের পরিচয়। তারানাথ তাকে মানবেন্দ্রবাবুর বাসায় দেখেছেন, তারা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে। তাই ঝিটাকে রাখার কথা তিনি তারানাথকে বলেছেন। পাঁচ টাকা মাইনে। সব কাজ করবে। খাটিয়ে, পরিষ্কার, ব্যবহার ভালো—এইসব তিনি বলছিলেন। কিন্তু কাকা স্বীকার করলেন তাকে দেখে কেমন একটা আসক্তি জন্মেছিল মনের ভিতর। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, বেশ সুস্থ ও সুশ্রী। মনে হয়েছিল ওঁদের সংসারে এই মেয়েটি এলে একটু নতুনত্ব হবে, অনেকটা শান্তি পাবেন। কিন্তু এখন অনুতাপে জানাচ্ছেন যে কামনা পরিতৃপ্ত হয়নি, হবে না কোনদিন, তার জ্বালা বড় কষ্ট দেয় মানুষকে। লেখক অনুভব করতে পারেন মানুষটির বেদনার কোনো সীমা নেই। বাবাকে বলছেন, 'রাগ করলেন দাদা?' মেয়ে মানুষের স্নেহমমতার একটানা অভাব বোধ করেছেন কাকা জীবনে। কিন্তু এখন বুঝছেন মায়া-মমতাই নয়, চাইছেন অন্য কিছু। আর একটা পাপের কথা তিনি স্বীকার করলেন দাদার কাছে। একথা

বোঝাতে যে বিয়ে করবার উপায় নেই তাঁর। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন-চার মাস পরে একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন। মনের অবস্থা ভালো ছিল না তখন। একটা গোপন রোগ নিয়ে ফিরেছিলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, রোগটা সারানোর চেষ্টা করেনি কেন? কাকা জানালেন, তাঁর মনের ভিতর একটা সাধুতার অহংকার আছে। কলকাতায় কত অচেনা ডাক্তার। তবু তাদের কাছেও নিজের পাপের কথা জানাতে ঘেন্না করে। "আপনি দাদা, আপনাকে বললুম।" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, রোগটা কঠিন হচ্ছে তাহলে? সারাবার উপায় নেই? কাকা জানালেন, না। চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো অন্ধ হবেন। এই রোগ নিয়েই মরতে হবে তাঁকে।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের আকাঙক্ষার সংঘাত, সততার ভান এবং সেই মুখোশ বজায় রাখার জন্য গোপন আত্মহনন, এর বেদনা এই গল্পের বিষয়বস্তু। এমন গল্প জীবনানন্দ বেশি লেখেননি।

১৯৩৬ সালে লেখা এই **অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি** গল্পটির নামকরণ করেছেন সম্পাদকরা। দ্বাদশ খণ্ডভুক্ত তৃতীয় গল্প এটি।

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসেছিল ভবানী কিন্তু কোনো মক্কেল এল না। মক্কেল কমই আসে। ভবানী সময় কাটাতে থিওজফির বই পড়ে। জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস তার ভালো লাগে না। মৃত্যুর রহস্যময় গন্ধের ভিতর যেসব গল্প জন্মায় তাই নেড়েচেড়ে সন্ধ্যা কাটে ভবানীর। সংসারের ডালপালা বহু বিস্তৃত হলেও সম্প্রতি কেউ মারা যান নি। মা এলাহাবাদে মেজদার কাছে, বাবা এখানে। নিঃসন্তান ভবানীর স্ত্রী আর বাবা দুজন নিয়ে সংসার। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। প্রতিবেশীর বাড়িতে বউভাতে গিয়েছে স্ত্রী। রান্না, পরিবেশন প্রভৃতি সেরে রাত দুটোর আগে ফিরবে না।

ভবানী কাউকে ভালোবাসত এক সময়। সেই মেয়েটি আজ মৃত কিনা কে জানে? পুরোনো পোড়োবাড়িতে রাত কাটাতে যেমন মনে হয়, রূপসী সাপিনী অন্ধকারে আছে কোথাও। সন্ধ্যায় এই ল্যাম্পের কাছে বসে এই চিরনূতন পৃথিবীকে ধূসর পুরোনো বাড়ির মতো লাগে। মরচে পড়া লোহা, মরা ঘাস, মাছি, তরমুজের ঘ্রাণ, শুকনো কদম ফুল, শিউলিপাতা। ভবানীর বাবা এসে জানতে চান ক'টা বেজেছে, বউমা ফিরেছে কিনা? এলাহাবাদ থেকে চিঠি এসেছে? কি এক স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। বাবার প্রখর আলোও নয়, অন্ধকারকেও অপছন্দ। দই তাঁর পছন্দের খাদ্য। চাকরি থেকে উকিলগিরি তার ভালো মনে হয়, যদি তাতে পয়সা থাকে। তাঁর এক একসময় মনে হয় পঞ্চাশ সালের আগের পৃথিবীতে চলে গেছেন তিনি। কখনো মনে হয়, ভবানীর মা আর নেই পৃথিবীতে। এলাহাবাদে নাতি নাতনিদের হট্টগোল থেকে চলে এসে ভালই লাগছে। এখানের নির্জনতায় চুপচাপ বসতে পারলেই মনের মতো আওয়াজ শুনতে পান। গত সত্তর বছর সংসারের লড়াই সামলে যেন জীবনের দম তাঁর ফুরিয়ে গেছে। নাতি নাতনিরা ভাবে, ঠাকুরদা মানুষের মধ্যে ধর্তব্য নয়। তাদের কাছ থেকে রেহাই পেতে তিনি পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু বুড়িটা কি মনে করছে?

ভবানী বোঝে, সাথীহারা বাবা কষ্ট পাচ্ছেন। মাকে আসার জন্য লিখে পাঠাবে

কিনা বলতে বাবা আপত্তি করেন। উপার্জনহীন ভবানীকে মেজছেলে হরিশ কিছু সাহায্য করুক এই বাবার ইচ্ছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে ভবানী সন্দেহ প্রকাশ করলে স্তব্ধ হয়ে যান তিনি। বাবা বলেন, 'বউমা কি আসরে?' ভবানী কাজ ফুরোলে আসবে বলতে, তার সেই বিশ্বাস নিয়ে বাবা বিদ্রূপ করেন। 'তবুও বিধাতার অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাস করো না তুমি?' কিন্তু তর্ক এড়িয়ে যান। বলেন, 'জ্ঞানী মানুষ নই আমি। সত্যকে দেখতে হয়তো ভয় পাবো।'

নির্জনে তিনি কিসের আওয়াজ শোনেন? ভবানীর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর নিজের জীবনের, ভবানীর হারান কাকা, স্কুলের মাস্টারদের পিতাম্বর দত্তদের শব্দ তিনি শুনতে পান। এদের স্মৃতি যেন ঢের সজীব মনে হয় তাঁর কাছে। ভবানী বলে বাবাকে কাল এলাহাবাদে রেখে আসবে। নির্জনতায় কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কিন্তু বাবা ষাট বছরের দাম্পত্য সান্নিধ্যের পর আর কিছু চাইবার আছে মনে করেন না। ভবানীর চশমার প্রয়োজন। বাবা হরিশকে লিখবেন, টাকা পাঠাবার কথা লিখবেন।

চাটুজ্যে বাড়ির নেমতন্নে ভবানী যাবে না তাঁকে একা রেখে। অতিরিক্ত ভাবনার জন্য ভবানীকে বকেন তিনি। কিন্তু বউমা চাটুজ্যেবাড়ি থেকে না ফেরা পর্যন্ত ভবানীকে ঘর থেকে না বেরোনোর জন্য বলে গেছে শুনে তিনি খুশি হন।

পিওন আসে টেলিগ্রাম নিয়ে। ভবানীর মা মারা গেছে। সেকথা আন্দাজ করেছিলেন বাবা। শান্ত কণ্ঠে তিনি নির্দেশ দেন বউমাকে ডেকে আনতে। কিন্তু ওসব খবর বউভাতের বাড়িতে যেন না জানান হয়। ভবানী প্রশ্ন করে, 'কি জানেন?' বাবা কিন্তু ভবানীকে বিছানায় একটু চুপ করে শুতে বলেন। তারপরে বউমাকে ডাকতে যাবে। বড় হলেও মায়ের মৃত্যু অনেককেই শিশুর মতো কাতর করে ফেলে।

বালাপোষটা ফেলে বাবা উঠে গেছেন। মাও চলে গেছেন। তবুও কয়েকদিন পরেই ভবানীর নিজের পৃথিবী আবার তাকে অধিকার করে নেয়। অন্ধকারে চুরুটের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি তৈরি হয় আবার।

বেকার উকিল থিওজফির বিষয় খোঁজে। অথচ তারই মায়ের মৃত্যু-সংবাদ যেন বিনা তারের বার্তার মতো পৌঁছে যায় তার বুড়ো বাবার কাছে। তাঁকে না জানাতেও তিনি বুঝেছিলেন সব। শান্ত স্থিরতায় উপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর-বিশ্বাসী এই মানুষটি থিওজফির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। অথচ নির্জন সাধনার জন্য তিনি এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে আসেননি। তুচ্ছ বাস্তব অতীত জীবন ও প্রকৃতি অনেক সময়েই তাঁর ঈশ্বরকে পিছনে ফেলে দেয়। স্ত্রীর মৃত্যু ও বেদনা তিনি আগাম অনুভব করেন। টেলিগ্রাম পেয়ে ভবানী বিচলিত, কিন্তু তার বাবা যেন স্থিতধী। টেলিগ্রামের বিষয় না জেনেও তিনি ইতিকর্তব্য নির্দেশ করেন অথবা ঠিক স্থিতধীও নন। যকন উঠে গেলেন 'বালাপোষটা মাটিতে পড়ে গেল।'—খেয়াল থাকলো না।

ভালবাসার মানুষগুলো একে একে চলে যায়। তিনি যেন তাদের সান্নিধ্য পান। কিন্তু ভবানীর সঙ্গে তার ভালবাসার মানুষদের কোনো আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? চুরুটের ধোঁয়ায় সে দেখে এক অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি। সেখানে বাবা মা স্ত্রী কেউ নেই,

নেই অতীতের পরিচিতরা। তারা বেঁচে না মরে, জানেনা ভবানী, অথচ সেই থিওসফির চর্চা করে। আশ্চর্য!

সোনালী আভায় দ্বাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এই চতুর্থ গল্পটি ১৯৩৬ সালে লেখা।

কনে দেখা আলোয় এক সময় মানুষের মুখ হয়ে ওঠে রঙিন। লাল মেঘ। পরক্ষণেই শালিখ নেই। ঝাপসা হয়ে গেছে অন্ধকারে। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে আনল তারাপদ। আজ না জ্বালালেও পারত। তারাপদ বলে, নিভিয়ে ফেলব? নিশ্চিত উত্তর দেয় না সতীশ। টেবিলে একটা বাতি থাকা ভালো। পড়ার ইচ্ছে হলে পড়া যাবে। 'অবিনাশ বাবুদের বাড়ি থেকে কি বই আনতে হবে?' এত বই পড়ে কি লাভ? সোডা ওয়াটার এনে দিল তারাপদ। বিছানা করল। ছেঁড়া তোশক রোদে দেওয়াও যায় না। তারাপদকে বললে কারিগর এনে সে বানিয়ে দিতে পারে।

সতীশের মাকে তারাপদ দেখেনি। সতীশ মাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কেন তিনি নেই তারাপদর এই প্রশ্ন বাচ্চা বোনের অসংখ্য কেন-র মত অবাস্তর মনে হয় সতীশের। চুরুট নিভে গেলে হাতে ধরা দেশলাই সত্ত্বেও সতীশের তা ভুলে যাওয়ার গল্প সে করতে যায় না। সে শুধু বিস্মিত হয়, ছেলের বউ নেই যে মা রাগ করবেন। মা তো ছেলের উপর রাগ করতে পারেন না। সতীশ কেন মাকে চিঠি লিখে আসতে বলে না, বা গিয়ে নিয়ে আসে না? সতীশ বলে, সে অফিসে ছুটি পাবে না।

তারাপদ কি পড়াশুনা করবে? সতীশের এই প্রশ্ন শুনলে মা বলতেন 'সতীশ, লেখা পড়া করে কেউ কোনোদিন মানুষ হয়েছে?' বাস্তবিক হাজার হাজার বই পড়েও আজ সতীশ তোশকের ছিবড়ের উপর শুয়ে আছে। চাকর তারাপদ চলে গেলে সারারাত তার সাথে কথা বলতে একটা টিকটিকিও মিলবে না।

তারাপদ সতীশের জন্য রেঁধেছে মোচার তরকারি, চারখানা রুটি, আর আলু সেদ্ধ। সে ছেলেমানুষ কি রাঁধবে তাকে তা কেউ বলে দেয় না। তার শুধু ভয় তাকে তাড়িয়ে সতীশ যদি কোনো পাকা রাঁধুনি জোগাড় করে নেয়। কিন্তু সতীশের পিসি, বড়দি বা মা হলে বুঝতেন, সতীশ কখনই রুটির সাথে আলু সেদ্ধ, মোচার তরকারি খায় না। অতএব মনস্থ করে একখানা মাত্র রুটি খাবে। দুধ আছে। কিন্তু দুধ খাবে তো সোডা আনিয়েছে কেন সতীশ? সে তারাপদকে দুধটা ক্ষীর বানিয়ে খেয়ে নিতে বলে। তারাপদ ভাবে কেউ যদি না খায় দু সের করে দুধ রাখার কি দরকার? কিন্তু সতীশ বলে দুধ বন্ধ করার দরকার নেই। এক আধদিন হয়ত সোডার সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারে। তারাপদ সাধাসাধি করে নরম জ্বালের দুধ, পুরু সর পড়েছে, সতীশ কি আজ খাবে না? তাকে আশাহত করে শুধু একখানা রুটি আর খানিকটা আলু আনতে বলে সতীশ।

রাত কাটবে। কাল সকালে অফিস মহিষের মতো শিং নেড়ে এগিয়ে আসবে। পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্য সারাদিন কাটিয়ে গোধূলি বেলায় আবার এই ডেক চেয়ারে এসে বসা। তার জীবন থেকে সোনালি আভা এমনই মুছে যাবে রোজ।

এটাকে কি গল্প বলা যায়? জীবনানন্দের অধিকাংশ গল্পই এমন কোনো বিশেষ পরিস্থিতির বর্ণনা।

১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে লেখা এই **সাধারণ মানুষ** গল্পটিও দ্বাদশ খণ্ডে আছে।

দাদা বেরিলিতে থাকেন। অবিবাহিত, ২৫০ টাকা মাইনে। বয়স ছেচল্লিশ বছর। শান্তিতে আছেন। ব্যোমকেশ বিয়ে করেছে ছ বছর। এবার তার দ্বিতীয় সন্তান হবে। সেও বিয়ে করবে না ভেবেছিল। লজ্জার সঙ্গে সে ভাবে নিজের দুটো ডানার পালকগুলো খসিয়ে নভোচারী পাখি বেজির মতো মাটি খুঁড়ে আঁধার বিবরের দিকে চলেছে।

স্ত্রী যখনই ঘুমোয়, শুধু শ্মশান আর মরার স্বপ্ন দেখে। রোজ তাই তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ব্যোমকেশকে আঁচড়ে কামড়ে জাগিয়ে রাখে। তারপর সে ঘুমোয়। আসন্ন ভোরে ক্লান্ত জন্তুর মতো ঘুমিয়ে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জাগবে না। কিন্তু ব্যোমকেশ আর ঘুমোতে পারে না। উঠোনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটা আটচালা ঘরে বাতি জ্বালা দেখে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয়, 'কাশীনাথ'। 'কে ব্যোমকেশ? রাতে ঘুম হল না বুঝি?' কাশীনাথের ভূতে বিশ্বাস। স্কুলে মাস্টারি করত। বি. টি. পাশ নয় বলে চল্লিশ টাকা মাইনে কমানোয় চাকরি ছেড়ে সে আইন পড়ছে। ওকালতি করবে।

কাশীনাথের এই সাহসের তারিফ করে ব্যোমকেশ। আর করে সে বিয়ে করেনি বলে।

'বিয়ে করব বই কি।' ব্যোমকেশ ভাবে, সে যদি কাশীনাথের মতো অবিবাহিত আর কাশীনাথ তার মতো বিবাহিত হত, তাহলেই ভালো হত। কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করে, 'কেন একা ফেলে এসেছ স্ত্রীকে? ঝগড়াঝাটি?' ব্যোমকেশ জানায় স্ত্রীর সঙ্গে সে ঝগড়া করে না। আসলে স্ত্রী স্বামীকে পায়নি। ব্যোমকেশও স্ত্রীকে পায়নি। লজ্জা কেবল, যে সে দুটি সন্তানের পিতা হতে চলল। আর দুঃখ কমলা এসব বোঝে না। কাশীনাথের জিজ্ঞাসা স্ত্রীকে পেতে ইচ্ছা করে না ব্যোমকেশের? ব্যোমকেশ বলে, 'প্রসবের সময় কমলা যদি মারা যায়, কোনো দুঃখ হবে না তার।' সে একা থাকতে চায়।

'কেন?' এখন সারারাতে দুপাতা বই পড়ার সুযোগ তার নেই, তাই। একা হলে বই পড়েই কাটিয়ে দেবে সারাজীবন। নইলে জাহাজের খালাসি হয়ে বাংলাদেশের নদীতে নদীতে ঘুরবে। পথে, পাহাড়ে ঘোরাই তার আকাঙ্ক্ষা।

কাশীনাথ ভাবে এমন কোনো পাখি আছে যা নীড়ে আসে না? ব্যোমকেশ এমন পাখির কথা ভাবে যাদের নীড় পাহাড়ের উপর। নক্ষত্রের স্তন ঘেঁষে। সে পালিয়ে যাবে আগে কলকাতায়। তারপর জাপানের জাহাজে।

জাপান কি পৃথিবীর বাইরে? সেখানে গিয়ে ব্যোমকেশ মানুষের খোলস বদলাতে পারবে? নূতন শিক্ষাদীক্ষা হয়ত পাবে। টাকা করবে। জাপানের চেরিকুঞ্জে জীবনটা কাটিয়ে দেবে ভেবেছ? বরং ঘরে ফিরুক। স্ত্রীকে সুস্থ করে তুলুক। অফিসের কর্তাদের খোসামোদ করে চাকরি বজায় রাখুক। জাপান, ইতালি, স্পেনে ভীড় বাড়াবে কেন মিছিমিছি?

চা করতে বসল কাশীনাথ। বলল, 'ভাবছ, কাশীনাথও আমাকে চিনল না। কিন্তু একদিন বুঝবে।'

কাশীনাথ যাচ্ছে কলকাতায়। আর ফিরবে না। বিয়ে করবে। কাশীনাথের কেউ

নেই। চাকরি নেই। বয়স তেতাল্লিশ। কেমন মেয়ে পাবে সে? কাশীনাথের জবাব সন্তানের মা হতে পারে এমন একটি মেয়ে হলেই চলবে। সোনালি খড়ের বোঝা টেনে গরুর গাড়ি চলেছে। যুদ্ধ করতে নয়। আত্মহত্যা করতে নয়। নীড় বাঁধতে। এই চিরন্তন শান্তির ছবি। পরিবার গড়ে তোলো। তোমার জীবনের আসল কাজ বাকি।

একটা টিনের সুটকেশ আর মস্ত বোঁচকা নিয়ে কাশীনাথ স্টেশনের দিকে চললো। ব্যোমকেশ ভাবলো, হায়! কাশীনাথ যদি কমলাকে পেতো।

শীতের পৃথিবী। নিদারুণ শূন্যতা চারদিকে। মাঠের কিনারে কাত হয়ে বসে ব্যোমকেশ ভাবছিল।

চির অতৃপ্তিময় মানবজীবন। সবাই ভাবে 'যাহা পাই, তাহা চাই না'। কিন্তু কাশীনাথ প্রকৃত শান্তির স্বরূপ ও সন্ধান সুন্দর করে দিয়ে গেছে তার বন্ধুকে।

আস্বাদের জন্ম দ্বাদশ খণ্ডের ষষ্ঠ গল্প, ১৯৩৬ সালে লেখা।

মাকে রহস্যময় মনে হয় সোমনাথের। অনেক বছর আগে এক মৃত সন্তান হয়েছিল সোমনাথের স্ত্রীর। এবার আবার সন্তানসম্ভবা সে। কিন্তু মার কোনো উৎসাহ নেই। খুব বয়স যে বেশি হয়েছে তাঁর, তা নয়। মাত্র ছাপান্ন। সত্তর বছরেও তিনি সংসারের স্তম্ভ হয়ে থাকবেন। তিনি শ্রীরামপুরে বাপের বাড়ি যাবার জন্য সোমনাথের কাছে কিছু টাকা নিলেন। সোমনাথ জানে বাপের বাড়ি গেলে পাঁচ-ছ মাসের আগে ফেরেন না। এদিকে বিভার এই অবস্থা, বাড়িতে স্ত্রীলোক রইল তিনটি। বিভা—যার দেড় মাস পরে সন্তান হবে হয়ত মৃত সন্তান। তার মাও ছিল মৃতবৎসা। মাতৃহারা বিভা শাশুড়িকে আপন করতে পারেনি।

দ্বিতীয়জন পিসিমা। সংসারের আরও দূরের মানুষ। তিনি শিক্ষিত, সমাজকর্মী। একটি নারীমঙ্গল আশ্রম খুলেছেন বিধবাদের জন্য। সপ্তাহে চার পাঁচ দিন সেখানেই থাকেন। বাড়িতে যতক্ষণ, বাগানে ঘুরে লেবু, করমচা প্রভৃতি ফল তোলেন। অফুরন্ত সেলাই করেন, বই পড়েন। সাগু, কলা, চিনি মেখে খেয়ে ঘুমোন। পরদিন ভোরেই দেখা যায় তিনি আশ্রমে চলে গেছেন। বিভার খবর তিনি রাখেন না। বিভা বিধবা হলে পিসিমার নজরে পড়ত। এখানে কর্তব্য বন্ধনের কোনো ভূমিকা নেই। বিভা আর পিসিমা যেন ভিন্ন নক্ষত্রের জীব। কেউ কাউকে বোঝে না। অবজ্ঞা করে।

তৃতীয় নারীটি হল সোমনাথের বোন নীহার। নীহার আই. এ. পাশ। বয়স বাইশ, বিয়ে হয়নি। অর্থ ও স্বাস্থ্যের অভাবে বি. এ.-ও পড়া হয়নি। চাকরির দরখাস্ত লেখে। এমন এক আইবুড়ো বন্ধু সুষমার সঙ্গে গল্প করে।

হয়তো নীহারের ধারণা দাম্পত্য সুখ দাদাই অনুভব করে নিল। নীহার এই দম্পতির কাছে ঘেঁষে না। সারাদিনে চোখের দেখাও হয় না দুপক্ষের।

সোমনাথের বাবার সত্তর বছর বয়স। প্রায় অন্ধ, নিঃসম্বল। দুপুরে লাঠি হাতে বাগানে ঘুরে বেড়ান। তামাক টানেন। সারাদিন কি চিন্তা করেন, সোমনাথ জানে না।

সন্ধ্যায় বিভাকে খুঁজছিল সোমনাথ। ননদের ঘরে সে দু-চার মাসেও যায় কিনা সন্দেহ। সেখানেই খুঁজতে গেল সে। বাবা তার সাড়া পেয়ে সোমনাথকে জিজ্ঞাসা

করলেন তার মা কবে ফিরবেন। তাঁর দুশ্চিন্তা বৌমার এই সময়ই একজন ভালো স্ত্রীলোক থাকা দরকার।

এ সংসারে পিসিমা ছাড়া সবাই বিতৃষ্ণ বৈরাগী। সবাই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ। অবশ্য বিভার আসক্তি আছে কিন্তু তা মেটানোর ক্ষেত্র নেই। সোমনাথ তার দরিদ্র স্বামী।

পিসিমা এক সাধুর জীবনচরিত পড়ছিলেন। তিনি সংসারের কোনো খোঁজ রাখেন না। বিভার ভার তিনি নেবেন না। আত্মকেন্দ্রিক পিসিমা সোমনাথের কাছে চশমার জন্য টাকা চান, কিন্তু থাকতে চান আশ্রমে।

নীহারও বিভার কোনো খোঁজ রাখে না। সে বলে, বৌদি অন্য ধরনের মেয়ে। এখানে আসে না। সংসার যেন একটা মঠের মতো। নীহার রাত্রে খায়নি। ফূর্তি নেই, উৎসাহ নেই, সন্ন্যাসীর মতো। শুধু নীহারকে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে। কাজ পেলে সে আফ্রিকাতেও যেতে রাজি। সোমনাথের মতো সত্তর টাকা মাইনের দার্শনিক সে নয়। উপার্জনশীল স্বামী, কিম্বা চাকরি, কিংবা মৃত্যু—এর যেকোনো একটি নীহারের চাই-ই।

'বিভা সোমনাথকে কি করে বিয়ে করল? সে তো সুন্দরীই ছিল।' এ প্রশ্নের চোখা উত্তর দেয় নীহার, 'মেয়েরা ঠকে, পুরুষদের ঠকানো শক্ত। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যা পেয়েছো তা ভোগ করতে পারলে কি? যোগ্যতা অর্জন না করলে সুখ মেলে না।' সোমনাথ জানে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা সুখের অধিকারী হয়ে জন্মায়নি। নীহারও মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে জেতা কঠিন। তারা, তাদের মা বাবা শক্তি হিসাবে খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীর। শেষ জীবনে সাগু, কলা খেয়ে পিসিমার মতো বিধবা আশ্রমে পড়ে থাকা নীহার কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে তার বিশ্বাস তার জীবন পিসিমার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। পিসিমার ধারণা তিনি ভগবানের পায়ের কাছে বসে আছেন। এই চিন্তার লোকেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোমনাথরা পারবে না। দুবেলা খাবার অভাব এখানে হত না নীহারের। তবু মানুষ বেরিয়ে পড়তে চায়। চলে যাবার একটা আনন্দ আছে। যেন অন্যত্র আধি-ভৌতিক কিছু অপেক্ষা করছে। সোমনাথ আরশিতে মুখ দেখার কথা বললে আহত নীহার উত্তর দেয়, 'আমার মুখ দেখে ভয় পাচ্ছ। এমুখ জন্মেছিল মেয়েদের পড়ানোর জন্য। শেষে শ্মশানের আগুনে ছাই হয়ে যাবে।'

সোমনাথ চলে এল। বাবা নীহারকে সস্নেহে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

বিভা নিজের ঘরে বসেছিল। বিভা বিশ্বাস করে না সোমনাথ তাকে খুঁজছে। তার ধারণা নীহার আর সুষমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গিয়েছিল সে। তার বিশ্বাস কলকাতায় সোমনাথ সন্দেহজনক জীবন কাটতো। সোমনাথ তাকে বোঝায় কারো উপর অভিমান করে লাভ হয় না। পৃথিবীতে মানুষ প্রায় একা। মা বাবার কথা মনে করে বিভা কাঁদতে বসে। আবার মুহূর্তেই নিজেকে সামলে সোমনাথকে খেতে যেতে বলে। তার বক্তব্য বহুবিধ। সোমনাথের মা বিভাকে জব্দ করতে শ্রীরামপুরে চলে গেছেন। বাপ মা-মরা মেয়েকে শাস্তি দিলে ঈশ্বরের অন্য ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়ত, নীহার রাতে খায়নি বলে

সোমনাথের কষ্ট। বোনকে তো সে চিরকাল ধরে রাখতে পারবে না। ঐ কদাকার মেয়ে যত তাড়াতাড়ি পার হয় ততই ভালো। তারপর বিভা সন্ধ্যার সময় সোডার সঙ্গে গরম সিঙ্গাড়া খাবার বায়না ধরেছে এবং রাতে চার মাইল হেঁটে ঠাণ্ডা সিঙ্গাড়া এনে তাকে দিলে দু-এক কামড় দিয়ে থু-থু করে ফেলে দিয়েছে। বলেছে, মা বাপ- মরা মেয়ে পেয়ে বিভাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে।

বাড়ির কুকুরটার বাচ্চা হবে। সিঙ্গাড়ার গন্ধ পেয়ে সে এলো। তাকে খাইয়ে বিভার তৃপ্তি। এতক্ষণে বিভার হুঁশ হয়েছে সোমনাথ তো সাইকেল ধার করেও দোকানে যেতে পারতো। হিমে ভিজতে হতো না। এবার বিভা স্বয়ং খেতে যাবার প্রস্তাব দিল। কুকুরটিকেও ডেকে নিল। এমন স্তব্ধ হেমন্তের রাতে নক্ষত্রের নির্দেশে পরম আস্বাদনীয় হয়ে উঠল সব সোমনাথ, তার বাবা, পিসিমা, নীহার এবং বিভার হৃদয়ে।

পুরো গল্পটি জুড়ে কতকগুলি সংকীর্ণ—আত্মকেন্দ্রিক মানুষের ভাবনা চিন্তার টানা পোড়েন। একটা দীর্ঘ ক্লান্তিকর কাহিনী। রচনায় শিল্প-সুষমাও নেই কিছু। সোমনাথের বৃদ্ধ বাবার চরিত্রটি ছাড়া আর কারো চরিত্রে গভীর অনুভবশীলতাও নেই। এই কাহিনীর সার্থকতা বোঝা যায় না। জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুধু ; হৃদয়ের কোনো সৃষ্টিশীলতা কাজ করেনি।

কুড়ি বছর পর ফিরে এসে ১৯৩৬ সালের অক্টোবর নভেম্বরে লেখা হয়েছিল এই গল্পটি। অবস্থাপন্ন সোমনাথ বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা করতে বোম্বে গিয়েছিল। তখন তার বয়স সতেরো। নানা জায়গায় ঘুরে চল্লিশ বছর বয়সে মাত্র পাঁচশ টাকা হাতে সে ফিরে এল কলকাতায়। চেহারা একটু স্থূল হওয়ায়, গোঁফ রাখায় যেন হেড মাস্টারের মতো লাগছিল তাকে। বিয়ে করেনি। নারীর সৌন্দর্য তাকে নাড়া দিলেও কখনো সম্পর্কের প্রয়োজন তেমন বোধ করেনি। অর্থের লালসা নিয়ে ব্যবসা করেনি। সোমনাথের মনে কোনো অস্থিরতা ছিল না। অন্তরের কোনো শক্তি তাকে 'কি করছ? কি করবে?' এই তাড়নায় বিদ্ধ করেনি।

কলকাতার এক হোটেলে খেয়েদেয়ে চৌকশ ঘুম দিয়ে রওনা হল সে গ্রামের দিকে। সেখানে বিঘে তিন জমির উপর বড় একতলা দালান আছে। বছর সাতেক আগেও এ বাড়িতে এসে ক'দিন ছিল সে। এবার যাচ্ছে স্থায়ীভাবে থাকতে।

গ্রামটি ক্রমশ শহরের ছোঁয়া পাচ্ছে। বিশ্বম্ভর নামে একজন বছর পঞ্চাশের নীচু জাতের মানুষ, স্ত্রী-পুত্রহীন। সোমনাথের দালানেই রাত কাটায়। তাকে বলতে সেই তুলে এনে দিল স্নানের জল। রান্না করে খাওয়াল। বিশ্বম্ভর চৌকিদারের কাজ করত। এখন খবরের কাগজ বিলি করে। তার মজুরি কমিয়ে দেবে বলাতে সে ভেবেছিল কাজ ছেড়ে দেবে। সোমনাথ বারণ করল। বিশ্বম্ভর তার কাছেই থাকুক, খাক। আর মাইনেটা তো উপরি। সোমনাথ তার সঙ্গে পরামর্শ করে হাঁস মুরগীর খামার বা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসা গাঁয়ে চলবে কিনা।

পরদিন সকালে বিশ্বম্ভর গেছে কাগজ বিলির কাজে। সোমনাথ টেবিল চেয়ারে লেখা-লিখি করছিল। একটা গাড়ি এসে থামল ফটকে। কুড়ি একুশ বছরের বিধবা

একটিমেয়ে এগিয়ে এল। গাড়ির অপর সঙ্গীটি ঘুরে আসছি বলে চম্পট দিলেন। মেয়েটির মুখশ্রী সোমনাথের হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগাল। জানা গেল মেয়েটিকে তার ছোটমামা রেখে গেলেন। দু-একদিনের মধ্যে মেয়েটির মাসিমা এক যক্ষ্মা রোগী নিয়ে এখানে আসবেন। বাড়িটা তাকে গোছগাছ করে রাখতে হবে। এবাড়ি যেন মেয়েটিরই নিজের। সোমনাথই যেন আগন্তুক। সে বলল, গত বছরও শরতে কয়েক মাস তারা এখানে কাটিয়ে গেছে— মেয়েটি, তার মেজমামা আর ভবশঙ্কর।

সোমনাথ ভেবেছিল, যিনি কমলাকে রেখে গেলেন, তার ছোটমামা। তিনি তো গত বছর আসেননি। হয়তো ভুল ঠিকানায় দিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু কমলা ভুল করেছে মানল না। দেখাল এখানের দেয়ালে তার নাম নীল পেন্সিলে লেখা আছে। তার ধারণা মামাতো ভাই ভবশঙ্করের বাড়ি এটা। কলকাতায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ করে। কমলার ধারণা সোমনাথ উকিল খালি বাড়ি পেয়ে সেরেস্তা সাজিয়ে বসেছে। বর্ধমান থেকে আজ বা তিন চারদিন পরে যক্ষ্মা রোগী তারানাথকে নিয়ে কমলার মাসিমা আসবেন। সোমনাথ কৌতুক করে বলল এদেশটাকে তো স্বাস্থ্যাবাস মনে হয় না। ওঁরা বরং পশ্চিমে গেলে পারতেন। কমলা জানাল যতদিন না সে ব্যবস্থা হয় পথে এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবেন ওঁরা। তারানাথ কমলার মাসতুতো ভাই। তার সেবার কাজে এসেছে সে।

সোমনাথ জানতে চাইল ছোটমামা কমলাকে রেখে কেন বা কোথায় গেলেন! কমলার ধারণা ট্রেনে চলে গেছেন এতক্ষণ। কলকাতায় মামাবাড়িতে টেলিগ্রাম করে লাভ নেই। পূজোর ছুটিতে তারা বেরিয়ে পড়েছে। ভবশঙ্করের ঠিকানাও সে জানে না। তার মাসিমা যদি তিন চারদিন বাদে আসেন কি হবে, এ প্রশ্নে কমলা বলল বিধবা হয়ে অবধি সে নিজেই নিজেকে চালাচ্ছে। এখানে সে একা থাকতে পারবে।

কমলা জানতে চাইল, সোমনাথ কি ভবশঙ্করের কাছ থেকে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। নইলে কি শর্তে দখল করেছে? সোমনাথ বলল, 'কোনো শর্ত নেই, আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে যে কয়দিন খুশি কাটাতে পারেন, একজন রুগী আসছে, তার চেয়ে আমার দরকার বেশি নয়।' তবু মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতে সাহস হয় না। প্রশ্ন করে নিজেকেই, এই মেয়েটি কি তোমার মেয়ের মতো নয়? কি অন্যায় কথা ভাবছো তুমি সোমনাথ?

কমলা বলল, 'আপনি কোথায় যাবেন? আপনার বাক্স প্যাঁটরা রয়েছে। মশারি টাঙানো। ক'দিন আছেন আপনি এখানে?' সোমনাথ কাল বম্বে থেকে এসেছে। তার স্ত্রী নেই, একথা জেনে কমলা কি ভাবছিল, জিজ্ঞাসা করল সোমনাথ। সে কি কথা বলত সোমনাথের স্ত্রীকে? তার জবাব না দিয়ে মেয়েটি একটা গাড়ি ডেকে দিতে বলল। সে কলকাতায় যাবে। একা মেয়েমানুষ কি করে থাকবে? সোমনাথ জানতে চাইল হাওড়ায় নেমে রাত দশ-এগারোটায় রিক্সায় চড়ে বাসা চিনে যেতে পারবে সে?

কলকাতার গাড়ি ক'টায় ছাড়ে জানতে চাইল কমলা। ওয়েটিং রুমে বসার বদলে সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে সিঁড়িতেই বসে গেল। তাকে পীড়িত করছে বলে দুঃখ

জানাল। তার মুখের হাসি শিউলি ফুলের শবের মতো মনে হচ্ছিল সোমনাথের। কথা প্রসঙ্গে সোমনাথ বম্বে ফিরবে না বলায় তাকে এখানেই থিতু হবার পরামর্শ দিল। বলল কমলা নিজে আজীবন কলকাতার মড়া গলিতে কাটিয়ে এখন চলেছে যক্ষ্মারুগীর সেবা করতে। সেখানেই ঘাড় গুঁজে হয়ত কাটাবে ছমাস। তার মামারা তাকে ফেলে ছুটিতে চলে গেল। কারণ প্রত্যেকে বড় ক্লান্ত তারা। ওর মাসিমা যখন তারানাথকে নিয়ে আসবে সোমনাথ যেন তাঁকে বুঝিয়ে বলে কেন সে থাকতে পারলো না।

সোমনাথ তার সঙ্গী হতে চাইলে তার এই অকারণ মাথা-ব্যথায় কমলা হেসে উঠলো। একা অনেক চলাফেরা করেছে কমলা। জানে, পথে মা-বাবার মতো কেউ না কেউ জুটে যায়।

টেবিলে কার্ডে সোমনাথ চৌধুরী নাম দেখে কমলা জানতে চাইল তারা জমিদার কিনা। বাড়ির তদারক করেনি কেন। বংশের পূর্বপুরুষরা তাকে শান্তিতে বাড়িতে থাকতে দেখে খুশি হবেন, কমলার এই ধারণা।

সোমনাথ বলল তার জায়গায় থাকলে কমলা বুঝত, সোমনাথের জীবন ঈর্ষণীয় নয়। এখানে একটি রাত শান্তিতে কাটে, পরের রাত কাটতে চায় না। কমলাও জানাল তার মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী কেউ নেই। ভবিতব্যই তাকে চালায়। সোমনাথকেও সে ভবিতব্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে বলে। কলকাতায় চলেছে কমলা হয়তো আর দেখাই হবে না। নিজেকে সোমনাথের ছোট বোন বা মেয়ের মতো ভাবতে বলে না সে। কার মনে কি দাগ থাকে কে বলবে? দাগ তো ঘৃণার জিনিস নয়। পথে ঘাটে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয় একবারই কেবল।

চোখ বুজে সোমনাথ বলল, 'মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে একবার।' কমলা বলল, 'পূর্বপুরুষরা তখন প্রশ্ন করবেন সে বংশের ধারা অব্যাহত রাখেনি কেন?' সোমনাথ জানতে চায় স্বয়ং নিঃসন্তান কমলা কেন একথা বললো? কমলা জানাল, এটা একটা কথার কথা।

সোমনাথ দেশে থাকুক না থাকুক এই পৈতৃক ভিটেতে দীর্ঘ শীতরাত, পেঁচার ডাক, শিশিরের শব্দ, পূর্বপুরুষদের প্রশ্ন— কিছু উত্তর তো নেই সোমনাথের কাছে। আকাশে নক্ষত্র আসে। কিছুদিন সোমনাথ শীত রাত ঠেকাতে পারবে। তারপর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিশে যাবে।

কমলা কিছু বলল না। চারটের রেল গাড়ি ছাড়ার আগে সোমনাথ একটা গাড়ি ডেকে এনে পৌঁছে দিতে বলল কমলাকে। পথে খাবার জন্য গাছের বাতাবি লেবু পেড়ে দিল কটা।

ভবিতব্যহীন দুটি নারী-পুরুষকে সম্ভাবনাময় এক পরিস্থিতিতে অবাস্তবভাবে টেনে এনে গল্পটি বানিয়েছেন লেখক। পাঠকের মনে একটা প্রত্যাশা জাগে। কিন্তু তাদের যুক্ত করার সাহস তিনি দেখাতে পারেননি। হয়তো যুক্ত করলে এর সৌন্দর্যটা আবিল হয়ে উঠত। বরং সমাপ্তির অতৃপ্ত দুঃখবোধ শৈল্পিক হয়েছে।

আর শেষটুকু স্বাভাবিক রেখেছেন বলেই সূচনার নড়বড়ে জোড়াতালি দেওয়া উপস্থাপন

নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। গল্পটা মিলনান্ত বানাতে চাইলে আগের পটভূমি যত্ন করে সাজাতে, মেরামত করতে হত। তাতেই অবশ্য লেখকের মুন্সিয়ানা বোঝা যেত। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্লট নির্মাণের নৈপুণ্য জীবনানন্দের কাছে এই পরিণত স্তরেও আশা করা বাতুলতা। সঙ্গ নিঃসঙ্গ গল্পের সঙ্গে এগল্পের গভীরাত্মক মিল আছে।

এক সেতুর দুটো তীর ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসের লেখা। এগল্পটি দ্বাদশ খণ্ডের অষ্টম কাহিনী।

সমরেশবাবু হেড মাস্টার। ধার্মিক মননশীল। ছেচল্লিশ বয়স হলেও চেহারাটা যৌবন ঘেঁষে। ত্রিশ বত্রিশ বছরের মানুষ বন্ধু হতে পারে তার। অনেক কিছুই জানেন না, দেখেননি।

বাইশ-তেইশ বছর থেকেই লেখার অভ্যেস তাঁর। সন্ধ্যার পরে ঘরে ফিরে সেই বাণ্ডিল নিয়ে বসেন। এগুলি পুড়িয়ে ফেললেই হয়। হরকান্তবাবু এলেন। খাতা দিয়ে আলোটা আড়াল করতে বললে সমরেশ সেটা নিবিয়েই দিলেন। দরজার কাছে জ্যোৎস্নায় কৃষ্ণচূড়ার ছায়া নড়ছিল। সমরেশ হরকান্তকে একটা কাহিনী বললেন। বছর বাইশেক আগে মেসে থাকতেন। চাকরি পাননি, কষ্ট হত চালাতে। এক খুব গরীব বন্ধুর কাছে দুটো টাকা ধার করেছিলেন। সেই থেকে ঐ বন্ধুকে এড়িয়ে চলতেন। ওই ঋণ শোধ করা হয়নি আজও। এখন কি করা যায় জানতে চাইলেন সমরেশ। একুশ বছর আগে পুরনো ঠিকানায় চিঠি বা টাকা পাঠিয়ে লাভ নেই। এমন তুচ্ছ বিষয়ে মানুষ কেন মাথা ঘামায়, ভেবে পেলেন না হরকান্ত।

তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন। সমরেশ তাঁকে বসিয়ে নূতন গুরুতর এক প্রসঙ্গ তুললেন। সেও কুড়ি বছর আগের মেস-জীবনের কথা। সমরেশ ভালো মাইনের এক সরকারি চাকরি করছেন তখন। বিয়ের জন্য ভূপতি চৌধুরী বলে এক ভদ্রলোক সমরেশকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মা-মরা মেয়েকে দেখানোর জন্য। তখন সন্ধ্যা আটটা। সমরেশ চেয়ারে আর ইজি-চেয়ারে ভূপতি। মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল একটি ভেলভেটের পর্দার আড়ালে। বাবা ডাকতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সমরেশকে প্রণাম করেছিল।

হরকান্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এমন প্রণাম পেয়ে তখন কি মনে হয়েছিল সমরেশের? সমরেশ ভেবেছিলেন যেন তিনি কোথাও পৌঁছে গেছেন। মেয়েটি প্রণাম করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। রং ফর্সা নয়, প্রসাধন ছিল না। কিন্তু দেখার মতো তার রূপ। তার রং যেন মেঘলা রাতের জ্যোৎস্নার মতো। নাম প্রতিমা।

হরকান্ত শুধোলেন, ভূপতিবাবুর বাসার ঠিকানা মনে আছে? সমরেশ বললেন লেখা আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কাকে দেখবেন হরকান্ত। সে কি বেঁচে আছে? হরকান্তকে বিস্মিত হতে দেখে বললেন, 'অন্তত আমরা তো তার কাছে মরে গেছি। বিশ বছর আগের রাতটিতে পৌঁছুতে হলে যে সেতু পেরোতে হয়, মানুষ ঈশ্বরকে পেতে পারে, কিন্তু এটা পারে না।

তারপর ভূপতিবাবুর নির্দেশে মেয়েটি বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছিল। আবার কখন

যে পিছন দিকে এসে জলখাবার রেখে গিয়েছিল। মেয়ে পছন্দ হয়েছিল সমরেশের। ভূপতিও বিয়ে করে সমরেশকে তাঁর সঙ্গেই থাকতে বলেছিলেন। কারণ চৌধুরী পরিবারের কে আর আছে? সমরেশও মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করার গভীর আগ্রহ বোধ করলেও ভূপতিবাবুকে সেকথা বলতে পারেননি। বিয়ের মতও দেয়নি। সমরেশের মনে হল ভূপতিবাবুর মতো স্বাস্থ্যবান অভিজাত পিতা সমরেশ হতে পারে না। এই নিঃস্তব্ধ চৌধুরী পরিবারে সমরেশের সন্তানরা ঘোলা নদীর আবর্ত তুলবে। তিনি ভূপতির বাসায় গিয়েছিলেন নিতান্ত সামান্য একটি মেয়েকে দেখতে পাবেন ভেবে। কিন্তু এরকম এক মেয়ে কি ভেবে সমরেশকে দেখালেন ভূপতি। সমরেশের দাম্পত্য-জীবনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন?

তার কথা শুনে ভূপতিবাবু হাসলেন। আরো দুদিন এলেন অনুরোধ করতে। তারপর আর এলেন না। হরকান্ত বললেন, 'ভূপতিবাবুর কলকাতার বাড়িতে একবার গেলে হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, মেয়েটিকে একবার দেখার সাধ নিয়ে, যে প্রাণের আবেগে সমরেশকে প্রণাম করেছিল। আজও তাকে মনে রেখেছে হয়তো।'

সমরেশ কিন্তু তা চান না। তিনি বরং কামদা বিশ্বাসকে দেখতে চান, যে টাকা পায়। কিন্তু সেই নারীটির সঙ্গে তো ধার করা দুটো টাকার সম্পর্ক নয়।

হরকান্ত জানতে চেয়েছিলেন সংসারে ব্যবহৃত হয়ে মেয়েটি এখন প্রেত হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই কি সমরেশের মত নেই?

এমন ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সমরেশ সতর্ক করেছিলেন হরকান্তকে। হরকান্ত জানতে চাইলেন প্রতিমাকে বিয়ে না করার জন্য সমরেশের কি আপশোস হয়? সমরেশ শুধু বলছিলেন, মেয়েটির মুখ পুরো ভুলে গেছেন তিনি। তার ছবি আঁকতে পারেন না। কোনো বিদেশী শিল্পীর ছবিতেও সে মুখের আদল পান না। কিছু জিনিস পৃথিবীতে একবারই হয় দ্বিতীয়বার হয় না।

হরকান্ত সমরেশকে কাশীতে যেতে বললেন। মণিকর্ণিকা ঘাটে বসলে আসক্তি ঘুচে যাবে, স্বাস্থ্য ফিরবে। পুরোনো পাণ্ডুলিপি নাড়াচাড়ার প্রয়োজনবোধ হবে না।

সমরেশ জানালেন ঐ পূর্ণ সুস্থিরতা তার কাম্য নয়। হরকান্ত জানতে চাইলেন তবে কি সমরেশ আমৃত্যু প্রতিমার কথা ভাববেন। সমরেশের বক্তব্য ইচ্ছে করে কেউ কিছু মনে রাখে না। জাগতিক নিয়মে কিছু টিকে থাকে। ভালোই হয়।

'আমার যদি এরকম হতো।' হরকান্ত বিবাহিত। তার ধারণাটা—সব অনুভব স্খলিত হয়ে কাদায় মাংসে খসে পড়ে, খেয়েদেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে। সমরেশ বিয়ে করেন নি। তাই হরকান্তর একথা বুঝবেন না। প্রতিমাকে সমরেশ যদি বিয়ে করতেন তাহলে হরকান্তর মতোই হয়ে যেতেন। হরকান্তর স্ত্রীর মতো। ভূপতিবাবুর মেয়ের সঙ্গে সমরেশের যা সম্বন্ধ তা চল্লিশ বছর বয়সেই ছসাতটি সন্তানের জননী মহিলা ঠিক বুঝবেন না। এই দুর্গন্ধের মধ্যে জীবন-যাপন হরকান্তই বোঝেন। ছেচল্লিশ বছর বয়সেই হেডমাস্টার সমরেশের নিরপরাধ একলা জীবন-যাপন অন্যরকমের।

প্রতিমার মুখের ভাস্কর্য অবয়ব সমরেশ ভুলে গেছেন। পরিচিত আরো কিছু নারীর

মুখের সঙ্গে মিশে একাকার। তার মুখ আজ রাতেও সমরেশকে ঠাট্টা করতে এল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সমরেশ। লালসা রক্ত স্থবির বানরের মতো কুঞ্চিত মুখ যেকোনো কদাকার নারীকেও যেন লালসায় জড়িয়ে ধরবে। ব্যথিত সমরেশ নিজেকে কাদার ভিতর একটা শুয়োর ভাবলেন। ভোরের আলোয় হিমরাতের অন্ধকার পেরিয়ে এক সেতুর পরপারে চলে যেতে চাইলেন যেখানে কোনোদিন ঘুম ভাঙে না।

প্রেমের গভীরতার সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার দ্বন্দ্ব, যৌবন স্বপ্নের সঙ্গে স্থূল প্রাণ-ধারণের সংঘাত এখানে জীবনানন্দ দেখিয়েছেন। নায়িকা প্রসঙ্গে হরকান্তের উক্তি 'মাংসের কাজে ব্যবহৃত হয়ে সেই মেয়েটি এখন প্রেত' এ ভাষায় সমরেশের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ বুঝিয়ে দেয় খাঁটি প্রেমিক সে। জীবনের নিঃসঙ্গতা তাকে হয়ত লালসার আগুনে পোড়ায়, কদর্য কাদায় লিপ্ত করে। তবু তার একটা স্বপ্ন-সুন্দর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আর এক সেতু পথে সেখানে তার অভিসার। হরকান্তের মতো পুরো জীবনবেষ্টনীকে সে ক্লেদলিপ্ত করেনি। গল্পটি আকর্ষণীয় হয়েছে।

বৃত্তের মতো গল্প ১৯৩৬ সালের রচিত জীবনানন্দ সমগ্র দ্বাদশ খণ্ডের নবম কাহিনী।

সমরেশ ঘোষাল মারা গেছেন। তাঁর পরিচিত কয়েকজন আমৃত্যু তাঁর সুখস্মৃতি বয়ে যাবে। বিভূতি ভাবেনি সমরেশের মৃত্যু সংবাদ তাকে পেতে হবে কখনো।

সমরেশ নিজের মাকে এত ভালোবাসত, মা মারা যেতে পারেন এই ভাবনা তাকে বিষণ্ন করত। সাধারণে সমরেশকে কাজকর্মের, হাসিঠাট্টার মানুষ ভাবত বটে। কিন্তু অন্তরঙ্গরা জানত সে মননশীল। মাতৃহীন বিভূতি মায়ের অভাব বোধ করে না, এটা তাকে বিস্মিত করত। সহপাঠী কারো মা মারা গেলে যেন অসুস্থ হয়ে পড়ত সমরেশ। পড়ার উত্তর দিতে না পেরে বেত খেতো। নিজের মাকেও একথা বলতে বা বোঝাতে পারত না।

এর বারো বছর পরে যখন সমরেশের মা মারা গেলেন, যথাবিধি সৎকার সেরে বাবার সঙ্গে সমরেশ বিন্ধ্যাচলে চলে গেল। যখন ফিরল তার কাছে মায়ের প্রসঙ্গ বিভূতি তোলেনি। তবু নারীহীন এবাড়ির প্রকৃতি যে বদলে গেছে তা সে অনুভব করেছে।

বিন্ধ্যাচলে সমরেশের কোনো বিষাদ বা অবসাদ ছিল না। পাহাড়ে সাধুদের সঙ্গও তাকে টানেনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধুদের যেন বৃত্তের মতো ব্যবধান।

বিন্ধ্যাচলে যিনি সমরেশের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তিনি এক মাদ্রাজি ভদ্রলোক। ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। চাকরি ছেড়ে এখানে বইপত্র নিয়ে আনন্দে আছেন। দর্শনের বই একটা লিখেছেন ইংরেজিতে, প্রকাশ হবে। সমরেশ পাণ্ডুলিপি দেখেছে কিন্তু দর্শনের কি বোঝে?

ভেঙ্কটাপ্পার দুটি বিধবা বোন ও তিনটি মেয়ে। তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে একজনের কাছে কিছু মাদ্রাজি (তামিল?) শিখেছিল। হাসিকৌতুকের মধ্যে তাদের মমতা ছিল কিনা সে বোঝেনি। বিভূতি ঐ মেয়ে দুটির মমতার অস্তিত্বের কথা বললে সন্দিগ্ধ সমরেশ ভেবেছিল বিভূতি কি 'বিন্ধ্যাচলে গিয়ে সব দেখেছে?' এসব মানুষের প্রাচীনতম অনুভূতির পথ। তার সবটা ধরা পড়ে না।

বিন্ধ্যাচলে নানা দেশের মেয়ে পুরুষের মধ্যে বাঙালীও ছিল। বিভূতির পরিচিত

নির্মলা নামে একজনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল কিনা সমরেশ মনে করতেও পারেনি। অথচ তার দেরাজে ভালো কাগজ, অভিজাত হাতের লেখা একরাশ চিঠি ছিল নির্মলার। বিভূতির এই আত্মীয়াকে সমরেশ বাড়ি ঢুকতে দিত না। তার অপরাধ সমরেশকে এই প্রেমপত্রগুলো লিখেছিলো সে। অনেকের পরম কাম্য এই মেয়েটিকে পেতনী মনে হয়েছিলো তার। এ ব্যবহারের জন্য সমরেশ অনুতপ্ত ছিল না।

নির্মলার সম্পর্কে সমরেশের ভাব ভাষা শুনে অবাক বিভূতি প্রতিবাদ করেছিল। সমরেশ তখন একদিনের ঘটনা বলে। এক সন্ধ্যায় বিন্ধ্যাচলে নির্জন জ্যোৎস্নায় ডেক চেয়ারে বসে সমরেশ মায়ের বিদেহী আত্মার দেখা পাবার প্রত্যাশা করছিল। বদলে নির্মলা এলো। মুখে ক্রিম, কাপড়ে এসেন্স, গাড়িতে এসেছে—এ স্থূলতা তার সহ্য হয়নি।

বিদ্রূপ করে বিভূতি তাকে বলেছিল, কিন্তু অনেক মহাপুরুষের হয়। সমরেশ তো তারো বাইরে। সে পুরাণ-পুরুষ। মৃতকে ফিরে পেতে চাওয়া ভুল। আর সামাজিক কোনো লোক নির্মলার মতো মেয়েকে কাছে পেলে প্রেতাত্মার কথা ভাবতে যেত না। কিন্তু সমরেশের জীবন তুচ্ছ, ঘৃণ্য, জটিলতায় ভরা।

সমরেশের দৃঢ় বিশ্বাস মৃতরা বেঁচে থাকে। সে রাতে নির্মলা এসে গোল না বাধালে মাকে সে দেখতে পেত।

নির্মলা আলাপ করতে এসেছিল। সমরেশ মানলেও নির্মলার কোনো চিঠিতে কামনার রঙ ছিল না। তাই সে ছিঁড়ে ফেলে নি। সাহিত্য সে বোঝে না। তাই নির্মলার চিঠির মূল্য সে দেয়নি। বিভূতি পরিস্থিতি জানার জন্য জিজ্ঞাসা করল সমরেশ তাকে বসতে বলেছিল কিনা। সমরেশ স্বীকার করল নির্মলার কোনো কথার জবাব না দিয়ে নিজে লেকচার ঝেড়ে উঠে ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিয়েছে। দেখেওনি মেয়েটার কি হল।

বিভূতি প্রশ্ন করল নির্মলাকে যদি উৎপাত মনে হয়েছিল তার, বিন্ধ্যাচল ছেড়ে চলে আসেনি কেন। স্তম্ভিত বিভূতি জানতে পারল মাদ্রাজি বিধবাদের জন্য নির্মলাকে লাঞ্ছনা করেও বিন্ধ্যাচলে টিকে রইল সমরেশের মতো মানুষ। সমরেশের কিন্তু এ অস্বাভাবিক মনে হয়নি। বিধবা দুটির ফটো দেখিয়ে সমরেশ বরং বিদ্রূপ শুনেছিল, 'চেহারা যাদের এত জঘন্য, তাদের মনের ভিতর মহান পাণ্ডুলিপি তোমার মতো মূর্খ ছাড়া কেউ কি খুঁজত?' এক প্রচণ্ড চড়ে বিভূতির মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। রুমালে রক্ত মুছে সে তবু জানিয়ে ছিল যা সে সত্য বলে মনে করে, তা বলায় সমরেশের আপত্তি কেন?

পরদিনই অজান্তে বিন্ধ্যাচলে ফিরে গিয়েছিল সমরেশ। বিভূতির আক্ষেপ শুধু নির্মলার মতো নারীকে সে চিনল না। এমনকি বিধবাদের সম্পর্কে এসে মাকেও ভুলে গেল? ক'দিন পরে এলো সমরেশের মৃত্যু-সংবাদ। তার বেগময় আত্মা দীর্ঘ বর্শা হাতে নক্ষত্রের ভিতর মিশে গেল। আর শহরের প্রাসাদে সেই নারী নির্মলার হাতের স্পর্শ কিন্তু অনেক সভ্যতা বাঁচিয়ে রেখেছে।

জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের অনেক গল্পের মতোই এগল্পেও ঈষৎ প্রেততত্ত্বের আভাস আছে। যদিও কাহিনীটি আসলে এক জটিল ইডিপাস কমপ্লেক্সের কাহিনী। সমরেশের প্রেমের আত্মকেন্দ্রিক গভীরতার একটি ভিত্তি এইভাবে রচিত হলেও তার মৃত্যুর কোনো

আকস্মিক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখা যায় না। এমৃত্যু স্বাভাবিক, না আত্মহনন তারো কোনো স্পষ্ট সংকেত গল্পে নেই।

অন্য পক্ষে বিভূতির নির্মলা সম্পর্কে এত দরদ ও ওকালতি এবং সমরেশের হাতে তার রূঢ় প্রত্যাখ্যানে বিস্ময় ও বিদ্রূপ সেকি শুধু পরিচিত আত্মীয় বলেই, নাকি অনেক মানুষের মতো সে বিভূতিরও কামনার জিনিস ছিল। তাছাড়া মৃত্যুর পর সমরেশ সম্পর্কে বিভূতির জাগরূক সুখস্মৃতির কি কারণ তাও ব্যাখ্যাত হয়নি।

দ্বাদশ খণ্ডের দশম গল্প **'বাসনার দেশ'** ১৯৩৬ সালে রচিত। এ গল্পটি যেন চলচ্চিত্রের মতো। প্রথম চরিত্র লেখক যে পাড়াগাঁর কুয়াশায় পেঁচার ওড়াউড়ি দেখে, দেখে অনেক মৃত্যু ও আগুন, যার আকাঙক্ষার নারী কলকাতা, দিল্লি, মুসৌরি থেকে বিলেত পর্যন্ত চলে যায়। অথচ এই গল্পে দেখা যায় এই মিশ্র অভিজ্ঞতার মানুষটা কিন্তু খুব তুচ্ছ, খুব সাধারণ।

লোকটি পরিশ্রমী। সেই অনুপাতে আয় যথেষ্ট নয়। অবসরে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। প্রার্থনা করে ঈশ্বর তাকে নিঃসঙ্গ শালিক করে দিন। কার্তিকের হিম রাতে তার নীড় ভিজিয়ে দিক শিশিরের জলে। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেন দেন মানুষের মনন ও স্বপ্ন।

সে লেখক। কাল রাতে এগারোটায় লিখতে বসেছিল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। দুটোর সময় জেগে দেখেছিলো বাতি নিবে গেছে। তেল ছিল না। জ্যোৎস্না মাখা অন্ধকারে একটা প্রসারিত পেয়ারার ডালকে মনে হয়েছিলো সেতু। হিমে তার দেহ মড়ার মতো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হৃদয়ে তবু বাসনা সজাগ।

আজ সন্ধ্যায় সে বেড়াতে গিয়েছিল দূরে নদী-কিনারে। বাজার, স্টেশন পেরিয়ে চায়ের দোকান এড়িয়ে শহরের শেষে যেখানে গ্রামের শুরু সেই ধান ক্ষেতের দিকে। সেখানে এক বছর দশেকের ছেলে অনিচ্ছুক একটা গরুর দড়ি ধরে টানতে টানতে চলেছে। তার বাবা আজই গাইটা কিনেছে। তামাক খেয়ে সে পিছু পিছু আসছে। এদিকে মাইল খানেক ধরে একটা ষাঁড় গরুটার পিছু নিয়েছে। বিপন্ন ছেলেটার কথা শুনে সুঠাম গঠন চমৎকার জমাট খোঁপা একটি কমবয়সী স্ত্রীলোক এগিয়ে এলো। পান চিবুতে চিবুতে লেখককে উপেক্ষা করে বলল, 'তা নেবে নারে, সংসারটাকে এখনো চিনলি নারে বাছা।' তারপর লেখককেই বলল, ষাঁড়টা এসে পড়েছে ; তিনি পুরুষ মানুষ, যেন বিহিত করেন। এসে মুখে কাপড় দিয়ে মেয়েটা জন্তুটাকে দেখছিলো। ভীত ছেলেটাকে বলছিল গরুটাকে টেনে নিয়ে যেতে। ছেলেটা প্রাণপণে টানে আর বলে, বাবা যে কখন আসবে!

মেয়েটার ধারণা গাঁজাখোর বাবা ছেলের হাতে গাই ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেটা বলে বাবার চেহারা দেখে গাই ভয় পায় বটে, কিন্তু শরীরে একজোড়া গোঁফ ছাড়া বুড়ো মানুষটার আর কিচ্ছু নেই। জ্বর-বিকারে নিস্তেজ। তার চেয়ে ওরই তেজ বেশি।

ষাঁড়টা হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো ষাঁড়, তেমন তাগিদ নেই। গাইটা সামনে থাকুক এইটুকু যেন চায়। মেয়েটি জানতে চায়, 'কি করা যায় বলুন দেখি?'— 'জানোয়ারটা থেমে দাঁড়িয়েছে। এগোবে না আর।'

মেয়েটি যেন হতাশ, 'দূর, বুড়ো ষাঁড়, তাই বলি, ভাবছিলাম কি মীমাংসা হয়। বড় মুশকিলে পড়েছিল, এই এক পো পথ আমি ওর সঙ্গে ফিরছি।'

না, সে হাটের থেকে আসেনি। তার বাসা এখানে। দুবেলা রান্নার কাজ করে। সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে বেরিয়ে এই পরিস্থিতি। ওর স্বামী হয়তো এখনই ভূতের মতো অন্ধকার ফুঁড়ে বেরোবে। বাড়িতে আর কেউ নেই বলে মেয়েটা চালাঘরে বাতি জ্বালে না।

ছেলেটাকে সে ধমকায়, 'এই ছেলে। ভাগছিস কোথায় রে?' মেয়েটা এদের চেনে। ওরা মুসলমান। ওর বাবার গাড়ি আছে। ছেলেটা কিন্তু তাকে পরিচিত বলে স্বীকার করতে চায় না।

ঘরে আলো না জ্বালার কৈফিয়ত সে দেবে না। কিন্তু লেখককে সে জানায় সে ভিখিরি নয়। 'ইচ্ছে না থাকলে শুনতে চাই না'—একথা লেখক জানালে রহস্যময় হাসে এ মেয়েটি। ইচ্ছে অনিচ্ছের জ্ঞান অনেকদিন নাকি ঘুচে গেছে তার। লেখককে লবঙ্গ খেতে দেখে সে একটা লবঙ্গ চায়। কিন্তু আর লবঙ্গ ছিল না তার পকেটে। তখন বলে পরে যখন আসবেন, আনবেন। তারপর ছেলেটাকে আবার শাসন করে। বাবার কাছে নালিশ করে মার খাওয়ানোর ভয় দেখায়। বিরক্ত ছেলেটি ওকে ফাজিল বললে আহত কণ্ঠে মেয়েটি বলে যে সে ওর মা হতেও পারত। কিন্তু হিন্দু মেয়েকে ছেলেটা মা ভাববে কেন?

অবান্তরভাবে কথায় কথান্তরে চলে যায় মেয়েটি। লবঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে এখানের বাসিন্দা নয়। তাই জানতে চায় লেখক কি চিনবেন তাকে? তিনি তো ডাক্তার নন যে সবাইকে চিনবেন। পুরোনো বাসিন্দা ক্ষেমদা সরকারকেও তিনি চেনেন না। মুখ দেখেই মেয়েটি বুঝেছে এসব লোকের মমতাও নেই, লোভও নেই। যাবার উপক্রম করতে সে তাকে অপেক্ষা করতে বলে। নিজের পরিচয় দেয়। ছিল ঘাটশিলায়। কলকাতা থেকে এখানে এসেছে। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো ফিরে যাবে।

এদিকে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো তখন কিছু প্রত্যাশা করে সে লেখকের কাছে। তেমন কিছু না ঘটায় হঠাৎ ছেলেটিকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে গরু নিয়ে চলে যেতে বলে। সে চলে গেলে মালতী একটু অপেক্ষা করে বিদায় নেয়। অন্ধকার ঘরে তার মানুষ পড়ে আছে। যাবার আগে জানিয়ে যায় অচেনা ছেলেটির জন্য তার একটু বেশিই মমতা হয়েছিল।

তিনটি চরিত্রই—ছেলেটি, মালতী এবং লেখক পৃথক পৃথক অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেল। ওদের কাউকে লেখক দেখেননি আর।

এ গল্পে নারী যেন কুহকিনীর মতো। সে পুরুষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, আবার আকর্ষণের চেষ্টাও করে। তার বাৎসল্যও আছে আবার নিষ্ঠুরতাও আছে। লোভ আছে, লালসাও আছে হয়তো। ষাঁড়কে গাভীর প্রতি আকৃষ্ট দেখে সে উত্তেজিত হয়। কিন্তু বুড়ো ষাঁড় তেমন কিছু ঘটাতে পারে না। যেমন ভদ্রলেখক মালতীর প্রত্যাশা সত্ত্বেও তাকে আকর্ষণ করে না—এমন একটা ইঙ্গিত বোধহয় রয়ে যায় গল্পের শেষে। আশ্চর্য যে অভিজাত দূরদেশবাসিনী নায়িকাদের পরিচিতি সত্ত্বেও এমন এক গ্রামীণ স্বৈরিনী নারীকে ঘিরেও লেখকের কল্পনা নরম নদী, হৈম শালিখপুর, কুয়াশা আক্রান্ত চিল-রাজকন্যার রূপকথা রচনা করে।

'বই'-শীর্ষক দ্বাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এই লেখাটির রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে

১৯৩৩ না ১৯৩৬ সালের লেখা। আমরা শেষ সালটিই ধরছি। এর নামকরণ জীবনানন্দ করেননি।

পিতা-পুত্র আলোচনা হচ্ছিল সংগ্রহ করা বই নিয়ে। বাবা মাস্টারি করে পঞ্চাশ বছরে অনেক বই কিনেছিলেন। তার অনেকগুলি নষ্ট হয়েছে উঁইয়ে খেয়ে এবং পড়তে নিয়ে গিয়ে লোকেরা ফিরিয়ে না দেওয়ায়। এখন বই কেনা বন্ধ। দোকানের ঋণ শোধ করা চলছে। শোধ হলে তখন কি কেনার মত পরিস্থিতি থাকবে, এই আক্ষেপ। ছেলেও কিছু বই সংগ্রহ করেছে, টিউশনের মাধ্যমে। এইসব আলোচনা প্রসঙ্গে দুই প্রজন্মের বই পড়ুয়ার পছন্দ, লেখক সম্পর্কে মতামতের পার্থক্য আর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য প্রতিফলিত এই আলোচনার। পাণ্ডুলিপিতে প্রায়ই লেখকদের নাম পুরো লেখা নেই। তাই সম্পাদকরা সেগুলি ফাঁকা রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তাই এই আলোচনার রসগ্রহণ অসম্ভব হয়েছে পাঠকদের। সর্বোপরি লেখাটি কোনো গল্পই নয়।

'গ্রাম ও শহরের গল্প' এ গল্পের রচনাকাল ১৯৩৬। তখনও 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতা সঞ্চয় চলেছে। এই পর্বের আরো কবিতা পাওয়া যাবে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এবং 'সুদর্শনা'য়। এখানেও বিষয় একই, নারী মনস্তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন, কিন্তু বিন্যাস আরো নিপুণ আরো চমৎকার। এই নারী কুমারী নয়, গৃহিণী, স্বামীকেই ভালবাসে, তার উপর নির্ভরশীল ; কেননা স্বামী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, বিত্তবান, সুরসিক শুধু নয়, শচীর প্রয়োজন মতো নিজেকে artistically পরিবর্তিত করতেও পারে, অথচ ধূমকেতুর মতো আকস্মিক আবির্ভূত তার বাল্যপ্রেমিক সোমেন লেখাপড়ায় কৃতী হযেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না, জীবন ব্যবসায়ের প্রতি অবিশ্বাসী—জীবনকে চায় শুধু ; অনাবিষ্কৃত সোনার খনির মতো কোথাও পড়ে আছে আজ, তার স্বামীর অফিসে ষাট টাকার চাকরির উমেদার, একথা ভেবে শচী কুঁকড়ে উঠছিল।

'অথচ সোমেন শচীর কাছে ঘুরে ঘুরে আসে, দুপুর বেলা শচী যখন একা, খুব একটা কোমল কুশানে বসে চুরুট টানতে টানতে একটি মেয়েমানুষের সান্নিধ্যে বসে থাকার বিলাস অনুভব করতে চায় হয়তো। হয়তো যে কোনো মেয়েমানুষ হলেই চলতো সোমেনের, শচী তার লক্ষ্য নয়। শচীর অবহেলা, সেলাই-এর কলে, চিঠি লেখায় লিপ্ত থাকা সোমেনকে আঘাত করছিল কয়েকদিন।

অবহেলা থাকলেও সোমেনের আপ্যায়নে শচীর কোনো ত্রুটি ছিল না। আপ্যায়ন কুশল বারবিলাসিনীর মতো নিজেকে পুরানো প্রসাধনে সাজিয়ে দেখাবার ব্যাকুলতা উৎরে উঠতে পারছিল না শচী।

শহরের এই বিলাসের পরিধির বাইরে যে গ্রামে তার ছেলেবেলা কেটেছে সেখানে মাঝে মাঝে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয় শচীর মনে। গ্রামে থাকতে একবার আম কাঁটাল বাঁশের জঙ্গলে শচী হারিয়ে গেলে সোমেন তাকে একটা পাতলা সরপুটির মতো কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইয়ের মতো নদীতে ভেসে এসেছিল। সে সব ঘটনার পর্যালোচনাও অবান্তর আজ। শচীও হয়তো সেই গ্রাম পরিবেশে ফিরে যেতে চায় যেমন মানুষ

তাজমহল দেখতে যায়। একটা ফরমায়েসী ট্রিপে সময়োপযোগী ভাবপ্রবণ হয়ে শচী গ্রামে যাবে, কাঁদবে, চুমো দেবে, হয়তো আর ফিরে যেতে চাইবে না, হয়তো ব্যবহার করতে দেবে নিজেকে। সে সব একটা দুপুরের জন্য পাড়াগাঁয়ে মাঠ জঙ্গলের আচ্ছন্ন দুপুর বড় মারাত্মক। পরদিন ভোরেই এক সাঁতারে আরো চোদ্দ বছরের ওপারে চলে যাবে। সোমেন গেলে আর ফিরতে পারে না। মেয়ে পুরুষের এই তফাৎ।

আজকে দুপুরের জন্যে শচী সেই শচী হয়ে গেছে। আজ সে শচীকে নিজের যে কোনো প্রয়োজনে লাগাতে পারে—শচী সেজন্য প্রস্তুত, ব্যাকুল। কিন্তু এই সোফার উপর? বক মোহানার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নীচে, জলের গন্ধের কাছে?

ভাবতে গেলেও ব্যথা।

এই কামরায় আর এক মুহূর্তও টিকতে না পেরে একটা হ্যাভেনা হাতে সোমেন মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় উঠল গিয়ে।

এই গল্পের মানব সম্পর্কের পশ্চাৎপটে অর্থনীতিক টানাপোড়েন স্পষ্ট। 'কোনো ভ্যাগাবণ্ডকে তার ন্যায্য জায়গা দিতে পারে না মেয়েরা।' অথচ দেহধর্ম মাঝে মাঝে হয়তো স্মৃতির অনুষঙ্গে সামাজিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়ায়। হয়তো নারী পুরুষের মনরেখার কম্পনে সব সময়ে সমতা আসে না বলে দুর্ঘটনা ঘটে না প্রায়ই, কিন্তু ঘটলেও বিচিত্র কিছু ছিল কি?

শ্রী সুনীলকুমার নন্দী প্রকাশের চরিত্রে দেখেছেন সংকীর্ণ সম্পত্তি সচেতন গ্রাম্যতা। শচী সম্পর্কে প্রকাশের সন্দেহ-প্রবণতা তাঁর মতে, ভালবাসা নয়, শীলিত নির্লিপ্তিও নয়, সম্মানজনক বিশ্বাসবোধও নয়—তা জীবন ব্যবসায়ে জিতবার এক অভিনব স্থূলতা। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কোনো দিকে গড়ায় না, সবই যায় ধোঁয়া হয়ে, শচীর স্বামী হয়ে প্রকাশই তো থাকে।' একথায় প্রকাশের প্রতি সুবিচার করা হয়নি সম্পূর্ণত। সন্দেহের এবং বিশ্বাসের এমন এক আলো-আঁধারি পরিস্থিতির মধ্যেই আজকের জীবনের মানুষ-মাত্রেরই দাম্পত্য দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে গুড়ের কলসির মতো বন্ধ করে রাখবার জিনিস স্ত্রী নয় আজ আর, স্বামীও, খানিকটা বিশ্বাস, খানিকটা ক্ষমা ও নির্লিপ্তি নিয়েই সংসার চালাতে হয়। শচীকে পূর্বাপর যা দেখেছি 'যার মধ্যে বিশেষ কোনো নীতি প্রখরতা নেই' তাকে এই সন্দেহ ও এই নির্ভরতার অবকাশ কি প্রকাশের নেই?

প্রকাশের চরিত্রে স্থূলতা অন্যক্ষেত্রে, জীবন-দৃষ্টিতে, অন্যদের মূল্যায়নে আত্মবিশ্বাসের অতিরেকে। বরং শচীর গ্রাম জীবনের প্রতি আকর্ষণের অস্বাভাবিক স্নায়ুচাঞ্চল্য সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন সুনীলবাবু। স্মৃতি-অনুষঙ্গে পুরানো প্রেমিককে আজকের বিরূপতা কাটিয়েও সবকিছু ছেড়ে দিতে চাওয়া ওই চরিত্রের পক্ষে একটু অসঙ্গতিপূর্ণ অথচ পুরো গল্পটাই তো এর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সোমেনের জীবনের সঙ্গে চিন্তার একটু সূক্ষ্ম অসঙ্গতি আছে। সে ভাবে, ষাট টাকার কাজ পেলে বালিগঞ্জের দিকেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে প্রকাশদের চেয়ে ঢের ভালো থাকতে পারতো। জীবন তার একটুও নিরর্থক হলে 'সুইসাইড লিষ্টে' খতম হয়ে যেত

আগেই, তার চাকরি নেই, স্ত্রী নেই, ঘর নেই তবু এসবের অতিরিক্ত কিছু আছে বলেই জোর আছে। এই অতিরিক্ত কি আছে সোমেনের গলাবাজি ছাড়া, প্রকাশের প্রাপ্তিতে অক্ষম ঈর্ষা ছাড়া? শচী বলেছে 'grotesque-এর চূড়ান্ত'।

এহেন সোমেন গ্রামে যেতে চায় শচীর সঙ্গে, কিন্তু ফিরে আসতে পারবে না। শচী ফিরে আসবে, সেটাই তার আক্ষেপ অথবা অভিযোগ। সে কি তবে শচীর শরীরের রোমাঞ্চ উর্বরতাই ফিরে পেতে চায় অতীতের মতো, কিন্তু এক দিনের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। সেটাই তার অভিযোগ বা আক্ষেপ, এটারই পিছনে উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ানো, তার অতিরিক্ত কিছু?

অথচ শচী, তার মধ্যে বিশেষ কোনো 'নীতি প্রখরতা' নেই। যে অতীতের যৌন সঙ্গী সোমেনের চেয়ে প্রকাশকে বরণীয় বুঝে দাম্পত্য জীবনে তৃপ্ত। তবু তার সেই সচেতন বিচারের অন্তস্তলে এক গৃহকাতরতা, অতীতের গ্রাম পরিমণ্ডলের হয়তো প্রেম পরিমণ্ডলেও ফিরে যাবার কামনা। সেই দুর্বলতা বোঝে বলে সোমেনকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং মুহূর্তের অভিভবে তারই প্রয়োজনে নিজেকে ব্যবহার করতে দিতে সে ইতস্তত করে না। একবার শচীর নিজেকে মনে হয়েছিল আপ্যায়ন কুশলা বারবিলাসিনীর মতো। আমাদের কিন্তু মনে হয়, সে সব সামাজিক ছদ্মবেশের আড়ালে আবেগ-প্রবণ স্বৈরিণী একজন।

'সোমনাথ ও শ্রীমতী' ১৯৪৬-এর আগস্টমাসে কলকাতায় এ গল্পটি রচিত হয়েছিল। এগল্পের নাম জীবনানন্দ দিয়ে যান নি। গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রের নামে গল্পটির নামকরণ করে প্রথম 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে।

সোমনাথ ও তার পরিবারের সকলেই খুব অসুস্থ। চেঞ্জে যাবার দরকার খুব। কিন্তু সামর্থ্য কম! প্রোলিটেরিয়েট না হলেও সে সমাজ-ব্যবস্থাকেই দুর্দশার জন্য দায়ী ভাবে। তার পরিবার খুবই ছোট, সে আর স্ত্রী শ্রীমতী, ১২ বছর বয়সী মেয়ে আর বছর সাতেকের ছেলে। তিন মাসের ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাবার পথে সে কলকাতায় এসেছে, ইচ্ছে দিন পনেরো থাকবে।

আগে যখন এসেছিল মেছোবাজার ঝামাপুকুর ইত্যাদি উত্তর কলকাতাতেই উঠতো, চৌরঙ্গি অবধি ছিল তার গতিবিধি। উত্তরে জগুবাবু বাজার পর্যন্ত তার চেনা। এবারে দক্ষিণ কলকাতায় লেকের ধারপাশে টালিগঞ্জ রসারোড রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ ষ্টেশন, যাদবপুর। ঘুরে ঘুরে তৃপ্তি। লেকের পাশে বসে, জলের শিশুকে দেখতে দেখতে জলের মহীয়সীর কথা মনে পড়তো, মনে হতো, রৌদ্রাসক্ত নীলাভ বিস্‌কে বা বেরিনের মেখলা থাকত যদি এই শহরকে ঘিরে! ঘোর প্রতিবাদ করে রাক্ষসের মতো বালিগঞ্জের ট্রেন সবেগে ছুটে যেত বজবজের দিকে।

একদিন দুপুরে জোর করে শ্রীমতীকে নিয়ে গেল লেকে বেড়াতে। তখন দুপুর সাড়ে বারোটা ; স্নান খাওয়া হয়নি। ফিরলো আড়াইটেয়, ইতিমধ্যে অম্বলের কষ্ট কেটে গেছে, খিদে জেগেছে। সোমনাথ বলল, রোজ বেড়ালে এই কলকাতাতেই শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

কলে তখন জল ছিল না। পাম্প চালানো গেল না। হাইড্রান্টের গাঙ্গেয় স্নান সেরে সোমনাথ ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফিরলো, হাতে এনেছে এক বালতি ঘোলা জল, শ্রীমতীর জন্যে। 'তা ঘোলা হোক, জলতো!' শ্রীমতীও খুশি।

সোমনাথের মাসতুতো ভাই সুরনাথ সপরিবারে দার্জিলিঙে। সেখানে পরিবার রেখে তিনি একা ফিরলেন। ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন অফিসে কাটে, রাতে ফিরতে খেতে বারোটা একটা। শ্রীমতী তখন একাই জেগে থাকে। তাঁকে গরম খাবার পরিবেশনে তৎপরতা আছে তার। কিন্তু সোমনাথ জানে না রেশনের চালের ভাত সুরনাথ খায়না, পোলাওর চাল আনতে হয় বিশেষ দোকান থেকে। অতএব ফারপোর রুটি কেটে, মটন মাংস চাটনি এবং লেডিকেনি দরবেশ পরিবেশন করে শ্রীমতী।

সুরনাথ শ্রীমতীকে ইলেকট্রিক হিটার সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, 'স্টোভ বড় বাঞ্চোৎ জিনিস—' শ্রীমতীর চেঞ্জে যাবার কথা প্রসঙ্গে কি এক কথা বলে বসে যা ট্রাকের শব্দের মাঝে শ্রীমতী শুনতে পায় না বলেই বাঁচোয়া। কথাটির পুনরুক্তি করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। সে বরং এখানে ছুটির তিন মাস থেকে যাবার কথা বলে। ঠাণ্ডা হিটারের উপর হাত রাখায় শ্রীমতীর ডানহাতের কবজি সজোরে টিপে ধরে প্রায় ভেঙেই দেয় যেন। তারপর শ্রীমতীকে নিজের ঘরের নীল শেডের নরম ঠাণ্ডা আলোয় ডেকে তাদের খরচ কি করে চলবে জিজ্ঞেস করে। শ্রীমতী জানায় তাদের টাকা আছে। বাতিটা সুরনাথ নিভিয়ে দিতেই দেখতে পায় জ্যোস্নালালিত পথ ধরে শ্রীমতী বেরিয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ বলে, শ্রীমতী যদি বলতো চেঞ্জে যাবার মত টাকা নেই। বাস্তবিক প্রকৃত পক্ষে এখানে থাকবার মত টাকাও সোমনাথের নেই। শ্রীমতী সত্য কথাটা বলতে পারতো দাদাকে। ছেলেমেয়ের লিভার খারাপ, ওষুধ কিনতে হবে। টনসিল অপারেশন দরকার বাবলুর। এখানের ডাক্তার দিয়ে করানোর টাকা নেই। ছেলেমেয়েরা বাবাকে ভয় পায় মায়ের জন্য, বাবার স্নেহের কথাতেও তার অবসন্নতা যায় না। বাবার প্রশ্নেরও উত্তর দেয় না কিছু। কিছুই তার ভালো লাগে না। কলকাতাও। চোখ তার ঠাণ্ডা ইলিশের মতো। কোথাও না যেতে হলেই সে যেন বাঁচে। তবে তাকে বাঁচানোর জন্য চেঞ্জে নিয়ে যদি যাওয়া হয় সে যেতে রাজি।

রোগা ঠ্যাং নিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল দুজন। লোভ নেই, খিদে নেই, শুধু ভয় সোমনাথ কখন এসে মারে।

একমাস ফুরিয়ে গেল, কিন্তু চেঞ্জে গেলে শ্রীমতী জানে তারা সর্বস্বান্ত হবে, হয়তো ছেলেটা মরবে, শ্রীমতীকেও গিরিডিতে উশ্রীর পাশে সমাধিস্থ করে আসতে হবে। বহুদিন আগে এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে মাত্র পাঁচশো টাকায় আমের পার্টনারশিপ ব্যবসার জন্য সোমনাথ গিরিডিতে গিয়েছিল, কিন্তু সে তা নেয়নি। তখন নিলে আজ লাখোপতি হতো নিশ্চয়ই। চোখ চকচক করে ওঠে শ্রীমতীর। শ্রীমতী সুন্দরী, উপযুক্ত মনন মর্যাদাও গড়ে উঠেছিল তার, সে কথাও ভুলে গেল সে।

মাত্র দেড়শ টাকা আছে সোমনাথের, পনেরো দিনের খরচ। তারপর কি করবে? শ্রীমতী বলে, সে দাদাকে (সুরনাথকে) লিখতে পারে। শুনে সোমনাথ বিচলিত হয়।

সুরনাথ তার মায়ের মাসতুতো বোনের ছেলে। একটা অবৈধ সম্পর্কের জনশ্রুতি আছে সুরনাথের মায়ের সঙ্গে সোমনাথের বাবার, অথবা সোমনাথের মায়ের সঙ্গে সুরনাথের বাবার। একথায় শ্রীমতীর মুখে শয়তানি হাসি ফুটে ওঠে। ছেলেটার রোজ জ্বর, মিকশ্চারে সারে না, কলকাতার ডাক্তারকে একটানা দেখানো সম্ভব নয়। চেঞ্জে যাওয়া যায়, অনেক দেনা হবে ; আর জীবনে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

মাতৃবাৎসল্য অভাবের চেয়েও শ্রীমতীতে মোচড় দেয়, এজন্য দেহসেবা করতেও সে রাজি। দাদার দেরাজে দেড় হাজার টাকায় সই করা বেয়ারার্স চেক আছে, শ্রীমতী ঐ চেক ব্যাঙ্কে ভাঙাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরলো। সুরনাথের চেক নিজেই সে ক্যাশ করে—ব্যাঙ্কাররা বলেছে।

শ্রীমতী বলে, 'আমাদের কোনো জীবন নেই—ভঙ্গিও নেই। তবে টাকার দিকে আমি মন দিয়েছি। টাকা পাবার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত যেতে রাজি আছি।' সুরনাথ কী চায় তার কাছে, যা চায় তাকি পাবে কোনো দিন?

সোমনাথও বলে সুরনাথ শ্রীমতীকে চেক দেবেই একদিন—দিতেই হবে। তবে সুরনাথ কিছু নয়, সে ছাড়া আরো অনেক আছে। কিন্তু ওই পথেই শ্রীমতীকে যেতে হবে। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করে, এখন ঝুপসির ভিতর দিয়ে আড়ি পেতে যেতে হবে তারপর কি সোজা ট্যাকটেকে পথ ধরে?—একথার উত্তর দিল না সোমনাথ। শ্রীমতী বললো খোকার কি হবে?

সোমনাথ বললো, খোকা নেই, এইমাত্র দেখে এলো সে। কিন্তু তক্ষুণি মায়ের কাছে এলো খোকা। শ্রীমতী স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে বলল, এর মানে সে বুঝল না। সোমনাথ উত্তর দিল, 'বুদ্ধদেবও মরা ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। আমিও ঠিক পেরেছি মনে করি না। কিন্তু সে বেঁচে আছে, এর চেয়ে কি সুখ আশা করো?'

দার্জিলিং-এ সুরনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হলো। তার শ্রাদ্ধশেষে কলকাতায় ফিরে সে বহুব্যয়ে সোমনাথদের মিহিজাম, গিরিডি মধুপুর চেঞ্জে পাঠিয়ে দিল। আরো ছমাস ছুটি নিয়ে সবাই মোটাসোটা হয়ে কলকাতায় ফিরলো। সুরনাথ সোমনাথকে মফঃস্বলের চাকরি ছেড়ে ১০০ টাকা মাসোহারায় কলকাতাতেই দেখাশোনার কাজে লাগালো। খাওয়াপরার খরচ নেই।

শ্রীমতীর নির্দেশে থাকতে হলো সোমনাথকে। কিন্তু সে একা বা সপরিবারে কোথাও চলে যেতে পারলেই খুশি হতো। অবশেষে শ্রীমতী একদিন সে বাদে অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলে যাবার কথাও বললো। কিন্তু ঐ লোকটার বাড়িতে শ্রীমতীকে একা রেখে চলে যেতে পারলো না সোমনাথ। কলকাতাতেই ভাল চাকরি পেল। দেশে ফেরার প্রশ্ন নেই আর। এক মকরসংক্রান্তির রাতে শ্রীমতীকে প্রত্যাশা করেছিল সোমনাথ। কিন্তু আজকাল মেয়েদেরও মর্যাদা আছে, তাই পুরুষকে পিপাসা সংবরণ করতে হবে।

শ্রীমতীর কাছে যে পুরুষরা আসে, তাদের নিষেধ করা যাবে না। তারা নিজেরা যদি ক্ষয় বুঝে সরে যায় তাছাড়া। এই অবক্ষয়ের শতাব্দীতে কিছুই ক্ষয় নয়। উপভোগ করার ছেঁড়া ছেঁড়া নীল করবীর রক্তজবার, রক্তাক্ত মানুষদের ইতিহাস।

নিচে বেল বাজলো। 'কে?' মোটরে ছেলেটি এসেছে শ্রীমতীদেবীর কাছে। 'আসুন উপরে।' শ্রীমতী চোখ বুজে ছিল, উঠে সে তৈরি হলো তার সঙ্গে যাবে বলে। হাসপাতালে বিজয়ের স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে। বিজয় ছেলেটির নাম। সোমনাথ বিমূঢ় ভাবে বলে 'বিজয়ের স্ত্রী।' কিন্তু ছেলেপিলে তো তোমারও হবে—আজই হতে পারে।—'

—তা যদি হয় তাহলে হাসপাতাল থেকে ফোন করে জানানো হবে তোমাকে।

ব্যাপারটা এরকম বাঁকা মনে হলেও শ্রীমতী কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। বেলা ছটায় ফোন এলো এক আনাড়ি ডাক্তারের হাতে মরা ছেলে প্রসব করতে গিয়ে শ্রীমতী মারা গেছে। তারপরে একটা চিরকুটে শ্রীমতীর শেষ লেখা পৌঁছে দিলেন হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ। শ্রীমতী লিখেছে, 'আমাদের জীবন মেঘের মতন, নৈরাজ্যের ধোঁয়ার ভিতর থেকে মানুষের স্বাদ নিয়ে এক আধ মুহূর্ত জেগে উঠেছে—কাজ ভাবতে হয়। উপভোগ করতে হয়। বদলাতে হয়। অনুভব—কিম্বা এসব না করতে পারলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু বুঝতে হয় যে ক্ষতি নেই।

সোমনাথ বুঝতে পারলো না এ কটা লাইন কার জন্য লেখা, তার জন্য, না শ্রীমতীর চিতা ঘিরে যারা বসেছিল ওদের সকলের জন্যেই।

জীবনানন্দের এই অসম্পূর্ণ অযত্ন রচিত, অসংশোধিত, যতিচিহ্নহীন গল্প বোধহয় শতবর্ষ বলেই আবর্জনা স্তূপ থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হলো। গল্পের প্রতিপাদ্য কিছু নেই, 'আজকের সমাজ ব্যবস্থাই এমন যে নানা রকম অনাচার সহ্য করতে হচ্ছে মানুষকে, সেই সামাজিক স্খলনের একটা ছবি গল্পের অন্তর্লীন নানা অসঙ্গতির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রসৃষ্টি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

'বিলাস' গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৭ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে। বিলাসের শান্তিশেখর চরিত্রে আত্মপ্রক্ষেপ অনেক বেশি। 'স্বরাজ' পত্রিকায় জীবনানন্দের কাজের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লেগেছে। আবার হেডমাষ্টার অপরেশবাবুর চরিত্রে ছায়াপাত ঘটেছে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাষ্টার জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। এঁর প্রভাব ছাত্র জীবনানন্দের জীবনে অনপনেয় ছিল।

'বিলাস' জীবনানন্দের শেষ গল্পই শুধু নয় শ্রেষ্ঠ গল্পও। ডঃ অমলেন্দু বসু সঠিক ভাবেই বলেছেন, 'বিলাস' গল্পটিতে কাহিনী শিল্পের একটি সূক্ষ্ম আঙ্গিক ও সাফল্য দেখতে পাই, সে আঙ্গিকে শ্লেষ অলঙ্কারের 'আয়রণি'র নিপুণ প্রয়োগ। গল্পটির নামকরণ জীবনানন্দ স্বয়ং করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু বিলাস কথাটির দুই বিপরীত তাৎপর্য এই গল্পের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। এ গল্পের নায়ক কোনো বিশেষ মানুষ নয়। যদিও গল্পটির দুই অংশের যোগসূত্র হিসাবে শান্তিশেখরেরই সত্তায় গল্পটির প্লট উদ্ভাসিত। নায়ক একটি ভাবনা, কোন অর্থে বিলাস, সেই ভাবনা, এই বিলাসের প্রতিফলনে কাম-অর্থ-ক্ষমতা লোলুপ সমাজের চিত্রায়ণে।"

প্রকৃতপক্ষে গল্পটির বৈশিষ্ট্যও অসামান্যতা এই প্লট পরিকল্পনায়। কোনো চরিত্রকে ঘিরে নয়, ঘটনাকে ঘিরে নয়—একটি ভাবনাকে কেন্দ্র করে গল্পটি গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ অত্যন্ত বাস্তব-এর ঘটনাপুঞ্জ সমাজ চৈতন্যের নিখুঁত প্রতিফলন, যুদ্ধোত্তর কালে

মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধ্যে যে মূল্যবোধের বিনষ্টি ঘটেছিল, সেই দম্ভ, ঘৃণা, রিরংসা, আক্রোশের চিত্র এতে পাওয়া যায়। সূচনা থেকেই অতুলনীয় ভাষায় ও শ্লেষ অলংকারের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা মিশিয়ে শান্তিশেখরের বেদনা ও বঞ্চনা, ঘৃণা ও প্রতিরোধ এবং শান্তিভোগের বিবরণের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি গড়িয়ে গেছে আস্তে আস্তে সর্বেন ঘোষের দাম্ভিক, কামুক, ইতর ও প্রতিহিংসা-প্রবণ চরিত্রের উদ্‌ঘাটনে এবং তার মধ্যেই আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে, মনোবৃত্তির প্রতি-তুলনা, যেদিকে গল্পের নামকরণের অভ্রান্ত ইঙ্গিত।

আত্মসৃষ্ট নিঃসঙ্গতায় বন্দী শান্তিশেখরের দুটি আক্ষেপ—অনেক দামী দরকারি বই বুলেটিন কিনেছে সে, সময়ের স্বল্পতায় পড়া হয় নি, আরও ঢের বড় বইয়ের জগৎ বাইরে পড়ে রয়েছে— কিন্তু এসব না পড়েই মরে যেতে হবে। তাছাড়া নারীকে না ভালবেসেই চলে যেতে হবে। কোথায়ই বা সেই নারী? ট্রামে বাসে উৎসব বাড়িতে যাদের দেখা তাদের সঙ্গে বজ্রমনির মতো কোনো পাথরের ব্যবধান রচনা করেছে সময়।

তার এই অনর্থক বই কিনে জমানোকে সে হেডমাষ্টার অপরেশবাবুর অনুভূতিতে বিচার করে বুঝেছে এ 'বিলাস'। কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করে দিয়েছেন তিনি : ভুল করছ। বিলাস তো খুব ভালো জিনিস শান্তিশেখর।

যৌন আকাঙক্ষার ক্ষেত্রে তার যে একটু ছলনা আছে তা অপরেশবাবুর বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি। শান্তি বিয়ে করেছিল বটে, কিন্তু বিয়ের একমাস পরেই স্ত্রী মারা যায়। কিন্তু তবুও মেয়েমানুষের ভালবাসা জীবনের থেকে ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

যে আমেরিকান পত্রিকা অফিসে শান্তিশেখর কাজ করে তাদের সঙ্গে কথা ছিল ফী সপ্তাহে কিছু কিছু লেখবার, বড় বড় লিখিয়েদের দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবার—কিন্তু বাঙালী সাহেবরা প্রুফ দেখার কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, শুধু প্রুফ দেখাই এখন কাজ তার। রাত দশটা পর্যন্ত।

সুস্মিতা চক্রবর্তীকে কিন্তু কিছুই করতে হয় না। রোজই আসতে হয় এই যা, উপরওলা সর্বেন ঘোষের গাড়িতে। অপেক্ষা করতে হয় কখন সে ফিরে যাবে রাত দশটায়। তার মধ্যে কখনো বা শান্তিশেখরের কাছ এসে দাঁড়ায়। সহানুভূতি জানায় তার কাজের চাপের জন্য, সাহায্য করতে চায়। মহিলাটির চেহারা বিশ্রী কিন্তু গলার সুরে ন্যাকামির কুয়াশা কাটিয়ে নির্মলতা রয়েছে মনে হয়। তবু শান্তিশেখর সুস্মিতার হাতটাকে নিজের হৃদয়ের দিকে এগোতেই দিচ্ছে না। ইচ্ছে করছে না। এমন কি রাতের ঘুমের স্বপ্নেও নানারকম নষ্টনমিত ইচ্ছার তোষণ-লোকেও রাখা গেল না তাকে।

শান্তিশেখর মারা গেল হঠাৎ। সে সংবাদে সর্বেন ঘোষের অন্তরে কোনো দাগ পড়লো না। সুস্মিতার কাছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কৌতুকের আসর খুলে বসল সে। কেননা পরেশবাবুর কথায় সারাদিন ফুলবাবুর মতো সেজে বেড়ালে হবে কী সর্বেনের মনে কোনো বিলাস নেই। বিলাস যদি থাকত তাহলে লোকটা মরে গেছে শুনে চুপ মেরে যেতো সে। ছুটি দিয়ে দিত অফিস। কিন্তু সর্বেন ছুটি দেবে না। সুস্মিতা বললো, 'মরে গেছে—সে জায়গায় লোক ভর্তি করে নিলেই হল 'এ ব্যঙ্গেও চোখ ফুটলো না সর্বেনের। এমন কি 'আমার ওরকম হলেও হত।' সুস্মিতার এই মন্তব্যেও নয়। কেননা সর্বেন কাজ

বোঝে। বিষয় আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালাভোলা জিনিস হয়ে বোম হয়ে থাকার জ্যাঠামশাই-সুলভ বিলাস তার নেই। সে বরং বিশ গ্যালন গাড়িতে পুরে সুস্মিতার সঙ্গে গাড়ি হাঁকাতে পারে দর্শনার দিকে অকারণে।

অপরেশবাবুর দুই উত্তর পুরুষ। একজন ছাত্র আর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র। একজন শান্তিশেখর, আরেকজন সর্বেন। সময়ের দোষে দুজনেই স্খলিত, তবু আদর্শের দিক বিলাসের দিক থেকে দুজনেই পরস্পরের বিপরীত। সেইজন্যই বিদ্বেষ ঘৃণা। একজনেরই মধ্যে যৌন ক্ষুধা। একজন রাজহংসী খুঁজে মরছে কেবল, অথচ বালিহাঁস কাদা-খোঁচা খুঁচে মারছে তাকে। তবু সে অভুক্তই থেকে গেল। সেটাই বরণীয় মনে করলো। অন্যজনের মনে ততখানি বিলাস নেই, সে তাই প্রাচুর্যের মধ্যে ফেলাছড়া করেই দিন কাটায়।

সুস্মিতার সঙ্গে যদি শচীর তুলনা করা যায় তবে অনুভূত হয় আর্থনীতিক প্রখরতা সুস্মিতার জীবনকে, যৌনতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে আরো। যে স্বচ্ছল জীবনের লোভে শচী প্রকাশকে পছন্দ করে, সোমেনকে তাচ্ছিল্য, সেই বাঁচামরার প্রবলতর তাগিদে সুস্মিতাকে সর্বেনদার সঙ্গ দিতে হয়। অথচ শান্তিশেখবের দুর্দশায় তার সহানুভূতি, করুণা। এডিথ উর্সুলাদের সঙ্গে শান্তি যখন আলাপিত হতে অনিচ্ছা জানায়, বলে, 'যাব না। আমি হোটেলে নিয়ে খাওয়াতে পারবো না।' তখন দুঃখিত সুস্মিতাকে বলতে শুনি, 'ওমা, কী যে বলেন আপনি, মোটরের আর খাটের ফাউফুর্তি ছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল হতে পারে না?' জীবনানন্দের প্রায় সব নায়িকাদেরই এই অর্থনীতির দাসত্ব এবং তাকে অতিক্রম করার ইচ্ছা খুবই প্রবল দেখা যাচ্ছে। মাল্যবান উপন্যাসেও উৎপলা স্বামীকে খাতির করে তখনই যখন তার টাকার প্রয়োজন, নতুবা সর্বক্ষণ তাকে দূরে সরিয়ে রাখ। তার জায়গায় অন্য যে কোনো চেনা আধাচেনা অচেনা মানুষকে সঙ্গ দেয়, অঙ্গও দেয় হয়তো।

জীবনানন্দের যাবতীয় গল্পের অলোচনার শেষে একথা স্বীকার করতেই হয়—আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পের সংজ্ঞা দিই, তার রসবিচার করি তার মধ্যে প্লট নির্মাণ এবং অন্তিম মোচড়ের প্রত্যাশা করি, জীবনানন্দ সেভাবে গল্পকে দেখেন নি। চেকভর গল্পে যেমন বস্তুনিষ্ঠ সহজ স্বাভাবিকতা ছিল, জীবনানন্দ হয়তো তাকেই অনুসরণীয় মনে করতেন। ধানের ক্ষেতে আমরা হয়তো বৃথাই আলু খুঁড়ে না পেয়ে হাহুতাশ করছি। ছোট গল্প তো একটা নূতন আঙ্গিক। গত শতাব্দীকালে আঙ্গিকের যথেষ্ট পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে। দেশে-বিদেশে তার নানা পরীক্ষানিরীক্ষা। যেমন কবিতার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই প্রচলিত রীতি পদ্ধতির বাইরে জীবনানন্দ দৃঢ় চিত্তে পদক্ষেপ করে সাফল্য পেয়েছিলেন, গল্পের ক্ষেত্রে তেমন হতে পারে কিবা তা সময় প্রমাণ করবে। জীবনানন্দের এক পর্বের কবিতার গভীর অনুরাগী বুদ্ধদেব বসু যেমন পরবর্তী পর্বে তাঁর গুণগ্রাহী হতে পারেন নি, মনীষী অশোক মিত্রের মতো আমরাও কিছু মানুষ রয়ে গেলাম যাঁরা তাঁর নির্বাচিত কয়েকটি গল্প ছাড়া সাধারণ ভাবে সমগ্র গল্প উপন্যাদির প্রকাশ—তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশেই মেনে নিতে দ্বিধান্বিত হচ্ছি। দ্বিধার কারণ সহজবোধ্য। তুচ্ছ বস্তুর আধিক্য ঘটলে স্রষ্টার সৃষ্টি

নৈপুণ্য সম্পর্কেই সাধারণের সংশয় ও অশ্রদ্ধা জাগতে বাধ্য। তবু সবই প্রকাশিত হয়ে যাবার পর এখন অপেক্ষার কাল। বিশেষজ্ঞরা বিচার করবেন কোন গল্প কি গুণে বরণীয়। জীবনানন্দ তাঁর রচনার মধ্যে যে গভীর অবস্থার কথা বারবার ব্যক্ত করেছেন 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পে মৃত্যুমুখ অনাদি তার পেনসিলে লেখা ত্রিশ-চল্লিশখানা খাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বন্ধু লোকনাথকে অনুরোধ জানিয়েছিল "এই খাতাগুলো যেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।" এমন অনেক গল্পেই অনেক প্রসঙ্গে ভাবীকালের রসজ্ঞদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সেকাজটি হয়েছে। এবার অপেক্ষা।

জীবনানন্দের গল্পের আলোচনার অবশ্য নানা দিক আছে। তাঁর কবিতার রসগ্রাহীরা জীবনানন্দের গল্পের গদ্যভাষার বিশিষ্ট তীক্ষ্ণ, কখনো কখনো কবিত্বময় সঞ্চয়নভাষায় এক ভিন্নতর রূপঐশ্বর্যের কথা বিশেষ করে বলে থাকেন। সে এক অপরিমেয় তৃপ্তিতর আকর্ষণ বটে, কিন্তু জানিনা গল্পের ঘটনা বা চরিত্রের উল্লাস ছাড়া বিশুদ্ধ ভাষার সৌন্দর্যে কজন আকৃষ্ট হবেন। সম্ভবত কয়েকজন আত্মিকের চর্চার বিষয় হয়ে নিকটকালেই আলমারির তাকবন্দী হয়ে যাবে। কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্য ও রচনার শিল্পোৎকর্ষ নিরূপণ করে তাঁর নির্বাচিত অতি সামান্য সংখ্যক কাহিনীসংগ্রহ প্রকাশ করলে সেটাই সমীচীন হতো। এই ভাবনা থেকেই সম্ভবত "জীবনানন্দ দাশের গল্প" গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সংখ্যা মাত্র তিনটিতে সীমাবদ্ধ থাকুক এও নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

উপন্যাস : উপক্রম

কবি জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত উপন্যাস লেখা শুরু করেন ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম দেওয়া হয়েছে 'পূর্ণিমা'। সেই উপন্যাসের আলোচনার আগে সমকালীন বাংলা উপন্যাসের পটপ্রেক্ষিত একবার একটু জরিপ করে নেওয়া ভালো।

১৯৩১ সাল, তার আগে রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' প্রকাশ করেছেন, তাঁর 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়' এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। আরো দশবছর বাঁচবেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রও বেঁচে থাকবেন সাত বছর। তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' বইটি তখনের সাম্প্রতিক রচনা। তখন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নক্ষত্র প্রতিম। রয়েছেন মণীন্দ্রলাল বসু, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কল্লোলের প্রথম তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গনে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায় উপন্যাসের আসর সাজিয়ে তুলেছেন। অনতিবিলম্বে এসে জুটবেন বনফুল, তারাশঙ্কর, মানিক, শরদিন্দু, ধূর্জটিপ্রসাদ, রবীন্দ্র মৈত্র, দিলীপ রায়, প্রমথনাথ বিশি, সরোজ রায়চৌধুরী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, গোপাল হালদার প্রমুখ। উপন্যাসের যে বৈচিত্র্য উজ্জ্বলতা ও উত্তুঙ্গতা সেদিনের বাংলা উপন্যাসে দেখা গেছে তার মধ্যে জীবনানন্দের আত্মপ্রকাশ দিনে দিনে আরো কঠিন আরো দুঃসাধ্য করে তুলেছে।

জীবনানন্দ খুব দ্রুত উপন্যাস লিখতে পারতেন। ত্রিশের দশকে এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে দুটি খণ্ডকালে জীবনানন্দ এক ডজনেরও বেশি উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু তার জীবৎকালে একটিও তিনি প্রকাশ করলেন না বা করতে পারলেন না। কেন? আরো লক্ষ্য করার বিষয় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্বজনেরা অতি ধীরে ধীরে তিনটি গল্প, একটি একটি করে উপন্যাস বার করলেন, তিনি যে আরো অনেক লিখে রেখে গেছেন ঘুণাক্ষরে সে কথা জানতে দিলেন না। আজ শতবর্ষের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে কিছু পাণ্ডুলিপি জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দিয়ে প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো, আরো কিছু ইতস্তত নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হতে লাগলো।

আসলে জীবনানন্দের কবিখ্যাতিকে সম্বল করে অত্যন্ত চতুর ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় প্রকৃত অর্থে তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে ঘেঁটে এই বিশেষত্বহীন কাহিনী সমূহ প্রকাশ করার মধ্যে তাঁর সম্পর্কে মুগ্ধতা প্রকাশ পায়, সৌন্দর্যচেতনা শিল্পমর্যাদা ব্যক্ত হয় কিনা সন্দেহ। বেদনা জাগে এত ব্যক্তিগত, এত পৌনঃপুনিকতা দুষ্ট রচনা প্রকাশিত হলো কেন?

জীবনানন্দ 'সুচেতনা' কবিতায় একসময় লিখেছিলেন :

> "মাটি পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি
> না এলেই ভালো হত অনুভব করে ;
> এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি।"

জীবনানন্দের যেকোনো গল্প উপন্যাস পড়তে বসে রসজ্ঞ পাঠকের এই কথা মনে হতে পারে। এইসব বই একাধারে জীবনানন্দের শক্তি ও অশক্তির, ঔপন্যাসিক সামর্থ্য ও নির্বলতার সাক্ষ্য দেয়। এগুলি প্রকাশ না হলেই ভালো হত। অবশ্য হয়েও মন্দ কিছু হয়নি।

না হলেই ভালো হত। কেননা একজন শক্তিমান লেখককে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে যে উঁচু আসনে দেখেছিলাম অন্য এক ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতার নমুনা দেখতে ভালো লাগে না। দ্বিতীয়ত, লিরিক কবিতায় মানুষের আবিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি দেখা যায়। তার পরিপূর্ণ স্বভাব চেনা যায় না। উপন্যাসে কিন্তু লেখকের পরিপূর্ণ জীবনবোধের প্রতিচ্ছায়া পড়ে। সেই প্রতিচ্ছায়ায় জীবনানন্দকে খুব মহান কথাশিল্পী মনে করতে পারছি না। তৃতীয়ত, হয়ত পরিমার্জিত হলে এইসব লেখা শৈলীর অপরিণত অবস্থা কাটিয়ে উঠত। সে সুযোগও আসেনি।

লাভের দিকের কথা হল জীবনানন্দের কবি-দৃষ্টি ও জীবনবেদের পুরো বলয় এবার আমাদের নজরে এল। সেই চেনার আলোকে জীবনানন্দের পূর্ণ মূল্যায়ন সহজতর হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু বাস্তব জীবন এবং সমকাল আর যুক্তিবাদী চিত্র উপন্যাসে প্রকট হয়ে উঠে এবং বর্ণনার ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার বাক্-প্রতিমা ও শব্দ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের পাশাপাশি উপন্যাসের বাক্-প্রতিমার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। এইসব গল্প ও উপন্যাসগুলির যোগে জীবনানন্দের সমাজ-চেতনা এবং প্রেমের বা যৌথ-সম্পর্কের মনোভাবনার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। এছাড়া আরো অন্যান্য যেসব দিক আছে, ডক্টর অমলেন্দু বসু 'মাল্যবান' এর ভূমিকাতে তার আভাস দিয়েছেন।

'ইদানিং বিশ্বসাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা উপন্যাসের মতো 'মাল্যবান' মহাকাব্যের বিশাল বিস্তৃত পথে না গিয়ে সংহত জীবনচক্র অঙ্কিত করেছে এবং এই সীমিত চিত্রের মধ্যে আশ্চর্য শিল্পশক্তির প্রমাণ রেখেছে, চরিত্রায়ণে, কথোপকথনে কাহিনীর গতিতে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ এই উপন্যাসের প্রধান আঙ্গিকী কৃতিত্ব এবং এই কৃতিত্ব পরিচ্ছন্ন রচনাশৈলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উপন্যাসটিকে তার স্বাধীন নিজস্ব মূল্য দিয়েছে।'

পূর্ণিমা

প্রতিক্ষণ পত্রিকায় ১৯৮৫ সালের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এই উপন্যাস। এটি লেখা হয়েছিল বরিশালে ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে।

পিতৃহীন ভাইবোনদের সংসার চলতো বড় বোন চামেলি ওরফে চপলার উপার্জনে। তিনি বিধবাশ্রমের স্কুল শিক্ষিকা। সুতরাং সুন্দরী গুণবতী মেজো পূর্ণিমার আগে বিয়ে হয়েছিল শিক্ষিত বেকার যুবক সন্তোষের সঙ্গে।

সম্প্রতি চামেলি জেদ করে চাকরি ছেড়েছে, সুতরাং আপাতত ভাইবোনগুলি বিপন্ন। এক আই. এম. এস. ডাক্তার বিরাজবাবু চামেলিকে পছন্দ করেছেন। তাঁর সঙ্গে চামেলির বিয়ে হবে। পূর্ণিমা আশা করে তাদের যথেষ্ট সাশ্রয় হবে এবার। এত বড় মানুষ তিনি। সন্তোষেরও একটা গতি হবে নিশ্চয়। অতটা প্রত্যাশা সন্তোষের নেই। বিরাজ কলকাতা আসবে। বিয়ের চিঠি ছাপানো হয়েছে। তবু রোজ চিঠি লেখে চামেলি বিরাজকে, চিঠি পায়ও।

সন্তোষও পূর্ণিমার চিঠি পেয়েছে ৭/৮ দিন পরে। সেও একটি চিঠি দিয়েছে। কিন্তু চামেলিদের সঙ্গে তাদের তুলনা বৃথা। বয়সে বড় হলেও চামেলি প্রেমের ক্ষেত্রে নূতন। পিপাসা, রোমাঞ্চ, প্রেমের স্বপ্নের প্রথম পাঠ তাদের চলেছে। পূর্ণিমার চিঠিতে রয়েছে সন্তানসম্ভবার কাতরতার কথা। প্রসবকালে মৃত্যু হলে, দুজনের জীবনের ব্যর্থতা, দুর্দশা, বেদনা থেকে মুক্তি মিলতো, কিন্তু সে উপশম ঘটবে না।

সন্তোষ পৃথিবীতে শুধু পূর্ণিমাকেই ভালবাসে। কিন্তু করুণা তো প্রেমের চেয়েও বড়ো। পূর্ণিমা তার রূপসমৃদ্ধি, সুলক্ষণ নিয়ে চামেলির চেয়ে ঢের বেশি বরণীয়া। পৃথিবীর যে কোনো বিরাজের মতো কৃতী পুরুষ চরিতার্থ হতো পূর্ণিমাকে পেলে। তবু সন্তোষ মেসের বিছানায় শুয়ে আপন জীবন থেকে পূর্ণিমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে। ভাবছে, এই রাতেই উপযাচক হয়ে কারো হাতে পূর্ণিমাকে দিয়ে আসতে পারলে জীবনে সে নিস্তার পেতো। তার কোনো অনুভূতির ক্লেশ থাকতো না, সন্তোষ সানন্দে সরে যেত।

চামেলির বিয়ে হয়ে গেছে। পূর্ণিমা আর চামেলি দুই বোনের ভাগ্যের এই ব্যবধান সন্তোষের চিন্তাকে পেয়ে বসেছে। কার দোষ? তার? বিরাজের? পূর্ণিমার? না চামেলির? অবিবেচক বিধাতার জাদুর খামখেয়ালে, এমন পরিস্থিতি হলো। দুবোনের ভাগ্যের এই আকাশ পাতাল পার্থক্যের ভিতর এক অবিচার ও অপরাধ লুকিয়ে আছে—যার শিকার পূর্ণিমা। কিন্তু চামেলি বা বিরাজ তো শিকারী নয়। বিধাতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই বা

লাভ কি? যে অভাব পূর্ণিমাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তার সমস্ত দায়ভার একা সন্তোষকেই বইতে হবে। অথচ সন্তোষ তো পূর্ণিমাকে গভীরভাবে ভালোবাসে, করুণা করে।

পূর্ণিমা চিঠিতে জানিয়েছে, এখানে থিয়েটার পার্টি এসেছিল। তার বিরুদ্ধে পিকেট করতে গিয়ে খুড় শ্বশুর মাথা ফাটিয়েছেন। বাড়িতে অন্য কোনো পুরুষ নেই। এদিকে মিশনের যে সিসটাররা পূর্ণিমার প্রসবকালে থাকবেন কথা ছিল—তাঁরা তিনচার মাসের জন্য দার্জিলিং চলে গেলেন। পূর্ণিমার তো তিনচার সপ্তাহের মধ্যে হতে পারে। কি হবে?

সন্তোষ ভাবছে, তেমন কিছু ঘটলে পূর্ণিমা মরে নিস্তার পাবে। হয়তো চামেলি নিজের চেয়ে যোগ্যতর বোনটির দুর্দশা দেখে বিবেক দংশন বোধ করবে। সম্পদের সচ্ছলতার মধ্যে হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অশান্তি কেউ কি চায়? বিরাজও কি হওয়া সঙ্গত ছিল তা ভেবে এক ব্যথার বিলাস অনুভব করবে।

পূর্ণিমা চেয়েছে সন্তোষ তার কাছে চলে যাক। পরিবর্তে সন্তোষ গেছে চামেলির বৌভাতে বন্ধু অমূল্যর সঙ্গে। বিরাজদের কম্পাউণ্ড জোড়া বিশাল সামিয়ানা অগুণতি হল্। সুগন্ধি, মানুষ, মেয়েমানুষ, রূপ রস সম্ভোগের প্রাচুর্য। চুরুট, মদ। জীবন এখানে উপভোগের অকল্পনীয় শিখরে। কিছুটা গিয়ে সন্তোষ আর অনুসরণ করতে পারে না। মনে পড়ে, পূর্ণিমা হয়তো উঁচু পেটে দুই পা ছড়িয়ে বেড়ায় ঠেস দিয়ে সন্তোষের জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে নিঃসহায় প্রসবের কিম্বা মৃত্যুর।

সন্তোষের স্থূল কল্পনা, আসবাব ও বস্তুপৃথিবীর অজস্র উপকরণে লণ্ডভণ্ড হয়ে ফিরে আসে। চামেলিদের জন্য পূর্ণিমা ও তার তরফে আনা উপহার মেহগিনির টেবিলের উপর স্তূপীকৃত ভিড়ের ভিতর রেখে এলো সন্তোষ।

ব্যারিষ্টার ও অফিসার অতিথিরা চামেলি ও বিরাজ যে প্রেসিডেন্ট লাইনারে ইউরোপে হনিমুনে যাবে তার আরামে ও বিলাস নিয়ে আলোচনা করছিল। সন্তোষ রাস্তায় নেমে পড়লো। অমূল্য বললো, চামেলিদির সঙ্গে দেখা না করেই চললে? সন্তোষ জানে, মোসাহেবদের ভিড়ে আজ চামেলি লজ্জিতই হতো কেবল। অমূল্য বলছিল, 'পূর্ণিমা একটু দাঁড়িয়ে বিয়ে করতো যদি।' সন্তোষ সায় দিল। পিছনের বাড়িটার দিকে একবার তাকালো। এমন ঐশ্বর্য ও রসোন্মত্ততার মধ্যে সে জীবনে ঢোকেনি। ভবিষ্যতেও সাহস বা রুচি অর্জন করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

প্রতিপদে উভয়ের ভাগ্যের এই অপরিহার্য তুলনা নিয়ে কোথায় যাবে সে? পূর্ণিমার প্রতি এই অবিচার, অপরাধ, অক্ষমতা বেদনার দায় নিজেকেই বহন করতে হবে কেবল। কোথাও কোনো সমর্থ লোক আছে যে সন্তোষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবে? নিজে সে শীতরাতে গোয়ালের খড় গাদায় শুতে রাজি—পূর্ণিমার জন্যই তার শুধু প্রার্থনা।

অমূল্য বলে, 'তুমি চেষ্টা করো না সন্তোষ, বিরাজের মতো উপযুক্ত জামাই হতে। তা পারবে না। ওদের সাত পুরুষের বুনিয়াদি, আই. এম. এস. ডাক্তারির দৌলতে এসব হয়নি।'

সন্তোষ বলে, 'কিন্তু বিরাজের মতো না হলে কিছুই যে হওয়া গেল না, অমূল্য।'

: 'কেন?'

: চামেলি যা পাচ্ছে—পূর্ণিমাকে সবটুকুই দিতে হবে তো। আমি ওর জীবনে হঠাৎ ঢুকে না পড়লে ও সমস্তটুকুই—হয়তো বেশিও পেতো।

: হয়তো পেতো, হয়তো না, এখন যে কিছুই পাচ্ছে না।

: সব রূপ গুণ সত্ত্বেও পূর্ণিমা গরীব ঘরেরেই মেয়ে। সচ্ছলতা পেলেই সে খুশি হতো। আমি সেই চেষ্টাই করেছি এতদিন। বিরাজ এসে সব ভণ্ডুল করে দিল। সন্তোষ বলে, 'প্রতিভা থাকলে আমি পূর্ণিমাকে তুলে নিতাম, কিন্তু সামান্য শক্তির মানুষ আমি। সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবস্থার পথ খুঁজছিলাম। ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল বিরাজ। তার দোষ নেই। রূপসীকে বিয়ে করেছে। স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্ণিমার বোনকেই বিয়ে করতে গেল কেন সে ? আর কি সুন্দরী ছিল না জগতে। তবু এই বিশৃঙ্খলাতেও আমি প্রেম হারাই নি। করুণা বা মমতাও বলতে পারো একে। নানা জায়গায় দুঃস্থতা থাকলেও পূর্ণিমার ব্যথাই আগে বুকে লাগে।

সাত আটদিন কেটে গেছে। পৃথিবী নরম কোমল মধুর সন্তোষের চোখে। পূর্ণিমা পা ছড়িয়ে খড়ো ঘরে বসে নেই। প্রসবের ভোরে মৃত্যু হয়েছে তার। বিশ্বময় সে ছড়িয়ে পড়েছে।

নায়িকা এখানে নেপথ্যচারিণী। তার ভাগ্যের বিপর্যয় নিয়েই ব্যাপ্তি-হীন এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে। যার জন্য পূর্ণিমার দুর্দশা সেই বেকার স্বামী সন্তোষের জবানীতেই কাহিনী বিবৃত। তাই গল্পের অন্তর্লীন করুণা প্রবল হতে পেরেছে। কিছু কিছু অংশ রূঢ়। যুক্তিহীন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সন্তোষের বড় শালির বিয়ের আড়ম্বরে যোগ দেওয়া, মিশনের সিসটারদের কোনো ব্যবস্থা না রেখে দীর্ঘদিনের জন্য দার্জিলিং ভ্রমণ এর মধ্যে পড়ে। অবশ্য সবে উপরেই দাঁড়িয়ে আছে গল্পের পরিণাম ও রস।

কল্যাণী

দেশ জীবনানন্দ (স্মরণ) শতবর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কল্যাণী' উপন্যাসটির রচনাকাল জুলাই ১৯৩২। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় রচনা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবলম্বনে এই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে।

এক ছোট জমিদারীর মালিক পঙ্কজ রায়চৌধুরী শালিখ বাড়ি গ্রামে পৈতৃক বসত বাড়িতে স্বমহিমায় আছেন। সেখানে তাঁর সাথে থাকেন স্ত্রী গুণময়ী আর মেজ ছেলে প্রসাদ। বড় ছেলে দীর্ঘদিন বিলাতে গেছে। নিয়মিত টাকা পাঠালেও তার মতিগতির হদিশ মেলেনি। সম্ভবত মেম বিয়ে করে সে সেখানেই স্থায়ী হয়ে গেছে। তাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করার ভয় দেখিয়েও কোনো সুরাহা না হওয়ায় মেজ ছেলে প্রসাদের পরামর্শে বা প্ররোচনায় মাসোহারা বন্ধ করা হয়েছে। ছোট ছেলে কিশোর আর মেয়ে কল্যাণী কলকাতায় বোর্ডিং-এ থেকে কলেজে পড়াশুনো চালাচ্ছে। কিশোর যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খল, পানাহারে অসংযত, আর্ট ও থিয়েটার-বায়োস্কোপে অতিমাত্রায় আসক্ত। মেয়ে কল্যাণীও ছোটদার পদাঙ্ক অসংকোচে অনুসরণ করছে, যদিও আবেগপ্রবণ কল্যাণী বাবার কাছে তাঁর আদর্শ মেনে চলবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়।

উপন্যাসের সূচনায় দেখা যায় দেশের বাড়িতে ফিরে কল্যাণী অসন্তুষ্ট হয়। বোডিংয়ে যে অলস অসংযত জীবনযাপনে অভ্যস্ত তাই অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। মায়ের একটু প্রশ্রয় থাকলেও বাবা তাকে বাধ্য করেন সংযত জীবনযাপনে। ষ্টিমারে কলকাতায় ফেরার পথে কিশোর কল্যাণীর সামনেই মদ খায়। বোডিং-এ কল্যাণী আবার অলস উচ্ছৃঙ্খলতায় ফিরে যায়। সহপাঠিনীদের সঙ্গে আড্ডার মধ্যে তার আশা আকাঙক্ষার প্রকাশ ঘটে। কিশোরের সঙ্গে সে শিশির ভাদুড়ির অভিনয় দেখে সারারাত, গঙ্গার ধারে গাড়িতে কাটিয়ে সকালে বোডিং-এ ফেরে। তার সাহস বাড়ে। কৃতকর্মে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে তার অনুতাপ হয় না। কিশোর সব সময়ে তাকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করে।

পূজার সময় সে শালিখ-বাড়িতে ফিরে এক অদ্ভুত দর্শন কদাকার ধনী ব্যবসায়ী চন্দ্রমোহনকে বাড়িতে দেখতে পায়। কল্যাণী প্রথম দর্শনে তাকে ঘৃণা করলেও তার বাবা মা তার সঙ্গেই কল্যাণীর বিয়ে দিতে উন্মুখ জেনে কল্যাণী কাঁদতে শুরু করে। লোকটি জানায় ৭/৮ কোটি টাকার কারবার আছে তার। প্রসাদ কি সব কাগজপত্র দেখে শুনে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করে। লোকটি কল্যাণীর ডায়েরি উন্মোচিত করে কল্যাণীর প্রকৃত চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ, কলকাতার হোস্টেল জীবন এবং প্রেম প্রসঙ্গ বাবা মার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। মেজদা কল্যাণীর পক্ষে দাঁড়ায় না। কল্যাণীর প্রেমিক অবিনাশ বেকার। সেও হতাশ চিত্তে কল্যাণীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে চন্দ্রমোহনকে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। চন্দ্রমোহনের কাকুতি মিনতি, প্রেম নিবেদনে কল্যাণী শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। বিয়ের পরে জানা যায় চন্দ্রমোহন কি ভীষণ ধাপ্পাবাজ। ৮ কোটি টাকার চালু কারবারের বদলে তার মাত্র ৮ হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল, কল্যাণীর বাবার দেওয়া যৌতুক ৭ হাজার টাকা মিলে মোট ১৫ হাজার টাকা মূলধনের সুদে তার সংসার চলে। তার নিজের কোনো বসত বাড়িও নেই। শ্যামবাজারে ৩৫ টাকায় এঁদো ঘরে ভাড়া থাকে। মাত্র ৩৫ টাকাতে কল্যাণীকে সংসার চালাতে হয়। ঠিকে কাজের লোকও জোটে না তার। ৭ মাসের গর্ভবতী কল্যাণীকে সব গৃহকর্ম করতে হয়। তার শখ সাধ পড়াশুনো চর্চা চলে গেছে। বাবা ও দাদারা তার খোঁজ নেয় না। মায়ের কাছে চিঠিতে কল্যাণী স্বামীর জন্য মার্জনা চায়।

কল্যাণীর যে সন্তান হয়—সে অবিকল চন্দ্রমোহনের প্রতিচ্ছবি। তবু তার উপর কল্যাণীর অশেষ বাৎসল্য। তার গর্ভে আবার সন্তান এসেছে। এও আরেক চন্দ্রমোহন। সন্তানসম্ভবা কল্যাণীর এই অনিবার্য পরিণতি।

বিশ শতকের চতুর্থ দশকে সুশিক্ষিতা স্বাতন্ত্র্য-পিয়াসী নারীর ক্ষণজীবী আশা ও স্বপ্নের সমাজ ও পরিবারের চাপে এবং স্বভাবনিহিত মাতৃত্বের টানে এমন অপ্রত্যাশিত পরিণতিই অনিবার্য ছিল। উপন্যাসের চরিত্র সৃজনে আদর্শ দক্ষতা কিছু নেই—মোটামুটি বস্তুনিষ্ঠা আছে। পঙ্কজবাবুর মতো নিজের বোধ-বুদ্ধি আদর্শবাদ সম্পর্কে অহংকারী অন্যের কাছে নানাভাবে প্রতারিত মধ্যবিত্ত জমিদার ; চন্দ্রমোহনের মতো ধূর্ত মিথ্যাবাদী অভিনয় নিপুণ প্রতারক ; প্রসাদের মতো সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মমতাহীন, পিতামাতার কাছে আস্থাভাজন সন্তান এবং কিশোরের মতো বাগাড়ম্বর সর্বস্ব পথভ্রষ্ট আধুনিক তরুণ অভিনব

কোনো সৃষ্টি নয়। সে যুগের যুগধর্মই এর মধ্যে বিম্বিত। ভণ্ড চন্দ্রমোহনের দ্বারা সমষ্টিগত ভাবে প্রতারিত হওয়ার পর ক্রোধ পরবশ হয়ে কল্যাণীর সম্পূর্ণ সংশ্রব বর্জন সেদিনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

জীবন যাপন

অজিতের রাঙাখুড়ো তারকবাবু, অজিতের ঘরে এসে জানালেন তিনি তাঁর ঘরে তামাকটুকুও খাবেন না। বাড়ির সকলের কুশল কিন্তু তিনি বড় মর্মাহত। সে থিয়েটারে নেমে বংশমর্যাদা, বাবা-মা'র ভালোবাসা, শিক্ষা সবকিছু জলাঞ্জলি দিল—এ কল্পনাতীত। অজিতের ঠাকুর্দা যিনি সংকীর্তন ছাড়া মজলিশ মুজরোয় থাকতেন না, পরস্ত্রীর দিকে তাকাতেন না, সেই বংশের সন্তান অজিতের এই অধঃপাতে পরিবারের সবাই দুঃখ পেয়েছে তাই নয়, ঘৃণাও করছে কেউ কেউ।

অজিত বলল, তার মা-বাবা, আপনি বা বাণীদি ভুল বুঝলে তা তার আঁতে লেগে থাকবে চিরদিন, তবু তাকে বিবেক অনুসারেই চলতে হবে। চাকরি ছেড়ে, প্রফেসারি ছেড়ে, হৃদয়ের মমতার জন্য অজিত থিয়েটারে এসেছে। কবিতা লেখা ছেড়ে, আবৃত্তির মুগ্ধতা পেরিয়ে, বাংলা স্টেজকে সৃষ্টির সার্থকতা দিতে, সাধারণ মানুষের বিরূপতাকে বিদূরিত করতে ঐকান্তিকতা নিয়ে সে অভিনয়ের জগতে এসেছে। যা মানুষের ভালোবাসার জিনিস তার সাধনা যদি সত্যি হয়, তা স্বীকার করতে হয়। মানুষ যদি অন্তঃসার হারিয়ে বসে তার দারোয়ান হবারও যোগ্যতা থাকে না। নট ঢের বড়ো জিনিস। অনেক পরিবারেই মেয়েদের মজলিশে গানে যোগ দেবার অনুমতি নেই—এরা জীবনের সংস্পর্শে আসতে ভয় পায়।

অজিত করুণাবাবুকে অবাস্তব পৌরাণিক উপাখ্যান ছেড়ে সাহিত্যমূল্য-সম্পন্ন নাটক বাছতে অনুরোধ করে। কিন্তু করুণাবাবু জানেন, স্টেজ একটা ব্যবসা। একটা নূতন বই নেবার আগে অনেক ভাবার থাকে। এই যা চলছে, সকলের আজও ভাল লাগছে, চলুক। মানুষের রুচি তৈরি করা যে স্টেজের কাজ তা করুণাবাবু মনে করেন না। অজিত ভাল অভিনেতা, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তার হাতে দিলে সে থিয়েটারকে নিঃশেষ করে ফেলবে। হয়ত শেভিয়ান নাটক স্টেজে এনে বসবে। অজিত বলে, শ'র নাটক তার ভাল লাগে না। তাতে জীবনটাকে ভোজবাজি মনে হয়। আজ বাংলাতে নূতন বইয়ের দরকার। গল্প উপন্যাস থেকে প্রাণসম্পদ ভরা এমন বই আপাতত সন্ধান করে কাজ চালানো যেতে পারে। ধোঁয়ার থেকে বেরিয়ে আসার সাহস সাধ তাদেরও থাকা উচিত। লেখকের জন্ম দিতে না পারুন নূতন ধরনের বই অভিনয়ে, ভবিষ্যৎ গঠনে তাদেরও অংশ নেওয়া উচিত। এসব কথা করুণাবাবুর শোনার সময় নেই। তিনি বলেন, আচ্ছা দেখবো।

সুদর্শনা সুশিক্ষিতা পূর্ণিমা মহাভারত নাটকে সত্যভামার পার্ট করে। তার আন্তরিকতায় অভিনয়ে চমৎকার সুর বাজে। স্টেজে দাঁড়িয়ে ভুল পড়ার আশঙ্কা অজিতের নেই তবু নিজের পার্টটা বই ধরে যত্ন করে মনে মনে তৈরি করছিল। এই অসার বইয়ের ভুল বা ঠিক পড়া নিয়ে অজিত মাথা ঘামায় না, তার সন্দিগ্ধতা অন্যত্র।

যদিও পূর্ণিমার মতে অজিতের অভিনয় দেখতে হল লোকে ভরে যায় ; তবু অজিত ভাবে বিচক্ষণ কিছু দর্শক নিশ্চয়ই ভাবেন, বুদ্ধি ও হৃদয়হীন এমন নির্বোধ অবাস্তব ঘটনা ও চরিত্রকে কেন নায়ক-নায়িকারা এত প্রাণসম্পদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলল—যা রাতের পর রাত দেখতে ইচ্ছে করে। কেন?—একথা কিন্তু সে বলল না। পূর্ণিমার অভিনয়ের প্রশংসাও করল না।

পূর্ণিমা তার নাটক-সম্পর্কিত সন্দেহ অনুমান করে অন্য নাটক লিখতে বা লিখিয়ে নিতে বললো। আগে যেমন বিখ্যাত এক উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল তেমন উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার প্রস্তাব তুললো। অজিতের তাই মত। পূর্ণিমা সেই বইটির অভিনয়ে দুদিন স্টেজে নেমেছিল। ভালো করে প্রস্তুতির অভাবে সেবার অভিনয় জমেনি। শিক্ষিত সদ্বংশজাত অজিত আত্মাভিমানে পূর্ণিমাকে আঘাত দিয়ে বলে, একটা গল্প হলেই বুঝি তোমার ভালো লাগে। পূর্ণিমা বরাবর আদর-আহ্লাদ পেয়েছে। এসব কথায় সে কষ্ট পায়। অজিত তখন দোষ স্বীকার করলে পূর্ণিমা লজ্জা পায়।

দুদিন পরে প্রত্যুষের শ্রাবণ বর্ষার মধ্যে পূর্ণিমার দোতলার সাজানো ঘরে ভিজে হুড়মুড় করে জামা-কাপড়-জুতো নিয়ে ঢুকে অজিত কার্পেট নোংরা করে বসে। ইজিচেয়ারে শান্ত হয়ে বসলে পূর্ণিমা তাকে একটা চুরুট খেতে দিতে চায়। তার ঘরে আগন্তুকদের জন্য এখন ধূমপান আর মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে শুনে অজিত স্তম্ভিত। বলে, সে থিয়েটার করে বলেই তার মা তাকে ভালো মনে করেন না। কিন্তু মদ খেলে সে তাঁকে কি কৈফিয়ৎ দেবে। পূর্ণিমা বোঝায় এ ঠিক মদ খাওয়া নয়—অজিত এক গ্লাস খাচ্ছে শুধু।

কিন্তু অজিতের যদি লোভ বেড়ে যায় প্রথম খাওয়ার পর। বিশেষত কোনো নারী কখনো তো সাধেনি তাকে। পূর্ণিমা সাধলে কি করে অগ্রাহ্য করবে সে? মনে পড়বে ওমর খৈয়াম, সাকি, নশ্বরতা, নারীর রূপ, আর্টিস্টের অধিকার। সে যদি সমস্ত বোতলটাই পূর্ণিমার অনুমতি নিয়ে শেষ করে বসে!

অজিত পূর্ণিমার কাছে তার পরিণতির বিষয়ে প্রশ্ন করে। উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করে। অজিতের সেই পরিবর্তিত জীবনে পূর্ণিমাও কি তাকে উপেক্ষা করবে না? পূর্ণিমা লজ্জা পায়। বলে উপেক্ষা করবে কেন? সে নিজে মদ খায় কিনা—এ প্রশ্নে আরো লজ্জিত হয় পূর্ণিমা। বছর দুয়েক সে মদ ধরেছে। মদের পরিমাণ, প্রত্যহ খায় কিনা এমন নানা প্রশ্নে বিড়ম্বিত পূর্ণিমা বলে তার ঘরে এসেছে বলেই অজিতের এতসব জিজ্ঞাসার অধিকার জন্মায়নি। এইভাবে সে লজ্জা চাপা দিতে চায়।

এ লোকটা সারাজীবন মদ খায়নি। ভাল অভিনেতা, থিয়েটারে এল। মদের গেলাস দেখলে মায়ের কথা মনে পড়ে তার। একসময় কবিতা লিখত। অনেক কবির সঙ্গে মিশেছে। অন্যরা যেখানে পদ্য মেলাতে শিখেই স্ত্রীকে ফেলে দশটা মেয়েমানুষ নিয়ে বসতে চায়, চুল ছাঁটে বাবরি ছাঁদে, জলের বদলে জন্মায় মদে রুচি। অজিত মনে করে প্রকৃত কবিদেরও কি বড় চুল রাখা অপরিহার্য? পদ মেলাতে পারলেই মদ খাওয়ার নিরঙ্কুশ অধিকার জন্মায়? প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ বা আবিষ্কারকরা তো মদ মেয়েমানুষহীন ভাবে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে পারে। অজিত মনে করে প্রকৃত কবি বা নাট্যপ্রতিভার এ-

বোধ থাকা দরকার? পূর্ণিমা তো অভিনয়কেই ভালোবাসে। তার জন্য ঢের লাঞ্ছনা সয়। সে শিক্ষিত। স্টেজ তার কাছে সুখের জায়গা নয়, নিবেদনের জায়গা।

পূর্ণিমা বোঝাতে চায় অজিতের মতো সে তো প্রতিভাবান নয়। স্টেজে উঠলে সে নার্ভাস হয়ে পড়ত। মদ খেয়ে নামলে অভিনয়টা সহজ সাবলীল হয়। অজিত বলে, 'তাহলে সেও কি খেতে শুরু করবে?' পূর্ণিমা জানায়, 'আপনার কি দরকার। আপনার জন্মগত ক্ষমতা।' অজিত হতাশ গলায় বলে প্রতি রাতে তাকেও কষ্ট পেতে হয়। 'আচ্ছা, এখন তো একগ্লাস ঢালো।'

পূর্ণিমা এবার তার পায় পড়তে চায়—অজিত মদ খেলে সে মঞ্চাভিনয় ছেড়ে চলে যাবে। অজিত বলে, সে তো কবি, গুণী। তার মদ খাওয়ার অধিকার সকলে সমর্থন করবে। পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করে মাকে কি বলবে অজিত তখন? হেসে ওঠে অজিত, মানুষের জীবন ক্রমে তার নিজের জিনিস হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ক্রমেই ঢিলে হয়ে যায়। যা ভাল লাগে তাই সে করে। তার মধ্যে নূতন ভালোবাসার জন্ম হয়। যেমন এখন অজিত অভিনয়কে শ্রদ্ধা করে, চুরুটে তার মমতা, কাকে ভালোবাসে তা সে আজও জানে না।

পূর্ণিমার মা-বাবা এখনো বেঁচে। মেমের স্কুলে ফ্রক-পরা বয়সে সে অক্ষর চিনেছিল। তাদের হিজলডাঙ্গা গ্রামে সেই রূপশালী ধানের দেশ, ছাতিম গাছ, মাছরাঙার জগৎ এসব কথা মনে করে পূর্ণিমা বর্ষারাতে জানলার পাশে বসে কাঁদছিল। অজিতের কথাগুলো কাঁদাচ্ছিল তাকে। সে মনে রাখবে তাকে নিবেদনের মূর্তি হতে হবে।

মায়ের কাছে পাঠানো অজিতের টাকা ফেরৎ এলো। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন তার অধঃপতনে তাঁদের মুখ দেখানো শক্ত। পরের জুতো সেলাই করে টাকা পাঠালেও তাঁরা সাদরে নিতেন। চিঠিখানা অজিত বার বার ভাঁজ করছিল। পূর্ণিমা এসে এই অবস্থায় দেখল অজিতকে। অজিত জানাল, মা নাকি তার তুলনায় হরিলালকেও মানুষ মনে করেন। সে মদ-গাঁজা খায়, বেশ্যাপাড়ায় থাকে। শুনে পূর্ণিমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। অজিতের পরিবারের এমনই চিন্তাধারা!

কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে অজিত। আর ছাপায়নি। একদিন সব পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দিয়েছে। তার ধারণা জীবনের একাগ্রতার পথে দ্বিধা রাখতে নেই। একটা জিনিসকেই সে ধরবে।

পুরানো বইটারই অভিনয় চলেছে। অজিতের অপছন্দ হলেও তার অভিনয়ে দর্শকরা আনন্দ পায়। পূর্ণিমাও খুব সফল অভিনেত্রী। নাটক নিয়ে পূর্ণিমার কোনো ধন্দ্ব নেই। আর অন্তঃসারশূন্য চরিত্রটি অভিনয় করতে উঠেও অভিনয়কে ভালোবাসার জন্য অজিতের অভিনীত চরিত্রটিও প্রাণ পায়, প্রশংসা পায়।

কাল কি পার্বণ উপলক্ষে সারারাত অভিনয় করেছে ওরা। সকালে অজিতের ঘুম লাগছিল। রূপের হিল্লোল তুলে পূর্ণিমা এল। যেন সারারাত ঘুমিয়ে এল। অজিত বলল, সে কি করে পারে? সে নাকি মদও ছেড়ে দিয়েছে? একটা শাদা বেনারসী পরে এসেছে পূর্ণিমা। থিয়েটারে দেহের মর্যাদা কতখানি তা গ্রিকরা বুঝত। এই দিব্যজনের মতো পূর্ণিমার সৌন্দর্য বাংলা মঞ্চের কুরূপা অভিনেত্রীদের জগতে অজিতকে আকৃষ্ট করে।

পূর্ণিমা বলে, 'চেহারার অপরাধ তো মানুষের নিজের নয়।' অজিত জানায়, 'যারা তাঁকে অভিনয় জগতে আমদানি করে, অপরাধ তাদের। এদেশে যুবা তবু পাওয়া যায়। কিন্তু রমা বা যোড়শীর ভূমিকায় এসে জোটে এক একজন ধুমশো ঝি।' পূর্ণিমা হেসে বলে সে ব্যর্থতার দিন কেটে গেছে। মানুষের পরিবর্তন ঘটছে। আপনার মা আজ টাকা নিলেন না। একদিন মা-রা নিজের মেয়েদের অভিনেত্রী হতে সাধবেন।

রাজেনকে অজিত বলে দেয় দর্শনার্থীদের আজ ঢুকতে না দিতে ; সে ঘুমোবে। তার ঘুম ভেঙে গেল আটটায় গোলমালে। অনেক লোক দেখা করতে চায়। অজিত তাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে এক এক করে আনতে বলে দেয়। প্রথমে এল এক ছোকরা। সসঙ্কোচে জানাল একজন বড়মানুষ ব্যক্তিজীবনে কেমন তাই দেখতে সে এসেছে। স্টেজে তক্‌মা পরা দেখে। এখানে নিজের মুখের কথা শুনবে। সে জানতে চায়, 'মানুষের জীবনটা কি?' অজিত প্রতি- প্রশ্ন করে, 'তুমি নিজে কি মনে কর?' ছেলেটি বি. এ. পাশ। ওরা তিনপুরুষ এটর্নি। তার বাবা তাকে এটর্নি হতে বলেন। কিন্তু সম্পদের এই নেশাকে ছেলেটি ঘৃণা করে। এতে মানুষের অন্তরের কোনো সাধনা তৃপ্ত হয় না। তবে কি সে ফুটবল ভালোবাসে? শুনে অভিমানে ব্যথায় রাঙা হয়ে যায় ছেলেটির মুখ। তার ধারণা বইও সবচেয়ে আশ্রয়ের জিনিস নয়। প্রেমেও চরিতার্থতা আসে না। যদিও নিষ্ফলা টাকার চেয়ে সব মাধুর্য সত্ত্বেও তাতে বিচ্ছেদ ব্যথা ঈর্ষা একঘেঁয়েমির শেষ হবে না। ভালোবাসার শেষে কি মনে হবে কাদামাটি নিয়ে ছিলাম। অজিত তাকে বলে তার ভালোবাসার অভিজ্ঞতা নিয়ে সে তো উপন্যাস লিখতে পারে। ছেলেটি জানায় সে লিখতে পারে না। অভিনয় পারে না। তার জীবন বড় নিষ্ফল। অজিত বলে মেয়েরা যদি তাকে ভালোবাসে তাহলে সে প্রেম করুক। স্টেজে বাঁধা না পড়লে অজিতও তাই করত। ছেলেটি বলে বাপ-ঠাকুর্দার পেশার চেয়ে সেও ঢের ভাল। কিন্তু তাতে জীবনের কৈফিয়ত দেওয়া হয় কই? মনে হয় জীবন নিয়ে খেলা করছি। যা ভালোবাসতে চাই তাকে কিছুতেই পাই না।

ছেলেটি জানায় এবার, সে মিস্ পূর্ণিমাকে ভালোবেসেছে। শুনে যেন ধাক্কা খায় অজিত। ছেলেটি বলে, কি করে তাকে পাব? অজিত বলে, দূর থেকে ভালোবেসে ভালো লাগে না? ছেলেটি বলে, ভালোবাসা হয় বটে। কিন্তু তাতে চরিতার্থতা নেই। অজিত বলে স্টেজ অ্যাক্টিং পারলে তাও করো। কিন্তু কিছুই যখন পারো না, তখন পূর্ণিমাকে ভালোবেসে চরিতার্থতা আশা করো না। সে একজন অভিনেত্রী। স্টেজে দাঁড়িয়ে মানুষের নিহিত সৌন্দর্য সম্পদকে সে অনুভব করতে সাহায্য করে। তোমরা অনুভব করতে পারলে সে কৃতার্থ হয়। সেই অনুভবের মাধুর্য নিয়ে দুঃখে নিষ্ফলতায় রাত একা একা মুগ্ধতায় কেটে যায়। জীবনের এই সাধনাটুকুর মূল্যও কম নয়। ছেলেটি মাথা পেতে শুনল। তারপর চলে গেল।

খণ্ডিত উপন্যাসটি এই পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পাণ্ডুলিপির উপর জীবনানন্দের নাম স্বাক্ষর ছাড়াও লেখা আছে উপন্যাসটির রচনাকাল অগস্ট ১৯৩২ এবং হয়তো বইটির নাম— 'অজিত-পূর্ণিমা'। 'বিভাব' জীবনানন্দ শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক ড. ভূমেন্দ্র গুহ জানিয়েছেন কবি-কন্যা মঞ্জুশ্রী দাশের কাছে সংরক্ষিত যে খাতা যে কাগজপত্র ছিল তার মধ্যে কিছু সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ উপন্যাস ছিল। অসম্পূর্ণ সেগুলিকেই বলা হয়েছে যা

গোড়ায় প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ ছিল না, এখন সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো কিছু খাতা হারানোর ফলে। তাঁর প্রত্যাশা, হারানো খাতা হয়তো পুনরুদ্ধার করা যাবে।

এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসসমূহের একটি বর্তমানে 'বিভাব' পত্রিকার জীবনানন্দ শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যায় 'জীবন-যাপন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ড. গুহই এই নামকরণ করেছেন। কিংবা বলা যায় 'অজিত-পূর্ণিমা' জীবনানন্দের লেখা এই পূর্বনাম পরিবর্তন করেছেন। নায়ক-নায়িকার নাম যোগে জীবনানন্দ লিখিত পূর্ব নাম নিতান্তই প্রাথমিক চিহ্ন বা স্মারক মাত্র ছিল, তা সহজবোধ্য। কিন্তু নূতন নাম নিতান্তই দায়সারা গোছের হয়েছে। কেননা একটিমাত্র খাতায় প্রাপ্ত কাহিনীটুকুতে এক মঞ্চাভিনেতা ও অভিনেত্রীর ব্যক্তিজীবনের কিছু সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাথমিক আভাস এবং তাদের সম্ভাব্য প্রেমের অঙ্কুরটি বিধৃত হয়েছে। 'জীবন-যাপন' বলতে যে নিয়ম মানা বিস্তারিত সাংসারিক অভিজ্ঞতাকে বোঝায়, উপন্যাসের বিলুপ্ত শেষাংশে তা ফুটে উঠত কিনা জানি না, এতে অন্তত নেই। কিন্তু বই মাত্রের একটা নাম থাকা দরকার। সে অর্থে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলেও চলে, 'জীবন-যাপন'ও চলবে।

সেদিনের যুগচিত্রটি এখানে ফুটেছে। চারের দশকের নাট্যজগতের পরিস্থিতি, তাৎক্ষণিক পরিবর্তন-মুখিতা ঐতিহাসিক নাটক থেকে সামাজিক নাটকের দিকে মোড় ফেরার সূচনা এবং এই নিয়ে নাট্যদরদী ও নাট্য-ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব, বাংলার গ্রামীণ সমাজে এমনকি নিজের পিতামাতার কাছেও অভিনেতাদের অমর্যাদা ও ঘৃণা। আবার তরুণদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে নবজাত মোহ ও মাদকতা; অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উচ্ছৃঙ্খল ও অবিবেচিত জীবনযাত্রার ছবি ঠিকঠিক ফুটেছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা যেন প্রতিফলিত অজিত চরিত্রে এবং তার প্রভাবে পূর্ণিমার স্বভাবের রূপান্তর কাহিনীর গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

সমস্ত গল্পধারা লক্ষ্য করলে এর মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য বা গতি লক্ষ্য করা যায় না। তবে পরে নিশ্চয়ই লেখকের হাতে পরিমার্জিত মতে পারত। কিন্তু তেমন চমকপ্রদ নাটকীয় বিস্তারের সম্ভাবনা কম। জীবনানন্দ নাট্যাভিনয়ের জগৎ থেকে এ বইয়ের বিষয় নিয়েছেন। জানি না, একে নাটকের আকারে দাঁড় করানো তাঁর অভিপ্রায় ছিল কিনা। প্রায় পুরো গল্পটাই সংলাপ ও ক্রিয়াগতি (Action) ভিত্তিক। তাই এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং মনে করা যেতে পারে তা করতে হলে ফের আগাগোড়া লিখতে হবে বলে কাহিনী এ অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

গৌণ চরিত্রের মধ্যে তারকবাবু (রাঙাখুড়ো), রাজেন ও এটর্নি-পুত্র ছেলেটি বাস্তবানুগ হয়েছে।

মৃণাল

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেখা 'মৃণাল' উপন্যাসটি তাঁর প্রথম পর্বের এক অপুষ্ট রচনা। লেখক এক বিবাহিত পুরুষ। দুঃস্থ, বোর্ডিংবাসী। পূর্বপরিচিতা এক অবস্থাপন্না যুবতী মৃণালের আমন্ত্রণে তার কাছে দেখা করতে গেছে তাদের বাড়ি। প্রসন্ন সকাল। কিন্তু সে এসে এত্তালা পাঠালেও মৃণাল এসে দেখা করল না। তাকেই যেতে হল

মৃণালের ঘরে। সকাল প্রায় ৮/৯টা তখনো বিছানায় শুয়ে সে! লেখকের মনে হয়েছিল বড়লোকের মেয়ে বলেই এই শৌখিনতা মৃণালের সাজে।

মৃণাল আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বলল, ভয় পেওনা। অপরূপ রূপসী মৃণাল থাইসিস হয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। তার গুচ্ছগুচ্ছ চুলগুলি ছাড়া সৌন্দর্যের লেশমাত্র অবশেষ নেই। তেইশ বছরের মেয়েটি মৃত্যুন্মুখ আজ। তার পরিস্থিতি দেখে চোখে জল এসে গেল লেখকের। আড়াল করার জন্য লেখক ঘরের কুজোর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলল।

ঘরে ওষুধের গন্ধ। শুধু ওষুধের নয়। অথচ মৃণাল বাঁচতে চায়। তার রূপের প্রশংসা শুনলে আজও খুশি হয়। তার বন্ধু অনেক। গত পাঁচবছর দেখা হয়নি মৃণালের সঙ্গে। ইতিমধ্যে লেখকের বিয়ে হয়েছে। একটি মেয়েও হয়েছে তার। মৃণালও অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে ইতিমধ্যে। অনেক প্রেমের চিঠি পেয়েছে। বিয়ে করতে তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু মোটের উপর হয়ে ওঠেনি। লেখক জিজ্ঞেস করে এদের কাউকে কি ভালোবেসেছিল মৃণাল। মৃণাল তার মনটাকে আজও বোঝে না। মৃণাল বন্ধুর কাছে স্বীকার করে কখনো কখনো খুব লোভ হয়েছে তার কারো সঙ্গে নিজেকে ভিড়িয়ে ফেলবার জন্য, কিন্তু লোভ তো প্রেম নয়।

লেখকের ধারণা, আকাঙক্ষা, টাকা আর সংযম নিয়েই দাম্পত্যজীবন সুখে কাটতে পারে, প্রেমের কোনো দরকার নেই। মৃণাল এই পুরানো কথাটাকে সত্য মনে করে না।

অমলা মৃণালের মাসতুতো বোন তার চেয়ে বছর চারেকের ছোট, তার দেখাশুনা করে। অমলার তাকে খুব হিংসা, 'এখন আমার জায়গা অমলা অধিকার করেছে। প্রেমের চিঠি পায়, মুখে মুখে নিবেদনও ঢের।' তাকে ঘিরে মৃণালের অনুগৃহীতরা ড্রইংরুম ভরে থাকে। এদের সবার কর্তব্যবোধ আছে। আগে বা পরে একসময়ে মৃণালের সঙ্গে দেখা করে যায়, তার খবর নিয়ে যায়। এর বেশি আজ মৃণাল আর কি আশা করতে পারে। মৃণাল বলে নানারকম প্রবঞ্চনা করে তাকে বুঝ দেওয়া সহজ, সে চুপ করেই থাকে। কিন্তু ওদের চেয়ে ঢের বেশি বোঝে।

পরদিন আবার আসে লেখক। চেঞ্জে যাওয়ার কথা হয়। আগে লেখক অভিমান হলে বেরিয়ে পড়ত। পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে গিয়েছিল কাঠগুদাম নৈনি ও ভীমতালে। এখন পরিণত বয়সে এমনকি গোলদিঘিতেও ঘুরতে যায় না—খবরের কাগজ আর চুরুট হাতে। অভিমানের কথা কেউ টের পায় না। প্রেমের কবিতা লেখে না এখন আর। মৃণাল ভাওয়ালি যায়নি। বেড পেয়েছিল তবু। বিদেশে গিয়ে কে মরবে বলো। বাংলাদেশের প্রকৃতির কোলে মরেও তৃপ্তি। মাঝে মাঝে বড় খারাপ স্বপ্ন দেখে মৃণাল, যেন কবরের মধ্যে ঠকঠক করে হাঁটছে। কোনোদিন জ্বরের রেমিশন হয় না।

অমলা এল, বিছানা পরিষ্কার করে মৃণালের কাপড় বদলে দিতে। এখনি ডাক্তার আসবে। অমলার কথায় কান দেয় না মৃণাল। বলে ডাক্তার আসতে দুঘণ্টা দেরি। একটু বাদে ডাক্তার ঢুকে পড়ে। পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশান লিখে অমলার কাঁধে হাত দিয়ে বেরিয়ে যায়। মৃণাল বুড়ো ডাক্তারকে পরিপূর্ণ পুরুষ মানুষ মনে করে। তার ধারণা তার সঙ্গে আলাপের সূত্রেই তিনি সব কাজ ছেড়ে তাদের পরিবারের অসুখ হলে দেখে যান। তার ধারণা, ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন মৃণাল লেখকের আঙুল নিয়ে খেলা

করছিল দেখে ডাক্তার আহত হয়েছে। সে তাই সন্ধ্যার মুখোমুখি ডাক্তারকে আরেকবার ডেকে এনে কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চায়।

অমলা ডাক্তার এলে লেখককে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসায়। গল্প করতে চায়। ততক্ষণে ডাক্তার ফিরে আসেন। তিনি বিরক্ত মন্তব্য করেন, 'মেয়েমানুষ এমন দুঃসাধ্য জিনিষ?' লেখক আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

পরদিন মৃণালকে একটু প্রসন্ন লাগে। অশ্বত্থ গাছটার প্রায় পাতা খসে গেছে ; ফাল্গুন চৈত্রের মধ্যেই নূতন পাতা গজাবে আবার। আবার ঝাঁকড়া হয়ে উঠবে গাছ। ডাঃ ব্যানার্জী চেঞ্জে যাবার কথা বলেছেন, কিন্তু ভাওয়ালির স্যানিটেরিয়াম এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শিলং যাওয়া যায়। যাবে শিলং? লেখক বলে শিলং গেলে তো ভালই হতো। মৃণালের ধারণা পুরুষমানুষ বলে ডাক্তার তাকে কিছু বলেনি, প্রত্যাশা করে হয়তো বসে ছিল ঘণ্টা দুয়েক। দু-এক জন মানুষ আছে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। মৃণালের ধারণা ছ মাসের পরিচয় কেন ছ বছরের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ডাঃ তার বিছানায় বসবেন না, আঙুল দিয়ে চুল নিয়ে খেলা করবেন তা বলে হৃদয়ের আগ্রহ তার কারোর চেয়ে কম নয়।

মৃণাল ওভালটিন খাচ্ছিল, লেখক চা। মৃণাল সংকল্প করে আজ ডাক্তার এলে তার কাছে অসুখ বিসুখ চেঞ্জের কথাই নয়—ওতে ঘেন্না ধরে যায়—এমন কথা বলবে মনের কুয়াশা কেটে যায় যাতে। মৃত্যুর আগে যে যা তার কাছে ভালবেসে নিতে চায় তাই তাকে দিয়ে যাবে। মৃণালের দেহের জন্য খিদে হয়তো নেই, তার মনের জন্য এখনো অনেকের লোভ। মেয়েদের পুরুষরা মৃত্যুশয্যাতেও নিস্তার দেয় না, হৃদয় নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে। আর মেয়েদেরও বলিহারি, পুরুষদের উপেক্ষা করার শক্তি নেই। নিজের হৃদয়কে অন্যের কামনার জিনিষ ভেবে চরিতার্থ।

এক তরফা বকে যাচ্ছিল মৃণাল। তার ওভালটিন আঙুর বেদানা যেমন দিয়ে গিয়েছিল বাবুর্চি, তেমন পড়ে রইল। সে ঘুমিয়ে পড়লো। মৃণাল কি বাঁচবে?

বিকেলে মৃণাল জানতে চাইল তাকে না বলে লেখক চলে গেল কেন? সে বললো, সে যায়নি। ড্রইংরুমে অমলার সঙ্গে গল্প করছিল। মৃণাল সতর্ক করেছিল অমলার সঙ্গে বেশি আলাপ করলে ওর দাম্পত্য জীবনের শান্তি নষ্ট হবে। আসলে অমলার সম্পর্কে দারুণ ঈর্ষা মৃণালের। তার বক্তব্য রূপ আর জীবনসম্পদের সঙ্গে দায়িত্ববোধ না থাকলে যে মারাত্মক জীব হয়ে ওঠে অমলা তাই। তার অজস্র অভিযোগ, ছোটবেলায় সে প্রজাপতির ডানা ছিঁড়তো। (লেখক বলে অনেকেই ছোট বেলায় এমন নিষ্ঠুর খেলা করে কিন্তু) মানুষকে ফুসলে বেড়ানোই এখন তার ধর্ম। ডাকলে লেখক যেন তার কাছে না যায়। মৃণালের পরিচিতদের উপরেই অমলার লোভ ঘনিষ্ঠতা করার।

পরদিন মৃণাল বললো মৃত্যুর পর অমৃতলোকে বিশ্বাস সে অনেকদিন হারিয়ে ফেলেছে। ছমাস আগে এক দুপুরে খ্রিষ্টানদেব·গোরস্থানে গিয়ে কত বড় নিস্তব্ধতা ও অসংখ্য ক্রুশ দেখে উদাস হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে তাই মৃত্যুর পর নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা ছাড়া তার জন্য আর কিছু নেই। আসন্ন মৃত্যুকে মৃণাল বিকেলের রোদে উড়ন্ত মাছিদের খেলা দেখতে দেখতে ভাবছে। ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও সুন্দরের শেষ হবে না, নীল আকাশ

থাকবে, লক্ষ উড়ন্ত মাছি, যক্ষ্মারোগী, জীবনের গভীর স্পৃহা, সব থাকবে। ভগবান ও অমৃতের বদলে এইসব সৌন্দর্য মৃণালের মনকে পেয়ে বসেছে আজকাল।

অন্ধত্বকে মৃণাল বিশ্বাস করবে না। এই সংকল্পে স্থির থাকতে গিয়ে জীবনের বড় জিনিষগুলো থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে এই মৃণালের আক্ষেপ। সে ভেবেছিল বিয়ে করবে সন্তান রেখে যাবে। 'ভেবে নিলেই হলো আমি সেই বধু, এই সব শিশু আমারই।' বলে সে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সে ডাক্তারের হাত বুকের উপর তুলে নিয়ে সাগ্রহে গল্প করছিল। লেখকের আসা সে টেরও পেল না। এমনই কয়েকদিন আরো কয়েকজনের হাত ধরে আঙুল নিয়ে ঐকান্তিক ভাবে নাড়া চাড়া করলো।

একদিন বিকেলে রোদ এসে পড়েছিল মৃণালের বিছানায়, দুটো মাছি উড়ছিল রোদে। লেখক তাড়াতে চাইলে বাধা দিল মৃণাল। সে দেখছিল রোদ যেখানে সেখানেই উড়ে উড়ে যাচ্ছে মাছি দুটি, যেন রোদকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। মৃণাল বললে চারদিকে জীবনের স্পৃহা এমনই নিবিড়, এমনই বিচিত্র।

মৃণাল বললো, সে শিলং যাওয়া স্থির করে ফেলেছে। ডাক্তার যাবে। লেখককেও সঙ্গী হতে বললো সে। অমলাকে লেখক জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 'খেপেছেন আজ বাদে কাল মরে যাবে, সে যাবে আবার চেঞ্জে?' একটু থেমে যোগ করলো—সারাদিন ব্যানার্জির কাছে কত হাবিজাবি বলে, আংটি বদল করে বিয়ে করে—ডাক্তার আমাকে জানায়, ড্রইং রুমে আমরা দুজন হেসে খুন হই।

পরদিন সকালে মৃণালের কাছে যায়নি লেখক। সন্ধ্যায় অমলার সঙ্গে প্রথম দেখা। সে বললে বেলা বারোটায় মৃণালের দাহ শেষ হয়ে গেছে।

আসলে মৃণাল উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। সেই ব্যাপ্তি আসেনি কাহিনীতে। মৃত্যুন্মুখ একটি কুমারী নারীর প্রেম পিপাসা, জীবনপিপাসা এই কাহিনীর একমাত্র উপজীব্য। অথচ তারই বোনকে সে ঈর্ষা করে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবে। বিবাহিত বাল্যবন্ধুকে সতর্ক করে দেয় বোন অমলা সম্পর্কে। নিজের সহৃদয় চিকিৎসককে প্রেম নিবেদন করার চেষ্টা করে, অনুকম্পাবশে তাকে যে তারা রূঢ় প্রত্যাখ্যান করছে না, এ টুকু সে বোঝে না। শেষে মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নেয়!

মৃণালের এই অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি।

বিভা

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা এ উপন্যাসের নামকরণ জীবনানন্দ নিজে করেছিলেন। উপন্যাসটির গঠন বিন্যাসে বিশেষত্ব হলো সমস্ত উপন্যাসটি পাশের বাড়ি থেকে দেখা ও শোনা। মেসের জানলা দিয়ে লেখক দেখতে পাচ্ছেন সম্পন্ন প্রতিবেশী বিভাদের জীবনযাত্রা। আশ্চর্য যে বিভা এই কৌতূহলে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেনি। তার ফলে প্রায় যেন অশরীরী অবস্থায় থেকে লেখক বিভার পরিচিত জনের যাওয়া আসা কথাবার্তা প্রেমসংঘর্ষ

তার জীবন সমস্যার সমস্ত চিত্রপট তুলে ধরতে পেরেছেন। এমনকি বিভা মুক্ষিদা ও সুদর্শনকে নিয়ে যখন টালিগঞ্জে কাকাতুয়া ছেড়ে দিতে যায় তখনকার ঘটনা বর্ণনা করতেও লেখকের অসুবিধা হয় না। এই অসম্ভাব্যতা মেনে নিয়ে উপন্যাসটি চলেছে।

এক বিশেষ ধরনের মুখ দুর্লভ সৌন্দর্য দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে। তেমন আদল বিভার। এই আদল, সিনেমার নায়িকা রুথ চ্যাটার-টনের মুখে ছিল। সেদিন এক ধূর্ত মুসলমান ফড়ে সাতকাহন গল্প শুনিয়ে এক মৃতপ্রায় ময়না আর রঙচঙে কাকাতুয়া ঠকিয়ে বিক্রি করে গেল বিভার কাছে। বিভা পাখি পোষার, খাঁচায় পুরে যন্ত্রণা দেবার পক্ষপাতী নয় বলেই কিনেছিল। দেখা গেল ময়নাটার ডানার নিচে ফোঁড়া ; পাখির ডাক্তার দেখাতে হবে।

বিভার বাবা বিরক্ত হলেন। ব্যাঙ্কে চেক পেমেন্ট বন্ধ করার ব্যবস্থা করছিলেন—বিভা তাঁকে অনুনয় করে থামালো। সে এর মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে পেয়েছে। ইতিমধ্যে ছাড়া পাওয়া পাখিটার ঘাড় মটকে দিল পাশের বাড়ির বিড়াল। আবার চাকর সুদর্শন বিড়ালটাকে ডাণ্ডা মেরে মেরে ফেলেছে। তখন বিভার বাবা বললেন, 'এবার আমি সুদর্শনকে মারি, তখন বিভা আমাকে মারুক। সাড়ে তিনশ টাকা খরচ করে বিভার এই শিক্ষা হলো সর্বত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে যেও না।'

এদিকে কাকাতুয়াটাও পোষ মানে না, চিৎকার করে খাঁচার শলা কাটতে চায়, না পেরে রেগে নিজের পালক নিজে ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়।

মোক্ষদাচরণ গল্প করতে আসে বিভার কাছে। তার সাহিত্যবোধের সঙ্গে বিভার মিল হয় না। বিভা টুর্গেনিভের ভক্ত, মোক্ষদা উপহাস করে। এলিজাবেথ লোমণ্ডের 'আই হ্যাভ বিন ইয়ং' বিভার সহ্য হয় না। এইসব তর্কের মধ্যে পাখিটা চেঁচিয়ে ওঠে। মোক্ষদা বিভার সমস্যা বুঝে চিড়িয়াখানায় ফোন করতে চায় পাখিটা দেবার জন্য।

মোক্ষদা বিভাকে ভালবাসে. কিন্তু বিভা একটু মমতা বোধ করে মাত্র। মোক্ষদা ভাবে প্রেমে ব্যর্থতার পর তার মনে বিভা সম্পর্কে এক অবজ্ঞার ভাব মাত্র থাকবে, মনে হবে বিভা প্রেম নিয়ে এক শৌখিন খেলা খেললো, প্রেম যে পূজার জিনিস তা বুঝলো না। বিভা বলে ব্যক্তিবিশেষকে ভাল না বাসলেও সে সর্বজনকে ভালবাসে। মোক্ষদা এ অবাস্তব গল্পে বিশ্বাস করে না।

বিভা স্থির করতে পারে না কাকাতুয়াটা চিড়িয়াখানায় দেবে কিনা। মোক্ষদা বোঝায় পাখিটাকে সে তৃপ্তি দিতে পারবে না। অথচ অন্যকে চরিতার্থতা দেবার যে শক্তি বিভার মধ্যে আছে তা অবহেলা করে সে ব্যস্ত থাকবে একটা কাকাতুয়া নিয়ে? ওকে সামলানোর কাজ অনেক ছোট মানুষ পারে ; বিভা কেন মমতার অপব্যয় করবে।

শেষে সাব্যস্ত হয় পাখিটিকে বনে ছেড়ে দেওয়া হবে। মোটর গাড়িতে টালিগঞ্জের দিকে বাঁশ, আশশ্যাওড়া বনে কাকাতুয়াটা ছেড়ে দেয় যখন, তখন একটা ছেলে ঢিল ছুঁড়ে মারতে পাখিটা মরে গেল। গাছে গাছে অনেক শকুন। মরা পাখিটা ছুঁড়ে দিতেই কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। দেখে স্তব্ধ বিহ্বল হলো বিভা।

একদিন এক পার্শি যুবক এলো বিভার বাবার সঙ্গে। রুস্তমজি কলকাতাতেই থাকে,

ভালো বাংলা জানে। জাত হিসাবে পার্শিদের প্রশংসা করায় রুস্তমজি খুশি হলো। সেও বাঙালীদের কবিতা ও আর্টের প্রশংসা করলো। পার্শিদের অগ্নি উপাসনা, অপচয় না করে প্রাইমারি স্কুলের প্রয়োজন মেটানো—নানা প্রসঙ্গে আলোচনা গড়ালো। রুস্তমজি বলে কাশীতে মুটেও সংস্কৃত জানে কিন্তু উদবাদায় মানুষ আবেস্তা দূর স্থান পার্শি বা পহলবি পর্যন্ত জানে না।

বিভা বলে, পার্শিরা চ্যারিটি দেখায়। রুস্তমজির মতে চ্যারিটির মাধ্যমে অলসলোক তৈরি হয় কেবল। প্রতিদিন রুস্তমজি নানা উপহার আনে। বিভাকে রুস্তমজির খুব পছন্দ। সে বিভাকে প্রেম নিবেদন করে। বিভা তাকে বোঝায় ভালবাসা জিনিসটা বিচিত্র। দিনরাত যাতনা পাচ্ছি এ কথা বললেই কাউকে ভালবাসা যায় না। কিন্তু রুস্তমজি নাছোড়। সে বলে বিভাকে নিয়ে কুঁড়ে ঘরে থাকলেও তার জীবন সার্থক হবে। কিন্তু বিভার সার্থকতার স্বপ্ন সে বুঝতে চায় না। সে বলে বিভাকে বিয়ে করলে তার কি পার্শি সমাজে স্থান হবে না? যদি হয়, তবে চরিতার্থতার বাকি রইল কি? সে নিজের তিন লাখ টাকার সম্পত্তি বিভার নামে উইল করে দিতে চায়।

বিভা নিজের প্রেমহীনতার কথা কবুল করে। মোক্ষদার ভালবাসার কথা বলে জানায় এই প্রেমে ব্যর্থ যুবক কিভাবে ব্যথা জয় করেছিল। বিভার ভালবাসা না পেলে রুস্তমজি ভাবে তার সবই ব্যর্থ। বিভা তা মনে করে না। যারা ভালবেসে জীবন শুরু করে তাদের সম্পর্কও তো অনেক সময়ে তিক্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া নরনারীর প্রেমই শুধু জীবনকে সুন্দর করে তুলছে না, গতিময় জীবন, প্রকৃতির শোভা, আকাশ, চড়াই, কৃষ্ণচূড়া, দিনের জন্ম এরাও আছে। রুস্তমজি তবু নাছোড়। 'তোমাকে ছাড়া আমার একদণ্ড চলবে না।' বিভা উঠে গেল। আর ফিরলো না। ছেলেটি অপেক্ষা করে করে চলে গেল।

এক দুপুরে এলো যুবক ডাক্তার। 'ডাক্তারবাবু' বা 'ডাক্তারসাহেব'—বিভার এ সম্বোধনে সে ক্ষুব্ধ। বিভা দেরাজ থেকে কেক বার করলো চড়াইকে খেতে দেবে বলে। এক টুকরো ছুঁড়তেই চড়াই উড়ে পালালো। ডাক্তার ভাঙা কেকটা চেয়ে নিয়ে খেল। অনেক অনুযোগ তার। বিভা কেন এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেয়নি। পদবি ধরে ডাকেনি কেন? বসতে বলেনি। সাহেবি ঢঙে ধন্যবাদ জানালো কেন?

বিভা বলে খাঁটি বাঙালী, নিছক স্বদেশী হওয়া কঠিন। দেশ বদলাচ্ছে।

রুস্তমজির গল্প শুনে ডাক্তারের ঈর্ষা হয়। ডাক্তারের দাবি, সে সংস্কার মুক্ত, ঈশ্বর নেই। বিভা ভাবে মঙ্গলময় ঈশ্বর আছেন। ডাক্তার বলে অল্প বয়সে যার এত বিশ্বাস—বার্ধক্যে তার কি গতি হবে? বিভার অন্ধত্ব গুবরে পোকার মতো।

স্কটল্যাণ্ডে থাকার সময় এক জার্মান মেয়েকে ডাক্তার ভালবাসতো। জৈবিক ভালবাসা। সে গল্প শুনতে নারাজ বিভা। যার এত বিবেচনা, সেই ডাক্তার এত অনুভূতিহীন? যে সব মেয়ে এই স্থূল কাহিনী শোনে তাদের হাত থেকে ভগবান ডাক্তারকে রক্ষা করুন। ডাক্তার তবু বলে, একদিন বিভা বুঝবে ভালবাসা আসলে আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি।

মোক্ষদা জীবন-অভিজ্ঞতায় তিক্ত, তবু সে ভালবাসাকে মর্যাদা দিত। কিন্তু ডাক্তারের জীবন সাবলীল। ব্যাঙ্কের জমানো টাকার সুদ, বালিগঞ্জে বাড়ি, বিলাতি ডিগ্রি, পেশায়

পশার, শরীর সুস্থ, আদর্শের ধার ধারে না, আড্ডাবাজ, মেয়েরা তাকে ভালোবাসে, কিসের পরোয়া? সে তো মোক্ষদার মতো নয়, যার জীবন ভোগের ইচ্ছা আছে কিন্তু উপায়াভাব। টাকা নেই বা চেহারা বিশ্রী, অথবা রুগ্‌ণ, এরাই তত্ত্বজ্ঞ হয়, তিক্ত হয়।

ডাক্তার বলে, নারীরা আঘাত পেলে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। জার্মান মেয়েটি বরফ ভেঙে ভেঙে তার কাছে আসতো। দুজনে চিমনির ধারে বসে হুইস্কি খেত। তারপর কি হোতো জানাবে না। সে মেয়েটি মারা গেছে।

মেয়েটি মরল কিসে? ডাক্তার বলে, অত্যাচার কি কম চলেছে। মদ দিয়ে শুরু, তারপর যা হতো শুনলে আপাদমস্তক কাঁটা দেবে। যে অত্যাচারে মেয়েটা গুঁড়ো হয়ে গেল আমার একটা কেশও তা স্পর্শ করলো না।

বিভা বলে, 'জীবনকে জীবন বলে বুঝতে এখনো ঢের দেরি আপনার।' কিন্তু ডাক্তার মনে করে মর্নীষীরাও তারই মতো অন্ধকারে পড়ে আছেন। বইয়ের ভিতর যে বিশ্বাস আশা, আদর্শ ব্যক্ত হয়, জীবনে তা পচা চুনকামের মতো খসে পড়ে। বিভা বিশ্বাস করে না, ইতিহাসে কাব্যে যে প্রেম পূজা পেয়ে আসছে তার কর্মকর্তারা জঘন্য মানুষ ছিলেন।

পাশের বাড়ির মেস সম্পর্কে বিভার মনে কোনো কৌতূহল নেই। কিন্তু ডাক্তাব বলে ও জানলাটা বন্ধ রাখা উচিত। ফটো তুলতে পারে ওরা। বায়নাকুলার দিয়ে দেখতেও পারে।

বিভা কিন্তু জানলা বন্ধ করবে না। ডাক্তার জানতে চায় রুস্তমজি আসবে কিনা। বিভা জানায় খুশি হলে আসবে।

একদিন বিভাকে প্রশ্ন করে ডাক্তার, যাদের বিভা একে একে ভালবেসেছে, তারা কেউ রুচি বিরুদ্ধ কাজ করলে আঘাত পেতো? ডাক্তার চরিত্রের দুর্গতির কথা ভেবে বিভা কি বেদনা পায় না। দু একটি মেয়ে আছে যারা ডাক্তারের হিতাহিতের কথা ভেবে রাতেও বোধ হয় ঘুমোতে পারে না। তারা রূপসীও।

বিভা বলে ডাক্তারের ভাগ্য খুব ভালো। তবে তাদের দুজনকেই তো ডাক্তার গ্রহণ করতে পারবে না। একজন আঘাত পাবে।

ডাক্তার বলে, যদি সেই বৃত্তের কিনারেও বিভা থাকে, সবাইকে অগ্রাহ্য করে ডাক্তার তাকেই নেবে। বিভা বলে যে, সে বৃত্ত চোখেও দেখেনি।

ডাক্তার চুপ করে। বলে, তবে তাকে নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে যাবে।

এ বইয়ের চরিত্র সৃষ্টিতে বিভার চরিত্রই উল্লেখযোগ্য। মোক্ষদা, রুস্তমজি এবং ডাক্তার তিনজন তিন টাইপ।

বিরাজ

১৯৩৩ খৃস্টাব্দের অগস্টে জীবনানন্দ 'বিরাজ' এই নামে একটি একসারসাইজ খাতায় একটি লেখা শুরু করেন, মাত্র ২/৪ পৃষ্ঠার পর সেটি অসমাপ্ত থেকে যায়। তাতে দুটি মাত্র চরিত্র লেখক এবং বিরাজ, একটি সংবাদপত্র থেকে নানা সংবাদ উল্লেখ করে তার

ভাষা ও বক্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করেছে। তৎকালীন রাজনীতিক খবরও কিছু আছে, একটু বিদ্রূপের সুরও আছে। কিন্তু গল্পই বলা যাক বা উপন্যাসই বলা যাক রচনা হয়ে ওঠার মত ব্যাপ্তি এতে ছিল না। এই আবোল তাবোল লেখাটি প্রকাশ করার কোনো সার্থকতাই অনুভব করা যায় না। যে কোনো লেখক অনেক কিছু লেখার পরিকল্পনা অনেক সময়েই করেন, বিশেষত তাঁর সৃষ্টি কালের সূচনা পর্বে। পরে পরিত্যক্ত এইসব অসম্পূর্ণ লেখা গ্রন্থাবলীতে তুলে দেবার অর্থ কি?

ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে আহৃত এই সব রচনা—জীবনানন্দ প্রেমীদের বিড়ম্বিত করে মাত্র।

প্রেতিনীর রূপকথা

১৯৩৩ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লেখা হয়েছিল এই উপন্যাস। শ্বশুরবাড়ি বিক্রি হবে জেনে মালতী বিমর্ষ। আশ্রয়হীন হলে তাকে কি বাপেরবাড়ি চলে যেতে বলা হবে? তার স্বামী নাকি চাকরির খোঁজে কলকাতায় যাচ্ছে। কিন্তু পাবে না। ইংরেজিতে এম. এ. পাশ না করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হলে তার কাজ জুটত।

ছেলে সন্ধ্যার স্টিমারে যাবে শুনে মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ছেলের যাবার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেয়ে তাঁর সমালোচনা বেশি মালতীর নিরুদ্বেগ নিশ্চেষ্টতা নিয়ে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে যথোচিত ব্যবহার সুকুমার প্রত্যাশা করে না। বরং তার ধান্দা মায়ের যে মোটা অনন্ত জোড়া তিনি দুঃখের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন সে দুটি বাগিয়ে নেওয়া।

সুকুমারের একটিমাত্র শার্ট, কেচে পরবে। ধুতি নিয়েছে তিনখানা। এবার ঘোড়ার গাড়িতে নয়। পায়ে হেঁটেই সে যাবে স্টেশনে। মালতী এলে শেষ বিদায়ের সুযোগ দিতে মা সরে গেলেন। কিন্তু মালতী তা বাঁকাভাবে নিল। লেখকের শার্টের হাতাটা ছেঁড়া। তাই একটা সেফ্‌টিপিন চায় সে। ব্লাউজে কয়েকটি থাকা সত্ত্বেও মালতী দেয় না। বলে আস্তিন গুটিয়ে নাও। নিজের পাখাখানা ছেলেকে দেবেন বলেও মা শেষে স্টেশন থেকে কিনে নেবার পরামর্শ দেন।

রামধন এসেছিল পৌঁছে দিতে। স্টিমারে এত ভিড়, বিছানা পাতার জায়গা নেই। রামধনকে একথা বাড়িতে বলতে নিষেধ করে দেয়। সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের ধার ঘেঁষে একটা জায়গায় শতরঞ্জি পাতল সে। মেঝের জলে শতরঞ্জি ভিজল। হয়ত কারো পেচ্ছাপের উপর পাতা হল বিছানা। আকাশে মেঘের নানা রূপের ভেতর ইতালির শিল্পীদের চিত্ররস অনুভব করছিল সে। বাদল ভেজা মাঠ, বাংলার পথ ঘাট। যুগান্তের পেত্নীদের নিরবচ্ছিন্ন রূপকথা। কুললক্ষ্মীদের নরম ঢৌলের মুখ যেন চেনা দিতে চায়। নয়নপুরের মাঠে ঝুরিওয়ালা ঝাঁকড়া বটগাছ, হিজল, জামের জঙ্গল হারিয়ে যায় সব। কেবিন বয়রা তাকে এক গ্লাস জলও দেয় না ; দেখায় খুব ব্যস্ত যেন। সঙ্গে খাবার নেই। কিন্তু খাবারের বদলে চুরুট কেনে সুকুমার। খালাসিরা সালুন খাচ্ছে মাটির থালায়। লেখকেরও ক্ষিদে পায়। চুরুট জ্বালিয়ে নেয় সে। 'মশাই শুনছেন'—একটা ক্লান্ত বুড়োলোক

বিছানাটা ভাগাভাগি করে সাথে শুতে চায়। তার গলায় কণ্ঠীর মালা। সে নাকি কানুপ্রিয় গোঁসাইয়ের শিষ্য হর্ষনাথ। সুকুমার তার আবেদনে আপত্তি করে না। লোকটা কলকাতা পর্যন্ত যাবে। তার অনুরোধ ঘুমোলে তাকে যেন না জাগানো হয়।

সুকুমারের বন্ধু বনবিহারী কলকাতায় যাচ্ছে। তবে খুলনায় একদিন হল্ট করবে। সে তার সঙ্গে গল্প করে। বলে তার শৈশবসঙ্গিনী যার বিয়ে হয়েছিল ফটিকের সঙ্গে, সে নাকি মারা গেছে। বিয়ের পর তিন বছর টিকল মোটে। বনবিহারী বলে, উঠে যাচ্ছে কেন? তার জন্য কেঁদে নিজেকে হাস্যস্পদ করছে কেন সুকুমার। ফটিক তো তার নিকটতম। কোনক্রমে বনবিহারীর হাত ছাড়ায় লেখক। আজ রাতে হর্ষনাথ তার সঙ্গী না হলেই ভালো হ'ত। মিনিট পনেরো পরে বনবিহারী তাকে ডেকে তুলল। তার কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। বনবিহারী তাকে পান, স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট, ফার্স্টক্লাস সেলুনে হুইস্কি খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করছিল। বলছিল যে হতভাগিনী দুবছরের মধ্যে দুটি সন্তান বিয়োতে পাবে তার কথা মিছিমিছি কেন ভাবো? সেলুনে বসে সোডা হুইস্কির বোতল আনা হল। পরদিন বনবিহারী এসে নোট বুক বের করে লেখককে কাঁকুলিয়া রোডের একটি বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল, চারু আছে সেখানে। গিয়ে দেখা কোরো। কাল রাতে কষ্ট পেয়েছো বড়। আজকে পরিতৃপ্তি কর। কলকাতা তোমার কাছে অলকা হয়ে উঠল। সেই জানালো অস্থি-চর্মসার পেত্নী হয়ে দাঁড়িয়েছে চারু।

বনবিহারী চলে গেল। সুকুমার ভাবছিল চারুর সঙ্গে দেখা করবে কিনা। বৃষ্টি নেই, মেঘলা থমথমে আকাশ। বনবিহারী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জানাল এক মোকদ্দমার সাক্ষী হিসাবে তাকে আজ থাকতে হবে। একটি মেয়ের খুনের মামলা। বনবিহারী জিজ্ঞাসা করল কলেজে পড়ার সময় প্রতি ছুটিতে লেখক দুটি মেয়েকে এসকর্ট করে নিয়ে যেত। তার মধ্যে একজন বিনতা, তাকে ভালোবেসে বিমূঢ় বেদনা পেয়েছে সে। অ্যাসিসটেন্ট সারজেন্ট বিপিনবাবুর দুটি মেয়ে। বিনতার সঙ্গে লেখকের কথাবার্তা হয়নি কোনোদিন। একবার কুয়াশার জন্য স্টিমার পৌঁছতে দেরি হওয়ায় ছ'টার বদলে বারোটায় ট্রেনে যেতে হয়েছিলো তাদের। কিন্তু হোটেল থেকে লেখক ভাত আনলেও তারা তা খেল না। বনবিহারী বলে বিনতার মুখ তার বেশ লেগেছিল। যখন বিধাতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেলেন, এই স্টেশনগুলো মনে হ'ল কাঁকড়ার বুকের শাঁসহীন কড়কড়ে খোলা মাত্র।

'মনে মনে নারীকে এত পূজা করতে পার তুমি?'

'পূজা আমি নারীকেই করি ঈশ্বরকে করি না।'

'মেয়েটি এখন কোথায়? পশ্চিমে?'

'অন্ধের তবল চাঁটির মতো পাঁচ মিনিট হৃদয়টাকে নিয়ে একটু রেলা করে নিলাম, মন্দ হ'ল কি?'

লেখকের মনে পড়ছিলো বিনতাকে যখন দেখেননি ঐ দায়িত্বে মন বিরস ও অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে মেয়ে দুটিকে দেখে, বিনতাকে দেখে জীবনকে অন্ধ অভ্যাসের আবর্জনা মনে হল। সিগারেটের প্যাকেটটা বারাসতে এক ভিখিরিকে দিয়ে

নিস্তার পেয়েছিলো সে। একটি কুমারীর সংস্পর্শে এসে এমনটি ঘটেছিলো। সতেরো বছর আগের সেই বিনতার ছবি কোনদিন ভুলতে পারবে না। তাদের ফিমেল ইন্টার ক্লাসে স্টিমার ঘাটে উঠিয়ে দিয়ে থার্ডক্লাসে ডেকে নিজের বিছানা পাতা।

আগে এক পানওয়ালিকে মেয়েমানুষ জ্ঞান করতো সে। কেননা সে প্রীতির চোখে তাকিয়ে কথা বলতো। বিনতার পরিচয়ের পর এই পানওয়ালি এক কামনালুব্ধ দুঃখিনী জীবন থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছে।

যে মেয়েটিকে সঙ্গিনী করে বাংলার প্রাণকে সে বের করবে এই স্বপ্ন দেখতো সেই মেয়েটি আজ আর নেই। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের দেশের প্রান্তর ও মাঠ ত ছাড়লো না, বিনতাও ছাড়লো তাকে। 'স্মৃতি আর বেদনা নিয়ে কাল কাটিয়ে যেতে হবে। যদি পারা যায় এ স্টেশনে আর আসবে না। ব্যথা ও অশ্রুর ঠেলা মিছিমিছি ঠেলে কি লাভ। একদিন আবার ট্রেন মিস্ করল বিনতার সান্নিধ্যে বসে। কেরোসিন তেলের মশাল, বিড়ির গন্ধ, পার্শেলের হিসাব, টিকিট বিক্রি, খেঁকিয়ে চিৎকার, দৌড়াদৌড়ি এসব একদিন ভালো লেগেছিল আর ভালো লাগবে না।

আর একদিন বিনতাদের নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিল। রাত্রি একটায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। বিছানাপত্র ভিজে গেল। এক ভদ্রলোকের টিনের সুটকেসে বসেছিল সে। সেকেণ্ড ক্লাসে ঝড় জলে কিছু এসে যায় না। বৃষ্টিতে ঘুম জমে। ঝিমোচ্ছিল সে। কাঁধে হাত দিয়ে ষ্টীমারের কেরানি শুধোলেন, 'বাবু, আপনার নাম সুকুমার মজুমদার? আপনি সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনে যান। 'ওদের কিছু অসুখ বিসুখ করেছে?' না, আপনি ভিজে গেছেন বলে আপনাকে যেতে বলেছে।' মেয়েদের কেবিনে নয়, মেল কেবিনে। একটা বেঞ্চিতে দুধ-শাদা বিছানা পাতছিল বিনতা। আমাকে দেখেই একটা মোলায়েম র‍্যাগ বিছিয়ে দিয়ে চট করে চলে গেল।

ভাবছিল কি করে বুঝলো বিছানা ভিজে গেছে। চমৎকার ঘুমে শান্তি পেল। পরদিন কেরানিবাবু বললেন 'আপনার জন্য কলকাতা অবধি সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করা হয়েছে।'

শিয়ালদায় ভাড়া চুকিয়ে দিতে বিনতার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার হাতের ব্যাগের দিকে নজর পড়তেই সে একটা ট্রেনে উঠে বসল। যেন ইহজীবনে তাকে চেনে না। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় যাচ্ছে। গায়ের আলোয়ান বিছানায় বাঁধা, খুলে নিতে ইচ্ছে করছিল না। ঝুপ করে একটা মস্ত শাল কাঁধের উপর পড়ল। বুঝল না, বিনতা না মমতা কার শাল। গায়ে দিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। সোনার দুগাছি চুড়ি সমেত ডান হাতের কব্জিটি বিনতার নয় কি? একবার ওয়েটিং রুমের পর্দা উড়ে গেলে দেখা গেল ঘিয়ে রঙের শাল গায়ে ইজি চেয়ারে মমতা ঘুমিয়ে, আর শাড়ির খুঁট গলায় জড়িয়ে থুতনিতে হাত রেখে বিনতা চুপচাপ। আত্মতৃপ্তিতে মন ভরে গেল।

সান্তাহার স্টেশনে গাড়ি থেমেছিল। বিনতার হাতের বইখানা ছিল টমাস হার্ডির 'টেস'। ট্যাক্সি চড়ে যাওয়ার সময় রিক্সাওয়ালা তার হাতে বইটি এনে দিল—'মাইজি দিলা।' সেদিন রাত জেগে বইখানা শেষ করেছিল সুকুমার।

দেশের স্টেশনে বিনতারা তাদের গাড়িতে চাপলো, সুকুমারের ঠিকা গাড়িতে এক

বেতের ঝুড়ি ভরা ফল ও সন্দেশ। গাড়োয়ান বলল, 'নীল কুর্তা গায়ে খুবসুরত মেয়েটি দিয়েছে।' পরদিন বিনতার মামা জানালো ফলের ঝুড়িটা নাকি ট্রেনে খোওয়া গেছে। ষ্টিমারে সে সেটাকে দেখেনি। মামার অভিযোগ, 'আপনিও তো হুঁশিয়ার লোক। কিন্তু মেয়েদেরই অপরাধ। টেসের সঙ্গে জড়িয়েছে তাকে। প্রথমদিন ভেবেছিল গোরচনা গোরী। প্রথম সাক্ষাতের ছ'মাস পরে তার সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিলো বিনতার। তার মামা এনেছিলেন। কিন্তু কাকাদের আপত্তি ছিল। বিপিনবাবু গুরু মানেন না। ধর্ম নেই তাঁর। এসব কথা তখন সে জানতো না।

একদিন মেসে দেশের রাজমোহন বোস বলল 'কাল বালিগঞ্জে পরেশের বাসায় বিনতার সঙ্গে দেখা হল। তোমরা তো পরস্পরকে খুব চেনো। কাল রবিবার সে আসবে। তুমি অবিশ্যি অবিশ্যি যেয়ো।' সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিল। শুনল সারাদিন বিনতা ছিল। সন্ধ্যার মুখোমুখি চলে গিয়েছে। রাজমোহন বলল—'আমরা ভেবেছিলাম তোমারই অনিচ্ছা আসার ব্যাপারে।'

যে বোর্ডিং-এ বিনতা থাকে সেখানে কমলা বলে এক আত্মীয়া থেকে কলেজে পড়তো। সে জানালো থার্ড ইয়ারের ছাত্রী বিনতা ট্যাবলোতে মিশরের রাণী সাজে। এবার বিনতাকে একখানা চিঠি লিখল। সার কথা বোর্ডিং-এ দেখা করা সম্ভব হবে কিনা। উত্তর এল না। পরে মনে হল সে মেসের ঠিকানা দিতেই ভুলে গেছে। দ্বিতীয় চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত পোস্ট করল না। মাস খানেক পরে কমলার কাছে গিয়ে শুনল। খুব অসুখ তার, কয়েকবার বমি হয়েছে। পরদিন গিয়ে খবর মিলল জ্বর ছেড়েছে। কিন্তু সেখানে মেয়েদের মজলিস। আব একদিন জানা গেল, কাল বাবার সঙ্গে সে দার্জিলিং চলে গেল।

আর একদিন রাজমোহন এসেছিল। জানালো বিনতা সারাদিন থাকবে পরেশবাবুর বাসায়। কিন্তু লেখকের পা ভেঙে গেছে। হাসপাতাল যেতে হবে তাকে। ভাঙা হাড় ধীরে ধীরে জোড়া লাগল। কমলা যখন ফোর্থ ইয়ারে তখন তার কাছে খবর পাওয়া গেল বিনতা পুরীতে গেছে' পুরীতে চলে গেল সুকুমার। কিন্তু চার-পাঁচ দিন চেষ্টা করেও কোনো খোঁজ মিলল না বিনতার। যদি ঠিকানাটা অন্তত আনতো। কলকাতায় ফিরে খোঁজ মিলল। পুরীতেই আছে তারা। বাড়িতে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে দু-তিন দিন বের হয়নি। আরো দু-তিন মাস থাকবে। পুরী যেতে আর একমাস কাটিলো। লোক মারফৎ খোঁজ নিয়ে জানা গেল দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবে। হয়তো সেই আয়োজনে ব্যস্ত। তাই তাকে সমুদ্র পাড়ে দেখা গেল না। মনে এক নিবৃত্তি এবং অবসাদ এল। দেশে ফিরবে বলে স্টেশনে এলো। দেখলো একটা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনে সে উঠছে। অন্যরা আগেই উঠেছে বোধ হয়। সুকুমারকে সে দেখতে পেল না। লেখকের ইচ্ছে হাওড়ায় নেমে অমায়িকভাবে বিনতাকে নমস্কার জানাবে, কিন্তু হাওড়ায় তার দেখা মিলল না। তারা খড়্গপুরে নেমেছিল। সাতদিন পরে আবার পুরী ফিরবে। আর দেখা হয়নি বিনতার সঙ্গে। কয়েক বছর কেটে গেছে। বিলাত থেকে এডুকেশনে ডিগ্রি নিয়ে পশ্চিমে কোথায় শিক্ষা বিভাগে কাজ করছে। সুকুমারের এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কাছে অনেক বড় চিঠি আসে তার। জীবনের হারানো দিনগুলো অন্ধ আক্ষেপ নিয়ে সেখানে ভেসে বেড়ায়।

লেখক উপলব্ধি করে পুরোনো দলিল বাক্সে বোঝাই রেখে জমির উপসত্ত্ব ভোগ করা চলে. হৃদয়ের বেলা একথা খাটে না।

এক সময় পদাবলীর কিশোরীর মতো মনে হতো বিনতাকে। পরে 'টেস' এবং আধুনিক সাহিত্যে যেখানেই মানুষের হৃদয় প্রসঙ্গ আছে, মনে পড়ে সতেরো বছর আগের বিনতাকে। বাংলার অখ্যাত এক স্টেশনে কেরোসিনের মশালের আলোয়, হাতির দাঁতের মতো হলুদ পথক্লান্ত একখানা মুখ। যদি ভাবী জন্ম থাকে, এই নক্ষত্রেই ফিরে আসে, ইছামতীর পারে, কোনো নিশুতি বটগাছের পাশে গেরুয়া রঙ ইঁটের বাড়িতে বিনতাকে নিয়ে একটা জীবন কাটাতে দিয়ো বিধাতা—এই প্রার্থনা সুকুমারের।

কাহিনীর দৈর্ঘ্যের কথা ভেবে প্রেতিনীর রূপকথাকে যদি উপন্যাস বলা হয়ে থাকে তাহলে কিছু বলার নেই। এই কাহিনীর মুল কাঠামো স্টিমারে কলকাতা যাবার বিবরণ। তার সঙ্গে গোড়ায় যোগ করা হয়েছে লেখকের মায়ের এবং স্ত্রী মালতীর পারস্পরিক ব্যবহার ও আকাঙক্ষার দ্বন্দ্ব এবং লেখকের উদাসীনতা। এইটাই প্রথম এপিসোড। আর এ প্রসঙ্গটি জীবনানন্দের গল্পে কাহিনীতে বহু-চর্বিত।

দ্বিতীয় এপিসোড যাত্রা প্রস্তুতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা।

তৃতীয় এপিসোড স্টিমার যাত্রার ঘটমান বর্ণনা—যা 'বিচ্ছেদের কথা' গল্পটির পাঠান্তর বলে মনে হয়। এর মধ্যে সুন্দর প্রাপ্তি বিকেলের পশ্চিমের আকাশে মেঘের বর্ণনা প্রসঙ্গ ত নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ।

এখানে বুড়ো হর্ষনাথ ও আধাবয়সী জনার্দন 'বিচ্ছেদের কথা' গল্পের স্বার্থপর বুড়ো ও তার সঙ্গী কৈলাসের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

বুড়ো হর্ষনাথের স্ত্রী মরেছিলো গলায় দড়ি দিয়ে। সেই পেত্নীকে দেখানোর জন্য জনার্দন বুড়োকে নিয়ে গিয়েছিলো আখড়াপুরের মাঠে। তেঁতুলগাছে নাকি তার দেখা মেলে রোজ—এই কথা বলে। এই প্রেতিনীর প্রসঙ্গ থেকেই কি গল্পটির নাম রাখা হলো 'প্রেতিনীর রূপকথা'?

অবশ্য আরো দুটি প্রেতিনীর উপাখ্যান আছে এই রচনায়। লেখকের কৈশোর সঙ্গিনী চারুলতার বিয়ে হয়েছিলো ফটিকের সঙ্গে। বনবিহারী লেখকের বন্ধু। সে খবর দিলে স্টিমার পথে—'ছেলে প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল মেয়েটি। তিন বছরের মধ্যে দুটি সন্তান প্রসব—একেবারে কাঁকলাসের মতো হয়ে গেল বৌ। ডাক্তার বললে, বছরের মধ্যে এর যেন ছেলেপিলে না হয়। কিন্তু ফটকে একটা জানোয়ার।' বনবিহারী ধূর্ত লোক। লেখকের হৃদয়ের কোমলতা বুঝে তাকে চারুলতার প্রসঙ্গ তুলে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত নিজের নোটবুক থেকে একটা ঠিকানা দিল কলকাতার কাঁকুলিয়া রোডের ; চারু আছে সেখানে। 'তোমার কথা বলছিল একদিন আমাকে। গিয়ে দেখা করো।' বোঝা গেল না বনবিহারীর কোন খবরটা ঠিক। তবু চারু যদি বেঁচেও থাকে, চারুত্ব হারিয়ে সে প্রেতিনীতে রূপান্তরিত।

তৃতীয় প্রেতিনী হল কলেজে পড়ার সময় লেখকের দেশে যাত্রার সময় সহযাত্রিনী বিনতা। বিনতা পরমা সুন্দরী ছিল। তাদের ছুটি পড়লে এস্‌কর্ট করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব

পড়েছিল সুকুমারের উপর। তারা স্বল্পবাক, সেকেণ্ড বা ইন্টার ক্লাসের মহিলা শ্রেণীর যাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে বিনতার হৃদয়ের কোমলতার কিছু নিদর্শন পেয়েছিল লেখক, তাতে তৃপ্ত ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে পরে উভয়ের পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার যাবতীয় প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়— এইভাবে সতেরো বছর কেটে যায়। সেই স্মৃতি সুরভিত অতীত কলেজ জীবনের কয়েকটি স্টিমার যাত্রার কাহিনীর চূর্ণক এই স্টিমার যাত্রার বিবরণের সঙ্গে মিশে আছে। আছে তিন চারটি কিশোর কিশোরীর হৃদয় শোণিতের লজ্জা রাগবিমিশ্রিত বেদনাবিধুর ব্যর্থ প্রেম।

জীবন প্রণালী

১৯৩৩ সালের ১৮ই অগস্ট শুরু করেন এই উপন্যাস। এর নামকরণ জীবনানন্দ করে যাননি। কাহিনীর প্রকাশকালে জীবনানন্দ সমগ্রের সম্পাদক গ্রন্থের অন্তর্বর্তী তিনটি পদ নামকরণের যোগ্য ভেবে উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন 'জীবন-প্রণালী'। তাঁদের বিবেচিত আর দুটি সম্ভাব্য নাম ছিল 'মানুষের স্বাদ' আর 'রক্ত মাংসের ব্যবহার'। আমার বিবেচনায় 'জীবন-প্রণালী' পদবন্ধই শ্রেয় নাম হিসাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে। জীবনানন্দের অধিকাংশ গল্পের নামকরণে সম্পাদক স্বাদ, রক্ত-মাংস এইসব শব্দ এত ব্যবহার করেছেন যে কথাগুলি লেবু কচলানোর মতো তেতো ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

জীবনানন্দের এইসব অপ্রকাশিত উপন্যাস কোনোটিই শিল্প হিসাবে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত এক নিবন্ধে মাননীয় অশোক মিত্র 'হুজুগ বিনাশী' হতে চেয়ে লিখেছেন—

> "ভূমেন্দ্র গুহরায়রা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করবেন, তাহলেও বলব 'মাল্যবান' থেকে শুরু করে তাঁর প্রতিটি প্রকাশিত গল্প উপন্যাসও আমি অপ্রকাশিত দেখতে পেলে খুশি হতাম। জীবনানন্দ বহুদিন ধরে এই লেখাগুলি গোপন রেখে গিয়েছিলেন, গোপন রাখা প্রয়োজন মনে করাতেই। যাঁরা তৎসত্ত্বেও এ সমস্ত নিভৃত স্বগত রচনাদি টেনে হিঁচড়ে মুক্ত আকাশের নীচে অনাবৃত করেছেন তাঁরা জীবনানন্দের স্মৃতিকে সম্মান জানাচ্ছেন কিনা তা নিয়ে আমার গভীর সন্দেহ।"—
>
> ধানসিঁড়ি, শারদ সংকলন, ১৪০৫।

যাই হোক জীবনানন্দের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের মতো 'জীবন-প্রণালী' উপন্যাসটিও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-ভূয়িষ্ঠ রচনা। লেখকের তৎকালীন ব্যক্তিজীবনের ছায়া পড়েছে এতে। সুশিক্ষিত স্বামী বেকার। তার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সংসারযাত্রা এর বিষয়বস্তু। নায়ক শচীনের স্ত্রী অঞ্জলি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট। জর্দা কেনার চারটে পয়সাও শচীন দিতে পারে না। অঞ্জলি চায় প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে গ্র্যাজুয়েট হবে, যদি কোনো চাকরি মেলে। স্বামীর পরামর্শ মতো পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন অঞ্জলি করবে না। পড়ার বই কেনার পয়সাও নেই। পরিচিত যেসব ছাত্র পাশ করে যাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে বই চেয়ে আনার

উদ্যমও শচীনের নেই। এই চরম দারিদ্র্য এবং অসন্তোষ তাদের দাম্পত্য নষ্ট করে দিচ্ছে।

একদিন বায়োস্কোপ দেখতে যেতে চায় অঞ্জলি। শচীন সঙ্গী হতে চায় না, পয়সার অভাবের দরুণ। পরিচিতির সুবাদে হয়তো ফ্রি-পাশ শচীন আনতে পারে কিন্তু গাড়ি ভাড়া তো চাই। আর ভাড়ার টাকাও যদি মেলে তবে পাশের জন্য উমেদারি করবে কেন? অবশেষে অঞ্জলির সঙ্গী হলো কেদারবাবু মুন্সেফের ছেলে অমল। মোট খরচা হবে দেড় টাকা। দুটাকা দেওয়া হলো অঞ্জলিকে।

ব্রিজ খেলতে শচীনকে ডাকতে এসেছে রাজেন। শচীন যেতে চায় না। পাঁচবছর বিয়ের পরেও রাজেনের সন্তান নেই। স্ত্রীর সম্মতি নেই বলে। এটাই রাজেনের দুঃখ। শচীনের অবশ্য একটি মেয়ে ছিল আড়াই বছরের। মারা গেছে। রাজেনের প্রত্যাশা ছেলে থাকলে বুড়ো বয়েসে সে বাবা-মাকে খাওয়াতো। কিন্তু সন্তান ধারণে অসম্মত স্ত্রীকে ত্যাগ করাও মনুষ্যত্বে বাধে। রাজেনের যক্ষ্মা হয়েছিল। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ওয়াল্টেয়ারে ছিল যে। এখন সুস্থ। স্ত্রীর ভালবাসা সে পেয়েছিল। তবু সে মনে ভাবে সাজাহানের জীবনে গভীরতম মুহূর্ত যে ক'টি বছর মমতাজ ষোলটি সন্তানের জননী হয়েছিল তখন। যখন তাজমহলের পরিকল্পনা করেছিল বিরহী সাজাহান তার গভীরতা যে ঢের বেশি একথা সে বুঝতে পারে না। বেকারের জন্য একসময়ের গৃহশিক্ষক শচীনকে সে করুণা দেখায়। আত্মাভিমানে নানারকম উপদেশ দেয়। তার হাড়-হাভাতের মতো চেহারা নিয়ে বিদ্রূপ করে। পকেট থেকে পাঁচ টাকা দান করতে চায় শচীনকে। ইচ্ছে মাধব ভটচাজের মেজ মেয়ে ষোড়শী রুক্মিণীকে বিয়ে করে। কিন্তু অন্য এক নারীকে এনে সংসারের শান্তি নষ্ট করার ইচ্ছেও রাজেনের নেই।

অভয় দত্ত এসে ঢোকে রাজেন যাবার পরে। সে শিক্ষক। নাম অভয় হলেও ভীষণ ভীতু মানুষ। ইস্কুলের খাতায় সত্তর টাকা মাইনে লিখিয়ে দিচ্ছে তাকে পঁয়তাল্লিশ। বি. টি.তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও এই দুরবস্থা। বয়স পেরিয়ে গেছে সরকারি স্কুলে ঢোকার। রাজেনের রেখে যাওয়া একটা জাভার চুরুট চেয়ে নিয়ে খায় সে। ইস্কুল মাস্টারি করার জন্য ইচ্ছা মতো জীবন-যাপন সে করতে পারে না। সহজ আনন্দ-উৎসবে তার অধিকার নেই। সব সময় ভয় সেক্রেটারি, হেডমাস্টার, স্টাফের অন্য মেম্বার এবং ছাত্ররা তাকে লক্ষ্য করছে। এই যে চুরুট খাচ্ছে কোনো ছেলে দেখে ফেললে ভয়াবহ পরিণতি। সামাজিক ধর্ম ও নীতিতে অচলা বিশ্বাস না থাকলে মাস্টারি করা চলবে না। বোদলেয়ারের কবিতা রাজেনের পছন্দ। কিন্তু কাউকে জানাতে ভয়। ফরাসি উপন্যাস, লরেন্স ও জয়েসের বই রাত্রে দরজা আটকে সাবধানে পড়তে হয়। চুরুট কিনতে শনিবারে স্কুলের পরে ট্রেনে সাত মাইল দূরে গিয়ে কিনে আনতে হয়। বেশি রাতে বাড়ি ফেরা চলে না। বাসার পাশে সহকর্মী যোগেশদা কৈফিয়ত চান। কলকাতায় গেলে থিয়েটার দেখাও হয়ে ওঠে না। কর্তৃপক্ষের কাছে যদি খবর যায়! রাজেন স্বীকার করে স্কুলে চাকরি করতে করতে মানুষ দাক্ষিণ্য, বিশ্বাস, প্রেম, সাহস হারিয়ে বসে। অভয় এসেছে ল্যাম্বের 'রোজামুন গ্রে'র বইয়ের খোঁজে। তাঁর পরিস্থিতি নিয়ে শচীন যাতে কারোর সঙ্গে গল্প না করে তার জন্যে অনুনয় জানিয়ে অভয় চলে গেল।

শচীন স্বপ্ন দেখছিলো মিশরের এক প্রান্তরে বিশাল দুটি প্রাসাদ। তার একটি অন্ধকারে অপরূপ নীল বাতাসে ভাসছে। খেজুর গাছের ফাঁকে চাঁদ, উটের পাল চলেছে ধীরে। প্রাচীন রানীর বেশে অঞ্জলি সামনে এসে দাঁড়াল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' 'যেখানে খুশি ছিলাম।' মামলুকেব কাছে যেতে চাইল সে। শচীন মামলুককে চেনে না। অঞ্জলি বলে তাকে কতবার দেখেছে শচীন। জিজ্ঞাসা করে তার পোষা সিংহটা কোথায়। হঠাৎ সিংহ এসে হাজির। বাদামী শরীর, ফোলা ফোলা কেশর, নারীর অনুরক্ত সিংহ। কখন অদৃশ্য হয়ে গেলো দুজনেই। দূরে পিরামিড। মামলুকের প্রাসাদে ঢুকল শচীন। কক্ষে থেকে কক্ষে ঘুরেও কাউকে দেখল না। হঠাৎ এক প্রকাণ্ড সবুজ মখমলের পর্দা সরিয়ে মেহগিনি কাঠের টেবিলে জ্যোৎস্নার আলোর মতো বাতির আলোয় মামলুকের পাশে তার স্ত্রী বসে আছে। 'মামলুকের স্ত্রী সেজে বসেছ কেন তুমি অঞ্জলি?' হো হো করে হেসে উঠল অঞ্জলি। তাকে বিদায় করে ওরা ঘুমোতে গেল। এই স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে ভাবল অঞ্জলিকে কি এই স্বপ্নের গল্প করবে। থাক।

গাড়ির শব্দ, বায়োস্কোপ থেকে ফিরল অঞ্জলি। অমল আর অঞ্জলির কথা শোনা যাচ্ছিল। 'সিগারেটটা ফেলে দিই। শচীনবাবু কি ভাববেন।' অঞ্জলির ঘরে ঢুকল দুজনে। চা, গাড়ি ভাড়া, কানের দুল এসব নিয়ে কথা বলছিল তারা পুকুরের কোণে। দলঘাসের ভিতর যে ফুলগুলো ফোটে সেই আগাছার ফুল অমলের ধারণা 'ফরগেট মি নট।' তার এই পাগলামির জন্যই ফেল করেছিল অমল এই অঞ্জলির ধারণা। অঞ্জলির তৈরি লেবুপাতার শরবৎ খেয়ে অমল চলে গেল।

এক দুপুরে মোটরে চন্দ্রনাথ এলো। দশ বছর পরে দেখা। তখন শচীন নির্ভুল ইংরেজি নিবন্ধ লিখতো খবরের কাগজে। দেশবন্ধু রাজনীতিতে আসায় জাতির গরিমা বাড়বে এমন ধারণা হয়েছিল তার। সেই প্রসঙ্গ ও সাহিত্য বিষয়ে নানা মন্তব্য করলো চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের অবস্থা ফিরে গেছে। খড়ের ঘরে থাকতো এখন সাহেবের বাংলো কিনেছে। বিলাত থেকে আনিয়েছে হিলম্যান উইজার্ড গাড়ি। রেওয়া স্টেটে চাকরি করতো, এখন রাজপুতানায় প্রফেসারি করে। হঠাৎ একদিন মিরাট চলে গেল সে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে নাগপুর কলেজের লেকচারার শ্রীবিলাস এলো। শচীনের বাড়ির হ্যারিকেনের আলো তার অপছন্দ। অপছন্দ তার ডেকচেয়ার। অষ্টিন গাড়ি তারও। কলকাতায় এলে ব্রিষ্টল হোটেলে থাকে। পড়াশুনো করে না। বোলচালে মাত করে ক্লাস। ছুটিতে আড্ডায়, তাসে, পরকীয়া হুল্লোড়ে সময় কাটায়। তার মনপ্রাণ জুড়ে থাকে রেসের ঘোড়া। অসুখ হলে লণ্ডনে দেখাতে যায়।

শ্রীবিলাসের বৈষয়িক সাফল্য ও শচীনের ব্যর্থতার কথা পেড়ে অঞ্জলি শচীনকে গঞ্জনা দেয়। শচীন তার মত স্যুট বুট বেল্ট হ্যাট পরুক। কম মাইনে হলেও আবার কাগজের কাজ নিক, এই অঞ্জলির ইচ্ছে। শ্রীবিলাসের স্ত্রী যে টেনিস খেলে, সাইকেল চালায়, টিনের মাংস খায়—এসবে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। সে শ্রীবিলাসের পরকীয়া প্রেমের কথায় স্তম্ভিত হয়। আবার চন্দ্রকান্তর (চন্দ্রনাথ?) মধ্যে এক মহান প্রেমিককে খুঁজে পায় সে।

রজনীকান্ত খাসনবিশ নামে পরিচিত এক ব্যবসায়ী একদিন শচীনকে ডাকে ১০০ টাকা পাঠালো। সে নাকি কবে ঋণ করেছিল। অত টাকা ঋণ শচীন দিতেই পারে না। কিন্তু ধনী রজনীকান্তের কাছে এটাকা নদীর জলে শিশিরের ফোঁটার মতো—এই ভেবে অভাবী শচীন টাকা ফেরৎ দিল না। অঞ্জলি ঐ টাকা পেয়ে বিয়াল্লিশ টাকা খরচ করে ফেলল, বই, নোটবই, ধুতি, শাড়ি, সাবান, পাউডারে।

হঠাৎ একদিন অঞ্জলির এক বইয়ের মধ্যে অঞ্জলির উদ্দেশ্যে লেখা অমলের এক প্রেম নিবেদন এবং অঞ্জলির প্রত্যাখ্যান পত্র নজরে এলো শচীনের। তার মনে হলো নিজের নিঃসম্বল সংসার ও অজেয় নারীত্বের অহংকার নিয়ে এচিঠি লিখতে অঞ্জলিকে অনেক কাঁদতে হয়েছে।

রজনীকান্ত নিজের ভ্রমের কথা উল্লেখ করে পাঠানো একশো টাকা ফেরৎ পাঠাতে লিখলো। নিরুপায় শচীন চেপে যেতে চাইলেও তার বাবা ব্যাপারটি জেনে লোন অফিস থেকে একশো টাকা ঋণ করবেন ভাবলেন। কিন্তু বাড়ি বন্ধক না দিলে ঋণ মিলবে না। রজনীকান্তের তৃতীয়পত্রে ফের তাগাদা। অগত্যা শচীন গেল শ্রীবিলাসের কাছে টাকা ধার করতে। শ্রীবিলাস ও তার স্ত্রীর কাছে নানাভাবে অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলো।

পরের দিন ছেঁড়া চাদর যত্নে পাট করে পরে শৈশব সঙ্গিনী প্রতিমার কাছে গেল শচীন। প্রতিমা এম. এ. পাশ করে পশ্চিমে ইনসপেকট্রেস এখন। সে প্রথমে তার নাম শুনে ও দেখেও চিনল। পরে ভৃত্যের সামনে প্রতিমার নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করে দিল। সাতবছর পরে প্রতিমা ফিরেছে এখানের স্থাবর সব কিছু বিক্রি করে চলে যাবে বলে। এখন সে এত বৈষয়িক যে শচীনকে দিয়ে তিনপৃষ্ঠা লেখা টাইপ করিয়ে বারো আনা পয়সা দেবার প্রস্তাব দেয় এবং টাকা ধারের প্রসঙ্গে বলে, কবে নাকি শচীন চার আনা ধার করে আর ফেরত দেয়নি। একশো টাকার বেলায় যদি তাই ফের হয়। শচীনের টিবি হয়েছে ভেবে সহৃদয় প্রতিমা ভালো ডাক্তার দেবার পরামর্শ দেয়—কিন্তু টাকা দেয় না।

বাড়ি ফিরে পায়চারিরত অমলকে জামরুল তলায় দেখে শচীন তাকে ঘরে আসতে বললেও সে আসে না। দরজা বন্ধ কেন জিজ্ঞেস করলে অঞ্জলি বলে অমল বড় বিরক্ত করে তাই দরজা বন্ধ রেখেছে। সে শচীনকে চিঠি দুটো পড়তে দেয়। চিঠি তো আগেই পড়েছিল শচীন। বায়স্কোপ দেখার দিন অঞ্জলির দেওয়া দুটাকার হিসাব কষে ছআনা পয়সার দাবি করবে বলে অমলের কাছে। শচীনের বারণ সে শোনে না ; তার সাফ কথা 'ছআনা পয়সা ভেসে আসে?'

জ্যোৎস্নার পথে বেরিয়ে পড়লো শচীন। উড়ন্ত বুনো হাঁসের মতো—যতক্ষণ না বুকে গুলি এসে লাগে।

বিচিত্র বৈষয়িক চরিত্রের বর্ণনা আছে উপন্যাসটির মধ্যে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বভাব কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বেকার সুশিক্ষিত ভদ্র চরিত্রবান মানুষের প্রতিকারহীন অবমাননার কাহিনী। ফলত জীবনানন্দের গল্পে উপন্যাসে এ কাহিনী বহুকথিত। অন্য গল্পের সঙ্গে পার্থক্য শুধু এই যে এখানে দম্পতির একমাত্র কন্যাটি মৃত।

কারুবাসনা

১৯৩৩ সালের অগস্ট মাসে রচিত এই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন সম্পাদক। এই বইটি সম্পর্কে মন্তব্য, "জীবনানন্দ নিজেই এই রচনাকে novel বলে চিহ্নিত করে না গেলে মনে হতে পারতো যে তিনি সব আড়াল ভেঙেই নিজের জীবনের কোনো এক সময়ের ডায়েরি রেখে গেছেন।"

বহু কষ্টে কেনা বইগুলিকে বর্ষায় উঁইয়ের হাত থেকে রক্ষা করা দুষ্কর। নায়ক হেম চাকরির সন্ধানে বহুদিন থেকে কলকাতায় যাবে বলছে, যাচ্ছে না। তাই স্ত্রী কল্যাণী বিরক্ত। কলকাতায় এলে টুইশন না পাক, দাদা তাকে একমাস মেসের খরচ দেন, তারপর শত অনুনয়েও আর দেন না। বাড়ির মাসোহারা বাবা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন বন্ধ করবেন না। তারপর কি হবে কে জানে!

চায়ের দোকান থেকে হেম ক্বচিৎ চুরুট কিনে খায়, চা বা দুধ কিনতে যায় না, যদিও সে চায়ের ভক্ত। কল্যাণীর কাছে পয়সা নিয়ে তার জন্যে চার পয়সার আধ গেলাস দুধ আনে। বাক্স বোঝাই চিঠি মার আর কল্যাণীরও চক্ষুশূল। হেমও হৃদয়ের স্মৃতি সঞ্চয়ই ভালো বুঝেও বিশ বছরের সঞ্চিত চিঠি উঁইয়ের দাপটে নষ্ট হলে কষ্ট পায়। মাধুরীর সেই মস্ত চিঠিগুলি যাতে সাংসারিক নানা কথা, কিন্তু দরদ খুঁজে পাওয়া যেত না। তবু মেয়েটি ছিল বলেই কিশোরী প্রেম, দেশি বিদেশি সাহিত্য, নায়কের কাছে অপরূপ হয়ে আছে। মৃত নির্মলার কয়েকটি ছবি আছে। কিন্তু তার কোনো চিঠি অক্ষত নেই। অবিনাশ পাঁচ বছর চিঠি লিখেছিল নানা স্থান থেকে, তারপর যক্ষ্মা হয়েছিল তার। আজ বেঁচে আছে কি নেই কে জানে? সেই নবীন সরস ভ্রমণ অভিজ্ঞতাগুলি কোনদিন পড়তে পারবে না আর। যে খাতাগুলোয় নূতন কবিতা লেখা ছিল তাও নষ্ট লুপ্ত আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির মতো।

মেজকাকা আপশোষ করলেন সার্টিফিকেট উইয়ে খেয়েছে বলে। শিবনাথ শাস্ত্রীর সার্টিফিকেটের জোরে উনি আবগারি ইন্সপেক্টরের চাকরি করে রিটায়ার করেছেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই আলাদা। এদের খাওয়া দেখে তাঁর দুঃখ হয়। ডিম-মাংস খেয়ে তাঁর গাউট হয়েছে। সেজকাকার ব্লাড প্রেসার। গতবছর মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল। মেজকাকার ৩-৪ শ টাকা পেনশন ঈশ্বরের কৃপায়। সেজকাকা ১২শ টাকা মাইনেয় ডিম মাংস হ্যাম বেকন কোকো জ্যাম চটকে জীবন কাটিয়ে দিল। দিনরাত সিগারেট। ব্লাড প্রেসারের কি দোষ। ভাল বই হাতে দিলে হাঁপিয়ে ওঠে। পা ছড়িয়ে দিন-রাত ক্রাইম নভেল আর সেক্স নভেল পড়ছে। আমড়াগাছি আর খোশামুদি করে উন্নতি।

মেজকাকার গলায় বিষ আর ঈর্ষা, ক্ষোভ আর যন্ত্রণা। আই. সি. এসের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েই দেমাক বেড়েছে রমেশের। দাদা তো ঠাণ্ডা শালগ্রামটি। রমেশ দশ টাকা দাদাকে পাঠাতে পারে না? মদ গরু খাওয়া সিভিলিয়ানের সঙ্গে মেজকাকা মেয়ের বিয়ে দেবেন?

সন্ধ্যায় মেজকাকার পায়ে লিনিসেন্ট মালিশ করে দিচ্ছিল হেম। বললেন, মালতীর

জন্য একটি ছেলে দেখো, যেন খেতে দিতে পারে, অন্তত ডেপুটি অ্যাসিষ্টান্ট হয়। অবশ্য অঘোর মজুমদারের ছেলে বিলেত গেছে সিভিলিয়ান হতে। ফিরে এসে মালতীকে বিয়ে করলে তাঁর আপত্তি হবে না। স্বদেশীর জন্য সিভিলিয়ানকে স্যাকরিফাইস করা বাড়াবাড়ি। হেমরা কি খায় না খায় জানতেও চান না মেজকাকা। রান্নাঘরে যেতে কাদা পথে তাঁর ভেলভেটের জুতো নষ্ট হবে। উপরন্তু সাপের ভয়।

মেজকাকা কুমায়ুনের পাহাড়ে ভ্রমণের গল্প করেন। সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ করে তিনি সপরিবারে বেড়াতে যান। বাবা শুনছিলেন, নিজের ঘরে গিয়ে পরীক্ষার খাতা দেখতে বসলেন। মা বললেন, "কুমায়ুনে কেন, এখানে বসেও তো ভগবানের সত্যকে উপলব্ধি করা যায়।" মেজকাকা এই ছোট নজরের কথা শুনতে চাননি। সুচের ছ্যাঁদা দিয়ে উট— এই খ্রিস্টানি কথা তিনি মানেন না। তাঁর মতে টাকা থাকলে ভগবান মানুষের হৃদয়ে নামবার ভরসা পান। "হৃদয়টা ভেলভেটের কুশনের মতো না হলে তিনি নামেন না বুঝি"—হেমের এই শ্লেষ বাক্যে সবাই বিরক্ত হন।

মেজকাকাকে তেপায়ের উপরে পোলাও আর ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে খেতে দেওয়া হয়। ঘি-এর কার্পণ্যে মেজকাকার পোলাওটা কড়কড়ে মনে হয়। কিসমিস পেস্তা বাদাম জাফরান দেওয়া মেজদিদির পোলাওর সুখ্যাতি করেন তিনি। মেজদি অবশ্য দশ-বারো বছর খাট থেকে নামেন না। বড়লোকের বউ, ওঠবার কি দরকার! মেজকাকা অর্ডার দেন কালও যেন ইলিশ, গলদা চিংড়ি, মুর্গির ডিমের ওমলেট, কুমড়ো ফুল ব্যাসনে ভাজা, বড়ি পালং শাক, আমচুরের টক রাঁধা হয়। খাওয়া শেষে এঁটো পাত কুড়িয়ে মা অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ঘাটে বাসন মাজতে গেলে মেজকাকা কম্বল জড়িয়ে আদাড়ে-বাঁদাড়ে যেসব সিদ্ধব্রাহ্মণ (কেউটে সাপ) ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের কথা স্মরণ করলেন।

বাবার পরামর্শে হেম কাকাকে অনুরোধ জানালো কোথাও চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কিনা। তাঁর নানা ডিপার্টমেন্টে নানা প্রদেশে অসামান্য প্রভাবের কথা জাহির করেও শেষপর্যন্ত তাকে পরামর্শ দেন ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিতে। মন্তব্য করেন, "ওর হবে ওর বাবার মত—থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়।"

কর্পোরেশনের চিফের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সেখানে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে বললে মেজকাকা হেমকে বলেন ওসব দুরাশা ছাড়ো। ইহকালটা নমোনমো করে কাটিয়ে দাও। পরকালে কপাল খুলবে।

কল্যাণীর আক্ষেপ কলকাতায় যেতে দেরি করছে হেম। কিন্তু হেম জানে গত ছ'সাত বছর সে টুইশন ছাড়া কিছুই পায়নি। পাবেও না—আকাঙক্ষার বিচিত্রতা ও উদ্যমের অপরিমেয়তা তো তার নেই। শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, কল্পনা, স্বপ্ন ও চিন্তার অঙ্কুরের বোঝা বইবার জন্মগত পাপ হেমের সামাজিক সফলতা নষ্ট করেছে। পঁচিশ টাকার মাস্টারি বা লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েও নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায় সাফল্য আসত। কিন্তু সাহিত্যে সৃষ্টি করবার আকাঙক্ষাই তার এই একাগ্রতা কেড়ে নিয়েছে। বিয়ে না করলে শিল্পসৃষ্টি ভালবেসে সংসারে বিফল হয়েও অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন কোনো বেদনা থাকত না। কিন্তু কল্যাণী ও খুকির দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েছে বলেই সে না পারে একান্তভাবে

শেয়ার ক্যানভাস করতে, না পারে শরবতের দোকান খুলে লক্ষ্মীকে অধিকার করতে। সব কারুতান্ত্রিক কি স্ত্রীর প্রতি উদাসীন? পার্থিব মানুষের মত রক্তমাংসের সুখ সুবিধাও সে চায়। কবিরা আর্টিস্টরা সংসারের ছক কাটা উন্নতির পথে অন্তর্ধান করতে পারে না, তাই না খেয়ে যক্ষ্মায়, লাঞ্ছনার মধ্যে মরে।

বিকেলে অনবচ্ছিন্ন বৃষ্টি শুরু হল। সুগন্ধ সোঁদা গন্ধ উঠল কেয়া কদমের। কিশোরবেলার সই যেন দিগঙ্গনা হয়ে এলো। বনলতা, পাশের বাড়ির মেয়েটি, ফকিরের মত শাদা দাড়ি বাবার সঙ্গে থাকত, তিনিও নেই, সে খড়ের ঘরখানাও গেছে ১৫ বছর। আট বছর আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের বারান্দায় পিসিমার সঙ্গে পুকুরের কিনারা দিয়ে বাঁশের জঙ্গলে ছায়া দিয়ে চলে গেল। তারপর তাকে দেখেনি। মন পবনের নাওতে চড়ে সে এসেছে আবার।

বাবা হেমকে বলতে এসেছেন, তার কলকাতা যাবার টাকা সংগ্রহ করেছেন। সে কবে যাবে? হেম বলে হতাশ সুরে, কতবার তো এলো গেল। বাবার বিশ্বাস, এবার কাজ পাবে হেম। বাবার পরলোকে বিশ্বাস আছে, হেমের নেই। বাবা চান না, হেম পঁচিশ টাকার ইস্কুল মাস্টারি বা দূরে কোথাও টিউশনি নেয়। হেঁটে উল্টাডিঙ্গি যাওয়া ও ফেরা আত্মার অপচয়। কলকাতায় কিভাবে সময় কাটায় হেম? কলকাতায় বন্ধুবান্ধব ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তারা ব্যস্ত। হেম ঘোরে ফুটপাথে, এতে ব্যথা পাবারই কথা। কংগ্রেসকে কি বড় জিনিস ভাবে? হয়তো যায়নি কংগ্রেসে, কিন্তু হৃদয়ে তো দেশপ্রেম আছেই! কখনো কখনো মৃত্যুচিন্তা গ্রাস করে হেমকে? মনে ভাবে, বয়স চৌত্রিশ, তবু সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে! সৃষ্টি এক পাখির খাঁচা যেন, অথবা ইঁদুর কল। রূপ নেই ফূর্তিও। একজন কেরানি হলেও জবাবদিহি হয়। দুটো কবিতার বই লিখলে হয় না। হেম দুপুরে খবরের কাগজ পড়ে। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, দুপুরের নিরিবিলিতে সে লেখে না কেন? হেম বলে, মানুষের জীবন নানা অভিজ্ঞতায় স্থূল হয়ে আসে, নবপর্যায়ে কবিতা লেখার আগে এই স্থূলতা ও অবসাদ আত্মসাৎ করে নেওয়া দরকার, তাই পড়ে দেখে ভেবে সময়টা কাটাচ্ছে।

বাবা চান, খবরের কাগজ না পড়ে যেন সে বড় লাইব্রেরি থেকে রুচি মত বই এনে পড়ে। তাতে তার চিন্তা ও কল্পনার অপব্যবহার হবে না। চাকরি পায়নি বলে নিজেকে যেন নির্যাতিত না করে, ওর চেয়ে কমশক্তির লোক বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে যেন বিদ্বেষ পোষণ না করে। কাজের খোঁজে সময়ে অসময়ে না ফুটপাথে ঘুরে মরে। যেন নিজের রুচি ও শক্তির গভীর বিচার করে ঠিক করে নেয়। নিষ্ঠাভরে যেন বিচারসম্মত পথেই চলে।

অঝোর বর্ষণের রাতে গ্রাম প্রকৃতির রূপধ্বনি মুগ্ধ হয়ে দেখছিল হেম। বাবা পড়ছিলেন। তারপর বই রেখে আলো নিভিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাতাসে লেবু ফুলের গন্ধ। যত বয়স বাড়ছে এই আটচালা ঘরখানাকে তত ভাল লাগছে হেমের। বাবা বললেন, কলকাতা যাবার এত তাড়া কেন তার। হেম বলে চার-পাঁচ দিন থাকবে বলে এসে চার-পাঁচ মাস কাটিয়েছে। কল্যাণী রাগ করছে। হেমের ভালোর জন্যই তো বেচারি রাগ করে। ভাবে কলকাতায় গেলেই চাকরি মিলবে।

দিন কেটেছে, কলকাতায় যাবার চাড় নেই হেমের। কল্যাণী মরিচপোড়া তেঁতুলের

জল দিয়ে পান্তা ভাত খায়। কোনোদিন উপোস দেয়। রাতে মেয়ে কাঁদলে পাখার ডাঁট দিয়ে পিটোয়। তা নিয়ে শোরগোল, অশান্তি, নালিশ, কান্না। আড়াই বছরের খুকি খাটের কিনারে পা ঝুলিয়ে পাথরের মত বসে থাকে। হেম স্পিরিট স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম করে। খুকি অপেক্ষা করে। বাটি ধরে চুমুক দিয়ে খায়। হেমের বিছানায় এসে শোয় পাখার হাওয়া পায়। রাত্রে মেয়ে বিছানা ভিজিয়ে দেয়। তাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে আলনা থেকে চাদর এনে পাতে হেম। ততক্ষণে মেঝের কতকগুলো বিষ পিঁপড়ে বেচারির গায়ের নানা জায়গায় কামড়ায়। হৈচৈ ওঠে। কী কামড়েছে? মাকড়সা, বিছে বর্ষাকালে কত কী কামড়াতে পারে। পা চুলকুতে চুলকুতে খুকু ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে।

মেজকাকার ঠিকমতো আপ্যায়ন হচ্ছে কি? কল্যাণী কি সন্ধ্যে থেকে ঘুমোচ্ছে? পান্তা ভাত, মরিচ পোড়া, তেঁতুল ও গুড়ের ঝোল খেয়ে সে ঘুমোয়। বাবার ধারণা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ সে মরবে পণ করেছে। হেম চাকরি না পেলে কল্যাণীকে বাঁচানো শক্ত হবে।

কল্যাণীর ঘরে গিয়ে তার অসুস্থতার খোঁজ নিলেও সে বিরক্ত হয়। হেমকে চলে যেতে বলে। হেম চলে যায় না, তাকে কথা বলিয়ে নেয় স্বাভাবিক খাবার কল্যাণী খাবে, যদিও সে মাঝে মাঝে পান্তা তেঁতুল খাওয়ার জেদ ছাড়ে না। বাবার নিঃসঙ্গতার কথা বলে কল্যাণী। খুকু দাদুঠাকুমাকে বাবার চেয়েও বেশি ভালবাসে। বাবা কলকাতায় যাবে শুনে তার কোনো বিকার নেই। ভালবাসা বোঝার মতো বোধ খুকুর হয়নি। তবু বাবার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তার আপত্তি নেই। হেম ভাবে খুকুকে নিয়ে এই খড়ের ঘরে আজীবন কাটাতে পারলে হত। খুকু যখন জন্মায় হেম কলকাতায় মেসে দারুণ উৎকণ্ঠা উদ্বেগ নিয়ে কাটাচ্ছিল। তার সন্দেহ ছিল প্রসূতির মৃত্যু বা সন্তানের অপুষ্টিজনিত অঙ্গ হানি। মেয়ে হয়েছে বলে কেউ হেমকে নির্বিঘ্নে সন্তান জন্মের কথাও জানায়নি। মেয়েটি এখন বাবার কাছে গুড় খাবার আবদার করে, চকোলেট কি জানে না।

মেজকাকার জন্য পাঁচ টাকা মাইনের এক চাকর রাখতে হয়েছে। সে টাকা বাবাই জোগাবেন এই পিসিমার ইচ্ছে। বাবারও সেটাই বক্তব্য। হরিচরণ লোকটা বেশ চালাক। তার তিনবেলা দেড় সের চালের ব্যবস্থা কিভাবে হবে তা নিয়ে মায়ের উদ্বেগ। তাতে ক্রুদ্ধ পিসিমা জানিয়ে দিলেন তাঁর মেজদার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে তিনি আর ফিরবেন না। তাঁকে মা নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিষয়টার মীমাংসা হল না।

পিসিমা মেজদার জন্য মিষ্টির দাম, বেড়ানোর গাড়ি ভাড়া, আড়াই সের সাবানের দাম, বাবার কাছ থেকে আদায় করে নিলেন। বাবার মাইনে মাত্র পঞ্চাশ। তাঁর ধার পাঁচ হাজার টাকা পেরিয়ে গেছে। সংস্কৃত মানুষ, কিছু বলতে পারেন না।

ভোর থেকে গভীর রাত, মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। হেম তাকে আলাদা করে পায় না। কল্যাণী পানে চুন খায় বেশি। সে রিকেটগ্রস্ত। মাকেই তাই পান সাজতে হবে। আগের রাতে বাসন মেজে রাখেন মা, কল্যাণী মেজে দেয় না। বৃষ্টির দিনেও বাসন মাজতে হয়। ছাতা নেন না। ভোরে উনুন জ্বালানো, কয়লা ভাঙা, ঘুঁটে দেওয়া। দুপুরে সেলাই। তাছাড়া মানুষকে আপ্যায়ন, আসন জমানো, সবেতেই তিনি, কিন্তু বাবা যে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে আগ্রহী

একথা বিশ্বাস হয় না মায়ের। ইহজীবনে তাস দাবা খেলেননি, অর্থ প্রতিপত্তিহীন এমন মানুষের কাছে দু-চারটি ছাত্র ছাড়া কে এসে বসবে? তবু হেম জানে, মারা গেলে তাঁর অভাব পূরণের মানুষ মিলবে না। দিনের মধ্যে কিছু সময় মা যেন তাঁর কাছে এসে বসুক।

কিন্তু মা ব্যস্ত। মেজকাকার জন্য লুচি ভাজতে হবে। বাবা তাঁর নিঃসঙ্গ কোঠায় একা কাটান। শাড়ি সিঁদুরের আড়ম্বরের কোনো মূল্য দেয় না হেম, জীবনে মা বাবাকে কিভাবে আঘাত করেছেন সেই কথাই মনে হয় তার। আদর্শ গৃহস্থ হতে না পারলে, তাড়িখানাও ঢের ভালো। মা শুনে ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু হেম বলে যদি সে দীর্ঘজীবী হয়, কবিতা লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে সে জুয়ার আড্ডায় কাটাবে। জাহাজের খালাসি হয়ে বেরিয়ে যাবে। বাবার মত বারান্দায় অন্ধকারে পায়চারি করবে না। মা তবু নিজের কাজেই চলে গেলেন।

বাবা জানেন মেজকাকা এবং সেজকাকা রাতে ইনজেকশন নিয়ে এনজয় করতে বেরোয় এবং ফিরে এসে ইনজেকশন নেয়। নিজেদের ব্যবহৃত জিনিস কাউকে ছুঁতে দেয় না। তাদের এই আসুরিক স্বভাব কেন হল, বুঝে পান না তিনি। হেম তাঁকে আশ্বস্ত করে খুকির গায়ের পাঁচড়া হেমের শরীরের কোনো রোগের ফল নয়।

পশ্চিমের মাঠে বেড়ালের কান্না শুনে বাবা তাকে তুলে আনতে যান। বিড়ালছানাটাকে কোলে করে তিনি চুপচাপ বসে থাকেন।

গভীর রাতে হেম দেখে ঘরে আলো জ্বলে। একা জেগে বসে আছে কল্যাণী। হেমকে ডাকবে ভেবেও আত্মসম্মান বোধে ডাকতে পারছিল না। তাকে কল্যাণী বলে মেদিনীপুরে হেমন্তবাবুর বাড়ি যাবে কাল। সেখানে তার নির্মলদা, থাইসিসের রুগী। আগে স্বদেশী করে জেলে গিয়েছিল। কল্যাণী তার গহনার বাক্স সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাবে, সেখানে গহনা বিক্রি করে রবি ঠাকুরপোর সাথে মেদিনীপুর যেতে চায়।

হেম ভাবে তার যক্ষ্মার খবর শুনলে বনলতা কি এমন স্বামীর ঘর ছেড়ে তার শিয়রে এসে দাঁড়ানোর জন্য চলে আসবে?

পরদিন কিন্তু কল্যাণীর অন্য চিন্তা। শেষ সম্বল গহনা বিক্রি করে খুকুকে বঞ্চিত করে সে যেতে প্রস্তুত নয় আর। এমনকি খালি হাতেও সেবা করার জন্যও সে নির্মলের কাছে যাবে না। যদি শেষে রোগ বাঁধিয়ে আসে, খুকির কি হবে? সে বরং বেশি উদ্বিগ্ন হরিচরণের পেয়ারা লেবু, দুধ, কেরাসিন চুরি সম্পর্কে। মেদিনীপুর যাবার বদলে সে সেজেগুজে পান-ডিবে ভরে, পাড়ায় তাস খেলতে চলে গেল।

সেদিন দুপুরে আড়াইটেয় মা ঘুমুতে এলেন এ-ঘরে। হেম বলে কলকাতায় গিয়ে সে যদি যক্ষ্মা নিয়ে ফেরে! মেসের খাওয়া ঢের খারাপ, এ বাড়ির চেয়েও। দুধ জোটে না। অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে হেমের। মেজকাকাকে বললে, তিনি অনেক ভাল ডাক্তারকে দিয়ে বিনি পয়সায় রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেবেন। মার একথাতেও হেমের সঙ্কোচ কাটে না। মেজকাকা রোজ খাবার পর সোডা ওয়াটার আনছেন, বাকিতে, সঙ্গে কী সব ওষুধও খান বোধহয়।

মেসে পৌঁছে খা খা দুপুরে বড় বিচ্ছিরি লাগে হেমের। মা বাবা খুকির কথা মনে

করে কষ্ট হয়। চৌবাচ্চা খালি, ঠাণ্ডা ভাত পুঁই চচ্চড়ি ট্যাংরা মাছের ঝোল মেখে খেয়ে এসে ঘুমোতে চেষ্টা করে। ওয়াই এম. সি এতে খবরের কাগজ পড়ে। গোলদিঘির বেঞ্চে বসে খানিকক্ষণ। দোকানে চা খায়। ভাবে কলকাতায় এসে এবার পুরস্কৃত হবে, প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরবে না। কিন্তু টিকিট কিনে পয়সাটাই যায়—ভাগ্য ফেরে না। অবসাদের মুহূর্তে মাড়োয়ারির পকেট মারার কথাও মনে হয়। আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছে জাগে। ইচ্ছে হয় গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হতে, কিম্বা খুন করে জেলে যেতে। মা বোঝেন, সংসারে কোনো বিশ্বাস নেই হেমের।

সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধু বিরাজ এলো। সে মহকুমা কোর্টে প্র্যাকটিস করছে, মনে হয় বিশেষ কিছু পাচ্ছে না। কিন্তু সে বলে ১৫ বছরের মধ্যে হাইকোর্টে উইগ মাথায় দিয়ে বসবে। তার বক্তৃতার তোড়ে খুকির ঘুম ভেঙে গেল। হেম তাকে ঠাকুমার কাছে রেখে এলো।

বিরাজের বাংলা খবরের কাগজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজি বাংলা সাহিত্যের বইয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ করল সে। তার পর চায়ের জন্য দেরি না করে ছেঁড়া ছাতা মাথায় শ্রাবণের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

যদুনাথ পৈত্রিক জমিদারি ঢের খুইয়েও আজো বড়লোক। নানা দেশ ঘুরে বুড়ো বয়সে দেশে এসে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। সিল্কের পাঞ্জাবি আর উড়ুনি গায়, সাধারণ এলবার্ট জুতো। চোখ চতুর, চিন্তাশীল; উৎসাহের খামতি নেই। হেমের জন্য দুঃখ জানালেন। বললেন, টেকনিকাল কিছু, ব্যাঙ্কিং কিম্বা দর্জিগিরি শিখতে, ডিমের বা দুধের ব্যবসা করতে। বিলাতি দুধ কোম্পানির ইতিহাস পড়েছে, কীসব প্রাইজ পেয়েছে তারা, হেম কোনো খবর রাখে না, উদয়শঙ্করের নাচ দেখে শুধু। মোটর ড্রাইভারি শেখো, মাস্টারদের চেয়ে সম্মানও বেশি। হলধর হয়ে জমি চযো। যদি ১০০ একর জমি আর ৪০০০ টাকা ক্যাপিটাল হয় তোয়াজে থাকবে। যদি বন্যা বা অনাবৃষ্টি হয় তবে তো সবই গেল। ভগবান আমাদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসেন। কাজেই অন্তত লাখ দেড় লাখ টাকা মজুত না থাকলে জমি নিয়ে খেলা বিড়ম্বনা। দিনকাল ছিল যখন তিনি চোত বোশেখের রোদে ১০/২০ ঘণ্টা খেটেছেন। এই ৭০ এও বার ঘণ্টা খাটতে পারেন।

কুমায়ুন পাহাড়ে আপেল ফলাতে আরো ক্যাপিটাল লাগে। সেখান থেকে মোরব্বা করে চালালে ঢের সুবিধা হয়। এখন ইলেকশনের ভোট কুড়োচ্ছি, মাঝে মাঝে মনে হয় কুমায়ুনের বাগানটায় গেলে হতো, তা কুমায়ুনে তোমাদের যেতে বলি না। জমিদারি ভোগ করো না। ত্রিশ একর জমি কেনা, হাজার দুই ফলের চারা লাগানো। ফল পেতে দশ বছর অপেক্ষা— মনে হবে জেলে আছো। তারপর তো যদি বাঁচো দুনিয়ার দালাল মুখ তুলে চাইবেন। ভগবান আশীর্বাদ করবেন। নারীরাও হাতের পুতুল হবে।

দূরে সরে যায় কীর্তি সফলতা। নির্বাসনের নিরন্ধ্রবলয় কাছে আসে। কারুবাসনার নয়।

সাহিত্য সাধনায় যাঁরা মগ্ন তাঁরা জীবনের গভীর অনুভবশীলতার জন্যই যে জীবনের বৈষয়িক সাফল্যে ব্যর্থ, এই তত্ত্বভাবনার উপর 'কারুবাসনা' উপন্যাসটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অতএব এ উপন্যাসের নায়ক কিছুটা অলস, সফলতার জন্য তাগিদ

তার নিজের মধ্য থেকে অন্যদের, বিশেষ করে তার স্ত্রী কল্যাণীর ও পরিজনবর্গের মধ্যে বেশি। চাকরির সন্ধানে যে কলকাতা যাবে, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে তা আর ঘটে ওঠেনি। যদিও আগের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার কিছু বিবরণ ও বেদনা এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক থেকে নায়ক হেম তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কল্যাণীর মধ্যে অসুখী, অসুস্থতার মনোবিকার সম্পন্ন, আত্মকেন্দ্রিক একটি চরিত্র ফুটেছে। আশ্চর্য এই যে সে তার অধৈর্যের কারণে নিজের একমাত্র মেয়েটিকেও ভালবাসতে বা তার ভালবাসা পেতে পারেনি। অথচ রুগ্‌ণ প্রেমিক নির্মলদার জন্য সাময়িক হলেও তার যে আবেগ দেখা গেছে তা অপরিমেয় মনে হয়। মেজকাকা এক স্খলিত চরিত্র বাগাড়ম্বর সম্পন্ন আত্মসুখী মানুষ। এই দুঃস্থ আপ্যায়নশীল পরিবারের কারো জন্যে তার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বা কর্তব্যবোধ আছে মনে হয় না। পিসিমার অবিবেচনা ও পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। বাবার মধ্যে ভদ্রতা, অনুভবশীলতা এবং সহিষ্ণুতা তাকে এক অবিস্মরণীয় মানুষ করে গড়েছে। মায়ের সংসারের জন্য আত্মোৎসর্গ, সব প্রতিকূলতার মধ্যেও পরিশ্রম ও সেবাপরায়ণতা বিস্ময়কর। যদুনাথ ধনী বাক্যবাগীশ রাজনীতিবিদ মাত্র।

বইটির মধ্যে 'বনলতা'-র প্রথম উল্লেখের গুরুত্ব সম্পাদকীয়তে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'বনলতা সেন' কবিতাটি ১৯৩৪ সালে লেখা কিন্তু ১৯৩৩ সালে রচিত এ উপন্যাসে বনলতা চরিত্রটি পাই। দেবেশ রায় মশাই লিখেছেন—"কিন্তু জীবনানন্দের জীবন ও কাব্যের অন্বয়ে ১৯৩৩-এ লেখা এই উপন্যাসটির গুরুত্ব প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চায় 'বনলতা'র প্রথম উল্লেখে।

"১৯৩৪ বলে চিহ্নিত কবিতার সেই খাতাটিতে বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা সযত্নে কাটা। তারই একটিতে 'বনলতা সেন' কবিতাটি ছিল। একটি কবিতায় কবির নিজের হাতে—'বনলতা সেন কবিতা পৌষ' লেখা—'কবিতা' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশের এই উল্লেখ।

পরে তাঁর কাগজপত্রের ভিতরে ঠিক এই কটি পৃষ্ঠাই একসঙ্গে গাঁথা পেয়েছি। কিন্তু এখন এখানে বনলতার সেই অংশত আদি উল্লেখেরও আগে, এই ১৯৩৩-এর খাতাটির এই উপন্যাসেই এখন পর্যন্ত 'বনলতা' নাম ও প্রতিমার প্রথম উচ্চারণ পাওয়া গেল।

"কবিতাটির আগেই 'বনলতা' এই উপন্যাসে স্মৃতিনির্মিত নায়িকা।"

এ বইতেও অত্যন্ত আলতো অনুভূতিময় করে বনলতার বাবার কথা তার নিজের কথা, নায়ক হেমের স্মৃতির মধ্যে তার অস্তিত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।

বাসমতীর উপাখ্যান

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা সুবৃহৎ দুটি উপন্যাসে জাতীয় এক সংক্রান্তিকালের অস্থিরতা ও ব্যক্তিজীবনের সমস্যাকে জীবনানন্দ সমীকৃত করে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ দুটি হলো জলপাইহাটি এবং বাসমতীর উপাখ্যান। দুখানি বইয়ের কোনটি আগে পরে বলা কঠিন। যেহেতু বাসমতীর উপাখ্যানের ঘটনাক্রম ১৯৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দ ঘিরে আর জলপাইহাটি

সম্ভবত ১৯৪৭ সালের কাছাকাছি, অনুমান করা যেতেই পারে আলোচ্য উপন্যাসটিই আগে এবং 'জলপাইহাটি' তার পরে লেখা হয়েছিল।

জীবনানন্দের উপন্যাসে প্রায়ই তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রক্ষেপ দেখা যায়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে জীবনানন্দ নূতন কাজের সন্ধানে কলকাতা চলে আসেন। তার আগের আট মাসে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগ হয়ে স্বাধীনতা আসে। বাসমতীর উপাখ্যানে নায়ক বাসমতী কলেজে কর্মরত ; জলপাইহাটি উপন্যাসে নায়ক কার্যত চাকরি ছেড়ে কলকাতায় কর্মসন্ধানে ব্যাপৃত। এইজন্যই আলোচ্য বাসমতীর উপাখ্যানকেই প্রাগবর্তী রচনা মনে হচ্ছে।

দেবেশ রায় লক্ষ্য করেছেন, "আখ্যানের সময় পরিবেশের দিক থেকে এই উপন্যাস দুটির সম্পর্ক নিবিড়। দেশভাগ হচ্ছে ; অখণ্ড বাংলাদেশের দুই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা ইংরেজ শাসনাবসানের বাস্তবতাকে অপ্রত্যাশিত এক নূতন মাত্রা দিচ্ছে ; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে ; গ্রামের পরিবেশ, তার সম্ভাব্য রাষ্ট্রভুক্তির পরিবেশে পরিবর্তিত হচ্ছে, একেকটি পরিবারে আভ্যন্তরীণ সংগঠন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে—'জলপাইহাটি' ও 'বাসমতীর উপাখ্যান' দুটি উপন্যাসেই জীবনানন্দ তার আখ্যান গড়ে তুলেছে এই ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সময়কে ভিত্তি করে।....এই দুটি উপন্যাস মিলে নিঃসন্দেহে এক পরিপুরকতা সৃষ্টি করে।"

'জলপাইহাটি' উপন্যাসে যে পূর্ববঙ্গের কল্পিত শহর জলপাইহাটির কথা বর্ণনা করা হয়েছিল এবং এখানে যে বাসমতী শহরের কথা বলা হয়েছে তা ধরা যেতেই পারে জীবনানন্দের জন্মশহর বরিশালের নামান্তর মাত্র। সেই শহরের ব্রাহ্ম সমাজমন্দির কলেজ, চার্চ, স্টিমার ঘাট নানা কিছুর বর্ণনাতেই সেদিনের বরিশাল শহরের চেহারা স্মরণে আনে।

আসন্ন স্বাধীনতা ও পাকিস্তানভুক্তির সম্ভাবনায় মুসলিম, হিন্দু, ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মানুষ, প্রটেষ্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক মিশনারি, ধর্মবিশ্বাস শিথিল বুদ্ধিজীবী সমাজকর্মী স্ত্রীপুরুষদের চিন্তা চেষ্টা মানসিকতা এ উপন্যাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ বইয়ের নায়ক সিদ্ধার্থ সেন (গুপ্ত) এক মধ্যবয়সী স্থানীয় কলেজ শিক্ষক। মফঃস্বল কলেজে সামান্যই তার বেতন। আদর্শের জন্য টিউশনির বাড়তি আয় সে করতে পারে না। তাদের পুরানো একান্নবর্তী বড়ো পরিবারভুক্ত অধিকাংশ অবস্থাপন্ন মানুষ কলকাতা বা অন্যত্র কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। গ্রামের বাড়িতে পড়ে আছে কয়েকটি বৃদ্ধ অশক্ত অক্ষম মানুষ। আগে যে আয়ে বা মাসোহারায় তাদের সচ্ছলভাবে চলতো, এখন মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাতে তাদের প্রায় নাভিশ্বাস উঠছে—কিন্তু এদের সম্পর্কে আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি বা দায়িত্ববোধ আছে মনে হয় না।

বাড়িতে আছে সিদ্ধার্থ, কলকাতায় কাজ পায়নি বলেই হয়তো গ্রামে আছে। আর আছে সিদ্ধার্থের রুগ্ন স্ত্রী সুনীতি, তার ছেলে ও মেয়ে, সিদ্ধার্থের বুড়ো অক্ষম ছাতুকাকা, বুড়ি পিসিমা সরোজিনী, তাঁর সঙ্গিনী নিঃসম্পর্কিত মধ্যবয়সী মহিলা টিনি মজুমদার। একদিন বাসমতীতে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের পীঠস্থান

গড়ে উঠেছিল। তখন যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই গতায়ু। সেই ধর্মোন্মাদনার ঢেউ সরে গেছে। পুরানো উপাসনা গৃহে সাপ্তাহিক উপাসনা কালে আজ জনাকুড়ি লোক হয় কিনা সন্দেহ। একালে ধর্ম গুরুত্ব হারিয়েছে। সিদ্ধার্থের মত বুদ্ধিজীবীরা উপাসনার চেয়ে, ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়ে, সৎকর্মেই, সমাজকল্যাণেই বেশি আগ্রহী। অনেকে স্বার্থের প্রলোভনে হিন্দু সমাজের কোলে ফিরে গেছে। শুধু বুড়ো বুড়িরা ছাতুকাকা, সরোজিনী পিসি, টিনি মজুমদার, গগনবাবু, হিতেনবাবু, আর ফাটা (নীরেন) বাবুরা আজো রয়ে গেছেন।

পোস্টাল ইনস্‌পেকটার বিপত্নীক প্রভাসবাবুর বড় মেয়ে বিবাহিত। ছোট মেয়ে সুন্দরী রমা কলেজের কৃতীছাত্রী। নানা স্থানে ঘোরার চাকরিতে প্রভাসবাবুর মেয়েকে নিয়ে বিড়ম্বনা যথেষ্ট, তাকে হোষ্টেলে রাখবেন কিনা ভেবে পান না। বিদুষী সমাজসেবায় আগ্রহী রমাকে সকলেই খাতির করে। অধ্যক্ষ, তার কথায় ও প্রয়োজনের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। প্রবীণ অধ্যাপক সিদ্ধার্থ তাকে বন্ধুর মতো মনে করে। রমার মৌখিক অভিযোগে হেডক্লার্ক রাজীব সাসপেন্ড হল, রমার অভিমত জানলে কমিটি ঐ শাস্তি পুনর্বিবেচনা করতে পারে। লাইব্রেরিতে রমার অর্ডারে বই আনা হয়, এবং সিদ্ধার্থকে না দিয়ে অধ্যক্ষ প্রথমে রমাকেই পড়তে দেন।

'জলপাইহাটি' উপন্যাসে চাকরিতে তিতিবিরক্ত নায়ক নিশীথের অধ্যাপনা ছেড়ে কলকাতায় নূতন কর্মসন্ধানের ঝকমারি ও ব্যর্থতা বর্ণিত হয়েছিল। বাসমতীর উপাখ্যানে মফঃস্বলের কলেজে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী ও নির্মম ব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব, কিছু অধ্যাপকের অধ্যক্ষকে খোসামুদি, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাও প্রয়োজনে নিতে না পারা, অল্প বেতন ইত্যাদি নানা সমস্যার দিক উদঘাটিত করেছে।

সিদ্ধার্থের মাইনে ডি. এ. মিলিয়ে দুশটাকা ; সংসারে চালানো কঠিন, নানা সমস্যায় নানা স্থানে ঋণের ফলে, মাইনের টাকা কাটা যায়, তার মধ্যেও ইনসিওরেন্সের সুদ ও কিস্তির টাকা যখন যোগ হয় তখন কিছুই সামলানো যায় না। সংসারে সিদ্ধার্থ দেড়শ মাত্র দিতে পারে, আক্রার বাজারে তাতে সুনীতি সংসার চালাতে পারে না। পয়সার অভাবে চিকিৎসা হয় না। শীত আসছে, লেপ তোষক, শীতের পোশাক এককালীন অনেক টাকা দাবি করে সুনীতি। কোথায় কত ঋণ সিদ্ধার্থের তা স্ত্রীকে না জানানোয়, প্রতিনিয়ত মিথ্যা ধরা পড়ে, স্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ততা নষ্ট হয়। সুনীতি তাই এখন জানতে চায় না, কার কাছ থেকে সিদ্ধার্থ ঋণ করবে।

দুটি টিউশনি করতো সিদ্ধার্থ। ছাত্ররা ফেল করবে বুঝে সে ছেড়ে দিয়েছে। ছাত্র ফেল করলে বদনাম হবে ঠিকই, কিন্তু সুনীতি বলে সততার সঙ্গে পরিশ্রম করতে হবে সিদ্ধার্থকে, ফেল করা তার দায় নয়। তাছাড়া তার মত সুশিক্ষক ফেল করবে ভাবছে কেন আগে থেকে?

কশাই বস্তিতে হারানো গরুর খোঁজ করতে গিয়ে গরু মেলেনা কিন্তু জানা যায়, বস্তিতে কলেরা লেগেছে। তাদের শুশ্রূষা, ইনজেকশনের ব্যবস্থা ছাত্রদের দিয়ে সেবাদল সংগঠন, ডাক্তারদের ফিস-এর টাকা তোলা, এসমস্ত কাজে সিদ্ধার্থকে কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক সাহায্য করে। মিশনারিদেরও সাহায্য চাওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটিতে ওষুধ

নেই। কলকাতায় অর্ডার গেছে। কবে আসবে কেউ জানে না। রাত জেগে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করতে হয় সিদ্ধার্থকে। কলেরা ছড়ানো বন্ধ হয়।

ব্রাহ্ম সমাজের সভায় নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। ভল্যান্টিয়ারদের রাত জাগতে হয়, চা সরবরাহের জন্য ফ্লাস্ক চাই। রমার কাছে গভীর রাতে সিদ্ধার্থ গিয়ে এনে দেয়। তার এই প্রভাসবাবুর বাড়ি গভীর রাতে যাওয়া কুৎসার উপকরণ জোগায়।

ব্রাহ্ম সমাজে বড় কমলবাবু অধ্যাত্মবিভূতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তার ছেলে ফাটাবাবু (নীরেন) কলকাতায় ব্যবসা করে যথেষ্ট ধনী হয়েছে। বাসমতীতে ফিরে উপাসনা করতে গিয়ে তার চেতনা হয়, ব্রাহ্ম সমাজের পুনরুজ্জীবনে যোগ দেওয়া দরকার। পুরানো ব্রাহ্ম সমাজীরা উৎসাহিত হয়। তার পৈতৃক জমিদারি পুনরুদ্ধার হলে সে বোন মৈতি (মৈত্রেয়ী)কে দিয়ে দেবে। ইঁট সুরকির কারবার করে যে চল্লিশ হাজার টাকা সে জমিয়েছে সে টাকা সে একজনকেই দিতে চায়, যদি সে নিতে রাজি হয়।

সিদ্ধার্থ তার ছেলে মেয়ে দপ্তরি আর কুড়ুনির পড়াশুনোর দিকে নজর দেয়নি। পরিণাম খুব খারাপ হয়েছে। তারা ফেল করছে, স্কুল এমন যে পাশ না করলেও মাইনে মেটালে তুলে দেওয়া হয়। সিদ্ধার্থকেই এখন বাইরের সমাজকল্যাণ কমিয়ে এদের পড়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। চাকর আদিনাথ সিদ্ধার্থরই খিদমদগার ছিল। ছটাকা মাইনে বাড়াতে বলেছিল বলে সুনীতি পুরানো চাকরটাকে তাড়িয়ে এক ঝি নিয়োগ করেছে। সুনীতির শরীর খুব খারাপ। হাঁপানি দুরারোগ্য। সংসার সামলানো তার পক্ষে কঠিন। ছেলেমেয়ে পড়তে গিয়ে একদিন সাইক্লোনের রাতে দেরিতেও ফিরছেনা দেখে সিদ্ধার্থকে খুঁজতে বেরোতে হয়। সরোজিনী বড় উদ্বিগ্ন হন। সুনীতি মনে করে অজাতের মধ্যে বিয়ে হওয়ায় ছেলেমেয়ের মেধা এমন শোচনীয় হয়েছে।

বনচ্ছবি আর বিপাশা সিদ্ধার্থের প্রাক্তন ছাত্রী। তার আদর্শের অনুরাগীও। সিদ্ধার্থের প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ে তারা পড়ায়। এরা দুজন এম. এ. পড়তে যাবে কলকাতায়। বনচ্ছবিকে ফাটাবাবুর পছন্দ। একদিন বিকালে ব্রাহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে ফাটা তাকে ভালবাসা নিবেদন করে। নিজের জমানো চল্লিশ হাজার টাকা চেক কেটে তখনি তাকে দিয়ে চায়। কিন্তু বনচ্ছবি টাকার বিষয়ে নিস্পৃহ। সে জানতে চায় ব্রাহ্মসমাজের মৃত আচার্য টাকা আর শান্তির সম্পর্ক বিষয়ে কি মত পোষণ করতেন? সে বলে, টাকা ছাড়া প্রায়ই সংসারে বা জীবনে স্বস্তি শান্তি লাভ করা কঠিন—কিন্তু অসম্ভব নয়।'

বনচ্ছবি বলতে পারে না, এম. এ. পাশ করে বাসমতীতে ফিরে এসে কলেজে বা স্কুলে শিক্ষকতা করবে কিনা। ফাটা মনে করে তাকে প্রত্যাখ্যানের কারণ বনচ্ছবি সিদ্ধার্থকেই ভালবাসে। মনে করে নক্ষত্রের দোষে তাদের তিন জনের সম্পর্ক এমন দাঁড়ালো। বনচ্ছবি তা মনে করে না। কিন্তু তার ধারণা বা বিশ্বাস কি করে বোঝাবে ফাটাকে।

রাত হচ্ছে, বনচ্ছবি উঠে পড়লো। নাইটক্লাসের ব্যাপারে তার আজই সিদ্ধার্থের সঙ্গে দেখা হওয়া চাই। কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? একটা রিকশা ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া করে তার সব ঘাঁটিগুলি খুঁজতে হবে। কেউ কেউ বলে বাসমতীর মাঠে অনেক রাতে সেনকে দেখা যায়। সেখানেও যেতে হতে পারে।

জীবনানন্দের উপন্যাসে কোনো পরিকল্পনা থাকে না। কোথায় শুরু হলো, যেখানে শেষ তা আকস্মিক সমাপ্তি কিনা, অথবা অসমাপ্ত, তা বলা যায় না, ঠিকভাবে। দেবেশ রায় বলেছেন, 'বাসমতীর উপাখ্যানের সমাপ্তি নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। তা সত্ত্বেও খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা ও বা উপকাহিনী জুড়ে জুড়ে যেভাবে তাঁর উপন্যাস গড়ে ওঠে তাতে কেন এখানেই শেষ হলো উপন্যাস, সে প্রশ্ন খণ্ডিত হয় না।

বাস্তবিক নাম ও চরিত্রগুলির ঘটনাস্থলের অসংগতি দূর করে জলপাইহাটি এবং বাসমতীর উপাখ্যান যদি মিলিয়ে এক অখণ্ড উপন্যাসের কথা ভাবা হতো তাতে উপাখ্যানটি পূর্ণতর হতো, তবু সমাপ্ত হতো কিনা বলা চলে না। আর এখন বাসমতীর উপাখ্যান যে আকারে আছে তাতে একাহিনীকে চরিত্রমুখ্য, ঘটনা ভিত্তিক, সমাজচিত্রণমূলক কোনো মতেই পূর্ণতা পেয়েছে একথা বলা চলেনা।

জীবনানন্দের পরিবার ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন। জীবনানন্দ অনেক মুক্ত চিন্তার মানুষ ছিলেন। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের অবিস্মরণীয় উন্মেষের কথা এ বইতে নেই, তার অন্তিম অস্তরাগ ছটার একটু আভাস এ বইতে ফুটেছে। উপাখ্যানের বাকি সবটুকুই প্রায় চর্বিতচর্বণ। দুঃস্থ শিক্ষকের দারিদ্র্য লাঞ্ছনা, সংগ্রাম। প্রেম, পুরুষ নারীর সম্পর্ক এখানে অস্ফুট, অনির্ণীত। উপন্যাস কিসের উপর দাঁড়িয়ে ডালপালা মেলবে? প্রবোধ কুমার সান্যালের একটি গল্পের নাম ছিল 'এক বান্ডিল কথা'। জীবনানন্দের এই উপন্যাস সম্পর্কেও কি তাই বলা হবে?

মুদ্রণ প্রমাদ যথেষ্ট। জীবনানন্দ সমগ্রর পঞ্চম খণ্ডের ১০০ পৃষ্ঠায় হঠাৎ কিছু বাদ পড়েছে মনে হয়। প্রিন্সিপ্যাল অন্তত রাজীব বাবুকে সম্বোধন করবেন—সেটা নেই। একি পাণ্ডুলিপি পাঠের ত্রুটি, নাকি প্রিন্টার্স ডেভিল?

জলপাইহাটি

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডে থাকাকালে জীবনানন্দ এ বইটি লেখেন। রচনাকাল ১৯৪৮-এর ৮ই এপ্রিল থেকে ৯ই মে। উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪৭-৪৮। দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বইটির আলোচ্য বিষয়। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে শিলাদিত্য মাসিকে উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকালে উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থল পদ্মাপারের কল্পিত শহর জলপাইহাটির নাম অনুসারে জীবনানন্দ অনুজ অশোকানন্দ দাশ এর নামকরণ করেন। এ নামকরণ মন্দ হয়নি। তবে জীবনানন্দ সমগ্রর সম্পাদক পাণ্ডুলিপি দেখে অনুমান করেন দ্বিতীয় খাতায় প্রথম পৃষ্ঠার উল্টোদিকে অস্পষ্টভাবে লেখা দুটো শব্দ 'সময়ের ঘাম' ও 'কূলকিনারা' "উপন্যাসটির জন্য জীবনানন্দ এই নাম দুটো হয়তো ভাবছিলেন। উপন্যাসের বিষয়ের দিক থেকেও নাম দুটিতে এক অন্য তাৎপর্য আছে।" তবু সুপরিচিত হওয়ায় 'জলপাইহাটি' নামটিই তিনি বহাল রেখেছেন।

কলকাতায় জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে জলপাইহাটি থেকে রাত্রে হঠাৎ এসেছে পুরানো বন্ধু নিশীথ। বন্ধু বেশি বয়সে বিয়ে করেছে জেনে সে ভেবেছে তার ওঠার

আস্তানাটা গেল। সেদিন কথা বেশি হয়নি। নববধূর সঙ্গে পরিচয়ও হয়নি। ক্লান্ত নিশীথ সেন ঘুমিয়েছে। জলপাইহাটি থেকে অধ্যাপনা ছেড়ে কর্মের সন্ধানে, আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছে নিশীথ। তার পি. এফ. এর অর্থ নিঃশেষিত। স্ত্রী মরণাপন্ন, একটি মেয়ে অপহৃত, অন্যটি যক্ষ্মারোগী, আপাতত মাতুলালয়ে। একমাত্র পুত্র বিপ্লবের কাজে দেশছাড়া। পিতৃবিদ্বেষীও। কিন্তু এসব সমস্যা নিয়ে ধনী প্রভাবশালী বন্ধু জিতেনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ মেলেনি। ভোরে উঠে অফিসে গেছে জিতেন। নিশীথকে আপ্যায়নের ভার পড়েছে জিতেনের ফিরিঙ্গি বউ নমিতার উপর।

নমিতা আর নিশীথ টিফিন করছিল সকালে। ফোনে জিতেন জানালো অফিসের জরুরি কাজে চার-পাঁচ দিনের জন্য জামসেদপুরে যাচ্ছে সে। নিশীথ যেন থাকে, কথা আছে।

নমিতার বাবা সলিল মুখুজ্জে বিশিষ্ট মানুষ ও ধনীব্যক্তি। বর্তমানে প্যারালিসিস রোগী। নমিতার মা, মাথিন। এরা থাকেন পার্কসার্কাসে। কথা হচ্ছিল সলিল মুখুজ্জের চিকিৎসা নিয়ে। জার্মান ইহুদি ডাক্তার রোজেনবুর্গ তাকে দেখেন। নার্স আছে। কিন্তু মাথিন ব্যস্ত তাস খেলায় কিম্বা অ্যাম্বুলেন্সের কাজে, তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। যেমন সেদিনই দুপুরে খাওয়ার পর নমিতা মায়ের ফোন পেল ব্যারিস্টার ইফতিফার উদ্দিনের বাড়ি থেকে। তিনি সেখানে আছেন, মেয়েকে ডেকেছেন তাস খেলতে। নমিতা সেখানে যাবে না, বাবার প্রতিবেশী ইয়ুসুফ সাহেবকে বলা আছে, প্রয়োজন হলে নমিতাকে ফোনে খবর দেবে, সে বাবাকে দেখতে যাবে।

এবার নিশীথ দোতলায় নমিতার পাশের ঘরে থাকবে। ও ঘরে টেলিফোন আছে। রাতে ঘুম ভাঙতে পারে সেজন্য। প্রাইভেট ফোন হলেও নিশীথকে ধরার অনুমতি দিল নমিতা।

জলপাইহাটি কলেজের কাজ ছেড়ে এসেছে নিশীথ। মাইনে কম, বাড়াবে না, ছুটিও দেবে না। সুমনাকে কলকাতায় আনতে হবে। রাণুকে খুঁজতে হবে। কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে ভানু বাঁচবে না। নিশীথের পি. এফ.-এর শেষ পাঁচশো টাকা ডাঃ মজুমদারকে সুমনার চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য, ১৫০ টাকা সুমনাকে সংসার খরচের জন্য ; আর নিজে ৫০ টাকা নিয়ে কলকাতা এসেছে। হাতে এখন মাত্র ২৩ টাকা। জিতেন ইচ্ছে করলে নিশীথকে বড় পোস্টে বসাতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হবে কবে?

জলপাইহাটিতে নিশীথের সহকর্মী মহিম ঘোষাল তার প্রতিবেশী ও তার স্ত্রী অর্চনার উপর অসুস্থ সুমনার দেখাশুনার ভার দিয়ে এসেছে নিশীথ। বিপ্লববাদী ছেলে হারীত যদি আসে, নিশীথ ফেরা পর্যন্ত তাকে থাকতে বলে এসেছে।

নিশীথের মেয়ে রাণু দাঙ্গায় মারা পড়েনি। নরেন মিত্তির—যে সুমনাকে রক্ত দিয়েছিল তারই ভাই তাকে ফুসলে গঙ্গাসাগরে নিয়ে যায়। তারপর কলকাতায়। তারপর থেকে বেপাত্তা। সুমনার বিশ্বাস নাখোদা মসজিদে গেলে তাকে পাওয়া যাবে। নরেন বরেনের কাজই হল মেয়েবাজি ও মেয়ে পাচার। কিন্তু রাণুকে আর ফিরে পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস নিশীথের আর নেই।

বুড়ো উকিল হরিলাল চাটুজ্জের অপ্রতিহত প্রভাব জলপাইহাটি কলেজ কমিটিতে। খোসামুদে অধ্যক্ষ কালীশঙ্কর তাকে সেক্রেটারি বানিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে।

দু-এক জন মেম্বারের প্রতিবাদে কিছু কাজ হয় না। প্রিন্সিপালের ইনক্রিমেন্ট হয়ে মাইনে দাঁড়ায় সাড়ে চারশো। নিশীথের ১০০ টাকা বাড়িয়ে দুশো টাকা করার আবেদন ছিঁড়ে ফেলা হয়। তার ছুটি নেওয়ার অপরাধে তাকে সাসপেন্ড বা বরখাস্ত করা হবে।

নিশীথ কলকাতায় আসার রাত্রেই হারীত বাড়িতে আসে। অন্নের তাগিদে হারীত নাকি মোটর ড্রাইভারি শিখছে। তার বাবা যদি শিখতো তাহলে সংসারের এই দুর্দশা হত না। সুমনা তাই ভাবে। কিন্তু হারীত যে বাবাকে রেহাই দেবে মা-দের কলকাতায় নিয়ে যাবে, এজন্য তার জীবন নয়। বয়ে যাওয়া ছেলে না হলেও তার মা বাবা বোনদের জন্য আন্তরিক টান নেই : তাদের উদ্ধারের কোনো কাজে তাকে পাওয়া যায় না। সে কামার পট্টিতে দুর্মূল্য অন্ন বিলোয়, কিন্তু শিক্ষকদের দুর্দশামোচনের কথা ভাবে না। অথচ সে নাকি সোসালিস্ট বিপ্লবী। মা তাকে গাল পাড়ে।

হারীতের যত কথা অর্চনা মাসির কাছে। 'তোমাকে ভাল লাগে তাই বলি।' বিয়াল্লিশের আন্দোলনে সারা দেশের সমর্থন ছিল। আজ তাদের কাজে কারো উৎসাহ নেই। তাই অর্চনা বলে জওহরলালকে শক্তি জোগাও। তিনি ভুল করবেন না। ভাঙার চেষ্টা ভালো না। তবু হারীত বলে মহামানুষ যাই চাক, দেশটাকে ধাড়ি মনিবরাই তো চালাচ্ছে আজকাল। গড়ব বলেই ভাঙতে হবে কোথাও কোথাও। প্রত্যেক লোক স্বার্থসন্ধানী। ভবিষ্যতের সুখের জন্য আত্মত্যাগ করবে ক'জন। 'তাদের সামনে সৎদৃষ্টান্ত জিইয়ে রাখা দরকার'—বাবার এমন কথা হারীত মানে না।

নিশীথকে ভালবাসে অর্চনা। হারীতেরও বন্ধুর মত তাকেই পছন্দ। অর্চনা হারীতের চেয়ে তিন বছরের বড়ো। অর্চনা চায় এখানের মানুষের কল্যাণে হারীত যদি কাজ করে সে তার শরীর সারিয়ে তোলার দায়িত্ব নেবে। জলপাইহাটিতে থাকলে তার আমৃত্যু সঙ্গী হবে।

জিতেনের ড্রয়িং রুমে পাশাপাশি বই পড়ছিল নমিতা আর নিশীথ। এক কাঠিতে সিগারেট ধরাচ্ছিল দুজন। এক ডাক্তার সুবল মুখুজ্জে নিশীথের খোঁজে এসে জানালো কাঁচরাপাড়া বা যাদবপুরে ভানুর বেড মেলেনি। মামা শঙ্কর গুপ্তও আর যক্ষ্মারোগী ঘরে রাখতে চান না। নিশীথ কেন খোঁজ নেয়নি? সে কি কোনো মুরুব্বি ধরে যাদবপুরে বেড পাবে? না নিজের কাছে ভানুকে আনবে? পরাশ্রিত নিশীথের বিপন্নতার সুযোগে সুবল তার নিজের বাড়ি ভানুকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিল। নিজের ঠিকানা লেখা কার্ড দিয়ে নিশীথের সম্মতি আদায় করে নিল।

নমিতা বাইরে গেছে। একা বাড়িতে নিশীথ। নানা সাংসারিক ভাবনা ভাবতে ভাবতে পৌনে বারোটায় নিশীথ ঘুমোলো। দেড়টায় ফিরলো নমিতা। ডাঃ রোজেনবুর্গ তাকে টিপে ঠেসে ঠুকে দেখে তিন মাসের ওষুধ দিয়েছে। যদি সাগরতীরে রোদে নগ্ন বেড়ানোর সুযোগ পেত তবে নমিতার নাকি ওষুধ লাগত না। ডাক্তারের কথায় উজ্জ্বল আকুতি ফুটেছিল নমিতার রক্তে। তারপর জুলফিকারদের পার্টি সেরে একটায় বাড়ি ফিরেছে। বালিশ আঁকড়ে বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে আধঘণ্টা স্নান সেরে উদল শরীরে নিশীথের ঘরে ঢুকেছে সে, ঘুমোচ্ছে নাকি দেখতে। ঘুমোচ্ছে দেখে এন্তার বরফকুচি ছুঁড়ে জাগানোর ইচ্ছে হয়েছে তার। কিন্তু সিগারেটের টিন একটা তুলে

নিজের ঘরে গিয়ে পোশাক পরে ফের এসেছে নিশীথের ঘরে। মাঝে মাঝে শরীরটা মুখিয়ে ওঠে। ফ্যান বন্ধ করে তেপয় উল্টে ঘুম ভাঙ্গিয়েছে তার। 'ভোর হয়ে গেছে?' এই হচ্ছে। সোফায় বসেছে নমিতা। সে নিশীথকে ভিলোঁ আর আনাতোল ফ্রাঁসের কড়া ভিয়েন বাংলা করে শোনাতে প্রস্তুত। কড়া ভিয়েন বলতে কি বোঝাচ্ছে নমিতা? বরফজল খেলো দুজনে। আলতো চুমুক দিতে দিতে নিশীথ ভাবছিল। জিতেন এলেই এ অন্তরঙ্গতার খেলা ভেঙে যাবে। তার ঠিক জায়গা জলপাইহাটিতে করমচা বনে অর্চিতার সান্নিধ্য।

কি অন্ধকার, মেঘ করেছে? ঝড় হবে? 'ঝমঝম বৃষ্টি ভাল লাগে না আপনার'? আসলে মেঘ নেই। নমিতা ছাদে নিশীথকে নক্ষত্র দেখাবে বলল। কিন্তু নিশীথের গরজ নেই। স্কোয়াস খেতে খেতে সে সমাজকল্যাণের তত্ত্ব জুড়লো। নিচের তলার লোকদের জন্য কিছু করা দরকার।

হানিফ জানালো পাঁচটায় জুলফিকার এসে ড্রয়িং রুমে বসে বসে ফিরে গেছে। দাশগুপ্ত সাহেব বাড়িতে নেই জেনেই এসেছিল সে। দাশগুপ্ত চায় না নমিতা জুলফিকারের সঙ্গে মেশে। পৈত্রিক সিফিলিসের বিষ নমিতার রক্তে। নিজে ইনজেকশান নেয়। জিতেনকে জানায়নি।

ক্যাপিটালিস্ট জিতেন সবার কল্যাণ চায়। ওদের এইসব কথার জন্য মার্কসবাদের মর্যাদা কমছে। পৃথিবী কখনো শুদ্ধ হবে না। বিপ্লব মানুষের ভাল করতে তাদের নিকেশ করছে। তবু ভবিষ্যৎ ভাল হয় না। নমিতা মূল ভাষায় ডাস ক্যাপিটাল পড়েছে। তার বিশ্বাস মার্কসের কথা ঠিক।

নিশীথ সবিস্ময়ে ভাবে, জার্মান ডাস ক্যাপিটাল আর ফরাসী ভিলোঁ একই নারীর মনে সমান ঠাঁই নেয়, সে মনের ব্যাপ্তি কত? শুধু তাই নয়, ইয়ুসুফের সঙ্গে একটা ব্যবসা চালায়। ধনী মেয়েদের ক্লাবের হয়ে সমাজসেবা করে, স্টাইক পরিচালনা করে, তার বহুমুখী দক্ষতা।

জামসেদপুর থেকে দিল্লি গেছে জিতেন, নিশীথকে থাকতে বলেছে টেলিগ্রাফ করে। নমিতা সকালে ঘুমোবে দুপুরে পার্কসার্কাস যাবে জুলফিকারের কাছে। নিশীথ বেরিয়ে পড়ল। চাকরি আর আশ্রয়ের সন্ধানে। পথে দেখা স্কটিশচার্চ কলেজের সহপাঠী রবিশঙ্করের সঙ্গে। মাদ্রাজে ডি. এ. জি-র কাজ করে। বউ স্কচ মহিলা। দুটি সন্তান। রবির সন্দেহ তারা তার সন্তান কিনা? অবৈধ নারীসঙ্গে সেও কম যায় না। সম্প্রতি করাচি এসে এক মার্কিন সাংবাদিক মিলফোর্ডকে মনে ধরেছে তার। তার সঙ্গে সহবাস প্রস্তাব যে ভগবদগীতার দেশের মানুষ দেবে ভাবেনি মিলি। সে ভার্জিনিয়াকে সরাবেই। তবে ছেলেমেয়েদের যাতে সুব্যবস্থা হয় তা নিয়ে চিন্তিত।

এখন কলকাতায় এসে ড্রাইভারকে পত্রবাহক করে পাঠিয়েছে কোন মেমের কাছে। সাহেব নাকি দিল্লিতে। সেই অবকাশে রবি তাকে ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে যেতে চায়। হাতে আরো তো দুটো দিন! ঐ মেমটি নমিতা কিনা দেখতে গেল না নিশীথ। রবি সুপুরুষ। তবে জুলফিকার তো অপেক্ষা করবে নমিতার জন্য।

প্রফেসার অভয় ঘোষ নিশীথের সহপাঠী। এখন চাকরির মুরুব্বি ধরতে নিশীথ বারবার তার কাছে আসে আর প্রতিবার সে তাকে চিনতে পারে না। তার স্ত্রী মোহিতা নিশীথের পরিচয় পেয়ে আর ক্যাকটিনা পিল খেতে দেখে সদয় হয়ে কথা দিলেন কলকাতার কলেজে তার চাকরি জোগাড় করে দেবেন। কিন্তু ঘোষকে কিছুতেই রাজি করাতে পারছেন না। তার এক কথা, আবার এম. এ. ফার্স্ট হয়ে আসতে হবে। মোহিতা বললেন 'অহিংস বিপ্লব চাই।'

কুলদাপ্রসাদ এক কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, তার বক্তব্য কলেজে চাকরি পেতে হলে কলকাতায় নাইট কমার্সে ১০০ টাকায় পার্টটাইমার হয়ে ঢুকতেই হবে। ফার্স্ট ক্লাসও চাই। কর্মরতদের অল্পযোগ্যতা ধর্তব্য নয়। তার পরামর্শ, খবরের কাগজে ১৫০/২০০ টাকা পেলে নিশীথ যেন ঢোকে। কিন্তু কাগজে কে তাকে সম্পাদনার কাজ দেবে? আরেক কলেজের অধ্যক্ষ জয়নাথ ইতিপূর্বে বারবার আশ্বাস দিয়েও কাজ দেয়নি। জয়নাথের বাবা গয়ানাথ ব্রাহ্ম হলে বৈরী আত্মীয়দের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের সময় নিশীথের ঠাকুর্দা তাকে সপরিবারে দু'বছর আশ্রয় দিয়েছিল, ভরণপোষণ করেছিল। সেই পুরনো কথা বলেও নিশীথ তার মন ভেজাতে পারলো না। সে বলল, নিশীথকে তার কলেজে নিতে পারে এই শর্তে প্রফেসার ঘোষ অথবা তার স্ত্রী তার হয়ে উমেদারি করবে। সম্ভবত মোহিতাকে আনা যেত। কিন্তু জয়নাথের মোহিতা সম্পর্কে লোলুপতার আভাস পেয়ে নিশীথ সে চেষ্টা করলো না।

জলপাইহাটির হিন্দুরা পশ্চিমবাংলায় যেতে উদগ্রীব। হারীত তাদের ওখানে থাকতে বলছে। তা শোনার মত অবস্থা তাদের নেই। কিছু না পেলেও ওরা সেখানে মুখ থুবড়ে পড়তে চায়। হারীতের সাধ্য নয় তাদের থামিয়ে রাখা। তার প্রথম কাজ শরীর সারানো, রোজ রাতে জ্বর হচ্ছে।

সুলেখার বাড়ি যেতে জুলেখা হারীতকে অপেক্ষা করতে বলে কোথায় গেল। সুলেখা তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ রাজনীতি ও আনুষঙ্গিক নানা গল্প করল। ইদানিং নরেন আর বরেন মিত্তিরের ঘোরা ফেরা সুলেখাদের বাড়ির আশপাশে। তাই একা সুলেখাকে রেখে আসা যায় না। ক্যানা আর কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। হারীত বলছিল আমৃত্যু সময়ের সঙ্গে থাকতে চেয়েও মানুষ সময়কে ধ্বংস করে ফেলছে। সুলেখা বলে, এ নিশীথবাবুর কথা। বাবার সঙ্গে হারীতের সাদৃশ্য আছেই। তবে দুজনের মনের দুটো ধারায় একজন জোর দেন একটিতে, অন্যজন অন্যটায়। কলকাতায় হারীত কত মানুষের শান্তিভঙ্গ করেছে। এবছরটা জলপাইহাটিতে অন্যরকম। নির্জনতাই তার ভাল লাগছে।

হারীত তিনটেয় বাড়ি গিয়ে খাবে। রাতে খাবে দুধ আর ফলটল। তার নিজের কোনো আয় নেই। নিশীথের ১৫০ টাকায় অন্তত তিনমাস চালাতে হবে। উপার্জন করতে পারলে বছরখানেক থাকবে সে জলপাইহাটিতে। হারীত চাষাচামারদের চাল কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু শিক্ষকদের আয় যে আরো কম, তাদের জন্য কি? এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই হারীতের। সে বলে, স্কুল-কলেজ ভেঙে উড়িয়ে দেবে সব। সুলেখার জবাব পিতৃরক্তে তর্পণ করবে তো মাস্টারের ছেলে! হারীত জানে, এখানে ওখানে তালিমারা ছাড়া বড় কিছু করা যাবে না। কিন্তু সুলেখা বিপ্লব চায়।

হারীত চারটেয় বাড়ি গেল। সুমনা বললো, 'একবার খাচ্ছ কেন? ক্ষিদে পায় না—এতো বিষম রোগ।' নিশীথের চিঠি আসেনি। হারীত জানে, তিনি কাজ পাবেন না, ফিরে আসবেন। হরিলালরা অব্যবস্থার যে বদরক্ত জমিয়েছে তা বার করে দিতে হবে। শুনে সুমনার ছেলেকে গুণ্ডা মনে হয়, হারীত অবাক হয়, এমন অবুঝ মানুষের সঙ্গে ঘর করতে হয় নিশীথ সেনের। সুমনা হারীতের ব্যবস্থা নাকচ করে নরেনের কাছে ফের রক্ত নেবে স্থির করে। জুলেখাদের বাড়িতে হারীতের যাওয়াতেও সুমনার আপত্তি। কেননা এজন্য নরেনরা হারীতের বিরুদ্ধতা করছে।

অর্চনা কিন্তু সুলেখাদের বাড়িতে যাওয়ায় হারীতের কোনো দোষ দেখে না। বরং চায় পরীক্ষার জন্য সে তাকে সাহায্য করুক। কিন্তু হারীত পড়াশুনা ছেড়েছে ঢের দিন। সে পড়াবে কি করে? প্রসঙ্গত হারীত জানায় সুলেখা, জুলেখা আর তাদের মা বনলেখা সুন্দরী তো বটেই যেন বোনের মত লাগে। হারীত বলে অর্চনাকে সে মাসি বলে ডাকবে না, মাত্র তিন বছরের বড় সে। সে তাকে নাম ধরে ডাকলো হঠাৎ। সম্পর্ক পালটাতে চায় সে।

হারীত বিরাজ সাহার আড়তে যাবে কালবাজারের দরে পনেরো বিশ মন চাল কিনে চামার পটিতে বিলি করতে হবে। সে কিছু টাকা এনেছে, বাকিটা ধারে কিনবে। দিন পনেরোর মধ্যে এত টাকা কে দেবে? হারীত অর্চনার এ প্রশ্নের জবাবে বলে, 'তুমি দেবে'। যদি তাকে জলপাইহাটিতে থাকতে হয়—তবে এমন বারবার সে চাইবে অর্চনার কাছে। অর্চনা চেয়েছিল জলপাইহাটিতে হারীত থাকুক, তার কাজে সে সাহায্য ও পরামর্শ দেবে যদি কল্যাণ কাজ হয়। হারীত বলল, টাকা চায় না সে, যদি তার শরীরটা সে তালি মেরে ঠিক করে দিতে পারে একবছর পেরিয়ে গেলেও সে থাকবে জলপাইহাটিতে।

নিজের নির্জন অন্ধকার ঘরে হারীতকে যেতে ডেকেছিল অর্চনা, কিন্তু হারীত বেকুবের মতো চেয়ারে বসেছিল। মন গ্লানিতে ভরে গেল অর্চনার। কিন্তু ধীরে ধীরে নিস্তার ও শান্তি অনুভব করছিল সেও। হারীতের মনে হলো অর্চনা এমন কিছু স্থিরতর সম্বন্ধ চায় যাতে নিশীথ সেনকে আহত ও সুলেখাকে ব্যাহত করা যায়। তা কি দিতে পারবে হারীত!

সে রাতে শরীরের দোহাই দিয়ে মায়ের পাশে শুয়ে রইল। অর্চনা ছিল মাসি, পরে যেন বোন, এবার যেন নাতনি, হারীতই যেন বড়, সে অর্চনাকে বললো পলিটিকসের কথা বোলো না তুমি, ওরা যা দিতে পারে না, তার জন্যে তোমার কাছে আসি। তা দিলে এখানে থাকবো বরাবর।

যখন রাত আড়াইটায় নাটক দেখে মহিম আর তার ছেলে ফিরলো, হারীত বেরোলো সাহাপট্টির দিকে। অর্চনা ঘরে যাবে, খাবে, এসে সুমনাদির কাছে শোবে। পরদিন বারোটায় ফিরে খেয়ে ঘুমিয়ে হারীত যখন উঠলো জুলেখা এসেছে। সে সুমনাকে দেখে বলল 'পার্নিশাল এনিমিয়া। স্ত্রীকে এ অবস্থায় রেখে নিশীথবাবুর চলে যাওয়া অন্যায় হয়েছে।' হারীত বললো, তারা তো সবাই আছে, ডাক্তার, অর্চনা, মহিমবাবু, হারীত নিজে থাকবে মার মৃত্যু অবধি। কথাটায় আহত হল জুলেখা। অর্চনার সম্পর্কে হারীতের মনোভাবের আভাস পেয়ে জুলেখা বললো, তুমি ভারতে বিপ্লব করছ আর এখানে তোমার বাবাও যা ভয় করতেন তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছ।'

হারীত বোঝায়, অর্চনা নিজে এগিয়ে গিয়েছিল নিশীথবাবুর দিকে। হারীত তাকে নিজের দিকে তাড়িয়ে এনেছে। সে পরে সাড়া দিয়েছে। দ্রৌপদীই সে। যখন তার উপছে পড়ার সময় দৈবক্রমে হারীত উপস্থিত। জুলেখা জানতে চায়, হারীতের মধ্যে পুরুষের মন কে জাগিয়েছে? হারীত উত্তর দেয় না। বাইরে অন্ধকারে হোঁচট খায় কেউ। 'কে?' নিশীথ এসেছে। বলছে, ভানু মরে গেছে। অর্চনাও তখনি সুমনার মৃত্যু সংবাদ দেয়। এদিকে সুলেখা এসে ওয়াজেদ আলির সঙ্গে তার বিয়ের সম্মতির কথা জানায়। নিশীথ আর সুলেখা মৃত সুমনাকে দেখতে ও ঘরে যায়। জুলেখা রয়েছে বলে হারীত কেমন লেপটে আছে—বুঝে অর্চনা ভাবে চেনা সময়ের মৃত্যু হচ্ছে। আর বাইরে অপেক্ষমাণ ওয়াজেদ আলিকে মনে হয় এক মহিমান্বিত দার্শনিক।

জটিল, পরিকল্পনাহীন চরিত্রের অন্তর্সঙ্গতিহীন, ঘটনা ও আদর্শের পারম্পর্যহীন এক উপন্যাস এই জলপাইহাটি। এতে দেশবিভাগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তেমনভাবে প্রকটিত হয়নি। সব চরিত্রে যৌনতার অতিরেক দৃষ্টি কটুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পিতাপুত্রের কে নায়ক তাও স্পষ্ট নয়।

সুতীর্থ

'সুতীর্থ' লেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের মে ও জুন মাসে। প্রথম প্রকাশ হয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৭৬-এর ৩রা জানুয়ারি থেকে ৪ সেপ্টেম্বর অবধি পর্যায়ক্রমে ৩৬ সংখ্যা ধরে। এর প্রকাশে বিলম্বের কারণ বিবৃতি প্রসঙ্গে অশোকানন্দ দাশ লেখেন ঃ " জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর রচনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে।....উপন্যাসগুলো প্রকাশ সম্বন্ধে কী তাঁর ভাবনাকল্পনা, পরিমার্জনা সম্বন্ধে কীই বা তাঁর চিন্তা ছিল সবই অব্যক্ত থেকে গেছে। তাই এগুলো প্রকাশে আমার কিঞ্চিৎ সংকোচ ছিল। 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং 'মাল্যবান' উপন্যাসটি....শ্রীঅমলেন্দু বসুকে আমি পড়তে দিয়েছিলুম। তাঁরা দুজনেই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন।...এগুলি প্রকাশ করার অধিকার ছিল তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্য দাশের অনুমতি সাপেক্ষ।...তিনি দীর্ঘকাল এই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার অনুমতি দেননি। ১৯৭৩ সালে...অনুমতি লাভ করি। কালবিলম্ব না করে তাঁর ছোট উপন্যাস মাল্যবান প্রকাশিত হয়।....কিন্তু ছোট ছোট অক্ষরে দ্রুত লিখনের জন্য জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়। কোথাও লাইনের নীচে দাগ আছে, কোথাও দুটি শব্দ পাশাপাশি আছে, যে পাঠ আমাদের অধিকতর উপযোগী মনে হয়েছে তাই আমরা গ্রহণ করেছি।"

'সুতীর্থ' যেভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা আদ্যন্ত সযত্নে পড়ে আমাদের মনে হয়েছে এতে এখনো অনেক পাঠবিভ্রাট এবং মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে ; সেগুলি সযত্নে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা দরকার। তা ছাড়া উপন্যাস দুটি পাণ্ডুলিপি থেকে অবিকল নেওয়া হয়েছে, অথবা উপন্যাসের সুষ্ঠু অবয়ব বা পরিসমাপ্তি দেবার জন্যে কিছু ছাঁটকাট বা অদল বদল করা হয়েছে কিনা সে কথা জানতে পারা গেল না।

আমার স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তবে মনে পড়ছে, জীবনানন্দের মৃত্যুর অনতিকাল পরে অশোকানন্দ আমাকে বলেছিলেন যে বই দুটিকে প্রকাশ করতে গেলে এমন অল্প স্বল্প ছাঁট কাটের প্রয়োজন হতে পারে। এই জন্যেই বিশেষ করে এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপরিতৃপ্ত রয়ে গেল।

'সুতীর্থ' 'মাল্যবানের মতোই নায়ক নামাঙ্কিত উপন্যাস। নানা কারণে উপন্যাসটি 'মাল্যবানে'র চেয়ে স্বতন্ত্র এবং জীবনানন্দের সমস্ত কথা-সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট। এখানে জীবনের এক ব্যাপ্ততর পটভূমিতে নায়ক নায়িকাদের উপস্থাপন করা হয়েছে ; ঘটনার বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপিত চরিত্রের সংখ্যাও এখানে অনেক বেশি। ঘটনা অনেক আছে বটে, কিন্তু তার বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন, পারম্পর্যহীন এবং উপন্যাসের মূল আখ্যানের সঙ্গে সংযোগশূন্য। বইটি যদি আদ্যন্ত সম্বিত প্রবাহমূলক হতো হয়তো তাহলে এ দোষ উল্লেখনীয় হতো না। কিন্তু রীতির বিপর্যয় একে খাঁটি ঘটনামূলক বা চেতনামূলক কোনটাই হতে দেয়নি, তাই পাঠকরা বই পড়ে খুশি হতে পারে না। এই উপন্যাসে লেখকের রচনা রীতিটা হলো, যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে উপন্যাসের নরনারীকে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেওয়া এবং পরস্পরের চেতনার অভিঘাতে তাদের চরিত্রস্বরূপের উদ্‌ঘাটন। কিন্তু এই উপন্যাসের মানুষগুলি এত প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নিজেদের অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাদের আচরণ এত সামঞ্জস্যহীন ও প্রতারণাময় যে তাদের কথা ও কাজের কোনো স্থিরতা পাওয়া যায় না, তাই তাদের সম্পর্কে পাঠক একটা সুস্থির প্রত্যয়ে পৌঁছাতে পারে না। জীবনানন্দ যেন দেখাতে চান কালের প্রতিসরণ নেই, যদিবা থাকে তা বর্তুলাকার। দেখাতে চান, জীবনের অস্থিরতা মানুষের কাজে ও কথায় প্রতিফলিত, চেতনা কোন ধ্রুবত্বকে নির্দেশ করে না, সুতরাং তাঁর উপন্যাস বাহ্যত পূর্বাপর অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্যহীন।

নায়ক সুতীর্থ দাশগুপ্তকে লেখক প্রথমে পরিচিত করলেন সাহিত্যিক বলে। সে লেখা ছেড়ে দিয়েছে সময়ের অভাব বশত। দুর্মর তার খামখেয়ালিপনা। বাড়ির ভাড়া দেয় না খেয়াল থাকে না বলে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বলে বেড়ায় পাশ গাঁয়ে তাঁর স্ত্রী পুত্র আছে। পরে জানা যায় পাশ গাঁ বলে গ্রামই নেই পৃথিবীতে, স্ত্রী পুত্র তো দূরস্থান। সে উচ্চ পদের অফিসার, খুশি মতো কাজ করে, ডিরেক্টরের পরোয়া নেই তার। নিচু কর্মীদের ধর্মঘটে তাতায়, ধর্মঘট না হলে চাকরি ছেড়ে চলে যায় আকস্মিক যোগাযোগে অন্যত্র শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে। ক্রমে উন্মোচিত হয়, সে আশৈশব বিপ্লববাদী, যদিও অহিংস। যদিও দেশ সেবা করেছে, জেল খেটেছে, পরীক্ষায় বিফল হয়নি ; যদিও পড়াশুনো করেছে, সাহিত্য সাধনা ছাড়েনি ; যদিও চাকরি করেছে, কখনো গোলাম বনে নি। অনুমান করা যাক যখন উপন্যাসের ঘটনাকাল, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর প্রাক স্বাধীনতার মুহূর্তে সুতীর্থর বয়স ৪৬। বলা হচ্ছে ২০ বছর আগে সে গ্রামে ছিল, তখন সে স্বপ্ন-চর। আবার বলা হচ্ছে ৩০ বছর আগে ভবতোষ তার স্কটিশে পাঠসঙ্গী। তাহলে কলেজে পড়ার পর সে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল কি? এমন অনেক জটিল গ্রন্থি রয়ে গেছে তার জীবনে। গয়ানাথ মালোর মৃত্যুর পূর্বাপর পরিস্থিতি এমনি একটি গ্রন্থি। গয়ানাথ সুতীর্থকে হত্যা করতে গিয়ে দৈববশে পদস্খলিত হয়ে আত্মঘাতী হয়, সুতীর্থের তাই ধারণা ছিল। এমনও হতে

পারে মুখার্জির দালাল বন্ধুর হাতে খুন হয়েছিল গয়ানাথ। কিন্তু আহত গয়ানাথকে পাঁজাকোলা করে যে সুতীর্থ চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, সে কেন গয়ানাথকে মৃত দেখে ফেলে পালালো? পালানোর সময় কেন টাই জুতো ইত্যাদি গয়ানাথের লাসের কাছে ফেলে গেল? কেনই বা স্বপ্নচর হয়ে বার বার ট্রাম পালটালো, শেষে আচ্ছন্নের মতো যখন ঘরে পৌঁছলো তখন তার মনে থাকলো না, সে নিজে প্রহৃত কিনা? তার পোষাকের রক্ত তার দেহের ক্ষতজাত কিনা। কিন্তু দেহে তার একটি আঁচড়ও পাওয়া গেল না। সুতীর্থের মতো যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এই আচরণ যেমন সামঞ্জস্যহীন, তেমনি দুর্বোধ্য তার মুখার্জির কথার ফাঁদে পড়ে গয়ানাথের মৃত্যুর মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে ধর্মঘট থেকে পিছিয়ে আসা, মণিকাকে ব্যবহার করতে চাওয়া মুখার্জির মনস্তুষ্টির জন্য, পরিশেষে নিজের অক্ষমতা বুঝে ঘুষ নিয়ে মুখার্জির শর্তমতো ধর্মঘট ছেড়ে চলে যাওয়া।

বোঝা যায়, 'সুতীর্থ' চরিত্র সম্পর্কে আগে থেকে লেখক সুষ্ঠু সুপরিকল্পিত ভাবে চিন্তা করে নিতে পারেন নি। লিখতে লিখতে ঘটনা সংস্থানের প্রয়োজনে চরিত্রটির নানা পরিচয় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এই পরিচয়গুলি একসঙ্গে দেখলে একটা পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তেমনটি ঠিক হয়নি। ঘটনার বাঁকগুলির প্রয়োজনে চরিত্রও বাঁক ফিরেছে কিন্তু সমস্ত চারিত্রিক বাঁকগুলির পারম্পর্যে নদীপ্রবাহের মতো অবিচ্ছিন্ন গতি নেই। এইজন্যেই কোনো চরিত্রই সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে হয় না। মনে হয়, অনেকখানি আরোপিত ও অসমঞ্জস। সুতীর্থর মতোই তার স্রষ্টার কল্পনাও খামখেয়ালি ও দায়িত্বহীন।

এমন অজস্র অসঙ্গতি কন্টকিত সুতীর্থ উপন্যাসের কাহিনী। কারো উক্তি ও কাজের মধ্যে এমন কোন স্থিরতা নেই যাতে তাদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়— পকেটমার হারাণ জানায় তার বাবা শোভান ঘোষ। বাবা-মা মরে গেছে দাঙ্গায় অথচ মজিলপুরে সে যাবে বাবা মার কাছে, অথচ জানবাজারে থাকে হারাণ, মিঞা সাহেবের কাছে, শোভান মিঞা তার বাবা। এমন অজস্র আত্মখণ্ডনের আত্মপরিচয় শেষ হলে হঠাৎ ছেলেটি 'বান মাছের মত সাঁ করে সটকে হঠাৎ কখন ঘাই মেরে অন্ধকারের সময় প্রসৃতির ভেতর ডুবে গেল—সুতীর্থ আর খুঁজে পেল না তাকে।

এমন অন্ধকার সময়-প্রসৃতির বুক থেকে উঠে আসে ভবতোষ ত্রিশ বছর বাদে হঠাৎ চৌরঙ্গী কফি-হাউসে অপেক্ষারতা পরীদের কাছে সুতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি যাবে না, ট্রামে না ট্যাকসিতে ঠিক করতে না করতেই হারিয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে আগামী ত্রিশ বছরের মতো। বাসে সুতীর্থের সঙ্গে ম্যাকগ্রেগরের আলাপ হয়। অহেতুক মনে হয় সুতীর্থর তাকে স্কটিশের অধ্যাপক হিসাবে স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা ও তার বারবার অস্বীকৃতি। এসব কিছুই মনে হয় অসংলগ্ন উদ্দেশ্যহীন, এমন কি মুখার্জির জেরার সময় হঠাৎ জানা যায় সুতীর্থ ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে সংযোগ রেখেছে, তারপরেও এই অসংলগ্নতার বোধ খণ্ডিত হয় না।

উপন্যাসটির আগাগোড়াই এমন। কেন যে এত কথাবার্তা, এত চরিত্রপুঞ্জ, এত

বিরোধ-সংঘর্ষ, এত পাত্রপাত্রীর কেনই বা এমন আকস্মিক প্রবেশ-প্রস্থান, পরিণামী তাৎপর্যের দিক থেকে দেখলে অস্পষ্ট ও অহেতুক মনে হয় সব। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপন্যাসটির এক অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব আছে। সমকাল যে অস্থিরতা দিয়েছে মানুষের জীবনে, যে লোভ, রিরংসা, অসহায়তার শিকার আমরা সকলেই—উপন্যাসের সূচনা থেকে পরিণামের মধ্যে অন্তত তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস আছে। বিরূপাক্ষের টাকার প্রলোভনে সুন্দরী সুশিক্ষিতা হয়েও জয়তী এই অর্ধশিক্ষিত ইতর স্বভাবের কনট্রাকটরকে বিয়ে করে জীবনের তিনটি বছর নষ্ট করেছে, বিরূপাক্ষের হীন আস্ফালন ও আত্মম্ভরিতার অন্ধকূপ থেকে জয়তী বেরিয়ে আসবার আগে তার পাঁচ লাখ টাকা ও একখানা বাড়ি বাগিয়ে নিয়ে এলো। এই অর্থের আসক্তি ত্যাগ দুরূহ বলেই সুতীর্থর অনুরাগিণী হলেন সুতীর্থর সঙ্গে তার গ্রামে যাওয়া হলো না। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সে এই প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়েছে।

মণিকা মজুমদার সুতীর্থের বাড়িওয়ালী। অসুস্থ স্বামী ও অভাবগ্রস্ত সংসারের জন্যই হোক বা স্বভাববশেই হোক তারও অর্থের লোভ কম না। বিরূপাক্ষ তাকে টাকার টোপ দিয়ে শিকার করতে চায়। মণিকারও সংকল্প বিরূপাক্ষের টাকা নেবে, কিন্তু ধরা দেবে না কিছুতেই। অথচ মণিকা সুতীর্থকে ভালবাসে, মেয়ে অমলার সঙ্গে সুতীর্থর বিয়ের প্রস্তাব রাখে, সে প্রস্তাব সুতীর্থের মনঃপুত নয়। যে মুখার্জিকে মণিকা মুখে চাবুক মেরেছিল একদিন, ধর্মঘটের দাবি আদায়ের জন্য সেই মুখার্জির কাছেই রাত্রে মণিকাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয় সুতীর্থ। এত অসঙ্গত প্রস্তাবও মণিকাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে তার কারণ তো কোনো লোভ নয়, আসক্তি নয়, সুতীর্থর প্রতি সুগভীর সহানুভূতি ও প্রেম একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

জয়তীর প্রেমিক ও স্তাবক অবিবাহিত, প্রকৃতি-প্রেমিক ক্ষেমেশকে ঘিরে সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া। ক্ষেমেশ তার আত্মমগ্ন উপদ্বীপ থেকে ইতিহাস-প্রবাহের কলরোলের সামনে এসে দাঁড়ায়। সুতীর্থ তার হটকারিতার, অস্থিরতা ও নিঃসঙ্গতার বলয় পেরিয়ে স্থির করে নেয় গ্রামীণ কর্মসূচি। শ্রমিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অনির্ভর অসঙ্গতি পেরিয়ে প্রকৃত শ্রমিক নেতৃত্বে এগিয়ে চলবে তার আভাস মেলে। জীবনানন্দের কোনো গল্পে উপন্যাসে এমন বৃহৎ সামাজিক তাৎপর্য আমরা দেখিনি। যেমন উপন্যাসটির প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদে সূচনার লৌকিকতা পিছনে ফেলে সমাপ্তি এক কাব্যময় দার্শনিকতায় উন্নীত হয়েছে, ঠিক তেমনই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে এখানেই একটা উত্তরণ আমরা দেখতে পেলাম।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় সুতীর্থ উপন্যাসের সঙ্গে 'গ্রামশহরের গল্পে'র সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। আমি মনে করি, এই উপন্যাস যোগ্য হাতে সুষ্ঠু সম্পাদনার অপেক্ষা রাখে। পরিচ্ছেদগুলির বিন্যাসের ক্রম কিছুটা পালটালে, কিছু অপ্রয়োজনীয় উটকো প্রসঙ্গ ও উক্তি-প্রত্যুক্তি বাদছাদ দিলে বইটি আরো পরিণত শিল্পশ্রী লাভ করতে পারে। এ বইয়ের ভাষা মাল্যবানের মতই বিশিষ্ট ও অপ্রত্যাশিত, বড়ো লৌকিক, কখনো শ্লীলতার সীমা না মেনে গা করকর করা ভাষা। কিন্তু এ ভাষা সচেতন। পাঠকদের

জিজ্ঞাসার উত্তরে যেন উপন্যাসের চরিত্রের মুখ দিয়েই জীবনানন্দ এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব দিয়ে গিয়েছেন :

: 'এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি—যা মুখে আসছে তাই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?'

: 'বাংলা আমার ঠিকই আছে—ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাইনে।

"ভাষা ও চিন্তা কি রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে টের পাও না তুমি।"

জীবনানন্দের ভাষার এই অপরিচ্ছন্ন বলিষ্ঠ রূপ যে আজকের কবি সাহিত্যিকদের ভাষা চেতনার অগ্রজাতক একথা ভেবে বিস্ময় জাগে।

মাল্যবান

মাল্যবান লেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের জুন মাসে। বইটি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ—এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। লিরিক কবিতায় কবির আবিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হয়, পরিপূর্ণ স্বভাবটা চেনা যায় না। উপন্যাসে লেখকের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের, তার পুরো জীবনবোধের প্রতিচ্ছায়া পড়ে সেই প্রতিচ্ছায়ায় জীবনানন্দকে খুব মহান ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি রাখতে পারছি না।

তবু এই প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসে জীবনানন্দের জীবনবোধের পূর্ণবলয়টা প্রথম দৃষ্টিগোচর হলে মনে হয়েছিল জীবনানন্দের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন সহজতর হবে। মনে হয়েছিল যেহেতু সমকাল, বাস্তবজীবন ও যুক্তিবাদীচিত্ত উপন্যাসেই সবচেয়ে প্রকট হয়, তাই উপন্যাসের ঘটনার বর্ণনা ও ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার বাকপ্রতিমাও শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্যের গভীরে সহজে পৌঁছানো যাবে। সমাজ ও প্রেমচেতনার যৌনসম্পর্কের বিশ্লেষণ জীবনানন্দের মনোভাবনার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবে। এছাড়াও আরো অন্যান্য যেসব দিক আছে ডঃ অমলেন্দু বসু তাঁর ভূমিকার মধ্যে তার আভাস দিয়েছেন।

> 'ইদানীং বিশ্বসাহিত্যর অনেক খ্যাতনামা উপন্যাসের মতো 'মাল্যবান' মহাকাব্যের বিশাল বিস্তৃত পথে না গিয়ে সংহত জীবনচক্র অঙ্কিত করেছে এবং এই সীমিত চিত্রের মধ্যে আশ্চর্য শিল্পশক্তির প্রমাণ রেখেছে, চরিত্রায়নে, কথোপকথনে, কাহিনীর গতিতে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ এই উপন্যাসের প্রধান আঙ্গিকী কৃতিত্ব এবং এই কৃতিত্ব পরিচ্ছন্ন রচনাশৈলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উপন্যাসটিকে তার স্বাধীন নিজস্ব মূল্য দিয়েছে।'

জীবনানন্দ গত অর্ধ শতকের বিশিষ্টতম কবি। কিন্তু সে কবিত্ব জীবন-দৃষ্টির গভীরতার উপরে ততখানি নয়, যতখানি শিল্পচেতনার নিপুণ সিদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। জীবন দর্শনের যে ব্যাপ্তি ও উদাত্ততা আমরা মহান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রত্যাশা করি লিরিক কবির তা না থাকলেও আসে যায় না। তাই লিরিকের ছোট প্রাঙ্গণ পেরিয়ে যখন উপন্যাসের প্রশস্ত প্রান্তরে কোনো কবি এসে দাঁড়ান তাঁর জীবনদৃষ্টির সীমাবদ্ধতাটা স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়তে পারে। আত্মহৃদয়ের সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা নিয়েও, স্বেচ্ছামত বাস্তব

থেকে কবিত্বের সৌন্দর্যলোকে প্রয়াণের উপযোগী ভাষার আশ্চর্য আয়ুধ আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ যে টলষ্টয় নন, টুর্গেনিভ নন, ন্যুট হামসুন, জোহান বোয়ার নন, ডি. এইচ. লরেন্সের জৈব প্রাণোচ্ছলতা ও গুস্তাভ ফ্লবার জীবনবোধ কিছুই তাঁর নেই—এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না। মধ্যবিত্ত মানসিকতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে তাঁর উপন্যাসের বিফল নায়কের মতো ভীরু পায়ে অপ্রত্যাশিত অনাহুত তিনি বাংলা উপন্যাসের জগতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অক্ষম উপন্যাস সবদেশেই বহু লেখা হয়েছে, হয়—অনেকে সমকালে লোকচিত্তে স্থানও করে নেন। জীবনানন্দের উপন্যাস কিন্তু তেমন দু-একটি চিরাচরিত ব্যর্থ সৃষ্টি নয়। হলে আলোচনার কিছু থাকতো না। নানাদিক থেকে এ উপন্যাসখানি বিশিষ্ট। কিন্তু যাঁর ভিস্তাভিশান ক্যামেরা নিয়ে আসার কথা, তিনি তার বদলে দূরবীণও নয়—একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র এনে যেন হাজির হয়েছেন!

তবু কি হয়নি, কি হলে ভাল হতো তার বিশদ বিচার নিষ্প্রয়োজন, কি পাওয়া গেল তার আলোচনায় লাভ আছে। জীবনানন্দের আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্র পরিধি খুব ছোট। স্বামী, স্ত্রী এবং পার্শ্ব চরিত্র দু-একটি। অল্প চরিত্র নিলে উপন্যাস ঠিক প্রত্যাশিত ব্যাপ্তি পেতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু উপন্যাস, দেশী বিদেশী আরো বহু নামকরা লেখকের লেখায় এমনটি হতে দেখা যায়, অথচ অন্তর অনুভূতির ঐশ্বর্যে, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্ম টানা পোড়েনে এগুলি আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে এক একটি পদ্মরাগ মণির মতো।

মাল্যবান ও তার স্ত্রী উৎপলা—এক অসুখী দম্পতি, পরস্পরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। বিপরীত-মুখী মনোভঙ্গি নিয়ে এক সংসারেই তারা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। উৎপলা, স্বামীর প্রতি নির্মম, আক্রমণশীল, যৌন জীবনে প্রতিরোধ পরায়ণ। আর মাল্যবান ব্যক্তিত্বহীন, স্পর্শকাতর, স্ত্রীর প্রতিরোধের কাছে বিমূঢ় বিপন্ন, অথচ দেহগ্রন্থির আবেশে বারবার তার কাছেই অনুনয়শীল। উৎপলার এই নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, স্ব-বিরোধী যুক্তিজালে স্বামীকে বিতাড়িত করার সফল প্রয়াস এবং ভণ্ডামি, স্বামীকে আর্থিক ভাবে দোহন করার জন্য চতুর ছলনা বিস্তার এবং স্বার্থসিদ্ধির পর দুর্ব্যবহার ; অজ্ঞাতশীল আগন্তুকের কাছে কুলটার মতো আত্ম-সমর্পণ—উপন্যাসের একের পর এক পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণী ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে মাল্যবানের নির্বুদ্ধিতা ও আত্মসংগুপ্তি, ইতরসুলভ রঙ্গ এবং প্রতারিত হচ্ছে জেনেও নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তা, সর্বোপরি স্বামী স্ত্রীর এই নিরন্তর দ্বন্দ্বে শিশু-সন্তান মনুর দুর্দশা।

প্রশ্ন করা চলে, স্বামী-স্ত্রীর এই জটিল অস্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যক্ত করতে এতগুলি পরিচ্ছেদের, এতগুলি খণ্ড কাহিনীর আদৌ প্রয়োজন ছিল কি? আরো অল্প কথায় স্বল্প ঘটনায় এই পরিস্থিতি কি পাঠকের অনুভূতিবেদ্য করে তোলা যেতো না?

দ্বিতীয়তঃ উপন্যাসের মধ্যে ঘটনাস্রোত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চরিত্রদ্বয়ের কোনো অগ্রগতি দেখি না। মেজদার সপরিবার আবির্ভাবে, বড় বৌদির 'সংবাদ'-সংবাদে কিছুতেই এই অস্বাভাবিক দাম্পত্য পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না। এমনকি পরিশেষে

অমরেশের আবির্ভাবের পর উৎপলা যখন চারিত্রিক দিক থেকে স্খলিত ও দুর্বল বলে প্রতিভাত হচ্ছে তখনো বিপর্যয়ের মুখেও দাম্পত্য ব্যবহারের কোনো ইতর বিশেষ ঘটলো না এটাই আশ্চর্য।

তবু তা সম্ভবপরতার, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন। কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহিলা উৎপলার কথার মধ্যে এত অশ্লীলতা স্বাভাবিক কিনা। অথচ এই দুর্ভাগ্যজনক দাম্পত্য আড়াআড়ির চিত্রটা এত প্রত্যক্ষ, এত খুঁটিনাটি নিয়ে বিশদ যে মনে হয় এ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই বিষয়। তাঁর লেখার তন্নিষ্ঠ পাঠকদের এও মনে পড়তে প্যারে যে মাল্যবানের দুঃখ ও অভিজ্ঞতার সমান্তরাল ভাবনা তাঁর কিছু কিছু কবিতায় পাওয়া যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেম কবিতাগুলিতে 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'আকাশলীনা', 'সুদর্শনা'র 'আজ' (২), 'ফসলের দিনে' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

তাহলে মাল্যবানের এই বেদনা কি জীবনানন্দের ব্যক্তিগত কোনো বেদনার প্রমূর্তি! মাল্যবানের চরিত্রের সঙ্গে কবির বহির্বিমুখ, গৃহকাতর, স্পর্শাতুর, অতিসহনশীল চরিত্রের অনেকখানি সঙ্গতি আছে, তবু দুটিকে একাকার করে দেখা সঙ্গত নয়। যেহেতু যে কোনো রচনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে আপন অনুভূতির জারক-রসে তাকে জারিয়ে তুলতে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটাতে হয়, মরমী জীবনানন্দ অবশ্যই তা বুঝতেন। বিশেষত মাল্যবানের মত সম্বিত-প্রবাহমূলক উপন্যাসে। কিন্তু লেখকের সঙ্গে উপন্যাসের বিশেষ কোনো চরিত্রের একাত্মতাই উভয়কে অদ্বৈত করে দেয় না।

এক হিসাবে 'মাল্যবান' উপন্যাস লেখকের 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র কাহিনীর বিপরীত উপস্থাপন। শচী যেমন বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে প্রকাশের উপর নির্ভরশীল, উৎপলাও তেমনি। শচী যেমন স্মৃতির ক্ষণ আবেশে সোমেনের কাছে আত্মসমর্পিতা, উৎপলাও অমরেশের কাছে তেমনি সঙ্গীতের আবেশে? নাকি প্রবলতর ব্যক্তিত্বের অভিভবে। আবার 'ছায়ানটে'র নায়ক যেমন অন্তরের সব ঐশ্বর্য নিয়েও আগন্তুক-ডাক্তারের কাছে প্রেমের দ্বন্দ্বে পরাভূত, এখানে মাল্যবানও একই ভাবে পরাভূত হচ্ছে স্থূলচেতন অমরেশের কাছে। কেন পরাজিত হচ্ছে তারা? সৌন্দর্য-হীনতার জন্যে, সরলতা যা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর তার জন্যে, প্রবল দস্যুবৃত্তিপ্রবণ পৌরুষের অভাবে, কেন তার মীমাংসা দেন নি লেখক। এবং এর মীমাংসায় নারী চরিত্রের গহন রহস্য উন্মোচনের অপেক্ষা রাখে।

ডঃ অমলেন্দু বসু মাল্যবানের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন 'জীবনানন্দর কাব্যপাঠে যাঁদের চিত্ত অনুরণিত হয়েছে...তাঁরা এই গল্প ও উপন্যাসকে জীবনানন্দর কথা সাহিত্যিক, তাঁর সম্পূর্ণ অমেয় সৃজনী কর্মের অচ্ছেদ্য অংশ বলেই গণ্য করবেন। জীবনানন্দর এই উপন্যাসটিকে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই তাঁর কাব্যশিল্পের সূত্রে সমন্বিত করতে চাইব। তেমনটি যখন চাইব তখন এই কথাসাহিত্যে তাঁর কবিসত্তার অসংখ্য আভ্যন্তরীণ আভাস পাব। সে আভাস যেমন শব্দপ্রয়োগে, তেমন বাক্‌বিধিতে, বর্ণনায়, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। সে আভাস মূলত কবিত্বের আভাস, একটি সুপরিচিত কবিত্বশক্তির আভাস

এমন ভাষায়, এমন দৃষ্টিতে, এমন অনুভূতিতে (যা) একজনবিশেষ বাঙালী কবিরই সৃজনীশক্তির মোহর আঁকা।'

এ কথার সত্যতা প্রতীত হবে যখন তাঁর কবিতার পংক্তিগুলি তুলে তুলে তাঁর উপন্যাসের পংক্তিগুলির পাশাপাশি স্থাপন করতে পারবো। তার শব্দপ্রয়োগ ও বাক্‌বিধির বৈশিষ্ট্য এখানেও ধরে দেওয়া যাবে। সেই সব বাক্য ও বাক্যাংশ তুলে তুলে নির্দেশ করা যাবে যা কবিতাতেই চলে কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবান্তর ছিল—কিন্তু জীবনানন্দ ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করেন নি। অথচ এখন অনুভব করতে পারি এগুলি উপন্যাস থেকে কেটে বাদ দিলে উপন্যাসটি অতি সাধারণ এবং বিস্মৃতিযোগ্য মনে হতো।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশখানি উপন্যাস সম্পাদনা প্রসঙ্গে সমারসেট মম্ জানিয়েছিলেন সর্ব দেশের সব মহান ঔপন্যাসিকের মহত্তম দৃষ্টিতেও এমন কিছু কিছু দুর্বল অংশ থাকে যা আপন সৃষ্টির প্রতি মমতাবশে তাঁরা বর্জন করতে পারেননি, কিন্তু তা কেটে বাদ দিলে লেখা দুর্বল হয় না, বরং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের লেখাতেও এমন দুর্বলতা—আগেই উল্লেখ করেছি— যথেষ্ট আছে। ভাবীকালের প্রাজ্ঞ সম্পাদক কেউ এসে তেমন কবে অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে যদি কোনোদিন মাল্যবানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, তাহলে যে অংশটিই তিনি বর্জন করুন না কেন, জানি না সেই বর্জিত অংশটি স্বতন্ত্র, স্বসম্পূর্ণ কবিতা বা কবিতা পরম্পরা বলে গণ্য হবে কিনা।

প্রবন্ধ সাহিত্য
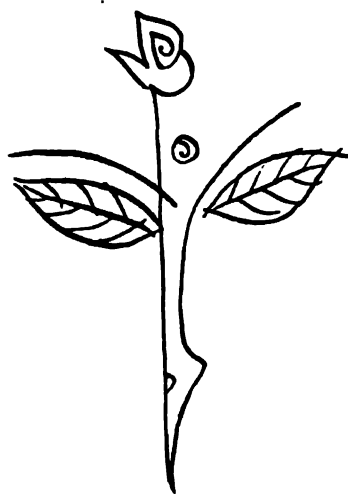
কবিতার কথা

জীবনানন্দের কবিসত্তার এক প্রসার যদি গল্পে উপন্যাসে, আর এক উৎসার তেমনি প্রবন্ধে সমালোচনায়। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে সিগনেট প্রেসের উদ্যোগে তাঁর প্রথম প্রবন্ধসংকলন 'কবিতার কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলিত ১৫টি রচনায় কবি কবিতার স্বরূপ এবং আধুনিক বাংলা কবিতা ও পাশ্চাত্য কবিতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও উপলব্ধির কথা বর্ণনা করেছিলেন। ১৩৪৫ থেকে ১৩৬০ অবধি সুদীর্ঘ ১৫ বছরে ছড়ানো এই সব প্রবন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার ইতস্ততঃ বিবর্তন ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারের অভিলষিত সাবলীল ভাষা ও সুবিন্যস্ত বিষয়বিন্যাস কুশলতা তাঁর প্রবন্ধে যদিও সুলভ নয়, তবু অনুভূতির সততা এবং কাব্যশিল্প সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট কবির স্বীয় ভাবনা-ধারণা, পছন্দ-অপছন্দের জন্য এই লেখাগুলি আধুনিক কাব্যপাঠক ও তত্ত্বজ্ঞদের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধ **'কবিতার কথা'** ১৩৪৫ সালের রচনা। জীবনানন্দ এতে কবিতা ও অকবিতার পার্থক্য নির্দেশ করে প্রকৃত কবিতার জন্মরহস্যে অনুসন্ধানী আলো ফেলার চেষ্টা করেছেন। কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। সমাজনীতি রাজনীতি বা মনস্তত্ত্বই হয়তো গভীর ও নিগূঢ়ভাবে কবিতার মর্মকোষে থেকে আরো দীপ্যমান করে তোলে কবিতাকে। কবিতা তবু সবার জন্যে নয়। যতদিন না সাধারণ মানুষ সুশিক্ষিত ও রসজ্ঞ হয়ে ওঠে ততদিন আপন প্রতিভার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কবিকে সৃষ্টি করে যেতে হবে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ সফল হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশায়।

'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটি ১৩৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পরেই রচিত। কোনো মহাকবিকে বুঝতে গেলে যে স্থির পরিপ্রেক্ষিত ও দূরত্বের প্রয়োজন, তার অভাব সত্ত্বেও জীবনানন্দ অভ্রান্তভাবে বলেছিলেন বহুযুগ ধরে পৃথিবীর কোনো দেশই এমন লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি। জীবনানন্দও অনুভব করেছেন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে তাঁর যুগ পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় বলে অপর কবিদের পক্ষে তাঁর পরিধি এড়িয়ে প্রকৃত কাব্য কিছু রচনা করা দুঃসাধ্য হয়।

আঙ্গিকের দিকে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার অক্ষমতা এবং মননধর্মের শোকাবহ অভাব সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে আধুনিকত্ব দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও ইতিহাসচেতনা এক সীমায় এসে মন্থর হয়ে গেছে একথা অনুভব করে আধুনিক কবিরা সমাজ ও ঐতিহ্য বোধে আশ্রয় নিয়েছেন। এ জিনিস রবীন্দ্র কাব্যে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এর দিকে গুরুত্ব দেননি। এই ব্যতিরেকীগতির জন্য আধুনিক কবিতার চিন্তা ও ভাষা পৃথক পথে চলেছে। আধুনিক কবিতা মোটাচাল এবং গদ্যছন্দে চলে এ ধারণা ভুল। সূক্ষ্মসুরের আধুনিক

কবিতা রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে গভীর সংঘর্ষে লিপ্ত। এইসব বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতার ভাবনা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে সৃষ্টি রহস্যের নূতনতর অর্থসন্ধানে ব্যস্ত। লোকায়ত জীবনদর্শনবাদী এইসব কবির মধ্যে মাত্র দু-একজনের মুষ্টিমেয় কবিতায় বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববোধ সফল অভিব্যক্তি পেয়েছে।

আধুনিক এইসব কবি দিব্যানুভূতির বিরোধী। অন্যায়ের প্রতিরোধে তাঁদের শ্লেষাত্মক ও উন্মোচনী প্রতিভা নিয়োজিত। রাবীন্দ্রিক শুদ্ধ আবেগের পরিবর্তে এঁদের রচনা মননজীবী ও রসবিমুখ। এঁদের কবিতার বেশি বেদনা, বেশি চেতনারই পরিচায়ক। ফরাসী প্রতীকী কবিদের অথবা ইয়েটস এলিয়ট পাউণ্ডের মনন বিচিত্রার কাছে এঁরা ঋণী। আধুনিকদের এক পক্ষ মনে করেছিল এলিয়টের 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড'ই যুগের প্রতিবিম্ব। তা সত্য, তবু এই বিশেষ সময়চিহ্নের ছাপ কালক্রমে ফিকে হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ—তিনি গণ-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ; বুর্জোয়া, আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাসী। কাব্য যদি কবিমনের সততা প্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা প্রতিভার সন্তান হয়, তবে আধ্যাত্মিকতা মারাত্মক দোষ নয়—বরং শূন্যবাদের চেয়ে জীবনীশক্তি সম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতায় লালিত হয়েও সেই সভ্যতারই প্রধান সমালোচক। পাউণ্ড এলিয়টও বুর্জোয়া সভ্যতার জীব, এলিয়টও আধ্যাত্মিক। জ্ঞাতসারে বিস্রস্ত হতে দিলেও আধুনিক কবিদের এক উৎকৃষ্ট পক্ষের অবচেতনায় রবীন্দ্র কাব্যই অনুভাবিত হয়েছে।

ভাব ও চিন্তা বৈষম্যের হেঁয়ালিতে পড়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার দেদীপ্যমান ছাপ। ইতিহাস ও সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার দোষ অতিক্রম করে প্রয়োগ প্রতিভায় যদি কোনো ইঙ্গিতের দিব্যতা কবিতায় না মেলে তবে সেই শ্লেষ বা ধ্বংস কিম্বা গঠনমূলক প্রচার প্রবন্ধকে কাব্যসৃষ্টি বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তর্গ্রথিত করে কাব্য রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তীদের মধ্যেও এমনি ঐতিহ্যচেতন নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বন্দ্বের থেকে উন্মেষিত সার্থকপ্রায় বা সফল কিছু কবিতা সৃষ্ট হচ্ছে। আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলছেন না বরং তাঁকে কেন্দ্র করেই নূতন বৃত্ত রচনায় ব্যাপ্ত রয়েছেন।

১৩৫১ সালে রচিত হয় 'মাত্রা চেতনা'। কবিতার সৃষ্টিশেষে কবির কাছেই ধরা পড়ে তার সফলতা বিফলতা। কবিতা-সৃষ্টির মুহূর্তে লাভালাভের প্রশ্ন, পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় হবে কিনা এসব প্রশ্ন গৌণ হয়ে যায়। ঐকান্তিক চেষ্টা থাকে শুধু কবিতাটিকে সৎ ও সার্থক করে তোলায়। কবিতা কবির ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশের এক মহৎ মাধ্যম। কবি মানসের প্রমত্ততা তাকে অস্পষ্ট করে তুললেও জনসাধারণের কাছে স্পষ্টতার দাবি কোনো কবিই উপলব্ধিই না করে পারেননি। তাঁর চেতনার গভীরে সেই দাবি তাঁর প্রতিভাকে যথাসম্ভব পরার্থপর করে তুলতে সাহায্য করছে।

কবিতা যদি শুধু কবির কাছেই বোধ্য হয়ে থাকে তবে সন্দেহ স্বাভাবিক কবি সমাজ ও ইতিহাসধারাকে মর্মস্থ করতে পেরেছেন কিনা। বর্তমান যুগই অস্পষ্ট ও অন্তঃসারহীন—এই সদুত্তরেও পাঠক-সমাজ শান্ত হবে না। এই শান্তি পেতে হলে কবিতায় ও জীবনে মাত্রাচেতনায় পৌঁছাতে হবে। (এই বইয়ের ভূমিকায় ডঃ অমলেন্দু বসু 'মাত্রাচেতনা' শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন 'শুভবুদ্ধির আদর্শ' বলে।) কবিতা পড়ে মূল্যচেতনা বাড়বার কথা।

এসবের পরিণামে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে, কবি জনপ্রিয় হন। কবির আপন অভিজ্ঞতা কবিতাতে পরিবেশিত হলেও তা সার্বিক হলো কিনা, নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায় সকলকে দীক্ষিত করা গেল কিনা তা কবিকেই দেখতে হবে।

অপরপক্ষে কবিতা স্পষ্ট করতেই হবে এ সংকল্পে কবিতা উৎরোবে না। কবির অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে স্থাপন করতে, প্রত্যয়কে সুস্থিরতা দিতে গিয়ে কবি সবচেয়ে স্পষ্ট করে অন্যকে জানানোর আগে আপন ব্যক্তি-পুরুষকে দেখাবেন। এইভাবে লেখা হলে কবিতায় প্রশান্তি আসে। কবিতা অনন্য সাধারণ হয়েও সাধারণের বোধগম্য হয়। অনেক কবি এসব জেনেও নিজেদের সংস্কারমুক্ত দেখানোর লোভে না জানার ভান করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যমূলক রচনার পাশাপাশি তাঁদেরই কিছু প্রকৃত কবিতা তবু জাজ্জ্বল্যমান হয়ে আছে।

কবিতা যে অমেয় পরিধি থেকে রূপ নেয়—তাতে আকাশও আছে, পাতালও আছে, প্রধানত আছে পৃথিবী, মানুষ। যে পথে কবিতা চলছে সেই পথেই একদিন ভাবীকালের কবিতা সুরসাম্য লাভ করবে। তাতে ভাষার প্রসাদও থাকবে মনে হয়।

১৩৫১ সালে **'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য'** প্রবন্ধটি লেখা হয়। কবিতা যে 'মেমোরেবল স্পিচ' অডেনের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন জীবনানন্দ সংজ্ঞার অতিব্যাপ্তির যুক্তিতে। সমাজচেতনা, ইতিহাসচেতনা ও পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান কবিতাতে অন্তর্লীন থাকতে পারে কিন্তু একে নিয়ন্ত্রিত করবে, রূপ দেবে ভাবপ্রতিভা। কবিতা অবিস্মরণীয় বাণীই বটে, কিন্তু স্মরণীয় উক্তি নয়। পুরানো শব্দই ধ্বনি ও চিন্তার মর্যাদায় নূতন অর্থ লাভ করে অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। আধুনিক দেশী-বিদেশী কবির লেখা থেকে দৃষ্টান্ত তুলে জীবনানন্দ দেখিয়েছেন এদের বিশেষ কবিতা স্মরণীয় বাণী বা স্মরণযোগ্য বাক্যের সমষ্টি মাত্র, হয়তো নিছক গদ্যধর্মী। স্মরণীয় যা তা সব সময়ে মনে নাও থাকতে পারে, যা অবিস্মরণীয় তা থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাব থেকে সচেতন মুক্তিপ্রয়াস নিয়ে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত তা আজ অপ্রাসঙ্গিক। একালের কবিদের রচনায় বচন স্মরণীয়তা বেশি বলে তাতে কবিতার গুণ কম। রবীন্দ্র-কাব্যের মতো মহাকালের উৎসঙ্গে তা লুটিয়ে নেই—তা আজকের জন্যেই। তবু কিছু কবি আছেন যাদের পরিণতি এই খণ্ড কালের সময়ানুভূতিকে অতিক্রম করে যাবে। অমিয় চক্রবর্তী আঙ্গিকের বিচিত্র আবহের ভিতর দিয়ে জীবনের অনুধ্যান ফুটিয়ে তুলেছেন? বুদ্ধদেবের কবিতার বহিঃপ্রসাধন স্তিমিত করেছে কি তার ভিতরের বহ্নি?—না সত্য তার বিপরীত? তিনি দর্শনভীরু হলেও তাঁর কবিতায় অস্তিবাদী জীবন দর্শন আছে। সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও আন্তরিকতা একান্তভাবে তাঁরই। এ রকম আত্মপ্রসাদহীন সংযম দুর্লভ, তিনি আধুনিক বাংলা কবিতায় সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা। প্রেমেন্দ্র ঐতিহ্যবাদী, তাঁর কবিতা পরিণতিহীন, চিরনবীন। তাঁর শিল্পপ্রেরণা ও জীবনচেতনা বিচিত্র এবং কখনো কখনো মহৎ। প্রেমেন ও নজরুলের কাব্যাত্মা গত দু-দশককে বেশি আকর্ষণ করেছিল এখন দশকের সীমা ভেঙে পড়ছে। কাল অনেককে প্রবীণ করেছে, অনেকে প্রবীণতার ভান করেন, কেউ কেউ অন্যের উক্তির মাহাত্ম্যে প্রবীণ, কাব্যশক্তিতে নয়, কেউ উপেক্ষিত—মহাকাল তাকে প্রবীণ বলবে। যেন প্রবীণতাই সাহিত্যের আরাধ্য। কিন্তু জীবনের প্রবীণতাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার উপযুক্ত প্রজ্ঞা ও ভাবপ্রতিভার অভাব বড় বেশি।

'কল্লোলে'র উল্লেখযোগ্য সব কবিই জীবিত ও সৃষ্টিশীল। এমন দু-তিন দশক চললে একক রবীন্দ্রনাথের অভাব অনুভূত হবে না। রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র প্রভাব পর্বের পরে এই 'কবি সাধারণ সংঘ' সাহিত্যের কাছে সময়ের দান।

১৩৫৩ সালে রচিত **'কবিতা প্রসঙ্গে'** প্রবন্ধে লেখক বলেন, কবিতা লিখতে অন্তঃপ্রেরণার প্রয়োজন। বুদ্ধির মতোই সকলের কল্পনাপ্রতিভাও সমান হয় না। কল্পনা প্রতিভার উপরই কাব্যসৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা নির্ভরশীল। ইতিহাস-চেতনায় সুগঠিত শুদ্ধতর্কের ইঙ্গিত কবিকে বুঝতে হবে। ভালো কবিতা লেখা তাই মুহূর্তের ব্যাপার নয়—কখনো হয়তো কবিতার কাঠামোটি বা সম্পূর্ণ কবিতাটি লেখা হলো, তারপর আবার কল্পনা-প্রতিভার আশ্রয়ে শুদ্ধ-প্রতর্কের আবির্ভাবে তার দ্বিজত্ব ঘটে। কবিতার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গকে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস করে তোলে, তাতে বিশেষ ছত্রের দাম ক্ষুণ্ণ হলেও নক্সাটার উজ্জ্বলতা বাড়ে। এমন ঐকান্তিক কবিতা সুলভ নয় নানা কারণে।

প্রকৃতি, মানব সমাজ ও সময়—লিরিক কবি এই ত্রিভুবন-চারী। উপন্যাসে নাটকে প্রাধান্য মানবসমাজের। কিন্তু কবিতায় কেউ একক ভাবে প্রাধান্য পায় না। কিছুই চরম নয় কবিতার ক্ষেত্রে। আপন শুদ্ধ সত্তার মুকুরে বাস্তবকে প্রতিফলিত করে নূতন কাব্যলোক গড়ে তুলতে হয় কবিকে। ফলে বাস্তব ও বাক্যের জগতে যে সেতু গড়ে ওঠে তা কারো মতে পাঠকদের পরিনির্মাণে, কারো মতে সমাজ পুনর্গঠনে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে।

কবিতার প্রয়োজনে সাময়িকভাবে কবিকে কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করতে হতে পারে। আধুনিক ইতিহাসের ইঙ্গিত এই অস্থায়ী পরমার্থকে নির্দেশ করে। সময় প্রকৃতির পটভূমিকা. জীবনের সম্ভাবনা বিচার করে এই চরমকে যাচিয়ে নেওয়া দরকার।

'কবিতার আত্মা ও শরীর' ১৩৫৪ সালের রচনা। নিছক বুদ্ধি দিয়ে কবিতা লেখা যায় না। আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলনে কবিমানসের আবহমানের অভিজ্ঞতার উপলব্ধি ঘটায় প্রেরণা। আজকের জটিল পৃথিবীতে প্রেরণার উৎস বহুমুখী, অবিজ্ঞানী অবিদ্যা পরিহার করে সৎসমাজের প্রবর্তনায় নিজেকে উদ্দীপিত করেন আধুনিক কবি। নবযুগের পরিবর্তিত মূল্যবোধ ছাড়া একালে সৎকবিতা সৃষ্টি সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের নিরিখে সুনিয়ন্ত্রিত আধুনিক কবিমন পূর্বজ কবিদের চেয়ে সংগত ও সমৃদ্ধ। এদের মনন পরিমণ্ডল মহত্তর কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। এই কাল সমাজ ও বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে কয়েকটি নূতন সত্য উদ্ভাবন করেছে, এসত্য অস্থায়ী হতেও পারে। তবু এই চলমান পটভূমির সঙ্গে একাত্ম আধুনিক কবিমন উত্তীর্ণ ছন্দের দ্যোতনায় সৃষ্টি করছে কবিতা।

যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পায় না। বিশিষ্ট আবেগ মুহূর্তের মধ্যে বিশেষ এক ছন্দকে নির্ণয় করে নেয়। ছন্দ অনেক রকম, গদ্যও এক রকম ছন্দ। বাংলা কবিতা ছন্দের মূল সুর হলো পয়ার। 'পয়ার' বলতে লেখক এক জাতের ছন্দ বোঝেন, ছন্দোবন্ধ নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার এক বিশেষত্ব ২২, ২৬ বা তার চেয়েও দীর্ঘতর মাত্রার পংক্তি সমাবেশ। অন্য কোনো ছন্দ এখনো বাংলা কবিতার প্রাণ বা আত্মার গহনতা আত্মস্থ করতে পারেনি।

আধুনিক কবিরা যতিপ্রান্তিকতার বদলে প্রবহমানতাই বেশি পছন্দ করেন। মুক্তক পয়ার, মুক্তক স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত মুক্তকেও লেখেন। একালের প্রাণের কথা যেমন সংহতি

খুঁজছে, তেমনি সমাজ ও জীবনের বন্দীত্ব অতিক্রম করে অমেয়তায় ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। তবু মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে বা স্বরবৃত্তের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আধুনিক কবির তেমন উৎসাহ নেই। আজকের অব্যবস্থিত জীবনের মহানাটককে মহাকবিতায় উত্তরিত করার সাধনাতেই কি একালের কবিরা শেক্সপিয়রীয় অমিত্রাক্ষর মহাপয়ার বেছে নিতে চাইছেন?

পরের প্রবন্ধ **'কি হিসেবে শাশ্বত'** লেখা হয় ১৩৫৫ সালে। প্রাচীন গ্রন্থ মহাভারত ও ইলিয়াডের মতো যে বইগুলি আজো বেঁচে আছে তা প্রকৃত পক্ষে সরাসরি আমাদের পড়া নেই—ঢের আধুনিকতর নানা রচনা থেকে আমরা এর জ্ঞান আহরণ করেছি। সাম্প্রতিক চার পাঁচশ বছরের দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও চিন্তাবলয় বরং আরো বেশি সঞ্জীবিত ও সক্রিয়।

মহাভারত তার যুগকে ধারণ করেছিল, পথ নির্দেশ দিয়েছিল, গল্পবলার মর্মস্পর্শী অসাধারণত্ব দেখিয়েছিল। আজ হাজার হাজার বছর পরে আমাদের কালকে ঘিরে আমরা নূতন মহাভারতের স্বাদ পাচ্ছি। মহাভারত পড়া থাকায় এ কালের আনুপূর্বিকতাকে উত্তম এক বিধানের মধ্যে গ্রথিত করে নেওয়া সহজ হয়েছে। মৌল পরিবর্তনও ঘটেছে অনেক, দৈব নির্ভরতা লুপ্ত হয়েছে, জীবন লোকায়ত হচ্ছে, বিজ্ঞানের প্রসাদে আত্মনির্ভরশীল মানুষের সমস্যা মোচন হচ্ছে। আদি মহাভারতের জীবন প্রশ্ন এবং তার দিব্য সমাধান এখন অচল। তবু গল্প বলাব সেই সফল বৃহৎ অনিমেষ পদ্ধতির জন্য, জীবনের কয়েকটা দিকের মর্মার্থ বোঝার জন্য বারবার আদি মহাভারতের কাছে ফিরে ফিরে যেতে হবে। আজ আর একমাত্র পরিচ্ছন্ন দিগ্‌নিরূপক অন্তিম গ্রন্থ হিসাবে মহাভারত বিবেচিত হবে না। কেননা অনেক সময়সন্ধির ভাঙাগড়ায় সেই যুগ চেতনা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মহাভারত থেকে গল্প, রূপক টেনে এনে ব্যবহার করছি আমরা, করবোও। তবু জ্ঞান ধর্ম ও সাহিত্যের একমাত্র সারাৎসার গ্রন্থ আর মহাভারত নয়। কেননা এযুগের বড় সাহিত্যিকদের লেখা নিজস্ব মহাভারত আদি মহাভারতের চেয়ে অনেক বেশি নিকট এবং উজ্জ্বল।

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' যেমন বহু প্রশংসিত কিন্তু অপঠিত, মহাভারতও তাই। প্রকৃত অর্থে পৃথিবীর কোনো বই-ই শাশ্বত হতে পারে না। এক এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অমর সংসদে চলে যান বটে কিন্তু তাঁর বইয়ের আবেদন ক্রমে রসিকদের কাছেও কমে আসে। দান্তের চেয়ে মহাভারত অনেক বেশি ব্যাপক ও লোকায়ত, তবু তার পাঠক সংখ্যা বেশি নয়। অনেকে কাশীদাসী মহাভারত পড়ে, না বুঝে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। ভালো অনুবাদ, সুলভ দাম ও সুন্দর বিজ্ঞাপনের অভাবের জন্যও মহাভারতের পঠন-পাঠন কম। সময় এবং রুচিও কমে গেছে মানুষের। তবু তার চেয়েও বড় কথা আমাদের ধারা ধারণাকে, কোন অলৌকিক নয়, সত্য পথনির্দেশ মহাভারত করতে পারে না। তাই এই শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ অপঠিত থেকে যাচ্ছে। দান্তে আমাদের কাছে নিকটতর কালের হলেও দান্তের উপলব্ধির শাশ্বত জিনিসে মরচে ধরেছে অনেক দিন, একই কারণে। একালের লেখকদের আকর্ষণীয় বই হাতে থাকতে দান্তের অব্যয় আলোর স্পর্শ নিতে কেউ রাজি নয়। শেক্সপিয়রও অমর, তবু তাঁর পরে দ্বিতীয় কোনো শেক্সপিয়র এসে দাঁড়ান নি বলে শেক্সপিয়র অনেকেই পড়ে। আধুনিক কালের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে এমন উপলব্ধি শেক্সপিয়রে বেশি বলে তাঁর লেখা বেশি দিন পড়া হবে মনে হয়।

'**কবিতা পাঠ**' লেখা হয়েছিল ১৩৫৬ সালে। ভালো কবিতা পড়লে অনুভব করা যায় হৃদ্য জিনিসের স্পর্শে এসেছি। আমাদের পুরানো নানা অভিজ্ঞতা কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি এসে যায়। কবিতাটি স্মারক আঙুলের মতো তাদের জাগিয়ে দিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তার মর্মার্থ বাড়িয়ে দেয়। ভালো কবিতা পড়ে অভিজ্ঞতার এক বিশৃঙ্খল উপেক্ষিত অংশে সম্বিত এলো, গোছানো হতে লাগল সব, কবি যা দেখাতে চাচ্ছে মনশ্চক্ষে, তার অনেকখানিই দেখলাম, আনন্দ পেলাম। সৎকবিতা পাঠকের কাছে সুস্থিরতা ও অভিনিবেশ দাবি করে, তার অভিজ্ঞতা ও মূল্যচেতনা বুঝে নিতে চায়। ছন্দ মানুষের জন্মকালীন। তারপরে কবিতা এলো। মানুষের মৃত্যু অবধি কবিতা থেকে যাবে মনে হয়। দেশ কাল ও সন্ততির ব্যাপ্তিতে গ্রথিত গভীর সব কবিতা পড়ে, আমাদের সামাজিক অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন হয়। আরো কিছু বাড়তি লাভ করি যা ইতিহাস বা সময়ের নিরঞ্জনের ভিতরে এখনো মেলেনি।

এদেশে কবিতার পাঠক খুব কম, বাড়বে মনে হচ্ছে। পাঠকদেরও রুচি দৃষ্টিসিদ্ধি সমান নয়। তবু একই যুগের বোদ্ধা পাঠকরা কবিতা পড়ে যে অব্যর্থ স্বাদ পায়, অন্য যুগে ততখানি পাওয়া সম্ভব নয়। উনিশ শতকের একজন সার্থক পাঠক শুধু যে আধুনিক কবিতা পড়ে বুঝবে না তাই নয়, এর প্রাণবস্তু সম্পর্কেও সন্দিহান হতে পারে। কবিতার ভাষা রীতি প্রকরণ সবই আমূল রূপান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং আজকের পাঠককে ক্রমাগত দীক্ষিত হতে হবে। একটি অনশ্বর কবিতার ভিন্ন ভিন্ন মানে বেরুবে একই বা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের মনের বিভিন্ন অবস্থায়, অর্থ অস্বচ্ছ হলে ধ্বনিগুণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে। এই সব ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌঁছানো চাই। সমাজ চেতন বা ইতিহাস চেতন—এই সবের বিচারে বোঝা যায় না রচনাতে কবিতার অনিমেষ স্বভাব বা সম্পন্নতা এলো কিনা। ইতিহাস চেতনা সমাজচেতনার দরকার আছে, কিন্তু তা কাব্যধর্মের অনুগত হয়েই আসবে।

অনেক কবিতা আছে, বিশেষ এক যুগে জন্ম হলেও তা চিরকালের কবিতা। চিরন্তন মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতি তাতে প্রতিফলিত হয়। সমাজ, মানুষ, প্রেম, প্রকৃতি বা আধুনিক সমস্যা যা কিছুই অবলম্বন করে কবিতা লেখা হোক তা অনুভূতিবেদ্য হয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির আরো দৃষ্টিসাধনার প্রয়োজন।

বাংলা কবিতার ভালো অতীত ও বর্তমান রয়েছে। মনে হয় ভবিষ্যতেও সব দেশের সৎ কবিতার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে বাংলা কবিতাও থাকবে, কখনো ভিড়ে চাপা কখনো আলোকোজ্জ্বল হবে। বাংলা আধুনিক কবিতার অধ্যয়ন ও আলোচনায় একালের ছাপ পড়বে বলে ক্রমে ক্রমে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি আসবে—আলোচনার শুদ্ধতাও। মানুষের হৃদয় না বদলালেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়, সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়ে নূতনভাবে। এই নূতন কালের অনাগত ভবিষ্যতের রূপরেখা অস্বচ্ছ হলেও ধ্যান ও বিচারের মাধ্যমে তাকে স্পষ্ট ও আয়ত্ত করতে হবে—তা হলে বোঝা যাবে এযুগের কাব্য থেকে কি মুছে যাচ্ছে, কি টিকে থাকবে।

পরবর্তী প্রবন্ধ '**দেশ কাল ও কবিতা**' ঐ বছরেরই রচনা। কবিতা যেহেতু বিশেষ কোনো দেশের বা যুগের নয়—তাই তার আলোচনায় কোনো গাণিতিক শুদ্ধি আশা করা যায়

না। কোনো লোকের পক্ষেই যাবতীয় কবিতা পড়ে দেখা সম্ভব নয়। তবু যত বেশি দেশের বিচিত্র কবিতা সমালোচকের পড়া থাকবে তত স্পষ্ট আয়ত গভীর আলোচনা তার পক্ষে সহজ হবে। উদার, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে, প্রাক্‌পরিগৃহীত কোনো ধারণা না রেখে কবিতা পড়লে সুজাত সমালোচকের বোধ জ্ঞানে পরিণত হবে। কবিতার ভালোমন্দ নির্ণয়ের সহজাত বোধ বিশ্লেষণ, অনুশীলন ও ব্যাপক কবিতাপাঠ সমালোচককে দক্ষ করে তোলে।

এদেশে পূর্বজ প্রধান কবিদের সব লেখাও কিনতে বা লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করতে পারা যায় না। তবু আলাওল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত কালের ভালো কবিতা সমালোচকের পড়া দরকার, সংস্কৃত কবিতার পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্ট বোধ এবং ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার—সমালোচকের বুনিয়াদ শক্ত করবে। ফরাসি, গ্রিক এবং সমস্ত প্রধান ইউরোপীয় কবিতাই ইংরেজি অনুবাদে পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার কবিতা থেকে তুলনায় লাভবান হওয়া কঠিন। ঢের বেশি কবিতা পড়া চাই, অন্তত নানা প্রামাণ্য সংকলনের ভিতর দিয়ে নানা দেশের সার্থক রচনার অন্তরে প্রবেশ করা দরকার।

সমালোচনার স্বভাবভিত্তি কোনো কোনো পাঠকের আছে। কম পড়েও তারা পৃথিবীর সমগ্র কবিতার অক্ষর স্বাদ, প্রতিটি কবিতার স্বতন্ত্র স্বাদ, বিভিন্ন দশক ও শতকের কবিতার স্বভাবধর্মকে অনুভব করতে পারে। কবিতার দেশ কাল ও তাৎপর্য তাদের কাছে ব্যক্ত হয়। তবু এই প্রাথমিক স্বভাব থেকে ক্রমে ক্রমে উপরের স্তরভূমিতে উঠে এলে তবেই সৎকাব্যের দোষত্রুটি, পাঠকচিত্তের রুচি পরিবর্তন এবং সমালোচকদের কাব্যের মীমাংসার রূপান্তরের হেতু প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের পরিসর সাপেক্ষ উত্তর দিতে পারা যাবে। নিজের যুগ ছাড়িয়ে অন্য যুগের অনুভূতি উপলব্ধির স্বভাব ক্ষমতা বিস্তারিত কাব্য পাঠের সুফল এনে দিতে পারে। যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রকৃতি এবং সমালোচনার তত্ত্বের বিবর্তন ঘটেছে। তাই প্রত্যক্ষ ও সামগ্রিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

শাশ্বত কবিতার মতো সমালোচনাও শাশ্বত হতে পারে। তবু এক এক যুগে এক এক দিকে ঝোঁক পড়ে বেশি। বড় সমালোচককে একথা অনুভব করে সাবধান হতে হবে। অক্ষর কবিতা আছে কিন্তু তা ব্রহ্মের মতো অব্যয় নয়। এ সব অনুভব করে বিভিন্ন যুগ প্রবণতা দোষ গুণ দাবি ও সার্থকতা বিচার করে কবিদের যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিটি যুগের বিশেষত্ব ও আতিশয্য সম্পর্কে সচেতন থেকে অগ্রসর হলে স্বাভাবিক ও মহৎ কবিতার এক নূতন যুগ জন্ম নিতে পারে।

'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা' প্রবন্ধটি ও ১৩৫৬ সালের সৃষ্টি। প্রাচীন মানুষের অলৌকিক নানা বিশ্বাস লুপ্ত হয়েছে বহুকাল। পরলোক, আত্মা, আত্মার অমরত্ব, ধর্ম, ব্রহ্ম ইত্যাদিতে এখন আস্থা অটুট থাকছে না। এই শূন্যতাটা ক্রমে ভরে উঠছে বিজ্ঞানে আস্থা দিয়ে। কিন্তু যুক্তি স্বচ্ছতা অতিক্রম করে মানুষ কি আবেগ-ঘনিল হয়ে উঠছে?

দর্শনের জায়গাটা ক্রমেই বিজ্ঞানের দখলে আসছে। ফলে এক বিরাট ভাববিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। যুক্তিসিদ্ধ নিঃশ্রেয়সের জন্য এই বিপ্লব। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে ঘটবে।

গত চার হাজার বছরে মানুষের সমাজে খারাপ কিছু না হলেও বেশি সততার দিকে

হৃদয়ের মোড় ঘোরেনি। সুতরাং সমাজের ভালো কি আরোপিত হবে, না শুভ বুদ্ধিজাত হবে? আরোপিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। এ সমস্যার সমাধান দর্শন দিতে পারেনি, বিজ্ঞানও পারছে না। তবু জগতের কল্যাণমূলক সত্য বিজ্ঞানই বেশি আয়ত্ত করতে পারবে। বিজ্ঞানের নিজস্বভাবে কোনো দোষ না থাকলেও ব্যবহারকারীদের দোষে তার ফল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ছাড়া কি মানুষের কল্যাণের অন্যপথ কিছু নেই?

কবিতা কোনো বিজ্ঞান-প্রামাণ্য পথে রচিত হয় না। কবিতা রচনার নানা উপকরণ আছে বটে কিন্তু ল্যাবরেটরিতে যেভাবে কিছু উৎপন্ন হয় সেভাবে কবিতা গড়ে ওঠে না। একটা স্থির ক্রমিক অব্যর্থতার বশে ঠিক প্রয়োজনীয় উপকরণটিই কবির চিত্তে আবির্ভূত হয়। যেভাবে কবিচিত্তে কবিতার সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঠিক সেই ভাবেই বিজ্ঞানের সত্যও বিজ্ঞানীর চিত্ত গহনে আবির্ভূত হতে পারে ; কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করা গাণিতিক যুক্তি-সাপেক্ষ। কিন্তু গাণিতিক যুক্তি নেই বলে কবিতা অসত্য হলো না। তাকে গ্রহণ ও বিচার করবে সহৃদয় পাঠক-চিত্ত। কাব্যের সত্য বিজ্ঞানের সত্যের সমান্তরাল। ধর্ম এখনো দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু তার সত্যগুলো এক এক করে ভুল প্রমাণ হয়ে বিজ্ঞানের আয়ত্তে চলে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ ধর্মকে আরো নিয়ন্ত্রিত করে নিলে তা কবিতার সঙ্গে বিপজ্জনক একাত্ম হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা না করাই ভালো, তা ধর্মেরও আকাঙ্ক্ষিত নয়। কবিতাতেও আপ্ত বাক্যের স্থান নেই। দর্শন ও ধর্মের নিকটতর ছিল কবিতা। ধর্মের সংস্কার ও অনুভূতি. দর্শনের মানুষ ও নিসর্গজনিত সত্য তার উপাদান ছিল। আজ এবিষয়ে কাব্য বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। যুক্তি রীতির উপায়ে শুদ্ধ হয়ে ধর্ম যদি ফিরে আসে তবে তার নাম ও রূপের বদল হবে নিশ্চয়। ধর্মের আসন্ন মৃত্যুতে কেউ কেউ নিঃসহায়। কিন্তু কবিতার মৃত্যু হয়নি। তবু বিজ্ঞানের মতো কবিতাতেও এইসব লোকের কোনো আশ্রয় নেই। বিজ্ঞান প্রদত্ত দ্বিতীয় সত্যের পাশাপাশি যারা কবিতার প্রথম সত্য অনুভব করে তারা কবিতায় আনন্দ পাবে। ধর্ম এদের ঢের বেশি সান্ত্বনা ও সিদ্ধি, বীতকাম করে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ আর সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু এখনো কবিতা এক জাতের আনন্দ ও প্রশান্তি দিতে পারে মানবচিত্তকে।

যে আগামী বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে তা ঘটলে কবিতা কি আরো সপ্রতিভ, আরো মহান হবে? বিপ্লবোত্তর দেশে দেখা যায় উচ্ছ্বাস আধিক্যে সুসাহিত্য লেখা হলেও বৃহৎ মহান সাহিত্য-সৃষ্টি দুরূহ হয়। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরিমিতি প্রসার ও গভীরতা নিয়ে কবির কাজ। অতি অবিশ্বাসে আধুনিক সাহিত্যের অনেক সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে, আশ্বাসের অতি সাচ্ছল্যে খারাপ হবার সম্ভাবনা আরো বেশি।

১৩৫৬ সালের চতুর্থ প্রবন্ধ হলো 'রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা'। উপনিষদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত রচিত দেশী বিদেশী অজস্র কবিতার অধিকাংশই ছাপাতে টিকে থাকলেও মন থেকে মুছে গেছে ; যা আছে তাও যাবে কালক্রমে, অতি অল্পই অনেকদিন স্থায়ী হবে। মানুষের স্বভাব-নিহিত মঙ্গল-প্রেরণা আছে বলেই বইগুলো মানুষের রুচি ও জ্ঞানের আকর হতে চেষ্টা করেছে। মহান কবিতা তাই সততা ও শুদ্ধতার সহায়ক শক্তি। দর্শনে ব্রহ্ম সম্পর্কিত চিন্তার বিবর্তন এবং পরিশেষে বিনাশ হয়েছে। বিন্দুতে সিন্ধু আছে একথা ধরে

না নিলে কবিতা ব্রহ্মের চেয়ে ঢের অল্পপরিসরের জিনিস। তবু তেমন গভীর কাব্যও আছে, তার আস্বাদের উপযোগী মনও আছে। তবু তা দার্শনিক চিন্তা বিচারের চেয়ে ছোট পরিসরের বিষয়। ব্রহ্মাণ্ড চেতনা মানুষের জন্ম মৃত্যুর চেয়েও পরিব্যক্ত। কোনো দার্শনিক বা চিন্তাবিদের রচনায় তার শেষ কথা উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু কবিতার পরিসর সাধারণত মানব কালের এক ছোট খণ্ডাংশ নিয়ে। তার স্বরূপ নির্ণয়েও আলোচককে এত অন্ধকার হাতড়াতে হয় না।

কবিতা সম্পর্কিত ধারণার যুগে যুগে বিবর্তন হয়েছে। প্রাচীনরা কবিতা সম্পর্কে পৃথক পৃথক রকম চিন্তা করতেন। তবু মনের স্থায়ী পদার্থ বদলায়নি বলে সাহিত্যচিন্তার নানান্তরে ফলিত ব্যক্তিত্বের তারতম্যটুকু বুঝে কবিতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নেওয়া অসম্ভব নয়। অধিকাংশ আলোচক আগে আপন খণ্ড কালের নিজ লক্ষণকে বড় করে দেখেছেন, সেই ত্রুটি বুঝে নিতে হবে। কোলরিজই প্রথম সমালোচনায় আপন দেশ ও কালের পরিধির বাইরে ধ্যানের একটা মেধাবী সমাহিতির সাধনা করেছিলেন। তাঁর আলোচনা আর্নল্ড ও এলিয়েটের চেয়েও স্থিতধী ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। এদেশে যেমন বঙ্কিমের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় গভীরতা ও উত্তরণ বেশি। প্রমথ চৌধুরীর মতো আলোচকের লেখাতেও পৃথিবীর যাবতীয় কবিতার চেতনা না থাকায় সে আলোচনা নির্ভরযোগ্য নয়। কাব্য-ব্রহ্মাণ্ডের চেতনার ভিতরে ব্যক্তির বা খণ্ড কালের কবিতাকে সৎসমালোচনা মর্মগ্রথিত করে নেয়।

কারো আলোচনায় আবার নিজের রুচি প্রতিফলিত হয়েছে। নিজের পছন্দ মাফিক দেশকালের কবিতা ভিন্ন অন্য কিছুকেই তাঁরা স্বীকৃতি দেন না। এঁরা অধিকাংশই আপন ধরতাই সংস্কার ভালবেসে বা সমাজের হিত কামনা করে কবিতার বদলে কবিতার অব্যবস্থিত উপকরণকেই ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে যেতে চান। কবিতার প্রকৃতি নাশ করে তার বদলে কোনো রীতি দাঁড় করালে, কল্যাণ হবে না, চেতনার অন্তিম সিদ্ধির কয়েকটি স্তর লোপ পাবে। মর্মে কবিতা থাকা সত্ত্বেও সমাজের অনুভব শক্তি কম। এজন্য কবিতা নয়—সমাজকেই পরিবর্তিত করতে হবে। কবিতা বেশি দিন লোক-কবিতা হয়ে থাকবে না—সরলতা ও নির্দোষ সাচ্ছল্য যেহেতু সভ্যতাতে আর নেই, তাই একালের অভিজ্ঞ স্থিরতর কবিদের চিন্তাগভীর ও অন্তর্গভীর কবিতার উপলব্ধি আয়াসসাধ্য হবে।

ঐ বছরের পঞ্চম প্রবন্ধ **'কবিতার আলোচনা'**। কবিতার আলোচনায় অকবিরা পরিচ্ছন্নতা ও ভালো অন্তঃপ্রবেশ দেখালেও নির্ভরযোগ্য ও কুশল আলোচনার জন্য প্রতিটি যুগের কবিদের এগিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। আপন কবিতার আলোচনার তাগিদ কেউ কেউ অনুভব করেন। কবির একমাত্র তাগিদ—ভালো কবিতা লেখার, নিজের বোধিকে পরিতৃপ্ত করে লেখার তাগিদ। সে কবিতা যদি পাঠকরা অনুভব করতে না পারেন তবে কবি কি কবিতার শরীর ও তার ভিতরের বেদ সম্পর্কে পাঠককে বোঝাতে যাবেন, না কবিতা লেখা থামিয়ে দেবেন? কম কবিই এ বিষয়ে গদ্য লেখায় উৎসাহ বোধ করেছেন। সৎ কবির কাছে কবিতাই একমাত্র ভালবাসা ও দায়িত্বের জিনিস, সমালোচনা নয়। কালচেতনা ও কালোত্তর চেতনা সম্পর্কে শিক্ষিত কবিমন তাঁর স্বভাব-প্রতিভাকে প্রতিনিয়ত স্থির ও বিশুদ্ধ করে নিচ্ছে, ফলে এসবের যথাযথ দাবি মিটিয়ে কবিতার জন্ম হচ্ছে, সৎকবির স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমেই বদলাচ্ছে। পরের পর্যায়ের কবিতা সবসময়ে ভালো না হতে পারে কিন্তু আগের চেয়ে ভিন্ন

হয়ে যায়। কবির অগ্রসরণ মানে পর্বান্তরে গমন। কবি তাই সহজাত গুণকে ক্রমেই আরো শিক্ষিত ও পরিণতির পথে চালনা করবেন। সৎ কবিতামাত্রই স্বভাব কবিতা। তবু অভিজ্ঞতা বাড়ার ফলে তা উন্নততর সিদ্ধিতে পৌঁছায়। অভিজ্ঞতাকে কতদূর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পেরেছেন কবি সে অনুযায়ী কবিদের উৎকর্ষের ক্রম ঠিক করা যায়। এই তারতম্যের জন্য সকল কবিদের মধ্যেও কারো কবিতা চলনসই, কারো সুন্দর, কারো সৎ, কারো বা মহৎ। তবু কবিতার কাজ দর্শনের শিখরে পৌঁছানো না, মানুষের চেতনার কাছে পৌঁছানো।

অভিজ্ঞতা বাড়াতে গেলে কবি প্রতিভা কখনো বা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। বিশাল অভিজ্ঞতা মহৎভাবে শিক্ষিত কবির সংখ্যা তাই কম। অভিজ্ঞতা আসে জীবন আর গ্রন্থ থেকে। এ দুইয়ের সুষ্ঠু সন্নিবেশ দরকার।

লোকে কবির কবিতার সঙ্গতি অনুভব করতে না পারলেও কবি কি বিবেকের কাছে খাঁটি থেকে কবিতা লিখে যাবেন? বিদেশী সমালোচকরা কবিতার সৃষ্টিপ্রণালীর আশ্চর্য অন্তর্গূঢ় বিবরণ দিয়েছেন যদিও, তবু জীবনানন্দের মতে কবিতা সম্বন্ধে বড় সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত। তাঁদের লেখায় পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান থাকবে বেশি। পাণ্ডিত্যে অর্ধসত্য অনেক, জ্ঞান সত্যের নিকটতর। গত দশ পনেরো বছর কবিতার সমালোচনা যাদের হাতে অর্পিত ছিল তাদের বইপড়া পাণ্ডিত্য থাকলেও কবিতার ভাবলোকে বাস করার রুচি ও ক্ষমতা ছিল না। ফলে অপসমালোচনায় কবিতার ক্ষতি হয়েছে। আরো হতে পারে। উদ্ভিন্ন কবিদের সম্ভাবনা যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, পাঠকরা যাতে প্রকৃত কবিতা চিনে নিতে পারে—এজন্য কবির সমালোচনায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন। ইংলণ্ডে এবং বাংলাদেশে সমালোচনার ধারা কবিরাই বহন করেছেন এতদিন। বর্তমানে এই শূন্যতা কবিদেরই পূরণ করতে হবে।

১৩৫৭ সালে রচিত প্রথম প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতা'। জীবনানন্দ বলেছেন, মানুষের মনের চিরপদার্থ মহৎ লেখকের হাতের কৌশলে কবিতায় বা সাহিত্যে রূপ পেলে আধুনিক সাহিত্য বা কবিতা হয়ে ওঠে। সুতরাং সব সময়ের জন্য আধুনিক এমন সাহিত্য রয়েছে। যেমন মহাভারতের কিছু, অংশ শোফোক্লেস বা ইশকাইলাসের কিছু কিছু।*

যাঁরা দায়িত্বের খাতিরে কবিতা পড়েন ও আলোচনা করেন যেমন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপকরা—যেসব কবিদের উপর বিশদ আলোচনা ও স্বীকৃত সিদ্ধান্ত নেই, সেই সব আধুনিক কবিতার আলোচনায় তাঁদের ধারণার অস্পষ্টতা লক্ষণীয়। কবিরাও অনেকে কবিতার আলোচক, কিন্তু সকলের ধারণা ও রুচি সমান নয়। এলিয়ট, জীবনানন্দের মতে, কবিতার অধ্যাপক হলেও তাঁর মতামত সবিশেষ গণ্য নয়। তবু কবিরাই ওদেশে এবং এদেশে কবিতা সম্পর্কে বেশি বোধশক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন। ১৯২৫ থেকে পরবর্তী কালের কবি মনের জিজ্ঞাসা ও মীমাংসায় কোনো বাঙালী কবি এগিয়ে এলে সহজ হবে। হয়তো তাতেও ভুল থাকতে পারে, তবু তা বর্তমান সমালোচকদের চেয়ে সম্পন্নতর হবে মনে হয়।

---

*তাঁর এই বক্তব্য আমরা সমর্থন করি না। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত আমরা ইতিপূর্বে (৩২ পৃঃ) উল্লেখ করেছি।

যুগলক্ষণ চিহ্নিত কবিতা আধুনিক কবিতা—এই প্রাথমিক আধুনিক কবিতার অল্প স্বল্প উত্তর যুগে উত্তরিত হবে। শেলির কাব্যমূল্য সম্পর্কে সমালোচকরা ভুল করেছিলেন। শেলির কবিতা কালোত্তীর্ণ হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত আধুনিক। কবিদের মধ্যে যেমন নানা স্তরের প্রবীণতা আছে, রুচির তারতম্য আছে, সমালোচকদের মধ্যেও অনুরূপ তারতম্য দেখা যায়। এলিয়টের বিশ্লেষণী আলোচনার সমীচীন মেধা উজ্জ্বল স্পষ্টতা সত্ত্বেও শেলি এবং অন্যান্য উনিশ শতকের কবিদের রবীন্দ্রনাথ আরো ভালো করে বুঝতে পেরেছেন।

যুগের বিশিষ্ট মর্ম যাঁরা অনুভব করতে পারেন না, আনুষঙ্গিকতার রীতি ও রাগে আচ্ছন্ন সে সব কবি নানা ভাসমান 'সামাজিক' বিষয় ও সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট নিয়ে চিন্তা ও ভাবের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সার্থকতায় পৌঁছবার চেষ্টা না করেও একধরনের প্রাথমিক আধুনিক কবিতা লিখেছিলেন। সেই আধুনিক কালের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছুকিছু আঙ্গিকের তাৎপর্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তী এইসব কবির কবিতার কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আজও আধুনিক। বর্তমানেও তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ দশক যাঁরা কবিতা রচনা করছেন, তাঁদের অনেকেই আপন যুগকে পরিষ্কার ও সত্য ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তবু পূর্বজ কবিদের মতো আধ্যাত্মিকতার বা অন্য কোনো পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসভূমি না থাকলেও কিছু কবি স্পষ্টতর ও সত্যতর ভাবে এই সফলতায় পৌঁছেছে। কিয়েৰ্কগার্ড প্রভৃতি দার্শনিকের অস্তিবাদী চিন্তাধারা মানবজীবনের এই অন্তর্নিঃসহায়তার কথাই ব্যক্ত করে। আশা করা যাক আধুনিক বিজ্ঞান নিরাশাবাদ ছাড়িয়ে শূন্যতা অতিক্রম করে সৎ আশাবাদে মানুষকে উপনীত করে দেবে। এবং এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সিদ্ধ কবিতা ভালোর স্তর পেরিয়ে মহতের স্তরে উত্তরিত হবে।

১৩৫৭ সালের দ্বিতীয় প্রবন্ধ **'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ'**। ধর্মসাধকদের মতো অনেক কবি চেতনাতীত এক আলোর কথা বলেছেন। মন-নির্মনের সন্ধিজাত এই আলো নাকি তাঁদের কবিতা সৃষ্টির উপকরণগুলিকে উদ্বোধিত করতে সাহায্য করেছে। এরই জন্যে দর্শন বিজ্ঞান এমনকি ধর্মের মীমাংসার চেয়ে পৃথক এক নির্মলতা কবিতায় দেখা যায়। এই দিব্যতা কালের বিচারে টিকবে কি? বিজ্ঞানের অভ্যুন্নতিতে দর্শন বিলুপ্তপ্রায়। বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস আরো বাড়লে ধর্মও টিকবে মনে হয় না। তবু কবিতা বিজ্ঞানের পদ্ধতির বাইরেও সত্য ও দিব্যতা বজায় রাখতে পারে। কেননা কবিতা মানুষের মনের স্থায়ী পদার্থের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের সত্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করেনি, ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত এই সত্যকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলচুক ধরা পড়ে। কিন্তু কবিতার সত্যে এত বেশি খণ্ডন নেই, তাই উপনিষদের, শেক্সপিয়রের বা রবীন্দ্রনাথের আবেদনের অনেকখানিই যুগান্তরেও অব্যর্থ থেকে যায়।

একটা বৃহৎ সময়ের ভিতর ফলিত হয়ে থাকবে কবিতা। প্রতিটি যুগের নতুন নমনীয়তায় নূতন সঙ্গতি লাভ করে কবিতা বেঁচে থাকতেও পারে। মনের অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন বা বিনাশ না হলে কবিতা থাকবে।

বাংলা আধুনিক কবিতা আধুনিক পৃথিবীর মহত্তম তাৎপর্যগুলির সঙ্গে যোগ রেখে গভীরতর প্রসার পেয়েছে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখানে কবি বেশি—কাব্যধারা

অখণ্ডিত। রবীন্দ্রোত্তর কালের সব লেখা স্থির ভাবে সংকলিত হলে বোঝা যেত একটা প্রধান কাব্যের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। পনেরো কুড়ি বছর পরে স্পষ্ট হবে একালে একজন বা দুজন কবির নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতা আছে কিনা। তখন এ যুগও পরিসমাপ্ত হবে। এই যুগের মধ্যে দীর্ঘ কবিতা, কাব্য নাট্য এবং শ্লেষ মহান কবিতা লেখা হয় নি। আগামী দশ-পনেরো বছরে এসব পরিণতির দিকে মোড় ঘুরবে কি? বাংলা কবিতার ভাবী পরিণতির কোনো স্পষ্ট আভাস দেখছি না। তবু অদূর ভবিষ্যতের দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহাকবিতা আসবে এবং গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র কাব্যনাট্য দেখা দেবেই।

এ গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটি হলো ১৩৬০ সালে রচিত **'অসমাপ্ত আলোচনা'**। নানা যুগে ও নানা দেশে রচিত অনেক কবিতাকেই আধুনিক কবিতা বলা চলে। একালে রচিত অনেক কবিতাও কালোত্তর। তবু আধুনিক বলতে একালের রচনার কথা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পনেরো বছর আগে থেকে 'কল্লোলের' লেখকদের নিয়ে একালের সূচনা। তাঁরা ভাবতেন, রবীন্দ্রনাথ সব বিষয়ে কবিতা লেখেন না। তাঁর লেখায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয় না। জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের সঙ্কেত তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়নি। এইসব সত্যমিথ্যা যুক্তির ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের অনুলেখন করতে করতে 'কল্লোল' নিজের মন খুঁজে পেয়েছিল, ভাষায় এক নূতন তাৎপর্য এনেছিল। কয়েকটি সার্থক কবিতা পাওয়া গিয়েছিল। প্রতীকী সাররিয়ালিষ্ট ও অন্যান্য নানাজাতীয় ও প্রচারমূলক, শিক্ষামূলক প্রভৃতি লেখায় ব্যাপকতা এলেও গভীরতা এসেছিল কিনা তার প্রকৃত বিচার হয়নি।

রবীন্দ্রনাথকে উপাদান হিসাবে নিয়েও যদি পৃথক সিদ্ধি আধুনিক কবির আয়ত্তে এসে থাকে তবে তা প্রশ্নাতীত। কেউ কেউ নূতন বীক্ষা ও রীতিনীতির ভিতর স্বতন্ত্র কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কারো কারো হাতে ক্লাসিক রীতির অভিনব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোনো কোনো কবির লেখায় অন্তর্জ্ঞানের দুয়ার যথাসম্ভব খোলা, মালার্মে র‍্যাঁবো রিলকের মতো প্রতীকী কবিতার প্রবর্তন। আবহমানের বাংলা কবিতার ঐতিহ্যকে আধুনিক কবিরা পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধির সঙ্গে অন্বিত করতে পেরেছেন। আধুনিক কালের জটিল বিন্যাস কবির কাছে অপার সতর্কতা অধ্যবসায় ও মননের ক্ষমতা দাবি করছে। আগাগোড়া বাংলা কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের সঙ্গে ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার মর্ম অনুধাবন করার শক্তিও চাই।

দেশ কালের বিশেষত্ব ও মানুষের রুচির পরিবর্তনের ফলে পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়েছে। যুগে যুগে সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে তার মধ্যে মানুষের সনাতন মূল্যবোধের অস্তিত্ব আছে বটে কিন্তু তা নূতন যুগে নূতন রীতি ভঙ্গি ও আঙ্গিকে বিলসিত। একথা বোঝা চলে, আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় ও রীতির নিরন্তর পরীক্ষা চলেছে। এই পরীক্ষায় সিদ্ধি নিতান্ত তাচ্ছিল্যজনক নয়।

বছর পনেরো পরে এই কাব্যযুগ যখন শেষ হবে তখন এ কবিতার আরো সঙ্গত পরিচয় পাওয়া যাবে। যে সব কবিতা কালান্তরে বেঁচে থাকবে তাদের শ্রেষ্ঠতারও তারতম্য থাকবে। সুদীর্ঘকাল ও বিভিন্ন রুচির পাঠক সমালোচকদের বিচারের পরিণামে যখন সেই তারতম্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হবে তখনই বলা যাবে একালে প্রকৃত মহৎ কবিতা কিছু লেখা হয়েছিল কিনা।

এবং অন্যান্য

'কবিতার কথা'য় সংকলিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও জীবনানন্দের আরো কিছু প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর অনেকগুলি শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'জীবনানন্দ' ১ম খণ্ডে সংকলন করেছেন। প্রবন্ধের মূল্য ও মর্যাদা নির্ভর করে বিষয়ের গুরুত্ব ও পরিবেশনের প্রাঞ্জলতার উপর। কবিতা বিষয়ক চিন্তা বলেই কবি জীবনানন্দের রচনা 'কবিতার কথা' পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপরাপর প্রবন্ধের মধ্যে যেমন সাহিত্য প্রসঙ্গে আছে, (রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতা, লেখা ও লেখকের দায়িত্ব) ; শিক্ষাপ্রসঙ্গে আছে, (শিক্ষা-দীক্ষা, শিক্ষা ও ইংরাজি) তেমনি ভাষা প্রসঙ্গ নিয়েও তার একটি সুচিন্তিত আলোচনা পাচ্ছি (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ) আমরা পর্যায়ক্রমে এইসব প্রবন্ধের বিষয়সার উদ্ধার করবো।

রবীন্দ্রনাথ

১০ আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে 'স্বরাজ' পত্রিকার রবিবারের সাময়িকীতে এ প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছিল। এতে জীবনানন্দ লেখেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে।

যতদিন বেঁচে ছিলেন স্বদেশবিদেশের নানা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কবির জগৎ তো বস্তুবিশ্ব থেকে আলাদা নয়। তবু তা কবির চেতনা অবচেতনায় সংহততর এক আত্মসৃষ্ট শুদ্ধতর পৃথিবী।

রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা একটা বড় জগতের সিংহদ্বার পেরিয়ে আশ্চর্য পটদিগন্তলোক অনুভব করতে পারি। দান্তে শেক্সপিয়রের মতো বড়ো কবিরা এমন স্বকীয় পৃথিবী, সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ দিব্যজগৎ সৃজনে তাঁরা বাস্তববিমুখ হননি। পৃথিবীর উজ্জ্বলতা, আবছায়া, গ্লানি ও শূন্যতার গহনতম সংস্পর্শে এসে নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত উন্নততর পরিমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে এক মহৎসাহিত্য আমরা পেয়েছি, পেয়েছি তাঁদের মর্ত্য জীবনের বিশেষত্বও। অনেক কবির এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু দান্তে, মিলটন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা নয়।

এ দেশের সাহিত্যলোকে রবীন্দ্রকাব্যই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তবু রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বেও মন টানে। তাঁর লেখা সুন্দর কবিতা পড়লে মনের নির্জ্জান প্রত্যাশা তৃপ্ত হয়, এ সাহিত্যগুণ আলোচ্য বটে, তবু তারপর মনে হয় কী বিরাট পুরুষ ছিলেন তিনি ; কি বিশাল প্রতিভা ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ তো জনগণের অধিনায়ক, রাষ্ট্রপতি বা সমাজগুরু হতে চাননি। তিনি তাঁর সমকালে এদেশে সব অবক্ষয় কাটিয়ে জীবনে সুস্থতা আনার চেষ্টা করে গেছেন।

সংপ্রেরণায়, স্পষ্ট চরিত্রের প্রবর্তনায়, আধ শতকের বেশি সময় ধরে সব কঠিন সঙ্কট মুহূর্তে অন্যায়ের অন্ধকারের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়িয়েছেন, মৃত সঞ্জীবনী বিশ্বাসের জোরে জীবনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। দেশ তাই বিশ্বাসের নৈরাজ্যে তলিয়ে যায় নি।

দুর্ভাগ্য এই যে তিনি চলে যাবার পরেই শতাব্দীর চরমতম সংকট, রাষ্ট্রীয় অবদমন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশ-বিভাজন ঘটে গেল। এই বারবেলায় আক্রান্ত আমরা তাঁর জীবন ও সাহিত্য থেকে যদি প্রতিভা, স্বপ্ন, সাহস, নিঃশ্রেয়স ঐতিহ্যের স্পন্দন খুঁজে নিতে পারি তার জন্য নিরন্তর রবীন্দ্র সাহিত্যপাঠ আর আলোচনার প্রয়োজন আছে।

'নজরুলের কবিতা' প্রবন্ধটি ১৩৫১ সালে কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ সমকালীন মানুষের জীবন্মৃতের মতো আসন্ন, সার্বিক, নিপট মৃত্যুর প্রতীক্ষা এবং তার মধ্যেও পুনরুজ্জীবন সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। হয়তো প্রত্যেক যুগেই এমনটি দেখা যায়, কালের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এক সময়ের বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িত হয়ে নূতন সাময়িকতা নিয়ে আসে শুধু। সমাজ উন্নয়ন না হোক এতে মূল্যচেতনা স্থিরতর হতে পারে।

সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে 'ভোর আসছে'। এমন প্রত্যুষ চেতনা বারবার এসেছে; বুদ্ধের যুগে, অশোকের যুগে, ফরাসি বিপ্লবোত্তর কালে, কিন্তু সুদীর্ঘ সুদিন বা সুরাত্রি কখনো আসেনি ইতিহাসে। তবু ভোর আসছে এই প্রত্যয় জাগছে। এর থেকে হয় নৈরাশ্যে পৌঁছাতে হয়। কিম্বা বিশ্বাস করতে হয় এখনো মানবসভ্যতার শৈশবের কাল, ভূমিকার ভাঙাগড়ার কাজ এখনো চলেছে।

যুগের ভাঙনের মুখে কবি যদি ভাঙনের মত্ততার কবিতা লিখতে বসেন তাঁর মধ্যে নূতন সময়ের আভাস স্থির অর্থসফলতা না পেয়ে স্থূল হয়ে দাঁড়ায়। আবার ভাবীসমাজ রূপের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন নিয়ে যেসব নিয়মের প্রভাবে আগামীকাল জন্ম নিচ্ছে, তার কয়েকটিকে প্রতীক বা প্রবর্তয়িতার মতো মনে করে এক ধরনের শ্লোগান ধর্মী কবিতা লেখা হচ্ছে ; অন্যপক্ষে বস্তুশক্তির দুরন্ত ক্রিয়াকৌশলের পরিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাবধর্মী সূক্ষ্মতনু আরেক ধরনের কবিতাও লেখা হচ্ছে যার ভাষা শব্দ ইঙ্গিতের দুরূহ আচ্ছন্নতা তাকে সাধারণের থেকে দূরে রেখেছে। যদিও এসবের মিশ্রণে বেশ কিছু ভালো কবিতাও লেখা হয়েছে।

১৩২৫-৩০ এর কালপর্বে যখন একদিকে মৃত্যুর সমাচ্ছন্ন ঘনঘটা অপরপক্ষে অরুণোদয়ের রক্তচ্ছটা, তখন নজরুলের আবির্ভাব। সেই আলোড়িত জীবনসংক্রান্তি ভালো কবিতা সৃষ্টির অনুকূল ছিল না। কিম্বা তাঁর মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতা থাকলে তখনই ভালো কবিতা হয়তো জন্মাতে পারতো। জনগণের চাহিদামতো চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়, এমন কবিতা লিখেছিলেন তিনি। তবু আজকের শ্লোগানধর্মী কবিতার চেয়ে তা সফল হয়েছিল। সমালোচকরা বিভ্রান্ত হয়ে জয়ধ্বনিও করেছেন কখনো কখনো, তবু তা মহৎমান এড়িয়ে গেছে।

কোনো যুগেই মহৎ কবিতা বেশি লেখা হয় না। নজরুলের কিছু কবিতা সফল, কিছু কবিতা সার্থক। তুলনায় আজকের কবিতা বর্তমানের সুস্থিরতায় পৌঁছেও ঢের বেশি ব্যাহত হচ্ছে। হৃদয় আমাদের আত্মস্থ নয়, মন আমাদের বিরুদ্ধাচার করে। নজরুলের

একাগ্রতা এবং সময়, বুদ্ধিসর্বস্বতা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। তাই তাঁর অনেক কবিতার ধ্বনিময়তা ও অঙ্গীকার আধুনিক কবিতা থেকে বেশি। তবু নজরুলের কবিতায় নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা নেই।

স্বার্থপরতা হেয়, কিন্তু কবির আত্মোপকার-প্রতিভাই তাকে মহত্ত্ব দেয়, কবিতাকে অন্তিম সঙ্গতির পথে পৌঁছে দেয়। সেই ব্যাপ্তি ও গভীরতার অভাবে নজরুলের কবিতা সফলতার সীমান্তে দাঁড়ায়নি।

'শিক্ষাদীক্ষা' প্রবন্ধটি দেশ-পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ হয়েছিল। জীবনানন্দের বক্তব্য হলো, নানা শিক্ষা কমিশনের শ্রম ও সুপারিশ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অল্পস্বল্প পরিবর্তন সত্ত্বেও গত পঞ্চাশ বছরে শিক্ষার কাঠামো পাল্টায়নি। এদেশের শিক্ষানায়করা কখনো রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও নির্দেশের ফল গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এদেশে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। এটাই ভালো হয়েছে, কেননা ইংরেজি অনেক বড়ো ভাষা ও সাহিত্য। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের জন্য আরো কিছুকাল ইংরেজিকে ধরে রাখতে হবে। তবু ইংরেজি বিদেশী ভাষা। হিন্দি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় তা শেখা কঠিন। কিন্তু সহজ হলেও শিক্ষা সংস্কৃতির দিক থেকে এসব ভাষা লিখে বিশেষ কোনো লাভ নেই। তাই বারো বছর প্রাণপাত করেও বাঙালীরা ইংরেজি শিখছে, দশদিন পরিশ্রম করেও কোনো ভারতীয় ভাষা শিখতে চায় না।

'শিক্ষা ও ইংরাজি' শারদীয়া দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৬০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে একটু বিস্তৃততর পরিধিতে প্রায় একই বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন টোল মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা প্রশস্ততর ছিল। মেকলে শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্যই ইংরেজি শিক্ষা চালাতে চেয়েছিলেন, তার দূর প্রসারী ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামাননি। দেশী শিক্ষার সব কৃত্য যখন শেষ হয়েছে মনে হচ্ছিল সেই উপযুক্ত সময়েই ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হলো। এবং তার সদ্ব্যবহারও যথেষ্ট হয়েছিল। উনিশ শতকের নব্য ইংরেজিওয়ালারা পাশ্চাত্য ভাষা সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত বিমুগ্ধ ছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল দেশীসভ্যতা পুরোপুরিই অসার। তার প্রতিক্রিয়ায় আবার একদল ইংরেজি শিক্ষাকেই সর্বদোষের আকর বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূচনাকালে ইংরেজি শিক্ষা সমকালীন ইতিহাসে এদেশে পরমলাভের বিষয় ছিল। অর্থনীতি রাজনীতিতে ততখানি সফলতা না পেলেও সাহিত্য সংস্কৃতির চিন্তা পদ্ধতি অনেক কিছুই ইংরেজি শিক্ষার ফলে শুদ্ধতর হয়ে উঠেছে। দেশী ঐতিহ্যের মূল্য ও সারবত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েও পৃথিবীর সৎকাজ ও চিন্তাধারার কাছে অর্জনীয় কিছু আছে এ আমরা জেনেছি। পরে যদি মূল্য বিশৃঙ্খলা কিছু ঢুকে থাকে তার কারণ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দোষ নয়—আমাদেরই মনের ত্রুটি ও অক্ষমতা।

এদেশে শিক্ষার বড় ত্রুটি হলো গোড়া থেকেই ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা নিখুঁত ব্যাকরণ সম্মত খাঁটি ইংরেজি সব ছাত্রের উপর চাপাতে চেয়েছেন। তবু আট দশ বছর স্কুলে কাটিয়েও ছাত্ররা শুদ্ধভাবে ইংরেজি বলতে বা লিখতে শেখেনি। ঠিক ইংরেজি না লিখতে শিখলে পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না ভেবে সব জোর ইংরেজি শিক্ষার উপরে

দিয়েছে, ফলে অন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে দুর্বল থেকে গেছে। আজকাল ছাত্ররা আর ইংরেজি তেমন ভাবে শিখতেও চাচ্ছে না। গত পনেরো কুড়ি বছরে পরীক্ষায় ইংরেজি ব্যাকরণ ও সাহিত্য দুইদিক দিয়েই ছাত্ররা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে।

ইংরেজি শেখার উপর এত জোর দেওয়াই ভুল। গোড়া থেকেই সরল বুনিয়াদি ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা করা দরকার ছিল। সেভাবে কখনো চেষ্টা করা হয়নি। ইংরেজি শিক্ষার দিকে ছাত্রদের রুচি খানিকটা ফিরিয়ে আনা দরকার। ইংরেজির বিকল্প হিসাবে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বাংলা বা হিন্দিকে এখনি দাঁড় করানো যাচ্ছে না। সুতরাং ইংরেজি শেখানোর পাঠ্য ও পদ্ধতি আমূল পালটে ফেলে ছাত্রদের কাছে ইংরেজিকে সহজ, আধুনিক ও রুচিকর করে তোলা দরকার।

১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত **'লেখা, লেখকের দায়িত্ব'** প্রবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। কিছু কবি আছেন যাঁদের ভাবনা-প্রতিভা যা সৃষ্টি করে তা জীবনের কোনো ব্যবহারে ধরা পড়ে না, জীবনের প্রতিবিম্বও নয়। আমাদের এই ইতিহাস স্মৃতিজীবন ছাড়িয়ে তাঁর কবিমানস এক অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চলে যায় যেন, তবু জীবনের বাইরে যেতে পারে না। সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে জীবন বড়ো তাই তা ঐ সব পদ্ধতিকে নিয়ত ভেঙে নূতন করে গড়ে চলেছে। মানুষের সেই শক্তি আছে যাতে সে কল্পনা-প্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করার বা নূতন ভাবে প্রচার করার সুযোগ পায়। তা হলো কবিতা বা শিল্প সৃষ্টি।

কবিতা সবসময়ে সৃষ্ট হতে পারে না। তা সমীচীন গদ্য বা ভুয়োদর্শী সম্পাদকীয় মন্তব্য নয়, কেউ কেউ অন্যভাবে চিন্তা করলেও গদ্যে বা পদ্যে রচিত কবিতার ভাষায় বা ভাবে দিব্য ইঙ্গিত বা দিব্যতার স্পর্শ থাকা অপরাধ নয়।

কারো করো ধারণা, সচেতন সমাজদর্শী মন এবং অভিব্যক্তির উপযোগী ভাষা থাকলেই ভালো কবিতা লেখা যায়। কিন্তু কবিতা এই সুলিপিকে অতিক্রম করে আপন চরিত্রবলে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, পূর্বজ কবিরা একে 'মায়াবল' বলতেন। যে কোনো রচনা সৌষ্ঠবকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়ে এই শক্তি রচনার অংশবিশেষ বা সমগ্রকেই কবিতা করে তোলে। কবিতার সংজ্ঞা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অদূর ভবিষ্যতে হয়তো গড়ে উঠবে।

কবি হিসাবে জীবনানন্দও কবিতার প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়েও তা ব্যক্ত করতে অসমর্থ। তাঁর সৃষ্টিপন্থা রৌদ্র ছায়াময়, ভবিষ্যতে বিশেষ করে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য। কবিতার স্বরূপ ও সম্পর্কিত সব ধারণা পাঠক ও কবির পক্ষে স্পষ্ট হওয়া দরকার। কবিতা মানুষের কল্যাণ সাধন করে না বরং জীবনের ভালো ও মনের ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে। আমাদের জ্ঞানপিপাসাকে সর্বতোভাবে চরিতার্থ করে। ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়, স্বার্থপরতার ভ্রান্তি দূর করে মহত্তর ও গ্লানিহীন করে তোলে, হৃদয়কে ক্রমেই বিশুদ্ধ করে পরিণতিশীল জীবনকে সজাগ ও শালীন করে তোলার ভার কবিতার উপর।

বস্তুত কবিতার উপর কোনো ভার নেই। কারো নির্দেশ পালন করে না কবিমানস

এবং কবিতা, তবু সৎ কবিতা আপন স্বচ্ছন্দ সমগ্রতায় শোধিত করে তোলে মানব জীবন, জীবনে বিপ্লব আনে। মহৎ কবির ভাবনা ও আন্তরিকতা সূক্ষ্ম ও সক্রিয় থাকায় মানুষ চায় তিনি সমাজ বিবর্তনে আত্মনিয়োগ করুন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কবিতা ও শিল্প সৃষ্টির মধ্যেই তিনি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়, এমনকি মহৎ। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তেমন নন।

জীবনানন্দ এই অনুভূতি থেকেই লিখে থাকেন। কবিতা বা সাহিত্যই শুধু নয় সুলিপি সৃষ্টির জন্যও লেখা প্রয়োজন। তাতে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ এবং তার থেকে মুক্তির পথসন্ধান পাওয়া যেতে পারে। একথা সত্য যে অগণন মনীষীর নির্দেশ সত্ত্বেও আমাদের জীবনের বেদনা ঘোচেনি, ব্যর্থতা বিদূরিত হয়নি, তবু একথাও মানতে হবে—কবিতা, সাহিত্য ও সুলিপি মানুষের ভাবনাকে জ্ঞানময় ও চরিত্রবান করে তুলেছে।

শোষিত মানুষের জীবনের, বিপ্লবের, বিপ্লবোত্তর শুভ সমাজের বিষয় ছাড়াও কবিতা মহৎ হতে পারে।

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধটি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই চৈত্র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিভাবে পড়বে সে বিষয়ে এতে আলোচনা করা হয়েছিল।

নবাবী আমল থেকে বিকাশের অব্যাহত ধারায় বাংলা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রায় পাশ্চাত্য ভাষার সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও এ ভাষার সাহিত্যের পরিধি বেড়েছে, বাড়ছে। কিন্তু ত্রিবিধ কারণে বাংলা ভাষায় আজ উদ্বেগের কারণ ঘটেছে।

১। বাংলা সাহিত্যে প্রতিনিয়ত যে নূতন নূতন প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের অব্যাহত অভ্যুদয় হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকা গোষ্ঠীর নামে যাদের পরিচিতি, কল্লোল যুগের পরে, চারের দশক থেকে তাতে খানিকটা ভাঁটা পড়েছে। নূতন লেখক থাকলেও লেখক-সংঘ নেই। তাদের সাহিত্য-কর্ম সংগঠিত নয়, অনেক লেখা সৎ হলেও মহৎ হচ্ছে না। সংখ্যার দিক থেকেও কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, পরিচয়, কবিতা যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমতুল্য নয়, সংখ্যার সঙ্গে যুগের সংযোগ সাহিত্যে বড় সাফল্য দেখা যায় নইলে ক্ষয় দেখা দিতে পারে। বাংলা সাহিত্যে কি অবক্ষয় চলছে? পুরানো সাহিত্যিকরা ফুরিয়ে আসছেন, দু-একজন বড় জোর দেড় দু-দশক চালিয়ে যেতে পারেন। নূতনরা কেউ কেউ ভালো লিখলেও নূতন সাহিত্য-সিদ্ধির দেশকালের ভিতর এসে পড়েছে মনে হচ্ছে না।

চারের দশকে বা তার আগের থেকে আরো একটি আধুনিক সাহিত্য যুগ বা যুগাংশের সূচনার প্রয়োজন ছিল। নূতন যুগ লক্ষণগুলো বড়ো লেখকের হাতে এতদিনে বিশেষ সংস্কার লাভ করতে পারতো, তা হয়নি। সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় একটা ছেদ পড়ার আশংকা দেখা যাচ্ছে।

২। খণ্ডনের আগের বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবাংলা। দেশ ছোট লোকজন কম। দেশ ছোট লোক কম হলেই সাহিত্য ছোট হবে তার কথা নেই। প্রমাণ ইংল্যাণ্ড ও এথেন্সের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি। তবু প্রাচীন গ্রিস ও এলিজাবেথী ইংল্যাণ্ডের থেকে

পশ্চিমবাংলার দেশ কাল পরিবেশ ভিন্ন। বিপদ অনেক রকম। উনিশ-বিশ শতকের গোড়ার দিকের সঙ্গে আজকের দশকের সঙ্গতি নেই। দশ-বারো বছর আগে থেকেই ক্ষয় ও ক্ষুণ্ণতা শুরু হয়েছিল, দেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাই আশংকা বেড়েছে গ্রিস, ব্রিটেন বা আমাদের ২৫/৩০ বছর আগের বাংলাদেশের সমপর্যায়ে উঠতে গেলেও কত সময় লাগবে বলা কঠিন। এ শতক হয়তো দেশ সমাজের ভাঙাগড়াপেটার কাজে লেগে যাবে।

এই ছোট বাংলাদেশে উদ্বাস্তুদের কুলিয়ে উঠছে না। আরো একটু পরিসর পেলে ভাল হতো। বাংলার উত্তর পশ্চিমে বিহারে যেখানে বাঙালীর সংখ্যা বেশি ছিল তা ফিরে পেলে ভাল হতো, কিন্তু হয়নি, হবে না হয়তো।

এ ভাষা আগে অবাঙালীকেও আপন সংস্কৃতি ও শক্তিতে আকৃষ্ট করছিল, তারা বাংলা শিখছিল, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অবাঙালীরা বাংলা ভাষার বইয়ের মর্যাদা মেনে বাংলা জানা দরকার মনে করতেন। বাংলা ভাষা যত উপরের স্তরে গেছে, পরিশ্রমও প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফল পাচ্ছে, তত এর সম্পর্কে অবাঙালীদের উৎসাহ কমছে। অবচেতনায় আগ্রহ থাকলেও, সচেতন তাগিদ দেখা যায় না। চলতি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা আজও শ্রেষ্ঠ, তবু বাংলা ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়। সংখ্যাধিক্যের সুবিধা দেখতে চেয়ে রাষ্ট্র হিন্দিকে বেছে নিয়ে হয়তো ঠিকই করেছে। রাষ্ট্রভাষা ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ কমিশনের বিশেষ পরীক্ষা ও আলোচনায় নির্ধারিত হলো না। হলে হিন্দি হতে পারতো না বোধহয়। রাষ্ট্রভাষাও একটি মাত্র হলো বেশি নয়। ভারত রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া দূরে থাকুক বাংলা এমন কি পশ্চিমবাংলার মতো ছোট রাজ্যের বাঙালীদের ভাষা। পূর্ববাংলার বাঙালীরা আজ পাকিস্তানী। বাংলার মুশ্লিমরা কয়েকশো বছর নানা উপভাষায় লিখে যে ভাষার চর্চা করে এসেছেন তা যদি লুপ্ত হয় তবে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে না কি?

৩। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষিতের মুখের ভাষা পশ্চিমবাংলা ঘেঁষা ছিল কিন্তু উপহাসের উপেক্ষা ছাড়িয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঐসব উপভাষা রচিত সাহিত্যের, ছড়া গীতিকা প্রভৃতির মূল্য ও মর্যাদা বাঙালী বুঝেছে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন উপভাষার নানা শব্দ ও প্রকাশরীতির ভাযাভঙ্গীর টানাপোড়েনে বাংলাভাষার যে মূল্যময় পরীক্ষা চলছিল তা অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হবে। কেননা উদ্বাস্তুদের সন্ততিরা ক্রমে ক্রমে কলকাতার বা এদিককার নানা উপভাষায় রপ্ত হয়ে এদেশী হয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা ও জনভাষা হলে এত বড় বড় উপভাষা লুপ্ত হয়ে যাবে।

পূর্বপাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোড়ন চলছে। বাংলা পূর্বপাকিস্তানের দেশজ ভাষা। এই আবহমানের ভাষা ও সাহিত্যকে ছেড়ে এখানের মানুষ উর্দুকে মেনে নিতে পারে? না উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পেতে চাইবে এসব সমস্যার মীমাংসা এখনো হয়নি। মনে হয় খুব বেশিসংখ্যক পাকিস্তানীই বাংলাকে পূর্বপাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দেখতে চান। এঁদের ইচ্ছা ও চেষ্টা সফল হলে পশ্চিমবাংলার ভাষা ও সাহিত্যের একটা বড় লাভ।

কিন্তু বাংলা পূর্বপাকিস্তান থেকে লুপ্ত হলে ও সাহিত্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হবে পশ্চিমবাংলা। পূর্বপাকিস্তানের নিজ ভাষা হয়েও ইংরেজি ও উর্দুর চাপে বাঙলা সেখানে

ক্ষয় পেয়ে পশ্চিমবাংলার সক্রিয় ভাষার থেকে এত বেশি বিভিন্ন হয়ে পড়বে যে তখন তাকে চেনা কঠিন হবে।

ভাষার উপর এমন এক অবক্ষয়ের চাপ, পশ্চিমবাংলাতেও ক্রমে দেখা দেবে। এখনি দিচ্ছে, আগের মর্যাদা ও পরিব্যাপ্তি এখন এত বেশি সঙ্কুচিত যে অর্থ ও অন্নকষ্টে আচ্ছন্ন বেকার বাংলার লোকের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করার সময়ও বেশি নেই। যে বাংলা একদিন ভাত কাপড়ে সচ্ছল ছিল তাদের গল্প রূপকথা বচন ছাড়া নূতন যুগে কোনো যুক্তিঘন ক্রমবিকাশ লাভ করলো না ; মরেই গেল, মানুষ মরে যাচ্ছে বলে।

বাংলার জনতাপট এই রকম, তাদের সাহিত্য নিস্তব্ধ। সাহিত্যিকরা প্রৌঢ়, নূতন সূচনা দেখা যাচ্ছে না। গল্প উপন্যাস কবিতায় কোনো নূতন বৃহৎ তাৎপর্যের স্পষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা শংকার বিষয়।

বাঙালী সাহিত্যিকরা লিখে ভাত কাপড়ের জোগাড় করতে পারেনি কখনো। চাকরিও দুর্লভ। কবিতায়, সমালোচনায় টাকা নেই, গল্পে উপন্যাসে আগের চেয়ে কম, লেখকদের টাকা ও অবসর না থাকলে সাহিত্যকর্মে স্থির থাকতে পারা কঠিন হবে, পূর্বপাকিস্তানেও একই অবস্থা। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে বাঙালী সাহিত্যিকদের বই ক্রমেই কম বিকোবে, শেষে অচল হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ইংরেজির তুলনায় অশক্ত ও দরিদ্র। এখন থেকে সারা দেশের বোধবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার আশ্রয়ে পরিণত হতে থাকবে। কিন্তু তার কাছ থেকে বাংলার প্রায় কিছু পাবার নেই। যোগ্য রাষ্ট্রভাষা ও বড় সাহিত্যে হিন্দিকে দাঁড় করানোর জন্যে হিন্দিভাষী লেখকদের চেষ্টা ও উৎসাহ বেড়ে গেলেও হিন্দি ভারতের একক ভাষা হয়ে উঠতে পারবে না কখনো সংস্কৃতের মতো। যাইহোক, হিন্দির দিকে মন দিতে গিয়ে প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রতি ঢিলেমি আসতে পারে, সুতরাং হিন্দির মঙ্গল হোক না হোক প্রাদেশিক সাহিত্যের অমঙ্গল হতে পারে। গত দেড়শো বছরে ইংরেজি ভাষার প্রভাবে বাংলার যে উন্নতি হয়েছে হিন্দিভাষার সংশ্রবে তেমন কোনো লাভের প্রত্যাশা নেই— ক্ষয় ও ক্ষতির সম্ভাবনাই বেড়েছে।

হিন্দি শিখে হিন্দিতে লিখলে বা বাংলা লেখায় হিন্দি অনুবাদের চাহিদা পূরণে গরিব সাহিত্যিকদের অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘুচতে পারে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তাতে কোনো বিকাশ হবে না। বাঙলা ভাষার জন্যই বাঙালীর সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, আগামী পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাঙালী সাহিত্যিকরা যদি সাহিত্যের বড় ধারাবাহিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো মন ও প্রাণের শক্তি দেখাতে পারেন তাহলে ভবিষ্যৎ যতটা খারাপ মনে হচ্ছে, তা নাও হতে পারে।

চিত্ররেখা সিনেমা পত্রিকায় জীবনানন্দের **আলোকপাত** নিবন্ধটি বের হয়েছিল। এটির রচনা বা প্রকাশের তারিখ জানা যায় নি। পুনরাবিষ্কারের পর পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখের দেশ পত্রিকায়। এর বিষয় সমাজ ও অর্থনীতি।

সমাজে অল্প লোকই সচ্ছল ও সুখী, বেশি মানুষ নিঃসম্বল, অনাথ, অসুস্থ। বিত্তবান আরো টাকা পায়, অভাবীরা পায় না। খাওয়া পরা চেয়ে গোটা মানবজাতিই প্রবঞ্চিত ও ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে। ধনীর জাঁকজমক দেখে গরীবের কি সান্ত্বনা?

একালের মানুষ ঢের সজাগ ও সমীচীন। বিজ্ঞানী ও সমাজ নেতারা সার্বিক কল্যাণের পথনির্দেশ করলেও সহজপ্রাপ্য জিনিসও এই খাপছাড়া সমাজে আমরা পাই না। জ্ঞানের অভাব নেই, তবু শুভ রাষ্ট্রের বদলে ঘটছে হানাহানি ও বিদ্বেষ। অল্পকালের মধ্যে দুটো মহাযুদ্ধ ঘটলো। জন্ম নিল অ্যাটম বোমা।

মহামৃত্যুর মধ্যে থেকেও লোকে ভাবে অন্যে মরবে, সে মরবে না। একই ভাবে আমাদের মানবসভ্যতার আসন্ন মৃত্যু আমাদের কল্পনাতীত। মূঢ়তা সত্ত্বেও আমরা চাই পৃথিবীর নীড় ও নিখিল টিকে থাকবে। সমাজ সাধু হবে, রাষ্ট্র শুভ হবে, সবাই সুবিচার পাবে। সুমঙ্গল আসছে।

অতীতেও কালরাত্রি কেটে গিয়ে সুপ্রভাতের প্রত্যাশা মানুষ করতো ; নানা সভ্যতার আয়ু ফুরিয়েছে, রাত্রি ভোর হয়নি। এ রাত্রি আরো কত দীর্ঘ? যে সমীচীন সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি মানুষ দিয়েছে, আশা করা যাক আমাদের সন্ততিরা তাতে প্রবেশ করতে পারবে। সেখানে পৌঁছানোর আগে এই দারিদ্র্য ও নিষ্ফলতাকে আমরা কি দৃষ্টিতে দেখবো। গরীবের দুঃখ তো সামাজিক অবিচারের ফল। কিন্তু ভালো সমাজ কি কখনো বাস্তবায়িত হবে?

অন্যদেশের বস্তিবাসীরাও এদেশের নিম্ন মধ্যবিত্তদের তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করে। নানা শ্রেণীভুক্তের দারিদ্র্য জীবনকে নিরাশা, বিপদ ও কুশ্রী করে রেখেছে। জীবনের এই শোচনীয়তা কেবল অর্থাভাবের কারণেই ঘটেনি। যখন বিত্তসচ্ছলতা আসবে সেদিনও দৃষ্টির সাহস আলো ও সততার উপর শান্তি ও আনন্দ নির্ভর করবে। টাকার উপর নয়।

অফিস কারখানার গোলামি ছেড়ে দিতে পারে এমন উপার্জন কারো নেই। ব্যাঙ্কের সুদে সংসার চালাবে বা কৃষিতে বিনিয়োগ করে আর্থনীতিক স্বয়ংভরতা পাবে এমন কেউ নেই, দেশভ্রমণ, শীতের পোশাক, রেডিও কেনার, বা মাথা গোঁজার মতো বাড়িভাড়ার সংস্থান এমন মানুষ দুর্লভ। আজকের ভাতকাপড়ের মন্বন্তরে বেঁচে থাকাই রহস্য।

অভাব ঘোচানো আর প্রত্যেককে রুচিমতো কাজ আর চিন্তার সুযোগ দিতে হবে। কিছু লোক কোটি টাকার অনির্বচনীয় প্রগলভতায় ঘুরবে, আর কেউ বাঁচার ব্যবস্থা পাবেনা— এ দুয়ের নির্লজ্জ সহাবস্থান চলে চলুক, কিন্তু এসত্য বুঝতে হবে টাকাই শান্তি ও আনন্দের একমাত্র আকর নয়। বরং যারা অর্থকৌলিন্যে কম ও তেমনই থাকতে চায় তাদেরই জীবনের অধিকার ও সমালোচক হবার সুযোগ বেশি। টাকায় সব কেনা যায়—তবু উদ্দেশ্য ও আধার না থাকলে তা খোলস বা মুখোশ ছাড়া কিছু নয়। মুখশ্রী নয়—টাকা নিসর্গ শোভা নয়, পাখি ফুল ঘাস ভালো বই, বন্ধুর হৃদয় নয়—এগুলি পেতে টাকা সাহায্য করতে পারতো, কিন্তু আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও অবিচার সে সাহায্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে।

এই ধনতান্ত্রিক দুষ্কৃতির দিনেও গরীবের জীবনে কিছুটা প্রশান্তি ও আনন্দ সম্ভব। এমনকি বিপ্লবের ছায়াপাত বা রক্তঝর্ণার মধ্যে বসেও প্রকৃতি, বই, আর মানবহৃদয়ে হাত রাখতে চাওয়ার মতো শিক্ষিত শুদ্ধ দৃষ্টি আছে। ব্রহ্মাণ্ডের অমেয় কারুকার্যে এবং হৃদয়ের বিচিত্রতায় আমাদের মন লীন ও আত্মস্থ হয়ে আসে। তাদের ভুল, গ্লানি সত্ত্বেও ভালবাসতে পারা যায়। ঐ·সুচেতনা ট্যাঁকের টাকা থেকে উপছে পড়ে না, টাকার দরকার আছে, কিন্তু তার আড়ম্বর নিতান্ত নিরর্থক ও নিষ্ফল।

জীবনানন্দ দাশের ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত নিবন্ধ **শিক্ষাদীক্ষা-শিক্ষকতা** সমাজে শিক্ষকদের স্থান ও গুরুত্ব নিয়ে লেখা। প্রকাশিত হয় মাসিক বসুমতীতে।

লেখক এতে জানিয়েছেন, শিক্ষকতার কাজ তিনি ভালবেসে নেননি ; একাজে লিপ্ত থাকতেও তাঁর ভাল লাগেনি। এম. এ. পাশ করে তাঁর মনে হয়েছিল অধ্যাপনার দিকেই তাঁর ঝোঁক। সে সুযোগ তাড়াতাড়িই এসেছিল। যৎসামান্য পারিশ্রমিকে কলকাতার এক বেসরকারি কলেজে তিনি কাজ পেয়েছিলেন। পরেও কয়েকটা প্রাইভেট কলেজে তিনি কাজ করেছেন। সরকারি অফিসের লোয়ার ডিভিশনের কেরানিদের চেয়েও কম বেতনে যে সব শর্ত মেনে অধ্যাপকদের কাজ করতে হয় তাতে তাঁর মনে হয়েছে দেশ চালকদের শিক্ষার বা শিক্ষকদের উপর কোনো শ্রদ্ধা নেই।

সাধারণে ভাবে চাকরিক্ষেত্রে কেরানিরাই সবচেয়ে অবিচারের শিকার। তাই লেখক কেরানিদের সঙ্গেই অধ্যাপকদের তুলনা টেনেছেন। অধ্যাপকদের মাইনে শুধু কম নয়, তাদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই, পেনশন নেই, একমাত্র স্কুল শিক্ষকদের অবস্থাই শুধু শোচনীয়তর। কেরানিদের মাইনের একটা গ্রেড আছে সময়ের সাথে তা নিয়মমত বাড়ে। কলেজে তাও নেই। খেয়ালখুশি মতো মাইনে, কারো তা বাড়ে, কারো বাড়ে না। ব্রিটেনের স্কুল কলেজে এমন অনাচার আছে কি? ব্রিটিশরা এদেশের শিক্ষাদীক্ষা ও শিক্ষকদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এদেশীরাই নিজেদের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী এসব বন্দোবস্ত করেছে।

অধ্যাপকরাও এদেশে শিক্ষাদানকে প্রাপ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেনি। দেশের কর্তাদের বিমুখতাকে মার্জনা করে এসেছে। কিন্তু টাকার মূল্য সম্প্রতি এত দুঃসহ ভাবে কমে এসেছে যে আজ আর সজাগ না হয়ে গতি নেই। তখন চাল ছিল ৪/৫ টাকা মন, এক জোড়া ধুতি দু-তিন টাকায় মিলত অধ্যাপকরা তখন পেতেন উর্ধ্বপক্ষে ১৫০/১৭৫ টাকা। আজ চাল যখন ত্রিশ/চল্লিশ টাকা মন তখনও বেসরকারি কলেজের অধ্যাপকদের মাইনে বাড়েনি। তাঁরা তবে খাচ্ছে কি?

অথচ গভর্নিংবডির সদস্য উকিল জজদের উপার্জন অন্যূন ১০০০/১২০০ টাকা। এঁরা কিন্তু অধ্যাপকদের বেতন শুরুতে একশর বেশি করবেন না। ১৯৪৮ সালের বিজ্ঞাপনেও দেখা যাচ্ছে, আবেদনকারীকে ন্যূনতম চাহিদার কথা জানাতে অথবা গুণানুসারে মাইনে দেবার কথা থাকছে ; কার্যত দেখা যাচ্ছে দেশ বিভাগের জন্য কর্মচ্যুত পাকিস্তানভুক্ত এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপক, যাঁর ৪৫০ টাকা মাইনে ছিল তিনি কলকাতার সাধারণ কলেজে ১৩৫ টাকায় চাকরি নিতে বাধ্য হলেন। ঐ পরিমাণ টাকা একজন মুটেও রোজগার করে। ম্যাট্রিক, আই. এ ফেল হুঁশিয়ার ছেলেরাও তিন চারশো উপার্জন করে।

ফার্স্টক্লাস এম. এ. না হলে আজকাল কলেজে শিক্ষকতা মেলে না। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস হলেই কি বিদ্বান ও কুশলী অধ্যাপক হয়! প্রচলিত যে নিয়মে পরীক্ষকরা এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ধার্য করেন, তাতে শুদ্ধচেতনা বা সৃজনীশক্তি না মেপে ফলিত স্মৃতিশক্তির উপর জোর দেওয়া হয় বেশি। এই ফার্স্টক্লাসেরা উত্তর জীবনে সাহিত্যের ছাত্র হলেও সাহিত্য স্রষ্টা বা সমালোচক হিসাবে নাম করেন কদাচিৎ। হয়তো কলেজগুলির চাহিদা ও রুচি মিটিয়ে এঁরা মাস্টার হন ভালো!

সেকেন্ড ক্লাস এম. এ.রা ৭০/৮০ টাকা মাইনেতেও কলেজে ঢোকে। ভালো পড়ানোর খ্যাতি ও বেশি অভিজ্ঞতাকে ডিঙিয়ে ফার্স্ট ক্লাসকে উঁচুপদ ও বেশি মাইনেও দেওয়া হয়। গভীর ক্ষোভে লেখক বলেন যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সেকেন্ড ক্লাস এম. এ.র কলেজে কাজের চেষ্টা করা উচিত নয়। পরিচিতির সূত্রে চাকরি পেলে শেষ দিন পর্যন্ত খোশামুদি করতে হবে। এই সব অবিচার কে দূর করবে? শিক্ষিত সচ্ছল সাধারণ মানুষরা এনিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা বলেন, আপনারা প্রফেসর—এই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানের জিনিস। কিন্তু টাকা না থাকলে এদেশে কি সম্মান মেলে?

অধ্যাপকীয় পরিমণ্ডল, বাছাই বই পড়া, কিছু লেখার প্রেরণা, পত্রপত্রিকা সম্পর্কে অবহিত থাকা, নূতন ও পুরানো বইয়ের সন্ধান রাখা—শুধু প্রয়োজনে নয়—ভালবাসার তাগিদে। দিনগত পাপক্ষয় নয়—কোনো সমাহিত অধ্যাপককে এই পরিবেশ থেকে ভাঙিয়ে অন্য লাইনে 'বড় চাকরিতে' নিয়ে যাওয়া যায় না। এমন সুধী আত্মস্থ শিক্ষকের সুসমাবেশ অর্থকৃচ্ছ্রতায় দিনের পর দিন কমছে। শিক্ষকতাই একমাত্র কাজ যা সবচেয়ে অচল ধীর অভিনিবেশ দান করে।

অবলুপ্তপ্রায় এসব শিক্ষককে কি সমাজ সৎরাষ্ট্রের শত্রু মনে করছে। বড়ো ব্যবসা আরো স্ফীত হচ্ছে, সদাগরী ও সরকারি সুধী অফিসারেরা নামডাকে মৃগয়ায় আরো দৌর্দণ্ড হয়ে উঠছে আর যেভাবে প্রাইভেট স্কুল কলেজের শিক্ষকরা ভাতে কাপড়ে নিকেশ হতে চলেছে তাতে নিশ্চিত রাষ্ট্র এদের দিয়ে সমাজের কোনো হিত হয়—একথা ভাবেনা।

যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালী জীবনানন্দের এই নিবন্ধটি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যার মুদ্রিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ লেখাটির সারাৎসার হলো—

ইংরেজ শাসনকালে সুযোগ ঘটেছিল শিক্ষিতদের চিন্তাযুক্তি ব্যবহারের। রামমোহন শুধু রাষ্ট্রীয় নয়, সমাজ সংসার ধর্ম শিক্ষা বিচিত্র বিষয়ে যে নূতন ধারণা সৃজন করেছিলেন তা থেকে আমরা এগিয়েছি মনে হয় না। বরং ঢের নূতন সংস্কার জমছে। যুক্তিবাদ বাতিল না হলেও আর কোনো রামমোহন জন্মান নি। এ নয় যে দেশ অন্ধতায় ডুবেছে। কিন্তু বাংলা ভারতের প্রতিনিধি না হলেও এদেশ বিশ্লেষণ করলে ভারতের পরিস্থিতি অনেকটা বোঝা যাবে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শ্রেষ্ঠত্বের গোঁড়ামি ছেড়ে জগৎ থেকে প্রচুর শিখতে হবে। সকলেই আমাদের মহৎ শিক্ষা দিতে পারে। উন্নত মন ও সতর্ক না হলে জাতীয়তার ফল নানা অর্থে খারাপ হবে।

রামমোহনের যুক্তি আর কাজের পুরস্কার বাঙালীই বেশি পেয়েছিল কিন্তু সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। রামমোহন মানুষের ও দেশের কল্যাণ চাইতেন, চাইতেন স্বাধীনতা। কিন্তু স্থূল জাতীয়তাবাদী ছিলেন না তিনি। আজ জগতের সব রাষ্ট্রই জাতীয়তাবাদী। কল্যাণ যুক্তি ও সেবার পথে কেউ চলে না। ফলে যুক্তি ও কল্যাণের বিনাশ রোধ করা কঠিন। বিশ্বের মানসিকতা না বদলালে বিচ্ছিন্ন দেশের মন ও কর্মপদ্ধতি পালটানো অসাধ্য। একক দেশের পক্ষে খাঁটি হয়ে থাকা হয়তো অসম্ভব।

ধার্মিকরা ভাবছেন, ঈশ্বর কোনো বিশেষ জাতির বা ধর্মের পোষক। এক ধর্মের মানুষ ইংরেজ ও জার্মানদের সম্পর্কে চিড় ধরেছে জাতীয়তা নিয়ে। সবাই ভাবে ধর্ম মানে

কল্যাণ নয়—নিজ জাতির নীতিহীন উন্নতি। যারা অধ্যাত্মের পরোয়া করে না, পার্থিব সদাচারের ত নয়ই, তাদের কাছে জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা সত্য ও বাস্তব।

লেখক 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, বাংলা প্রথম শ্রেণীর ভাষা। নিজের দেশ বা ভাষাগত আবেগ থেকে এই ভাষা ও সাহিত্যের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা দাবি করা যায় তাতে এর বিশদ ব্যাখ্যান ও সম্পদ বর্ণনা করে মন আবিষ্ট ও বিহ্বল করা যায়। পৃথিবী বিশিষ্ট ও প্রধান ভাষা ও সাহিত্য হলেও এমন ছোট গরীব বিপন্ন ও বিশৃঙ্খল দেশের সাহিত্যিকরা যত কর্মঠই হোন, ইংরেজির লোপ আর হিন্দির প্রতিপত্তির দিনে আসন্ন দুর্দিন ঠেকাতে পারবেন না। আরো স্থান, মানুষ আর রাষ্ট্রের সাহায্য চাই। ওটি লেখার সময় এ ভাষার সম্পর্কে এসব আশা-আকাঙ্ক্ষাই মনে ছিল। ভাষা ও সাহিত্যের মতো শুদ্ধ জিনিসও মনকে অবিকার রাখতে না পারলে মন্দ জাতীয়তাবাদ হতে পারে। আজ বাংলার এই বিপদের দিনে এনিয়ে ঢের ভাববার ও করার আছে। কিন্তু সদ্ভাব ও যুক্তি মানতে হবে। সেটাই শ্রেয়ের পথ। উত্তেজনার পথে যাওয়া অসঙ্গত হবে।

রুশ বিপ্লব ঘটে যাবার পরে ভারতীয় সমাজমানসে তার অস্পষ্ট প্রভাব পৌঁছেছিল। যুক্তিবাদীরা বুঝেছিলেন, রামমোহনের, তারপর বিদ্যাসাগরের কাজও যুক্তির পর তৃতীয়ে ধাপে এই বিপ্লবের পূর্ব ও উত্তর সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণের দরকার ছিল। কিন্তু সে পথে চেষ্টা না করে মহাত্মা গান্ধী যে শান্ত বিপ্লবের চেষ্টা করছিলেন ভারত ও বাংলা সেদিকে ঝুঁকল। কিন্তু গান্ধী দর্শন ও যুক্তি বাঙালী নিল না।

মার্কসবাদেও জিজ্ঞাসার একান্ত মূল্য আছে, বাঙালী জীবনে তার প্রভাব শিথিল। পণ্ডিতদের বিতর্কের মধ্যেই এখানে মার্কসবাদ স্থিত। তার সামাজিক ব্যবহারের কিছু বিরল নিদর্শন মেলে। লেখকের মনে হয় না তবু যে জীবন ও সমাজ সমস্যার কোনো সুধী শাশ্বত মীমাংসা আছে। যদিও যুক্তি ক্ষুণ্ন করলে সমস্যা বাড়ে।

লেখক ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। নীতিকে ধর্ম ভাবলে পৃথিবীকে ধর্মনিষ্ঠ ভাবলে তৃপ্তি মেলে। কিন্তু ধার্মিকরা নীতি ও যুক্তিকে ধর্ম মনে করেন না। এগুলো বাদেও ধর্ম চলে, তাতে চৈতন্য অনাবশ্যক। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, বুদ্ধিমানরাও ভক্তি, অন্ধভক্তিকেও ধর্ম মনে করেন। ঈশ্বর আছেন কিনা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু কারো ভাবাবেগে তাঁর শুদ্ধ স্বরূপ আছে মনে হয় না। তবু জিজ্ঞাসার জায়গায় ভক্তিকে বসিয়ে এরা যেভাবে নিবেদন জানায় তা সরল ও আন্তরিক, তার বেশি কিছু নয়। একথা ভাবার দরাকর। জ্ঞানবিজ্ঞানের নিট ফল বাঙালী বোঝেনি বা কাজে লাগায়নি। জীবনের সবক্ষেত্রে দেখা শোনা বোকার স্পষ্টতা আসার প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। উনিশ শতকের গোড়ায় যা এসেছিল তার বিকাশের বদলে পতন ঘটেছে। আজকের বাঙালীর জিজ্ঞাসা বিমুখতা সর্বজনবিদিত।

বাংলাদেশে নব্যন্যায়ের জন্ম—রামমোহন বিদ্যাসাগর ও দুচারজন মনীষীকে ইংরেজি শিক্ষা প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসার প্রাধান্য আজ বাঙালী জীবনে নেই। ওঁদের যুক্তি দর্শন জাতীয় জীবনে স্থায়ী ছাপ রাখেন নি। যুক্তিবাদী বলবেন ধর্মের ক্ষেত্রে নীতি পুরোটাই ধর্ম, বাকিটা হলো ব্যক্তিগত চেতনা ও সংবাদ। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত ধার্মিকরা মেনে নেবেন এটা দুরাশা।

দেশ পত্রিকার ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে অগস্ট **শিক্ষার কথা** প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, লেখকের বক্তব্য কেবল বাংলা দেশটুকুর শিক্ষার ধারা নিয়ে। মেকলে, রামমোহনরা ইংরেজি শিক্ষার আদি কাঠামো গড়েছিলেন তার উপরেই সামান্য ভাঙাগড়া চুনকাম চলেছে। গত পঞ্চাশ বছর সেই জীর্ণ কাঠামোই বহাল আছে। স্কুলের পাঠ্য বই পাল্টায়নি। অভিন্ন কবিতা বা গদ্য পাঠ্যাংশ যুগ যুগ শিক্ষকরা প্রায় একই ভাবে পড়াচ্ছেন।

আগে অবশ্য পাঠ্যপুস্তক বলে কিছু ছিল না যদিও কয়েকটি বই পড়াবার নির্দেশ দেওয়া থাকতো। তা থেকে টেকস্টের প্রশ্ন কিছু করা হতো না। কোনো পাঠ্যেরই নোট বই ছিল না। তবু গড়পড়তা ছাত্ররা বেশি নির্ভুল ইংরেজি শিখতো। লেখকের মনে আছে পঁয়ত্রিশ বছর আগে 'লিজেন্ড অব স্লিপিং হলো' বইটির জন্য বাজারে অনেক খুঁজে উইল্‌সন নামের এক লেখকের একটি নোট মিলেছিল যাতে শক্তশক্ত শব্দের মানে আর কঠিন বাক্যগুলির অল্পস্বল্প ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই ছিল না।

তখন বাড়িতে বা শিক্ষকের কাছে, মন আর অভিধানের সাহায্যে ছাত্ররা নোটবই ছাড়াই ইরেজি পড়তো। কবিতার বইগুলোর পিছনে, অপ্রচলিত শব্দার্থ ও ভাবভাষার খটকা এককথায় ভাঙাতে স্বল্পতম টিকা থাকতো। এই টিকার সাহায্যেই ছাত্ররা সাহিত্যরস পেতো, আজ বাজারের ঢাউস বাচাল নোটবইতে বাংলা মানে দেওয়া সত্ত্বেও ছেলেরা ইংরেজিতে দুর্বল : বলা নিশ্চয়ই যায় না যে ছেলেরা নোট পড়ে বলেই ইংরেজিতে ফেল করে। কিন্তু একমাত্র নোটবই ধরে পড়াশুনা করে ছেলেরা ইংরেজিতে নিতান্ত কাঁচা হয়ে যায়।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর সরকার ইংরেজি রাখবেন না বলেছেন। এত কম সময়ে হিন্দি বা বাংলা ইংরেজির জায়গা নিতে পারবে না। আরো কয়েক দশক, সম্ভবত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের ইংরেজি শিখতে হবে, কেননা ইংরেজিই এখন পৃথিবীর বিদ্যা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বাহন। সে পর্যায়ে উঠতে বাংলা (হিন্দির আরো) ঢের দেরি।

এদেশে বুনিয়াদী ইংরেজি চালানো যেতে পারে। নিখুঁত ইংরেজি নয়, ব্যাকরণের মোটা মাঝারি ভুল না হলেই হলো। অল্পসংখ্যার ছাত্র শক্তি ও রুচি অনুযায়ী ইংরেজি সাহিত্য পড়বে। সবাই নয়। বছর চল্লিশ আগে অনেক ছাত্রই শুদ্ধ ইংরেজি জানতো, আজ প্রায় কেউ জানে না। রাতারাতি দেশ উন্নত হবে না, তবে মনে হয় ব্রিটিশ ভারতের চেয়েও অবস্থা তখন খারাপ। বেশি মানুষ বেকার গরীব ও উপোসী। এ নিষ্ফলতা ও ক্ষয় ছাত্রদের মধ্যে ষোল-আনা ঢুকেছে।

বিশৃঙ্খলার উপর সুশিক্ষা দাঁড়ায় না। শিক্ষা কমিশনে, গান্ধী ও সার্জেন্টের খসড়ায় নানা রদবদল ও পরিবর্তনের সুপারিশ আছে। কিন্তু শাসকদের ধারণা এতো পিছিয়ে যে কাজ হচ্ছে না। সিলেবাস ভারি। স্বাধীনতার আগে দেশকে দাঁড় করানোর সর্বাত্মক বিশ্বাসের আবহ ছিল, আজ ঢিলেমি আর লক্ষ্যের অস্পষ্টতা। আগে ছাত্ররা শুধু শুদ্ধ ইংরেজি শিখতো না, শিক্ষায় সার্থকতা পেতো। কিন্তু শিক্ষা বিজ্ঞানের পরিণতি ও ট্রেন্ড শিক্ষক সত্ত্বেও ছাত্ররা অসার অসুস্থ। এটা দূর করতে না পারলে তারা বাংলাও শিখবে না। নোট বই ছেড়ে পাঠ্য বই ও অভিধান ব্যবহার ও স্বাধীন চিন্তা যুক্তি জিজ্ঞাসার চল দরকার। সরকার থেকে বেশি টাকা, শিক্ষাবিজ্ঞানের সাহায্য না পেলে এর স্থায়ী সুমীমাংসা

হবে না। লেখকের ধারণা, বিচারবিবেচক সরকার তার আর্থিক সঙ্গতি এখন বহু দূরের জিনিশ। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা আন্তরিকভাবে চিন্তা চেষ্টা কাজ করছেন, তাদের প্রচুর দায়িত্ব। সরকারি সহায়তা পেলে ভালো, তবে দেশবাসী, শিক্ষাকর্তা এবং কর্মীদের সহায়তা নিতান্তই জরুরী দরকার।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘে হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংকলন **'কেন লিখি'** প্রকাশ হয় তাতে জীবনানন্দ নিজের লেখা সম্পর্কে লেখেন, জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা অসম্ভব। আকাশ পাতাল সঞ্চারী কবির অভিজ্ঞতাও তো মানবীয়। অবশ্য কিছু কবি বা কাব্যনিয়তির পথে কিছু মুহূর্তে মনে হয় কবির ভাবনাপ্রতিভা এমন অরূপ অপ্রশান্তির আস্বাদ পেয়েছে যা জীবনের কোনো ব্যবহারের মধ্যে ধরা পড়ে না এই ইতিহাসস্মৃতি জীবন ছাড়িয়ে কবিমানসের অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চলে গেছে। কোনো কবি এভাবে ভাবলে বুঝবো নিত্যকার ব্যবহার্য সমাজ পদ্ধতির বাইরের কিছুর কথা ভাবছেন, তবু জীবন ছাড়িয়ে চলে যেতে পারেননি। কারণ জীবন-জীবনপদ্ধতি সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়ো, মানুষের সমবায় ব্যবস্থা বারবার ভাঙে গড়ে, এই গ্রহের জীবন সাক্ষ্যের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মানুষ বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অন্যরূপে কল্পনা করতে পারে না। তার কল্পনা প্রতিভাব চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে মূল্যবান কথা আবিষ্কার ও প্রচার করার সুযোগ পায়। এ হলো কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়।

যাঁরা কবিতাকে সমীচীন গদ্য বা ভূয়োদর্শী সম্পাদকীয়ের মতো ভাবেন তাঁরা বলতে পারেন কবিতা সব সময়েই সৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু মানুষের ভূয়োদর্শী মনতো কবিতা রচনা করেনা তার ভাষা ও অর্থে দিব্য ইঙ্গিত থাকে, থাকা অপরাধ নয় অন্তত। কিন্তু যারা তা ভাবেন, কবিতাকে মনে করেন সৎ সম্পাদকীয় উক্তি সদৃশ তাদের মতে কাব্য রচনায় ভাবনা প্রতিভা ও হৃদয়াবেগের কোনো দরকার নেই। রচয়িতার জীবনদর্শী মন ও মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করার মতো লিপিকুশলতাই যথেষ্ট। কিন্তু ও দুয়ের উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্যে যে সুলিপি প্রবর্তিত হয় তাই কি কবিতা। আমার মতে সুসমাচারের মতো সুলিপিকেও অবান্তর করে দিয়ে কবিতা আপন চরিত্রলে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। পূর্বজ কবিরা একে মায়াবল ভাবতেন, আমি চরিত্রবল বলছি, যা রচনা সৌষ্ঠবকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়ে দুএকটি লাইন, কয়েকটি লাইন বা সম্পূর্ণ জিনিসটাকে অবিসংবাদী কবিতা করে দেয়।

সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে কবিতার সংজ্ঞা ও কবিতাপাঠ সম্পর্কে ধারণা লেখক ও পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হবে। এ আশা স্পষ্ট পোষণ করার মতো উৎসাহ অভিজ্ঞ মানুষের হৃদয়ে আজ হয়তো নেই। কিন্তু সে আশা যাতে ছলনার মতো থেকে না যায় এজন্য আধুনিক লেখকরা অবহিত হয়ে উঠেছেন।

আমিও অবহিত--হয়তো অসমর্থ। আমার সৃষ্টিজগন্নাথও সূর্য ও তপতীকে আশ্রয় করে, হয়তো তপতীকেই অবলম্বন করেছি বেশি ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য। কবিতা কি, তার কাজ কিকরে কবিতাকে গ্রহণ করতে হবে এ সব প্রশ্নের পরিচ্ছন্ন

সহজ উত্তর না পেলে উভয় পক্ষই অস্বস্তি বোধ করবেন। আমার ও জীবনের পরিজনদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে জ্ঞানময় করার প্রয়াস পাই এই কথা প্রচার ক'রে যে জীবন নিয়েই কবিতা। কবিতা নিরন্তর আধুনিক মানবজীবনকে শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে চলেছে স ধারণা ঠিক হবে না। কবিতার ঐতিহ্য বুঝলে জানতে পারি, কবিতা মানব কল্যাণকে প্রত্যক্ষভাবে চরিতার্থ করে না বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও ভীষণতা আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে তৃপ্ত করতে ভাবনাকে সর্বমাননীয় পরিসর দেয় অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদে নিহিত সর্বনাশ জানিয়ে তাকে মহত্তর ও গ্লানিহীন করতে চায়—হৃদয়কে ক্রমশ বিশুদ্ধ করে।

এই সমস্ত করে বলেই আমাদের গতিপরিণতির কাহিনী নিয়েই কবিতা। পরিণতিহীন জীবনকে সজাগ ও শালীন করে তোলার ভার কবিতার উপর। তবু কবিতার উপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কবিমানস কারুনির্দেশ পালন করে না। সৎকবিতা খোলাখুলি ভাবে নয়, নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের এবং তারপরের শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা। মহৎকবির ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক, অভিজ্ঞতা সজাগ চেতনা অবচেতনা সক্রিয় এমন মানুষ জীবনের উন্নতিশীল ভাঙাগড়ায় শুভ ও সঠিক আত্মনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির ভিতরেই এরা বেশি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়, বাস্তব কার্যক্ষেত্রে তেমন মহৎ নন।

একথা বলতে আমি আত্মবিস্মৃত কিনা সমকালীন কবিবন্ধুরা বিচার করে দেখবেন।

এই বিষয়গুলি অনুভব করেই আমি লিখি। কিন্তু কবিতার এমনকি সুলিপি সৃষ্টির জন্যও লেখা প্রয়োজন মনে করি। আজকের দুর্দিনে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ তা কাটানোর জন্য কিভাবে প্রয়াসী হতে পারা যায় এসব বিষয় নিয়ে কোনো প্রবীণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশও মূল্যবান জিনিস। অগণন কবিমনীষীর সৎজীবননির্দেশ সমুদ্রের মতো আমাদের হৃদয়ের কাছে আছে। তবু তা আমাদের জন্য লবণাক্ত, ওপাশে জীবনের অন্নপূর্ণা মরীচিকা তবু তাতে প্রমাণ হয় না কবিতা সাহিত্য ও সুলিপির ইতিহাস বিশ্বমানবের ভাবনা চেতনাকে ঋদ্ধ করেনি।

শোষিত মানবজীবনের বিপ্লবের বিপ্লবোত্তর আশাবাদের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়ে কবিতা মহৎ হয়। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময় প্রকৃতি ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিস হয়েও কেবলি শ্রয়মান, ধ্যেয়মান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞতা ;—ও এই অভিজ্ঞতা—এই সুজাতার থেকেই উৎসারিত।

কবি কথা
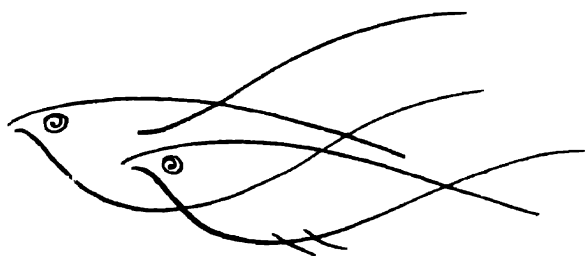
জীবন প্রসঙ্গ

ইংরেজ কবি শেলি নীল নভ থেকে ভেসে আসা স্কাইলার্কের গানকে 'বিদেহী কণ্ঠস্বর' কল্পনা করেছিলেন। বাঙালীদেরও বোধহয় দৃঢ়বিশ্বাস, কবিদের শরীর নেই, জীবন নেই, জীবনের শতবিধ প্রয়োজনে ব্যাপৃত হতে হয় না তাঁদের। শুধু তাঁদের দেহাতীত বাণী আছে, কবিতা আছে, গান আছে, যে গান আকাশ থেকে ভেসে আসে দৈববাণীর মতো।

এ বিশ্বাস যদি না থাকত, তবে আমরা কবির কদর বুঝতাম, কবিতার দর দিতাম। কবির লেখা অ-মূল্য বলে অ-মূল্যে কিনে নিতাম না। কবি যে একজন মানুষ, যে বেঁচে থাকে, জীবনের অভাব-দৈন্যে দুঃখে দ্বন্দ্বে পীড়িত হয় একথা আমরা নির্মম ঔদাসীন্যে ভুলে থাকি!

লোকে বলে বাঙালী কবির জাত। যারা বলে, তারা একটি মিথ্যা উক্তির নির্বোধ পুনরুচ্চারণ করে। বাংলাদেশে কবিতা লেখেন অনেকে, কিন্তু কবি দুর্লভ। তার চেয়েও কম, কবিতা ভালবাসেন, পড়েন এবং বোঝেন এমন পাঠকের সংখ্যা। এদেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে ছিল যে মানুষ, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঁচালী শুনতো, ছড়া আওড়াতো, ভাটিয়ালী, কীর্তন গান গাইতো, আজ তারা লুপ্ত হয়ে গেছে অভাবে, অশিক্ষায়, অবস্থার অস্বাভাবিক চাপে। বেনে ইংরেজের আওতায় যে আধা-শিক্ষিত কলমপেশা আত্মাভিমানী মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, তাদের না আছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, না আছে মার্জিত রস-রুচি। মাইকেল মধুসূদন যখন ফ্যাশন ছিলেন তখন তারা মাইকেল মাইকেল বলে চীৎকার করেছে, রবীন্দ্রনাথ যখন দরবারে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথই তাদের জিগির হয়েছে। হুজুগ এমনি আরো অনেককে নিয়ে। বলা বাহুল্য এঁদের তারা পড়েছে বুঝেছে—এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছুই হতে পারে না। মূর্খ ধনী কাঁচের আলমারিতে বই সাজায়—এদের সাহিত্য-চর্চার উৎসাহের উৎস তার চেয়ে গভীরতর কোথাও নয়।

অথচ এই সব কবির সৃষ্টির মর্মসূত্র আদৌ দুরূহ ছিল না। হুজুগের বদলে কবিতায় সত্যিকারের অনুরাগ থাকলে এই কবিরা সমাদৃত হতে পারতেন।

এদেশে সাময়িকপত্র আছে প্রচুর। কিন্তু পাঠক রসিক আর সম্পাদকরা কাব্যবোধশীল হলে তাতে সংখ্যাতীত অকাব্যের বদলে কিছু সৎকবিতার প্রকাশ হতো। ভালো কবিরা আশ্রয়, অর্থ ও মর্যাদা পেতেন। অসংখ্য অকবির সাথে মিশিয়ে তাদের মুড়ি-মিছরির একদর করা হতো না।

কিন্তু যে দেশে রেওয়াজ আছে বলেই কবিতা প্রকাশ করা হয়—বিচার করে নয়, সেখানে বিজ্ঞাপনেরই জয়জয়কার। সেখানে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারা স্বীকৃত হন না বরং ধিক্কার

জোটে তাঁদের, নিকৃষ্টের ভাগ্যে প্রচুর বাহবা মেলে। কবিতার চেয়ে পদ্যের, ছড়ার যেখানে আদর, কবিতা নিয়ে কোনো গভীরাত্মক আলোচনা ও চর্চা সেখানে বাহ্য বিবেচিত হয়।

এদেশে কাব্যানুরাগ যে কত ভুয়া তার আরো বড় প্রমাণ হলো এদেশে রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন ছাড়া আর কারো প্রামাণ্য বা স্বাদু জীবনী নেই। কবিদের ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল সহানুভূতি এবং অনুসন্ধিৎসা নেই। কাদের সম্পর্কে আছে সে কথা উল্লেখ না করাই ভালো।

সম্প্রতিকালে কবি জীবনানন্দ দাশ উত্তর-রবীন্দ্র কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অনেকের কাছে বিবেচিত হচ্ছেন। তার কতটা কবিতার তুলনামূলক বিচারশীলতা ও কাব্য-চেতনার অনুভব থেকে এসেছে, কতটাই বা যুগের হুজুগ—যে সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবার অবকাশ আছে। তিনি কতবড় কবি ছিলেন, আধুনিক কাব্য-চেতনার দিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের আসরে তাঁর স্থানটি ঠিক কোথায়, সে সম্পর্কে এদের কোনো সুনির্ণিত বোধ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আধুনিককালে কাব্য-বিচারের পুরনো পর্যায় পেরিয়ে আমরা এমন এক নূতন আদর্শে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে মূল্যায়নের নূতন মানদণ্ডগুলি চিনে নিতে না পারলে কবির গুণাগুণ বিচার করে তার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হবে না। ধ্বনি ও রস-নির্ণয়ের পুরানো রীতি অতিক্রম করে নব নব পদ্ধতি ও প্রকরণে ঋদ্ধ কবিতার নবাধিকৃত ভাবক্ষেত্র এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিভিন্ন শিল্প-মতবাদ সমন্বিত কবিতার সাম্প্রতিক রূপরাগ অধিগত করতে না পারলে আধুনিক কবিতার গতিপ্রকৃতি এবং আধুনিক কবির সাধনা ও সিদ্ধি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হবে না।

আমাদের বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথ বাদে, বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অজস্র সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু যা লিখেছেন তাতে যেমন শিল্পীর কুশলতা আছে তেমন হার্দ্য-স্বভাব ও সুস্থ-মননের সমন্বয় হয়েছে। তিনি আধুনিক শিল্প-চেতনা ও আন্দোলনের মূল ধারাস্রোতগুলিতে গাহন করেছিলেন আর তার দ্বারা সুন্দরভাবে সঞ্জীবিত করতে পেরেছিলেন বাংলা কবিতাকে। তাঁর কাব্যের ভাব-পরিধি রবীন্দ্রনাথের মতো বহু ব্যাপক না হলেও সুপরিসর ও হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী ছিল। সর্বোপরি একই বিষয় বা বক্তব্যের অনুবর্তন নয়, পরন্তু নব নব নিরীক্ষা ও সাধনার পথে তিনি নিজেকে উদ্যত রেখেছিলেন। বর্তমান-কালের বিশ্বের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ কবিদের সামনে উদ্ধৃতি-যোগ্য সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর। বাংলাদেশের মতো স্তিমিত চেতনার দেশে জন্মেছিলেন বলেই জীবিত কালে তাঁকে ঘিরে যথেষ্ট আলোচনা, আন্দোলন ও প্রচার হয়নি, নইলে যাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে জীবনানন্দের যোগ্যতা কম ছিল না।

কিন্তু জীবনানন্দের প্রতিভার বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কাল যখন নিরবধি এবং পৃথ্বী যখন বিপুলা, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বিনষ্ট না হলে—তিনি প্রাপ্য মর্যাদা পাবেনই। কুক্কুটের কাছে অনাদৃত গজমোতি জহুরীর কাছে অবহেলা পায় না। কিন্তু তাঁব জীবনের সুবিস্তৃত কাহিনী যদি এখনই সযত্নে রক্ষা করা না হয় তবে ভাবীকালের মানুষ, আক্ষেপ নয়, একালের অধিবাসীকে অভিসম্পাত করবে। কারণ আমরা ধরে না রাখলে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীকে ভাবীকালের মানুষ কোথাও আবিষ্কার করতে পারবে না।

জীবনী লেখা বাঙালীর ধাতে নেই। এখানে সাহিত্যিকরা লাভের জন্য অথবা লোভের জন্য সাহিত্য-সেবা করেন, আদর্শের জন্যে নয়। সেই জন্যে পরের জীবনীর চেয়ে আত্মস্মৃতি লিখতে পছন্দ করে তাঁরা। কারণ তাতে শ্রম নেই, লেখা যায় সহজে। নিজের ঢোল নিজে বাজিয়ে সুবিধে না থাক অসুবিধে নেই, কিন্তু পরের গুণকীর্তনে পেট ভরে না। জীবনীর কাটতিও নেই বাজারে। আর কবির জীবনী। কি হাস্যকর! অর্ধশতাব্দীতে যাঁর বইয়ের সংস্করণ হয় না, তাঁর আবার জীবন? তিনি একসময়ে বেঁচে ছিলেন, তারপর মারা গেছেন, মধ্যে কতগুলি দুর্বোধ্য কবিতা লিখে গেছেন—এর চেয়ে আর কি খবর থাকতে পারে আধুনিক কবির সম্পর্কে?

আমরা জীবনানন্দের জীবনী লিখতে বসিনি। সে সুযোগ এবং ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমরা এমন নিষ্ঠাবান নির্লোভ সাহিত্যসেবীকে আহ্বান করছি যিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখবেন। তাতে তিনি আর্থিক লাভবান হবেন এমন আশ্বাস দিতে পারি না, কিন্তু ভাবী কালের মানুষের কাছে তিনি যে চিরশ্রদ্ধেয় হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

জীবনানন্দের জীবন ঘন-ঘটনা সমাচ্ছন্ন নয়। এক একজন মানুষ থাকেন প্রতিভা যাঁদের জীবনে উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভের মতো। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে তাঁরা অতি সাধারণ। তবু সেই আপাত-সাধারণ জীবনও তুচ্ছের নয়, তাচ্ছিল্যের নয়! কারণ সেই উজ্জ্বল আলোকময়তার উৎস রয়েছে আপাত-সাধারণ জীবনেরই অভ্যন্তরে। খণ্ডাংশ পরিদৃশ ভাসমান তুষার শৈলের মতো তাঁর জীবনের বাহ্যিক ঘটনামান্দ্যের নিচে তীব্র চেতনার আলোড়নময় যে বিশাল অন্তর্জীবন থাকে যার পরিচয় বাইরের কার্যাবলীতে পরিস্ফুট হয় না, কিন্তু চরিত্রের উপাদান রচনায় ও প্রতিভার বিকাশে আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য করে। জীবনানন্দও তেমন একজন। এই জন্যেই তাঁর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও তার বিশ্লেষণ তাঁর কাব্যরসপিপাসুর কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

মধুসূদনের মতো যে শিল্পীর বহির্জীবনটাই ঘটনাবহুল ও একমাত্র, অজস্র ঘটনা ও আলাপে আচরণে যার অন্তরের অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাবনা ও পরিণতি ব্যক্ত হয়ে আছে, তাকে নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই জীবনী-রচকের। কিন্তু বঙ্কিমের মতো যিনি নিজের মনোগহ্বরে আত্মগূঢ়, নিজের জীবন, নিজের চিন্তা-চেতনা যিনি নাটকীয়ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেন না বা ইচ্ছা করেন না, তীব্র চেতনা-সম্পন্ন অনুভূতিশীল সেই সব মানুষ নিয়েই সমস্যা। জীবনের কোনো ঘটনা এবং কোনো অনুভব অথবা পরিচিতদের জীবন থেকে লাভ করা অথবা গ্রন্থলব্ধ কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ও জীবনে কি দুরপনেয় স্বাক্ষর রেখে যায় অতি অন্তরঙ্গ ছাড়া কেউ তা বলতে পারে না এবং আত্মীয়দের পক্ষেও সব বিষয়ের সন্ধান এবং সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্যার একটা দৃষ্টান্ত জীবনানন্দের জীবন থেকেই দেওয়া যেতে পারে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় কবি এক লাশকাটা ঘরের কাহিনীকে অবিনশ্বর করে রেখেছেন। এই কাহিনীর উৎসের অভিজ্ঞতা তিনি কবে কোথা থেকে কি ভাবে সঞ্চয় করেছিলেন তা কবি ছাড়া কারো পক্ষেই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। অথচ জীবনানন্দের জীবনী প্রসঙ্গে কেউ কেউ বরিশালের বাড়ির সন্নিকটের এক বিশেষ মর্গের কথা, সেখানে

জীবনানন্দের বেড়ানোর বিবরণ এমন ভঙ্গিতে দিয়েছেন যে এই মর্গকে ঐ কবিতার উৎস মনে করা বিচিত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে সেই তথ্যকে ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ ঐ কবিতার উৎস পর্যালোচনা পর্যন্ত করেছেন।

আমরা ঐ মর্গের অস্তিত্বের কথা, সেখানে জীবনানন্দের বেড়াতে ভালবাসার কথা কিছুই অস্বীকার বা অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু তবু আমরা পুরো ব্যাপারটাকে 'কাকতালীয়' বলতে ইতস্তত করি না। বরিশালের ঐ মর্গটি কবির বহু পরিচিত হলেও ঐ কবিতাটির উত্তেজের মূলে সেটাই, একথা যেমন জোর করে বলি না, তেমনি তাকে অস্বীকার করার মতো তথ্যও আমাদের নেই। কিন্তু কবির কল্পনার প্রেরণা-মূলে তাঁর কোনো দেখা ঘটনা, অথবা শোনা অথবা বইতে পড়া কোনো অভিজ্ঞতা অথবা সম্পূর্ণ কল্পনা কাজ করে অন্য ব্যক্তির তা বলা সম্ভব নয়। তাই আলোচনার সময় সতর্ক হতে হয়। অনুমানের কথা অনুমানের মতো করেই বলতে হয়। এই ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও সংযম জীবনী লেখকদের থাকা ভালো।

জীবন বৃত্ত

১৩০৫ সালের ৬ই ফাল্গুন, (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরে জীবনানন্দ দাশ জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কবির জীবন অন্তত একান্ত আকস্মিক ও ভুঁইফোড় হতে পারে না, সযত্ন লালন, স্নিগ্ধ শুশ্রূষায় ফুলের গাছের মতো কবির-মন সঞ্জীবিত ও বিকশিত হয়ে থাকে। জীবনানন্দের মনোজীবনও এমনই পিতামাতার বিশিষ্ট সাধনা ও স্বপ্নের সুস্মিত পরিণতি। তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনানন্দ লিখেছেন— "আজ অনুভব করি যে তাঁদের নানা বিজ্ঞানের ভূষণ ছিল না, কিন্তু মহত্তর মর্মজ্ঞান ছিল, তাঁদের উচ্চাকাঙক্ষা ছিল না, কিন্তু সকলের জন্যে যতদূর সম্ভব হিতাকাঙক্ষা ছিল।..... আমরা তাঁর সন্তান, য়ুনিভারসিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছি অনেক দিন হতে চল্ল। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম আমরা? আমি অন্ততঃ তিনজন মানুষের কাছে। একজন বাবা, একজন মা, আর একজন ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাষ্টার আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বরিশাল স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে অনেক বড় বড় কলেজে পড়েছি, য়ুনিভারসিটিতে পড়েছি, কিন্তু আজ জীবনের মাঝামাঝি এসে প্রতিনিয়তই টের পাচ্ছি যে আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি এঁদের হাতে গড়া। এক এক সময়ে মনে হয় মহাভারতের রচনাকর্তা বেদব্যাসের মত দৃষ্টি নিয়ে এরা সবই শিখিয়েছিলেন আমাকে, আমার জীবনে সে শিক্ষা যদি ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসূ না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের কোনো দোষ নেই, যদি মনোলোকে কিছু সার্থক হয়ে থাকে তাহলে এঁদেরই প্রশস্ত দানের ফলে।"

সুতরাং জীবনানন্দের জীবন রচনায় তাঁর পিতামাতার যে মূল্যবান ভূমিকা আছে সেটি স্বীকার করতে হবে। তাঁর বাবা সত্যানন্দ দাশ বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশানের শিক্ষক ছিলেন। যে যে গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী হলে জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায় সেই দুর্লভ শক্তি তাঁর আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকতাকেই তিনি

জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এজন্যে অন্তত কোনো আক্ষেপ ছিল না তাঁর জীবনে। আজীবন নির্ভীকভাবে, উদ্বোধিত হয়ে চিত্ত প্রসাদের সঙ্গে তিনি কাজ করে গিয়েছেন।

তিনি সে যুগের একজন সাধারণ গ্রাজুয়েট ছিলেন, কিন্তু অসামান্য গ্রন্থপ্রীতি ছিল তাঁর। ভাল লাইব্রেরি ছিল বাড়িতে। নিজে ক্বচিৎ যা লিখতেন তাতে উচ্ছ্বাস কম, সংহতি বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মননিষ্ঠা তাঁর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ডারউইন, হাক্সলি, মিল থেকে সুরু করে ওয়েলস, রাসেল এমনকি মার্কসিজম কম্যুনিজম পর্যন্ত তার অনুসন্ধিৎসার বাইরে ছিল না। সাহিত্যে তিনি ধারাবাহিক ঐতিহ্যের মূল্য স্বীকার করতেন এবং প্রাকলব্ধ সংস্কার নিয়ে কোনো দেশের সাহিত্য পাঠে অগ্রসর হতেন না। ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যুগ এলিজাবেথীয় সাহিত্য কিম্বা সপ্তদশ শতকের মেটাফিজিক্যাল কাব্য, বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব বঙ্কিমী রাবীন্দ্রিক ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্য, রাশিয়ার টলষ্টয় ইত্যাদির প্রতি তাঁর উদার অনুরাগ ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে তিনি তথাকথিত ন্যাশানালিজম ও স্বদেশপ্রীতির প্রভেদ বুঝতেন, তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে ভিক্ষুক বৃত্তির পরিবর্তে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনকে আবশ্যিক মনে করতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ব্রজমোহন স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের যে উন্মেষধর্মী সংঘ গড়ে উঠেছিল—সেখানে এই জাতের সাহিত্যিক লৌকিক নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আলোচনায় বিকেল ও রাত্রিগুলো উজ্জীবিত হতো।

সত্যানন্দ দাশ সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, নেতা ও বক্তা ছিলেন—এই সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতার সঙ্গে সাধনা, সাধনার সঙ্গে সততার পরিপ্রেক্ষণীতে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গতিশীল ধর্মবিশ্বাস, পুরাচার্যদের কাছ থেকে, নিজের পিতার কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন নিয়ত অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তাকে পরিশীলিত করতে ইতস্তত করেনি। জীবনানন্দ লিখেছেন, 'মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম তাঁর ধর্মজীবনের ভিত্তি নড়বে না তো?" এবং এই ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মাচার সম্পর্কেও তিনি সুচেতন মানুষের স্বাধীনতার অনুকূল ছিলেন।

ভারতীয় দর্শন এবং উপনিষদ তাঁর সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বিষয় ছিল। "প্রায় রোজ শেষ রাত্রে—বিশেষতঃ হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন। তারপর সকালবেলায় রৌদ্রের সাগরের ভিতর যখন একাকী বসে থাকতেন তখন মনে হতো মহাকবির মতন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছেন, তুমি কি করতে এসেছ অসীম দেশ ও অসীম কালের প্রান্তে? এর উত্তরে মন বলে আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেছি যে, 'দেখা হয়েছে'; এই উত্তরটি সমস্ত কর্মের মধ্যে নিহিত, সমস্ত বাধার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে শুভ মুহূর্তে উদ্ভাসিত চৈতন্যের দীপ্তিতে এই উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সকল দেখার অন্তরে সত্যকে দেখতে পেলাম। কোনো কিছু সংবাদ নিতে নয়, তত্ত্ব নির্ণয় করতে নয়, শুধু এই অনুভব নিয়ে স্থির হয়ে থাকতে যে 'দর্শন করা হলো।'

পিতার চরিত্রের সঙ্গে জীবনানন্দের অনেক বিষয়েই মিল নেই। তবু পিতার চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্য, এই দার্শনিক-সুলভ মননিষ্ঠা ও সততার এবং বৈদগ্ধ্যের উত্তরাধিকারে

জীবনানন্দও অসামান্য ছিলেন। পিতার প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠন ও অভিনিবেশ কিছুই তাঁকে একালের মানুষের মতো উন্নাসিক বুদ্ধিজীবী করে তোলেনি। প্রজ্ঞা তাঁর চরিত্রে মগ্ন থেকে প্রতিভাকে অবয়ব দিয়েছে, ব্যক্তি-জীবনে বা ব্যবহারে প্রকট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সত্যানন্দের সামাজিক স্বভাব, নেতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার জীবনানন্দে দেখা যায় না। তিনি আত্মমগ্ন, নিঃসঙ্গ ও স্বভাব-লাজুক মানুষ ছিলেন। সরলতা ও স্পর্শকাতরতা মিশে তাঁকে লোকব্যবহারে বিষণ্ণ ও সঙ্কুচিত করে তুলতো—অথচ অন্তরঙ্গ পরিবেশে তিনি বিষণ্ণ ছিলেন না আদৌ।

পিতার ধর্মশীলতাও পুত্রের মধ্যে পুরোপুরি আশ্রয় পায়নি। অথচ ঐতিহাসিক ভাবে ধর্মের কার্যকারিতা ও ভূমিকা সম্পর্কে চেতনা ছিল তাঁর। কিন্তু বর্তমান যুগপ্রেক্ষিতে সম্ভবত ধর্মের রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করতেন তিনি। অন্তত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর খুব বেশি শ্রদ্ধা ছিল না।

জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী বরিশাল শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে খুব সম্ভব ফার্ষ্ট ক্লাশ অবধি পড়েছিলেন। তারপরেই বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্যার্জনের উপযুক্ত মেধা ও অনুরাগ তাঁর কম ছিল না। বরিশালে শ্বশুরবাড়ির বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে গৃহস্থালী কাজকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতো তাঁকে। খুব ভোর থেকে গভীর রাত অবধি অক্লান্তভাবে সকলের সব প্রয়োজন মিটিয়ে সংসারের শেষ মানুষটির খাওয়া হলে তবে তিনি ঘরে ফিরতেন। ঘরে এসেও ঘুরতেন ফিরতেন। প্রদীপের পাশে সেলাই করতে বসে যেতেন হয়তো, কিম্বা দু-চারটে পত্রপত্রিকা নিয়ে বসে পড়তেন। ছেলেরা জেগে থাকলে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করতেন, ঘুমোতে বলতেন। মাঝে মাঝেই প্রতিবেশীরা রোগীর সেবায়, আশ্রয়চ্যুত দুঃস্থের সংবেদনায়, নিম্নশ্রেণীর কারো মৃত্যুতে, অনাথ বিপন্ন স্ত্রীলোকের উদ্ধারে, প্রতিবেশীর সন্তান-জন্মে তাঁকে ডাকতে আসতো, তিনি চলে যেতেন, সারারাত হয়তো বাড়িই ফিরতেন না।

এর মধ্যেও সময় করে ছেলেদের তিনি স্কুলের পড়া শিখিয়েছেন। সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ইস্কুলের পড়াটুকুই শুধু নয়, সংসারের সমাজের দেশের ও জীবনের সদর্থ আবিষ্কারের দিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকতো বলে সে শিক্ষা সার্থক হয়েছিল। মায়ের কাছেই জীবনানন্দ দেশী বিদেশী কবি ও ঔপন্যাসিকের লেখার ভাল দিকগুলি চিনেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলি ব্রাউনিঙের অনেক কবিতা কুসুমকুমারীর মুখস্থ থাকতো। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে নবীন সেন, হেমচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন সেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে সুন্দর সুন্দর অংশ আবৃত্তি করে শোনাতেন। শৈশবে মায়ের কাছে এইসব আবৃত্তি শুনতেই ভালোবাসতেন তিনি। এইভাবে মায়ের সাহিত্যপ্রীতি পুত্রের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা সেদিনের বাংলাদেশের মহিলা কবিদের মধ্যে কুসুমকুমারীর একটি বৈশিষ্ট্যসমুজ্জ্বল স্থান ছিল। সহজ ও স্বভাব-কবিত্ব নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। ঘর ও সমাজের কাজের চাপে কবিতা লেখার চর্চা করতে পারেননি তেমন। তবু যখন পত্রিকা থেকে তাগিদ আসতো হয়তো রান্নাঘরে ঢুকে এক হাতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে কবিতা লিখছেন দেখা যেত, যেন চিঠি লিখছেন—বড় একটা ঠেকছে না কোথাও। তবু একটা

অর্থধ্বনন সুস্মিত ভোরের আলো, শিশির লেগে রয়েছে যে এসব কবিতার শরীরে! সময় এদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না। গদ্য রচনাতেও একজন সৎ সাহিত্যিকের উপাদান ছিল তাঁর মধ্যে। এইসব রচনায় সমাজের অভিভাষণে, আলাপ আলোচনায় বোঝা যেত আজকের পৃথিবীর জীবনবেদের তাৎপর্য ও আধুনিকতার মর্ম বুঝেছিলেন তিনি। অনেক আগেই কবিতা লেখা তিনি বন্ধ করেছিলেন। যে মহৎ কবিতা তিনি লিখে যেতে পারতেন, যার আভাস আছে তাঁর কাব্যের শরীরে, তাই বোধ হয় উত্তরাধিকারে পূর্ণ হয়েছিল পুত্রের লেখায়। আমাদের বিশ্বাস এই ভূমিকা থেকে দেখলে জীবনানন্দের কবিমানসের পটপ্রচ্ছদটি স্পষ্টতর হবে।

জীবনানন্দ ছোট ভাই অশোকানন্দ ও বোন সুচরিতার সঙ্গে যে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন তা সুন্দর শান্তির সংসার ছিল। মায়ের সস্নেহ সান্নিধ্যে তাঁর শিক্ষার সূত্রপাত। বাড়িব পরিচারক পরিচারিকাদেরও ছোট থেকে তাঁরা জানতেন আত্মীয়ের মতো। এদের কাছেই তিনি নানা কাহিনী, ছড়া, অনেক গাছ, লতা-পাখির নাম শিখেছিলেন। বাড়ির আওতায় মানুষ হওয়াতেই তাঁর প্রকৃতি হয়েছিল লাজুক। তবু ছোটবেলা থেকে খেলাধুলো বেড়ানো ও সাঁতারের অভ্যাস ছিল তাঁর।

১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে প্রখ্যাত ব্রজমোহন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় সব সময়েই পুরস্কার পেতেন তিনি। পুরস্কারের টাকায় ইংরেজি কবিদের কাব্যগ্রন্থ তিনি নির্বাচন করে নিতেন। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। কৈশোরের সে সব কবিতা তিনি নিজেই বিনষ্ট করে দিয়েছেন।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। ব্রজমোহন কলেজ থেকেই ১৯১৭ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তখন বহু বাঙালী কবির কবিতার বই কিনতেন ও পছন্দ মতো অংশ বহুবার আবৃত্তি করতেন। ঐ বছর কলকাতার অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়া শুরু করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন, পরে যথা সময়ে ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ঐ সময়ে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থেকে আইনও পড়াশুনা করেন।

১৯২২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে টিউটরের কাজ নিয়ে তাঁর কর্ম-জীবনের সূত্রপাত। সেই সঙ্গে চলেছে কবিতা-চর্চা। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সম্পর্কে যে কবিতা বঙ্গবাণী পত্রিকায় লিখেছিলেন সেটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার মধ্যে একটি। কবিতাটি সম্পর্কে কালিদাস রায় বলেছিলেন এই কবিতা পড়ে তাঁর মনে হয়েছে যে এটি একজন প্রবীণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছদ্মনামে লিখেছেন! আরো অনেকে প্রশংসা করলেও 'মা আমাকে ফেরৎ ডাকে লিখলেন চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে লিখেছ ভালই করেছ, কিন্তু রামমোহনের উপর লিখতে বলছি তোমাকে, মহর্ষির উপরেও। তিনি পড়ে বিক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন—এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত।' মা কুসুমকুমারী হয়তো যাচিয়ে দেখতে চাইতেন সাময়িকতার আবর্তের বাইরে যে সব মহৎ মানুষ আছেন তাঁদের

সম্পর্কে পুত্রের বিশ্বাসের সততা কতখানি। এইভাবে মায়ের নিরুচ্ছ্বাস উৎসাহ ও প্রত্যাশায় জীবনানন্দের কবিমনের দীক্ষা সম্ভব হয়েছিল।

জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতা এই আমলে প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। ১৯২৭ সালের অক্টোবর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয়। এর পর তাঁর জীবনে এক বিপর্যয় এলো। ১৯২৮ সালে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

১৯২৯ সালে খুলনার বাগেরহাট কলেজে মাস তিনেক ইংরেজির অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে ঐ বছরই ডিসেম্বরে দিল্লির রামযশ কলেজে আবার তিনি অধ্যাপনার কাজ পেলেন। ১৯৩০ সালের চাকরি ত্যাগ করে তিনি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ঐ বছর শ্রীমতী লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৩১ সালের তাঁর কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়। মে মাসে ১৯৩৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজেই তিনি টিউটর নিযুক্ত হন। পরের বছর তাঁর অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়। ঐ সময়ে ডিসেম্বর মাসে কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ধূপছায়া, প্রগতি ও কল্লোল পত্রিকায়। বরিশালের কলেজ ম্যাগাজিনে তিনি এসময়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

জীবনানন্দের অধ্যাপক জীবন খুব উজ্জ্বল সাফল্যের ছিল না বলেই মনে হয়। তাঁর এক ছাত্র লিখেছেন, 'জীবনানন্দ দাশ আমাদের ইংরেজি পড়াতেন, ছেলেদের মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম তিনি কবি। কবি বলতে তখন রবীন্দ্রনাথকেই আমরা বুঝতাম। কাজেই আমাদের অধ্যাপক যাঁকে রোজ দেখি তিনি একজন কবি এ সংবাদ আমার কিশোর মনে প্রকৃতই চাঞ্চল্য এনে দিয়েছিল। তিনি আমাদের The Northman পড়াতেন ; আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সেই কবিকে খুঁজবার চেষ্টা করতাম। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন, তার কয়েকদিন পরেই আমাদের ছাত্রাবাসের উঁচুক্লাসের কয়েকজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনার জন্য জীবনানন্দের বাসায় গেলেন।সেদিন তিনি কি বলেছিলেন তা কিছুই মনে নেই আজ, কিন্তু সেই স্বল্পভাষী কবির বিশাল চোখে সেদিন যা দেখেছিলাম তা তাঁর বলার চাইতেও বেশি। সেদিন বোধ হয় প্রথমে সেই কবি মানুষটিকে দেখতে পেয়েছিলাম।'

১৯৪২ সালে কবিতাভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে তাঁর 'বনলতা সেন' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হলো। তখন তার কলেবর, বলা বাহুল্য বর্তমানের চেয়ে ছোটো ছিল। ১৯৪৪ সালে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির সঙ্গে আরো কিছু কবিতা গ্রথিত করে 'মহাপৃথিবী' নামে প্রকাশ হলো।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা হয়, ১৯৪৬ সালের নভেম্বর ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত জীবনানন্দ 'স্বরাজ' দৈনিক পত্রের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। পরের বছর তিনি ব্রজমোহন কলেজের চাকরি ত্যাগ করলেন। ১৯৪৮ মা কুসুমকুমারীর কলকাতায় মৃত্যু হলো। ১৯৪৮ ডিসেম্বরে সাতটি তারার তিমির প্রকাশিত হয়।

কিন্তু 'স্বরাজ' পত্রিকায় আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ১৯৫০ জুন থেকে 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন। আবার কর্মের সন্ধানে বাইরে যেতে হলো। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি খড়্গপুরে তিনি অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে 'মহাপৃথিবী'র নির্বাচিত কিছু কবিতার সঙ্গে আরো কিছু নূতন কবিতা যোগ করে সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হয়। খড়্গপুরের চাকরি ত্যাগ করে ঐ বছর নভেম্বর মাসে তিনি বরিষা কলেজের ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ীভাবে যোগ দেন।

ঐ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুব ক্ষুণ্ণ। রক্তচাপ জনিত একটা মানসিক দৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল। ক্লাসের পূর্ব মুহূর্তে বড় অসহায় মনে করতেন নিজেকে। সহানুভূতিশীল সহকর্মীর হাতে বাড়িয়ে দিতেন নিজের হাত। সহকর্মীর অনুমতির উপরেই নির্ভর করছে তাঁর ক্লাসে প্রবেশ করা না করা। ইদানীং চোখের দৃষ্টিও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সুতরাং নির্ধারিত চার মাস পার হয়ে গেলে তাঁকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা না করে কর্তৃপক্ষ অধিকতর কর্মঠ ব্যক্তির সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

১৯৫৩ সালে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন' পুরস্কৃত হলো। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহাজাতি সদনের সম্বর্ধনা সভায় দুহাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর কবিতা বোধ হয় বেশি লোক পড়ে না। কিন্তু সেদিনের সে সভায় তাঁর ধারণা বদলেছিল। আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। সম্বর্ধনার পরে উত্তর দিতে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপছিল। এ সম্মেলনের পরবর্তী কোনো অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়নি। ঐ বছরই তিনি হাওড়া গার্লস কলেজে যোগ দেন এবং আমৃত্যু ঐ কলেজেই ছিলেন।

১৯৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা সিনেট হলে আয়োজিত কবি-সম্মেলনে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ঐ বছর মে মাসে 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আরও অনেক বারের মতো ঐ বছরের ১৩ই অক্টোবর কলকাতা কেন্দ্র থেকে বেতারে তিনি 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। পরদিন সেই নিয়ে আলোচনা করেছেন বন্ধুর সঙ্গে, কৌতুক করেছেন। তারপরে একাই বেড়াতে বেরিয়েছেন বিকালে। কখনো দুপুরে, কখনো রাত্রির গভীরতায় এবং বিকেলের দিকে নিয়মিতভাবে একাকী বেড়ানোর অভ্যাস ছিল। শহরের পাকচক্রের মানুষী ভিড় হৈ-হট্টগোলে বিলি কেটে, হাঁটুর নিচে ধুতিটাকে একটু গুটিয়ে তুলে ধরে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে চলে যেতেন। খুব কম লোক চিনতে পারতো ইনিই জীবনানন্দ দাশ। চেনা কারোর দেখা হলে একটু লাজুক চাপা হাসি হাসতেন বা অন্যমনস্ক কথা বলতেন দু-চার মিনিট, রাসবিহারী এভিনিউ-ল্যান্সডাউন-এর মোড়ে দাঁড়িয়ে।

সেদিনও জলখাবার ছাড়িয়ে জুয়েল হাউসের সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন তিনি। শুধু অন্যমনস্ক নয়, কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন কবি। চলন্ত ডাউন বালিগঞ্জ ট্রাম ষ্টপিং ষ্টেশন থেকে তখনও প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে। অবিরাম ঘন্টা বাজানো ছাড়াও বারম্বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল ট্রাম ড্রাইভার। তবু যা অনিবার্য

তাই ঘটলো। গাড়ি থামলো। তখন প্রচণ্ড ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই কবির দেহ ক্যাচারের ভিতর ঢুকে গেছে। ক্যাচারের কঠিন কবল থেকে অতিকষ্টে টেনে হিঁচড়ে বার করল সবাই কবির রক্তাপ্লুত অচৈতন্য দেহ। কেটে ছিঁড়ে থেতলে গেছে এখানে সেখানে। রক্তের ছোপ মাথায় হাতে বুকে, ডান চোখের কোণে। চুরমার হয়ে গেছে বুকের পাঁজরা। ডান দিকের কণ্ঠা আর উরুর হাড়।....

'ধরাধরি করে সবাই মিলে কবির বেহুঁশ দেহ নিয়ে গেলেন রাস্তার ওপারে। তারপর জল বাতাস বরফ....ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেলেন কবি : 'কি হয়েছে? আমি এখানে কেন?' 'হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।' কে একজন বললেন। 'আপনার নাম ঠিকানা কি?' আরেকটি প্রশ্ন। 'জীবনানন্দ দাশ, ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড।' খানিক এধার ওধার তাকালেন : 'আমি এখন বাড়ি যেতে পারি?' 'তা যেতে...হ্যাঁ যেতে পারেন বৈ কি।' বললেন কে একজন।

উঠতে গিয়ে ধড়াস করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ছাতু হয়ে গেছে ডান পা। যেমন তেমন জখম নয়—এবার বুঝলেন সবাই।....'

রাস্তার লোকজনরাই ট্যাক্সি করে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পৌঁছে দেন। সবই কবা হযেছিল, চিকিৎসা বিদ্যার আয়ত্তে যা করা যেতো, কিন্তু ইতিমধ্যে আহত ফুসফুসে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, যেটা আরোগ্য না করা পর্যন্ত চূর্ণ অস্থি সংস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এই নিউমোনিয়া শেষ পর্যন্ত আরোগ্য করা যায়নি।

তাঁর যাঁরা সমসাময়িক কবি এবং সাহিত্যিক বন্ধু, কলকাতার যাঁরা তরুণ লেখক এবং তাঁর কবিতার ভক্ত পাঠক তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন মন নিয়ে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ডাক্তারি পড়া তরুণ ছাত্ররা সারারাত্রি শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতেন, সারাদিনই দেখা যেতো ব্যাকুল চোখমুখ ছোট খাটো একটি দল হাসপাতালের বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

পুত্র সমরানন্দ (রঞ্জু), কন্যা মঞ্জুশ্রী, স্ত্রী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ম্লানমুখ অশ্রুসিক্ত করে ২২শে অক্টোবর রাত সাড়ে এগারোটায় তিনি চলে গেলেন। পরদিন সকালে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে নীরবে তাঁর দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁকে যাঁরা জানতেন, ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাঁরা এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ একটি শোকযাত্রীদল।*

---

*এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্য এমনকি প্রায়শ তার ভাষাও মুখ্যত 'উত্তরসূরী' জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা ও 'কবিতা' জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যার বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের একটি প্রবন্ধও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট
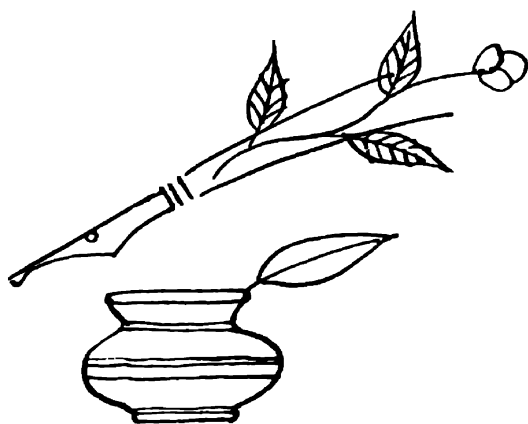
উল্লেখপঞ্জী

জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও পুরাপ্রসঙ্গের আলোচনা

অজন্তা—অজন্তার পার্বত্য গুহাচিত্রাবলী প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। হিউ এন সাঙ এই বৌদ্ধ শিল্প কেন্দ্রের বিবরণ দিয়েছিলেন। পরে বিস্মৃত এই গুহাগুলি উনিশ শতকে আবিষ্কৃত হয়। এই সব গুহার ভিত্তিচিত্রের সুসমঞ্জস রেখাবিন্যাস, বর্ণসুষমা, ব্যঞ্জনা, গতিশীলতা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর।

অতলান্তিক চার্টার—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি জাহাজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিলিত হয়ে এক চার্টার প্রচার করেন। এতে স্থির হয় রাজ্যবিস্তার নীতি ত্যাগ করা হবে, পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হবে, ফ্যাসিষ্ট শক্তি সমূহের পরাজয় ঘটিয়ে শান্তি ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ অনুসরণ করা হবে। বিভিন্ন দেশ পরে এই সনন্দ গ্রহণ করে। বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই নীতির ভিত্তিতে শান্তিস্থাপন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। যুদ্ধে দুর্নিবার ছিলেন বলে অনিরুদ্ধ নাম। ভোজরাজ রুক্মির পৌত্রী সুভদ্রার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শোনিতপুরের রাজা বাণদৈত্যের পরম রূপবতীকন্যা উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন। সখী চিত্রলেখার সাহায্যে উভয়ের মিলন হলে বাণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নাগপাশে বদ্ধ করেন। পরে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বাণ অনিরুদ্ধকে কন্যাসম্প্রদান করেন।

অনুরাধা—জ্যোতিষ মতে শুভদায়ক সপ্তদশ নক্ষত্র। প্রত্যেক নক্ষত্রই কয়েকটি তারার সমষ্টি। অনুরাধা সপ্ততারাময়ী, (মতান্তরে তাতে চারটি তারা দেখা যায়)। অনুরাধার আকার সর্পের মতো। অনুরাধার অধিষ্ঠাতা দেবতা মিত্র। পুরাণে দেখা যায় কৃষ্ণের অনুরাগিণীরা সকলেই নক্ষত্র-নাম্নী। রাধার সঙ্গী অনুরাধা তাঁদেরই একজন।

অনুরাধাপুর—শ্রীলঙ্কার প্রাচীন নগর। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে অনুরাধাপুর সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের শিখরে ওঠে। রাজা দেবনাম পিয় তিসস বুদ্ধগয়া থেকে বোধিদ্রুমের শাখা আনিয়ে এখানের মহাবিহারে রোপণ করেন এখানেই রাজধানী গড়ে তোলেন। সে গাছ এখনো আছে। বুদ্ধের শৌবন দন্ত দন্তপুর (পুরী) থেকে এনে এখানে স্থাপন করা হয়। দশম শতকে চোল রাজাদের আক্রমণে অনুরাধাপুর ধ্বংস হয়।

অন্নদামঙ্গল—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত বিখ্যাত কাব্য। জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থে অসতর্কভাবে মুকুন্দরামকে এ কাব্যের রচয়িতা বলেছেন 'রায়গুণাকর'।

অপ্সরা—দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে দেবযোনি নৃত্যগীত বিশারদ অপ্সরারা সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কামদেব নাকি অপ্সরাদের অধিপতি। পরবর্তী সাহিত্যে অপ্সরারা গন্ধর্বদের স্ত্রী। মুনি ঋষিদের তপোভঙ্গের প্রয়োজনে দেবতারা অপ্সরাদের ব্যবহার করতেন। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা ধৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরারা বিখ্যাত। এরা স্বর্গের স্বাধীনা নারী।

অবলোকিতেশ্বর—বৌদ্ধ মহাযান দেবতা।

অম্বাপালী—বৈশালীর রাজোদ্যানে জাত এই শিশুটিকে উদ্যান-পালক লালন পালন করেন। আম্রোদ্যান-পালকের কন্যা বলে অম্বাপালী নামে পরিচিতা হন। অনিন্দ্যসুন্দর অম্বাপালী রাজকুমারদের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সভানর্তকী হন। বুদ্ধ লিচ্ছবিরাজের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে অম্বাপালীর ঘরে ভোজন করেছিলেন। অম্বাপালী ভিক্ষুসংঘকে একটি 'বিহার' দান করেন।

অর্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব, ধনঞ্জয়। অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষার জন্য পার্বতীর আশীর্বাদ-ধন্য নারীরাজ্যে গমন করেন ও নারীরাজ্যের অধীশ্বরী প্রমীলাকে বিয়ে করেন। দ্রঃ কৃষ্ণা।

অর্ধনারীশ্বর—একদেহে মিলিত হরগৌরীর যুগলমূর্তি। এই মূর্তি মণির মতো চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, হাতে পাশ, রক্তপদ্ম, নরকপাল ও শূল।

অলকা—পুরাণে উল্লিখিত যক্ষরাজ কুবেরের হিমালয়স্থিত রাজধানী। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে এই কল্প-নগরীর অপূর্ব বর্ণনা আছে।

অশোক—মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র অশোক খ্রি. পূ. ২৭৩-২৩২ খ্রি. পূ. রাজত্ব করেন। প্রথম জীবনে নিষ্ঠুরতার জন্য 'চণ্ডাশোক' নাম ছিল। কলিঙ্গ দেশ জয়ের জন্য অজস্র সৈন্যক্ষয় দেখে অনুতপ্ত হয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন ও প্রজাকল্যাণ এবং ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। নানাদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠান। এই উদ্দেশ্যে পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকেও শ্রীলংকায় পাঠিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে পরে 'ধর্মাশোক' বলা হয়েছে।

অশোক স্তম্ভ—সারনাথে প্রাপ্ত অশোক প্রতিষ্ঠিত ধর্মানুশাসন লিপিযুক্ত প্রস্তর স্তম্ভ। এর মাথায় তিনদিকে তিনটি সিংহ ও তার মাঝখানে তিনটি চক্র (ধর্মচক্র) আছে। এটাই স্বাধীন ভারতের সরকারি প্রতীক এবং পূর্বোক্ত অশোক চক্র ভারতের জাতীয় পতাকায় স্থান পেয়েছে। সারনাথ ছাড়াও নানা জায়গায় আরও অশোকস্তম্ভ আছে বা ছিল।

অহল্যা—বৃদ্ধাশ্বের কন্যা ; গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যা। একদিন গৌতম স্নান করতে গেলে কামাতুর ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে অহল্যার কাছে এসে কামাভিলাষ জানান। অহল্যা তাঁকে দেবরাজ বলে চিনেও তাঁর কামনা পূর্ণ করেন। পরে গৌতমের

অভিশাপে অহল্যা পাষাণ হয়ে যান। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপমোচন হয়েছিল। দ্র. 'ইন্দ্র'।

আইনস্টাইন—জগৎবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

আই হ্যাভ বিন ইয়ং—এলিজাবেথ লোমন্ড রচিত উপন্যাস।

আকবরী আইন—দিল্লির মোগল বাদশাহ আকবরের প্রবর্তিত আইনসমূহ।

আত্তিলা—হুন সম্রাট আত্তিলা (খ্রি. ৪০৬-৪৫৩) নিষ্ঠুরতার জন্য অবিস্মরণীয়। ইনি রোমানবাহিনীকে পরাভূত করে জার্মানি ও গ্রীস জয় করেন এবং ইতালি অভিযানের প্রস্তুতিকালে মারা যান।

আথেন্স—গ্রিক নগররাষ্ট্র। গ্রিক সভ্যতা সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। 'গ্রিস' দেখুন।

আফ্রিকা—মহাদেশ বিশেষ। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে শোষিত আফ্রিকার কালো মানুষ ও অন্ধকার মহাদেশ সম্প্রতিকালে মুক্তিলাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপীড়ন ও শোষণের বেদনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ও যুদ্ধকালীন যুগে স্মরণীয় ছিল।

আবেস্তা—পারশি ভাষার প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ জিন্দাবেস্তাহ।

আমহার্স্ট স্ট্রিট—উত্তর কলকাতার এক রাজপথ।

আরব সাগর—আরব দেশের উপকূলে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের এক উপসাগর।

আলমোড়া—উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের এক বিশিষ্ট শৈলাবাস।

আলেকজান্দ্রিয়া—খ্রি. পূ. ৩৩০ অব্দে গ্রিক সম্রাট আলেকজাণ্ডার আপন নামে মিশরে ভূমধ্যসাগর তীরে এই সমৃদ্ধ নগরের পত্তন করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল এই নগর এশিয়া ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিল।

আল্পস—ইউরোপ মহাদেশের প্রায় মধ্যস্থিত সুবিশাল ও সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী।

অয়ার্ল্যান্ড—আইরিশ জাতির বাসভূমি। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অংশবিশেষ।

আসিরিয়া—খ্রিষ্টপূর্ব দু হাজার বছরেরও আগে মেসোপটেমিয়ায় তাইগ্রিস নদীতীরে নিনেভে শহরকে কেন্দ্র করে আসিরিয় নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সেখানের প্রাচীন সভ্যতার প্রভূত নিদর্শনের মধ্যে কিলক লিপিতে লেখা টালিতে তৈরি ২০ হাজার বই এর বিশাল লাইব্রেরি পাওয়া গেছে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বেবিলনরাজ হাম্মুরাবি নিনেভে অধিকার করে বেবিলন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আহিরীটোলা—উত্তর কলকাতার এক পুরনো অঞ্চল।

অ্যাডনিস—রোমান্টিক রিভ্যাইভাল যুগের কবি পারশিবিশি শেলির বিখ্যাত কবিতা।

অ্যাপোলো—গ্রিক প্রাচীন সূর্যদেবতা অ্যাপোলো অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের জন্য বন্দিত। ইনি যাবতীয় শিল্পকলার অধিদেবতা। দেলফি নগরে এঁর মন্দির অবস্থিত।

ইউলিসিস—১। 'ওডিসিউস' দেখুন।

২। জেমস জয়েস লিখিত ইংরেজি উপন্যাস।

ইছামতী—নদীবিশেষ। ১। পাবনা জেলায় আত্রেয়ী নদীর শাখা, পদ্মায় মিশেছে।

২। দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত নদী।

৩। ২৪ পরগনা জেলার পূর্বাঞ্চলে প্রবাহিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের খাড়ি। পদ্মা থেকে নির্গত ভৈরব জলঙ্গী ও মাথাভাঙার বন্যার জল একসময়ে ইছামতীর খাতে বইত। ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী থেকে নির্গত অধুনালুপ্ত যমুনার জলও ইছামতীর খাতে বইত। এখন বনগাঁর কাছে মজে গেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ইছামতীর নাম কালিন্দী।

ইটালি—প্রাচীন ও বর্তমান ইটালি চিরকালই স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জন্য বিখ্যাত।

ইডেন গার্ডেন—১। বাইবেল বর্ণিত স্বর্গোদ্যান।

২। কলকাতায় ধর্মতলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এক সুন্দর উদ্যান। ১৮৩৬ খ্রি. লর্ড অকল্যান্ডের আমলে তৈরি এই উদ্যান তার সহোদরার নামে নামাঙ্কিত হয়। আগেকার সৌন্দর্য ও আয়তন কমে গেলেও এটি কলকাতার অন্যতম শোভা। কলকাতার ক্রিকেট মাঠ এই উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত। মহারাজা রণজিৎ সিংহের নামে নামাঙ্কিত এই ষ্টেডিয়ামে প্রায় এক লক্ষ দর্শক খেলা দেখতে পান।

ইন্দোচীন—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুবৃহৎ উপদ্বীপ ইন্দোচীন 'ভিয়েতনাম' 'কম্বোডিয়া' ও 'লাওস' তিন রাষ্ট্রের সমবায়। সুপ্রাচীন কালে এ অঞ্চল ভারতের উপনিবেশ ছিল। প্রাচীন কাম্বোজ দেশ (কাম্বোডিয়া) ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। জগৎবিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দির ও আঙ্কোরথোমের মন্দির সমূহ এই সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করছে।

ইন্দ্র—দেবরাজ আখণ্ডল। ঋক্‌বেদের প্রধান দেবতা। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি, রাজ্য অমরাবতী, উদ্যান নন্দন, প্রাসাদ বৈজয়ন্ত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথী মাতলি, ধনু ইন্দ্রচাপ, অস্ত্র বজ্র, স্ত্রী পুলোম-কন্যা শচী, পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ, সীদ্ধ, অর্জুন ও বালী। তিলোত্তমা সৃষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করলে তিলোত্তমার দর্শন লালসায় তাঁর সর্বাঙ্গে সহস্র নেত্রের উদ্ভব হয়। মতান্তরে গুরু পত্নী অহল্যাকে হরণ করায় গুরু গৌতমের শাপে সর্বাঙ্গে যোনি চিহ্ন দেখা দেয়, পরে তা সহস্র চক্ষুতে রূপান্তরিত হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—উড়িষ্যার এক পৌরাণিক রাজা। কিম্বদন্তী আছে, ইনি জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

ইন্দ্রপ্রস্থ—মহাভারতে উল্লিখিত পাণ্ডবদের রাজধানী। কথিত আছে : ইন্দ্র এখানে বিষ্ণুর যজ্ঞ করেছিলেন। তাই ইন্দ্রপ্রস্থ নাম। পরে এখানে খাণ্ডব বন গড়ে ওঠে। তাই খাণ্ডবপ্রস্থও বলা হতো। দ্রৌপদীকে লাভ করার পর পঞ্চপাণ্ডব হস্তিনায় ফিরে এলে ধৃতরাষ্ট্র তাদের অর্ধরাজ্য দেন। তখন অর্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করে ময়দানবের সাহায্যে ইন্দ্রপ্রস্থে অপরূপ নগর নির্মাণ করে নূতন রাজধানী তৈরি করে যুধিষ্ঠিরকে প্রথম রাজা করেন।

ইন্দ্রাণী—পুলোমা দানবের কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্রপত্নী 'প্রসহা'।

ইলিয়াম—'ট্রয়' দেখুন।

ইলোরা—মহারাষ্ট্রে ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিত প্রাচীন 'এলাপুর'। পঞ্চাশটির বেশি কৃত্রিম পার্বত্য গুহায় বৌদ্ধ হিন্দু জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকীর্তি দেখা যায়। এগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক

যুগেও মানুষ থাকতো। তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। গুহা খনন শুরু হয় ষষ্ঠ শতকে এবং শেষ হয় সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে। চিত্র-মান অজন্তার চেয়ে নিচু। তবু এখানেই বৌদ্ধ শৈলখাত স্থাপত্যের শেষ উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইয়াল্টার—সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ক্রিমিয়ার এই শহরে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে, চার্চিল ষ্ট্যালিন ও রুজভেল্ট মিলিত হয়ে এক সম্মেলন ও চুক্তি করেছিলেন।

ইয়েটস—উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। জন্ম ডাবলিনে ইনি আয়ার্ল্যান্ডের সাংস্কৃতিক নবজাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯২৩ খ্রি. নোবেল পুরস্কার পান।

ইরান—প্রাচীন পারশ্য দেশের আধুনিক নাম। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত এই দেশ আর্যদের অধ্যুষিত দেশ। আর্য শব্দ থেকেই 'ইরান' শব্দটি এসেছে। এর ভাষা আগে ছিল পার্শি, ধর্ম ছিল জরাথুষ্ট্রীয়, এখন এর ভাষা ফারশি, অধিবাসীরা প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত।

ইশিশ—প্রাচীন মিশরে ইশিশ প্রধানতম দেবী হিসাবে পূজিতা হতেন।

ঈশা—যীশুখ্রিষ্ট হিব্রু যীশু, ইংরেজি 'যীশুখ্রিষ্ট' দেখুন।

ঈশোপনিষদ—অন্যতম এক উপনিষৎ যাতে ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উইলম মুডি—এক খ্যাতনামা মহিলা টেনিস খেলোয়াড়।

উজ্জয়িনী—প্রাচীন নগরী, অবন্তী, বিশালা, পদ্মাবতী, ভোগবতী, হিরণ্যবতী নামেও পরিচিত। স্কন্দপুরাণ, মেঘদূত, কথাসরিৎসাগরে এর উল্লেখ আছে। উজ্জয়িনী মালব দেশের রাজধানী ছিল। সে কালে উজ্জয়িনী ভাষা, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস সম্পর্কে অজস্র কিম্বদন্তী এই নগরী প্রসঙ্গে জড়িত আছে। শিপ্রা তটবর্তী এই নগরে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক মহাকাত্যায়ন ও লুইপাদ জন্মগ্রহণ করেন।

উডবার্ণ পার্ক—কলকাতার এক উদ্যান। এখানে টেনিসখেলার কেন্দ্র আছে।

উত্তরপাড়া—হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে কলকাতার সন্নিহিত একটি উপনগরী।

উদয়ন—১। অগস্ত্য মুনি।

২। বৎসরাজ উদয়ন চন্দ্রবংশীয় নৃপতি শতানীকের পুত্র (বা পৌত্র)। এঁর রাজধানী ছিল কৌশাম্বীতে। ইনি রাজকন্যা বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করেন। এর অপর পত্নীর নাম রত্নাবলী। বাসবদত্তার গর্ভে এঁর নরবাহন নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

উদয়শঙ্কর—বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর (১৯০০.৭৭) বাংলাদেশের যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। লন্ডন আর্টস কলেজের ছাত্র নিজের চেষ্টায় নৃত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বিখ্যাত ব্যালে নর্তকী আনা পাভলোভার সাহচর্যে খ্যাতি লাভ করে তিনি আলমোড়ায় ভারতীয় নৃত্য নাটক অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। নানা দেশে তাঁর দল আমন্ত্রিত হয়ে যায় ও নৃত্য প্রদর্শনী জননন্দিত হয়। সিনেমা নৃত্য ও নাটকের মিশ্রণে তিনি 'শঙ্কর স্কোপ' গড়ে তোলেন।

উমা—পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার কন্যা, পার্বতী, [সং উ (শিব) মা (লক্ষ্মী) ৬ষ্ঠী

তৎ] দক্ষযজ্ঞ কালে সতীর দেহত্যাগের পর উমা রূপে জন্মগ্রহণ করে, মদন ভস্মের পর শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য যে কঠোর তপস্যা করেন তা দেখেই মেনকা 'উমা' শব্দ উচ্চারণ করেন। 'উ' (অয়ি পার্বতি!) মা (না, অর্থাৎ তপস্যা করো না।) এই কথা মেনকা বলাতে পার্বতীর নাম হয় উমা। পরে শিবের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়।

ঊষা—দ্রঃ অনিরুদ্ধ।

উর—মেসোপটেমিয়া (ইরাক-এর) প্রাচীনতম শহরগুলির অন্যতম ও সুমের সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও রাজধানী। বর্তমান নাম 'মুকেরিয়র'। ইউফ্রেতিস ও টাইগ্রিস নদীর সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। বাইবেলে বর্ণিত ক্যালডিজদের মহানগরী উর এব্রাহামের জন্মস্থান। সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন এই সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আনুমানিক খ্রি. পূ. ৩০০০ বছর থেকে ৪০০ খ্রি. পূ. পর্যন্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরে বিন্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্রঃ বেবিলন।

উর্বশী—সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অনন্ত যৌবনা অপ্সরা বিশেষ। [উরূণ (মহাপুরুষদের)+বষ্টি (বশ করেন) এই অর্থে] নারায়ণের ঊরু ভেদ করে সমুদ্ভুত হওয়ায় এর নাম উর্বশী। পদ্মপুরাণে আছে, বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গের জন্য কামদেব স্বীয় ঊরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি করেন। উর্বশী বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গে সমর্থ হওয়ায় ইন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করেন। প্রত্যাখ্যাত মিত্রাবরুণের শাপে উর্বশী মনুষ্যভোগ্য হয়ে রাজা পুরুরবার পত্নী হিসাবে মর্ত্যে বাস করেন। বেদে বলা হয়েছে উর্বশী থেকে বশিষ্ঠের জন্ম। উর্বশীকে কেউ কেউ পার্থিব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতিমা হিসাবে মনে করেন।

এডগার এলান পো—'পো' দেখুন।

এশিরিয়া—প্রাচীন এশিরিয়া দেশ ও রাষ্ট্রের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। উত্তর মেসোপটেমিয়ায় এশিরিয়ার সাম্রাজ্য খ্রি. পূ. ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে অবস্থিত ছিল। খ্রি. পূ. ৭২১ অব্দে এশিরিয়রা ইজরাইল দখল করে ও বন্দী ইহুদীদের বেবিলনে বিক্রি করে দিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা ভারতীয় আর্যরা অসুর সভ্যতার উত্তরসূরী ও তাদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত।

এঞ্জেলো—বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী Buanarroti Michelangelo (১৪৭৫-১৫৬৪) Caprese-তে জন্মগ্রহণ করেন।

ওডিসিউস—ট্রয়ের যুদ্ধে যে সব গ্রিক রাজা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে ইথাকার রাজা Odysseus সবচেয়ে খামখেয়ালী ছিলেন। অবরুদ্ধ ট্রয়ের পতন ঘটানোর জন্য তিনি কাঠের ঘোড়ার পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। ট্রয় ধ্বংসের পর তাঁর স্বদেশে ফেরার বিবরণ নিয়ে হোমারের ওডেসি কাব্য রচিত হয়। জাহাজে করে ২০ বছর নানা দেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে অবশেষে তিনি দেশে ফেরেন। এদিকে রাজ্যের লোভে বহু রাজা ওডিসিউসের স্ত্রী রাণী পেনেলোপির পাণি প্রার্থনা করেন, সুকৌশলে পেনেলোপি তাঁদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ওডিসিউস তাঁদের হত্যা করেন ও কিছুদিন রাজ্য ভোগের পর পুত্র টেলমেকাসকে রাজত্ব দিয়ে

আবার সমুদ্রাভিযানে বেরিয়ে পড়েন। পরবর্তী সাহিত্যে ওডিসিউসকেই ইউলিসিস বলা হয়েছে।

ওয়েসেক্স পোয়েমস্—টমাস হার্ডির লেখা কবিতা।

ওয়ালটেয়ার—দক্ষিণ ভারতের দর্শনীয় শৈলাবাস।

ওয়াল্টার পেটার—ইংরেজ প্রবন্ধকার। 'রিনাসান্স' বইটির লেখক।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ—বিশিষ্ট ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

কঙ্কাবতী—বাংলা রূপকথার নায়িকা।

কনফুচ/কনফুশিয়াস—চীন দেশীয় রাজনীতিক ও ধর্মসংস্কারক। (খ্রি. পূ. ৫৫১-খ্রি. পূ. ৪৪০)। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিভিন্ন চীনা ধর্মগ্রন্থ পড়ে ইনি ধর্মসংস্কারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। পরে চাংটু নগরের প্রশাসকের পদ লাভ করে ইনি সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। পরে পদত্যাগ করে দেশে দেশে তাঁর নীতি প্রচার করেন। তাঁর মতে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিই ব্যক্তি জীবনের দুঃখ কষ্টের হেতু। শিক্ষাকে তিনি সমাজ-সংস্কারের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মচিন্তা মানবকেন্দ্রিক ও বাস্তব ধর্মী। মানুষকে ভালবাসাই পুণ্যকর্ম, মানুষকে জানাই জ্ঞান—এই সব শিক্ষা তিনি কথোপকথনছলে দিতে চেষ্টা করেন।

কপিল—সাংখ্য দর্শন প্রণেতা ও সগর বংশ ধ্বংসকারী মুনি। পিতা কর্দম প্রজাপতি এবং মাতা দেবহূতি। সগর-রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ইন্দ্র চুরি করে ধ্যানস্থ কপিলের কাছে রেখে আসেন। সাগর সন্তানেরা তাঁকেই চোর মনে করে লাঞ্ছনা করায় তাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হয়। তারপর অংশুমান তাঁকে তুষ্ট করে ঘোড়া আনেন এবং তাঁর উপদেশ মতো ভগীরথ গঙ্গা আনলে পূত সলিলে সগর বংশের উদ্ধার হয়। দ্র. গঙ্গাসাগর।

কবির—মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক কবি, সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত মরমী এই কবি বহু ভজন গান লিখে গেছেন।

কমলা—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। শিব সতীকে দক্ষযজ্ঞে যেতে নিষেধ করলে, সতী কালী মূর্তিতে তাঁকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন। শিব তাতেও ভয় না পেলে তিনি দশদিকে দশ মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে শিবের পথরোধ করেন ও ভীত শিবের সম্মতি আদায় করেন। এই দশ মহাবিদ্যা হলো কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা। [ক (ব্রহ্মত্ব) + ম (শিবত্ব) + লা (দান করা) + ডক + আপ]—যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান করেন।

করাচী—সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত পাকিস্তানের সর্বপ্রধান শহর, বন্দর ও প্রথম রাজধানী।

কলকাতা—পশ্চিমবাংলার রাজধানী ও বন্দর নগর। জব চার্নক প্রতিষ্ঠিত এই নগর এক সময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। এটি ভারতের বৃহত্তম শহর।

কলেজ স্ট্রিট—কলকাতার রাজপথ। উত্তর কলকাতার এই রাজপথে বহু বিশিষ্ট স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তক বিপণি অবস্থিত।

কর্ণফুলী—নদী বিশেষ। লুসাই উপত্যকা থেকে উদ্ভূত এই নদী বাংলাদেশের ভিতর

দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। উর্ধ্বাংশে অনেক জলপ্রপাত আছে। কাসালাং কাপতাই ও হালদা এর প্রধান উপনদী। মোহনা থেকে উর্ধ্বপ্রবাহে চট্টগ্রাম শহর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। রাঙামাটি, চন্দ্রকোনা কাসালাং নদীতীরের প্রধান শহর।

কল্কি—বিষ্ণুর দশাবতারের শেষ অবতার। কলিযুগের অন্তকালে বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুদশা নামক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেবেন। ভার্গবের কাছে নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মহাদেবের কাছে সর্বগ অশ্ব ও সর্বজ্ঞ শুক লাভ করবেন। সেই ঘোড়ায় চড়ে দেবদত্ত অসি হাতে ম্লেচ্ছ নিধন করে নির্মূল করবেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণকে দান করবেন। তখন প্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস পাবে এবং সত্যযুগের সূচনা হবে। এই কিম্বদন্তী আছে।

কল্পতরু—হিন্দুপুরাণের মতে স্বর্গোদ্যানস্থিত এই অলৌকিক গাছ প্রত্যেকের যে কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে।

কাইরো—মিশরের রাজধানী, আফ্রিকার বৃহত্তম শহর। নীলনদের ধারে অবস্থিত।

কাঙরা চিত্র—নাদির শাহের দিল্লি আক্রমণের পর মোগলরীতিতে শিক্ষিত হিন্দু চিত্রকরেরা পাঞ্জাব ও হিমালয় সন্নিহিত পাহাড়ী রাজাদের আশ্রয়ে মোগল ও রাজপুত চিত্ররীতির মিশ্রণে পাহাড়ী চিত্ররীতি গড়ে তোলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাঙরা দুর্গাধিপতি সংসার চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় গুলের রাজ দরবারের থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীরা হিন্দুপুরাণ ও কৃষ্ণকথা অবলম্বনে যে অসংখ্য উন্নতমানের চিত্ররচনা করেন সেই চিত্রধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ১৯০৫ পর্যন্ত চলে এসেছে। বস্তু সংস্থাপনে, বর্ণিকাভঙ্গে রেখার ছন্দে, নারীরূপের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সজীব সমন্বয়ে এইসব চিত্র মোগল পরবর্তী যুগের ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কাঁচরাপাড়া—উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এক শিল্পাঞ্চল। এখানে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মস্থান।

কাঞ্চন মালা—'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্যতম একটি পালার নায়িকা। এ কাহিনীটি প্রকৃত পক্ষে একটি রূপকথা।

কাঞ্চী—মাদ্রাজের চেঙ্গেলপুত জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির নগরী ; কাঞ্চীপুরম বা কাঞ্জিনগরম নামেও পরিচিত। খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতকে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এর উল্লেখ আছে। ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান। খ্রি. পূ. ৪র্থ শতকে পল্লবদের রাজধানী ছিল। হিউ-এন-সাঙ ধর্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বিক্রমে একে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান রূপে বর্ণনা করেছেন। এর দুটি অংশ শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। কাঞ্চী বারাণসীতুল্য।

কামাখ্যা—কালিকা দেবীর নামান্তর। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শিব তাঁর শব কাঁধে নিয়ে ঘুরতে থাকেন। বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে সেই শব দেহ খণ্ড খণ্ড করেন। সতীর যোনিমণ্ডল কামাখ্যায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় এটি এক মহাতীর্থে পরিণত হয়। কামাখ্যা ৫১ পীঠের অন্যতম আসামের গৌহাটি শহরের সন্নিকটবর্তী।

কারবালা—আরবদেশে মধ্যযুগে এজিদের চক্রান্তে আশ্রয়হারা হোসেন কারবালার প্রান্তরে

সদলবলে শত্রু এজিদেব সৈন্যদল পরিবেষ্টিত ও তৃষ্ণার্ত হন। ফোরাত নদীর জল লাভ করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ করে পরিশেষে নিহত হন।

কার্থেজ—ভূমধ্যসাগরের তীরে আফ্রিকার উপকূলে 'কার্থেজ' সুপ্রাচীন শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। রোমের অভ্যুদয়কালে বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশত উভয় রাষ্ট্রে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলে। খ্রিঃ পূঃ ২৬৪ প্রথম পিউনি যুদ্ধ হয়। হানিবলের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পিউনির যুদ্ধে কার্থেজীয় বাহিনী বিপুল শৌর্য প্রদর্শন করেও পরাজিত হয়। খ্রিঃ পূঃ ২০২ অব্দে রোম কার্থেজ জয় ও ধ্বংস করে।

কালকেতু—১। কৃষ্ণ পতাকা।

২। ইন্দ্র পুত্র নীলাম্বর শিবের শাপে মর্তে ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র রূপে কালকেতু নামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহসী ও বলশালী কালকেতু ব্যাধ পরে চণ্ডীর কৃপায় রাজ্যলাভ ও চণ্ডীর পূজা প্রচার করেন। চণ্ডীমঙ্গলে এ কাহিনী আছে।

কালনেমি—(১) রাবণের মাতুল। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের ঔষধি সংগ্রহে লিপ্ত হনুমানকে বাধা দেবার জন্য অর্ধেক রাজত্বের লোভ দেখিয়ে তাকে রাবণ পাঠান। মুনির ছদ্মবেশী কালনেমির কাছে হনুমান জল চাইলে তিনি কাছের জলাশয়ে যেতে বলেন ও মকরী দ্বারা নিহত হবে বিশ্বাসে মনে মনে লঙ্কা ভাগ করতে থাকেন। হনুমান মকরীকে বধ করে কালনেমিকেও হত্যা করেন।

(২) হিরণ্যকশিপুর পুত্র। অপরাজেয় এই দৈত্যকে বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে হত্যা করেন। পরজন্মে কালনেমি উগ্রসেন পুত্র কংসরূপে জন্ম নেন।

কালীদহ—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগর সেতুবন্ধ পার হয়ে লঙ্কায় যাবার পথে সমুদ্রে কালীদহ নামে এক দহে উপস্থিত হয়। এখানে চণ্ডী মায়ার ছলনায় কমলে কামিনীরূপে ধনপতির চোখে প্রতিভাত হন।

কালীয় দমন—বিষধর সর্পরাজ কালীয় গরুড়ের ভয়ে বৃন্দাবনের একটি হ্রদে আশ্রয় নেয়। তার বিষে হ্রদের জল বিযাক্ত ও অপেয় হয়ে যায়। কৃষ্ণ এই হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে কালীয়ের ফণায় উঠে দাঁড়ান ও সে রক্তবমি করতে থাকে। অবশেষে কৃষ্ণের আদেশে কালীয় হ্রদ ত্যাগ করে সমুদ্রে চলে যায়।

কাশী—বরুণা ও অসি দুই নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্যক্ষেত্র কাশী। এটি নাকি শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। এখানে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিত আছেন। কাশী বিদ্যা ও সংস্কৃতিচর্চার সুপ্রাচীন পীঠস্থান ও অসংখ্য মন্দির শোভিত নগর।

কাশীপুর—কলিকাতার উত্তর শহরতলীস্থিত শিল্পাঞ্চল। এখানে একটি রাইফেল ফ্যাক্টরি আছে।

কাশ্মীর—ভারতের উত্তরে অবস্থিত এই রাজ্যটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরিসীম। কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়। কাশ্মীর সুপ্রাচীন কাল থেকে দর্শনচর্চার পীঠস্থান বলে পরিগণিত।

কিন্নর—অরিষ্টা ও কশ্যপ থেকে জাত কিন্নরেরা দেবযোনি। কিন্নরদের মুখ ঘোড়ার মতো এবং দেহ মানুষের মতো বা দেহ ঘোড়ার মতো এবং মুখ মানুষের মতো। এদের

নিবাস কৈলাসে। এদের রাজা চিত্ররথ (মতান্তরে কুবের)। কিন্নরেরা নৃত্যগীতের জন্য বিখ্যাত ও স্বর্গের গায়করূপে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে ও শিল্পে কিন্নরদের বিশিষ্ট স্থান আছে।

কীচক—কেকয় রাজপুত্র ও বিরাট রাজার শ্যালক কীচক অতি শক্তিশালী অহংকারী ও কামুক ছিলেন। ইনি ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে পরাস্ত করে তাঁর রাজ্য বিরাটের রাজ্যভুক্ত করে দেন এবং মৎস্যদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য বিরাট রাজার প্রশ্রয়ে যথেচ্ছাচার শুরু করেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস-কালে সৈরিন্ধ্রী বেশী দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হলে ইনি ভীমের হাতে নিহত হন।

কীর্তিনাশা—পদ্মা নদী। পদ্মার প্রবল ভাঙনে পাশের অট্টালিকা প্রভৃতি সব কীর্তি ধ্বংস হয় বলে পদ্মাকে কীর্তিনাশা বলে।

কুইসলিং—নরওয়ের সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতা মেজর ভিনকুন কুইসলিং। ১৯৪০ সালে হিটলার অতর্কিতে নরওয়ে আক্রমণ ও অধিকার করলে নবপ্রতিষ্ঠিত পুতুল সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন কুইসলিং। পরে তাঁকে ঐ পদ থেকে বিতাড়ন করা হয়। যুদ্ধাবসানে বিশ্বাসঘাতকতার ও দেশদ্রোহের অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। এখন কুইসলিং শব্দটি ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর প্রতিশব্দ।

কুয়ালালামপুর—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে থাইল্যাণ্ডের অধীন মালয় দেশের রাজ্যগুলি ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা পায়। ১৯৫৭ সালে এমন কয়েকটি রাজ্য নিয়ে প্রথমে মালয় যুক্তরাষ্ট্র, পরে ১৯৬৩ সালে আরো কিছু রাষ্ট্রের যোগে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। সিঙ্গাপুর ১৯৬৫ সালে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। মালয় যুক্তরাষ্ট্র এবং মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর।

কুরুক্ষেত্র—মহাভারতে উল্লিখিত আছে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে পিতৃতর্পণ করেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হয়।

কুরুবর্ষ—প্রাচীন ভারতের সূর্যবংশীয় সম্রাট কুরু ও তাঁর সন্ততিদের শাসিত রাষ্ট্রকে কুরুবর্ষ বলা চলে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস। মহর্ষি পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভে দ্বাপরে এই মহামনীষীর জন্ম হয়। দ্বীপের মধ্যে জন্ম হয় বলে দ্বৈপায়ন, কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলে কৃষ্ণ এবং বেদ সংগ্রহ ও বিভাগ করেন বলে বেদব্যাস নাম হয়। ইনি মহাভারত রচনা করেন ও পাতঞ্জল দর্শনের টিকা করেন। বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীপত্নীর গর্ভে বিদুর নামে এঁর ক্ষেত্রজ পুত্র হয়।

কৃষ্ণা—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞাগ্নি সম্ভূত কন্যা যাজ্ঞসেনী। লক্ষ্যভেদ করে বীর্যশুল্কা কৃষ্ণাকে অর্জুন লাভ করলেও মা কুন্তীর আদেশে পাঁচ ভাই মিলে বিবাহ করেন। কৃষ্ণসখী দ্রৌপদীকে পাশার বাজি হিসাবে ধরে যুধিষ্ঠির পরাজিত হন এবং দুঃশাসন প্রকাশ্য সভায় তাঁকে বিবস্ত্র করার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অফুরন্ত এই শাড়ি

খুলতে খুলতে ক্লান্ত ও অসমর্থ হন। কৃষ্ণার এই অপমানের প্রতিশোধে কুরুক্ষেত্রে ভীম দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে হত্যা ও দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করেছিলেন।

কেদার—হিমালয়স্থিত শৈব তীর্থক্ষেত্র।

কোশল—আর্যাবর্তের প্রাচীন রাজ্য ছিল কোশল।

কোশী—উত্তর বিহারে অবস্থিত প্রবল পার্বত্য নদী। নেপাল সন্নিহিত হিমালয় অঞ্চলে সপ্তকুশী নামে পরিচিত। বরাহক্ষেত্রের উত্তরে সাতটি নদীর মিলিত ধারা কুশী নামে সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে। কুশী নদী বহুবার খাত পরিবর্তন করেছে। প্রতি বছর বন্যায় এ নদী কৃষির যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি করতো। বর্তমানে কোশী পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। রামায়ণ ও পুরাণে নদীটির উল্লেখ আছে।

কোহিনূর—প্রাচীন ভারতের জগদ্বিখ্যাত হীরা। নাদির শাহ এটি লুণ্ঠন করেছিলেন। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মুকুটে অবস্থিত আছে।

কৌটিল্য—চাণক্য। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিখ্যাত কূটনীতি-বিশারদ মন্ত্রী। চাণক্য রচিত 'অর্থশাস্ত্রে' প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি, সমাজনীতি এবং শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। কথিত আছে, এঁরই পরামর্শে ৩২২ খ্রী. পূ. চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ক্যালডিয়া—এশিরিয়দের হাতে বেবিলন ধ্বংস হলে ক্যালদি নামক এক উপজাতি সেখানে বসতি স্থাপন করে। ক্যালদিয়দের প্রতিভাবান নেতা নেবুচাডনেজার বেবিলনের পূর্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইরান এবং ইহুদী রাজ্য জুডা দখল করেন এবং জেরুজালেম অধিকার করে ইহুদীদের ক্যালদিয় দেবতা 'মারদুপের' পূজা করতে বাধ্য করেন। যে সব ইহুদী মূর্তিপূজায় অস্বীকৃত হন তাঁদের অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। দ্রঃ উর।

ক্রেমলিন—রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অবস্থিত এক প্রাসাদ। এখান থেকেই রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় বলেই এর গুরুত্ব ও খ্যাতি।

খণ্ডগিরি—উড়িষ্যার শিল্পসমৃদ্ধ পার্বত্য গুহা। এখানে সুপ্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন মেলে।

খ্রিষ্ট—যীশু খ্রিষ্ট দ্রঃ।

গগ্যাঁ—প্রখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী Paul Gauguin। ১৮৯০ খ্রি. প্যারিসে জন্ম। স্টক দালাল হিসাবে জীবন শুরু করেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কাজ ছেড়ে ইম্প্রেশনিষ্ট ঢঙে পিসারো ও সেজান-এর সমতুল্য ছবি আঁকতেন। পরে ঐ রীতি এবং প্রকৃতি চিত্রণের রীতি ছেড়ে Synthetism চিত্র আঁকেন। বিশ শতকের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এঁর প্রভাব অপরিসীম। ১৯০৩ খ্রি. দারিদ্র্য, রোগ ও দুঃখে তাঁর মৃত্যু হয়।

গঙ্গাসাগর—গঙ্গার মোহনায় সাগর দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তের তীর্থ। এখানে সম্ভবত প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। ১৬৮৮ খ্রি. ভীষণ জলপ্লাবনে এই দ্বীপ জলহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়। কথিত আছে, সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল মুনি এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ

করেন। তাঁর শাপে ভস্মীভূত সগরসন্তানদের উদ্ধারকল্পে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনেন ও গঙ্গার মাহাত্ম্যে এই স্থান তীর্থে পরিণত হয়। এখানে পৌষসংক্রান্তিতে মেলা হয়। আগে সন্তানহীনা নারীরা মানত করে সন্তান লাভ করলে প্রথম পুত্র এখানে বিসর্জন দিত। এই দ্বীপে কপিল মুনির এক মন্দির আছে। দ্রঃ কপিল।

গন্ধর্ব—ঋগ্বেদে আছে, আদি গন্ধর্ব প্রথম মানব-মানবী যম ও যমীর পিতা ছিলেন। পরবর্তী সাহিত্যে গন্ধর্বরা দেবযোনি এবং স্বর্গের গায়ক। সঙ্গীতশাস্ত্রকে তাই বলে গন্ধর্ববেদ। গন্ধর্বরা সুপুরুষ ও কামুক। তাদের বিবাহরীতিকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। অথর্ব বেদের মতে গন্ধর্বদের অমঙ্গল করার শক্তি আছে।

গয়া—বিহারের গয়াজেলায় অবস্থিত বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ। এখানে মৃত পূর্বপুরুষদের পিণ্ড দান করলে তাদের আত্মার মুক্তি ঘটে, হিন্দুদের এই বিশ্বাস। কিম্বদন্তী আছে গয়াসুরের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়। গয়া শহরের ৫/৬ মাইল দূরে বুদ্ধগয়ায় গৌতমবুদ্ধ সম্বোধিলাভ করেন। তাই বৌদ্ধজগতেও গয়ার গুরুত্ব অসামান্য।

গাঙুড়—মনসামঙ্গলে উল্লিখিত নদী। লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় বেহুলা এই নদীপথে ভেসে স্বর্গে পৌঁছান এবং দেবতাদের কৃপায় তাকে পুনর্জীবিত করে ফিরে আসেন।

গান্ধী—'মহাত্মা গান্ধী' দেখুন।

গিবন—এডোয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪) বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক। রোম সাম্রাজ্যের উত্থান পতন-এর ইতিহাস লিখে তিনি প্রসিদ্ধি পান, তাঁর আত্মজীবনী ও স্মরণীয় গ্রন্থ।

গৌড়—বাংলায় অবস্থিত প্রাচীন রাজ্য ও রাজধানী। গৌড় নগর বর্তমান মালদহের মধ্যে। খ্রি. পূ. পঞ্চম শতক থেকে গ্রন্থাদিতে গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৭ম শতকে কর্ণসুবর্ণকে রাজধানী করে স্বাধীন গৌড়রাজ্য রাজা শশাঙ্কের অধীনে গড়ে ওঠে। পরে পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের এবং পাঠান সুলতানদের আমলেও গৌড়ের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ অব্যাহত ছিল। মোগল আমলে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় গৌড়ের গৌরব ম্লান হয়।

গ্যয়টে/গ্যেটে—বিখ্যাত জার্মান কবি নাট্যকার ও কথাশিল্পী Johann Wolfgang von Goethe (১৭৮৯-১৮৩২) তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যে Sorrows of young Weather উপন্যাস ও Faust নাট্যকাব্য অন্যতম। বিশ্বের একটি মহৎ সৃষ্টি Faust। তাঁর 'ইফিগেনী আউফ টাউরিস' কাব্য এবং সুবিশাল উপন্যাস 'ভিলহেলম মাইষ্টের' উল্লেখযোগ্য। গ্যেটে একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক কবি ও চিন্তানায়ক হিসাবে বিশ্বজোড়াখ্যাতির অধিকারী।

গ্যালিফ ষ্ট্রিট—উত্তর কলিকাতার একটি রাজপথ।

গ্রিস—ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত উপদ্বীপ। স্বাধীন নগররাষ্ট্রভিত্তিক গঠনতন্ত্র এখানেই প্রথম উদ্ভূত হয়। বিশিষ্ট সভ্যতা ও কৃষ্টিসম্পন্ন গ্রিসের ইতিহাস প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক কাহিনীর সমষ্টি।

এগুলির মধ্যে এথেন্স স্পার্টা মাসিডন প্রভৃতি নগর রাষ্ট্র প্রধান। খ্রি. পূ. ১০০০ সাল থেকে খ্রি. পূ. ৩০০ গ্রিস ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার জ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য ও শিল্পকলা সবই প্রাচীন গ্রিসের দান।

গ্রে স্ট্রিট—উত্তর কলকাতায় অবস্থিত এক রাজপথ।

গ্লাসগো—স্কটল্যাণ্ডের প্রধান শহর ও শিল্পকেন্দ্র। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর এক প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র।

চণ্ডিকামঙ্গল—এ মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। কালকেতু এবং ধনপতি দুটি উপকাহিনীর মাধ্যমে চণ্ডীদেবীর মহিমা প্রতিষ্ঠা ও তাঁর পূজা প্রচার করা হয়েছিল। দ্র. মুকুন্দরাম।

চণ্ডীদাস—বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস সম্ভবত চৈতন্য পূর্ববর্তী। সহজ সরল ভাষায় রচিত তাঁর পদাবলী চিরকাল বাংলাদেশে আদৃত হয়েছে। কিছুদিন আগে 'বড়ুচণ্ডীদাস' রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রশ্ন দেখা দেয় দুই চণ্ডীদাসই এক এবং অভিন্ন কিনা। 'রামী' দেখুন।

চন্দ্রমালা—রূপকথার নায়িকা।

চন্দ্রশেখর—শিব। চাঁদ শিবের শিরোভূষণ বলে তাঁর এই নামকরণ।

চাঁদ—মনসামঙ্গলকাব্যে বর্ণিত চন্দ্রধর সওদাগর। শিবভক্ত চাঁদ মনসার পূজা করতে অস্বীকৃত হওয়ায় মনসার কোপে অশেষ দুর্ভাগ্যের শিকার হন, কিন্তু তাঁর মনোবল নষ্ট হয় না। অবশেষে পুত্রবধূ বেহুলার মাধ্যমে মনসা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে বাম হাতের পূজা লাভ করেন এবং চাঁদের পুত্রদের পুনর্জীবিত ও ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার করে দেন।

চার্চিল—স্যার উইনষ্টন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বিচিত্র প্রতিভাধর মানুষটি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর লেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস এবং আত্মজীবনী উল্লেখযোগ্য রচনা। চিত্রকর হিসাবেও তিনি কৃতী ছিলেন।

চার্বাক—নাস্তিক মুনিবিশেষ। কথিত আছে, ইনি বৃহস্পতির প্রিয় শিষ্য এবং তাঁর কাছেই এই জড়বাদী দর্শন লাভ করেন। তাঁর কথা খুব চারু বা মিষ্ট ছিল বলে নাম চার্বাক। এঁর মতে—'দেহ সচেতন ; আত্মা নেই; পরলোক নেই ; সুখই পরম পুরুষার্থ ; প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ ; পৃথিবী, জল, বায়ু ও আগুন থেকে সব পদার্থের উদ্ভব হয়েছে' ইত্যাদি।

চিৎপুর—কলকাতার উত্তর ও মধ্য সংযোগকারী এক প্রধান রাজপথ (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী) ও উত্তরস্থিত একটি থানা। কলকাতার এই অঞ্চলটি সুপ্রাচীন ও ঘনবসতি পূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র।

চিন—এশিয়ার বৃহত্তম লোকবসতিপূর্ণ রাজ্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম অধিষ্ঠানভূমি চিন, মূল চিন ভূখণ্ড ও মাঞ্চুরিয়া, শিকাং, চিংহাই, শিনকিয়াং ও অন্তর্মঙ্গোলিয়া নিয়ে গঠিত। এখানে কনফুশিয়ান, বৌদ্ধ ও তাও ধর্মাবলম্বীদের বাস। এখন চিন কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত।

চেৎলা—দক্ষিণ কলিকাতায় কালিঘাটের পার্শ্ববর্তী এক অঞ্চল।

ছত্রপতি—মারাঠা নায়ক শিবাজী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ছত্রপতি উপাধি ধারণ করেন। এঁর মৃত্যুর পরও পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজীর অনুগামীদের দমন করতে পারেন নি।

জয়েস—ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেমস জয়েস। ইনি বিখ্যাত উপন্যাস ইউলিসিস রচনা করেন।

জরাথুষ্ট—প্রাচীন পারসিক ধর্মপ্রবর্তক জরাথুষ্ট খ্রি. পূ. ১০০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কথিত আছে পনের বছর পর্বতে তপস্যার পর পরমেশ্বর 'অহুর-মজদা' তাঁকে দেখা দেন। এর পর তিনি নিজের লেখা গাথায় একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। এজন্যে আজীবন অশেষ নির্যাতন ভোগ করে ৭৭ বছর বয়সে এক ধর্মান্ধ ব্যক্তির হাতে ইনি নিহত হন। এর বড় ছেলে 'মগ' বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'মগ' শব্দেরই গ্রিক বহুবচন রূপ Magi (প্রাচের জ্ঞানীবর্গ) বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে।

জলাঙ্গী—বাংলাদেশে অবস্থিত এই নদীটি পদ্মার একটি উপনদী এবং পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশিছে।

জাঞ্জিবার--পূর্ব আফ্রিকাস্থিত সুবৃহৎ দ্বীপ। জাঞ্জিবারের রাজধানী জাঞ্জিবার নগরী।

জাভা—ইন্দোনেশিয়া। অনেক পর্বত ও আগ্নেয়গিরি সমাকীর্ণ এই দ্বীপে রবার, কফি, চা, চিনি, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ও নানা রকম বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য আছে। ঘনবসতি এই রাজ্যের রাজধানী জাকার্তা। জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিওর উপকূল সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের অংশবিশেষকে জাভা সমুদ্র বলা হয়।

জামসেদজি—বিখ্যাত শিল্পপতি জামসেদজি টাটা। ইনিই প্রথম ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলেন। বিহারের জামসেদপুর টাটানগর এরই কীর্তি।

জুহু—বোম্বাই শহরের সন্নিহিত সমুদ্র উপকূল। জুহু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাগরবেলা এবং পর্যটনস্থান।

জেঙ্গিস (চিঙ্গিস খান ১১৫৫-১২২৭ খ্রি.)—মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এর আদি নাম তেমুজিন। বন্য তাতার-দের দমন করে ১১৮৮ খ্রি. খান পদে বৃত হন। ক্রমে তাঁর সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কাস্পিয়ান এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়া থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। নেপলিয়ঁর মতো রণনিপুণ এবং তাঁর চেয়েও দক্ষ সাম্রাজ্য সংগঠক জেঙ্গিস দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁ।

জে. এম. সেনগুপ্ত—বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সাধারণের কাছে এই নামে পরিচিত ছিলেন। এঁর স্ত্রী নেলী সেনগুপ্ত বিশিষ্ট কংগ্রেস নেত্রী ছিলেন।

জেনেভা—সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত শহর। ১৮৬৪ খ্রি. ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এখানে এক চুক্তিতে উপনীত হয়ে যুদ্ধে আহত ও রুগ্ণদের প্রতি মানবিক আচরণ ও তাদের সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করেন। এর ফলে পরে ১৮৭০ সালে রেডক্রশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে জেনিভায় মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে জার্মানি লোকার্ণোচুক্তির শর্তাদি মেনে

নেয়। (লোকার্ণো দেখুন) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এই সময়েই একমাত্র শান্তির উজ্জ্বল পরিবেশ স্পন্দিত হয়েছিল।

জোড়াসাঁকো—উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়।

জ্যাসন—গ্রিক পুরাতত্ত্বমতে Acson-এর পুত্র জ্যাসন রাজার আদেশে পঞ্চাশ দাঁড়ের জাহাজ 'আর্গো' তৈরি করে সমুদ্রাভিযানে যান। Colchis থেকে Phrixus-এর বিদেহী আত্মাকে মুক্তি দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। নানা বিঘ্ন উত্তীর্ণ Jason-এর যোগ্য নেতৃত্বে এই দুঃসাহসী ও ঘটনাবহুল অভিযান সার্থক হয়েছিল।

টায়ার সিন্ধু—ফিনিসিয়ার সর্বদক্ষিণ উপকূলে নগররাষ্ট্র ছিল টায়ার। বাণিজ্য দক্ষ ফিনিশিয়রা এই টায়ার বন্দরে ভিড়তেন। খ্রি. পূ. পঞ্চম শতকে পারস্য সম্রাট গ্রিস আক্রমণ করলে নৌশক্তিতে দক্ষ ফিনিশিয়রা তাঁকে সাহায্য করেছিল। খ্রি. পূ. ৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডার টায়ার বিজয় করলে ফিনিশিয় সভ্যতা ধ্বংস হয়। টায়ার নগরীর উপকূলবর্তী সাগর 'টায়ার সিন্ধু'।

টারানটেলা—বিষাক্ত মাকড়শার কামড়ের বিষ দূর করার জন্য ইতালিতে এক ধরণের নাচের রীতি ছিল। এই নাচকে টারানটেলা বলা হতো।

টালা—কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠস্থিত এই অঞ্চলে অবস্থিত জলের সুবৃহৎ ট্যাঙ্ক আছে। এখান থেকে কলকাতায় জল সরবরাহ করা হয়। এরই সন্নিহিত অঞ্চল।

টেনিসি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টকি প্রদেশস্থিত নদী বিশেষ। ওহিও নদীর প্রধান শাখানদী। এর উপত্যকা আগে প্রবল বন্যায় বিপর্যস্ত হতো। এখন বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সাহায্যে বহু বাঁধ তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতির মাধ্যমে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছে। এই পরিকল্পনার আদলে ভারতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

টেরিটি বাজার—মধ্য কলকাতাস্থিত একটি বাজার।

টোকিও—জাপানের রাজধানী। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

ট্রয়—প্রাচীন এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্ক) উত্তর-পশ্চিম কোণে পৌরাণিক যুগের ইলিয়াম রাজ্যের রাজধানী ছিল ট্রয়। ইউরোপ ও এশিয়ার যোগাযোগের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল বলে এরা বিদেশী জাহাজীদের উপর জুলুম করতো। এই কারণেই গ্রিকদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা হয়। গ্রিকদের সমবেত আক্রমণে এই ট্রয়ের ধ্বংসের কাহিনী হোমারের ইলিয়াড কাব্যের বিষয়বস্তু। পুরাতত্ত্ববিদ শ্লীম্যান ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করেন। এখানে নানা স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন যুগের সভ্যতার নিদর্শন ও ঘরবাড়ি পাওয়া যায়।

ডেভিড কপার ফিল্ড—ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

তক্ষশীলা—মহাভারতে উল্লেখিত এই নগরী বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। তক্ষশীলা সেকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল।

তপতী—সূর্যপত্নী ছায়া।

তাজমহল—সাজাহাঁ দেখুন।

তারক গাঙ্গুলি—বঙ্কিম যুগের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪১-৯১ খ্রি.)। এঁর সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) স্মরণীয় সৃষ্টি। এছাড়াও তিনি আরো ৪ খানি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও বঙ্কিম প্রভাবমুক্ত।

তিলোত্তমা—পরমা সুন্দরী দেবীবিশেষ। বিশ্বের রমণীয় পদার্থগুলির তিল তিল অংশ নিয়ে এঁকে সৃষ্টি করা হয় বলে এর নাম তিলোত্তমা। একে পাবার জন্যে অচ্ছেদ্যবন্ধন দুর্ধর্ষ অসুর ভ্রাতৃযুগল সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে লড়াই বাধে, ফলে উভয়ের ধ্বংস ও মৃত্যু হয়।

তালতলা—উত্তর-পূর্ব কলকাতায় অবস্থিত এক অঞ্চল।

তৈমুর—(১৩৩৬-১৪০৫) চাঘতাই তুর্কি নেতা তৈমুর ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সমরকন্দের সিংহাসন লাভ করেন। খোঁড়া ছিলেন বলে 'তৈমুরলঙ্গ' বলা হয়। পারস্য, আফগানিস্তান ও মেসোপোটেমিয়া জয় করে ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে ভারতে আসেন। তলম্ব দীপালপুর ও ভাতনীর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। দিল্লিতে তিনি এক লক্ষ বন্দী হিন্দুকে হত্যা করেন। নাসিরুদ্দিন মামুদকে পরাজিত করে মীরাট, কাংরা ও জম্মু জয় করে ১৩৯৯ খ্রি. ভারত ত্যাগ করেন।

ত্রিশঙ্কু—কিম্বদন্তী আছে, রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের সহায়তায় স্বর্গলাভের চেষ্টা করেন। বিশ্বামিত্র তপপ্রভাবে তাঁকে স্বর্গে পাঠান কিন্তু ইন্দ্র তাকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দেন না। মধ্যপথস্থিত ত্রিশঙ্কুর দুর্দশামোচনে কৃতসংকল্প বিশ্বামিত্র নূতন নক্ষত্রমণ্ডল ও নূতন স্বর্গসৃষ্টি করতে শুরু করেন। তখন ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান দেন।

দক্ষ প্রজাপতি—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ তাঁর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম নেন। এর ভার্যা প্রসূতি। দক্ষের বহুকন্যা হয়—তার মধ্যে কশ্যপ ১২টি, ধর্মরাজ ১০টি, চন্দ্র ২৭টি, অরিষ্টনেমি ৪টি, অঙ্গিরা ২টি এবং শিব সর্বকনিষ্ঠ সতীকে বিবাহ করেন। ভৃগুঋষির যজ্ঞে শিব দক্ষকে অভিবাদন না করায় ক্রুদ্ধ দক্ষ স্বয়ং এক শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণে এই যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে দক্ষের শিবনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেন। সানুচর শিব তখন যজ্ঞ নষ্ট করে দক্ষের শিরোচ্ছেদ করেন। পরে প্রসূতির স্তবে শিব দক্ষের ছিন্ন মুণ্ডের স্থানে ছাগমুণ্ড বসিয়ে পুনর্জীবিত করে দেন।

দধীচি—অথর্বা ঋষির পুত্র দধীচিমুনি বৃত্রের নিধনের জন্য ইন্দ্রের অনুরোধে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন অস্থি দান করেন। সেই অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করে ইন্দ্র অসুরদের দমন করেন।

দশ মহাবিদ্যা—সতীর দশমূর্তি। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞকালে অনিমন্ত্রিত হয়েও পিত্রালয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অনিচ্ছুক শিবের সম্মতি আদায়ের জন্য সতী এই দশমূর্তি ধারণ করে তাঁকে ভয় দেখান বলে কথিত আছে। কালী, তারা, বগলা, ষোড়শী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী প্রভৃতি এর অন্যতম।

দাদু—মধ্যযুগের অন্যতম মরমী সন্ত কবি।

দাদাভাই নৌরজি—বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা, ইনি জাতিতে পার্শি ছিলেন।

দামোদর—পালামৌ জেলার খাসারগড় থেকে উদ্ভূত এই নদ বরাকর কোণার বোকারো ও যমুনীয়া উপনদীর জলে পুষ্ট হয়ে সর্পিল গতিতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলি নদীতে মিশেছে। দামোদরের নিম্ন অববাহিকা বন্যার নিয়মিত প্রকোপে বিধ্বস্ত হতো। বর্তমানে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাধার থেকে কৃষির জন্য জলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এই অঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

দার্জিলিং—পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শৈলাবাস। এখানে দুর্জয়লিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে নাকি এর নাম দার্জিলিং হয়েছে।

দিকহস্তী—পৌরাণিক মতে আকাশের আটদিকে দাঁড়িয়ে আটটি দিকহস্তী শুঁড় দিয়ে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। পূর্ব দিকে থেকে এরা হলো ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদণ্ড, সার্বভৌম, সুপ্রতীক।

দিল্লি—সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী। খ্রি. ১১ শতাব্দীতে তোমর বংশীয় রাজা অনঙ্গপাল কুতব মিনারের কাছে লালকোট দুর্গ তৈরি করে দিল্লির পত্তন করেন। ১২শ শতাব্দীতে এখানে পৃথ্বীরাজ চৌহান 'রায় পিথোরা' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে দিল্লিতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়। বারবার নগরীর প্রসার, সমৃদ্ধি ও ধ্বংসের এবং রাজধানী স্থাপন ও স্থানান্তরের পর ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর হয় এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের পূর্বে এবং শাহজাহানবাদের দক্ষিণে রায়মিনায় নূতন নগর নয়াদিল্লি গড়ে ওঠে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—আদিনাম চন্দ্রগর্ভ নামান্তর অতীশ। ৯৮০ খ্রী. বাংলাদেশের বিক্রমপুরে কল্যাণশ্রীর ঔরসে প্রভাবতীর গর্ভে এর জন্ম হয়। শৈশবে জেতারি নামক অবদূতের কাছে, পরে কৃষ্ণ গিরি বিহারের রাহুল গুপ্তের কাছে শিক্ষালাভ করেন। উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আখ্যা পান। ব্রহ্মদেশে সুবর্ণদীপ গিয়ে চন্দ্রকীর্তির কাছে অধ্যয়ন করে ১২ বছর পরে মগধে ফেরেন এবং রাজা নয়ন পালদেবের অনুরোধে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ হন। তারপর ধর্মপ্রচারের জন্য তিব্বতে যান ও লাসার কাছে নেথান নগরে নির্বাণ লাভ করেন। মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর বোধিপথ প্রদীপ, পিণ্ডার্থ প্রদীপ, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি দুশ গ্রন্থের লেখক।

দেবদত্ত—১। বুদ্ধদেবের খুড়তুত ছোট ভাই দেবদত্ত ও আনন্দ সহোদর ছিলেন। বুদ্ধের অনুসরণে এঁরা দুজনেই প্রব্রজ্যা নেন। রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য দেবদত্তের সঙ্গে বুদ্ধের মতবিরোধ হয়। দেবদত্তের ইচ্ছা ছিল বুদ্ধের পর তিনি সঙ্ঘের নেতা হবেন। কিন্তু বুদ্ধ তার বিরোধিতা করেন। কৃচ্ছ্রসাধনের পোষকতা করে দেবদত্ত সঙ্ঘ ভেদ করেন। কথিত আছে ইনি একাধিকবার বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। ২। অর্জুনের শঙ্খ।

দেশবন্ধু—চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। দানের জন্য এর অসামান্য খ্যাতি ছিল। মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে তাঁকে মুক্ত করেন এবং ব্যারিষ্টারি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতি হন। পরে কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দল গঠন করেন। 'সাগর সঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের ও অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা। দেশবাসী চিত্তরঞ্জনকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দেন।

দ্বারকা—গুজরাটের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে আরব সাগর তীরস্থিত বন্দর। প্রাচীন নাম দ্বারাবতী ও কুশস্থলী। খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে বৈষ্ণব ও শৈবতীর্থ হিসাবে খ্যাত। দ্বারকার জ্যোতির্লিঙ্গ হলেন নাগেশ শিব। কুশস্থলী আনর্ত দেশের রাজধানী ছিল। পুণ্যজন রাক্ষস এটি অধিকার করায় শর্যাতির বংশধররা এ নগর ত্যাগ করেন। পরে জরাসন্ধের আক্রমণে বিব্রত কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করে কুশস্থলীর জনহীন ভূখণ্ডে দ্বারকা পত্তন করেন। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়। কারো মতে জুনাগড় ও বা গিরিনগরই দ্বারকা ; মতান্তরে বেট দ্বারকাই প্রাচীন দ্বারকা। কথিত আছে বেট দ্বীপে বিষ্ণু শঙ্খসূন দৈত্যকে নিহত করে তার পত্নী তুলসীকে চারাগাছে রূপান্তরিত করেন।

দ্বৈপায়ন—পরাশর মুনিপুত্র বেদব্যাস দ্বীপে জন্ম নিয়েছেন বলে তাঁর নাম হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। দ্র. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

ধনপতি—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম নায়ক। উজানি নগরবাসী এই সওদাগরের লহনা ও খুল্লনা দুই স্ত্রী। বাণিজ্যের জন্য সিংহলে যাবার পথে তিনি কালীদহে কমলেকামিনী মূর্তি দেখেন ও সিংহল রাজকে জানান। কিন্তু রাজাকে বা দেখাতে না পারায় কারারুদ্ধ হন। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত চণ্ডীর কৃপায় রাজাকে এই মূর্তি দেখিয়ে পিতাকে কারামুক্ত করেন।

ধন্বন্তরী—দেববৈদ্য, সর্ববেদ বিশারদ ও মন্ত্র তন্ত্র পারদর্শী ধন্বন্তরী সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হন। তিনি দেবতা, অস্ত্রক্ষত নিরাময় ও প্রাণদানে সক্ষম। মতান্তরে তিনি দীর্ঘতমা বা দীর্ঘতপা ঋষির পুত্র। অনেকে এঁকে দিবোদাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। আবার কারো কারো মতে দিবোদাস ধন্বন্তরী বংশ সম্ভূত। ধন্বন্তরী সুশ্রুতকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। সুতরাং সুশ্রুতের কাল বিচারে তিনি খ্রি. পূ. ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

ধর্মতলা—কলকাতার এক অঞ্চল বা রাজপথ।

ধর্মাশোক—অশোক দ্র.।

ধলেশ্বরী—বাংলাদেশস্থিত নদীবিশেষ।

ধানসিড়ি—ধনশ্রী > ধনসিড়ি। আসামে এই নামে ২টি নদী আছে। ১। নাগাপর্বতের দক্ষিণ পশ্চিম থেকে ডিমাপুরের কাছে শিবসাগর জেলা দিয়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্বে গোলাঘাট পর্যন্ত গিয়ে পশ্চিমে সরে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে।

২। নেফার তাওয়াং থেকে বেরিয়ে দরং জেলার উদলগুড়ির দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। সমভূমিতে পড়ার সময় ভৈরবকুণ্ড নামে সুগভীর ও পবিত্র কুণ্ড সৃষ্টি করেছে।

ধূমাবতী—কথিত আছে, ক্ষুধিত পার্বতী শিবের কাছে খাদ্য চেয়ে না পেয়ে তাঁকেই গ্রাস করেন। তাতে দেবীর শরীর থেকে ধূম নির্গত হয়ে তাঁকে বিবর্ণ করে দেয়। তখন শিব বললেন 'আমাকে যখন গ্রাস করেছো তখন বিধবা বেশ ধারণ করে তুমি জগতের পূজা নাও। এই মূর্তি ধূমাবতী নামে খ্যাত হোক।' দ্র. 'কমলা', 'দশমহাবিদ্যা'।

নচিকেতা—কঠোপনিষদে আছে বাজশ্রবা ঋষির পুত্র নচিকেতা পিতার কথা রক্ষা করতে যমালয়ে যান এবং ধর্মরাজ যমের কাছে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা করেন।

নবদ্বীপ—পশ্চিমবঙ্গের এর বিশিষ্ট জনপদ, নদীয়ার জেলাশহর। সুপ্রাচীন কাল থেকে গঙ্গাতীরবর্তী এই এলাকা পুণ্যার্থী ও পণ্ডিত জনের নিবাস। চৈতন্যদেব এখানে জন্ম নিয়েছিলেন।

নরক—মৃত্যুর পর যেখানে পাপভোগ করতে হয়। ভূমণ্ডলের দক্ষিণ দিকে ভূমির নীচে ও জলের উপরে যম মৃতদের এনে কর্মানুসারে বিচার করে শাস্তিবিধান করেন। অমিত্র, রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি একুশটি নরকে পাপের তারতম্যানুসারে ঐ সব শাস্তি দেওয়া হয়।

নরীম্যান—বোম্বাই শহরের মেয়র ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ।

নাগার্জুন—প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক। ইনি খ্রি. দ্বিতীয় শতকের লোক, অশ্বঘোষ. আর্যদেব কুমারলাত ও কনিষ্কের সমসাময়িক। ইনি বিদর্ভের অধিবাসী ও অন্ধ্ররাজ সাত বাহনের বন্ধু ছিলেন। ইনি মহাযানের প্রধান শাখা মাধ্যামিক যানের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'মাধ্যামিকা কারিকা' গ্রন্থ, 'অকুতোভয়া' টিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র দশভূমিবিভাষ শাস্ত্র, মহাযানবিংশক, সুহৃল্লেখ, যুক্তি ষষ্টিকা, শূন্যতাসপ্ততি প্রভৃতি গ্রন্থ। ইনি জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎশাশাস্ত্র ও জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মনে হয় নাগার্জুন নামে একাধিক লোক ছিলেন।

নাটোর—বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নগর বিশেষ। রাণীভবানীর রাজত্বের রাজধানী ছিল।

নিউইয়র্ক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ম্যানহাটন ব-দ্বীপের ডাচদের প্রতিষ্ঠিত এই শহর বিশাল অট্টালিকা, সুন্দর উদ্যান ও সেতু শোভিত।

নিনেভে—মেসোপোটেমিয়ার (ইরাক) সুপ্রাচীন রাজধানী। টাইগ্রিস নদীর পূর্বতীরের এই নগরটি আধুনিক মোসুল-এর বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন সুমের সভ্যতার কেন্দ্র। আসুরীয় আমলে এখানে রাজধানী স্থাপিত হয় এব আসুরবনিপালের আমলে (খ্রি. পূ. ৭০০) এই রাজধানী নূতন রূপ নেয়।

নিমতলা—কলকাতার উত্তর-পশ্চিমে অংশে অবস্থিত অঞ্চল। এখানে বিখ্যাত নিমতলা মহাশ্মশান অবস্থিত আছে।

নীলকণ্ঠ—শিব। সমুদ্র মন্থনের ফলে যে কালকূট বিষ ওঠে শিব তা পান করেন। কিন্তু তা উদরস্থ না করে কণ্ঠে ধারণ করেন। তার ফলে কণ্ঠ নীল বর্ণ হয়ে যায়। এইজন্য শিবের অপর নাম নীলকণ্ঠ ও মৃত্যুঞ্জয়।

নেহরু—ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নেহরু পরিবার অতি বিখ্যাত। মতিলাল নেহরু তৎকালীন রাজনীতিক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-৬৯) রাষ্ট্রনীতিক ও লেখক। ইনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ও নবভারতের রূপকার। শান্তিবাদী এই মহান নেতা ৭ বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। Glimpses of World History, The Discovery of India, An Autobiography প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

নৈনিতাল—উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত শৈলাবাস। একটি 'তাল' অর্থাৎ জলাশয়ের পাশে 'নৈনি' দেবীর পীঠ অবস্থিত। সতীর অঙ্গচ্ছেদ কালে তাঁর নয়ন এখানে পড়েছিল বলে এই শক্তিপীঠের এই নাম। এটি একটি দর্শনীয় স্থান।

পদ্মা—বাংলাদেশে প্রবাহিত গঙ্গার মূল প্রবাহ। 'কীর্তিনাশা' দেখুন।

পক্ষিরাজঘোড়া—রূপকথায় উল্লেখিত কিম্বদন্তীর ডানাওয়ালা দ্রুতগামী উড়ন্ত ঘোড়া।

পতঞ্জলি—'পাতঞ্জল' নামক যোগ দর্শনের স্রষ্টা, 'যোগসূত্র' ও 'পাণিনি ভাষ্য' গ্রন্থের রচয়িতা পতঞ্জলি সুঙ্গবংশীয় রাজা, পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক। তাঁর জীবনকালে গ্রিকরা সাকেত ও মধ্যমিকা নগরী অবরোধ করেছিল। এই গ্রিক আক্রমণকাল থেকে অনুমান করা যায় খ্রি. পূ. ১৫০ অব্দে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

পাটলীপুত্র—মৌর্যসাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্র (বর্তমান পাটনা) বিহারে অবস্থিত।

পাথুরেঘাটা—উত্তর কলিকাতার একটি অঞ্চল।

পাভলভ—প্রখ্যাত রুশ শরীরবিজ্ঞানী পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) পাচনতন্ত্রের গ্রন্থি বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালনের নার্ভ ঘটিত নিয়ন্ত্রণ, পরিপাক এবং অভ্যাসলব্ধ প্রতিবর্ত্য ক্রিয়া (কনডিশনড রিফ্লেক্স) সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এইসব যুগান্তকারী গবেষণা লব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে মস্তিষ্ক নির্ভর মনোবিদ্যা গড়ে ওঠে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন সমৃদ্ধ হয় ও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা সহজ হয়। তাঁর মতে মানবচৈতন্য সমেত যাবতীয় মননক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের প্রতিফলন। দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সঙ্গে পাভলভ বিজ্ঞানের সম্পর্ক নেই।

পারিয়া—তামিলনাড়ুতে অচ্ছুৎ বর্ণবিশেষ। ব্রাহ্মণরা এদের ঘৃণা করেন এবং ছায়া মাড়ানোও পাপ মনে করলেন। বর্তমানে এ মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে।

পারস্য—বর্তমান ইরান। আর্যদের সুপ্রাচীন আবাসভূমি পারস্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভারতের বৈদিক যুগের সমকালীন। 'ইরান' দেখুন।

পিকাশো—Poblo Ruigy, Picasso বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে মালাগাতে জন্ম। Munch, Toulouse-Lautrec, Renoir, Ganguin, Van Gogh প্রভৃতির শিল্পধারা অল্পদিনেই আয়ত্ত করেন। প্রথম পর্বে নীল বর্ণের সুপ্রচুর সমাবেশ। প্যারিসের দুর্গতদের ছবি এতে এঁকেছেন। গথিক স্থাপত্যের প্রভাব বাড়ে। তারপর আসে গোলাপীযুগ। সুখের চিত্র। ১৯০৭ সালে সেঁজার ভঙ্গিতে বিমূর্ত শিল্পের ধরনে কিউবিজমের পত্তন করেন। আরো পরের চিত্রে নিগ্রোভাস্কর্যের প্রভাব পড়ে।

পিরামিড—মিশরের প্রাচীন যুগের বিশাল ত্রিকোণাকার রাজসমাধি। প্রাচীনযুগের স্থাপত্য প্রতিভার বিস্ময়কর নিদর্শন ও বিশ্বের আশ্চর্য সপ্তকের অন্যতম। এইসব পিরামিডের অভ্যন্তরে গুপ্তকক্ষে ফারাওদের মৃতদেহ মমীর আকারে কফিনের মধ্যে রক্ষিত হতো।

পুরুরবা—পুরুরবা ও উর্বশীর প্রেম ও দাম্পত্যের কাহিনী পুরাণ প্রসিদ্ধ। মহাকবি কালিদাস এনিয়ে তাঁর বিখ্যাত নাটক বিক্রমোর্বশী রচনা করেন।

পোহলবি—প্রাচীন পারসিক ভাষা।

পো—মার্কিন কবি ঔপন্যাসিক গল্পকার ও চিন্তাবিদ এড্‌গার এলান পো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রান্সে আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে।

পোল্যাণ্ড—ইউরোপের অন্তর্গত এই দেশ ১৯১৮ সালে প্রথম স্বাধীনতা লাভ করে। কৃষি ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের রাজধানী ওয়ারশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি দ্বারা অধিকৃত ও বিধ্বস্ত হয়।

প্যারাডিম—Paradigm-এই ব্যাকরণিক চার্টে শব্দরূপের মতো শব্দের অবস্থান দেখানো হয়।

প্যারিস—শেন নদীর তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম নগর। সাহিত্য ও শিল্প চর্চার পীঠস্থান। ১৮৭০-৭১ সালে জার্মানির দ্বারা অবরুদ্ধ এবং ১৯৪০-৪৫ জার্মানির দ্বারা অধিকৃত ছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে ১৯১৯ সালে এখানে প্যারিস পীস কনফারেন্স শুরু হয় এবং ১৯২০ সালে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বার্লিন শান্তিচুক্তি সমর্থিত হয়।

প্যালেষ্টাইন—বাইবেলে উল্লেখিত প্রাচীন রাষ্ট্র সিরিয়া ও লেবাননের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই শহরের উত্তরে জর্ডন, পূর্বে মিশরের সিনাই অঞ্চল, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। ১৯৪৮ সালে এখানে এক নূতন ইহুদীরাষ্ট্র ইজরায়েল-এর প্রতিষ্ঠা হয়। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে এই নবগঠিত রাষ্ট্র পার্শ্বস্থ আরব রাষ্ট্রগুলির নানা অঞ্চল অধিকার করে বিশাল হয়ে ওঠে। এর প্রধান শহর জেরুজালেম, খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। সম্প্রতি চুক্তিমাধ্যমে কিছু এলাকা প্যালেষ্টানীয়দের ফেরত দেওয়া হয়েছে।

প্রচেতা—১। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ২। প্রজাপতি দক্ষের পিতা। ৩। ব্রহ্মার পুত্র।

প্রভেন্স—পূর্ব দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত এক অঞ্চল। এখানে মধ্যযুগে ত্রুবাদুররা শৌর্য প্রদর্শন করে গিয়েছে।

প্লেটো—(খ্রি. পূ. ৪২৭ খ্রি. পূ. ৩০৭) গ্রিক দার্শনিক প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য ও অ্যারিষ্টটলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অজস্র বইয়ের মধ্যে Dialogues এবং Republic অন্যতম।

ফিটজেরাল্ড—ওমরখৈয়াম-এর ফার্শি রুবাইসমূহের বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদক এডোয়ার্ড ফিটজেরাল্ড।

ফিনিশিয়—ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে সিরিয়ার উপকূলে ও লেবানন পর্বতের পশ্চিমে প্রাচীনকালে ফিনিশিয়া অবস্থিত ছিল। খ্রি. পূ. ৪০০০ বছর আগে তাঁরা সিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। খ্রি. পূ. ১৮০০ থেকে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন থেকে

খ্রি. পূ. ১৫০০ অব্দে মিশর সম্রাট খড়মোঙ্গের এবং তারপরে ব্যাবিলন সম্রাট নেবুচাডনেজার ফিনিশিয়া জয় করেন। তারপর ফিনিশিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। বিবলস, সিডন ও টায়ার ফিনিশিয়ার তিন নগরী। ফিনিশিয়রা বাণিজ্যে পক্ষ, নৌযুদ্ধে পটু ও উপনিবেশস্থাপনে উদ্যোগী ছিল। ফিনিশিয় বর্ণমালা থেকে গ্রিক বর্ণমালা উদ্ভুত হয়। 'টায়ার সিন্ধু' দেখুন।

ফিয়ারলেন—কলিকাতার একটি গলিপথ।

ফ্যান্সি ফিল্ডস—এক ইংরেজ অভিনেত্রী।

ফ্যারাও—মিশরের সম্রাটের উপাধি।

ফ্রয়েড—Sigmund Frued(১৮৫৯-১৯৩৯) বিশ্বখ্যাত মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানী! ১৯২০ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে Neurlogy-র অধ্যাপক ছিলেন। প্রথমে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নার্ভরোগ সম্পর্কে ফরাসি চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাঁ সার্তে শার্কের কাছে মনোরোগ ও সংবেশন (হিপনোটিজম্) সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে মনোরোগের চিকিৎসক হিসাবে ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বহুগ্রন্থের লেখক হিসাবে বিখ্যাত হন। তাঁর মতে শৈশব থেকে ক্রমবিকশিত অহংবোধ এবং আধিশাস্তা বা সুপার ইগোর প্রভাবে অবদমনের ফলে যৌনকামনা নির্জ্ঞানমনে জমা হয়। মনোবিকার এই অতৃপ্ত যৌনকামনার প্রকাশ। স্বপ্নে তারই স্ফুরণ বা চরিতার্থতা ঘটে।

ফ্রান্স—পশ্চিম ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। রাজধানী প্যারিস। ফ্রান্স সুদীর্ঘকাল শিল্প ও সাহিত্যের পোষকতা করে এসেছে। প্যারিসকে এক সময়ে বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী মনে করা হতো। বহু খ্যাতিমান চিত্রকর ও ভাস্কর এদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অসংখ্য চিত্রশালা এবং সংগ্রহশালায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন রক্ষিত আছে।

বটতলা—উত্তর কলকাতার এই অঞ্চল শস্তা লোকপাঠ্য পুস্তক ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

বরুণ—জলের অধিদেবতা বরুণ প্রাচীন বৈদিক দেবতাদের অন্যতম। তিনি পাশ অস্ত্রধারী। ইন্দ্রের কোপ থেকে তিনি হিমালয় পুত্র মৈনাককে আশ্রয় দেন। এবং ভৃগুমুনির অভিশাপে স্বর্গে শ্রীভ্রষ্ট হলে তিনি লক্ষ্মীকে জলতলে আপন কন্যার মতো পালন করেন।

বরাহ অবতার—বিষ্ণুর শূকরবৎ মুখাবয়ব বিশিষ্ট দশাবতারের তৃতীয় অবতার। এই মূর্তিতে তিনি 'বর' নামক অসুর বধ করেন। পৃথিবী জলনিমগ্ন হলে বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হয়ে দাঁত দিয়ে পৃথিবীকে জল থেকে তুলে ধরেন। এর ঔরসে ধরণীর গর্ভে নরক নামক অবতারের জন্ম হয়। এই অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের নিপাত সাধন করেন।

বল্লাল সেন—গৌড়ের সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেন ও রাণী বিলাসদেবীর পুত্র বল্লাল সেন খ্রি. ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই এদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। ইনিই সেন বংশীয় রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়ে গৌড় তুর্কীদের পদানত হয়।

বাগীশ্বরী—সরস্বতী, বাক্‌পটু।

বাদুড়বাগান—উত্তর কলকাতার একটি অঞ্চল।

বাভেনব্রুক—টোমাস মান রচিত উপন্যাস।

বারাসাত—বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশহর ও রেলওয়ে জংশন।

বারুণী—১। বরুণের কন্যা ; লক্ষ্মী। ২। বরুণের স্ত্রী, 'বরুণানী' শব্দের পরিবর্তে 'বারুণী' শব্দটি মধুসূদন দত্ত প্রথম বরুণ পত্নী হিসাবে প্রয়োগ করেন।

বালগঙ্গাধর—বালগঙ্গাধর তিলক স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিপর্বে বিশিষ্ট মান্যনেতা ছিলেন। মহারাষ্ট্রে 'বাল', পঞ্জাবে 'লাল' —অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলায় বিপিনচন্দ্র পাল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিন প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে গণ্য হতেন।

বালি—জাভার পূর্বদিকের একটি দ্বীপ। ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশ এখানে ছিল। এখানের অধিবাসীদের মধ্যে উন্নত নৃত্যকলার চর্চা আছে।

বাসব—ইন্দ্র। 'ইন্দ্র' দেখুন।

বাসুকি—কশ্যপ মুনি ও রুদ্রর সন্তানদের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি শেষ নাগ হিসাবে দেবতুল্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর ফণার উপর পৃথিবী অধিষ্ঠিত এবং সমুদ্র মন্থনের সময় দেবাসুর তাঁকে রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে আশ্রয় দিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ভাগিনেয় আস্তিক তাঁকে উদ্ধার করেন।

বিদর্ভ—প্রাচীন রাজ্যবিশেষ। কুন্তিনগর। অধুনা এই স্থানের নাম বেরার প্রদেশ। দময়ন্তী, অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রা ও রুক্মিনী বিদর্ভের কন্যা ছিলেন।

বিদিশা—প্রাচীন নগর। মালব রাজ্যের অন্তর্গত। গোয়ালিয়রের নিকটে আধুনিক 'ভিলসা'।

বিম্বিসার—প্রাচীন মগধের রাজা। খ্রি. পূ. ৫৩৭ খ্রি. পূ. ৪৮৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এর রাজধানী ছিল রাজগৃহ (রাজগীর)। বুদ্ধদেবের কাছে ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। ইনি নিজপুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

বিশালাক্ষী—বাংলাদেশের লৌকিক দেবীবিশেষ। চণ্ডীর বা সরস্বতীর রূপভেদ। বাশুলী। সম্ভবত বাশুলীশব্দ থেকেই 'বিশালাক্ষী' শব্দ কল্পিত হয়েছে। বৌদ্ধ তন্ত্রেও বাশুলী নাম পাওয়া যায়। বিশালাক্ষী রূপবাচক বিশেষণ, কোনো নির্দিষ্ট দেবতার পরিচয় নয় ; তিনি কালী, চণ্ডী, সরস্বতী যে কেউ হতে পারেন। জীবনানন্দের বিশালাক্ষী নিঃসন্দেহে লক্ষ্মী।

বুদ্ধ—শাক্যসিংহ, গৌতম, সিদ্ধার্থ (খ্রি. পূ. ৫৫৬-৫৭৬) কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধন ও রাণী মহামায়ার পুত্র সিদ্ধার্থ বিমাতা গৌতমী কর্তৃক লালিত হন। পরিণত বয়সে দণ্ডপানির কন্যা গোপার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর পুত্রের নাম রাহুল। জীবের দুঃখ মোচনকল্পে তিনি গৃহত্যাগ করে কঠোর তপশ্চর্যায় বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধত্ব অর্জন করেন ও অহিংসা এবং সর্ব জীবে দয়াভিত্তিক নবধর্ম প্রচার করেন। ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বৃন্দাবন—যমুনাতীরে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও রাধা মিলিত হতেন। বৃন্দাবন তাই পুণ্যতীর্থ বলে পরিগণিত।

বেটি নাটহল—ইংরেজ মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন।

বেথলেহম—ইজরায়েল-এর অন্তর্ভুক্ত জেরুজালেম-এর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর। এখানে যীশুখ্রিষ্টের জন্ম হয়।

বেনারস—বারানসীর ইংরেজি নামান্তর। 'কাশী' দেখুন।

বেন্টিক স্ট্রিট—কলকাতার একটি রাজপথ।

বেবিলন—মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনতম শহরগুলির অন্যতম ও সুমের সভ্যতার পীঠস্থান ও এককালীন রাজধানী বেবিলন আধুনিক বাগদাদ শহর থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে ইউফ্রেতিশ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সুমেরীয় সভ্যতা প্রায় খ্রি. পূ. ৪০০০ অব্দের হলেও এখানে সম্ভবত খ্রি. পূ. ২৩০০ অব্দে রাজধানী স্থাপিত হয়। খ্রি. পূ. ১৯০০ অব্দে সম্রাট হাম্মুরাবি এবং আরো পরে সম্রাট নেবুকাডনেজারের ঝুলন্ত বাগান এবং হাম্মুরাবির গ্রন্থাগার এই সভ্যতার চিহ্ন বহন করছে। 'ফিনিশিয়' দেখুন।

বেরিনতরঙ্গ—উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ বিশেষ বেরিং সাগর উত্তর আমেরিকায় আলেউসিকাল দ্বীপসমূহের সন্নিহিত। বেরিং প্রবাহ বেরিং প্রণালী থেকে কামস্কাটকা ও জাপানে দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে প্রবাহিত অপেক্ষাকৃত শীতল জলের স্রোত। বেরিং সাগরে মুক্তা পাওয়া যায়।

বেলগাছিয়া—উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে আর. জি. কর হাসপাতাল অবস্থিত।

বেহালা—কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত এক অঞ্চল।

বেহুলা—মনসামঙ্গলের নায়িকা বেহুলা (বিপুলা) সায়বেনের কন্যা ও চন্দ্রধর সওদাগরের পুত্র লখিন্দরের বধূ। বাসর ঘরে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হলে বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভাসতে ভাসতে স্বর্গে উপনীত হন। নেত্রবতীর সাহায্যে ইন্দ্রের সভায় নাচগানে দেবতাদের মুগ্ধ ও মনসাকে তুষ্ট করে স্বামীকে পুনর্জীবিত করেন। চাঁদ দ্রঃ।

বৈকুণ্ঠ—স্বর্গে বিষ্ণুর বাসস্থান।

বৈতরণী—মৃত্যুনদী। যমপুরীর প্রান্তে এই নদী প্রবাহিত। এই নদী পার না হয়ে কেউ যমালয়ে প্রবেশ করতে পারে না।

বৈশালী—মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের আগে বিখ্যাত ষোড়শ জনপদের অন্যতম। গঙ্গার উত্তর উপকূল থেকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত বৃজি রাজ্য ছিল। এই বৃজি আটটি উপজাতির একটি যুক্তরাষ্ট্র ছিল। এর অন্যতম ছিল বিদেহ, লিচ্ছবী, যাত্রিক, বৃজি ইত্যাদি। এই গণশাসিত বৃজি (লিচ্ছবী) রাজ্যের রাজধানী বৈশালী। বৌদ্ধ উপকথায় এই বৈশালীর প্রসঙ্গ বহুবার এসেছে। 'অম্বাপালী' দেখুন।

বোদলেয়র—'ক্লেদজ কুসুম' রচয়িতা ফরাসী প্রতীকী কবি শার্ল বোদলেয়র।

ব্যাণ্ডেল—হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি উপনগরী। ডাচদের প্রতিষ্ঠিত এই শহরে একটি সুপ্রাচীন ক্যাথলিক চার্চ আছে।

ব্যাসকূট—মহাভারত রচনাকালে ব্যাসদেব লিপিকর গণেশের লেখার গতি বিলম্বিত করার জন্য কয়েকটি দুর্বোধ্য শ্লোক রচনা করেন। এই শ্লোকগুলির অর্থভেদ করতে গণেশেরও যথেষ্ট সময় লাগে।

ব্রজেন শীল—বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত দার্শনিক।

ব্রহ্ম—নির্গুণ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম। ইনি সর্বভূতে অবস্থিত অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অব্যয়। উপনিষদসমূহে এঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আধুনিক কালে পৌত্তলিকতা বিরোধী রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা পুনঃ প্রবর্তন করেন।

ব্রহ্মা—মহাপ্রলয়ের পরে সুবর্ণ অণ্ড থেকে উদ্ভূত আদি দেবতার অন্যতম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ চতুরানন ও রক্তবর্ণ। তিনি হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। তাঁর মানস পুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ। তাঁর স্ত্রী সরস্বতী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা। তাঁর বাহন হংস।

ব্রাউনিং—বিশিষ্ট ইংরেজ কবি দম্পতি রবার্ট ব্রাউনিং এবং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং রোমান্টিক রিভাইভ্যালের যুগে স্বনামধন্য ছিলেন।

ভাগীরথী—গঙ্গা। ভস্মীভূত সগর সন্তানদের উদ্ধারের জন্য সগরের প্র-পৌত্র ভগীরথ তপস্যাবলে স্বর্গস্থিত গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। সেই গঙ্গার শাখা ভাগীরথী।

ভারত—ভারতবর্ষ। আর্যমতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। জম্বু, প্লক্ষ, কুষা, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, শাল্মলী দ্বীপের অংশবিশেষকে বর্ষ বলে। জম্বুদ্বীপের যে বর্ষে ভরত নামক রাজা রাজত্ব করতেন তাকে ভারতবর্ষ বলা হয়েছে। ভারতবর্ষ আধুনিক কালে তিনটি রাষ্ট্রে (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) বিভক্ত। ভারত বলতে বর্তমানে সাধারণত ভারত রাষ্ট্রকেই বোঝানো হয়। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত মহাসাগরকে 'ভারত সমুদ্র' বলা হয়েছে।

ভাসান—মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গান মনসার ভাসান।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে নির্মিত স্মরণ সৌধটি কিছুটা তাজমহলের আদলে রচিত কলকাতার এক দর্শনীয় স্থাপত্য কীর্তি।

ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী ও সুপ্রাচীন মন্দিরনগরী ভুবনেশ্বর ভারতের অন্যতম দ্রষ্টব্য তীর্থস্থান।

ভূমধ্যসাগর—ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। দার্দানেলিশ প্রণালীর মাধ্যমে কৃষ্ণসাগর এবং জিব্রাল্টার প্রণালীর মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত।

মকরকেতন—কন্দর্প, কামদেব, মদন। 'মীন কেতন' দেখুন।

মঞ্জুভাষা— চার্বাকের প্রণয়িনী ছিলেন।

মৎস্যনারী—এক শ্রেণীর কল্পিত প্রাণী যার মাথা ও ধড়টি মানুষের মতো এবং নিচের অংশ মাছের লেজের মতো। এরা সমুদ্রের অধিবাসী। এদেরই স্ত্রীজাতিকে মৎস্যনারী বা মীনকন্যা বলা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যদেশের প্রাচীন কিম্বদন্তীতে এদের 'সাইরেন' বা সুধাকণ্ঠ মায়াবিনী মনে করা হতো।

মনসা—সর্পদেবী বিষহরী মনসা, কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মতান্তরে শিবের মানসকন্যা ও বাসুকী কর্তৃক লালিতা)। বাসুকীর ভগিনী ইনি, জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক মুনির মা। বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদে এঁর এক চক্ষু কানা হয়ে যায়।

মনুমেন্ট—কলকাতার অক্টরলোনি মনুমেন্ট। গড়ের মাঠে অবস্থিত এই সুউচ্চ স্তম্ভ কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য ও শোভা। এখন এর 'শহীদ মিনার' নামকরণ হয়েছে।

মমতাজ—মোগল সম্রাট সাজাহানের পত্নী মমতাজ বেগম। এঁর মৃত্যুর পর এরই স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতে সাজাহান প্রভূত অর্থব্যয়ে অতুলনীয় সমাধিসৌধ আগ্রার তাজমহল গড়ে তোলেন। মধ্যযুগের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়।

মমী—কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষিত শবদেহ। মিশরীয় সম্রাটদের দেহ এই উপায়ে সংরক্ষিত করে পিরামিডের মধ্যে গোপন কক্ষে রক্ষা করা হতো। তারা বিশ্বাস করতো ভবিষ্যতে দেহ বহির্ভূত আত্মা ফিরে এসে আবার এই দেহে আশ্রয় করবে এবং মানুষ প্রাণ ফিরে পাবে।

ময়—উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো অঞ্চলে সুপ্রাচীন 'মায়া' সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সভ্যতা প্রসঙ্গেই কি 'ময়' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?

মহাত্মা গান্ধী—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ব্যারিষ্টারি উপলক্ষে আফ্রিকা যান এবং শ্বেতাঙ্গ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করে বিখ্যাত হন। ১৯১৪ সালে ভারতে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বহুবার আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মহাত্মা' আখ্যা দেন। ১৯২৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য ও অন্যান্য বহু অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁকে অনেকবার অনশন করতে হয়। স্বাধীনতার পর ভারত পাকিস্তানের সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে এক প্রার্থনা সভায় আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়।

মহাভারত—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব এই মহাকাব্য কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। এতে নাকি ১ লক্ষ ১০ হাজার শ্লোক ছিল। দেবদেবী সংক্রান্ত নানাবিধ পৌরাণিক কথা, রাজ বংশাবলীর ইতিহাস ও ধর্মোপদেশ এর অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতকে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাকল্পদ্রুম বলা চলে।

মহেন্দ্র—সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন। ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাও তাঁর পরে শ্রীলঙ্কায় ঐ উদ্দেশ্যে যান।

মাণিকমালা—রূপকথার নায়িকা।

মাতঙ্গী—দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি মাতঙ্গী। দ্র. কমলা।

মাতিস—Henri Matisse (১৮৬৯-১৯৫৪) ফ'-গোষ্ঠীর প্রধান শিল্পী। ইনি Gustave Moreau-র শিষ্য ছিলেন। এঁর রচনা ইম্প্রেশনিজম দ্বারা প্রভাবিত। সেজাঁ ও

Signac-র প্রভাব খুব প্রবল দেখা যায়। ১৯১০ সালে পিকাসোর কিউবিক আর্টের সংশ্রবে আসেন এবং এঁর ফলে ১৯১৪ সালে ফ' আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

মাথুর—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ঘটিত ব্যাপারের গীত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা কংসের দমনের জন্যে বৃন্দাবন ত্যাগ করে চলে যান। অক্রুর এই আমন্ত্রণ বহন করে আনেন। ফলে বৃন্দাবনস্থিত গোপিনীদের অশেষ দুঃখ আক্ষেপ হয়। এই বিরহ গাথা অবলম্বনে বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর পালা রচিত হয়েছিল।

মানিকতলা—উত্তর কলকাতার একটি অঞ্চল।

মারীস্টোপস—প্রখ্যাত মহিলা যৌনবিজ্ঞানী।

মার্কস—জার্মান দার্শনিক Hienrich Karl Marks (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা সাম্যবাদের জনক। জার্মানীর ট্রেডস-এ ইহুদী বংশে এঁর জন্ম। বিখ্যাত গ্রন্থ Das Capital-এর রচয়িতা।

মার্কাস স্কোয়ার—কলকাতার উদ্যানবিশেষ। এখানে টেনিস খেলা হতো।

মার্কোপোলো—বিখ্যাত ভিনিসীয় পর্যটক ও আবিষ্কারক মার্কোপোলো (১২৫৬-১৩২৩) চিন ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশসমূহ পরিক্রমা করে ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সমসাময়িক ব্যক্তিরা এইসব বিস্ময়কর ঘটনা বিশ্বাস না করলেও পরবর্তীকালে তার অনেকাংশ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মালয়—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উপদ্বীপ। এখন সন্নিহিত রাষ্ট্রগুলি একত্র হয়ে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠন করেছে। মালয়ের সন্নিকটস্থ সাগরকে জীবনানন্দ মালয় সাগর নামে অভিহিত করেছেন।

মালাবার—ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ উপকূলকে মালাবার উপকূল বলা হয়।

মিউনিখ—জার্মানির অন্তর্গত ব্যাভেরিয়া প্রদেশের রাজধানী মিউনিখ আইসের নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হিটলারকে তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের, হিটলার ও মুসোলিনির মধ্যে এক চুক্তি হয়। এর ফলে হিটলার অষ্ট্রিয়া গ্রাস করে। রাশিয়ার অজ্ঞাতে এই চুক্তি হয়েছিল।

মিলা হার্জলিস—এই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কবি গ্যয়টে কবিতা লিখেছিলেন।

মিশর—আফ্রিকা মহাদেশের একটি সুপ্রাচীন দেশ। বর্তমান নাম সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। নীল নদের তীরে উদ্ভূত মিশরীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের অন্যতম।

মিহিজাম—বিহারের একটি স্বাস্থ্যাবাস।

মীনকন্যা—মৎস্য নারী দ্রঃ।

মীনকেতন—কামদেব, কন্দর্প। এঁর ধ্বজায় মীন বা মাছের চিহ্ন আঁকা থাকতো। মাছ উর্বরতার প্রতীক, তাই প্রেমের অধিদেবতার প্রতীক হিসাবে মীন চিহ্ন ধরা হয়েছে মনে হয়।

মুকুন্দরাম—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে

কাব্য রচনা করেন। পিতা হৃদয় মিশ্র। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে জন্মভূমি দামুন্যা ত্যাগ করে মুকুন্দ মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামে রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে ছাত্র রঘুনাথ রাজা হলে তাঁর অনুরোধে অভয়ামঙ্গল নামে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। 'চণ্ডিকামঙ্গল' দেখুন।

মুচিপাড়া—মধ্য কলকাতার একটি থানা এলাকা।

মুন্সী—এখানে সম্ভবত বিখ্যাত লেখক ও রাজনীতিবিদ কে. এম. মুন্সীর কথা বলা হয়েছে।

মেঘনা—পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহকে মেঘনা বলা হয়। মেঘনা পৃথিবীর বিস্তৃততম নদী। মোহনায় পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সন্দ্বীপ ও ভোলা অবস্থিত।

মেম্নন—ইথিওপিয়ার রাজা মেম্নন খুল্লতাত ট্রয়রাজ প্রায়ামের সাহায্যের জন্য ট্রয়ের যুদ্ধে যান ও অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হন। তার মা cos-কে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। থেবস দ্বীপে অ্যাসেনোফিসের যে মূর্তি আছে তাকে গ্রিকরা মেম্নন মনে করে। কথিত আছে, উদিত সূর্যের প্রথম রশ্মিপাতে এই মূর্তি সুরঝংকার তোলে। মনে করা হয়, মা cos (ভোর) পুত্রকে চুম্বন করছে এবং মেম্নন সঙ্গীতধ্বনিতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

মৈত্রেয়ী—ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। ইনি পার্থিব ধনসম্পদ বর্জন করে স্বামীর কাছে অমৃতের সন্ধান করেছিলেন। ইনি বলেছিলেন যাতে আমি অমৃত হবো না তা দিয়ে কি করবো?

যদুবংশ—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু পিতৃশাপে রাজ্যভ্রষ্ট হন। এরই বংশধরেরা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পরাক্রান্ত হয়, কিন্তু অন্তর্কলহে সমগ্র বংশই ধ্বংস হয়।

যম—সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে মৃত্যুর অধিদেবতা যমের জন্ম। বিমাতা ছায়া এঁর অযত্ন করলে ইনি তাঁকে পদাঘাত করতে যান, ফলে ছায়ার অভিশাপে পায়ে ক্ষত ও কীট হয়। সূর্য তখন এঁকে এক কুকুর দেন, সে ক্ষত নির্গত পূঁজ ও কীট খায়। ইনি দক্ষিণদিকপাল ও জীবের পাপপুণ্যের বিচারক, যমী এঁর ভগিনী, মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত, আয়ুধ দণ্ড, বাহন মহিষ, দক্ষপ্রজাপতির ১৩টি কন্যার ইনি পাণিগ্রহণ করেন। অনীমাণ্ডব্য মুনির শাপে ইনি মর্ত্যে বিদুর রূপে জন্মান। যমের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।

যমুনা—নদী বিশেষ। সূর্যকন্যা কালিন্দী। বেদোক্ত নদী। এই নামে কয়েকটি নদী আছে। ১। উত্তর ভারতের বিখ্যাত নদী। এর তীরে আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি অবস্থিত। প্রয়াগ তীর্থে এই নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ২। ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্নাংশ যা পদ্মার সঙ্গে মিলে মেঘনা নামাঙ্কিত হয়েছে। ৩। ইচ্ছামতীর অংশবিশেষ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে গঙ্গাসাগরে পড়েছে। ৪। আসামের নদীবিশেষ। ৫। দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত নদীবিশেষ।

যযাতি—কুরুবংশের এক রাজা যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। দৈত্যরাজ কন্যা শর্মিষ্ঠা, দেবযানীর সহচরী ছিল। তাকে গোপনে পত্নীত্বে গ্রহণ করায় শুক্রের অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হয়। শেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু স্বেচ্ছায় পিতার জরা গ্রহণ করে যৌবন দান করলে যযাতি শাপমুক্ত হয়। তিনি তাই পুরুকেই নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। 'যদুবংশ' দেখুন।

যাদবপুর—কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত যাদবপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি যক্ষা হাসপাতাল আছে।

যুনানী—গ্রিক, আইওনিয়া দ্বীপবাসী।

রক্তবীজ—পুরাণে বর্ণিত এক বিশেষ জাতের দৈত্য, যাদের একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়লে নূতন বহু দৈত্যের জন্ম হতো। কালী ঐ রক্তবীজদের সমুহ রক্ত পান করে তাদের নিঃশেষে নিধন করেন।

রবি, রবীন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' নামক ইংরেজি কবিতার বইয়ের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ও নৃত্যনাট্যে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। চিত্রকর অভিনেতা ও বক্তা হিসাবেও তিনি বিশিষ্ট ছিলেন। ইনি বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে আপন সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দেন।

রমন—ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন বর্ণালী সম্পর্কে গবেষণা করে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে নোবেল পুরস্কার পান।

রাই—'রাধিকা' দেখুন।

রাজবল্লভ—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খাঁর প্রধানমন্ত্রী জানকীরামের পৌত্র ও রায়দুর্লভ বা দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভ। দুর্লভরাম আলিবর্দী ও সিরাজের আমলে যুদ্ধ বিভাগের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। পিতার সহায়তার রাজবল্লভ দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন।

রাজাবাজার—মধ্য কলিকাতার শিয়ালদহের সন্নিহিত অঞ্চল। এই এলাকায় প্রধানত দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান ও হিন্দু শ্রমজীবীদের বাস।

রাধিকা—রাধা, রাই। শ্রীকৃষ্ণের মাতুল অভিমন্যু বা আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা অনুরাগিণী ছিলেন। ইনি বৃষভানুর কন্যা। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত ও পদ্মপুরাণে-রাধার উল্লেখ আছে। 'রা' অর্থে লাভ করা, মুক্তি পাওয়া। 'ধা' অর্থে ধাবমান হওয়া। রাধিকা আরাধিকা এবং কৃষ্ণ আকর্ষক অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান হিসাবে উভয়কে গণ্য করা হয়।

রামপ্রসাদ—শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-৭৫)-এর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহরে জন্ম। কলকাতায় এক ধনীর অধীনে সামান্য চাকরি করলেও সব সময়ে শ্যামাবিষয়ক চিন্তায় মগ্ন থেকে গীত রচনা করতেন। কবিত্বশক্তি দেখে মালিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। পরে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের

অনুগ্রহও লাভ করেছিলেন। এঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলি অতি সহজ ও স্বাদু। একখানি কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করে ইনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেছিলেন।

রামী—রজকিনী রামী ওরফে রামতারা বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের প্রেমিকা ছিলেন। রামীও কবি ছিলেন। 'চণ্ডীদাস' দেখুন।

রামেসিস—প্রাচীন মিশরীয় রাজবংশের উপাধি। এর অর্থ সূর্যবংশোদ্ভূত। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশ প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করে। সোসোস্ত্রিসকে রামেসিসদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

রায়—মানবেন্দ্রনাথ রায়। প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৭-১৯৫৪)। ১৯০৭ সালে এঁর নেতৃত্বে ভারতে প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে অস্ত্র আনতে জাভা যান। বাঘা যতীনের মৃত্যু হলে চিনদেশে সানইয়াৎ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও ছদ্মবেশে জাপান আমেরিকা মেক্সিকো ঘুরে লেনিনের আমন্ত্রণে রাশিয়ায় তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেন। মস্কোয় তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। লেলিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ১৯২৯ সালে কমিনটার্নের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন ও ১৯৩০ সালে দেশে ফিরে বন্দী হন। মুক্তি পেয়ে প্রথমে কংগ্রেসে যোগ দিলেও পরে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে তাও ভেঙে হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেন। ইনি বিপ্লবী, দার্শনিক বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও লেখক হিসাবে সম্মানিত।

রায় গুণাকর—ভারতচন্দ্র রায় (১৬৩৪ শক-১৬৮২ শক) হুগলির পেঁড়ো গ্রামে জমিদার বংশে জন্ম। বর্ধমানরাজের রোষে জমিদারিভ্রষ্ট ও কারারুদ্ধ হন। পালিয়ে গিয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণের পর ফরাসডাঙার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় পান। পরে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে আপন দরবারে স্থান দেন ও কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'রায় গুণাকর' উপাধি লাভ করেন। বর্ধমানরাজের প্রতি বিরাগহেতু অন্নদামঙ্গল কাব্যে সু-কৌশলে ইনি 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান জুড়ে দেন।

রাষ্ট্রসংঘ—ইউ. এন. ও.। রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ-বিবাদ মীমাংসা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৩ সালে মস্কোয় রাষ্ট্রসংঘের চার্টার গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালে সানফ্রানসিস্কোয় এর গঠন ও কর্মধারা নির্ধারিত হয়। এর কার্যকরী সংগঠন 'নিরাপত্তা পরিষদে'র পাঁচ স্থায়ী সভ্য আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ভেটো দেবার অধিকার আছে। বহু নূতন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির ফলে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মধারা প্রসারিত হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘ আজ এক শক্তিশালী গৌরবমণ্ডিত অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান।

রাহু—বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র রাহু সমুদ্র মন্থনের পর মোহিনীবেশী বিষ্ণুর সুধা বন্টনের সময় দেবতাদের পংক্তিতে সুধা পান করেন। চন্দ্র ও সূর্য তাকে চিনে একথা বিষ্ণুকে জানালে সুদর্শনচক্রে রাহুর মুণ্ডচ্ছেদ করেন। কিন্তু অমৃতপানের ফলে তার

মৃত্যু না হওয়ায় ঊর্ধ্ব ভাগ 'রাহু' ও দেহ ভাগ 'কেতু' নামে পরিচিত হয়। তাই চন্দ্র সূর্যের প্রতি শত্রুতাবশে এরা চন্দ্র ও সূর্যকে সুযোগ মতো গ্রাস করে, তাই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। রাহু নবগ্রহের এক গ্রহ ও নৈর্ঋত কোণের অধিপতি।

রুদ্র—ধ্বংসকারী শিব। 'শম্ভু' দেখুন।

রুম—রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত।

রুশ—রাশিয়ার অধিবাসী, ভাষা, রাষ্ট্র বা উৎপন্ন দ্রব্য।

রুশো—Jen Jacques Rousseau (১৭১২-৭৮) জেনিভাতে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন কঠোর শ্রম ও পর্যটনের পর ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে এসে দিদোর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহের মুক্ত চিন্তাধারা প্রাচীনপন্থীদের বিরাগের কারণ হয়; ফলে সাময়িকভাবে রুশো ফ্রান্স ত্যাগ করেন। ইংল্যাণ্ডে বাসকালে তিনি Confession এবং Le Contact Social বই দুটি লেখেন। এই অভিনব চিন্তাধারা ও সরকার গঠন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পরিণামে ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত করে।

রূপসা—আসামের নদীবিশেষ।

রেজারেকশন—লিও টলস্টয় রচিত উপন্যাস। 'টলস্টয়' দেখুন।

রোনাল্ড রস—স্যার রোনাল্ড রস বিজ্ঞানী ছিলেন। কলকাতায় থেকে গবেষণা করে ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে মশাবাহিত রোগের দ্বারা হয় একথা প্রমাণ করে ছিলেন। এজন্য তিনি প্রভূত সম্মান ও নোবেল পুরস্কার পান।

রোম—ইতালির রাজধানী। টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত এটি একটি সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত শহর। প্রাচীন বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল। এখানে ভাটিকান শহরে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের বাস। এখানে সেন্ট পিটার গির্জা অবস্থিত। রোম চিরকাল স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা ও বিলাসব্যসনের জন্য বিখ্যাত।

রোহিণী—চন্দ্র পত্নী। এর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত বলে অন্য স্ত্রীদের অভিযোগে দক্ষ কর্তৃক চন্দ্র অভিশপ্ত হন। নক্ষত্র বিশেষ।

লক্ষ্মী—ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিষ্ণুর স্ত্রী, শিব ও দুর্গার কন্যা। লক্ষ্মীপেঁচা তাঁর বাহন।

লখনৌ—কথিত আছে রামানুজ লক্ষ্মণ প্রতিষ্ঠিত এই নগরী তার নামে নামাঙ্কিত হয়। মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের সময় এর শিল্পসমৃদ্ধি ও খ্যাতি তুঙ্গে ওঠে।

লণ্ডন—ইংল্যাণ্ডের রাজধানী। টেমস নদীর তীরে অবস্থিত। এই বিশাল নগরী সুদীর্ঘকাল বিশ্বের রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র ছিল।

লরেন্স—ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক ছিলেন ডি. এইচ. লরেন্স। তাঁর 'সন্স অ্যান্ড লাভার্স' প্রমুখ উপন্যাস জনপ্রিয়।

লহনা—ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী। 'ধনপতি' দেখুন।

লাওৎসে—আনুমানিক ৬০৪ খ্রি. পূ. চিন দেশে দার্শনিক লাওৎসের জন্ম হয়। লাওৎসে নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'পুণ্যের পথ'।

লাহোর—পাঞ্জাবের প্রধান শহর। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

লিওনার্দো ভিঞ্চি—সুবিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই মানুষটি সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা, রাজনীতি, রণনীতি, বিজ্ঞান, শল্যবিদ্যা যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। জগৎবিখ্যাত 'মোনালিসা' চিত্রটি এঁরই সৃষ্টি।

লিবিয়া—উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে ইতালির উপনিবেশ ছিল। প্রধান শহর ত্রিপোলি ও বেনগাজি।

লিগ অফ নেশনস—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি লিগ অফ নেশনসে যোগ দেন। জেনেভাতে লিগের সদর দপ্তর ও হেগ আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৬ সালে লিগের শেষ অধিবেশন বসে। বর্তমান রাষ্ট্রসংঘ একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে।

লেনিন—রুশ রাষ্ট্রনায়ক। লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী; কার্যত মার্কসবাদের প্রযোক্তা, ১৯১৭ খ্রি. তিনি রুশবিপ্লবের পর বলশেভিক মতে রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করেন।

লোকার্ণো—সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্ণো শহরে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স বেলজিয়াম জার্মানি ও ইতালি একত্র মিলিত হয়ে এক চুক্তিতে উপনীত হয়। স্থির হয় জার্মানি ফ্রান্স ও বেলজিয়াম তাদের তৎকালীন সীমান্ত বজায় রেখে চলবে এবং শক্তি প্রয়োগের নীতি পরিহার করা হবে। ভের্সাইচুক্তি মান্য করাই এর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকার করে হিটলার এই চুক্তি ভঙ্গ করেন।

ল্যাম্ব—বিশিষ্ট ইংরেজ প্রবন্ধকার চার্লস ল্যাম্ব। এঁর 'এসেজ' নখ, রোজামুণ্ড গ্রে' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য।

শকুনিমামা—দুর্যোধনের মামা গান্ধার রাজপুত্র। এঁর কূটবুদ্ধিতে দুর্যোধন এঁর মৃত পিতার হাড়ে তৈরি পাশা নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে পাশা খেলতে প্রবৃত্ত হন। এই পাশা শকুনির ইচ্ছামত চালিত হত। তাই যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে সর্বস্ব হারান। পরিণামে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংস হয়।

শঙ্খমালা—রূপকথার নায়িকা।

শম্ভু—শিব, মহাদেব। ইনি ধ্বংসের অধিদেবতা রুদ্র।

শয়তান—বাইবেলে উল্লেখিত পাপপুরুষ শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন ও নরকে নিক্ষিপ্ত হন। আদম ও ইভকে তিনি নিষিদ্ধ ফল খেতে প্ররোচিত করেন; ফলে আদম ও ইভ স্বর্গভ্রষ্ট হন। শয়তান চিরকালই মানুষকে পাপের পথে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন।

শুকতারা—শুক্রগ্রহ। প্রত্যুষে শুকতারা রূপে পূর্বাকাশে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারা রূপে পশ্চিমাকাশে তাকে দেখা যায়।

শোন নদী—গোতবন পর্বত থেকে বার হয়ে শোন নদ পাটনার কাছে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। শোন শব্দের অর্থ রক্তবর্ণ, রুধির, সিন্দুর।

শ্বেতাশ্বতর—১। ব্রহ্ম। ২। উপনিষদ বিশেষ। উপনিষদ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও অনুশীলনের ফলে ব্রহ্ম সমীপে পৌঁছানো যায় বা যে বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি সংসার-বন্ধনকে শিথিল বা নিঃশেষে বিনাশ করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ শুক্লযজুর্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্যামবাজার—উত্তর কলকাতার এক কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

শ্যামা—কালিকা দেবী।

শ্রাবস্তী—গণ্ডক জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগর। আধুনিক 'সাহেত মাহেত'। সূর্যবংশীয় শ্রাবস্ত রাজার নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই নগরের নামকরণ হয়। বুদ্ধের আমলে এই নগর উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। তখন রাজা নবসেনাদিত্যের পুত্র 'জেত' এবং কোষাধ্যক্ষ 'সুদত্ত' নামান্তর 'অনাথপিণ্ডদ' বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। জেত-এর নিকট ক্রীত জমিতে সুদত্ত এক বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সারিপুত্তের তত্ত্বাবধানে এই কাজ হয়। শ্রাবস্তীর পার্শ্ববর্তী নদীতীরে এই বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারের বুদ্ধদেব প্রদত্ত নাম ছিল 'জেতবন অনাথপিণ্ডিকারাম'।

শ্রীমতী—বুদ্ধ অনুগামিনী শ্রীমতীর উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে মেলে।

শ্রীমন্ত—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক, ধনপতি সওদাগরের পুত্র। 'চণ্ডিকামঙ্গল' ও 'ধনপতি' দেখুন।

সগর—সূর্যবংশের রাজা বিশেষ, ভগীরথের প্রপিতামহ। এঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য অশ্বরক্ষাকালে ষাট হাজার পুত্র কপিল মুনির শাপে পাতালে ভস্মীভূত হয়। পরে প্র-পৌত্র ভগীরথের সাধনায় গঙ্গা আনিত হলে তাঁরা উদ্ধার পান। দ্র. ভাগীরথী।

সঙ্ঘমিত্রা—সম্রাট অশোকের কন্যা। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ভাই মহেন্দ্রের মতো ইনিও সিংহল [শ্রীলঙ্কা] যান।

সতী—'দক্ষ যজ্ঞ' দেখুন।

সনকা—মনসামঙ্গলের নায়ক চন্দ্রধর সওদাগরের স্ত্রী, লখিন্দরের মা।

সব্যসাচী—অর্জুন, দুই হাতেই শরসন্ধানে সমান নিপুণ ব'লে অর্জুনকে সব্যসাচী বলা হতো। গাণ্ডীব ধনুর্ধারী অর্জুনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি ছিলেন। 'অর্জুন' দেখুন।

সাজাহাঁ—মোগল সম্রাট সাজাহাঁ [সাজাহান] জাহাঙ্গীরের পুত্র। শিল্পানুরাগী সাজাহাঁ পত্নী মমতাজের বিস্ময়কর স্মৃতিশৌধ তাজমহল নির্মাণ করেন।

সাভারকর—ভারতীয় জননেতা বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) ১৯১০ সালে স্যার কার্জন ওয়ালিকে হত্যার অপবাদে অভিযুক্ত হল, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে বিলাত থেকে ভারতে আসার সময় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মার্সাই শহরে যান কিন্তু ফরাসিদের দ্বারা ধৃত হয়ে ১৯২৪ পর্যন্ত বন্দী থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৭-৪২ সালে হিন্দু মহাসভা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সিংহল—প্রাচীন লঙ্কা, সাম্প্রতিক নাম শ্রীলঙ্কা। ভারত মহাসাগরীয় একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। শোনা যায়, বিজয় সিংহ এই দ্বীপ জয় করে এর সিংহল নাম রাখেন। কথিত

আছে, এখানে প্রাচীনকালে কুবেরের রাজধানী ছিল, রাবণ তাঁকে বিতাড়িত করে সিংহাসন আরোহণ করেন। পরে বিভীষণ রাজত্ব পান। একসময়ে সিংহলের রাজধানী ছিল অনুরাধাপুর। 'অনুরাধাপুর' দ্রঃ। সিংহলের সন্নিহিত সমুদ্রকে সিংহল সমুদ্র বলা হয়েছে।

সিদ্ধার্থ—বুদ্ধ দেখুন।

সিন্দবাদ—আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনী প্রসঙ্গ।

সীতা—রামায়ণের নায়িকা সীতা জনকরাজার কন্যা ও রামের পত্নী। পিতৃসত্যপালনে রাম বনে গেলে সীতাও অনুগামিনী হন। সীতা হরণকারী রাবণকে লঙ্কাযুদ্ধে বিনাশ করে রাম সীতাকে উদ্ধার করলেও আত্মশুদ্ধি প্রমাণের জন্য সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। তবু সীতার চরিত্র বিষয়ে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হলে অন্তঃসত্ত্বা সীতা নির্বাসিত হন। পরে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললে সীতা পাতাল-প্রবেশ করেন।

সীতারাম—সীতারাম রায় বাংলাদেশের বারভুঁইয়ার অন্যতম বিদ্রোহী রাজা ছিলেন। যশোহর জেলার মহম্মদপুরে এঁর বাস ছিল। তৎকালীন বাংলার সুবাদার সীতারামের রাজ্য দখলে ব্যর্থ হন। পরে এর উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগে বাদশাহী সৈন্য মহম্মদপুর আক্রমণ করে সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করে। এর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সীতারাম' উপন্যাস রচনা করেন।

সুজাতা—যে ভক্তিমতী কন্যা তপঃক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত বুদ্ধদেবকে পায়সান্ন খাইয়েছিলেন।

সুমাত্রা—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক সুবৃহৎ দ্বীপ সুমাত্রা বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আগে এখানে প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ ছিল। এদেশ কফি, গোলমরিচ, চিনি, ধান প্রভৃতি কৃষিজ ও টিন পেট্রোল সোনা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

সুমেরীয়—খ্রি. পূ. ৩৫০০ বছর আগে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তাদের সভ্যতার নিদর্শন নানা বাণমুখ লিপিচিত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্র. উর, বেবিলন।

সূর্য—আদিত্য, রবি। প্রধান দেবতা পত্নী ছায়া, কন্যা তপতী।

সেজান—Paul Cezanne (১৮৩৯-১৯০৬) সম্ভবতঃ গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। Aix-on Paovence-এ জন্ম। Bourbon কলেজে শিক্ষা। সেখানে Zola-র সঙ্গে বন্ধুত্ব। ১৮৬১ খ্রি. Passiro-র সঙ্গে পরিচয় ও চিত্র রচনার সাধনা। ১৮৭৪ খ্রি. প্রথম ইম্প্রেশনিস্ট প্রদর্শনী। রং এবং টোন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। Cubism-এর মূলনীতি প্রথম তাঁর সৃষ্টিতে পাওয়া যায়।

সেলিম—ভারতের মোগল সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গির উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। মেহেরউন্নিসাকে লাভ করার জন্য তার স্বামী শের আফগানকে হত্যা করান। নূরজাহান উপাধি ধারণ করে মেহেরউন্নিসা জাহাঙ্গিরের অংশ গ্রহণ করেন। ১৬২৭ খ্রি. জাহাঙ্গিরের মৃত্যু হয়।

সোক্রেতিস—প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক (খ্রি. পূ. ৪৬৯ খ্রি. পূ. ৩৯৯)। তখন প্রচলিত সব শিক্ষায় পটুত্বলাভ করে ইনি সৈন্যবিভাগে যোগ দেন। পরে সৈনিকবৃত্তি ত্যাগ

করে এথেন্সে বাসকালে জনগণকে ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্তে নাস্তিকতা ও তরুণদের কলুষিত করার অভিযোগে ইনি অভিযুক্ত হন ও বিষপানে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পালন করেন। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এঁর শিষ্য ছিলেন।

সোফোক্লেস—গ্রিক নাট্যকার (খ্রি. পূ. ৪৯৫ খ্রি. পূ. ৪৫৬)। ইনি প্রায় ১০০ খানি নাটক রচনা করেন।

সোভিয়েট—এই রুশ শব্দের অর্থ সভা। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর শ্রমিক সভা বা সোভিয়েটভিত্তিক শাসনতন্ত্র চালু হয়। সমাজবাদী সোভিয়েট রাশিয়ায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বদলে 'সোভিয়েট' সব কাজ চালনা করতো।

স্ট্যালিন—রুশ রাষ্ট্রনায়ক যোশেফ ভিসারিওনোভিচ স্ট্যালিন (১৮৭৯-১৯৫০) ১৭ বছর বয়স থেকে সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা নেন। লেলিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যান। মৃত্যুর পরে তাঁর কর্মনীতি সমলোচিত হয়েছে।

স্ফিংকস—কিম্বদন্তীর ডানাওয়ালা প্রাণী, যার মাথা নারীর মতো আর দেহটা সিংহের মতো। এই মূর্তি মিশরের থেকে উদ্ভুত। সূর্য যখন সিংহ রাশিস্থ হয় তখন নীলনদের জেগে ওঠার প্রতীক। সম্ভবত স্ফিংকসের পরিকল্পনা মোসোপোটামিয়া থেকে উদ্ভুত হয়। রাজাকে দৈবী মূর্তিতে দেখানো তার উদ্দেশ্য ছিল। আনুমানিক ২৯০০ খ্রি. পূ. নির্মিত গিজার বিশাল স্ফিংকস মূর্তিটির দেহ সিংহের আর মাথা একজন 'ফ্যারাও'-এর। কথিত আছে, স্ফিংকস এক জল দানব। সে থেবসের লোকদের এক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করত, উত্তর দিতে না পারলে হত্যা করত। ইডিপাস সেই ধাঁধার সঠিক জবাব দেন ও স্ফিংকসের মৃত্যু হয়।

স্বর্গ—দেবতাদের বাসস্থান, সুরলোক, অমরাবতী, ত্রিদিব। দেবতারা ও মৃত পুণ্যাত্মারা সেখানে দুঃখবিবর্জিত পরমসুখে বাস করেন। সেখানে রোগ, শোক, ক্ষুৎপিপাসা, ক্লান্তি, জরা, মৃত্যু নেই। সুখের অজস্র উপকরণ অমৃত, নৃত্যপরা অপ্সরা, নন্দন কানন, কল্পতরু প্রভৃতি আছে। সূর্যের ধ্রুবতারার সংস্থান পর্যন্ত এলাকা হল স্বর্গ।

স্বাতী—অশ্বিনী প্রভৃতির অন্তর্গত পঞ্চদশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্র কুঙ্কুমের মতো রাঙা ও এক তারাবিশিষ্ট। কিম্বদন্তী আছে স্বাতী নক্ষত্রের জল সাগরে শুক্তির মধ্যে পড়লে মুক্তা জন্মায়।

হংকং—ক্যান্টন নদীর তীরে অবস্থিত চিনের প্রাচীন বন্দর। বর্তমানে স্বাধীন হংকং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিলাসব্যসনের কেন্দ্র।

হরপ্পা—পাঞ্জাবের অন্তর্গত মন্টগোমারি জেলার হরপ্পাতে আনুমানিক ৩০০০ খ্রি. পূ.-এর প্রাগৈতিহাসিক নাগরিক সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় মহেঞ্জোদাড়োর সমকালীন এই নগরীতে প্রাপ্ত মূর্তিসমূহের গঠন নৈপুণ্য ও শিলমোহরসমূহের লিপিচিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হরি—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, যিনি পাপ হরণ করেন; মৃত্যুকালে তাই হরিনাম করা রীতি।

হিটলার—(১৮৯৯-১৯৪৫) জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক। নাৎসীদলের নেতা, জার্মানির চ্যান্সেলার ও রাষ্ট্রপতি ছিলেন। জন্মস্থান উত্তর অস্ট্রিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইনিই সূচনা করেন। এ যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে ইনি আত্মহত্যা করেন।

হেগেল—(১৭৭০-১৮৩০) খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক। স্টাটগার্ড-এ জন্ম। কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর দর্শনগ্রন্থের রচয়িতা।

হ্বিয়েনা—ডানিয়ুব নদীর তীরে অস্ট্রিয়া রাজ্যের হ্বিয়েনা [ভিয়েনা] শহর ইউরোপের সুন্দর শহরগুলির অন্যতম। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর হ্বিয়েনা কংগ্রেসে মিলিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ফরাসি সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে নেয়। এই চুক্তি ৪০ বছর কার্যকর ছিল।

হ্বের্সাই—ফ্রান্সের এই বিশিষ্ট শহর [ভার্সাই] প্যারিসের ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এখানে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানির মাথায় ঋণের বোঝা চাপানো হয়। এই চুক্তির দ্বারা লীগ অফ নেশনস্ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও হয়েছিল। তবু এই চুক্তিরই সুদূরপ্রসারী পরিণামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

হ্যারিসন রোড—কলকাতার শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন সংযোগকারী প্রধান রাজপথ। বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড।

হ্যোল্ডেরলিন—জার্মান কবি ফ্রেডেরিখ হ্যোল্ডেরলিন (১৭৭০-১৮৪৩) হেলেনিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ১৮০৬ সালে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। সুস্থ অবস্থায় হাইপেরিয়ান উপন্যাস ও সোফেক্লেসের ছটি অনুবাদ নাটক মাত্র প্রকাশ করেন। তিনি পাগল হওয়ার পর তাঁর বন্ধুরা তাঁর সমুদয় গ্রন্থ একে একে প্রকাশ করেন। প্রাচীন ছন্দে গ্রিক বিষয়বস্তুর উপরে রচিত তাঁর লিরিকগুলি ধীরে ধীরে কবি হিসাবে তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

সুরেন বাঁড়ুজ্জে—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতাশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁকে 'রাষ্ট্রগুরু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

হিরোসিমা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে মার্কিন আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত জাপানের অন্যতম শহর।

শব্দপঞ্জী

[জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ভিনদেশী শব্দসমূহের তালিকা]

আরবি

আখের < আখির—পরিণাম, শেষ, অন্ত।

আশক, আশেক < আশিক—প্রেমিক।

ইদ < ঈদ্—মুশসলমানদের প্রধান পর্ব, ঈদ্ উল্-ফিৎর্, ঈদ্-উজ-জোহা।

ইবলিশ—শয়তান।

ইলাহি <ইলাহি—ঈশ্বর, উচ্চ, মহান, বিরাট।

কবর < কব্র—সমাধি, গোর।

কাফের < কাফির—অমুসলমান, (বাংলা) বিধর্মী।

কুলুপ < কুফ্ল্—তালা।

কোরাণ < কুর্ আন—মুসলমান ধর্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ।

খবরদারি < খবর্দার—সতর্কতা, তত্ত্বাবধান।

খামির < খমীর—পচানো তামাক, গাঁজা পচাবার বীজ।

খারাবি < খরাবি—অনিষ্ট, দুষ্ট আচরণ।

খারিজ—বাতিল, অগ্রাহ্য।

খুন—রক্ত, (বাংলা) হত্যা।

খুন খরাবি < খুন খরাবি—লাল রং বিশেষ, dragon's blood

খেয়াল < খয়াল—কল্পনা, স্বপ্ন দেখা, শখ, ইচ্ছা, হুঁশ, স্মরণ, জ্ঞান, অনুমান, প্রবৃত্তি, সুলতান হোসেনী প্রবর্তিত সঙ্গীতের পদ্ধতিবিশেষ।

খেলাপ < খিলাফ্—অন্যথাচরণ, ব্যত্যয়।

গজল—সঙ্গীতের সুরবিশেষ, কবিতাবিশেষ, প্রেমসঙ্গীত।

জিন—দৈত্য।

জৌলস—ঔজ্জ্বল্য।

তস্বি—মুসলমানের জপমালা।

তাবিজ < তবীজ্—বাহুর অলঙ্কার বিশেষ, কবচ, মাদুলি।

তালাস < তলাশ—খোঁজ, অনুসন্ধান।

দলিল—লিখিত প্রমাণপত্র, স্বত্বাস্বত্ব নির্দেশক পত্র।

নহবত < নওবৎ—সানাই ইত্যাদির ঐকত্যন বাদ্য।

ফকির—মুসলমান সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক।

ফরাশ < ফারোশ—মেঝের বা বড় তক্তাপোষের আস্তরণ। যে চাকর বিছানা পাতা, ঘর সাফ, বাতি জ্বালা ইত্যাদি কাজ করে।

বুরুজ < বুর্জ—দুর্গাদির প্রাকারের বহির্গত অংশবিশেষ, চূড়াযুক্ত স্তম্ভ. গুম্বজ ; তাসখেলা বিশেষ।

বেদুইন—আরব দেশের যাযাবর জাতি।

মজগুল < মসগুল—নিমগ্ন, বিহ্বল।

মসজিদ < মস্জিদ্—মুসলমান উপাসনা মন্দির।

মসলাদরাজ, মসলাদার <মশাদাহ্দার—খাদ্য সুগন্ধ ও স্বাদু করিবার উপকরণযুক্ত।

মুয়াজ্জেন < মুআজ্জীন্—নামাজের সময়ে মসজিদের মিনার থেকে আল্লাহ্-র নাম ঘোষণাকারী।
মুসাফের < মুসাফির—পথিক, বিদেশী ভ্রমণকারী।
মেজাজ < মিজাজ—মনের অবস্থা, mood.
রেওয়াজ—দস্তুর, রীতি, চলন।
শরাব—মদ্য।
সফর—দেশভ্রমণ।

ফারসি

আশান < আসান—অবসান, রেহাই, লাঘব।
খুশ, খোশ < খুশ—আনন্দজনক প্রীতিকর, স্বেচ্ছাকৃত, প্রীত, সন্তোষ।
গুলজারিয়া, গুলজার—ফুলের কেয়ারি, (ব্যঙ্গে) বিভিন্ন পাপীর একত্র সমাবেশ।
চোগা—ঢিলা খোলা জামা।
জবান—ভাষা, কথা, জিহ্বা।
জমিন < জমীন্—কৃষিক্ষেত্র, ভূমি।
জাজিম < জাজম—ফরাস বিছানা ইত্যাদির চাদর।
জাহাঁবাজ < জাহান্‌বাজ—ধড়িবাজ, কূটবুদ্ধি, বহুদর্শী, দুর্দান্ত।
জিঞ্জির—শিকল।
জিন < জীন—ঘোড়ার পিঠের আসন, Saddle.
জুলপি < জুল্‌ফ্—কানের পাশে রাখা চুল বা কানের পাশে থেকে গালের কিছু দূর পর্যন্ত রাখা দাড়ি।
তখত, তখ্‌ৎ—সিংহাসন, কাঠের ফলা, board.
দরাজ—মুক্ত, বিস্তৃত, প্রশস্ত।
দরিয়া—নদী, (বাংলা) বড় নদী, সমুদ্র।
দস্তুর—প্রথা, নিয়ম, কায়দা।
দিওয়ানা < দিবানা—পাগল।
দিলদার—মহানুভব।
দুশমন—শত্রু, দুর্বৃত্ত।
নিরিখ < নির্খ—দর, হার, rate.
পরী—পক্ষযুক্তা উপদেবীবিশেষ।
পশ্মিনা—পশমী বস্তুবিশেষ।
পীর—মুসলমান সাধু, মহাপুরুষ।
পেয়ালা < পিয়ালা—পানপাত্র, বাটি, cup.
বান্দা, বন্দা < বন্দাহ্—দাস, গোলাম, চাকর, অনুগত বা অধীন ব্যক্তি। (ব্যঙ্গে) লোক, chap.
বেলোয়ারি < বিল্লৌরী—স্ফটিকের মতো পলতোলা কাঁচ নির্মিত।
বেহুশ, বেহোশ—অচৈতন্য, জ্ঞানহীন।
মিনার—স্তম্ভাকৃতি, চূড়া বা মন্দির।
রবাব—বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।
রোজা—রমজান মাসে পালনীয় মুসলমানের উপবাসব্রত।
রোশনাই, রোশনি—আলোক, আলোকসজ্জা, illumination.
লঙ্গরখানা—সাধারণের রান্নাঘর, বিনামূল্যে অন্ন বিতরেণর স্থান।
শাহানশাহ্—রাজাধিরাজ, সম্রাট।
সরাই—পান্থশালা, চটি।
সাকি—সুরা পরিবেশনকারী তরুণ বা তরুণী।
শাদা < সাদাহ্—শ্বেত, শুভ্র।
সওয়ার—আরোহী, অশ্বারোহী।
হুণ্ডি—ভিন্ন স্থানের কাউকে টাকা দেবার নির্দেশলিপি।

ইংরেজি

Aerial—বায়বীয়, বায়ুবিহারী, শূন্যস্থিত, আকাশতার।
Aerodrome—বিমানঘাঁটি।

Aeroplane—উড়োজাহাজ।
All clear—বিমান আক্রমণের পর নিরাপত্তা সংকেত।
Aluminium—অল্যুমিনিয়াম, শুভ্র লঘুধাতু বিশেষে।
Ambulance—আহত বা রুগ্‌ণ ব্যক্তিবাহী যান।
Amoeba—সর্বদা পরিবর্তনশীল জীবাণু-বিশেষ।
Art—শিল্প।
Baboon—বৃহৎ বাঁদর বিশেষ।
Ball—গোলক।
Ballot—গুপ্ত ভোটদান পদ্ধতি।
Bank—ব্যাঙ্ক, অধিকোষ।
Barr-ck—সেনানিবাস, ছাউনি।
Bathroom—স্নানাগার।
Bed—শয্যা।
Beryl—পান্না, ফিরোজমণি।
Blade—ব্লেড, অস্ত্রের ফলক।
Blizzard—তুষার ঝটিকা।
Bobbin—সুতা জড়াইবার নলি।
Bodkin—কাপড় ফুটো করার সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র।
Bomber—বোমারু সৈনিক বা বিমান।
Bourgeois—ক্ষুদ্র অক্ষরের মাপবিশেষ।
Bread-basket—রুটির টুকরি।
Birar pipe—গাছের শিকড় থেকে তৈরি তামাক খাবার পাইপ।
Bubonic plague—গ্রন্থি স্ফীতিযুক্ত সংক্রামক রোগবিশেষ।
Budget meeting—বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের বৈঠক।
Bus—বাস।
Camp—শিবির।
Canary—দ্বীপপুঞ্জবিশেষ।
Capital—মূলধন।
Canteen—(সেনানিবাসে) মদ, খাদ্য প্রভৃতির দোকা।
Caravan—মরুভ্রমণকারী বণিকদল, বাসযোগ্য বড় গাড়ি।
Charter—রাজ শাসনপত্র, সনন্দ।
Chemise—সেমিজ, স্ত্রীলোকের লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ।
Chorus—একতান সঙ্গীত।
Circus—মণ্ডলাকার ক্রীড়াঙ্গন।
Club—প্রমোদ সমিতি।
College—মহাবিদ্যালয়।
Commission—কোনো কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।
Committee—কার্যনির্বাহী সভা।
Compass—দিক নির্ণয় যন্ত্র।
Congress—মহাসভা।
Conferance—সম্মেলন।
Convoy—রক্ষীবাহিনী।
Co-prosperity—সহ-সমৃদ্ধি।
Cormorant—সামুদ্রিক অতিভোজী পাখি।
Crane—কপিকল।
Cross—বধকাষ্ঠ, যে দণ্ডকাষ্ঠে যীশুখ্রিষ্টের প্রাণবধ করা হয়।
Dialectic—তর্কশাস্ত্র সম্পর্কীয়।
Dish—থালা, পেয়ালা।
Dock—জাহাজ নির্মাণের বা মেরামতের জায়গা, কাঠগড়া।
Dodo—অধুনা বিলুপ্ত একজাতীয় বড় পাখি।
Dollar—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্যমুদ্রা।
Dynamite—বিস্ফোরক বিশেষ।
Electron—পরমাণু, তড়িত-অণু।
Enamel—কলাই, মীনা, দাঁতের মসৃণ কঠিন আচ্ছাদন।
Engine—বাষ্পীয় যন্ত্র, যন্ত্র।

Epidemic—মহামারী।
Factory—কারখানা।
Fan—পাখা।
Foot—পরিমাপ বিশেষ, ১২ ইঞ্চি।
Foot-Path—হাঁটার নির্দিষ্ট পথ।
Gas-lamp—গ্যাসবাতি।
Gas-light—গ্যাসের আলো।
Glacier—হিমবাহ, তুষার নদী।
Glass—কাঁচ, গেলাস।
Grill—হোটেলের রান্নাঘর।
Halitosis—মুখের দুর্গন্ধ রোগ।
Head line—শিরোলিপি।
Head light—সামনের প্রধান আলো।
Heliotrope—সূর্যমুখী।
Hotel—পান্থনিবাস, সরাই।
Hurray—উল্লাস ধ্বনি।
Hydrant—পথের জল তোলা কল।
Hydrogen—উদজান।
Income-tax—আয়কর।
Injection—ইনজেকশন।
Jacket—ছোট জামা বিশেষ।
Jeep—ছোট দ্রুতগামী মোটর গাড়ি।
Jetty—জেটি।
Journal—দিনপঞ্জী।
Lagoon—উপহ্রদ, সমুদ্রের নিকটবর্তী অগভীর লবণাক্ত হ্রদ।
Lamp—দীপ, আলোক।
Lens—দৃষ্টিসহায় কাঁচ, পরকলা।
Libido—কামবৃত্তি।
Machine—যন্ত্র।
Magnetic-mine—চৌম্বক মাইন।
Mammoth—অধুনা বিলুপ্ত হস্তীজাতীয় জন্তু।
Marmalade—মোরাব্বা বিশেষ।
Maroon—আপিঙ্গল, লোহিত।
Meeting—অধিবেশন, বৈঠক।
Microphone—স্বরবিবর্ধক যন্ত্র।
Middle-man—দালাল।
Mile—আধ ক্রোশ।
Mineral—খনিজ।
Monument—কীর্তিস্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ।
Morgue—শবব্যবচ্ছেদ গৃহ।
Mosaic—চিত্রবিশেষ, কারুকার্য বিশেষ।
Motor car—মোটর গাড়ি।
Mummy—মসলা দ্বারা রক্ষিত শব।
Museum—জাদুঘর।
Nation—জাতি।
Neolith—নব্য প্রস্তরিক।
Nocturne—রাত্রির ছবি, নৈশদৃশ্যের স্বপ্নময় সঙ্গীতালেখ্য।
O. K. (All Correct)—ঠিক থাকা।
Oasis—মরুদ্যান, মরুভূমির মাঝের উর্বর জমি।
Oblong—আয়তক্ষেত্র, আয়তাকার।
Olive—জলপাই।
Overbridge—রেললাইনের উপরকার উচ্চ সেতু।
Pact—চুক্তি, সন্ধি।
Pagoda—বৌদ্ধমন্দির।
Papyrus—ভূর্জপত্র, এক প্রকার চারাগাছ, তার থেকে প্রাচীনকালে কগজ তৈরি হত।
Paradigm—শব্দরূপের মত চার্ট।
Paraffin—শাদা মোমজাতীয় পদার্থবিশেষ।
Party politics—দলীয় রাজনীতি।
Petrol—খনিজ তৈল, পেট্রোল।
Phoshorescence—অন্ধকারে জ্বলনশীল, অনুপ্রভা।
Photograph—আলোকচিত্র।
Pice restaurant—বিভিন্ন পদের জন্য

পৃথক পৃথক দাম দিয়ে তারকারি, ভাত খাবার জায়গা।
Piston—পাম্পের ব্যবহৃত ছাট সিলিণ্ডার, চাপদণ্ড।
Plan—অভিসন্ধি, অভিপ্রায়, পরিকল্পনা।
Plane—উড়োজাহাজ।
Plate—রেকাবি।
Poplar—বৃক্ষ বিশেষ।
Power—শক্তি, কর্মদক্ষতা।
Printing press—ছাপাখানা।
Propellar—প্রচালিকা, বাষ্পচালিত তরীর চাকা।
Ration—বরাদ্দ খাদ্য, রেশন।
Renaissance—নব জাগরণ, ১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুভ্যুদয়।
Restaurant—রেস্তোরাঁ, সাধারণ ভোজনালয়।
Ribbon—রেশমী ফিতা।
Ricksaw—রিক্শা গাড়ি।
Rubber—রবার।
Saccharin—আলকাৎরাজাত চিনি।
Satin—রেশমী বস্ত্র।
School—বিদ্যালয়।
Simoon—আরবের উষ্ণ বায়ু, উত্তপ্ত বাতাস।
Siren—বিমান আক্রমণের সঙ্কেতশিঙ্গা, কবি কল্পিত কোকিলকণ্ঠী কুহকিনী।
Skylight—ছাদস্থিত জানালা।
Slogan—স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য প্রদেশের প্রাচীন রণধ্বনি, কোনো দলের বাঁধা বুলি।
Slot machine—মূল্য ঢুকিয়ে যে যন্ত্রকে চালু করা হয়। স্বয়ংক্রিয় বিক্রয়যন্ত্র।
Soviet—সাম্যবাদী রুশ দেশের প্রতিনিধি সভা।
Splinter—টুকরো, চটা, চোকলা।
Stand—গাড়ি দাঁড়ানো জায়গা।
Taxi—ভাড়ার মোটর গাড়ি, ট্যাক্সি।
Torch—মশাল, পথপ্রদীপ।
Totem—বংশচিহ্ন, কুলকেতু।
Trade union—কর্মী সংঘ।
Traffic—মাল বা যাত্রীর যাতায়াত।
Tram—ট্রাম, লোহার রেলের উপর চাচিত গাড়ি বিশেষ।
Truck—ট্রাক, শকট।
Typhoon—প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘূর্ণিবাত্যা।
U. N. O. (United Nation's Organisation—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ।
Velvet—মখমল।
Vitamin—খাদ্য-প্রাণ।
Vote—মতপ্রকাশ।
Water—জল।
Wrist Watch—মনিবন্ধ ঘড়ি, হাতঘড়ি।

নির্ঘণ্ট

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ

এই গ্রন্থে আলোচিত কবিতার নির্ঘণ্ট রচনায় 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত গ্রন্থক্রম ও কবিতার সংখ্যাক্রম মোটামুটিভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

কথাসাহিত্য ॥ উপন্যাস